“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com
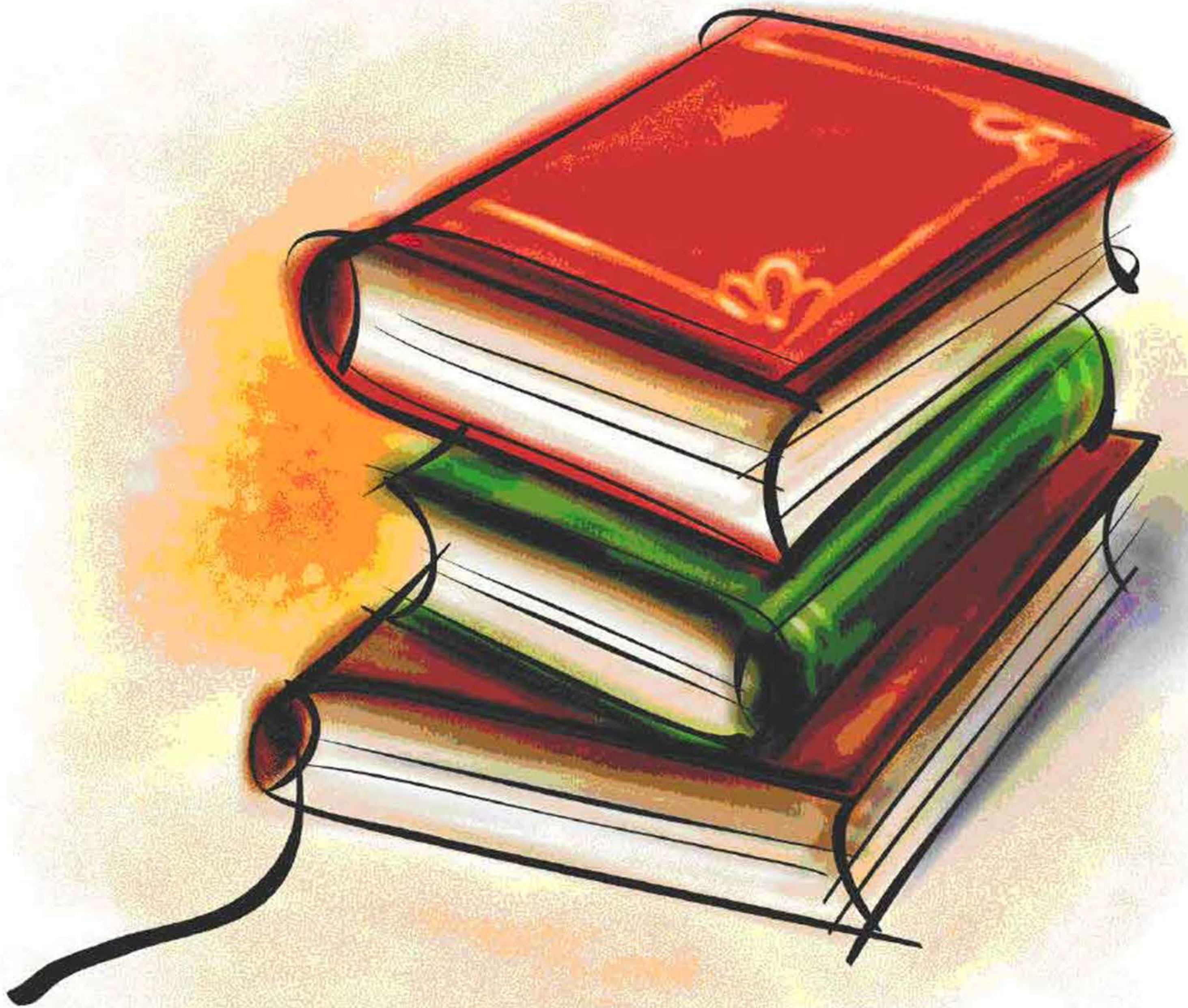
বন্দিনী সীতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদ চট্টোপ

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৭ | তৃতীয় সংখ্যা

জানি

যারে ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার চলায় মোর তরী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার তুলিতে যার কলা,
যার সুর বেজে উঠে মোর গানে গানে
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র এ আমার পরাণে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গাঁথি দিল মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু ‘আমারি জানি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে টানি’।

তবে কেন পাই মোর, নিবিড় হাতে
প্রেয়সীর দূরের পরশ

আমি

বারে বারে
দেখেছিনু তারে
অতল মাধুরী-সিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
আমি সেই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরানে নীরের মহিমায়
আপনা-হারায়
তারে তাই আপনার দেখেছি বিস্ময় পরপারে।
যে আমি তোমার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কাছে,
মানবের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে দেখেছি জানিতে।

দিগন্তে মেদুর মেঘলোক
নীল মেঘে
নবীন আসে নীড়ে।
দিনে দিনে তাই
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে॥

১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রলেখা

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

১

জনরব যে পাঠিকারা প্রায়ই কাব্যের নায়কদের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে যান। এর কারণও স্পষ্ট। স্ত্রীজাতি সব জিনিষই যাচাই করে নেয় হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে নয়। কাব্য হিসাবে Hamlet যে Romeo Julietএর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা কোনও স্ত্রীলোক মুখে স্বীকার করলেও মনে মানবে না। এর কারণ, Romeoর সঙ্গে সহজেই ভালবাসায় পড়া যায়, এমন কি গুরুজনের অমত উপেক্ষা করেও; কিন্তু কোনও প্রকৃতিস্থ কিশোরী, গুরুজনের আজ্ঞাতেও প্রসন্নমনে Hamletএর গলায় মালা দিতে সম্মত হবে না, অবশ্য সে যদি Opheliaর মত মতিচ্ছন্ন না হয়। Julietএর সঙ্গে Romeoর প্রেমালাপের সঙ্গে Opheliaর সঙ্গে Hamletএর নর্ম্মালাপের তুলনা করলেই, সহজেই বুঝতে পারবেন যে এর কারণ কি?

কাব্যের মনগড়া মানুষের প্রতি মনের টান কিন্তু স্ত্রীজাতির একচেটে নয়। কাব্যরাজ্যের কোনও কোনও নায়িকাও কখনো কখনো কোনো কোনো পাঠকেরও মনকে পেয়ে বসে। আর ভালবাসা শব্দের, আর যে অলৌকিক অর্থই থাক না কেন, মনকে পেয়ে বসা যে তার একটি অভ্রান্ত লক্ষণ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যার কথা দিনে একবার মনে হয় না, যার মুখ যখন তখন চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে না, তাকে যে ভালবাসি, এমন কথা সেই বলতে পারে, যার কথা শুকের মুখের বাণী, অর্থাৎ মুখেরই কথা মনের কথা নয়।

তবে এ ক্ষেত্রে, পাঠিকাদের ভালবাসার সঙ্গে আমাদের ভালবাসার একটু তফাৎ আছে। তাঁরা শুনতে পাই, কাব্যে যে মনোমত নায়কের সাক্ষাৎ পান, জীবনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবার অলীক আশা মনে পোষণ করেন। Romeoর [illegible]তার না হোক, অংশাবতারের সঙ্গে কোন শুভ পূর্ণিমার রাত্রে যে দেখা হবে এ বিশ্বাস তাঁদের মনে বদ্ধমূল; আর য[illegible] নাহয় ত চন্দ্রালোকও বৃথা, জীবনও বৃথা।

আমরা কিন্তু জানি যে, আর্টের রাজ্যে অর্থাৎ রূপলোকে যার সাক্ষাৎ পেয়েছি, জীবনে অর্থাৎ কামলোকে তার সাক্ষাৎ কখনও মিলবে না। আমরা জীবনে তাই তাদের খুঁজিনে[illegible] সংসার-ভাবনা থেকে মুক্ত হলেই,মনের আকাশে তাঁদের প্রত[illegible] করি। যে সুর, যে রূপ মানুষের মনকে হঠাৎ পেয়ে ব[illegible] সে সুর সে রূপ সব সময়ে যে খুব উঁচুদরের তা অবশ্য নয়

২

সকলেই জানেন, এক-একটা গানের সুর অ[illegible] টুকরো, কি কারণে জানিনে, মনে এমনি বসে যায় কিছুদিন ধরে তা কানের কাছে যখন তখন গুনগুন ক[illegible] এবং হাজার ইচ্ছা করলেও, সেটিকে মন কিম্বা কান থে[illegible] তাড়ানো যায় না। একটু অন্যমনস্ক হলেই দেখা যায় আবার কানের কাছে গুনগুন করছে। যদিও তা দরবা[illegible] কানাড়া নয় ছিবলে পিলু, রেখাব-পঞ্চমের স্পর্শমুক্ত প[illegible] মালকোষ নয়; কড়িমধ্যম স্পৃষ্ট ভৈরবীর একটা টুকরো মা[illegible]

কানের মত চোখেরও এ রকম অযথা পক্ষপাতি[illegible] আছে। এক জায়গায় এক সঙ্গে একশ'টি রূপসী র[illegible] দেখলে তাদের মধ্যে হয় ত একজনের মুখ, আমাদের চো[illegible] এঁকে যায়, যদিচ তার মুখ দস্তুর-মত সুগঠিত নয়, অ[illegible] তার চোখটি একটু ছোট অথবা নাকটি একটু বড়। [illegible] অশাস্ত্রীয় মুখটি যখন তখন চোখের সুমুখে এসে হা[illegible] হয় আর তার রূপ চোখ থেকে আলগা করা অস[illegible] হয়ে পড়ে।

কেন যে এক-একটা বিশেষ সুর, এক-একটা বি[illegible] রূপ আমাদের মনকে স্পর্শ করে ও বিচলিত করে, এর কা[illegible] আমি জানিনে। সম্ভবতঃ সে সুর সে রূপের অন্তর্নি[illegible]

াণ আমাদের প্রাণকে গোপনে স্পর্শ করে। এর চাইতে ষ্ট ব্যাখ্যা হয় ত দেহতাত্ত্বিকরা অথবা মনস্তত্ত্ববিদরা দিতে রেন কিন্তু আমি পারিনে। তবে এ ঘটনা যে ঘটে তার াণ আমি এ জীবনে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। ়র আমার বিশ্বাস যে, চোখ কাননামক মনের দু'টি দুয়োর া খোলা আছে তিনিই তা করেছেন।

কাব্যরাজ্যও এই একই নিয়মের অধীন। কবিতার এক চটি পদ বা বাক্য আমাদের মনে হঠাৎ এমনি বিঁধে যায় যে, কথাটি সময়ে অসময়ে আমাদের মনে খোঁচা দেয়। বির আঁকা কোনও কোনও ছবিও যখন তখন আমাদের ত্রপথে উদয় হয়। কবি-কল্পিত নাম রূপের মায়াও আমরা বনে কাটিয়ে উঠতে পারি নে। সংস্কৃত কবিদের কল্পিত নসকুমারীদের মধ্যে একটি কুমারী আমার মনের পটে াদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তার নাম পত্রলেখা।

৩

প্রথমতঃ হয় ত ঐ নামের গুণেই পত্রলেখা আমার কানের তর দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করেছিল। নামেরও যে একটা হিনী শক্তি আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্পষ্ট র বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ নাম সংস্কৃত সাহিত্যে অপূর্ব্ব। মায়ণ মহাভারতে এ জাতীয় নাম নেই। এ নামের গায়ে ষ্ট আর্য্য মার্কা নেই। একদিকে পত্রলেখা যেমন উর্ম্মিলা গুবী শ্রুতকীর্ত্তির সগোত্র নয়, অপর দিকে অর্ব্বাচীন যুগের লিকা, মদনিকা, তমালিকারও স্বজাতি নন। এ নামের য় যেমন আর্য্য রূপ নেই, তেমনি অনার্য্য গন্ধও নেই।

তারপর বাণভট্ট পত্রলেখার যে ছবি এঁকেছেন, সে ই যার চোখ আছে, তার চোখ কখনও এড়িয়ে যায় না। স্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের যে যায় নি, 'কাব্যের উপেক্ষিতার' সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন। রবীন্দ্রনাথ ত্রলেখার যে ছবি বাঙলা পাঠকদের কাছে ধরে দিয়েছেন ছবিটি এই :—

"যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে াস নামে একটি কঞ্চুকী প্রবেশ করিল—তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা অনতিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তাম্বর অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দন তিলক, কটিতে হেম-মেখলা, কোমল তনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য অঙ্কিত—এই তরুণী লাবণ্যপ্রভা প্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া কনিত নূপুরাকলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।"

এ হচ্ছে পত্রলেখার রূপের চমৎকারিত্বর first impression।

৪

সংস্কৃত কাব্যের কোন নায়িকারই নাম শোনবামাত্র তার বিশেষ রূপ আমাদের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয় না। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই সর্ব্বললামভূতা অনবদ্য সুন্দরী। সকলেই এক ছাঁচে ঢালাই হয়েছেন। তাই এঁদের একজনের রূপ আর একজনের রূপ থেকে স্বতন্ত্র নয়।

বাণভট্ট হচ্ছেন একমাত্র কবি যাঁর কাব্যে আমরা নানা রূপের স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাই, কারণ তিনি নানা জাতির নানা শ্রেণীর, এমন কি অস্পৃশ্যা রমণীরও ছবি এঁকেছেন। মাতঙ্গকুমারী যে গন্ধর্ব্বকুমারীর সবর্ণ নয়, এ কথা বাণভট্ট ভোলেন নি। একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, এ জগতটা যে দৃশ্য জগৎ তা এতই প্রত্যক্ষ যে এই স্পষ্ট সত্যকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ বিষয়ে বাণভট্টও Theophile Gautierএর সমধর্ম্মী।

স্ত্রীজাতির স্ত্রীত্বের অতিরিক্ত রূপ বলে যে একটি বিশিষ্ট ও একমাত্র নয়নগোচর গুণ আছে, বাণভট্টের চোখ সে বিষয়ে খোলা ছিল। তাই তিনি কোন কোন রমণীকে একমাত্র ছবি হিসেবে দেখেছেন এবং আমাদেরও দেখিয়েছেন। পত্রলেখার চিত্র তাঁর masterpiece, অতএব এই অপূর্ব্ব চিত্রটি আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। বিশেষ পরিচয়ে এ চিত্রের first impression ম্লান হয় না বরং তার মর্ম্ম আরও ফুটে ওঠে।

এ রূপ দেখে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না, কেননা পত্রলেখা মহাশ্বেতা নয়। সে চন্দ্রমণ্ডল থেকে রাহুভয়ে ভুবনে অবতীর্ণ একখণ্ড জ্যোৎস্না মাত্র, জমাট জ্যোৎস্নার পরিচ্ছিন্ন আকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে তার মুখের

মেরুদণ্ড, অর্থাৎ নাসিকা, সম সুবৃত্ত ও তুঙ্গ। তারপর চোখে পড়ে তার দেহ। সে দেহ লতানো নয়, তন্বীর মত চরণের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সখী আমায় ধরো ধরো, এমন কথা তার মুখ দিয়ে কখনও বেরয় না। সে অবশ্য চরণের উপর সুপ্রষ্ঠিত হ'লেও চিত্র-পুত্তলিকার মত আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলনা, কঞ্চুকীকে অনুগমন করছিল, মন্দ মন্দ বাহুবিক্ষেপের দ্বারা দেহের লাবণ্য দুহাতে চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে। এ মেয়ে যে পরে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়বে যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের পার্শ্বে, তার ইঙ্গিত তার সকল অঙ্গে ছিল। বাণভট্ট দুটি চারটি ছোটখাটো জিনিষের উল্লেখ করছেন যাতে করে এ স্ত্রী মূর্ত্তি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি একটি কথায় পত্রলেখার দেহমনের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন। সে রূপ পূর্ণ মুকুলিত নয় স্ফুটোন্মুখ। পত্রলেখার পয়োধর নাতি নির্ভরোদ্ভিন্ন। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তার মনও তার স্তনের অনুরূপ নাতিনির্ভরোদ্ভিন্ন। অতিমাত্রায় তাম্বুল চর্ব্বণের ফলে তার অধররেখা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, দেখতে মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার প্রান্তদেশে ঈষৎ অন্ধকার লেগে আছে। তার চরিত্রও তার দেহযষ্ঠির অনুরূপ সরল। প্রমাণ তার তিলক আগের দিন পরা চন্দনের, অতএব ধূসর। সে সেজেগুজে মুখধুয়ে যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের কাছে উপস্থিত হয় নি। তাই তার কপালে বাসি চন্দনের তিলক, রাঙা ঠোঁটে পানের কালো দাগ।

পত্রলেখার কি দেহে কি মনে হাবভাব বিলাস বিভ্রমের ইঙ্গিত মাত্রও নেই। এখনও সে নারীসুলভ ছলকলা শেখে নি। লজ্জা এখনও তার শরীর মনকে অভিভূত করে নি। সে প্রগল্ভ অথচ অবিনয়ী নয়, মিতভাষী নয় কিন্তু মিষ্টভাষী। সে অনর্গল বকে কিন্তু যা খুসি তা বলে না। এক কথায় তার চলাফেরা বলাকওয়া সব যেমন সপ্রাণ তেমনি সুন্দর; রাণী বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়কে আদেশ করিতেছিলেন যে পত্রলেখার চাপল্য নিজের চিত্তবৃত্তির মত দমন করে।

পত্রলেখা "প্রথমে বয়সি বর্ত্তমানা" উপরন্ত সে রাজার নন্দিনী, রাজনন্দিনী হ'লেও রাজকুলের আদুরে মেয়ে। তাই তার প্রাণের স্ফূর্ত্তি অব্যাহত।

পত্রলেখার কোন ইতিহাস নেই, কারণ তার দেহ মনে যৌবনের সূচনা মাত্র আছে পরিণতি নেই। "দিনে দিনে অঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ" বিদ্যাপতি ঠাকুরের এ উক্তি রক্তমাংসে গড়া নারীর পক্ষে সত্য কিন্তু ছবির পক্ষে নয়। চিত্রকরের তুলিকা বা লেখনি একটি অনিত্য মূহূর্ত্তকে নিত্য করে। চিত্র হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন নয়। তাই পত্র লেখা যে একদিন দ্বিতীয় কাদম্বরী হয়ে উঠবে, এ পরিণাম আমি কল্পনাও করতে পারি নে। পত্র লেখা সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র চিরকুমারী।

চণ্ডীদাস বলেছেন,

> রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
> কামগন্ধ নাহি তায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যদি কোনও কিশোরী এ হেন কিশোরী স্বরূপ হয় ত সে পত্রলেখা।

চন্দ্রাপীড় যখন বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভ করে প্রথমে এ জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি নির্নিমেষ নয়নে পত্রলেখার প্রতি অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন, তার পর তিনি পত্রলেখাকে একদিনের জন্যও চোখের অন্তরাল করেন নি এমন কি কাদম্বরীর নেশায় যখন তিনি বিভোর তখনও নয়। এ তরফের তার তাঁর মনোবীণায় চিরদিনই চড়ানো ছিল।

আমিও যখন কলেজ থেকে বেরিয়ে পত্রলেখাকে প্রথম দেখি তখন আমিও তারদিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়েছি এবং আজ পর্য্যন্ত তাকে চোখের অন্তরাল করতে পারি নি। এর কারণ, পত্রলেখা কামলোকের নয়, লোকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ক্ষণিকা

শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম্‌-এ

"ক্ষণিকা" যখন প্রথম পড়ি সে আজ বহু‘দিনের কথা। া তখন নবীন, প্রতিদিনের জগত তখন প্রতিদিনের ময়ের ও আনন্দের খনি। বাইরের পৃথিবী, মানুষের লা, কাব্যলোক—সবই নূতন, সবই বিচিত্র রঙে রঙীন। ন্তু মন যখন সকল ডাকে সাড়া দিল, সব জিনিষকে জানতে তে, উপভোগ করতে, অনুভব করতে ব্যাকুল, এই তিপুরাতন ধরণী আর এই চিরন্তন মানবপ্রকৃতি যখন একটি কাশোন্মুখ জীবনের কাছে নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়, খন মনের যে বরাদ্দ মাফিক নিত্যখোরাক বিদ্যালয়ে বা মাজিক আবেষ্টনের মধ্যে জুটল তাতে প্রাণমন শুষ্ক, তিক্ত, তৃপ্ত, নিরানন্দ ক'রে তোলার সব উপাদানই ছিল। দ্যালয়ে শুধু বস্তা বস্তা বিদেশী ভাব বিদেশী ভাষার ভাঙ্গা াকো ক'রে সরবরাহ করা হত, আমাদের কাছে পৌছতে াছতে সে সব হয়ে আসত বস্তাপচা। সমাজব্যবস্থায়ও াথাও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যেতনা। চারিদিকে যাঁরা ানী, গুণী, গুরুজন তাঁরা শূন্য জীবনের জীর্ণ পুঁথি ঝেড়ে তেন শুধু গোটাকয়েক শুক্‌নো উপদেশ—ব্যবহারিক জীবনে ক বেঠিক সফলতা বিফলতা যাতে সমঝে চলি। আর াবন ব'লে কোন বালাই ত আমাদের দেশে বড়-একটা াকেই না, কাজেই জীবনের সত্য স্পর্শে যে নিজেকে সজীব াখব সে উপায়ও ছিল না।

চারিদিকে এই জরার অচলায়তনে প্রাণ যখন একান্ত ক্লিষ্ট, মন সময়ে কোন্ শুভলগ্নে পড়লাম :—

> শুধু অকারণ পুলকে
> নদীজলে পড়া আলোর মতন
> ছুটে যা ঝলকে ঝলকে !
> ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
> ঝলমল প্রাণ করিস যাপন
> ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
> শিরীষ ফুলের অলকে !
> মর্ম্মরতানে ভরে ওঠ গানে
> শুধু অকারণ পুলকে !

মুক্ত প্রাণের দমকা হাওয়ায় যেন জীর্ণ প্রাচীর ভেঙে ধূলিসাৎ হল, রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। এতদিন যা খুঁজেছিলাম অতি সহজে হাতের কাছেই তা পেয়ে গেলাম। যে "অকারণ পুলক" চেপে যাওয়াই দুষ্ট প্রকৃতিকে শিষ্ট করার উপায় শুনেছিলাম এ যে তারই জয়গান! সংসারের বাঁধা রাস্তায় হুঁসিয়ার হয়ে, ট্যাঁকের কড়ি সামলে চলার সদুপদেশে বুক বোঝাই হয়ে উঠেছিল, সে পাথরের বোঝা হাল্কা হয়ে গেল। কুটিল দ্বিধা যত সব সিধা হল, বুঝলাম অকারণে অকাজ নিয়ে অসময়ে অপথ দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও মহাজন অনুমোদিত।

> কত কালের কত মন্দ ভাল
> বসে বসে কেবল জমা করি
> ফেলা-ছড়া ভাঙ্গা-ছেঁড়ার বোঝা
> বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি,
> গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে দিক
> দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া !
> বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
> মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া !
>
> সংসারেতে সংসারী ত ঢের
> কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
> মেলাই আছে মস্ত বড় লোক,
> সঙ্গে তাদের অনেক সেজো মেজো,
> থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে ;—
> লাগুক্ মোরে সৃষ্টি ছাড়া হাওয়া !
> বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
> মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া !

জীবনের অতিপরিচিত প্রতিদিনের গণ্ডীর মধ্যে দূর বনানীর মর্ম্মরধ্বনি শোনা গেল, অর্থহীন তুচ্ছ কাজের দাসত্ব শৃঙ্খল খসে গেল।

ঘরের মধ্যে বকাবকি
নানান মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা;
সময় অল্প ফুরায় তাও
অরসিকের আনা গোনায়;
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
একথা সে বিশেষ বোঝে!

এই কথাটাই এতদিন শুনে এসেছিলাম যে যৌবন বড় বিষম কাল, এবং একলম্ফে বাল্য থেকে বার্দ্ধক্যে পৌছতে পারলেই মোটের ওপর সুবিধে, কারণ তাতে অনেক ঝঞ্ঝা এড়িয়ে নিরাপদ নিশ্চিন্ত নিয়মিত জীবনের বন্দরেতে আসা যায়। "ক্ষণিকায়" পড়লাম কবির কাব্য তরুণের জন্যে, বসন্তের পুষ্পসম্ভার তরুণ-আঁখির প্রসাদ যাচে, বনে কোকিল গেয়ে মরে তরুণ শুনবে ব'লে, বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভাল চলে, তপস্যা তখনই সার্থক হয় যখন নবীন তপস্বী মধুর বাতাসে বিচঞ্চল নীলাঞ্চলের সন্ধান পায় আর কাঁকন মলের রিণিক্‌ঝিণি শুনতে থাকে। অজানা জগতের সন্ধানে নব নব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তরুণই সুদূরের, সুন্দরের স্বপ্ন দেখে চলতে থাকে। সে যে-বাণিজ্যের মহাজনী করে তার জন্যে সে অকূলের মাঝে তরী ভাসিয়ে অজানায় চলে যায়।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজ খানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি
কোন তারকা লক্ষ্য করি
কূলকিনারা পরিহরি
কোন দিকে রে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে!
মরবনা আর ব্যর্থ আশায়
বালু মরুর তীরে!
সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেণায় ফেণা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাবত তবু
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈবনা আর কভু!

যৌবনের সকল রঙীন কল্পনার, তার আশা আকাঙ্ক্ষার, তার বিচিত্র অনুভূতির এমন অপূর্ব্ব প্রকাশ যখন কাব্যে পেলাম তখন যেন পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেলাম। শঙ্কা সংশয় দূর হল, নিজে যা, তাই হবার সাহস পেলাম, দশের সঙ্গে নিজের প্রভেদ অস্বাভাবিক মনে করে তার জন্যে লজ্জা পেয়ে সে সব ঘষে মেজে সবার সঙ্গে একাকার হবার ব্যর্থপ্রয়াসে প্রাণপাত করার আর কোন দরকার রইল না। বুঝলাম নিজের যে অনুভূতি সত্য, যা সুকুমার তা অবজ্ঞার সামগ্রী নয়, তার মূল্য অসীম, তাকে ছেঁটে বাদ দিলে জীবনও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

ক্ষণিকা পাঠে অনেকদিন আগেকার সে যৌবনসুলভ চঞ্চল আনন্দ-হিল্লোল এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে, স্মৃতির সাহায্যে মাঝে মাঝে তাকে খানিকটা ফিরে পাই। তখনকার মনোভাবের সঙ্গে যে কবিতাগুলির ভাবের বিশেষ ঐক্য পেয়েছিলাম সেইগুলিই তখন বেশী করে ভাল লেগেছিল, কিন্তু বয়সের কোঠায় যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই "ক্ষণিকার" সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আরও বেশি করে বুঝছি। কবি যখন "ক্ষণিকা" লেখেন তখন তিনি যৌবনের প্রান্তে এসে

পড়েছেন। যৌবনের উদ্দাম প্রবল বাসনা শান্ত হয়ে আসছে, জগৎটাকে একটা বৃহৎ ভোগপাত্র মনে করে নিঃশেষে তার সকল সুধা পান করার ইচ্ছা তখন অন্তর্হিত। যা পাওয়া যায় ভাল, অনেক পাওয়া অনেক চাওয়ায় আর প্রবৃত্তি নেই। সব জিনিষ আলগা মুঠিতে ধরছেন, থাকে থাকুক, খসে যায় যাক। জীবনের যত জটিল কুটিল ব্যথা, মায়া-ঘেরা যত নিষ্ফল ব্যকুলতা, সব ছেড়ে ছুড়ে প্রাণের উৎস মুখে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর মনের ভাবকে বৈরাগ্য বলা চলে না, Cynicism বা world-weariness ত একেবারেই নয়। জীবনের পথে একটা বাঁকে এসে পৌঁছে তিনি থেমেছেন; যে পথ অতিক্রম করেছেন এবং যা এখনও সম্মুখে রয়েছে তা একবার চেয়ে দেখে নিতে চাইছেন। যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে হৃদয়াবেগ যৌবনের যে হাজার আকুল বাসনা, যে অসংখ্য অস্ফুট কল্পনা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন, চলতে চলতে তার অনেক খসে গেছে, যা অবশিষ্ট আছে বুঝেছেন যে তাও এবার পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হবে। জীবনের একটা পর্ব্ব শেষ হয়ে আসছে, তার কাছ থেকে কবি বিদায় নিচ্ছেন। অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক বুঝেছেন। নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নানা লোকের সঙ্গে মিশে মানুষের মনের কিছুই যেন তাঁর অজানা নেই। মানুষের কোথায় দুর্ব্বলতা, কোথায় তার মহত্ত্ব সবই জানেন। কারো প্রতি ঘৃণা নেই, অবজ্ঞা নেই, রাগ নেই। জীবনে অনেক পেয়েছেন, আবার অনেক এসে জোটেও নি। তার জন্যে কোন খেদ নেই। আঁধার আলোয়, শাদায় কালোয়, দিনটা মোটের ওপরভ লই কেটেছে, কারো সঙ্গে কোন তাঁর ঝগড়া নেই। এটা কিন্তু ভালই বুঝেছেন যে জীবনের এক নূতন সুরে তিনি চলেছেন, কোথায়, তা তাঁর ঠিক জানা নেই। দীর্ঘ পথের অন্ত ঠিক দেখাতে পাচ্ছেন না, কিন্তু পথ বেঁকেছে। এত দিনের সাধা যন্ত্রে তাঁর একটি তন্ত্রী বিকল বাজছে, কেন তা জানেন না, জানেন শুধু এই যে মনের মধ্যে যেটা শুনচেন হাতে সেটা আসচে না। বাইরের জগত এবং মানুষের মন এত ভাল চিনেছেন যে সবেরই সত্যরূপটি দেখতে পাচ্ছেন, তাদের নানান অলীক মায়ায় ঘিরে আত্ম-বঞ্চনা করা আর তাঁর সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞানের এই গভীরতার জন্যে কি নিজে দৃষ্টির সূক্ষ্মতা অনুভব করে' কোথাও আত্ম-গরিমা আত্মপ্রসাদ নেই। বরঞ্চ একটু দুঃখ আছে যে সবই কেটে গেল। এখনও যেন দু'চারটিও অবশিষ্ট থাকে দু'চারটি মিথ্যাও যেন জীবনকে মধুর রাখে—এই ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। সব জিনিষ সুস্পষ্ট আর সংগি আর সারবান নাই বা হল, থাকলই বা চারিদিকে এ বেশী, একটু উপরন্তু, একটু আতিশয্য। দেখচি ত স সাদা চোখে; কিন্তু বছরে একটা দিন যদি আসেই য দ্বার মুক্ত পেয়ে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা হন, না হয় সেদিন ক ওজন হারিয়ে ফেলে একটু অতিবাদই করলাম! ভাগ্য কৃপণ হয়ে আসচে অনেক দিকেই, একদিনের জন্যে না ভাণ্ডারে অজস্রত্বই বিরাজ করল!

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে,
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই!

*   *   *

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলবো তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করচে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচকি হাসি সুধার বৃষ্টি
চলচে আজি জগৎ জুড়ে।

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এম্‌নি করে'
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে—
জেনো তবে মূঢ় মত্ত
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব,
ফুট্‌ল নূতন চোখের কোণে!

* * *

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী তেম্‌নি করে
এসব কথা ভুল্‌ব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল!
চিত্ত দুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই বল্‌বনাক সত্যকথা!

কিন্তু বসন্তে প্রকৃতির আতিশয্যের অনুকরণে কবিরও যে এই অতিবাদ তার সুযোগও কমে আসচে। জীবনের বসন্তকে বিদায় দেবার ক্ষণ এসেছে। শেষ-বসন্তের শূন্য হাওয়া শস্য-শূন্য মাঠে হাহা করে উঠেছে। অনেক তরঙ্গের ঘাতে হাল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া তাঁর জীবনতরীকে 'ক্লান্ত মে এবার আনাগোনা বন্ধ করতে বলচেন। এখন আর অকূল কালো নীরে ভেসে যাওয়া নয়,

এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি';
ঘাটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে,
তারি আঘাত সহি!

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এপার হতে পারে
যাসরে খেয়া বেয়ে!
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।
ওপারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এঘাট ওঘাট,
ইচ্ছা করিস যদি!

এতদিনের যে সর্ব্বনেশে স্বভাব সে মাঝে মাঝে এ নূ বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশায়, আবার মাতাল হয়ে মরণ-লুব্ধ হতে ছো কিন্তু ধীরে ধীরে দেখি মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হ এল, উত্তমের উল্লাস ক্রমে বিরতির শান্তিতে পরিণত হ ফাল্গুনের সে দখিন হাওয়ার হাল্কা হিল্লোল যখন নে আকাশ যখন মেঘে জোড়া, পূবে হাওয়ায় তখন দখি হাওয়ার ফুল ধরে' না দিয়ে কবি গাইলেন,—

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথ অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা!

এই অন্য গানের সুর নিতান্তই সহজ। কবির মন এ শান্ত, তাতে নানান ভাবের নানান প্রবৃত্তির সংঘাত এ স্তব্ধ। কোনো গভীর অতৃপ্তি, কি বিরাট আকাঙ্ক্ষা, কি বিপু প্রয়াস কবির বীণাকে উত্তাল তুমুল ছন্দে ঝঙ্কৃত করছেনা মনের ভাবটী যেমন নিতান্ত সরল ও স্নিগ্ধ, তার প্রকাশ তেমনি একান্ত সহজ ও মধুর। সকল জিনিষকে স্পষ্ট ক সত্য করে' দেখছেন, কিন্তু সে চাহনির মধ্যে অশেষ করুণা মনের ভাব এত সরস, অনুভূতি এত খাঁটি, যে তার প্রকাশে শ্রেষ্ঠ কাব্য করে তুলতে কোনো প্রয়াস কোনো অলঙ্কারে

[প্র]য়োজন নেই। এরকম একান্ত প্রাঞ্জল, অনাড়ম্বর, সকল [বা]হুল্যবর্জ্জিত কবিতা কাব্যের ইতিহাসে দুর্লভ। কবির [আ]র্ট সেই শিখরে পৌঁছেচে যেখানে ভাব, ভাষা, ছন্দ এক [হ]য়ে একটি অনায়াস পরিপূর্ণ রূপসৃষ্টি করে। জীবনের [জ]টিল গ্রন্থিগুলি খুলে জীবনকে মুক্ত, অবাধ, সরল করতে [তি]নি বারে বারে বলছেন। সকল অসাধ্য সাধন চুকিয়ে [দি]য়ে, ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম কুড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র না করে, [যা] সহজ সমুখে রয়েছে তাকে আদরে বুকে তুলে নিচ্চেন। [কি] হবে তর্ক বিবাদ করে, মান নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি [ক]রে? যদি ক্ষতি হয়ে থাকে, ফাঁকি যদি লোকে দিয়ে [থা]কে, মনে করলেই ত হয় যে ভবের এই গতিক; কতক [আ]সে, কতক যায়; কতক ধরা দেয়, কতক নাগালের [বা]হিরেই থেকে যায়। মাথা খুঁড়ে ত কারো মন পাওয়া [গে]ল না, আবার অযাচিতে কেউ বিকিয়ে রইল! কামনার [সি]দ্ধি যখন হল ব'লে, হঠাৎ হয়ত সব আশা চূর্ণ হয়ে ব্যর্থ [হ]য়ে গেল; বন্দরের কাছে জাহাজডুবী এমনই কি বিচিত্র! [এ]সব সত্ত্বেও কিন্তু

> আকাশ তবু সুনীল থাকে
> মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
> মরণ এলে হঠাৎ দেখি
> মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো!

[এ] বিশ্বভুবন এতই ডাগর যে অনেক বাদ দিলেও তার [অ]নেক বাকি থাকে। ক্ষতিক্ষত সব সত্বেও জীবন সরস [সু]ন্দর থাক্‌তে পারে। জীবনের আলো যদি আঁধার হয়ে [যা]য় বুঝতে হবে সেটা নিজেরই দোষে। বেশি আশা করতে [নে]ই, বেশি জানা জান্‌তে নেই। কিন্তু জীবনকে এড়িয়ে [যা]'র কথা কোথাও নেই। কবি যে ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে [জী]বন-তরঙ্গে দুর্ব্বল মানুষের হাবু-ডুবু খাওয়া দেখছেন তা [মো]টেই নয়। তিনি জলেই নেমেছেন, তবে স্রোতে গা [ভা]সিয়েছেন, টানের বিপরীতে সাঁতার কাটেন নি, তাই [মা]থা তুলে রেখেছেন। দুটি হৃদয়ের প্রেমে যে মিলন তার [ভি]তর বিশেষ কোনো তাৎপর্য্য তিনি খোঁজেন নি কারণ [সে] ত নিতান্তই সোজাসুজি ব্যাপার, বসন্তে ফুল ফোটার মত। [তা]র মধ্যে গভীর তত্ত্ব কি অসীম রহস্যের সন্ধান করতে গেলে এই সোজা কাহিনীটির স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু মাটি করা হবে, আর যে কিছু বড় লাভ হবে তা নয়—

> মধুমাসের মিলন মাঝে
> মহান্ কোন রহস্য নেই,
> অসীম কোন অবোধ কথা
> যায় না বেধে মনে-মনেই!
> আমাদের এই সুখের পিছু
> ছায়ার মত নাইক কিছু,
> দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
> নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি!
>
> * * *
>
> ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
> খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
> আকাশপানে বাহু তুলে
> চাহিনে ভাই আশাতীত।
> যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
> তাহার বেশি আর কিছু নাই,
> সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
> করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
> মধুমাসে মোদের মিলন
> নিতান্তই এ সোজাসুজি!

এই ভোগবিরত অনাসক্ত মনের কাছে সমাজের হিতসাধন বা দেশোদ্ধারের প্রবল চেষ্টা শুধু ক্লান্তি আর গ্লানি আনে। হাজার তুচ্ছ কাজের বাঁধনে নিজেকে বাঁধাই যদি সুসভ্যতা হয় ত তেমন সুসভ্যতার অলোক তিনি চান না। অর্থহীন কাজের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাচ্চেন তিনি ভারতের সুদূর অতীত যুগের কল্পনায়; কখনো বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের গোষ্ঠলীলার মধুর ছবি আঁকছেন, কখনো কালি-দাসের কালের প্রসন্ন, আনন্দোজ্জ্বল মন্থরগতি জীবনের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটাতে রেবার তটে চাঁপার তলে আমাদের নিয়ে যাচ্চেন। কোনো মতেই তিনি ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে দশের চোখে বড় করতে চান না। জ্ঞানী গুণী কর্ম্মী বলে প্রতিপত্তি, একেলে বা ভাবীকেলে

কোনো কীর্ত্তিকলাপেরই তিনি ধার ধারেন না। নেতা হয়ে নবযুগের চালক বলে কোনো নামই চান না, তার চেয়ে বরং অশোকনীপের ছায়ে আবার সেই ব্রজের রাখাল বালক হতে পারলে তাঁর জীবন সার্থক হত। কালিদাসের যুগে যদি জন্মাতেন, তাও নবরত্নের সভার মাঝে একটেরে রইতেন। দশের এক হয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তিই যদি তাঁর লক্ষ্য হত তাহলে কি আর মহাকাব্য না লিখে গীতিকাব্য লিখতেন, না লোকের মনের সিংহাসনের চেয়ে প্রিয়ার মনো-গৃহের চাবী মূল্যবান মনে করতেন!

এই নিতান্ত হাল্কা লঘু মনোভাব নিয়ে তিনি অবলীলায় রসসৃষ্টি করছেন তার মধ্যে গভীর তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা মাত্র না করেও তিনি সকল অনুভূতির সব পর্দ্দাগুলি বাজিয়ে চলেছেন। মানুষের মনের সর্ব্বত্রই তাঁর অবাধ গতিবিধি, তাই বিশেষ করেই যেখানে বলে রাখছেন যে গভীর সুরে গভীর কথা তিনি বলতে চান না, সেখানেও হাল্কা সুরেই গভীরতম কথা প্রকাশ করছেন। প্রিয়জনের ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা মাত্র কল্পনা করেই হৃদয় যে কতদূর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তা একটি অপূর্ব্ব কবিতায় বলেছেন ঃ—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমনকরে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
ঠাট্টা করে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।
সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কিনা
বুঝব কেমন করে?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
গর্ব্ব ছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।
ইচ্ছা করে নীরব হ'য়ে,
রহিব তোমার কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের পরে বুকের কথা
উগলে ওঠে পাছে,
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমার ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই
ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয়রে পাছে,
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়ে যাই,
স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই
নিত্য তব নেত্রপাতে
জালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

এই ত চরম আর্ট, যেখানে সরলতা সরসতায় মিশে একটি এশ্চর্য্যের পূর্ণতা সৃষ্টি করচে। "ক্ষণিকা"য় কবিতার পর কবিতায় এই একান্ত দুর্লভ একটি নিরাভরণ নির্ম্মল শ্রী দেখতে পাই। শেষের দিকের কবিতাগুলিতে কবি মনের গভীরতম ব্যথাই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেগুলিতেও এই একই প্রয়াসশূন্য স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য। গুরুগম্ভীর বিষয় আর মেঘমন্দ্র ধ্বনি না হলে কাব্য হয় না যাঁরা মনে করেন তাঁরা হয়ত "ক্ষণিকা"র পাতা উল্টে কবিতাগুলিকে "superficial" বলে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু যাঁরা যথার্থ রসগ্রাহী, বংশীর চেয়ে যাঁরা শাঁককে বেশি মূল্যবান মনে করেন না, তাঁরা বুঝবেন ভাব, ভাষা, ও ছন্দের এই মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, আনন্দিত গতি কি আশ্চর্য্য প্রতিভার ফল। আর প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতার বিষয়ের লঘুত্বের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আসে তাহলে উত্তরে একথা বলা চলে যে কবি একটি সৃষ্টিছাড়া বিশেষ উদ্ভট জীব নন, তাঁর সহজ মানুষ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়! তাঁর জীবনে যে খালি একের পর এক চরম মুহূর্ত্তই আসতে থাকে তা নয়, লঘু গুরু হাজারো ভাব কল্পনার লীলায় তাঁর প্রাণমন তরঙ্গায়িত। গভীর ব্যথাই ত তাঁর সকল গানের উৎস তা মোটেই নয় এমন কি sweetest songs-এরও নয়। আর-সকলের মতই ছোটখাটো হাসি দুঃখ, রাগ অনুরাগের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবন প্রবাহিত হচ্চে। অবশ্য এটা ঠিক জনসাধারণের কবি সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে খাপ না খেতে পারে। যাঁরা মনে করেন চাঁদের পানে চক্ষু তুলে নদীর কূলে পড়ে থেকে কাব্যে একটি বিপুল দীর্ঘশ্বাস না ধ্বনিত করে তুললে আর কবি কি হল, তাঁদের কথা ভেবেই সম্ভবতঃ "ক্ষণিকার" কবি পরম কৌতুকে লিখেছেন ঃ—

সুখে আছি লিখ্‌তে গেলে
লোকে বলে প্রাণটা ক্ষুদ্র!
আশাটা এর নয়ক বিরাট
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র!
পাঠক দলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর;
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে' যায় এর মনের জঠর!
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে!

কিন্তু যেহেতু মানুষ মানুষের কাছে একান্ত interesting সেইজন্যে একজনের জীবনের পরমমুহূর্ত্তগুলির প্রকাশই যে অন্যের কাছে আদরের সামগ্রী তা নয়। ছোট ছোট অভিজ্ঞতা, হাল্কা ভারী সকল সত্য অনুভূতি, দৈনিক জীবনের পথ চলার ছোটখাট সুখ দুঃখ, আদর অপমান—এ সকলই কাব্যে প্রকাশের সার্থকতা আছে। তাতে পুরাণ চিত্র বীর চরিত্র না দেখান যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যই ত একমাত্র কাব্য নয়। কবির পোষাকী চেহারা যদি লজ্জিত হয়ে তাঁর আটপৌরে চেহারাকে শুধু ঢাকতেই চায় তাহলে তাঁর কাব্যে একটা বড় রকমের গলদ থেকে যাবে—sincerity'র অভাব। মোট কথা যিনি প্রকৃত কবি তিনি বোঝেন যে জীবনই সবার বড় কাব্য-ভিত্তি, সুতরাং সেই জীবনের সকল কথাই কাব্য কথা হতে পারে। "ক্ষণিকার" প্রথমাংশে বিশেষ করেই জীবনের সেই unheroic অথচ একান্ত সত্য অনুভূতিগুলিকে চিরন্তন করা হয়েছে অপূর্ব্ব কাব্যরূপ দিয়ে। এর সত্যতা যেমন চমকে দেয় এর প্রকাশনৈপুণ্য তেমনি পুলকিত করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্য কোনো কাব্যে এমন অবাধে ধরা দিয়েছেন কিনা, এমন পরিপূর্ণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। কাব্যে এরূপ একান্ত স্পষ্টবাদ এরূপ মাধুর্য্যে নিষিক্ত করার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

এমনই হাল্কা সুরে সরস একটা হাসিঠাট্টা প্রথমদিকের অনেক কবিতায় ফুটে উঠেছে। এতে শ্লেষ বিদ্রূপ নেই, কাউকে কোন খোঁচা নেই। নিজেকে নিয়েই ঠাট্টা করচেন, কখনও বা সে হাস্যরস হঠাৎ করুণ হয়ে উঠচে। জীবন এতই ক্ষণিক যে কিছু হারালে, তা সে ধনই হোক আর প্রিয়ার মনই হোক, দীর্ঘবিলাপের কোন অবসর নেই; এই নির্ম্মম সত্য কথাটা যখন কবি হাসতে হাসতে বললেন তখন

প্রথমে মনে হল এ হাসি নিষ্ঠুর, তারপর বুঝলাম যে সত্যটা আরো নিষ্ঠুর বলেই তার ব্যথায় কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়াই কবি ভাল মনে করেছেন :—

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্যে বিলাপ করি—
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ত তলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রু জলে,
নিদেন কাঁদি মাসেক-থানেক
তোমায় চির আপন জেনেই—
হায়রে আমার হতভাগ্য !
সময় যে নেই ,—সময় যে নেই !
বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে
ঝরে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু,—
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্ব্বরতা,—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই !

কালিদাসের কালের মন্দালিকা, মঞ্জুলিকা , মঞ্জরিণীদের সঙ্গে কবির মিলন হয়নি বলে যখন তিনি বিচ্ছেদে অন্যমনা হচ্ছেন তখন মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন এই ভেবে যে সে সব বরাঙ্গনা এখন হয়ত অন্যনামে মর্ত্ত্যলোকে আছেন। কালের গতিকে তাঁদের যে সব পরিবর্ত্তন হয়েছে তার বর্ণনায় কবি ঠাট্টার সঙ্গে প্রশংসার সুনিপুণ ভাবে মিশিয়েছেন :—

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্ত্যলোকে,
মন্দ তারা লাগ্‌তনা কেউ
কালিদাসের চোখে !

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীর চালে,

তবু দেখ সেই কটাক্ষ,
আঁখির কোনে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা দিত
কালিদাসের কালে !

বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিলনা তাঁর ছবি !

মরবনা ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে !

কাজের যখন কোন তাগিদ নেই, কোনোদিকেই হাতে হাতে ফললাভের কোন বাসনা নেই, কোন স্থির লক্ষ্য ধ[illegible] জীবন যখন চলছেনা তখন মনের সেই অপর্য্যাপ্ত অবস[illegible] নিয়ে কবি বাঙলার শান্ত, নির্জ্জন গ্রামের মধ্যে বাসা বাঁধছে[illegible] গ্রামের প্রকৃতির ও সরল জীবন যাত্রার সকল সৌন্দর্য্য মনে[illegible] মধ্যে গ্রহণ করচেন। দিন শেষে গাঁয়ের পথে অকার[illegible] বেরিয়ে পড়ে যা দেখছেন তার ছবি এঁকে দিচ্চেন :

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক হীরা
শর্ষে ক্ষেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।

এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে!
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে!
আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলে গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শব্দে বাজ্‌বে কলস
ক্ষণে ক্ষণে!
সে সব কথা ভাবচি বসে
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়চে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ ঘরে ফিরচে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে' আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চলচি ফিরে
অকারণে!

বাঙলার গ্রামের এই স্নিগ্ধ পটভূমিতে দুটি হৃদয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের নিতান্ত সোজাসুজি কাহিনী কবি একটি মধুর pastoral এ বলেছেন—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে নাচে আমার বুক!
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে!
আমাদের এই গ্রামের নামটী খঞ্জনা
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।
আমাদের এই গ্রামের গলিপরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।
আমাদের এই, ইত্যাদি।

চারিদিকের কোন সৌন্দর্য্যই কবির চোখ এড়িয়ে যাচ্চেনা; তাদের আহরণের বাসনা যেদিন ছেড়েছেন আপনি এসে সেদিন তারা ধরা দিল। যেদিন চয়নে ব্যস্ত ছিলেন সেদিন চোখে পড়েনি বসন্ত কত ফুল নিয়ে আসে; বকুল-শয়নে নিলীন হয়ে যখন শুধু বকুল দলিত করেছেন, কুসুম-কান্তি তখন দেখেন নি। এখন না-চাইতেই হাতের নাগালে সবারে পেলেন। এ পাওয়াতে তাঁর লোভ বা বাসনা ফিরে এলনা কিন্তু সকলের সঙ্গে তাঁর একটি আনন্দের যোগ তিনি উপলব্ধি করলেন। নিরাসক্ত, নিরলম্ব মন একটি অচঞ্চল আশ্রয়ের সন্ধান পেল। বুঝলেন যে সবাই যদি তাঁকে ছেড়েও থাকে তবু জনশূন্য বিশাল ভবে হাজার সুরে তাঁর বিশ্ব তাঁকে উদার রবে ডাকতে থাকবে। এ জগতে অনেক দিন থেকেও অনেক কিছুই মিললনা বলে পরকালের মুক্তির আশায় মনকে আশ্রয় খুঁজতে হল না। চারিদিকের সঙ্গে নিজের যোগ যেই অনুভব করলেন তখন পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়োকেও নিজের একান্ত অন্তরঙ্গ সমবয়সী বলে চিনলেন; আর পরকালের ভালমন্দ গণার চেয়ে তাদের মনের কথা নিজের বীণার

তারে ধ্বনিত করে তোলায় কবিজীবনের পরম সার্থকতা পেলেন। বুক-ভাঙা বোঝা শুদ্ধ সারা মনকেই ফেলে আর তাঁর ছুটে পালাতে হলনা। মনের সকল আনন্দ উল্লাস তিনি আবার পরিপূর্ণ ভাবে ফিরে পেলেন। নববর্ষায় হৃদয় তাঁর ময়ূরের মত নেচে উঠল, আবার শত-বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত বিকশিত হয়ে উঠল, তাঁর আনন্দিত মন সারা বিশ্বে তিনি প্রসারিত করে দিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন নব কদম্বের মদির গন্ধে চারিদিক আকুল, তখন বিদ্যুৎ-চমকের মত, বাতাসের দুরন্তপনার মত, নবীন পাতার মর্ম্মরের মত, তাঁর সারা দেহ মন আনন্দ-রস-ধারার কলকল্লোলে উতরোল হল। এমনটা যে ফের হবে তা তিনি আশাই করেন নি; হৃদয় তাঁর যে আবার এমন করে খুলে যাবে, বিপুল বিশ্ব যে তাঁর প্রাণমনকে এমন করে আবার প্রচণ্ডবেগে নাড়া দেবে এ যে অপ্রত্যাশিত! বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে তিনি যে ভরসা জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন ঘন বরষায় তিনি আবার তা ফিরে পেলেন। যার অস্পষ্ট ধারণায় তাঁর মন একদিন ব্যাকুল হয়েছিল, আজ যখন তাকে কাছে দেখলেন তখন দেখলেন তার অভিনব রূপ। যৌবনস্বপ্নে তিনি যা চেয়েছিলেন এ তাই, কিন্তু আরও অনেক বেশী। এ অভাবনীয় দান তিনি কি ভাবে গ্রহণ করবেন তা জানেন না। তিনি এতদিন ধরে যে ক্ষণিকের পর্ণকুটীর রচনা করেছেন, এতবড় আগমনের পক্ষে তা যে নিতান্তই অনুপযুক্ত! তাই কবি তাঁর এই আয়োজনহীন পরমাদের জন্য লজ্জিত, কুণ্ঠিত। তিনি বুঝলেন যে তাঁর পরাণ ভরে এবার যে নূতন গান বেজে উঠবে তা আর এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে বেতসের বাঁশিতে বাজানো যাবেনা।

এইখানে কবির জীবনের এবং তাঁর কাব্য পরিণতির এক পর্য্যায় শেষ এবং নূতনের পর্ব্বের সূচনা। জীবনের প্রভাতে যে অজানার উদ্দেশে সকল রসারসি কেটে মাতাল হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন, মধ্যাহ্নে শ্রান্ত হয়ে তার অন্বেষণে বিরত হলেন; চিরন্তনকে চিরদিন না খুঁজে শান্ত মনে ক্ষণিকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনি তৃপ্তির সম্পূর্ণতা পেলেন না। জীবন-অপরাহ্নে যে পরমাশ্রয়ের আহ্বানে তিনি পুনরায় দুর্গমবন্ধুর পথে বেরিয়ে পড়লেন পথশেষে তাঁর সঙ্গে মিলনের আভাস পাই সর্ব্বশেষ কবিতাটিতে—

কখন যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে!
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানিনা কখন পশিনু কেমনে!
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে!
কখন যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হল যে কবে!

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়াছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা?

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

১১

বনে

হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ!
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ!
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদি যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে, সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ ধূধূ করিতেছে, কোথাও বা এক একটী বৃহচ্ছায়া বট বা অশ্বত্থ তাহাদের ডালপালা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে শ্যাম বনরেখার মধ্যে বিলীন গ্রামের নিকটে কতকগুলা চষা জমি, কোথাও বা রাখালের দল গরু চরাইতেছে, দূরত্বের জন্য সেগুলিকে যেন ছবিতে আঁকার মত গতিচাঞ্চল্যহীন দেখাইতেছে।

মাঝখানে একটা ঘন বন খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া মাঠের সবুজ সমুদ্রে যেন দ্বীপের মত দাঁড়াইয়া; তাহার এক পাশে একটা মরা বিল, বুকের স্থানে স্থানে ঘন ঘাস এবং শৈবাল ভরা সামান্য জল লইয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেই 'বিলেন জমি'তে কৃষকেরা স্থানে স্থানে আশু ধান্য রোপন করিয়া সেই বিলের "লক্ষ্মী জোলা" নামটি ঈষৎ সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বনের মধ্যে ঢুকিলে বুঝা যায় সেটি বন নহে, পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। ইদানীং বসতি বোধ হয় খুব কমিয়াই আসিয়াছিল তাই সেই দীর্ঘবৃক্ষসন্নিবেশের নিম্নে আগাছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে কয়েকখানি চালহীন মাটির ভিটা তাহাদের বক্ষপঞ্জর উন্মুক্ত করিয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত বনটি খুঁজিলে এইরূপ দুই তিন জায়গায় মাত্র দেখা যায়, তাহাদের অধিবাসীরা বোধ হয় অল্প দিন চলিয়া গিয়াছে। বাকি সমস্ত গ্রামের চিহ্ন বনে ঢাকিয়া গিয়াছে, কদাচিৎ কোথাও একটা ইষ্টক স্তূপ, তাহারই এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী মন্দির। অনতিবৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দিরটিকে প্রায় নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়া মন্দিরের মাথার উপরে মহাকাল দেবতার বিজয়-নিশানের মত নিজের সবুজ শাখার পত পত শব্দ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের কপাট নাই, অভ্যন্তরের দেবতার মূর্ত্তিও বাহির হইতে অস্পষ্ট। কতকগুলি দেবদর্শনার্থী যাত্রী অদ্য সেই মন্দিরের সম্মুখের ভগ্ন রোয়াকটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবতার উদ্দেশে সকলে প্রথমে সেই ভগ্ন রোয়াকেই মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিল। তারপরে একজন বাক্য উচ্চারণ করিল "কই কিছুই দেখা যায় না যে।" দলের কর্ত্তা আমাদের বৃদ্ধ রায় মহাশয় বলিলেন "মাঠের রোদ থেকে সদ্য বনে ঢোকা গেছে, গাছের ছায়ায় চোখ এখনো অন্ধকারই দেখচে কিনা। রোয়াকের ওপর ওঠা যাক্।" জুতা নীচে রাখিয়া কোনরূপে তিনি প্রায় ইষ্টকস্তূপেই পরিণত সেই ক্ষুদ্র রোয়াকে উঠিলেন। দলের সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল।

"ঐতো গৌরনিতাই দেবের যুগল মূর্ত্তি! বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।" আবার তাঁহারা একবার সকলে প্রণত হইয়া দৃশ্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তো বেশ পরিষ্কারই আছেন, মন্দিরের মধ্যেও বেশ পরিষ্কার, বোঝা

যাচ্ছে এখনো নিত্যই পূজা হয়। ঐতো বাইরে ফুলপাতাও পড়ে রয়েছে। এখানা দুয়ারে দেবার ঝাঁপ বোধ হচ্ছে, দুয়োরের অভাবে তৈরী করা হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে যতখানি সম্ভব চারিদিক বেশ পরিষ্কারও দেখাচ্ছে। লোক জন যাওয়া আসা করে নিশ্চয়।" দলের মধ্যে আমাদের চপলা কিশোরীও ছিল, সে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল "এ বনে বাঘ থাকে, না ঠাকুর দাদা?" অনেকে যেভাবে "চুপ চুপ" করিয়া উঠিলেন তাহাতে বোঝা গেল তাঁহাদেরও মনে সে কথাটা উদয় হইয়াছে। রায় মহাশয়ও মৃদুস্বরে বলিলেন "সেটা এমন অসম্ভবই বা কি?" কয়েক জন নারী অস্ফুটে কয়েক বার "বন মধ্যে বরাহঞ্চ" বলিয়া বিষ্ণু-ষোড়শ নামের এক নাম স্মরণ করিলেন। কেবল রাধা প্রতিবাদ করিল "এ রকম জায়গায় সে ভয় খুব কমই থাকে। দেখছনা এখানে মানুষ চলাচলের চিহ্ন রয়েছে।" তাহার কথায় সকলে যেন একটু ভরসা পাইলেন। অসহিষ্ণু কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "চলনা পিসি, একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরে দেখি—" "বাঘ আছে কিনা?" রায় মহাশয় নাতিনীর উদ্দেশে একটি মধুর সম্পর্কের সম্বোধন প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"তোর একটা বুনো বাঘের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়! যেমন তুই তেমনি বর হয়।" ঠাকুরমাতাও স্বামীর রহস্যে যোগ দিয়া বলিলেন "যে বর ওর জন্যে ঠিক হচ্চে সেতো ওকে 'মেনা বেনা'। সেই যে কোন মোছলমান দুর্গা ঠাকুর দেখতে এসে নাকি বলেছিল যে ওপরের চাল চিত্তিরের আঁকা ঐ ঠাণ্ডা বুড়োটি দুর্গির খসম? ও খসম তো দুর্গিকে মানায় নি! দুর্গি যেমন দজ্জাল্‌নি আমাদের হান্‌ফে চাচা যদি ওর খসম হ'ত তবেই ম্যানাতো। ওরও তাই হবে বড় বৌমা।" খুড়শ্বশুর ও শাশুড়ীর রহস্যে বড় বৌ মৃদু হাস্য করিলেন, কিন্তু কিশোরী মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিয়াছিল। সলম্ফে সেই ভগ্ন রোয়াক হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া "তোমরা বসে বসে এইখানে নমাজ কর ঠাকুমা তোমার হান্‌ফে চাচার সঙ্গে, আমি বাঘ খুঁজ্‌তে যাচ্ছি" বলিয়া বনের মধ্যের সেই লুপ্তপ্রায় পথরেখা ধরিয়া প্রায় লাফাইতে লাফাইতে একদিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। সকলে হাসির সঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া আবার বরাহ দেবকে স্মরণ করিতে করিতে বলিল "এ দস্যি মেয়ে একটা ঘটাবে দেখছি! রাধা তুই তোর মেয়ে সামলা। যেমন সং করেছিস্, বল্লাম ওটাকে লুকিয়ে যাই আমরা, তা ওঁর হ'লনা।' রাধা ততক্ষণে কিশোরীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া উভয়ে কয়েকটা গাছের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। শঙ্কিতা বড় বৌ বলিলেন "ওকে কি ফাঁকি দিয়ে আস্‌বার জো ছিল বাছা?' তিনি ভীত নয়নে তাহাদের গতি-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "আমিও যাই খুড়ীমা, কোনদিকে যাবে আবার?"

"ওটাকি পিসি? ঐ যে গাছের ডালে বসে আছে! ও বাবা দুটো যে! কি গোল্ গোল্ চোখ, কি বিশ্রী চেহারা! প্যাঁচা; হ্যাঁ প্যাঁচা নাকি অতবড় হয়? হুতোম প্যাঁচা? "তুই থুলি মুই থুলি" আবার নাম হয় নাকি? কই ওরা তো তা বল্‌ছে না! বাবা কি হুম্ হুম্ শব্দ! হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে একদিন জোচ্ছনা রাত্রে যখন তোমাদের দেশের সেক্‌রা পাখি ঠকর্ ঠকর্ ক'রে কেবলই গয়না গড়াচ্ছিল,—সেও এক রকম প্যাঁচা? সব পাখিই ত প্যাঁচা তাহলে বাপু, তোমাদের দেশে! সেই রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রকাণ্ড একটা কি চিলের ছাদের ওপর বসে ছিল আর এই রকম হুম্ হুম্ শব্দ আসছিল অন্ধকার রাত্রি হলে বাপু ভয় করত কিন্তু। কেমন মজা দেখছ পিসি? একবার গলা ফুলিয়ে এটা ডাকছে আর একবার ওটা ডাকছে! ওরাই সেই "তুই থুলি" পাখী যারা টাকা লুকিয়ে রেখে ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে মরেই গেল? তারপরে মরেও এই রকম ধেড়ে ধেড়ে পাখী হয়ে দুজনে দু'জনকে বলে "তুই থুলি, তুই থুলি"! আমাদের দেশে আরও ঝোপের মধ্যে লুকুলো দেখছ পিসি? কাক যদি আসে তো বাছাধনরা টের পান এখনি! ও পিসি, শেয়াল শেয়াল! ওমা, কেমন ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটে বাচ্ছা সঙ্গে! আমি ধরব একটা—হ্যাঁ—কেন—কামড়ে দেবে না আরও কিছু? যাঃ পালিয়ে গেল তুমিও একটু দৌড়ুলে না কেন তাহলে ধরা যেত! হ্যাঁ যাও!"

কিশোরীর কলকণ্ঠ বনের দিকে বাজিতে লাগিল শুনিয়া মাতা আর তাহাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইলেন না। মন্দিরের অদূরেই দাঁড়াইয়া ছোট জায়ের সঙ্গে বন ও বনের ঠাকুরটির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অপরিসর স্থানে শ্বশুরের ন্যায় গুরুজনের অতি নিকটে তাঁহারা এতক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য পাইতেছিলেন না, একটু আড়ালে আসিয়া বাঁচিলেন।

"অবধৌত"! অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দে সকলে সচকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল মলিন ধূলী-ধূসরিত ছিন্ন কন্থার আল্‌খেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, রূক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু ও জটায় মস্তক এবং মুখ সমাচ্ছন্ন এক বৃদ্ধ বার্দ্ধক্যের চাপে যেন কুব্জাকার হইয়া সেইদিকে আসিতেছে। সেই নির্জ্জন বনের মধ্যে সেই কুদর্শন অদ্ভুত বেশধারী ব্যক্তির আগমনে সকলেই যেন ঈষৎ শঙ্কিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সেখানে তাঁহাদের দেখিয়াও কোন ভাবান্তর প্রকাশ করিল না। রোয়াকের অদূরে সহসা জানু পাতিয়া বসিয়া কাহার উদ্দেশে যেন প্রণাম করিল এবং নত মস্তকে নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজী কি সাধু মহান্তকে দর্শন করতে এসেছো?" আগন্তুক কোনই উত্তর দিল না। "আমরাও তাঁকে দর্শন কর্‌তে এসেছি, তিনি এই বনের ঠিক কোনখানটায় থাকেন জানো কি?" আগন্তুক নীরব—যেন সে মূক বা বধির। কিন্তু সে সেখানে আসার সময়ে যে একটা গম্ভীর শব্দ সকলের কাণে গিয়াছিল তাহাতে সকলেই বুঝিল লোকটা অন্ততঃ বোবা নয়। ইহার নিকটেও কোন সন্ধানের আশা নাই বুঝিয়া সকলে একটু যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

"ঠাকুর্দ্দা—ঠাকুর্দ্দা, দেখুন এসে, কাকে খুঁজে বার করেছি। আপনারা তো নমাজ কর্‌তে লাগলেন, আমরা ঐ দিকে গিয়ে দেখি—কেমন ডালপালার ছাউনিতে কুঁড়ে ঘরের মতন রয়েছে, তার মধ্যে তিনি চোখ বুজে বসে রয়েছেন। দেখেই চেঁচিয়ে 'সন্নিস্যি ঠাকুর, আমরা তোমাকে যে দেখতে এসছি; ঠাকুর্দ্দা এসেছেন' বলতেই তিনি চোখ চাইলেন আর আমি ছুটে পালিয়ে এলাম" বলিতে বলিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিশোরী ছুটিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া সহসা তাহার গতিরোধ হইয়া গেল। ঈপ্সিতলাভের সম্ভাবনার সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলে রোয়াক হইতে নামিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় হর্ষোচ্ছ্বাসের সহিত "কইরে কোন দিকে—কোন দিকে" বলিতে বলিতে নামিয়া নাতিনীকে অকস্মাৎ সেই বৃদ্ধ দর্শনে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া রহস্যেচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন "এইবার বাঘ দেখতে পেলি ত?" সেই বনতলে উপবিষ্ট চিত্রিত ছিন্ন কন্থাবৃত কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধকে একটী ভীতিপ্রদ বন্য জন্তুর মতই দেখাইতেছিল বটে।

তাঁহাদের আর অগ্রসর হইতে হইল না—একখানা কম্বল হস্তে পূর্ব্বপরিচিত সেই উদাসীন প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাদের দিকেই আসিতেছিলেন, পশ্চাতে জোড় হস্তে রাধা। "আসুন—আসুন, কতক্ষণ এসেছেন?" সকলে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই উদাসীন দূর হইতেই সুদীর্ঘ দেহ অর্দ্ধ-অবনত করিয়া বদ্ধাঞ্জলী ভাবে সকলকে অভিবাদনসূচক নমস্কার করিলেন। সকলে তখন বনের সেই আগাছা জঙ্গলের মধ্যেই হাঁটু পাতিয়া বসিতেছিল, উদাসীন প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই সকলকে এরূপ ভাবে বাধা দিলেন যে কেহই আর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যটি করিতে সাহস পেল না। তাহাদেরও মস্তক নত করিয়াই প্রণাম সারিতে হইল। সেই ভগ্ন রোয়াকের উপরে কম্বলটি বিস্তৃত করিয়া উদাসীন তাঁহাদের বসিতে আহ্বান করিলেন।

রায় মহাশয় এইবার সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিলেন "আপনার বিছানো আসনেও বস্‌তে হবে?" "আপনারা আজ গৌরনিতাই দেবের অতিথি যে!" উদাসীনের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে আবার সকলে রোয়াকের উপরে উঠিলেন কিন্তু কম্বলে বসিলেন না। রায় মহাশয় কম্বলটি গুটাইয়া মাথায় ঠেকাইতে গেলে যখন উদাসীন তাঁহার হস্ত ধরিয়া শান্ত অনুরোধের স্বরে বলিলেন "আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দেন দয়া করে" তখন তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ত্ব হইতে মুক্তি দিতে রাধাদাসী অগ্রসর হইয়া কম্বলখানি আবার একবার পাতিয়া দিল। তখনো উদাসীনের অনুরোধে সকলকে প্রথমে বসিতে হইল; পরে তিনি মন্দিরের ভিতর হইতে একটু ছিন্ন আসন বাহির করিলেন।

বৃদ্ধ ভিক্ষুক এতক্ষণ জোড় হস্তে দাঁড়াইয়াই ছিল, তাহার দিকে মস্তক হেলাইয়া অভিবাদনান্তে সাধু বলিলেন "অবধূত, তুমি কখন? এঁদের সঙ্গেই নাকি?" ভিক্ষুক নতমস্তক একটু চালনা করিল মাত্র। রায় মহাশয়ই উত্তর দিলেন "না, উনি এই কতক্ষণ এসেছেন!" "তুমিতো মন্দিরেও উঠবে না, আমার আসনও নেবেনা, ব'স!" বৃদ্ধ আবার প্রণামের ভাবেই সেইখানে হাঁটু পাতিয়া বসিল। সাধুও সেই ছিন্ন আসন টুকু পাতিয়া রোয়াকের একদিকে উপবেশন করিতে করিতে

রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "একাদশস্কন্ধে ভগবান উদ্ধবকে যে-সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, যার নাম "উদ্ধব গীতা" তার মধ্যে "ভিক্ষুগীত" একটি উৎকৃষ্ট বস্তু! সেই অবন্তীদেশের ব্রাহ্মণের মত এই বৃদ্ধটিও বহুকাল 'অবধূত' পন্থা নিয়েছে। কিন্তু এতকালেও শান্তি পায়নি। এর মন এখনো একে কর্ম্মপাকের স্মৃতিতে অশান্ত রেখেছে, তাই মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

এতক্ষণে ভিক্ষুক নিজমনে একটু একটু যেন মাথা নাড়িল —চক্ষু-কোটর হইতে যেন দুই এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল "দুবার এসে দর্শন পাইনি!" তাহার সেই বার্দ্ধক্য-জড়িত কণ্ঠস্বর যেন একটা জন্তুর গর্জ্জনের মত গোঁ গোঁ শব্দ করিল মাত্র। উদাসীন কিন্তু বুঝিলেন, স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "আমিও সেকথা ভেবেছি যে অবধূত হয়ত ফিরে গেছেন।" আবার সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এঁকে এইদিকে ভিক্ষা করতে অনেকেই হয়ত দেখেছেন?"

রায় মহাশয় কুণ্ঠিতভাবে "আমিতো গ্রামে থাকি না, বহুদিন পরে এবার এসেছি, আমি" এইটুকু বলিতেই রাধাদাসী জোড় হাতে সকলের হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, ওঁকে গ্রামে ভিক্ষা করতে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। কখনো কথা কইতে শুনিনি। বহুদিন পূর্ব্বে একজন সঙ্গিনীও ওঁর সঙ্গে থাক্‌তেন, শুনেছি তিনি ওঁর স্ত্রী ছিলেন। দুজনেই কথা কইতেন না, একদিকে বেশী দিন থাকতেনও না। দুচার বৎসর পরে পরে আসতেন ব'লে মনে পড়ে। ছেলেরা ধুলো দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে বড় জ্বালাতন কর্‌ত।"

রাধাদাসী নীরব হইলে সাধু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভিখারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তারপরে?" ভিক্ষুক আবার মাথা নাড়িয়া এবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল "অনেক দিন কিছু পাইনি বাবা"! রায় মহাশয় উদাসীনের পানে চাহিলেন, ভিক্ষুকের প্রার্থনার বস্তুটি কি তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। উদাসীন এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনাভাবে একদিকে চাহিয়াছিলেন, ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বরে দৃষ্টি ফিরাইতেই রায় মহাশয়ের প্রশ্ন বুঝিয়া বলিলেন, "কিছু শুনতে ইচ্ছুক। লোকটি কর্ম্মবিপাকে আর্ত্ত,—তাই আখ্যায়িকার মধ্যেই তার মনঃশান্তির উপায় খুঁজতে ভাগবত আলোচনাই মাঝে মাঝে করা যায়। আপনি—"

রায় মহাশয় সবিনয়ে জোড় হস্তে বলিলেন, "আমরাও আজ তাহ'লে কিছু লাভ করব। কিন্তু আমিও কর্ম্ম-বিপাকে আমাদের শাস্ত্র পুরাণে একেবারে অনভিজ্ঞ, কিছুই জানিনা,"—উদাসীন সহাস্যে বলিলেন "সেদিন আপনার গৃহের মহিলাদের ভাগবতে যে রকম অভিজ্ঞতা দেখেছি তাতে আপনি একথা বল্লে মান্‌তে তো পারিনা।" "আমি তো আপনাকে সেদিন সেকথা বলেছি। একদিন আমাদের গৃহে তাই ছিল বটে কিন্তু আজ ঐ মহিলারাই যদি কিছু মনে মনে সঞ্চিত বা কাজেও কিছু কিছু রেখে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া ছাড়া তাই বা কে আছেন? আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটির জীবনও ভয়ানক ঘটনা-বিপাকের সমষ্টি। তাঁরও—" অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া রায় মহাশয় নিজের কথা ফিরাইয়া বলিলেন, "তিনি আজ আমাদের সঙ্গে আসেন নি, এলে হয়ত আপনার কথার একজন যোগ্য শ্রোতা হতেন। তিনি নিজের সাধনা নিয়েই দিনের বেশীর ভাগ আমাদের গ্রামের কালীতলার বনে কাটান। অপরাহ্ণে ঘরে এসে হবিষ্য গ্রহণ করেন, সেইজন্য তাঁকে আন্‌তে আমরাও তেমন চেষ্টা করিনি। তিনি তো কোথাও যেতে ইচ্ছা করেন না।" উদাসীন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "সাধনা-গৃহ নির্জ্জন স্থানেই হওয়া উচিৎ।" "তাঁর গৃহও তো বনের মতই নির্জ্জন। বৃদ্ধ এক পিশি আর এই দাসী, এইমাত্র লোক। সেজন্য নয় বোধ হয়। তাঁর শক্তিমন্ত্রে সাধনা, তাই ঐ দেবীর স্থানেই জপ করার আগ্রহ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।"

উদাসীন তাঁর অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্র উন্মীলন করিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের প্রতি চাহিলেন। দ্বিধার সহিত উচ্চারণ করিলেন "শক্তিমন্ত্র? আপনাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভই কি আপনাদের বংশের ইষ্টদেব নন? আপনারা বৈষ্ণব বলিয়াই" —তাঁহার স্বর ক্রমে অস্পষ্ট হইল। রায় মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষরা স্বর্গীয় ভ্রাতারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের কন্যা। শ্বশুরকুলের রীতিই তাঁর আচরণীয়।" উদাসীন ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া আবার মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন "কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই মনে হয়েছিল।"

"তাঁর জীবনে ঘটনা-বিপাকের মত ধর্ম্ম-বিপাকেরও মহা ন্দ্ব ঘটে গিয়েছে। শ্বশুররা তাঁকে তাঁদের কুলোচিত দীক্ষা দন, আবার স্বর্গীয় কর্ত্তারাও তাঁকে নিজেদের রুচি ও ারণা মত বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই সময়েই তাঁকে হু বৈষ্ণব শাস্ত্র পুরাণ শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি শেষে র্গগত স্বামীর ধর্ম্মই গ্রহণ করেছেন।" বৈরাগী নিস্তব্ধ-গবে চক্ষু মুদ্রিত করায় রায় মহাশয় থামিয়া গেলেন, াধুর স্তব্ধ সমাহিত ভাবকে আর বাক্যশব্দের দ্বারা বিচলিত রিতে সাহস পাইলেন না।

ক্ষণপরেই সাধু নয়ন মেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে রোয়াকের নিম্নে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ভিক্ষুকের পানে চাহিয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকামাঃ।
মনঃ পরং কারণ মামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ।
দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনো নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।"

ভিক্ষুক নতমস্তকে জোড়হস্তে যেন মূর্ত্তিমান শুশ্রূষুর মত শুনিতেছিল। সাধু সহসা তাঁহার কণ্ঠ থামাইয়া রায় মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"এই অবধূত। এঁর কথা আমাদের মত সাধারণ সুখদুঃখভোগী জীবের পক্ষে বচনেরও অতীত! যাঁরা এ গ্রামে বাস করেন তাঁরা কেউ কেউ কিছু জানেন হয়ত!" বলিতে বলিতে সাধু সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন একটি নারী সেই বনপথের মধ্যে একভাবে দাঁড়াইয়া স্তব্ধদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে, আর তাহার নিকটে সেই কিশোরী বালিকা, যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, সেই চঞ্চলা বালিকাও স্থানকালপাত্রের প্রভাবে তেমনি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধু তখনি দৃষ্টি নত করিলেন। ক্ষণপরে ধীরে বলিলেন "কেহ কেহ হয়ত এঁকে জানেন! ইনি এখন কিছুক্ষণ এইখানেই থাকবেন। আপনাদের কিন্তু অনেকটা পথ যেতে হবে, সঙ্গে বালিকা ও মহিলারা রয়েছেন, এপথে সন্ধ্যা না হওয়াই উচিৎ।"

সকলে একে একে উদাসীনকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রায় মহাশয় দুঃখপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন "ভাগ্যে আর হয়ত দর্শন ঘটবে না, এইবার আমার যথাস্থানে চলে যেতে হবে!" উদাসীন গম্ভীর মুখে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিয়া রায় মহাশয়কে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিলেন "কে বলতে পারে আর ঘটবে না! এই যে ঘটনা এও তো অঘটন ঘটনই! এই রকম ভাবে হয়ত আবারও ঘটতে পারে।" রায় মহাশয় সহসা একটা আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার হয়ত ছয়মাসের ভেতরই আসার সম্ভাবনা আছে! সেই যে যুবকটিকে দেখেছিলেন আমার বধূমাতার ভ্রাতা, সেই যতীনের সঙ্গে আমাদের এই নাতিনীটির বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে। আপনি যে অঘটন ঘটনের কথা বল্লেন এবারে সত্যই আমরা অনবরত যেন তাই প্রত্যক্ষ কর্‌ছি! যাদের সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতি আমাদের বংশে কেবল জ্বালাই আনত তাদেরই সঙ্গে পুনঃ পুনঃ এই অমৃতসংযোগের ব্যবস্থা কিসে হচ্চে জানিনা! যতীন ছেলেটি আপনাকে আর একবার দর্শন করতে বড়ই ইচ্ছুক ছিল কিন্তু এই সব ব্যাপারেই বোধ হয় আর সে এখন এদিকে আস্‌তে পার্‌ছেনা। আমরা এ শুভ বিবাহটিও এইবারেই সেরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম, সকলেরই সেই ইচ্ছা, কিন্তু মাতৃপিতৃহীনা কন্যার একমাত্র অভিভাবিকা পিসির অনিচ্ছাতেই ঘটতে পারছেনা।" উদাসীন যেন অনিচ্ছাতেও উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে একার্য্য না ঘটাই উচিৎ।" "না, তাঁর এই বিবাহেই অনিচ্ছা যে তা নয়! যতীনও তাঁর বংশধর, কন্যাটিও ভ্রাতুষ্কন্যা, এ যোগাযোগ সুখেরই! তবুও তিনি এতশীঘ্র একাজটি সমাধা করতে চান্ না! বলেন, যদিই এরপরে উভয় পক্ষের কোন মনোমালিন্য ঘটে তখন আর উপায় থাকবে না। এই প্রস্তাব কিছুদিন এইভাবে থাকাতে যদি দুই দিকের কোন মতপরিবর্ত্তন না ঘটে তবেই একাজ করা ঘটবে।" সাধু মৃদুস্বরে বলিলেন "যুক্তিতে বিচক্ষণত্ব আছে।" তারপরে কিশোরীর পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "এই বালিকাটি?" "হ্যাঁ, কিশু প্রণাম কর।" ধীরভাবে কিশোরী সাধুর চরণে আবার প্রণতা হইল এবং তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে থাকিয়া রাধাদাসীও আর একবার সাধুর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সকলে অবধূতের উদ্দেশেও মস্তক অবনত করিয়া যখন বিদায় হইয়া ক্রমশঃ বাহিরে আসিয়া পড়িলেন,

তখন শুনিতে পাইলেন সমস্ত বন কাঁপাইয়া সেই উদাত্ত স্বরে গীত হইতেছে —"দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্ত কিমাত্মনস্তত্র নিজস্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোহন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেতকস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে। আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখ হেতুঃ কিমন্যত তত্র নিজ স্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোহন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখং। কর্ম্মাস্তহেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মন স্তদ্ধি জড়া জড়ত্বে। দেহস্তচিৎ পুরুষোহয়ং সুপর্ণং ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলং। কালস্ত হেতুঃসুখ-দুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোহসৌ নাগ্নেহি তাপো ন হিমস্য তৎস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বং।"

রায় মহাশয় সনিশ্বাসে বলিলেন, "উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু ওঁদের পক্ষে আমাদের সঙ্গ বেশীক্ষণ হলে পীড়াদায়ক হয়। আচ্ছা, ও অবধূতকে জান না কি তোমরা কেউ? রাধা যে বল্লে ওঁকে সে দেখেছে এর আগে?" সকলের পশ্চাদবর্ত্তিনী রাধার প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইলে রাধা তখন অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। সে এতক্ষণ অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে সকলের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল মাত্র, কোন কথা বা আলোচনায় যোগ দিতে পারে নাই। রায় মহাশয় পুনরায় রাধাকে অবধূত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে রাধা কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "শুনেছি ঐ লোকটিই নাকি সেই 'রামামীরে' ডাকাত।" কর্ত্তা যেন অতিমাত্র বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, "রামামীরে? এখনো সে বেঁচে আছে? শুনেছিলাম বটে যার নামে একদিন সমস্ত নদে জেলা থরহরি কাঁপত সে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। সে যে অনেক দিনের কথা! সেই কি এই অবধূত?" রাধা আবার সঙ্কুচিত ভাবে বলিল "সেই লোকটি বলেই তো মনে হয়। ওর স্ত্রীও সঙ্গে থাক্‌তেন, তিনি বোধ হয় এখন নেই।" কর্ত্তা উৎসাহিত ভাবে বলিলেন, "ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি! সেই রামামীর! ওর ভয়ে কর্ত্তারা বাড়ীতে সেকালে একদল পাইক রেখে সড়কি আর লাঠি খেলা শেখাতেন। ও একবার বলে পাঠিয়েছিল যে বড় রায় ঠাকুরের ভুঁড়িটী সড়কি দিয়ে ফাঁসিয়ে দেব আর ঝর ঝর ক'রে মোহর পড়্‌বে।" তাই শুনে বড় কর্ত্তা তাকে সেই মোহর কুড়ুতে ডাক্‌তেও পাঠিয়েছিলেন। এত তাঁদের সাহস ছিল। তিনি বেঁচে থাকতেই সে একবার নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল, কিন্তু তখন বড় কর্ত্তা রোগ শয্যায়। সিঁড়ির ঐ দরজা ফেলে দিয়ে সকলে ভয়ে কাঁপছে, বড় ঠাকরুণ একখানা বঁটি হাতে ক'রে বেরিয়ে বল্লেন "রাম! বড় অসময়ে নেমন্তন্ন রাখ্‌তে এসেছিস্ রে! ভীষ্মদেব এখন শরশয্যায়! তা আয় আমিই তোর নেমন্তন্ন রাখি!" রামামীর আর যাই হোক্ সাহসের মর্য্যাদা জান্‌ত, আর স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞানে সমীহ কর্‌ত! বড় ঠাক্‌রুণকে মা বলে ডেকে পায়ের ধুলো নিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমাদের ছোট বেলায় এ গল্প শোনা। জান ত সে বড় ঠাক্‌রুণের কথা। তিনিই সতী যান।" গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিয়া রায় মহাশয় সনিশ্বাসে থামিলেন। রাধা মৃদুস্বরে বলিল, "রামমীরের শেষ জীবনের কথা না কি বড় ভয়ানক।"

"কি বল্‌তো? আর কিছু মনে পড়ছে না ত কি হয়েছিল ওর।"

"নিজের একমাত্র ছেলেকেই না কি—" রাধা অর্দ্ধোক্তিতে থামিল। রায় মহাশয় যেন শিহরিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্ ওঃ—মনে পড়েছে বটে! সে যে বড় ভীষণ কথা! যে কুল বেড়ের মাঠে ওর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতে যার জন্য নাম হয়েছিল "বিষম কুলবেড়ে!" সেই মাঠেই তার পাপের ফল নিজের হাতে ফলিয়েছিল! অন্ধকার রাতে আপনার ছেলের মাথাতেই—যে লাঠিতে পরের ছেলে মার সেই লাঠি! ওঃ!" সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে শিহরি উঠিল। রাধা বলিল, "তারপরেই নাকি স্বামীস্ত্রীতে এ ফকিরি নেয়? কতলোকে দিন পেয়ে কত মারত ধরত, দূর ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিত, কুঁড়ে জ্বালিয়ে দিত, মুখে অন্ন খেতে দিত না, ছেলেপিলেরা কত অত্যাচার কর কিন্তু ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা কেউ শুনতে পায়নি।"

সকলে স্তব্ধ ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। সায়াহ্নে রৌদ্র তখন মাঠের উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে রক্ত-পতাকার ম ঝলসিতেছিল। রৌদ্রদগ্ধ মাঠের শ্রান্তির নিশ্বাসের ম অপরাহ্ণেও বায়ু এক একবার যেন হায় হায় করি উঠিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্প

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, পি-আর্-এস্

ভূমিকা

ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাহার ধর্ম্ম, তাহার ...ান-বিজ্ঞান, তাহার ললিত-কলা। সেই আদি যুগ হইতে ...ারম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সিন্ধু নর্ম্মদা গঙ্গা গোদাবরীর তীরে ...রে কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত রাজ্য ভাঙ্গিয়াছে, কত রাজ-...ংহাসন ধূলায় লুটাইয়াছে, ইতিহাসে সে-সব কাহিনী রচিত ...ইয়া আছে, কিন্তু মানুষের চিত্তপট হইতে কবে তাহা মুছিয়া ...য়াছে। এমন-যে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, তাঁহার ...ম আছে শুধু পুঁথির পাতায়; এমন বিস্তৃত মৌর্য্যসাম্রাজ্য, ...মন বীর সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, দেবপাল, মহীপাল, রাজেন্দ্র-...াল, এমন স-সাগরা ভারতের সম্রাট আক্‌বর ঔরংজেব, ...তিহাস ইঁহাদের স্মৃতি বুকে করিয়া রাখিয়াছে শুধু কাহিনী ...সাবে, শুধু ঘটনার পর ঘটনা একটির সঙ্গে আর একটি ... করিয়া গাঁথা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটা চিত্র ...সাবে। কিন্তু যে-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে ইতিহাসের ...া আলোকিত হইয়া উঠে, যাহার মধ্যে একটা দেশ, কাল ...জাতি ভাষা এবং রূপ পায়, এবং যাহার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ...স্ত মূক অতীত শতকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠে, সে-সম্পদ ও ...র্য্যের পরিচয় এই দিগ্বিজয়ী সম্রাট ও তাঁহাদের আসমুদ্র-...াচল সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। এমন ... যাঁহাদের কূট রাষ্ট্রবুদ্ধি সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ বিপ্লব আবর্ত্তনের ...চাতে থাকিয়া রাজ্য ভাঙ্গে গড়ে, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি ...ন্ত্রণ করে, সেই বৃহস্পতি-চাণক্য-শুক্রাচার্য্য-মানসিংহ-...ীরাও-ফারনবিশের বুদ্ধি কৌশলের মধ্যেও নয়। আসল ...া, অন্যদেশে যাহাই হউক, ভারতবর্ষের সত্যকার পরিচয় ...রতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে নাই। আছে তাহার ...না ও সংস্কৃতির মধ্যে, যে সংস্কৃতির স্পর্শ ও পরিচয় আমরা ...ই তাহার ধর্ম্মে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শিল্পে ও কথায়। এই সংস্কৃতিই ভারতের ও ভারত-ইতিহাসের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র ঐশ্বর্য্য; এই ঐশ্বর্য্যই ভারতবর্ষকে জগতের অন্যতম তীর্থভূমি করিয়া তুলিয়াছে, এবং ইহারই দীপ্তি যুগে যুগে সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের সর্ব্বজয়ী বীর তাই বুদ্ধদেব আর আমাদের চিত্তপটে অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া আছেন সম্রাট অশোক, কুমারজীব, গুণবর্ম্মণ-শঙ্করাচার্য্য-শ্রীচৈতন্য-নানক-কবীর-রামানুজ। তাই শতাব্দীর সমুদ্র পার হইয়া রামায়ণ ও মহাভারত আজও আমাদের কাছে নিত্যকালের জীবন্ত বাণী বহন করিতেছে, আর কালিদাস আজও আমাদের নিকট হইতে পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন। তাই, কুরুক্ষেত্র পাণিপথ কোনদিনই জাতির তীর্থ হইতে পারিল না, হইল সাঁচি, অমরাবতী, সারনাথ, কোনারক, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, মহারথীপুর, তাঞ্জোর, অজন্তা, নাসিক এবং আরও কত গুহা, পর্ব্বত, যেখানে নীরস পাথর লীলায়িত ছন্দে নাচিয়াছে অযুত কণ্ঠে কথা কহিয়াছে, গান গাহিয়াছে। কবে কোন্ অতীতে ভারতবর্ষে কোন্ জাতি আসিয়া প্রথম ঘর বাঁধিয়াছিল, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষ যখন যাহা ভাবিয়াছে, মনে তাহার যে-কথা জাগিয়াছে, অনুভূতিতে যে-সুর বাজিয়াছে, তখনই সে তাহাকে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে, শিল্পে ও সাহিত্যে ভাষা ও রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ তাই শত শত শতাব্দীর পর বৃদ্ধ ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে যত ধর্ম্ম যত জ্ঞান, যত শিল্প যত সাহিত্য জমা হইয়াছে, তাহারা সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষের একটি পরিপূর্ণ বাণীকে রূপদান করিতেছে। এই বাণীই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস, যথার্থ পরিচয়।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যেমন, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যেমন, তেমনি ললিত কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্কৃতি এক একটি বিশেষ রূপ পাইয়াছে। নৃত্যে তাহা এক রূপে, সঙ্গীতে অন্য রূপে,

তুলির রঙে ও রেখায় এক রূপে, পাথরের উপর ভিন্ন রূপে তাহা ভাষা ও রূপ লাভ করিয়াছে। এই ভাষা ও ভঙ্গির রূপবৈচিত্র্য সকলের চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে ভাস্কর-শিল্পে, এবং তাহার ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিও অন্য সকল ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে। যেদিন হইতে ভারতবর্ষের একটা অপেক্ষাকৃত সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা পড়ে, প্রায় সেই সময় হইতেই স্বাধীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বহিয়া মুসলমানী আমল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, এবং সেইখানে আসিয়া হঠাৎ যেন নিজকে মরুবালিরাশির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মহানুভব অশোকের বিরাট মৌর্য্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রায় দেড়হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র এই শিল্পের কত যে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, আর মহাদেশের মতন বিশাল এই দেশে কত যে বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী, শিল্পকেন্দ্র এই দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার হিসাবও আমরা করিতে পারি না। এক এক শিল্পীগোষ্ঠীর, এক এক শিল্পকেন্দ্রের যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ; এক এক বিশিষ্ট রূপভঙ্গির আবার বিভিন্ন বিকার। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের এই রূপ-বৈচিত্র্য পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছে: কত নূতন বিষয়বস্তু, কত নূতন শিল্পভঙ্গিমা, কত বিচিত্র মণ্ডনরূপ ও রীতি, কত অপূর্ব্ব ছন্দভঙ্গি, কত অভিনব বিন্যাস-কৌশল, সর্ব্বোপরি কত নূতন ভাব-দৃষ্টি-যে তাহার নূতন আবিষ্কার, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শুধু শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিক্‌ হইতেই নয়, ইতিহাসের দিক্‌ হইতেও ভারতের ভাস্কর-শিল্প অমূল্য সম্পদ। যে-কথা, যে-কাহিনী পুঁথিতে নাই, শিলালেখ-তে নাই, তাম্র-ফলকে নাই, কিংবদন্তীতে নাই, সে কথা সে কাহিনী যুগে যুগে লেখা পড়িয়াছে এই অগণিত শিল্প-সৃষ্টিগুলিতে—তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনো উপায় নাই। বিচিত্র এই দেশের বিভিন্ন যুগের বিচিত্র বেশভূষা, অলঙ্কার আভরণ, বিচিত্র ধর্ম্ম, অসংখ্য দেবদেবীর অসংখ্যতর রূপ, বিচিত্র প্রকৃতি—সমস্ত কিছুর ছায়া পড়িয়াছে ইহাদের উপর; ভাব ও কল্পনার মায়াস্পর্শে, অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেন ইহাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত হইয়া আছে। বন্ধুরূপে শত্রুরূপে কত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি লইয়া এই দেশের বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—ন হয়, তাহার বুকের উপর তাণ্ডব নাচিয়া নিজের দেশেই ফিরিয়া গিয়াছে—ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু তাহার অমোঘ ও অব্যর্থ চিহ্ন আঁকা পড়িয়াছে দেশের এই অপূর্ব শিল্প অবদানের মধ্যে। যে সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ লইয়া তাহারা আসিয়াছিল, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের কোলাহলে তাহাকে তুচ্ছ করে নাই, তাহাকে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই; তাই, কত বিভিন্ন ও বিচিত্র সাধনা এবং সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব যে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর শিল্পের উপর আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পারসীক আসিয়াছে, গ্রীক, রোম আসিয়াছে, শক হূন আসিয়াছে; সকলের আগমনের পরিচয় ইহার ইতিহাসে আছে। ভারতের সংস্কৃতি তাই এত বিচিত্র, এমন অপূর্ব্ব; ভারতের ভাস্কর-শিল্পের ইতিহাস তাই এত সুন্দর, এত মূল্যবান।

এই অপূর্ব্ব ভাস্কর-শিল্পের বিচিত্র ও অসংখ্য নিদর্শন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—মাটীর নীচে, পাহাড়ের গায়ে ও গুহায়, মন্দিরের বেদীতে, দেয়ালে ও প্রাচীরে নদীর গর্ভে, জনবিরল পথে ঘাটে জঙ্গলে। এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কতকাংশ বিজয়ী মুসলমানের মুষলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, কতকাংশ পরদেশী সৌন্দর্য্যলোভীদের কবলে পড়িয়া দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং অধিকাংশই এখনও মাটির নীচে অথবা লোকলোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে। অবশ্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও উদ্যোগে আজকাল অল্প অল্প করিয়া এই লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের উদ্ধার-সাধন হইতেছে, অনেক গুহা ও মন্দির সংস্কৃত হইতেছে, এবং তাহা হইতেছে বলিয়াই আজ এতদিনে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটা সুসম্বদ্ধ পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হইয়াছে।

সূচনা

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগ

অশোক কর্ত্তৃক আসমুদ্র-হিমাচল মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাস্কর শিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, আমাদের বাঙলা দেশেরই এক অকালমৃত অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ভারতের সিন্ধুদেশে জনবিরল মরুভূমিতে —বর্ত্তমান মহেন্-জো-দাড়ো নামক স্থানে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের আনুমানিক (খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০-৩০০০ বৎসরের) এক বিরাট নগর-পত্তনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুই চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি, পোড়ামাটিতে খোদাইকরা কয়েকটি নারী ও পশুমূর্ত্তি, অসংখ্য মাটির বাসন, প্রসাধন দ্রব্য ও অলঙ্কার এবং অনেকগুলি শিলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এই শিল-মোহর গুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ, এবং হাতীর দাঁত, অথবা এক প্রকার মিশ্র পাথরে তৈরী। মহেন্-জো দাড়ো ও মণ্টোগোমেরি জেলার হরপ্পা নামক স্থানে প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মোটামুটি ভাবে, একদিকে মেসোপটেমিয়া, কিস্, ও সুমার সুমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এবং অন্যদিকে বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন। অবশ্য এই অনুমানের যথেষ্ট কারণও আছে। মহেন্-জো-দাড়োতে যে অসংখ্য মাটির বাসন ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের আকৃতি ও গড়ন এবং তাহাদের উপর রেখাঙ্কনের নমুনার সঙ্গে মেসোপটেমীয় গড়ন ও নমুনার আশ্চর্য্য মিল আছে। কিন্তু এই ঐক্যের সব চেয়ে বড় পরিচয় আছে শিলমোহরগুলিতে (১নং চিত্র)। ইহাদের উপর ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই; তবে এই অক্ষরগুলি যে চিত্রাক্ষর এবং সেই হিসাবে ইহাদের সঙ্গে সুমের লিপির নিকট সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া ক্ষোদিত ষাঁড় গণ্ডার ও হাতীর মূর্ত্তি-গুলির শিল্প-ভঙ্গীর সঙ্গে সুমের শিলমোহরের উপর ক্ষোদিত এই জাতীয় মূর্ত্তির শিল্প-ভঙ্গিরও অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। জন্তুগুলির দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে, মাংসপেশীর গড়নে এবং মোটামুটি আকৃতিতে যে বিশিষ্ট শিল্প-রীতির পরিচয় আছে, সেই পরিচয় মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত সুমের শিলমোহরের জন্তুগুলিতেও পাওয়া যায়, এবং পরে আসীরীয়, বাবিলনীয় ও একিমিনিয় শিল্পেও ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দেহের মাংসপেশীগুলিকে প্রধান করিয়া দেখাইবার চেষ্টা, দেহের বস্তুরূপটির উপরই বিশেষ করিয়া মনোযোগের প্রয়াস, শিল্পের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী মহেন্-জো-দাড়ো হইতে আরম্ভ করিয়া সুমের, এবং পরে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত শিল্পরীতির মধ্যেই কোনো না কোনো রূপে দেখা যায়। এই সব ও অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এই বিশিষ্ট শিল্পরীতি যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভারতবর্ষে সিন্ধুনদীর তীরে মহেন-জো-দাড়ো-হরপ্পাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরে ক্রমে পশ্চিমদিকে সুমের দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং আরও পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম এশিয়ার আসীরীয়, বাবিলনীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির সূচনাতেও ইহার প্রভাব ছিল।

১নং চিত্র—মহেন্-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত শিলমোহর

কিন্তু শিল্পের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই শীলমোহরগুলির মধ্যে দেখিলাম মহেন্জো-দাড়োয় প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্ত্তিগুলিতে ঠিক এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই না। প্রায় সবগুলি মূর্ত্তিই ভগ্নাবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে, তবু উপরার্দ্ধ হইতেই ইহাদের শিল্পভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া কঠিন নয় (২নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে শ্মশ্রু ও সুবিন্যস্ত কেশ মণ্ডিত একটী দীর্ঘাকৃতি পুরুষের আবক্ষ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি চুনাপাথরের তৈরী এবং উপরে বালির প্রলেপ দেওয়া। দুটীরই দেহভঙ্গী স্থির ও উন্নত, কিন্তু আড়ষ্ট। মুখ ও দেহের দৃষ্টি ঠিক সম্মুখ-স্থানক নয় (frontal) বরং কতকটা

ত্রিকোণ ও অর্দ্ধ-স্থানক (three-quarter profile and profile)। দুটী মূর্ত্তিরই চুল ও দাড়ির বিন্যাস-ভঙ্গী একটু অদ্ভুত; প্রত্যেকটি চুলের গুচ্ছকে পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। সমগ্র মুখটির একটা সহজ সমগ্র দৃষ্টি লইবার প্রয়াস শিল্পীর ছিল না। নাক, মুখ, চোখের পাতা, চোখ, ঠোঁট, কপাল, সমগ্র দাড়িটি, এমন কি প্রত্যেকটি চুলের গুচ্ছও তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সুনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ; একটি অঙ্গের গড়ন সহজভাবে আর একটি অঙ্গের গড়নের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় নাই। মূর্ত্তিটিতে উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, অর্দ্ধমুদিত দৃষ্টি এবং পুরু ভারী ঠোঁট খুবই লক্ষ্য করিবার। হাজার হাজার বৎসর পরেও ভারতীয় ভাস্কর্য্যের কোন কোন বিশেষ শিল্পভঙ্গির হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তিতে অবিকল এইরূপ অর্দ্ধমুদিত যোগ-দৃষ্টি এবং এইরূপ ভারী পুরু ঠোঁট দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি বিষয়েও হাজার বৎসর পরের খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মহেন-জো-দাড়োর এই ভাস্করশিল্পের দৃষ্টি-ভঙ্গির মিল্ আছে। মূর্ত্তিটির মুখমণ্ডলের গড়ন ও অপর একটির দেহাংশের গড়ন হইতে বেশ বুঝা যায়, শিল্পী কোথাও দেহের কোনো অংশবিশেষকে, তাহার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে প্রধান করিয়া দেখাইতে, কিংবা দেহের বস্তুরূপটাকেই একান্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেকটি দেহাংশই অন্য দেহাংশ হইতে পৃথক; তৎসত্ত্বেও পৃথক পৃথক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেহাংশের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে; দেহের ও মুখমণ্ডলের গড়নের গতিটি সহজ ও অব্যাহত রাখিবার জন্য দেহের কোনো অংশবিশেষের গড়নের উপর অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। এই মূর্ত্তিগুলির এই বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে শিলমোহরে খোদিত পশুমূর্ত্তিগুলির শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গির সেই জন্যই একটা পার্থক্য আছে।

২। মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগ

মহেন্-জো-দাড়োর প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর হইতে মৌর্য্য রাজত্বের যুগ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ অব্দ) পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ভাস্করশিল্পের খুব কম নিদর্শনই আমাদের জানা আছে। এই হাজার হাজার বৎসরের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাসও আমাদের জানা নাই। মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগের অর্থাৎ শিশুনাগ ও নন্দবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নানাপ্রকার শিল্প ও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রচুর উল্লেখ আছে, কিন্তু শিল্প-নিদর্শন কম
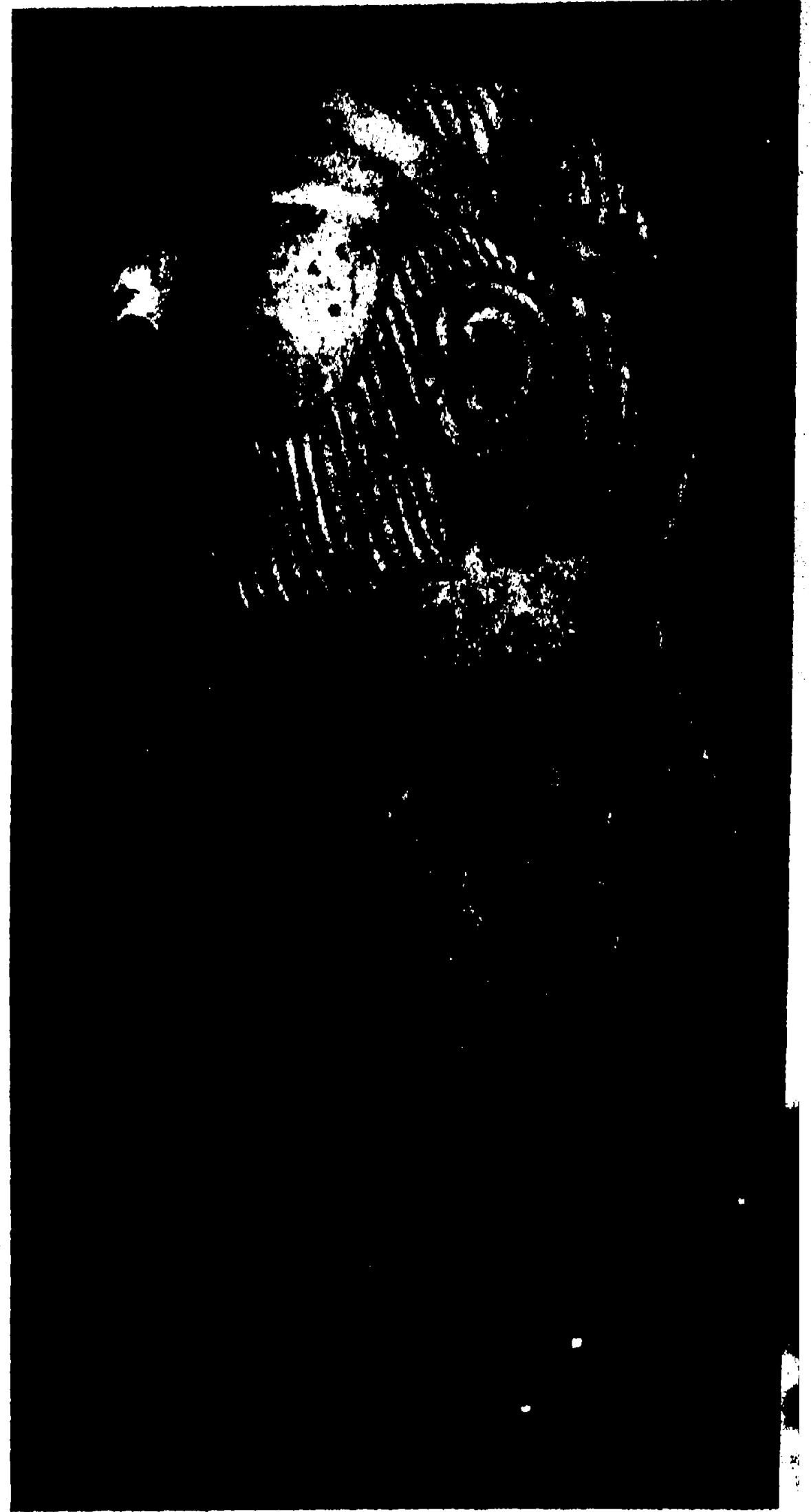
২নং চিত্র—মহেন্-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত পুরুষ-মূর্ত্তি

পাওয়া যায়। লৌড়ীয়া নন্দনগড়ে একটী বৈদিক শ্মশান-স্ত খননাবিষ্কারের ফলে সোনার পাতে ঢালাই করা একটী ছো নগ্ন নারী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবী-দেবীর (৩নং চিত্র)। ঠিক্ এই ধরণেরই আর একটি পোড়া মাটির

পাওয়া গিয়াছে তক্ষশীলায়, ভির্ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। তাহা ছাড়া অনুরূপ পোড়ামাটির মূর্ত্তি নগধী, ভীটা, বসার, এবং

৩নং চিত্র—লৌড়িয়া-নন্দনগড়ে বৈদিক শ্মশান-স্তূপ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণপাতের উপর মূর্ত্তি (অবিকল আয়তন)

পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে (৪নং চিত্র)। নন্দনগড়ের সোণার পাতের মূর্ত্তিটিতে এবং পোড়ামাটির অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিতে যে শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে আমরা ঠিক ভারতীয় ভাস্কর্য্য-রীতির প্রথম সূচনা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মহেঞ্জোদাড়োর যে শিল্পরীতির কথা আগে বলিয়াছি, তাহা ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একতম এবং প্রথমতম রূপ সন্দেহ নাই; কিন্তু যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সেই সঙ্গে যে-শিল্পের পরিচয় আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুদেশে পাই, হাজার হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সঙ্গে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগের খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটা সত্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা খুব সহজ নহে। কিন্তু মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের যে কয়টি শিল্প নিদর্শন আমাদের জানা আছে, তাহার মধ্যে এই সত্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটা বিশেষ মুখ ও দেহাকৃতির পরিচয় আছে। মুখমণ্ডলটি গোল ও চ্যাপ্টা ধরণের, তাহারই উপর একটি ভারী চ্যাপ্টা নাক, ভারী পুরু এক জোড়া ঠোঁট; মুখমণ্ডলটির গড়ন একটু ভারী ও সুডৌল, উঁচু মাংসল গাল দুটির এবং চিবুকের সুডৌল গড়নটি যেন একটি অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতির মতন, এবং তাহা যেন নেমে ঢালু হইয়া নাক ও ঠোঁটদুটির কোণ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নারীমূর্ত্তিগুলিতে গোল ভারী স্তনযুগ্ম, ভারী ও সুপ্রশস্ত নিতম্বদেশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; গোল ভারী কর্ণকুণ্ডল, মেখলার অলঙ্কার এবং বিশিষ্ট কেশ-বিন্যাসের রীতিও লক্ষ্য করিবার। এই বিশেষ মুখ ও দেহাকৃতি, গড়ন-ভঙ্গি এবং কেশ ও অলঙ্কার বিন্যাসের মধ্যে যে শিল্পরীতি ও ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মথুরা, ভাজা ও বরহুতের সুঙ্গ এবং অন্ধ্র বংশের রাজত্বকালের ভাস্কর্য্যের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। মুখ ও দেহাকৃতি এবং গড়নভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই; কেশ ও অলঙ্কার বিন্যাসের রীতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও দুই রীতির মধ্যে একটা সম্বন্ধ সহজেই চোখে ধরা পড়ে। সোণার পাতের পৃথিবী দেবীর মূর্ত্তিটি সম্মুখ-স্থানক, কিন্তু তাহার পা ও পায়ের

৪নং চিত্র—বসার হইতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্ত্তি (অবিকল আয়তন)

পাতা দুটি দেখাইবার ভাব একটু অদ্ভুত; সে দুটিকে সহজ ভাবে সম্মুখের দিকে না রাখিয়া পাশের দিকে ঘুরাইয়া রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় সহজভাবে সম্মুখের দিকে রাখিয়া দেখাইবার শিল্পকৌশলটি তখনও শিল্পীর আয়ত্ত হয় নাই। মনুষ্য-মূর্ত্তির দাঁড়াইবার এই বিশেষ ভঙ্গিটি পরবর্ত্তী সুঙ্গ যুগের বরহুত স্তূপের প্রাচীর গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও দেখা যায়। এই সব সাদৃশ্য হইতে মনে হয়, মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগের

এই শিল্প নিদর্শনগুলিকে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথম সূচনার পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লইলে খুব ভুল করা হইবে না।

ভাস্কর্যের এই কয়েকটি নমুনা ছাড়া এই যুগের অলঙ্কার, চিত্রাঙ্কিত মাটির বাসন ইত্যাদি আরও দুই চারি প্রকারের শিল্প-নিদর্শন আমাদের জানা আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী মৌর্য্য-যুগের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনের প্রাচুর্য্য এবং ভাস্কর্যের বিচিত্র রীতি ও ভঙ্গি, মণ্ডন-শিল্পের নমুনা ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগেও এই নানাজাতীয় শিল্পের এই বিচিত্র রীতি, ভঙ্গি ও নমুনা ইত্যাদির সমৃদ্ধি কিছু কম ছিল না, এবং ভারতীয় শিল্পীরা তাহাতে অভ্যস্তও ছিল। তাহা না হইলে হঠাৎ মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের এমন একটা শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ মৌর্য ও সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে এমন কতকগুলি রূপবস্তু ও মণ্ডন-বস্তুর নমুনা আমরা পাই, যেগুলির উদ্ভব হঠাৎ হইতে পারে না; বহু বৎসর, বহু যুগ ধরিয়া সেইসব রীতি ও নমুনায় শিল্পীর হাত ও মন অভ্যস্ত না হইলে, জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাহা মিশিয়া না গেলে মৌর্য্য অথবা সুঙ্গ যুগে হঠাৎ সেগুলি পাথরের উপর নানান্ বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিত না। সেইজন্যই একথা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগেও ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, অন্যান্য শিল্পের মত ভাস্কর শিল্পেরও একটা সমৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল; কিন্তু আজ যে সে-সমৃদ্ধির খুব কম পরিচয়ই আমরা পাই, তাহার একমাত্র কারণ পাথর লইয়া কাজ করিতে শিল্পীরা তখনও ভাল করিয়া শেখে নাই, পাথর খুদিয়া বস্তুকে, মণ্ডন-নমুনাকে রূপায়িত করিবার রীতি তখনও সুপ্রচলিত হয় নাই, কিংবা সে ক্ষমতা তখনও আয়ত্ত হয় নাই। মাটি লইয়া, কাঠ লইয়াই ছিল শিল্পীর কারবার; কাদা মাটি গড়িয়া পিটিয়া এবং পরে তাহাকে পোড়াইয়া কাঠ খুদিয়াই সে তাহার শিল্প-বোধ ও বুদ্ধিকে রূপদান করিত। আজ সেই পোড়ামাটির শিল্প-নিদর্শন যদিই বা কিছু কিছু পাওয়া যায়, সেই কাঠের চিহ্নও আর নাই; হাজার বৎসরের মাটির চাপে তাহা মাটির সঙ্গেই মিশিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, মৌর্য্য ও সুঙ্গ যুগের ভাস্কর্য্যে কতকগুলি বিশিষ্ট মণ্ডন-রূপ ও নমুনার পরিচয় আমরা পাই, এবং এগুলি একান্তভাবে মৌর্য্য অথবা সুঙ্গ ভাস্কর্য্যেরই নিজস্ব বস্তু নয়। এই মণ্ডনরূপ ও নমুনাগুলি পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন বাবিলনীয় ও পারস্যের ভাস্কর্য্যেও সমানভাবে দেখা যায়, এবং পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও তাহার পরিচয় কম নয়। মৌর্য্যযুগে অশোকের রাজত্বের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের উপর এই পশ্চিম-এশীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট বলিয়া, এবং এই যুগেই উল্লিখিত মণ্ডনরূপ ও নমুনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সম্রাট অশোকই পশ্চিম এশিয়ার পারসীক শিল্পীকুলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং তাহাদেরই প্রভাবে মৌর্য্য ও পরবর্ত্তী সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের প্রভাব এবং তাহার সঙ্গে এই সকল মণ্ডনরূপ ও নমুনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু একজন রাজা অথবা সম্রাটের রাজত্বে তাঁহার ইচ্ছায় অপর একটা শিল্পের প্রভাব অন্য একটা শিল্পরীতি ও সংস্কারের উপর হঠাৎ এমন ভাবে সুবিস্তৃত হইয়া পড়া, এবং জাতীয় শিল্প সংস্কারের সঙ্গে এত শীঘ্র এক হইয়া যাওয়া একটু বিস্ময়কর! ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া না লইলে অন্য একটা শিল্প-রীতি ও সংস্কার সহজে এক হইয়া যাইতে পারে না; কোনো যুগের কোনো দেশের শিল্প-ইতিহাসে তাহা হয় না। সেই জন্যই মনে হয়, মৌর্য্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সঙ্গে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং ক্রমে পরবর্ত্তী কালে সেই সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া পড়ে। একথাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের এই ধারা শুধু বাবিলনীয় অথবা পারসীক শিল্পেরই একান্ত নিজস্ব ধারা নয়; কতকটা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরও ধারা বটে, এবং পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ভাস্কর্য্য এই সুপ্রাচীন ধারার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই ধারারই পরিচয় পরে মৌর্য্য ও সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অনুমান খুব মিথ্যা নয়, কারণ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন পারস্য একই সাধনা ও সংস্কৃতির সন্তান, একথা বহুদিনই প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাদের শিল্প রীতি ও সংস্কারও যে সেই হিসাবে গোড়ায় এক এবং অভিন্ন ছিল, তাহাও সন্দেহ করবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী কালে

ভারতীয় ও পারস্য-শিল্পের বিকাশ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন রূপে হইয়াছে, একথা সত্য ; কিন্তু কতকগুলি মণ্ডন-রীতি ও নমুনা একই রকম থাকিয়া গিয়াছে, দুই শিল্পেই তাহার রূপ ও বিকাশ প্রায় একই রকম।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইলে গোড়ায় এই কথাটি জানিয়া রাখা ভাল ; কারণ, তাহার প্রথম অধ্যায়েই অর্থাৎ মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যেই পারসীয় শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো পশ্চিমের কোনে বিশেষ শিল্পরীতির স্পর্শের পরিচয়ও তাহার মধ্যে নিতা অস্পষ্ট নহে। মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের আলোচনায় এই স্পর্শ প্রভাবের পরিচয় আমরা পাইব। সে পরিচয় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

রাজার দুলাল বৈরাগী হ'ল

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

গাঙের কিনারে বেলা ডুবু ডুবু! ঝরা কামিনীর বাসে
হায় অবেলায় রাজ-ঝিয়ারীর তন্দ্রা নামিয়া আসে!
আঁধার ঘনালো ঘন বাঁশবনে, বনছেড়ে সে আঁধার
দাঁড়ালো নিরালা শেষে বটছায়ে শ্মশান ঘাটার পার।
শেষে সে আঁধার চুপি চুপি হায়, পশে গিয়ে কার প্রাণে?
রাজার পুত্র কাঁদিল না, শুধু দুলালীর আঁখি টানে।
রাজার ছেলে সে রাজকন্যার টানিছে নলিন-আঁখি
আর বলিতেছে—"আমারে একেলা ফেলিয়া পালালে নাকি?"
যে দু' চোখে হাসি নাচিত সদাই—হায়, চোখ খুলিল না।
শ্মশান ঘাটায় বেলা ডুবে' যায়, ছড়ায়ে রোদের সোনা!

রাজার পুত্র কাঁদিল না, বলে—"আনিব সোণার কাঠি
আমার সোণার পুতলী আবার জিয়াইব পরিপাটী—।"
দিশা নাই—ছুটে শাওনের মেঘ সারা ভুবনের মাঝ—
মনের কথার সাক্ষী কেবল শ্মশানের বটগাছ।
রাজার দুলাল মাটীর ধুলায় সব ছেড়ে বৈরাগী,
হায়, দুশ্চর একি তপস্যা ঘুমন্ত প্রিয়া লাগি!
এ কেমন ধারা! তবু সে কাঁদে না—বিশুষ্ক দু'নয়ান
বড় ব্যথা বুকে বাজে তাই আরো জোরে জোরে গায় গান।

আজি সে সোণার কাঠি পাইয়াছে, কিন্তু সেজন নাই—
সোণার বরণী শ্মশানের ঘাটে কবে হয়ে' গেছে ছাই।
প্রিয়া নাই, তবু ঐ সে ছুটেছে সোণার কাঠিটি হাতে
কোথা? সব খানে! পথ ঠিক নাই, ঘুম নাই আঁখি-পাতে
কত গাঁয়ে গাঁয়ে বিলে আ'লপথে উলুর কুটীর মাঝ
আর দীঘি-পাড়ে দীঘল ছায়ায় ছুটিছে রাজাধিরাজ।
প্রিয়া মরিয়াছে, আর সে দেখিল বাংলার ঘরে ঘরে
নারী মরিয়াছে—নারী-কঙ্কাল সারি সারি আছে পড়ে।
যারে পায় তারে ছোঁয়ায় সে তার হাতের সোনার কাঠি
সোণার সীতারা উঠিয়া দাঁড়ালো বাংলার মাটি ফাটি।
এক নারী গেল, তাহারি ধেয়ানে কোটি নারী পায় প্রাণ
রাজার পুত্র শোকেতে কাঁদে না শুধু গেয়ে' চলে গান।

মড়া-জিয়াবার নেশায় পাগল, তার কি নজর আছে
কোটি নারীদের মাঝখানে কবে তাঁরো প্রিয়া জাগিয়াছে?
তিনি বেঁচেছেন।—সতীর মূরতি দেখে এনু দূর গাঁয়ে
গোঁয়ো মেয়েদের সঙ্গে মিতালি ঘন বন প্রচ্ছায়ে।
তোমার প্রিয়ারে চোখে দেখে এনু, শব-সাধনের ঋষি!
পাতার কুঁড়ের পাশে ঝিঁঝিঁ ডাকে—আঁধার নিশুতি নিশি-

পিদিম আলোয় পল্লীর বধূ সেলাই করিছে কাঁথা
আর মনে মনে গুণ গুণ করে তোমাদের প্রেম-গাঁথা।
আমি দেখে এনু, গাঁয়ে সাঁঝ নামে—শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে
তোমার প্রিয়ার ছবিটিরে আগে মেয়েরা প্রদীপ ধরে।
এক বিধবারে হাসিতে দেখিনি, দু'চোখ রহিত ভরি'—
তব প্রিয়া তার চোখ মুছালেন, সে যে তাঁর সহচরী।
তোমার হিয়ার কমল আজিকে একেলা তোমার নয়,
আমি দূর গাঁয়ে কুটীরে কুটীরে পেয়ে এনু পরিচয়।
সতী-হারা শিব, তুমি ছড়ালে যে বরতনু প্রেয়সীর
সারা বাংলায় ছড়াইয়া উহা রচিয়াছে মন্দির।
দেখে আসিলাম, যেখানে পড়েছে সতীদেহ এক কুটি ;
অপরূপ রূপ শতদল হয়ে অমনি উঠেছে ফুটি'
আজি দেখে এনু দেশ জুড়ে তব বিরহের গাঙ চলে
তার দুই কূলে কত কত ফুল ফুটিয়াছে দলে দলে !

আমি দেখি আর বিস্ময় মানি, উল্লাসে নাচে প্রাণ—
একি অপরূপ তাজ গড়িয়াছ হে বিরহী শাজাহান ?
নীলাকাশ চিরে শির তুলে নাহি দম্ভের ভঙ্গিমা
শক্ত পাথরে ঘিরে চারিধার গড়ো নাই কোন সীমা।
এ তাজের কোলে চুপে চুপে যেই অশ্রু-যমুনা বয়,
তার ক্ষীণধারা যাত্রীরা কেহ দেখেনাক নিশ্চয়।
তোমার মতন বুক হ'লো যার' ব্যথার আগুণে খাঁক,
তব মন্দিরে আসুক অভাগা, আসিয়া হাসিয়া যাক
এসে দেখে যাক বুকে শোক নিয়া হাসা যায় মন খুলে
অশ্রু-পিছল শ্মশান-ঘাটাও ঢাকা যায় ফুলে ফুলে।
হে মহৎ, তুমি শাওনের মেঘ—বক্ষে বাদলরাশি
বাদল কখনো ঝরিতে দেখিনি, দেখি ঝিলিকের হাসি।

শ্রীমনোজ বসু

পরলোকগতা সরোজনলিনীর স্মৃতিতে
শ্রীযুক্ত গুরু সদয় দত্তের প্রতি—

বিচিত্রা

ধরিত্রীর দুহিতা (Daugh'ers of the Soil)

[মাদ্রাজ ফাইন্ আর্ট সোসাইটির ১৯৩০ সালের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

চিত্রশালা

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগীর গঠিত
কয়েকটি মূর্ত্তির প্রতিলিপি—
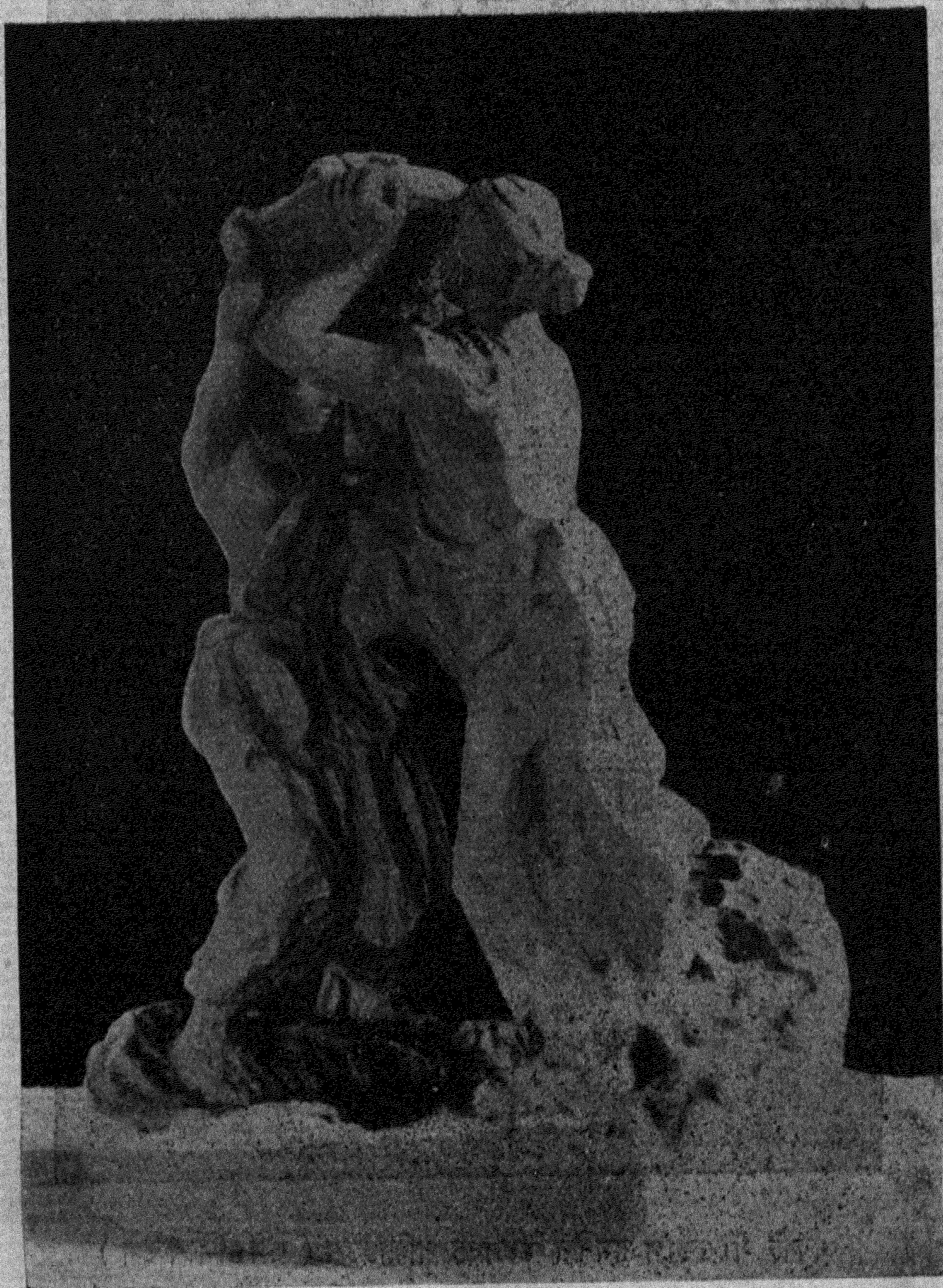
ধরিত্রীর দুহিতা (অপর পার্শ্ব)

[মাদ্রাজ ফাইন্ আর্ট সোসাইটির ১৯৩০ সালের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

একটি সাঁওতাল রমণীর উচ্চাবচ পরিচিত্রণ (শান্তিনিকেতন)

প্রণতি

মাদ্রাজের জনৈক শিল্পী-বন্ধু

শান্তিনিকেতনের জনৈক ভাস্কর-বন্ধু

বৃহত্তর—মহত্তর

—বড় গল্প—

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে এক দিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হল। লোকটার চেহারায় না' হোক, পোষাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে শিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে কোঁচানো শান্তি-পুরে ধুতি, পায়ে চক্‌চকে ডার্ব্বি। হাতে আবার একটা রিষ্টওয়াচ বাঁধা!

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মত বল্‌ল, রেষ্টুর‍্যাণ্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন ক্ষিদে পেয়েছে ভায়া!

আশে পাশে রেস্তর‍াঁর নাম গন্ধ ছিল না, দেশী খাবারের দোকান ছিল; বললাম, খাবার খাবেন?

অগত্যা! ব'লে সে একটা বিড়ি ধরাল। সঙ্গে ক'রে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। সে নিজেই এটা ওটা ফরমাস করল, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুণলাম। জিজ্ঞাসা করলাম দিদি কেমন আছে?

জানি না, ব'লে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেল্‌ল।

জানেন না মানে?

মানে আমায় কলা দেখিয়ে শালী ভেগেছে চার মাস!

আমি নীরবে উঠে দাড়ালাম যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হ'য়ে বলল, চললেন যে?

সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?

এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

দাম? দাম আমি জানি না, ব'লে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, এ কোন দেশী ঠাট্টা ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কি রকম? প্রতিজ্ঞা করছি আর খারাপ কথা বলব না। খুব সম্মান ক'রে কথা কইব। কি জ্বালা, আপনার পায়ে পড়চি দাদা, হ'ল?

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ ক'রে অনুযোগের সুরে বলল, রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বার হয়ে গেছে ব'লে কি এমন করতে হয় রে দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনো।

কাঁপুক। চট ক'রে বলুন দিদির কি হয়েছে।

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বলল তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই মাস চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বলল আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইচে না আমি মহত্তর বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম ব'লে নগেনকে কথাটি কইবার (মানে, চুলের মুঠি ধ[illegible] আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্ ক'রে চ'লে গেল নগেন প্রথমটা ভাবল সে বুঝি আমায় ভর ক'রে অকু[illegible] ভাসল। (এইখানে সে হাত জোড় করল, পাছে আমি রা[illegible] করি) শেষে শুনল, তা নয়, কি একটা নারী-সমিতিতে যো[illegible] দিয়ে সে দেশের কাজে গেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছো[illegible] ছেলে মেয়েদের পড়ায়, বাড়ী বাড়ী মেয়েদের কাছে স্বদে[illegible] প্রচার করে। একথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করা[illegible] করার জন্য দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সে আমার কানের কা[illegible] দুঃখ-লজ্জা অনুতাপের জলন্ত বর্ণনা ক'রে চলল। আ[illegible] খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না। শেষটা কিছু শুনলাম না।

উদ্গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম তার খাওয়া বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্গার তুলে বলল, আ[illegible] খাব না, দামটা দিয়ে দিন।

দিচ্ছি। এত ঘটা ক'রে সাজ করেছেন কেন বলুন ত

দিদির শোকে না কি? কালো দাঁত বার ক'রে হাসল, মারে রামো, সে বৃহত্তর মহত্তর জীবনে সার্থক হতে গেছে তার জন্যে শোক কি! আবার বিয়ে ক'রে ফেলেছি কি না—ঝলেন না? দুটো পয়সা দিন ত, পান কিনব।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হল খাবারের দাম না দিয়ে চ'লে যাই; দোকানীর হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও খাক্। কষ্টে সে সঙ্গত ইচ্ছা সংযত ক'রে খাবারের দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হল, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি এত লোকও চলেছে কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কত বিভিন্ন! এতগুলি চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মত কেউ গৌরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারীসমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম! তিনি জানালেন মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠান হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠনমূলক, ধ্বংস এর কর্ম্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড় মুস্কিল।

পরদিন আমি মমতাদি যে গ্রামে ছিল সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার পাঁচ ঘণ্টার পথ।

বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ ক'রে, শোভার প্রাচুর্য্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে সেইখানে একটি ছোট টিনের বাড়ীতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিদের জন্য গ্রামের কে সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিল। ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার পাঁচটী চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এল।

হেসে বলল, এসেচ? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু'এক ঘণ্টা তর্ক করবেই। তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

তর্ক করব নিশ্চিত জান?

জানি। যে কাণ্ড করেচি, তর্ক না ক'রে তুমি ছাড়বে?

যদি না করি তর্ক?

বিস্মিত হবো! ভেবে পাবনা বাঙ্গালী হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কি ক'রে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে মুখে তর্ক উঁকি মারচে। অন্ততঃ আলোচনা।

নদীতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসল—অর্দ্ধেক মাদুরে অর্দ্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনি ভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভাল ক'রে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম এজীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিল কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা যেমন সম্ভব ছিল না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্দ্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে মুখে একটা শান্ত-জ্যোতির আবির্ভাব দেখে বোঝা গেল না সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে সমর্থন কর না?

আমি বললাম, ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম যদি—

যদি?

যদি তোমার দেশ-প্রেম নিজের তেজে স্বামী-পুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেত, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকত।

সে হাসল! তাপসী নই, মন নির্ব্বিকার নয়। ভেজাল হয়ত আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবচ তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবচ আমি ঝগড়া ক'রে ঝোঁকের মাথায় চ'লে এসেচি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিল। কতদিন ধরে চেষ্টা ক'রে আমি বাড়ী ছাড়তে পেরেছি জান? ছ'সাত মাসের বেশী। রাগের মাথায় চ'লে এসেচি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয়

এই ভয়ে যখনি সে বেশী রকম খারাপ ব্যবহার করত আমি গৃহত্যাগের সময় পনের দিন পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্ততঃ পনেরটা দিন যখন রাগের কোন কারণ উপস্থিত হবে না তখন বাড়ী ছাড়ব, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থেকেও ছ'সাত মাস যেতে পারি নি। শেষের দিকে তো হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে একবারও খিটিমিটি বাধবে না এমন পনেরটা দিন এ জীবনে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হল—

সেই সুযোগে চলে এলে!

সে হাসল। শোনই আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার ত অসুখ হ'ল, আমি নাওয়া খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে অসুখ ভাল হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্য ভাল হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলি যেন ফিরে এল—এত আদর এত সোহাগ এত ভালবাসা! পনের দিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চ'লে এলাম। রাগ ক'রে এসেচি আমি? ঝগড়া ক'রে এসেচি? তা আর বলতে হয় না।

তবে এলে কেন?

না এলে চলে না তাই।

তার মানেই তুমি হার মেনেচ। নগেন বাবুর সঙ্গে যে বাজী রেখেছিলে তাতে তোমার হার হয়েচে।

কিসের বাজী?

মনে নেই? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী; বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়ীছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই নেই!

নেই তো! আমায় কেউ বাড়ীছাড়া করে নি, আমি নিজে এসেচি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চ'লে আসব আমি কি তেমন মেয়ে? নই, নই, নই। এগার বছর ধ'রে তার অবিচার অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে জন্য নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন ক'ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য্য থাকে? যদি কোন বই-এ প'ড়ে থাক অত্যাচারী স্বামীর কথা, জানবে লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টা দিনের আধ ঘণ্টার হিসাব দিয়েচে, বাকী সময়টা চালাকী ক'রে নেপথ্যে রেখে দিয়েচে! অবশ্য ঐ বাকী সময়টা স্নেহ ভালবাসায় বোঝাই না হ'য়ে একদম ফাঁকা হ'তে পারে—কিন্তু ওসব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন! শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনী হলে অভাগিনী হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় ক'রে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্ত্তমান জীবনও ভবিষ্যতে যে-জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব সমস্ত গ্রাস না করত আমি মুখ বুজে তার সংসার ঘাড়ে ক'রে মরতাম। সুখ শান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার অনিদ্রা প্রহার নির্য্যাতন উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি। জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না। কতক স্বামীর জন্যে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণ ভাবে আমার জীবন হল অকারণ, অর্থহীন। স্বামী নয়, দুখ দুর্দ্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্ত্তনাদ আরম্ভ ক'রে দিল।

সতীনের ভয়ে?—ব'লে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠল। সতীনের ভয়ে আত্মার আর্ত্তনাদ সতীন? সতীন হয়েচে না কি এর মধ্যে! স্ত্রী ছাড়া তা চলবে না জানতাম, কিন্তু এত শীগ্‌গির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনো বোধ হয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যা নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে বিশাল ফাঁকটা সইল না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হল?

নালিশ! ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ অভিযোগ! মনে হল, অভিমান জেগেছে— ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দুচোখে মানিয়েছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভাল লাগল না। মুখে সমর্থন করি আর না করি মনে মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে দেবীর মত জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তুলেছিলাম—দধীচি থেকে আরম্ভ ক'রেই আজ পর্য্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে

মানুষের। মানবতার গায় ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্ত্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, এবার আমার পূরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেচ নিজেকে। ভেবেচ কর্ত্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েচ কর্ত্তব্য পিছনে ফেলে! সে বলল, কর্ত্তব্য মানে? স্বামীসেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করে নি দেখচি! এই নারী-বিদ্রোহের যুগে ওকি কথা বলচ তরুণ? কোন যুগের মানুষ তুমি?

এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাব? নাচিকেতার মত যমের বাড়ী না গেলে আর সে শিক্ষা জুটচে না। দুঃখ এই যে যম আমায় বাড়ী ফেরার জন্য ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্য্যার নালিশ পুরোণো, পচা। নিজেই বলেচ ও জন্য বাড়ী ছাড় নি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারল না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারল না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কি ক'রে ব্রতরক্ষা করবে?

লাখ মানুষের আশীর্ব্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের সেই ফ্যালাসির মত—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয় অতএব মানুষ বানর। একের সঙ্গে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারল না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে না এ কথা বলা যায়? একটি মাত্র বত্নাকরের মঙ্গল ক'রে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে এমন আশা করা বোকামী। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডী ছোট হলেই যে ভাল কায করা যাবে তার মানে নেই। বাড়ীর বৌ সমস্ত বাড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ীর সব চেয়ে ছোট ঘরটি পরিস্কার করার জন্য ডাকতে হয় মেথরকে? আমি চেষ্টা করি নি ভেবেচ? এগার বছর চেষ্টা করেচি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙ্গল আঁচড় কাটতে পারে নি—ফসল ফলাব কি! তাই এসে দাড়িয়েচি এই বিস্তীর্ণ মাঠে। যত আগাছা থাক, মাটী যত শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিস্কার ক'রে আবাদ করতে পারব না? বাকী জীবনে চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারব—ফলবে। সে থামল। একটু ভেবে বলল, এই কথাটা আমি ভাবতাম রাত্রিদিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোট নয় তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষে আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দু আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে আসা আত্মার দূরত্ব বেশী। তাই আমি ভাবতাম যে, শু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই আমার জীবন তাদের কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হ না? সবাই পরের জন্যেই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজে জন্য আহরণ ক'রে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওা নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম কিন্তু দেওয়া মিথ্যা হল না, এই টুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্য দধীচি আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আ দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থি বজ্র নিভে গেচে। একটু তাপ শুধু আছে নেভা বজ্রে ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় ক'রে যেতাম মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দ হত। আজীবন স্বামী সেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম! কার সারাজীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মে দেখতাম দুর্ল্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবনব্যা দানব-পূজার আপশোষ নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হ'ত আপশোষ নিয়ে মানুষ কোন পরলোকে যায় জান? নরকে।

আমি বললাম, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল ক এখনো বলি নি। তোমার তো শুধু স্বামী নয়, দুটি ছেলে

সে সংশোধন ক'রে বলল, দু'টি নয়, ছ'টি। চারটি স্ব গেচে। দুটি গর্ভের অন্ধকার থেকে, দুটি পৃথিবীর আ দেখে। না, দুটিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হ জন্মেছিল।

এ বারতায় ব্যথা ছিল, আঘাত ছিল। আমাদের শি জগতে স্থায়ী মড়ক আছে সে কথা শুনেছিলাম। শুনেছিল মানে দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম কখনো ভেবে দেখি নি শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণে ন

মমতাদির মত অসংখ্য মাতার মর্ম্ম-বেদনায়। জগতে যার ছাড়া মর্ম্ম-বেদনা নেই।

সে বলল, তুমি ভাবচ এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দুটির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড় ছেলের বয়স বার—মনের বিকৃতিতে বার শ'। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগী, বোকা, অলস। ছোটটিও ওমনি ভাবে গ'ড়ে উঠচে—দুজনেই একদিন বাপের মত হবে।

অত খারাপ? ব'লে আমি জিভ কাটলাম।

সে বলল, জিভ কেটোনা। সারা জীবন কথা কইতে হবে এখন জিভ কাটা গেলে মুস্কিল। নিজেই স্বামী নিন্দে করেচি, তোমার কথায় আর কত ব্যথা পাব? আমার ছেলে দুটি বাপের মত অত খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদ্‌গুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের। দশ বছরে দশটা কুকুর ছানার বাপ হবে—আকাল মৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড় হয়ে দশ দশে একশটা শূকর ছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করচ? পৃথিবী এমনি ক'রে ভারাক্রান্ত হয় ভাই -একটা গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্যে যীশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া প'ড়ে যায়। একটী মানুষ থেকে মানব জাতি হয়েচে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। ওমনি অমানুষ হয়ে উঠচে আমার ছেলেরা! ন মাস দেহের মধ্যে ব'য়ে বেড়িয়েচি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেচি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেচি, স্নেহ করেচি ভালবেসেচি জগতের দুটি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেচি। পাপে আমার বিরাগ, ব্যর্থতায় অরুচি। প্রাণ-পণে সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় ক'রে তোলা পাপ।…তোমার দুচোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমায় পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্চে?

আমি বললাম, না। তোমার কথাগুলি এত ছোট বড় কথার চুম্বক যে হঠাৎ শুনে ঠিক মত ধারণা ক'রে উঠতে পারচি না।

সে বলল, সেটা আশ্চর্য্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগার বছর শুধু ত জলিনি—তিল তিল ক'রে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেচি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন তো করবেই। এগার বছরের ভাবনা কি দু মিনিটে ভাবা যায়? আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায় না। আমি সময়মত ভাবব। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনার খোরাক সংগ্রহ করি।

সে বলল, ভেবো। ভেবে দেখো আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পয়সা দিয়ে কেনা দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায়, দুর্ভাগ্য;—শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কতবড় অন্যায়, কতবড় দুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মায়ের অদৃষ্টে! স্বামীর কাছে জীবনের একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে তিল তিল ক'রে বাড়িয়ে জননীকেই জেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনের চুল্লী—যদি সে চুল্লীতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীর, যদি তার আগুনে গৃহদাহ হয় কলঙ্কও জননীর। মায়ের দায়িত্ব এতবড় ভাই! তাই পৃথিবীর দুটি গলগ্রহ সৃষ্টি ক'রে আজ আমার অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে দু ফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েচি সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তার দাহে আমার শুধু ক্ষেপে যাওয়া বাকী আছে। ভগবান আজ যদি ওদের কাছে টেনে নেন, তবে বোধ হয়—তবে বোধ হয়—

ভগবানের নাম নিয়ে মার মুখে সন্তানের মৃত্যু কামনা! এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজের অসমাপ্ত উক্তির প্রহারে সেও কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম এ কান্নার অর্থ কী। অভিশাপের প্রত্যাহার। মুখের কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কাণে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্য্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিল, তীর ঘেঁসে চলেছিল একটি পানসী। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে

কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ব'সে আছে, একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত ক'রে ধ'রে। কিছু দূরে নদীর বাঁক, সে পর্য্যন্ত আমি নৌকার জননীটিকে অনুসরণ করলাম। ততক্ষণ কাছের জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, এভাবে চরমে উঠলে আমাদের আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ম্লান হেসে বলল, চরম কীর্ত্তির আলোচনায় চরমে না উঠে উপায়?

বললাম, তুমি শুধু ইঙ্গিত কর, বাকীটা আমি অনুমান করব। নরকের অন্ধকার আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ করবে। আমরা পৃথিবীর মানুষ আমাদের মাঝামাঝি রকা হওয়াই ভাল।

ভীরু! ব'লে সে হাসবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যত রেখে ঢেকেই বল অপমানিত হব। তোমার কথাই হোক্। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুস্কিল আছে। বোধ হয় সে মুস্কিলের অবসানও নেই।

কি মুস্কিল?

আমার মত ভীরু অকর্ম্মণ্য থেকে আরম্ভ ক'রে তোমার ছেলেদের মত চোর ছ্যাঁচোরকে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মত অস্বীকার করে, দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিন দিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায়?

জন্মাবে না!

শুনে আমি থ খেয়ে গেলাম। সে বলল, ভড়কে গেলে দেখছি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সুতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল কি আমার মত মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরাণী আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? সহরের বিষপান ক'রে যে কটি মানুষ জ্ঞান হারিয়েচে তাদের বাড়ীতে? কলকাতাতেই অগুন্তি ডালিম বেদানা, আইন ক'রে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কি আসবে যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মত মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে সুতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই ক'রে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের শক্তিক্ষয় হবে না;—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্ত্তে অর্জ্জন করবে। দুর্যোধনকে সজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কি লজ্জা ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিল, তোমার নয়, ধর্ম্মের জয় হো'ক।

আমি বললাম, তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না? কথার সুরে মনে হল দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই। সে বলল, ও যদির কথা। আমরা মা না হলে যদি দেশের সুতিকা ঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল সত্যি ভেঙ্গে পড়ে। জন্মানোটাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানোটা দুর্ভাগ্য? কত দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কত জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েচে। সে জন্য কে তাদের দোষ দেয়? অবসানে দুঃখ কি? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভাল।

আমি বললাম, এ সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই, কারণ মৃত্যু যবনিকা নয়, পটপরিবর্ত্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা ক'রে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।

জমা করা জীবন যখন প'চে যায়? একমাত্র Noahকে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রম সংশোধন করতে বাধ্য হন?

তখন ভগবান অত্যাচারী খেয়ালী। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভাল, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরও ভাল।

সে মৃদু হাসল, তোমার হলী কি? আমি পূবে পা বাড়াচ্ছি, তুমি হাঁকচ পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ আমি তা বলিনি। বলেচি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডীর বাইরের অতিরিক্ত সত্য। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে

গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্যে ওষুধ তৈরী হ'চ্ছে, আমি করব তার প্রতিবাদ? স্পর্দ্ধায় ধূলো হয়ে যাবো যে! অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেচি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ কর?

আমি বললাম, ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে তো তোমাদেরি হাতে!

মানে?

মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণতি নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রীও তোমরা। তুমি ছেলে দুটিকে মানুষ ক'রে গড়ে' তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে না, তার কারণ বুঝতে পারি, তার শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভাল মন্দ কোন শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে তোমার শক্তি সামান্য। সামান্য শক্তি এত বড় দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে? দুটি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড় দেশসেবা হত না? কেন তা করলে না?

কেন করলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এলো। সকাল সন্ধ্যা রান্নাঘরে কাটল, বাকী সময় নানা কাজে। অভাবের খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এল। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে রইল, স্বার্থপর স্বামী ছিনিয়ে নিল। তবু আমি পারতাম। অতিমানুষ না করতে পারি অমানুষ হতে দিতাম না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেত। চব্বিশ ঘণ্টা পলে পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কি করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্ন হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যে দেহ মন কুঁকড়ে গেল বিকাশ হল না, জীবনীশক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল, দোষে বিনা দোষে বাপের খোঁচা খেয়ে কুটিলতা শিখল, শিশুমনের তুচ্ছতম আকাঙ্খাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল, বাড়ীর ভয় ও নির[...] নন্দের আবহাওয়ায় মন না টেঁকায় বেশী সময় বাইরে কাটা[...] ভালবাসল, যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দো[...] সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকে[...] কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল। এতো সংক্ষিপ্ত হিসা[...] আরও কত আছে! এবার বুঝলে কেন পারলাম না?

আমি কতকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। একি বর্ণ[...] একি নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পারে[...] অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হলাম, আমার কে[...] সান্ত্বনা রইল না। শুধু মুখের কথা তো নয় যে, শোন[...] সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কম বেশী ক'রে যতটুকু মান[...] মনের স্বস্তি ততটুকু মানব। সন্তানহারা মা আমার সামনে[...] বসেছিল। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এল[...] সন্তান হারানোর চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ করেছে অ[...] যোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বলল, অনেক দুঃখেই বাড়ী ছেড়েছি ভাই। আ[...] অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশের অভিশা[...] জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হলনা। আমি মুক্তি নিলা[...] এ মুক্তি সময় সময় পীড়া দেয়, এগার বছরের চেনা খাঁচ[...] ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আ[...] যাতনায় ছট্‌ফট্ করি। কতক্ষণের জন্য দেশের সেবায় দা[...] বিরাগ জন্মে। মনে হয়, ন্যুব্জ হয়ে পথের ধূলোয় চো[...] বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালবাসে, ভালবাসুক[...] সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চ[...] না চাক;—আমার কি? আমি কেন মাতৃত্বের আত্মহ[...] দিয়ে এমন নিষ্ঠুর পূজা ক'রে চলি? কিন্তু এ দুর্ব্বলতা কে[...] যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দেশে অসংখ্য পুরুষ দিদি। ত[...] তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মত তারা মাটিতে শিকড়-ব[...] তরু নয়। নিজেকে উপ্‌ড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্য[...] তোমার করতে হবে কেন? তুমি ফিরে যাও।

সে হাসল, সংখ্যার গর্ব্বে দেখি ফেটে পড়ছ! প্রমাণ কই তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আমি অনাবশ্য[...] অতিরিক্ত বাহুল্য? যদি পার, এখুনি ফিরে যাব। সতীনে[...]

পর্য্যন্ত ভয় করব না! একটু থেমে বলল, তুমিও তো পুরুষ, না ভাই? শিকড়হীন তরুণ পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙ্গিয়ে শিকড় গাড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছ, এই যা আপশোষ। একটি বাড়ী, টুকটুকে একটি বৌ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়। না? লোভী!

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, অনেক আগে ঘাট মেনেচি, খোঁচাচ্ছ কেন?

খোঁচাচ্ছি? মাইরি না। কালীর দিব্যি। স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলাম, আর রাগ কোরো না। বলে সে হাসল। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যি খোঁচাই নি ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাব? যার সে অধিকার নেই সে তা করলে ভেবে নিতে হয় ঠাট্টা করেচে।

খোঁচাবার অধিকার তোমার আছে।

নেই! আমার দেশ-সেবা যে বাধ্যতা-মূলক।

সে সবারি। অধীনতা বাধ্য করে।

করে কি? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে কি ক'রে জানলে? না ভাই, জবাব চাই নি। একথার জবাব মানে আধ ঘণ্টা ধ'রে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ওরকম দেশ-সেবা বাধ্যতা-মূলক নয় ভাই। তা হলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতা মূলক-বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইল না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েচি—ঝড়ে ভাঙ্গা তরী এসেচি বন্দরে। বেশী নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম আমি সেখানকার মাটী কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকায় ব'লেই না এখানে নিশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগার বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম সেখানে থেকে সন্তানের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও বলি, আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বহু ঊর্দ্ধে—আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশী কি, আমি আ[illegible] তোমার প্রণম্য!

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্ব্বাদ তারপর চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। সূর্য্য তখন নদীর অপ[illegible] তীরে, তরু শ্রেণীর খানিক ঊর্দ্ধে। নদী দিয়ে একটা ষ্টিমা[illegible] চ'লে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউএর শব্দ মৃদুভাবে কা[illegible] এল। কয়েকটা বক নদী তীরে ব'সে ছিল, হঠাৎ উ[illegible] গেল।

মমতাদি বোধ হয় ভাবে নি এত শীগগির আমি তা[illegible] রেহাই দেব। স্পষ্ট অনুভব করলাম সে আমার কথা বলা[illegible] প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। ক[illegible] কথা তো বললাম, কিন্তু কথা ব'লে লাভ কি? সংসারে[illegible] জ্বালায় কত মানুষ গেরুয়া প'রে পালিয়েছে, কত মানুষ ক্ষে[illegible] গেছে, কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে,—মমতাদি যদি জগতে[illegible] মধ্যে মহত্তম কর্ম্ম-বৈরাগ্যে আধ-পোড়া মনের আগু[illegible] নেভাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোন কিছুর এদিক ওদিক হ[illegible] না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যত বড় কর্ত্তব্য হোক সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই; সে অপচয় বন্ধ করা যত ব[illegible] অকর্ত্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ে[illegible] সবচেয়ে সদ্‌ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণ[illegible] ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ ক'রে আমি ভাবতে লাগলাম অধুন[illegible] পরিত্যক্ত স্বামী পুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদে[illegible] বাড়ী রাঁধুনী হয়েছিল,—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে[illegible] ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারটি বছর এ[illegible] টানা বেঁচেছিল শুধু স্বামী পুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্চ্ছা তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটি[illegible] দিল, বাঁধন-শুদ্ধ যে বেড়িয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্ম্মশ[illegible] নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজে[illegible] ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। [illegible] দুর্ব্বোধ্য; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভী[illegible] মুখ দেখে আমার মনে হল, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে [illegible] আমার শেষ শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হ[illegible]

উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বলল, তোমায় একটা কাজ দেব।

কি কাজ?

সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।

কি খবর? কুশল?

হুঁ, ব'লে সে চোখ মুছতে মুছতে হাসল।

বলচ ওদের। ওদের মানে কি তোমার স্বামীরও?

নিশ্চয়। আধখানা কুশল সংবাদ নিয়ে করব কি?

স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা! একটা স্পষ্ট কথা জিজ্ঞেস করচি। স্বামীকে তুমি ভালবাসতে?—বাস?

সে একটু ভাবল, ভালবাসা? প্রেম? কি জানি ভাই ওসব বুঝিনা। এইটুকু বুঝি যে না দেখলে মন কেম করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগার বছর যার ঘর ক নায় তার হীনতা বোধ হয় স্নেহ মমতাকে ঠেকিয়ে রাখ পারে না।

প্রেম নয়—স্নেহ এবং মমতা। এই তিনটি মনোধ আমার কাছে এমন একরূপ প্রতিভাত হয় যে আজও ঠি করতে পারি না তার স্বামীপ্রেম ছিল কি ছিল না।

মায়া কি নিছক অভ্যাস? প্রেম নয়?

সমাপ্ত

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাগুন-বিলাস

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

মনে রং ধরিয়াছে সবুজের,
কথা তাই কই যত অবুঝের!

চোখে নীল লাগিয়াছে আকাশের;
কানে শুনি যেন গান বাতাসের;

পুরাতনে দেখি ছায়া নবীনের;
চেনা চেনা লাগে মুখ অচিনের;

পাশে যবে বসি মোর প্রেয়সীর
কেঁপে কেঁপে উঠে কেন এ শরীর?

মুকুরেতে দেখি মুখ আপনার,
দিনে রাতে ঘুরে-ফিরে লাখোবার!

আঙ্গুলের পরশনে ফাগুনের,
আমি জ্বলি যেন শিখা আগুনের!

কাটে দিন দোলে দিবা-স্বপনের:
জাগে নবঘন বুকে গগনের!

সন্ধ্যা-তারা

শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চেনা সুর

প্রতিবেশিনীর পায়ের নূপুর রোজই বাজে সকালে—সাঁঝে। আমার ঘরের এই ছোট্ট জগৎটির বাতাসকে তার ঐ নূপুরের ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল কোরে দেয়।

তার প্রতি পদক্ষেপে যে সুর বেজে ওঠে কেবল সেইটুকুই জানিয়ে দেয় যে সে এই জগতেরই মানুষ। সে যে আছে এই বার্ত্তা বহন করে আনে এই মৃদু আওয়াজটুকু।

দুই বাড়ির মাঝে ছোট নালাটার উপর দিয়ে দিনে রাতে যে সুরের সেতু গড়া হয়—তাই দিয়ে আমার মন তার পাশে গিয়ে পৌছায়। তার সারাদিনের কাজ আমার কাছে ধরা দেয় ঐ নূপুরের সুরের রূপে।

সকালে নূপুর বেজে ওঠে—বুঝি সে চলেছে স্নানে। তারপরে নূপুর বাজতে থাকে দ্রুত তালে এঘরে ওঘরে, বুঝি সে ব্যস্ত ঘরের কাজে।

দুপুরে ছাদের কোণে সেই সকালের চেনা সুর ডাক দেয় আমার মনকে—ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে সে চুল শুকোতে রত।

বিকেলে আবার নূপুর ব্যস্ত ভাবে বেজে বেড়ায় এঘরে ওঘরে।

পড়সীনীদের কল-কণ্ঠের সাথে তার নূপুরের আওয়াজ সন্ধ্যাবেলা থেকে শোনা যায়। রাত্রে তার নূপুর আর বাজে না।

বছর কেটে গেছে; প্রতিবেশিনী হোয়েছে আমারই গৃহবাসিনী। তার নূপুর এখন আমারই ঘরের মাঝে দিনে রাতে বাজে। কিন্তু তেমন সুরে আর বাজে না; কেন যে তা বোলতে পারিনা। তাই তো থেকে থেকে গিয়ে বসি সেই পুরোনো জানলাটার পাশে।

গান

সেদিন দেবমন্দিরে যে ছেলেটি গান গাইতে এল তাকে আগে কেউ দেখেনি।

তার চন্দ্র-কলার মত কপালটিতে চন্দন। গলায় কুন্দ ফুলের মালা। কানে কুণ্ডল।

আশ্চর্য্য তার গান। ধূপের ধোঁয়ায় মন্থর হাওয়া সুরের আঘাতে চঞ্চল হোয়ে উঠলো।

গভীর রাতে গান থামলো। তখন চাঁদ উঠেছে। সবাই ফিরে চল্ল ঘরের পথে। কেবল যে মেয়েটি দেবমন্দিরে মন্দিরা বাজাত সে স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার আঙিনায়।

নবীন গায়কের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে।

রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় গান গাইবার জন্যে। তা'তে সবাই হোল খুসী। কেবল যে মেয়েটি মন্দিরা বাজাত, সে বল্লে "যেওনা।"

ছেলে জিজ্ঞাসা করলে "কেন?"

"তোমার গান তো রাজ-সভার গান নয়।"

শুনে ছেলেটি হেসে চলে গেল। মেয়েটি সন্ধ্যা-তারা পানে দুই চোখ মেলে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজার সভায় ছেলেটি গান করে, কিন্তু মন ভরে না কোথায় যেন ফাঁক পড়ে। কেবলই মনে হয় যেন গান শোনা এই রাজ-আয়োজনের মাঝে কোথায় একটা ফাঁক রো[illegible] গেছে। সভাসদের দল গম্ভীর মুখে বসে তার গান শোনে মনের চারিপাশে রাজনৈতিক বুদ্ধির পাথর দিয়ে গাঁথা [illegible] প্রকাণ্ড পাঁচিল তারই গায়ে তার সুর মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরে

উৎসব রাত্রে রাজপ্রাসাদের হাজার দীপালোকে যখন সে ইমন-ভূপালীতে গান ধরতো, তখন তার মনে পড়তো সেই জীর্ণ মন্দিরের আঁধার ভরা কোণে সেই মাটির প্রদীপটির কথা। আর মনে পড়তো সেই দীপশিখার ক্ষীণালোকে কার চাঁপার কলির মতো আঙুল মন্দিরা বাজাচ্ছে।

সেদিন শরতের প্রথম প্রভাতে মন্দিরের পথ শিউলি ফুলে ঢাকা পড়েছে। যে মেয়েটি মন্দিরা বাজাতো তার মন আজ কেবলই বলছে 'সে আসবে, আসবে, আসবে'।

ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁকে যখন সূর্য্যের আলো দেবতার পায়ের কাছে এসে পড়েছে—তখন তরুণ গায়ক প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো।

মেয়েটির চঞ্চল হাতে মন্দিরার তালে তালে ছেলেটি ভৈরবীতে মাঙ্গলিক গান ধরলে।

দান

১

রাজার দ্বারে এসে সকলেই অন্ন নিয়ে যায়। ভোরের আলোর সাথে সাথেই রাজার অতিথ-শালায় লোকের ভিড় জমে। কত দেশের কত পথিক আসে যায়, কেবল একটি মানুষ রোজই আসে দ্বারের পাশে কিন্তু অন্ন নেয় না।

জিজ্ঞাসা করলে বলে "তোমাদের হাতের অন্নে আমার কাজ নেই। আমার অন্ন স্বয়ং রাজকুমারী দেবেন। তিনি যে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা।"

সে রোজই শূন্য হাতে উষার ম্লান আলোয় আসে, আবার সন্ধ্যার মলিন আলোয় ফিরে চলে শূন্য হাতে।

২

রাজার দ্বার হোতে শূন্য হাতে অতিথি ফিরে যায়, এ খবর রাজকুমারীর কানে উঠলো।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহর, পথিক আপন জায়গায় ব'সে এক তারাতে সুর ধরেছে। এমন সময় রাজকুমারী এলেন সোনার থালায় অন্ন সাজিয়ে।

পথিক হেসে বল্লে "ওগো অন্নপূর্ণা, ভুল কোরেছ, ও অন্নে আমার দরকার কি? আমার রাজার রাজ্যে কি অন্নের অভাব? ভুল করেছ দেবী, কাল এসো।"

রাজকুমারী লজ্জা পেলেন, ফিরে চল্লেন অবনত মুখে।

৩

পরের দিন রাজকুমারী সোনার থালায় সাজিয়ে আনলেন ধন, রতন, মণি, মুক্তা।

পথিক হাতে কোরে থালা সরিয়ে দিয়ে বল্লে "আমার রাজার রাজ্যে বাস কোরে আমি কি গরীব?"

রাজকুমারী ফিরে গেলেন আঁচলে মুখ ঢেকে। পরের দিন পথিক এলো রাজার দ্বারে ভোরের আকাশকে গানের সুরে চঞ্চল কোরে দিয়ে।

তারপর রাজার অতিথ-শালায় কত লোকই এলো কত লোকই গেলো। বেলা বাড়তে লাগল।

সেদিন রাজকন্যা এলেন শূন্য হাতে। পথিক হেসে বল্লে "দেবী, আজ আমার শেষ দিন। আমি যে-পথে মানুষ সেই পথ আমাকে ডাক দিয়েছে। যাবার আগে তোমার হাতের দান সাথে কোরে নিয়ে যেতে চাই।"

রাজকুমারী আপন চুলের মাঝে লুকিয়ে রাখা শ্বেত করবীর গুচ্ছ নিয়ে পথিকের হাতে দিলেন।

পথিক আপন একতারাটির তারের সাথে ফুলের গুচ্ছ বেঁধে নিয়ে মাঠের পথে ফিরে চল্ল।

রাজকুমারীর আঁচল চোখের জলে ভিজে উঠলো।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি
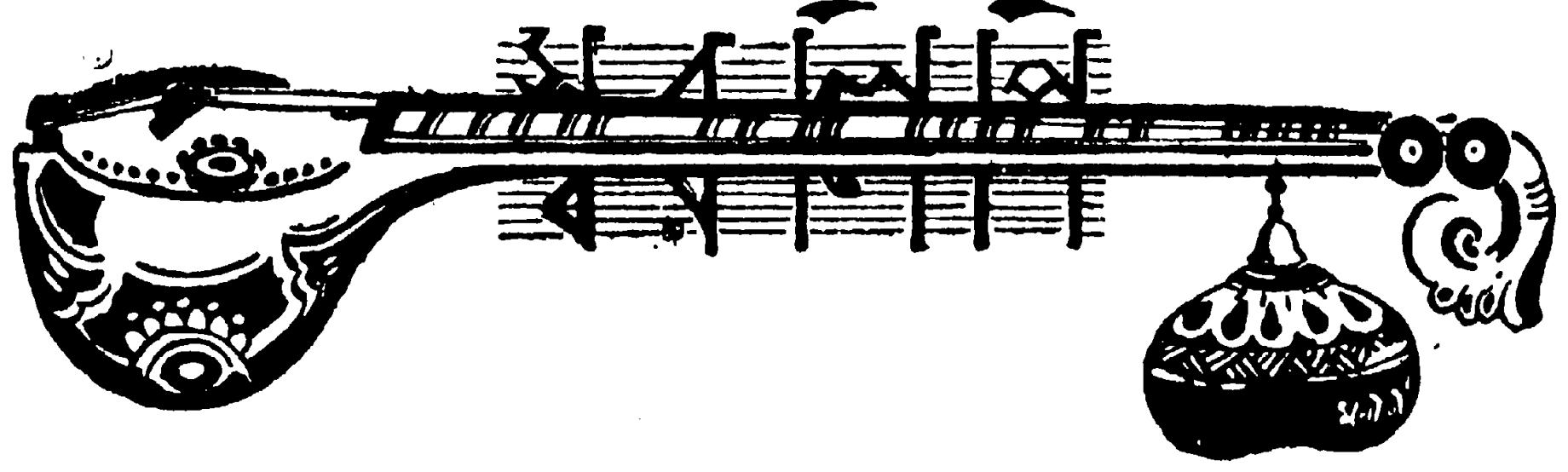
মিলন রাতি পোহালো বাতি
নেভার বেলা এলো,
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো।
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে
ব্যথার তাপ কিছু তো রবে,
সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে
সুরের খেলা খেলো।
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো॥

ফাল্গুনের মাধবীলীলা
কুঞ্জ ছিল ঘিরে,
চৈত্রবনে বেদনা তারি
মর্ম্মরিয়া ফিরে।
হয়েছে শেষ তবুও বাকি,
কিছু তো গান গিয়েছি রাখি,
সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে
সুরের খেলা খেলো।
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II না র্সা । র্গা র্ঋা -া I র্সা -দা । না না র্সা I -া -া । -া সমা মা I মা গা । -া মা মা I
মি ল ন রা ০ তি ০ পো হা লো ০ ০ ০ বা তি নে ভা র্ বে লা

I মা মপা । -মা -গা -া । মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা I
এ লো ০ ০ ০ ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে

I না দা । না না -দা II
ফে লো ফে লো ০

II র্সা র্গা । র্গা র্মা র্পা I র্গা র্মা । র্গা র্ঋা র্সা I নর্সা দা । দা না -র্সা I র্সর্গা র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I
স্মৃ তি র ছ বি মি লা বে য বে ব্য থা র তা প কি ছু তো র বে

I র্সর্গা র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I সা -মা । মা মা মা I মা মা । -া মা মা I মা মপা । -মা- গা -া I
সে টু কু নি য়ে গু ন্ গু নি য়ে সু রে র্ খে লা খে লো ॰ ॰ ॰

I মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা I না নদা । না না -দা II
ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে ফে লো ফে লো ॰

II র্সা -না । র্সা র্ঋা র্সা I র্সনা র্সা । না দা -পজ্ঞা I পা -ণা । ণা দা পজ্ঞা I পা দা । -া -া -া I
ফা ল্ গু নে র মা ধ বী লী লা কু ন্ জ ছি ল ঘি রে ॰ ॰ ॰

I পা -ণা । ণা ণদা পা I মা পা । পদা মপা মজ্ঞা I পা -া । পণা জ্ঞমা মজ্ঞা I ঋা সা । -া-া-া I
চৈ ॰ ত্র ব নে বে দ না তা রি ম র্ ম রি য়া ফি রে ॰ ॰ ॰

I দা দা । দা না -র্সা I র্সঋা র্ঋা । র্সা না র্সা I র্সর্গা র্গা । র্গা র্ঋা -র্সা I না র্সা । র্ঋর্সা নর্সা র্সদা I
হ য়ে ছে শে ষ্ ত বু ও বা কি কি ছু ত গা ন্ গি য়ে ছি রা খি

I র্গা র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I সা -মা । মা মা মা I মা মা । -া মা মা I মপা মগা । -া -া -া I
সে টু কু নি য়ে গু ন্ গু নি য়ে সু রে র খে লা খে লো ॰ ॰ ॰

I মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা I না দা । না না দা II
ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে ফে লো ফে লো ॰

ভ্রম-সংশোধন

মাঘ সংখ্যা বিচিত্রার স্বরলিপিতে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। স্বরলিপি ব্যবহারের পূর্ব্বে সেগুলি সংশোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

১। স্বরলিপির তৃতীয় ছত্রে সপ্তম স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'জ্ঞা' হইবে।
২। ঐ অষ্টম ছত্রে তৃতীয় স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'র্ঋা' হইবে।
৩। ঐ নবম ছত্রে দ্বিতীয় স্বর '-া' -র পরিবর্ত্তে 'পা' হইবে।
৪। ঐ দ্বাদশ ছত্রে দ্বিতীয় স্বর '-ঋা' -র পরিবর্ত্তে '-র্ঋা' হইবে।
৫। ঐ ঐ ঐ তৃতীয় স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'র্ঋা' হইবে।

বিঃ সঃ

কুর্কিহারের আবিষ্কার

কুমারী অশোকা চট্টোপাধ্যায়

কুর্কিহার গয়ার সতের মাইল পূর্ব্বে একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান। বুদ্ধদেবের জীবনীর সহিত এই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইহার পুরাতন নাম "কুক্কুট পাদ"। নিকটস্থ কুক্কুট পাদ গিরি হইতেই স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

বিখ্যাত চৈন পরিব্রাজক হি ওয়েন সাঙ্গ খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমূল্য ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কুক্কুট পাদ' গিরি ও তৎসন্নিহিত কুক্কুট পাদ বিহারের এক নাতিবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

সম্প্রতি এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মনোরম স্থানটি দর্শন করিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল বরোদা রাজ্যের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাটনায় ষষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মিলন হইতে গয়ায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত উক্ত স্থানে যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি কুর্কিহারের মাননীয় জমিদার রায় হরিপ্রসাদলাল কুক্কুট পাদ বিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে অন্যূন দুইশত মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। আবিষ্কারের ইতিহাস এইরূপ। একটি গোশালা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত হরিপ্রসাদ বাবুর ইষ্টকের প্রয়োজন হয়। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একটী স্থানে পুরাতন ধ্বংসাবশেষের প্রচুর ইষ্টক প্রোথিত ছিল, তিনি ঐ ইষ্টক খনন করাইয়া বাহির করিতে থাকেন। দুই একদিন খনন করাইবার পর তিনি প্রাচীর-বেষ্টিত একটা নাতিবিস্তৃত ঘর দেখিতে পান। ক্রমশঃ সেই ঘরের ভিতর দুই একটী মূর্ত্তিও দেখা গেল। তখন জমিদার মহাশয় ইষ্টক খননে মনোযোগ না দিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতে মূর্ত্তি বাহির করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই ঘর খুঁড়িয়া একটী একটী করিয়া প্রায় দুই শত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেব-দেবীর, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার মধ্যে একটী মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটী বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের। মূর্ত্তিটীর ভিতরদিক অষ্টধাতু নির্ম্মিত, বহির্ভাগে পুরু সোনার পাতে মোড়া। দেবতা ললিতাসনে উপবিষ্ট, বাম পদ পদ্মাসনে স্থাপিত, দক্ষিণ পদ নিম্নে লম্ববান, এবং পদতলে একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত পদ্ম। দুই পার্শ্বে দুই হস্তে পদ্ম স্থাপিত। ইহা বোধ হয় মগধ শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কারুকার্য্যের তুলনা নাই। ইহার মুখের ভাব, শরীরের ললিত ভঙ্গী দর্শকের মনে এক নিরুপম ভাব আনয়ন করে। অবলোকিতশ্বের করুণার দেবতা। ইঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভঙ্গীতে ভাবে সর্ব্বত্রই যেন করুণা বিজড়িত রহিয়াছে।

অবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী হরগৌরীর মূর্ত্তি ছাড়া বাকী সমস্তই বৌদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যেটী সেটী প্রায় তিন ফুট উচ্চ। এই বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি অনেকটা মথুরা শিল্পের ধাঁচে তৈয়ারী। মাঝারি মাপের মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি। এইগুলি অপেক্ষা ছোট মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধদের সঙ্ঘের নানা দেব-দেবীর। সমস্তই মগধ শিল্পের অভ্যুদয় কালের তৈয়ারী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল রাজাদিগের রাজত্বকালীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেশীর ভাগ মূর্ত্তি মগধ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ইহার ভিতর কতকগুলি মূর্ত্তি একেবারে দুষ্পাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্মধ্যে কুরুকুল্লার মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেবীর চারিটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। চারিটীতেই দেবী চতুর্ভূজা, এবং পদ্মাসনস্থা। দক্ষিণ দুইটী হস্তের একটীতে বাণ, অপরটীতে অভয়মুদ্রা প্রদর্শিত, দুইটী বাম হস্তে ধনু এবং পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী

তারা, অষ্টভূজা তারা, ধ্যানিবুদ্ধ, বজ্রাসন, মঞ্জুঘোষ, বাগীশ্বর ইত্যাদি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

কুর্কিহারের জমিদার মহাশয় মূর্ত্তিগুলি রক্ষার নিমিত্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। নির্ম্মাণের এক মাসের মধ্যেই নিকটস্থ হিন্দুরা মূর্ত্তিগুলির পূজা আরম্ভ করিয়াছে, এবং মন্দিরে ফুল ও পয়সা অনেক পড়িয়া আছে দেখিলাম। কুর্কিহার মূর্ত্তির একটী মিউজিয়ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপরিকথিত জমিদারবাটীর নিকটে একটী কালী মন্দির আছে, এই মন্দিরের চাতালের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তি গাঁথা আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে প্রাচীর-গাত্রেও প্রচুর বৌদ্ধমূর্ত্তি গাঁথা, বাহিরে অসংখ্য মূর্ত্তি ছড়ান।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সকলগুলিই অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝা যায় আততায়ীর ক্রুর দৃষ্টি মূর্ত্তিগুলির উপর কখনও পতিত হয় নাই।

মন্দিরের গর্ভাগারের প্রধান মূর্ত্তিটী যদিও কাপড়ে ঢাকা ছিলো তথাপি উহা যে দুর্গার মূর্ত্তি তাহা চিনিতে বিলম্ব হয় নাই; কারণ, দেবীর পদযুগল সিংহের উপর স্থাপিত, নিকটে মহিষ, তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন, কর্ত্তিত মহিষের দেহ হইতে মহিষাসুর অর্দ্ধ-বহির্গত—দেবীর পাদপীঠে।

মন্দিরস্থ অপর মূর্ত্তিগুলির ভিতর লম্বোদর, জাম্ভোল, মঞ্জুশ্রী, চুন্দা,—এই মূর্ত্তিগুলি দেখিবার যোগ্য।

যাঁহারা মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে কুর্কিহার তীর্থস্থান স্বরূপ।

এই নূতন আবিষ্কার মগধ-শিল্পের উপর যে নূতন আলোক প্রদান করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

কুমারী অশোকা চট্টোপাধ্যায়
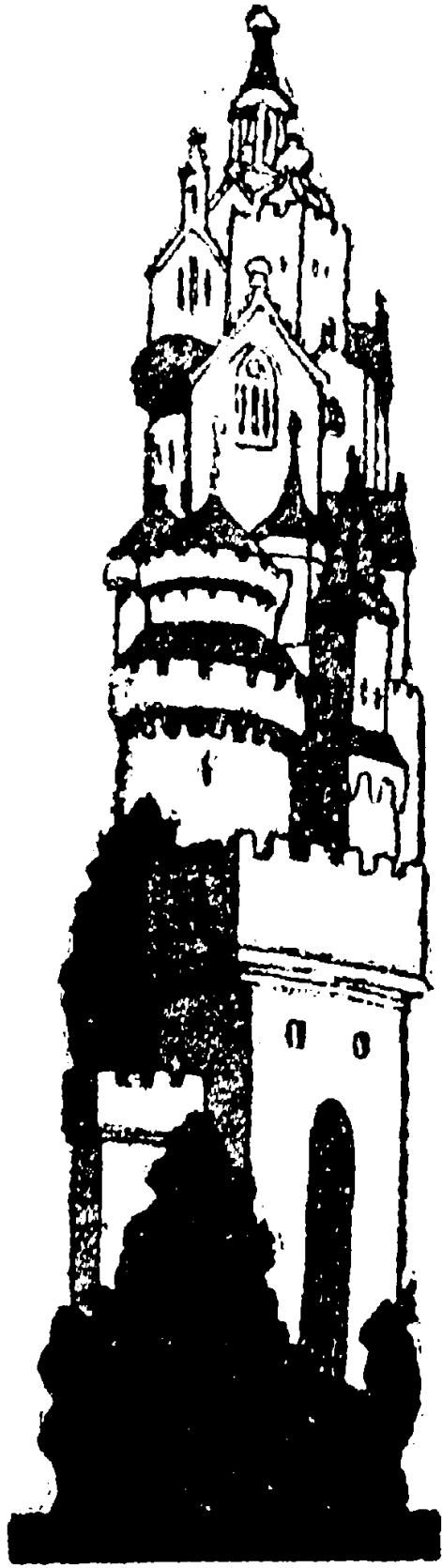
সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৪৬

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি তো। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি!

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগ্‌ল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতিবৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে কর্‌লেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব কর্‌ল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব কর্‌ল অমনি আশ্চর্য্য হলো ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায় উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠ্‌ল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদশারা বাতায়নে দাঁড়ালে প্রতীক্ষমান ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক কর্‌তেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

চুরি করে দর্শন কর্‌তে কর্‌তে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। বীণার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বীণা ফিক্ করে হেসে মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার সময় ছিল না যে দাঁড়ায়। স্বামীর কলেজের বেলা হলো। তিনি প্রাইভেট টিউশনি কর্‌তে গেছেন, এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়্‌বেন। ভাবটা এই যে, আজ নাই বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটীর দরখাস্ত করে দিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দুটো কথা কই। স্বামীটি জানে প্রিন্সিপাল যদি বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করবে স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখ্‌তে দেবে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো আজকে রাশি রাশি কথা কইতে হবে, দিস্তা খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাবতে ভাবতে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা ফিক্ করে হেসে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কি মনে কর্‌ছিল কে জানে! উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের ষ্টাডি'তে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ কর্‌বে। এত বড় উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয় তো এজন্যে তাকে অশ্রদ্ধাও কর্‌তে পারে।

বাদলের ষ্টাডি'র দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙানো ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটি মটো। "Repentance is a sin." উজ্জয়িনী তার মানে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। পৃথিবীতে এত কথা থাক্‌তে বাদলের ঐ একটি কথা মনে ধর্‌ল কোন গুণে? সবাই তো ওর উল্টাটাই বলে। অনুতাপ কর্‌লে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ কর্‌লে পাপ হয়। এ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখ্‌লে মন্দ হয় না। ভালো কথা সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল, একবারের বেশী পড়া হয়নি, অথচ বহুবার না পড়্‌লে ঠিক্ ঠিক্ অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়্‌তে বস্‌ল।

সুধী লিখেছে:—

প্রীতিভাজনাসু,

বাদলের সংবাদ জানিবার জন্য আপনার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকিবে বলিয়াও বটে, আবার দেশভাষায় কথা

কহিয়া আমিও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিব, এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবিতেছি আমার এ পত্রখানি যখন ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসার মতো প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার পুরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করিতে করিতে ক্ষীণকণ্ঠ হইবে তখনো কি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইবে না, তিনি উত্তর দিতে একান্ত বিলম্ব করিবেন?

দেশে থাকিতে আমরা থার্ডক্লাস্ গাড়ীর যুগল পক্ষিরাজ ছিলাম। দেশের গতির ছন্দে মিল দিয়া আমরা দুই বন্ধুও ধীরে সুস্থে হাঁটিতাম ও আস্তাবলের বাহিরে বন্ধু খুঁজিতাম না। তবে ঠিক অসামাজিকও ছিলাম না। বিলাত দেশটা মাটীর হইলেও মাটীর গুণে ফসলের বাড় বেশী বা কম। দেখিতেছি বিলাতে আসিয়া বিলাতের গতিচ্ছন্দ আয়ত্ত না করিলে মরণং ধ্রুবম্। বাদল বুদ্ধিমানের মতো গাড়ীটানা ঘোড়ার কাজে ইস্তফা দিয়া ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বনিতেছে। আমিও মোটর গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়া খোঁড়া হইয়া মরি কেন, পিঁজ্রাপোলে আশ্রয় লইয়াছি। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এদেশের অনেক সংখ্যক না-মঞ্জুর ঘোড়ার সঙ্গে আমিও জাবর কাটিতেছি।

এদানীং খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর মোলাকাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রতি বুধবার। বাদলকে আপনার হইয়া বহু অনুরোধ উপরোধ করি, সে কি কথা শোনে? সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। গভীর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো প্রশ্ন করে, "এঁ্যা, কী বল্‌ছিলে?" আপনার কথা পাড়িলে বলে, "ওঁকে কিছু নতুন প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিতে রোজই ভুলে যাই, ভদ্র মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।"

বাদল অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইংরাজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ বৎসর বয়সে যাহা হইয়া উঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তাহা হইতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ ততদিনে ইংরাজ সন্তান চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়াছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বাঁচিয়াছে বিশবৎসর। অন্য কথায়, ইংলণ্ডে জন্মাইয়া বাদলের সম-বয়সীরা বিশ বৎসর ষ্টার্ট্ পাইয়া গেছে এবং সে ষ্টার্ট্ কোনো মতে হ্রস্ব হইবার নয়। তথাচ বাদল উঠিয়া পড়িয়া দৌড়াই-তেছে, ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হইতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ করিতেছে, ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বাহিয়া চলিয়াছে। ইংরাজশিশু জন্মলাভ করিয়া দেখে উহার জন্য একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করিয়া আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি উহাকে নানা সূত্রে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরাজ করিয়া তুলিতেছে। কিছুটা সে কাণে শুনিয়া শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখিয়া ও অবস্থায় পড়িয়া। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর উহার দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন। টাকাকে গলাইয়া নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থ লেখাকে মুছিয়া আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্ব্বে বাঙালী কখনো ইংরাজ কিম্বা ইংরাজ কখনো বাঙালী হইতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইয়া বা বহুদিন হইতে একত্র থাকিয়া আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হইতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্মৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইংরাজ হইতে চাহিতেছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের মতো আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিত তবে দুঃখিত হইলেও বিস্মিত হইতাম না, কিন্তু কোন দিন সে বলিয়া বসিবে, "তুমি আমার ভারত-বর্ষীয় বন্ধু, যখন ভারতপ্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়।"

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা করি, অবধান করুন। শুভ্র আকাশ হইতে রাশি রাশি শেফালী অতীব ধীর মন্থর ভাবে ঝরিতেছে! জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু হাত কন কন করে না। ইংলণ্ডের বর্ষা বর্শার ফলার মতো বেঁধে। বৃষ্টির ফোঁটা যে ভয়ানক ঠাণ্ডা হইতে পারে অনুভব করেন নাই। কিন্তু বরফের থোপা বড় মোলায়েম ও ঈষৎ শীতল-স্পর্শ।

যে বরফ খা'ন সে বরফের কুচি জমাট ও কঠিন। এ বরফের পাউডার ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়।

এ বাড়ীতে একটি শিষ্ট বালিকা থাকে, তাহার নাম মার্সেল। বোধ করি তাহার পরিচয় দিয়াছি। লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে দেখিতে চান তো মার্সেলকে দেখিয়া যান। আজ রবিবার, আজ আমাকে বাহিরে যাইতে দিবে না, আমাকে তাহার ঘোড়া সাজাইবে। থার্ডক্লাশ ঘোড়াকে সহজেই চেনা যায়, মেয়েদের স্বাভাবিক ইন্‌টুইশন বশত মার্সেল আরো সহজে চিনিয়াছে। চিঠিখানাকে আরেকটু দীর্ঘ করিয়া সেই অশ্বারূঢ়া ঝাঁসীর রাণীর মসীচিত্র আঁকিয়া দেখাইব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু লাগামে টান লাগিতেছে। অগত্যা উঠিতে হইল। নমস্কার জানাই। ইতি। বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ।

৪৭

মার্সেলের কাণ্ড পড়ে উজ্জয়িনীর কৌতুক বোধ হচ্ছিল। ইংলণ্ডের মেয়েগুলোও কম বাঁদর নয়। সুধীবাবুর মতো একজন দার্শনিক মানুষকে হামাগুড়ি দেওয়ায়। দেয় সপাং করে এক চাবুক। সুধী না হয়ে বাদল হলে কেমন জব্দ হতো! (মার্সেল নয়, বাদল জব্দ হতো!)

কিন্তু বাদল থাকে দূরে, বীণা থাকে অদূরে। বীণার টানই প্রবল। উজ্জয়িনী সুধীবাবুকে কী লিখবে ভেবে তাঁর চিঠিখানা খুলেছিল ভুলে গেল। একবার বীণাকে দেখে এলে হয় না? এবার কিন্তু খুব সন্তর্পণে, বীণা যাতে টের না পায়। শুধু বীণা নয়। বীণার স্বামীও এতক্ষণে ফিরেছেন, তিনিও টের পাবেন আর মুচ্‌কি হাস্‌বেন। ভারি লাজুক ভদ্রলোকটি। সুন্দর চেহারা, ঋজু ও তন্বু গড়ন, সুকুমার স্বভাব। বীণার স্বামী না হয় বীণার স্ত্রী হলেন না কেন? অসাধারণ ফর্সা, তবু প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, নম্রতার অবতার। মৌনতারও। কলেজে বেশী বক্‌তে হয় বলে বাড়ীতে শক্তি সঞ্চয় করেন।

উজ্জয়িনীকে বীণার আকর্ষণ কি কমলের আকর্ষণ কোনটাতে টান্‌লে বলা যায় না। উজ্জয়িনী এবার সযত্নে নিজেকে গোপন কর্‌ল। দেখ্‌ল স্বামীটি খাচ্ছে আর স্ত্রীটি এমন ভাবে তার থালার দিকে হাতের দিকে মুখের দিকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাকাচ্ছে যেন একটি সূর্য্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। যেন স্বামীর আহারলীলা নিরীক্ষণ করার মধ্যে স্ত্রীর নিজের আহার-ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। বাদল উজ্জয়িনীকে কোনো দিন এমন সুযোগ দেবে কি? যদি দেশে ফেরে তবে দুর্দ্ধর্ষ জন্‌বুল্ হয়ে ফির্‌বে, স্ত্রীর সেন্টিমেন্টের মর্য্যাদা বুঝবে কি? এমনি করে দিনের তুচ্ছ কাজগুলির ভিতর দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী আত্ম-নিবেদন করবার ছল খুঁজবে, কিন্তু পাবে না। উজ্জয়িনী না হয়ে বীণা হয়ে জন্মালেও বীণার ভাগ্য পেলে বুঝি উজ্জয়িনীর ক্ষোভ থাক্‌ত না।

বীণার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে উজ্জয়িনী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব? উজ্জয়িনীদের সমাজের রীতি এই যে দু'পক্ষেরই কোনো একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা পরিচিত লোকে দু'জনকে আলাপ করিয়ে দেবেন। গায়ে পড়ে আলাপ করা অসিদ্ধ এবং আকস্মিক আলাপ পরে অস্বীকার্য্য। উজ্জয়িনী মহিমচন্দ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "বাবা, ও বাড়ীর কেউ আমাদের এখানে আসেন না কেন?"

মহিম বল্লেন, "কমল বাবুদের কথা বল্‌ছ? কই কোনো দিন তো আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।"—এই বলে খানিক অট্টহাস্য করে নিলেন!

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য্য সিদ্ধ হলো না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার দু' পাঁচজন ডেপুটী মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের "ওঁদেরকে" একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপ্‌না থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে দুঃসাহসের কাজ করেন নি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারো "ওঁরা" একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘট্‌তে থাক্‌ল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার যা ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই

। চিন্তিতপূর্ব্ব ? দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রে যে হাস্য-বিনিময়টুক্
়র সেটাও কি আকস্মিক ?

সংকোচ কেটে যেতে লাগ্‌ল। উজ্জয়িনী জানালার থেকে
়রে যায় না, বীণা ত্রস্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না।
আহা, উভয়ের বয়স যদি আরো কম হতো ! তখন হয় তো
়'জনে একই ইস্কুলে যেত, একই জায়গায় খেলা কর্‌ত।
ইস্কুলের কথা মনে পড়ায় উজ্জয়িনীর আফ্‌শোষ হতে লাগল,
়কেন অবুঝের মতো অকালে ইস্কুল ছাড়্‌ল। তখন কী
ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে, কোনো মেয়ের
সঙ্গে তার বন্‌ত না, ওরা তাকে মার্‌ত কিম্বা ক্ষ্যাপাত অথচ
সে কারো গায়ে হাতটি তুল্‌ত না কিম্বা মুখ ফুটে প্রতিবাদ
কর্‌ত না। একদিন বাবাকে বল্ল, "আর ইস্কুলে যাব না।"
বাবাও বাধা করলেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাষ্টারি কর্‌তে
সুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক
শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে তাদের জগতে
প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়্‌লে পড়াশুনা
হতো না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয়
তাই হতো—হতো সখ্য, হতো অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হলো বাদলকে যে সে নিজের প্রতি
আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌ল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা
নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা
বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে
বল্‌তে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত
যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে
নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য্য আছে
উজ্জয়িনীতে তা কই ? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল
এত একাগ্রভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা কর্‌ত না। তার
তপশ্চর্য্যায় বীণার মুখখানি হতো ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয়
তো তার জীবনের ব্রত হতো বীণাকে সুখী করা, বীণাই
হতো তার ধন ও মান, যশ ও কীর্ত্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কী দশা হতো ! সে যে
বড় বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান,
একান্ত স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মা'র হাতে থেকে
স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে,
উজ্জয়িনী কিছুতেই সইতে পার্‌ত না। বাদল যদি কমল
হয়ে থাক্‌ত তবে উজ্জয়িনীর ক্ষোভ দূর হতো না, এক
ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নিতো। স্বামীর ভালবাসা
পাওয়ার থেকে বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা কর্‌তে পারা।
উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণখুলে এসব কথা না কইলে কাকে
কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব কর্‌বে ?
বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না।
বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের নয়। একটি সখী তার চাই-ই
চাই। এ যে অভাব, এর মতো অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক্ করল বীণার
সঙ্গে যেচে আলাপ কর্‌বে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান
করে তা হলে যে সে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সেকথা ভাব্‌তে
তার মাথা ঘোরে, সেকথাকে সে বলপূর্ব্বক চাপা দিল
না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আ
কখনো এই জানালা খুল্‌বে না এবং আর কখনে
কারো সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জান্‌বে যে তাকে
পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া
পৃথিবীর কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীর
বাইয়ের মতো ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌বে এব
হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন কর্‌বার জন্যে সংসা
ত্যাগ কর্‌বে। তার বাবা ছাড়া অন্য সকলে ক্রমশঃ ভুলে
যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

৪৮

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সৌভাগ্য এলো। বী
নয়, মলিনা মেয়েটির নাম। একদিন মা'র সঙ্গে মহিমচন্দ্রে
বৌমাকে দেখ্‌তে এসে বলে গেল, "আমি আবার
আস্‌বই, এলে আপনাদের লাইব্রেরী থেকে নড়ব
দেখ্‌বেন।" (ইংরেজীতে)

পরিচয়ের ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক্।

মহিমচন্দ্রের উকীলবন্ধু সুবল একদিন দুপুরবেলা তাঁ
স্ত্রীকে ও কন্যাদ্বয়কে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করে আস্‌বা

অনুমতি দিলেন। গিন্নীটি বড় ভাল মানুষ। এসেই বল্লেন, "মা, রোজ আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না, জানোই তো বৃহৎ পরিবারের অসুবিধে। নইলে তোমার এখানে মা নেই, বোন নেই, শাশুড়ী নেই শুনে অবধি প্রাণে যে উন্মাদনা বোধ করছি, মা, সে আর কি বল্‌ব? তুমি আমার মেয়ের মতো, তুমি তো সব বোঝো।" এক নিঃশ্বাসে এই পরিমাণ কথা বলে ধুঁক্‌তে লাগ্‌লেন। উজ্জয়িনী চট্ করে একখানা পাখা ও এক গ্লাস জল আনিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিম্ন স্বরে বল্লেন, "বাবা সিবিল সর্জ্জন?

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ভাই বোন কটি?"

"ভাই নেই, বোন দুটি।"

"আহা, ভাই নেই! একেবারেই নেই!"—ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হলো তিনি পরম উন্মাদনা বোধ করছেন। উজ্জয়িনীও যেন এই প্রথম একটি ভাইয়ের অভাব বোধ করল। তার চোখ ছল ছল করল।

মলিনা ও মিনতি মা'র কথাবার্ত্তার সেকেলে ধরণে মনে মনে চটে গেছ্‌ল। মা'কে থামাতেও পারে না। অত্যন্ত অসহায় অথচ অপ্রসন্নভাবে তারা শুনতে লাগ্‌ল মা বলছেন, বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, রাজার মেয়ে। দেখে প্রাণ প্রফুল্লিত হলো। আর আমার মেয়ে দুটোর ছিরি ছাখো। এখনো বি-এ পাস করতে পারল না। হাঁ মা, তুমি তো এম-এ পড়া মেয়ে—

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বল্ল, "আজ্ঞে না, আমি ম্যাট্রিকও পড়িনি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার বিদ্যার দৌড় নেক্‌স্থ্‌ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

মলিনাদের মা টিপ্পনি কাট্‌লেন, "ছাখ্ তোরা, দেখে শেখ্, বিনয় কাকে বলে। কত জ্ঞান আহরণ করলে তবে বল্‌তে পারা যায় আমার বিদ্যার দৌড় লাষ্ট ক্লাস্ পর্য্যন্ত। কে যেন ইংরেজ কবি বলে গেছেন, আমি বেলা-ভূমিতে বালুকাখণ্ড সংগ্রহ করেছি?"—

মিনতি মা'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "কবি নয় মা, scientist। স্যর আইজাক নিউটন, যিনি Laws of Gravitation আবিষ্কার করেন।"

মলিনা উজ্জয়িনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বল্ল, "আবিষ্কার করে কি result হলো; আজ তো আইনষ্টাইন এসে সব explode করে দিলেন?"

উজ্জয়িনী সবিনয়ে বল্ল, "না, ঠিক্ উল্টে দেননি। দেখুন, এ সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও এত কম বোঝেন যে আমাদের এ-পক্ষে বা ও-পক্ষে কোনো রায় দেওয়া সাজে না।"— বলেই উজ্জয়িনী রেঙে উঠ্‌ল।

মলিনার মা বল্লেন, ঠিক বলেছ মা। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ঐ যে বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল,' ওই হয়েছে আমাদের দশা। A little knowledge is dangering thing.

মিনতি চোখ টিপে উজ্জয়িনীকে বল্ল, "She is a living proof of that saying.

মলিনা বল্ল, "I should call her a veteran example and a warning."

মা কিম্বা মেয়ে কারুকেই উজ্জয়িনীর মনে ধর্‌ছিল না। সে টের পেয়েছিল যে মা'তে মেয়েতে বিদ্যা সংক্রান্ত ঈর্ষা ও অভিমান থেকে তাদের সম্বন্ধের স্বাভাবিক মধুরতাকে পরের পক্ষে অনুপভোগ্য করছে, যেমন চিনির মধ্যে কাঁকর। মেয়েরা উজ্জয়িনীকে মা'র চেয়েও আপন মনে করছে—কিন্তু কেন? সমবয়সীদের মধ্যে একটা দলগত চক্রান্ত আছে অসমবয়সীদের বিরুদ্ধে—তাই কি? প্রাচীন ও নবীন, একের গর্ভে অপরের জন্ম, তবু উভয়ে উভয়ের শত্রু। কথাটা সে কোন্ বইয়ে পড়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা করল।

উজ্জয়িনী তাঁদের কিছু জলযোগ করিয়ে বাড়ীর নানা অংশ দেখিয়ে বিদায় দিল। তাঁরা বাদলকে ভালো করেই চিন্‌তেন, সুধীকেও। সুধী ও বাদল কেমন আছে, কি পড়্‌ছে, কবে ফিরবে ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করছিল বীণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না প্রথম দিনে অতটা ভালো দেখায় না।

মলিনা ও মিনতি এই দুজনের মধ্যে মলিনাকেই তার যা কিছু ভালো লাগ্‌ল। দুই বোনেরই প্রধান দোষ তারা

উজ্জয়িনীর উপর নিজেদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে উৎসুক। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার বিবরণী দিল। মলিনা বি-এ দিচ্ছে আগামী বৎসর, মিনতি এইবার আই-এ দেবে। দুজনেই বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ে। পাটনায় মেয়েদের কলেজ নেই। মলিনার মধ্যে কিছু গভীরতা আছে। সে উজ্জয়িনীর লাইব্রেরী দেখে বল্ল, "আপনার সঙ্গে আমার রুচি খাপ খাবে। আমিও বিজ্ঞান ভালোবাসি কিন্তু শেখায় কে? সস্তায় মাষ্টার পাওয়া যায় বলে দু'জনেই হিষ্ট্রী ও সংস্কৃত পড়ি।" (ইংরেজীতে)

মিনতি বল্ল, "আচ্ছা, আপনার কাছে এল্ মুখার্জীর ইংলিশ্ হিষ্ট্রীর নোট্ আছে? নেই? আহা, ভুলে গেছলুম আপনি কলেজে পড়েননি। আমি কিন্তু এইবার কল্‌কাতা গিয়ে ডাইওসিসানে ভর্ত্তি হবোই।" (ইংরাজী)

এমনি করে সুবলবাবুর দুই কন্যার সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ পরিচয় হলো। এবং মলিনা আশা দিয়ে গেল যে সে শীঘ্রই একদিন আসছে। মিনতির ভাব দেখে বোধ হলো সে উজ্জয়িনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ফির্‌ল। বিলেত-ফেরতের মেয়ে, অন্ততঃ ইংরেজীটা বল্‌তে পারা তার পক্ষে মাতৃভাষার মতো হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মিনতিরা যতবার চার ফেলে মাছটি কোনোবার ধরা দেয় না। উজ্জয়িনী একটিও ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ কর্‌ল। মিনতি বোধ হয় ভাবছিল যে বাদলটা যাকে তাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে, বিশেষ যখন এক পাড়াতেই মিনতির মতো মেয়ে রয়েছিল। কেন, উজ্জয়িনীর চাইতে সে কিসে কম যায়? উজ্জয়িনীকে সে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার বাবা হাইকোর্টের ভকিল ও ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিক্। মেয়েকে তিনি বিলেত পাঠাতেও পারেন। তবে মা'কে রাজি করানো শক্ত। মিনতি যতক্ষণ বক্ বক্ করছিল মলিনা ততক্ষণ তন্ময় হয়ে যোগানন্দ-প্রেরিত "Jesting Pilate" এর পাতা ওল্‌টাচ্ছিল ও মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল। উজ্জয়িনী যে এ জাতীয় বই পড়ে বুঝতে পারে এ বিষয়ে তার হয় তো সন্দেহ ছিল, তবু স্থানে স্থানে সমঝদারের মতো লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখে সে উজ্জয়িনীর বিদ্যার প্রতি মোটের উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ছিল। অন্ততঃ তার ভাব থেকে উজ্জয়িনীর তেমন অনুমানের কারণ ছিল।

ওরা চলে গেলে উজ্জয়িনী কতকটা আশ্বস্ত হলো। মলিনা বীণা নয়, বীণা বল্‌তে যত কিছু বোঝায় মলিনার মধ্যে তার অল্পই আছে, তবু মন্দের ভালো। বীণা যদি উজ্জয়িনীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে মলিনা তার অবলম্বন। আর কিছু না হক্ মলিনার সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা তো করা যেতে পারে। যদিও উজ্জয়িনীর মনটা সম্প্রতি জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল হতে অভিলাষ ছিল সিষ্টার নিবেদিতার মতো কোনোরূপ লোকহিতকর কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে। হঠাৎ ভ্রান্তের মতো বিয়ে করে বসল। বিয়ের স্বরূপ তো এই। উজ্জয়িনী তপস্বিনী হবে লোক চক্ষুর অন্তরালে। এত শীঘ্র নয় অবশ্য। বছর তিন চার স্বামীর প্রতীক্ষা করবে। তার পরে একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি স্বামী না ফেরে কিম্বা না ডাক দেয়।

যদি ফেরে কিম্বা ডাক দেয় তবে?—ভাব্‌তে উজ্জয়িনী লজ্জায় থর থর করে কাঁপে। না, সে সুখের তুলনা নেই। উজ্জয়িনী ধন্য হয়ে যাবে। বীণার মতো চব্বিশ ঘণ্ট পাগ্‌লামি করবে। বাদল যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু দূর হক্ এ সব বাজে চিন্তা। বাদল হয় তে এতদিনে কোনো 'স্বদেশিনীর' প্রেমে পড়েছে।

৪২

মেল্-ডের একদিন আগে মহিমচন্দ্র বল্লেন, "বাদলকে কিছু লিখ্‌বে, মা? অবশ্য জবাব পাবে সুধীর।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "থাক্, বাবা। তাঁর ধ্যানভঙ্গ করব না সোজা সুধীবাবুকেই কিছু লেখ্‌বার আছে তাঁর পত্রে উত্তরে।"

মহিম খুসীই হলেন। বাদলের এটা ব্রহ্মচর্য্যের বয়স গার্হস্থ্যের দেরী আছে। তিনি বর্ণাশ্রম বিশ্বাসবান। যদি নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেননি। তবু গৃহিণীর অভাব তাঁর গার্হস্থ্যও তো অসিদ্ধ। তাঁর চিত্তে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই। পুত্রের শিক্ষার কাঞ্চনমূল্য সংগ্র

করতে হচ্ছে কলির অধ্যাপকরা নিষ্ক্রয় দাবী করছে বলে। নতুবা কামিনী কিম্বা কাঞ্চন কোনটাই বা তাঁর প্রেয় ?

উজ্জয়িনী বাদলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে চায় না, এজন্যে যোগানন্দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জাত হলো। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা তো বহু পিতা দিয়ে থাকেন, এমন চরিত্রশিক্ষা এ যুগে বিরল।

উজ্জয়িনী সুধীকে লিখ্‌ল :—

"আমি পাট্‌না এসেছি, খবর রাখেন ? যে সে সহর নয়, পাটলীপুত্র। তিনটি হাজার বছর এর বয়স। তার থেকে একটি হাজার বছর এ নগরী বিশাল ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীদের রাজধানী ছিল। আপনাদের লণ্ডনের এত দীর্ঘকাল এরূপ সৌভাগ্য হয়নি।

এর মাটী মাড়িয়ে চিরকালের জন্যে পবিত্র করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, আর রাজর্ষি অশোক। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ইত্যাদি কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত দার্শনিক কত কবি, কত জ্যোতির্ব্বিদ, এবং হিউয়েনৎ সাং ফাহিয়েনের মতো কত তীর্থযাত্রী। কল্পনাও পরাস্ত হয়, ইতিহাস তো স্মৃতির কঙ্কাল মাত্র। আমি অবসর সময়ে যতবার এই নগরীর অতীত চিহ্নহীন সিন্দূরকঙ্কণহীন বিধবা মাটীর দিকে তাকাই ততবার আমার সমগ্র সত্তা এর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। এর গায়ে পা ঠেকেছে, সেই কি কম অপরাধ ? অথচ এমন কুৎসিৎ সহর আমি অল্পই দেখছি। যারা একে কুৎসিৎ করে রেখেছে তারাই কুৎসিৎ। এই সব বালখিল্যের কল্পনা অল্প একটুখানি বর্ত্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ অবধি মারগের মতো ওড়্‌বার ভাণ করে। হয় তো এই পুণ্যভূমির কোনো অদৃশ্য স্থানে কোনো শাক্যসিংহ তপস্যা করছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যাঁদের হাঁক ডাক শুনি তাঁরা ক্ষণজন্মা নন, ক্ষণজীবী। আমার শ্বশুরের সঙ্গে যাঁরা গল্প করতে আসেন তাঁদের হয় তো অন্য সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আশা ও কল্পনা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের সমতুল নয়।

এত অল্প দেখে এত বড় বিষয়ে মত জাহির করতে আমার সাহস হয় না, তবু আমার যা সত্য ধারণা তাই আপনাকে বল্লুম। ক্ষমা করবেন তো ? দয়া করে দোষ ধরবেন না।

আপনার বন্ধুর অসাধ্য সাধন তাঁর প্রতি আমাকে সশ্রদ্ধ করেছে। কিন্তু কিসে যেন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের হাত খরচের টাকা, তার উপর অন্যের হাত খাটানো অন্যায়। বিবাহসূত্রেও এক জনের হাত খরচের টাকা অন্য জনের হয় না, হওয়া অনুচিত। কাজেই তিনি তাঁর জীবনের যেমন খুসী বিলি ব্যবস্থা করলে আমার একটি কথা বল্‌বার অধিকার নেই।

আমার বিয়ে আমার জীবনের সমস্ত ওলট পালট করে দিয়েছে। আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলুম লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করব, যেমন সিষ্টার নিবেদিতা করেছিলেন। সে আদর্শ কোথায় উঠে গেছে। আমাকে টান্‌ছে নামপরিচয়-হীন ভগবদ্‌ভক্তের জীবন। কিন্তু আপনার বন্ধুর প্রতি কী একটা কর্ত্তব্য আমার আছে—এ আমার সংস্কার থেকে বল্‌ছে। যুক্তি এক্ষেত্রে খাট্‌ছে না। একটি প্রতিবেশিনী মেয়েকে রোজ দেখি, আপনি হয়তো তার স্বামীকে চেনেন। থাক্, নাম করবো না। তার স্বামীই তার ভগবান। শাস্ত্রে লিখ্‌ছে শুধু তার কেন, সব মেয়ের পক্ষে তাই। এত বড় একটা কথা কি কখনো মিথ্যা হতে পারে ? আমার সাহস হয় না ভাব্‌তে।

পড়েছি দোটানায়। যদি স্বামীর জন্যেই প্রস্তুত হই—যা আমার পিতা, আমার শ্বশুর, আমাদের সমাজ আশা করেন—তা হলে একদিন নিরাশ হবো। স্বামী হয়তো ফিরবেন না এবং তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে দেখ্‌ব তিনি আমাকে চেনেন না ও চান না। পক্ষান্তরে যদি নিজের আদর্শ অনুসরণ করে পার-মার্থিক জীবনে মনোনিবেশ করি তা হলেও একদিন বিপন্ন হবো। স্বামী ফিরবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি তাঁর জন্য লৌকিক আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত থাকিনি।

এই সব ভাবি কিন্তু কাউকে বল্‌তে পারিনে। আপনাকে বলে মনটা হাল্‌কা হলোও বটে, আবার এই সম্ভাবনাও থাক্‌ল যে আপনি প্রসঙ্গটা আপনার বন্ধুর কাণে তুলবেন। বাবাকে লিখেছিলুম কেন এতদিন তিনি আমাকে ভগবান ও ভাগবত-উপলব্ধির কথা বল্লেন নি। তিনি তার উত্তরে

একখানি চটুল ও চাতুর্য্যপূর্ণ বই পাঠিয়েছেন—"Jesting Pilate". এবং লিখেছেন, 'তোর শ্বশুরের বয়সে যা স্বাভাবিক তোর বয়সে তা morbid. ভূত ছাড়ানোর জন্যে যেমন রোজার দরকার হয় ভগবানকে ছাড়াবার জন্যে হয় বৈজ্ঞানিকের। এই লেখকটি বৈজ্ঞানিকের পৌত্র ও নিজেও বৈজ্ঞানিকমনা। ইনি যদি বিফল হন তবে আমাকে Sthethoscope নিয়ে পাটনা রওনা হতে হবে। তোর শ্বশুর নানা জাতীয় সাত্ত্বিক আহার্য্যের সঙ্গে তোর মস্তিষ্কটি-তেও দন্ত-প্রয়োগ করছেন নাকি ? এই তো সেদিন এখান থেকে গেলি। এরি মধ্যে ভগবানে পেয়েছে ! চলে আয়, চলে আয়।'

যা কোনো দিন আশঙ্কা করি নি তাই ঘটতে যাচ্ছে। পিতাপুত্রীর মতভেদ। আমার বাবা যে আমার কী ছিলেন কেমন করে তা বোঝাবো ? আমি শুধু তাঁর দেহের সৃষ্টি নই মনের সৃষ্টিও। তবু দেখ্ছি তাঁর কাছে আমাকে বিদ্রোহী হতে হবে।"

কুশল প্রার্থনা করে ও মার্সেল সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে পরিশেষে উজ্জয়িনী লিখ্ল, "চিঠিখানা বড়ই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমার বয়স স্মরণ করে আপনি এতে পাকামির গন্ধও পাবেন। কিন্তু জানেন, অল্প বয়স থেকে আমি সঙ্গীমাত্রহীনভাবে একা থেকেছি, তাই আমোদ প্রমোদে ও হাস্যপরিহাসে সময়ক্ষেপ না করে কেবল পড়েছি ও ভেবেছি। অন্যান্য অবয়বের তুলনায় মস্তিষ্ক যদি কিছু বেশী পরিণতি পেয়ে থাকে তবে সেটা হয়তো আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেক্তেও পারে। তা বলে ভাব্বেন না যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র শীর্ণ শুষ্ক খর্ব্ব ক্ষীণ। মাগো, দিনকের দিন এমন মোটা হতে লেগেছি যে আপনার বন্ধু দেখ্লে হয় তো এই এক দোষে চিন্তে দ্বিধাবোধ করবেন।"

তাড়াতাড়ি ডাকে না দিলে সে সপ্তাহে যেত না। ডাকে দেবার পর একে একে কত ত্রুটি উজ্জয়িনী স্মৃতিসমুদ্রে নেমে ডুবুরির মতো উপরে তুলল। তাই নিয়ে তার অনুশোচনার অবধি রইল না। নিজের লেখার নিজেই যত কদর্থ করল সব গুলি যে সুধী বাবুও করবেন তার আর সন্দেহ কী !

এই সময় বাদলের মতো তার চোখের ভিতরে দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করল। "Repentance is a Sin". বটে ? উজ্জয়িনী তা হলে পাপ করছে ? শাস্ত্রেও বলেছে গতস্য শোচনা নাস্তি। তবু এ দোষ উজ্জয়িনীর স্বভাব থেকে যায় না কেন ?

বাদলের দেওয়া বীজমন্ত্রটিকে সে এখন থেকে জীবনের মূলধন স্বরূপ খাটাবে। বাদল তার দীক্ষাগুরু। সে পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্বিধাহীনভাবে এগোতে থাক্বে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত। কে কী মনে কর্বে সে কথা মনে করাই তো অনুশোচনার গোড়ার কথা ? আচ্ছা যে যা মনে করে করুক। উজ্জয়িনী যদি ভুলও করে ফেলে তবু অনুশোচনা কর্বে না, শুধু ভুলটার সংশোধন যদি সম্ভব হয় তবে কর্বে এবং ভবিষ্যতে যাতে অমন ভুল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ্বে।

৫০

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বল্ল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাবো।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা ! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ! এর রক্তমাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে স্তরকে স্তর উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাবো।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা ! কে তোমাকে এ মতি দিল, মা ? তোমার বয়সে আমরা কী খেতে বাকী রেখেছি ? যে বয়সের যেটা। ও সব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখো, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা করতে পারবে না, তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্য্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণ্লেন। সাহেব সুবোকে বাড়ীতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠ্বে না। স্বয়ং হোষ্টেস্ হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খেতেও ডাক্বে না। সবাই টিটকারী দেবে। বল্বে, আই-সি-এসের এমন বৌ ? যোগানন্দই বা কী ভাব্বেন ! ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা।

স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে কি তার শরীর থাকে ?

তবু তিনি মনে মনে খুসীও হ'লেন। এখন থেকে তাঁকে আর লুকিয়ে সাত্ত্বিক আহার সারতে হবে না।

বল্লেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাক্‌লে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাক্‌ল। মহিম ভাব্‌লেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীর শারীরিক শক্তিহ্রাসের ছিদ্র পেয়ে উজ্জয়িনীরও হলো।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়্‌তে না পারে গুছিয়ে ভাব্‌তে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, "নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাবো।"

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছটফট্ কর্‌ছিল। বারম্বার পাশ ফির্‌ছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুল্‌ছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বস্‌ল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ কর্‌ল। উজ্জয়িনী চম্‌কে উঠে বল্লে, "কে ?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেল্‌তে পার্‌ল না।

"কে ?"

"আমি।"—সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি ? মাফ কর্‌বেন, চিন্‌তে পার্‌ছিনে। মলিনা ?"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে বস্‌ল। কিন্তু এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মতো ভেঙে পড়্‌ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ কর্‌ল এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এলো। তার চুলগুলিকে একত্র করতে করতে বীণা তার মনের কথা নিজের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে শুন্‌তে পাচ্ছিল এবং সেই সুত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল! কোনোপক্ষে বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বল্লে, "কাল আস্‌ব।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মতো আট্‌কে রাখ্‌তে। বীণার জন্যেই তো তার এই দশা। এ কথা এখনো বীণাকে শোনানো হয় নি। কাল ? কালের কত দেরী! সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আস্‌বে। অসহ্য। তবু উজ্জয়িনী নির্ব্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল। বল্ল, "বহু ধন্যবাদ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর উত্তরে যে কী বল্‌তে হয় তাও তার জানা ছিল না। তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প। কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে দিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেকটা সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি কর্‌ছিল। হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ। কপাটে টোকা দিয়ে "আস্‌তে পারি কি ?" বল্‌তে হয় একথা বীণার জানা ছিল না। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী হয়ে যাওয়ায় সে বিষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামালো।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বসুন।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বস্‌বে ঠিক্ বুঝ্‌তে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়্‌ল। বসে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থের পাতা উল্টাতে লাগ্‌ল। দু'একটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেল্ল। কিন্তু একটিও কথা বল্‌তে পার্‌ল না। "আপনি আজ কেমন বোধ কর্‌ছেন" পর্য্যন্ত না।

উজ্জয়িনীও কি বল্‌বে ভেবে পেল না। অতিথি

এসেছেন। কিছু খেতে বল্‌বে কি? বস্‌বার ঘরে নিয়ে যাবে? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভালো ক'রে ধন্যবাদ জানাবে কি? অভাবনীয় ভাবে পরিচয়। কার কাছে খবর পেলেন যে আমার অসুখ করেছে?—কিম্বা এমনি কিছু প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। উজ্জয়িনী ঘেমে উঠ্‌ল।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়্‌ল। বল্ল, "আপনি বাংলা বই পড়েন?"

উজ্জয়িনী বল্ল, "কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

বীণা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা।"

তবু বীণা কথা বল্ল না। উজ্জয়িনী দেখ্‌ল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বল্ল, "আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবীভাবাপন্ন?"

বীণা বল্ল, "লোকে তো তাই বলে।"

"এবার যখন বল্‌বে তখন বিশ্বাস করবেন না। কেমন?"

"বল্লে আমি বল্‌ব, উনি 'যোগ ও সাধন রহস্য' পড়েন।"

"না, না, ছি, ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না আমি বড় লজ্জিত হবো।"

"কেন, লজ্জা কিসের? আমিও তো এই রকম বই পড়তে ভালোবাসি। কতগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কী!"

"তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন?"

"আমি ইংরেজী তেমন বুঝ্‌তে পারি নে, ভাই। থার্ড্‌ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।"

"তবে তো আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্স্‌থ ক্লাশ অবধি।"—উজ্জয়িনী ভাব্‌ল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা করবে।

বীণা বল্ল, "তা হলেও ইংরাজী আপনার পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভালো জানে। উনি জানেন কি না আপনার বাবাকে।"

"সত্যি? বাবাকে লিখ্‌ব আমি এ কথা।"

এর পরে দু'জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

ফাগুনে

শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু

এসেছে ফাগুন গোপনচরণে স্বপনের সম চুপে,
নয়নের পথে ফিরে এলো সে যে অপরূপ নব রূপে।
আজ বরণের শত শত ধার
ছড়ায়ে পড়েছে ভরি চারি ধার,
সহসা নিথর বনভূমি আজ সচকিত পাখীগানে,
মৌন দুপুর নয়ন মেলেছে মৌমাছিদের তানে।
মানবের মাঝে যদি বা রিক্ত, নহি তো জগতে নিঃস্ব—
আছে ফুলভরা শ্যামল ধরণী আলোভরা আছে বিশ্ব।

ভেসে আসে কত স্বপ্ন সুদূর,
কত স্মৃতিকথা গন্ধবিধুর,
আমের মুকুল সৌরভে কত অতীতের কলরোল,
পলাশের বনে আজিকে লেগেছে ফাগুনের ফুলদোল।
মর্ম্মে আমার দোল দিয়ে গেছে উতল বিভোল হাওয়া,
চেয়ে থাকাতেই শেষ হ'ল আজ যত ছিল চাওয়া-পাওয়া।
দৃষ্টি হারায় ঘন নীলিমায়,—
মন ভেসে যায় প্রাণ ভেসে যায়,—

নদী বহে যায় রূপালী ধারায় আজি পূর্ণিমা সাঁঝে,
আজিকে পেতেছি চন্দ্রবাসর আঁধার হিয়ার মাঝে।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

কার্ল্ স্পিট্‌লার (Carl spitteler)

জন্ম—১৮৪৫ ; মৃত্যু ১৯২৫ ; প্রাইজলাভ—১৯১৯

১৯১৮ সালে সাহিত্যে কাহাকেও নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় নাই। ১৯১৯ সালের নোবেল পুরস্কার সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কবি কার্ল্ স্পিট্‌লার প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে লাভ করেন। লিষ্টালে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর পিতা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জাতিতে সুইস্ হইলেও ইহাঁর সমস্ত লেখাই জার্ম্মাণ ভাষায়।

কার্ল স্পিট্‌লার

অল্প বয়সেই সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিজের চিত্রকর হইবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও পিতার আপত্তিতে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি এজন্য দুঃখিত ছিলেন। পড়াশুনা শেষ করিয়া স্পিট্‌লার প্রায় আট বৎসর রুশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডে দুইটি রুষ পরিবারে গৃহ শিক্ষকের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য "প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস" রচনা করেন ও প্রথমে তাহা ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। প্রমিথিয়ুস একটি মহান্ আত্মার কাহিনী। আদর্শ ও ন্যায়ের জন্য সে আত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত। ভাবের গভীরতায় সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই কাব্য অতুলনীয়। অনেকের মতে ইহাতে তিনি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শের Thus Spake Zarathustra গ্রন্থখানির অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু স্পিট্‌লার একখানি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন ও বলেন যে প্রমিথিয়ুস লিখিবার পূর্ব্বে তিনি নীট্‌শের উপরোক্ত পুস্তকখানি পড়েন নাই।

১৮৮৩ সালে স্পিট্‌লার বিবাহ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই "প্রজাপতি" নামে তাঁহার একখানি গীতি-কবিতার পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার ছন্দ-বৈচিত্র্য ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা উল্লেখযোগ্য। বিবাহের বৎসর দুই পূর্ব্বে স্পিট্‌লার টাকাকড়ি সম্বন্ধে স্বাধীন হন ও চাকরী ছাড়িয়া ল্যুজার্ণে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকেন। এখানকার রমণীয় দৃশ্য তাঁহার কবিচিত্তে নূতন প্রেরণা আনে। "Laughing Truth" এই সময়ের লেখা। ইহা কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে নানাবিষয়ের সমালোচনা আছে। সত্য কথাকে তিনি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আবরণে ঢাকিয়া বলিয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক নীট্‌শে প্রবন্ধগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্পিট্‌লারের রচনাবলীর ভিতর "অলিম্পিয়ার বসন্ত" (Olympian Spring) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এই সুবৃহৎ মহাকাব্যে পাচটী খণ্ড ও ত্রিশটী কাণ্ড আছে। ইহাতে পৌরাণিক কাহিনীর সহিত

আধুনিক ভাব ও রূপ, সমস্যা ও ব্যঙ্গ একত্রে মিলিয়াছে। দুঃখ, কষ্ট ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া আত্মার বিজয় কাহিনী কাব্যগুলির মূল বর্ণনীয় বিষয়। সমালোচকগণ "অলিম্পিয়ার বসন্ত"কে "নবযুগের ডিভাইন কমেডী" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গল্পরচনার ভিতর তাঁহার "লেপ্টেন্যান্ট কনরাড" ও "ইম্যাগো" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জীবনের শেষভাগে তিনি পুনরায় "প্রমিথিয়ূস" নামে একখানি কাব্য লেখেন। মূল বিষয় এক হইলেও ইহা তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

"বাল্যস্মৃতি" শিশুমনস্তত্ত্বের সুন্দর ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য চিত্র। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি। এরূপ পুস্তক বিশ্বসাহিত্যে অতি অল্পই আছে।

ফ্রান্সে ও জার্মানীতে স্পিট্‌লার যথেষ্ট সমাদৃত ছিলেন। তবে গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে বেল্‌জিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় তিনি জার্ম্মাণীর বিপক্ষে দু'চার কথা বলেন, ও সেজন্য জার্ম্মানরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠে। কিন্তু স্পিট্‌লার ইহাতে বিচলিত হন নাই। নিন্দা ও প্রশংসায় সমান ভাবে অবিচলিত থাকিতেন।

তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। রাজনীতি, সাহিত্য বা ধর্ম্ম কোন দলের সঙ্গেই তাঁহার কোন যোগ ছিল না। দুই কন্যা ও পত্নীর সহিত তাঁহার দিনগুলি আনন্দেই কাটিত। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন। নারীজাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পুস্তকের অনুবাদ অতি অল্প ভাষাতেই হইয়াছে। ইংরাজীতে তাঁহার মাত্র দু'তিনখানি পুস্তকের তর্জ্জমা পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালী হইলেও তাঁহার রচনার সহিত বেশী লোকের পরিচয় না থাকার ইহাই প্রধান কারণ।

১৯২৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর স্পিট্‌লারের মৃত্যু হয়। মনীষী রোম্যা রোলাঁ বলেন "স্পিট্‌লার বর্ত্তমান ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি। জার্ম্মান সাহিত্যে গায়টের পর এরূপ প্রতিভাবান কবি কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংরাজ কবি মিল্‌টনের সহিত তিনি একাসন পাইবার অধিকারী।"

ন্যুট হাম্‌জুন (Knut Hamsun)

জন্ম—১৮৬০ ; প্রাইজলাভ—১৯২০

নরওয়ের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ন্যুট হাম্‌জুনের নাম বিশ্ব-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইনি কৃষকপুত্র। ইঁহার পিতামহ কর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন পিতার অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল থাকায় অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছাড়িয়া হাম্‌জুন জুতার দোকানে শিক্ষানবিশী করিবার জন্য ভর্ত্তি হন। সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি গোপনে কবিতা ও গল্প লিখিতেন। ১৮৭৮ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস ও কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

অল্পদিন পরেই মুচীর কাজ তাঁহার ভালো না লাগায় তিনি দেশ ছাড়িয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার আশা ছিল যে আমেরিকায় তিনি সাহিত্য-সাধনার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন। সেখানে তিনি ট্রামের কণ্ডাক্টার, ক্ষেতের মজুর, মাংসের দোকানের কেরাণী প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিচয় তাঁহার "Wanderer" নামক পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

১৮৮৫ সালে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অর্থের অভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়েন যে আত্মহত্যারও চেষ্টা করিয়াছিলেন! পরিশেষে সাহিত্যকে উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেন। কোপেনহেগেনের এক-খানি সংবাদ পত্রে তাঁহার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস "ক্ষুধা" (Hunger) প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রিষ্টিয়ানিয়ার একটি যুবকের দারুণ অভাব ও কষ্টের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম এই গল্পের বর্ণনীয় বিষয়।

Growth of the Soil হাম্‌জুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহা লিখিয়াই তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। "পল্লীতে ফিরিয়া যাও" ইহাই এই অনুপম নরওয়েজিয়ান উপন্যাসের মূল কথা। আইজ্যাকের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিরূপে একটি জনমানবশূন্য অনুর্ব্বর জায়গায় একটি পুরুষ ও একটি নারী কেবলমাত্র

অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া সেখানে লোক-বসতির সূত্রপাত করিল, তাহার বিবরণ পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ইহা কৃষক-জীবনের অমর চিত্র!

তাহার অন্যতম প্রধান উপন্যাস "Mysteries"এর নায়ক জোহান নাজেল এক পাদ্রীর তরুণী কন্যার প্রেমে পড়ে। নানারূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগের পর সে অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ায়। মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতির নিকটেই সে বেশী শান্তি পাইত। হাম্‌জুনের মত সেও

নুট্ হামজুন

সমাজের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিফল-প্রযত্ন হইয়া অসুখী হয়।

"প্যান" একটি মধুর ও করুণ প্রেমের গল্প। ইহার নায়ক নিজের কুটীরে ও নির্জ্জন অরণ্যে সুখী থাকিলেও মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই দুঃখ পায়। নায়িকা এড্‌ভারডা চঞ্চল প্রকৃতির নারী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

নাটক রচনাতেও হাম্‌জুন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার "রাণী তামারা" "ধনীর দুয়ারে" "Munken Vendt" প্রভৃতি নাটক দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু নাট্য-কলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ নাই।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁহার "Childern of the Age" বিশেষ জনপ্রিয় হয়। অবসর প্রাপ্ত লেপ্টেন্যাণ্ট Willatyএর চরিত্র ও ধনীকন্যা নিজের পত্নীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। শেষ দিনগুলির দুর্দ্দম গর্ব্ব ও নিঃসঙ্গতা উচ্চঅঙ্গের কলা নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

হাম্‌জুনের উপন্যাসের ভিতর বাস্তবের সহিত ভাবপ্রবণতা ও অজানা রহস্যের মিলন দেখা যায়। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও আধুনিক জীবনের দোষ-ত্রুটী নির্দ্দেশ করিতে তিনি যথেষ্ট বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তাঁহার ক্ষমতা কম নয়। দোষের মধ্যে তাঁহার রচনা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। একজন সমালোচক বলেন "প্রথম হইতেই হাম্‌জুনের রক্তে শিল্পী ও ভবঘুরের প্রভাব সমান প্রবল" কিন্তু ভবঘুরে হইলেও তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দেশবাসীদিগের উপর মমতা অত্যন্ত গভীর। তিনি আশাবাদী নহেন কিন্তু তাঁহার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া যাওয়া এবং অধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও সাহস অক্ষুন্ন রাখা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য।

সর্ব্বসমেত হাম্‌জুন প্রায় চল্লিশখানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থাবলী নানা ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্ম দিনে নরওয়ের লোক তাঁহাকে ঋষি ও জীবিত লেখকদিগের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত করে। বিশ্ব-সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী।

হাম্‌জুনের ব্যক্তিত্ব, রচনা ও দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপক J. Wiehr এর 'Knut Hamsun; His Personality and his Outlook upon Life" নামক পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য।

আনাতোল্ ফ্রাঁস (Anatole France)

জন্ম—১৮৪৪; মৃত্যু—১৯২৪; প্রাইজলাভ—১৯২১।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁসের স্থান বিশ্ব-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৪৪ সালের ১৬ই এপ্রিল

প্যারী সহরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রকৃত নাম জ্যাক্ আনাতোল তিবো। দেশপ্রীতির জন্য তিনি ফ্রাঁস নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পুস্তকব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তক-বিক্রয় অপেক্ষা পুস্তক-পাঠেই বেশী মনোযোগ দিতেন বলিয়া ব্যবসায়ে সেরূপ উন্নতি করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ও ভক্ত ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁহার দোকানে গ্রন্থকার, পণ্ডিত, দার্শনিক প্রভৃতি বহুবিধ লোকের সমাগম হইত। বালক আনাতোল্
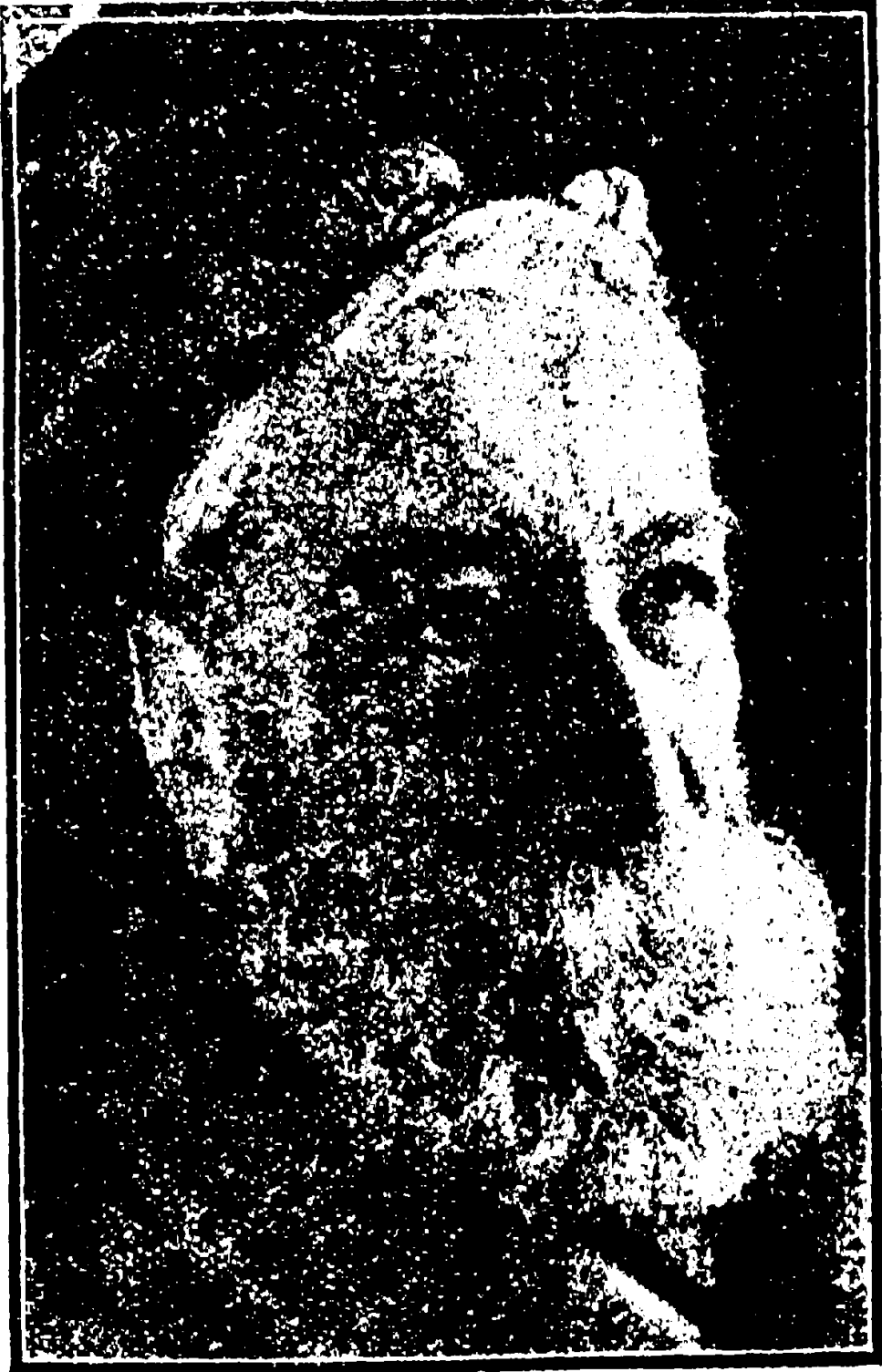
আনাতোল ফ্রাঁস্

এই আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হন। পুস্তকের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার অনেক উপন্যাসে তিনি বাল্যকালের ও তাঁহার পিতার পুস্তকালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

ধনী না হইলেও ফ্রাঁসের পিতামাতা তাঁহাকে উচ্চশিক্ষিত করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সাহিত্য-অনুরাগী। ১৮৬৮ সালে ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি কবি অ্যালফ্রেড ডি ভিঙ্নির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কথিত আছে যে ইহার দুই বৎসর পরে তিনি যখন সৈনিক হইয়া যুদ্ধে যান, তখন রণক্ষেত্রে অজস্র গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যেও ভার্জ্জিলের কাব্যপাঠে মগ্ন থাকিতেন। মাঝে মাঝে বাঁশীও বাজাইতেন।

প্রুশিয়া যুদ্ধের পর তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৮৮১ সালে তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধ উপন্যাস "সিলভেষ্টার বনার্ডের অপরাধ" প্রকাশিত হয় ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ইহা হইতেই তাঁহার পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির সূত্রপাত। উক্ত উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু অল্প, গল্পাংশও সাদাসিধা, কিন্তু অত্যন্ত মধুর ও মনোমুগ্ধকর। সুপণ্ডিত, নিঃসঙ্গ ও বৃদ্ধ বনার্ডের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত একবার পরিচয় সাধন করিলে তাঁহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা অসম্ভব। যৌবনের মানসী ক্লেমেনটাইন তখনও তাঁহার মনের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাঁহার কন্যার জন্য তাঁহার স্নেহ ও আত্মত্যাগ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহু সমালোচকের মতে এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মানবমনের উচ্চতম বৃত্তিগুলি ইহাতে নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাস "Thais"এ আত্মা ও বিষয়-বুদ্ধির চিরন্তন সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং একবার বলিয়াছিলেন যে প্রথমোক্ত উপন্যাসখানি তিনি জনসাধারণের তুষ্টির জন্য লিখিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তটি তাঁহার নিজের সন্তুষ্টির জন্য রচিত হইয়াছে।

ফ্রাঁসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ উপন্যাসের ভিতর "Penguin Island" "The Opinions of Jerome Coignard" "The White Stone" "The Revolt of the Angels" প্রভৃতি পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস ব্যতীত ফ্রাঁস কতকগুলি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি একজন সুদক্ষ সমালোচক। ইংরাজীতে তাঁহার চার খণ্ড সমালোচনার পুস্তক "সাহিত্য ও জীবন" (On Life and Letters) নামে অনূদিত হইয়াছে। এগুলি এরূপ সরস ও সুন্দরভাবে লেখা যে পড়িবার সময় মনে হয় কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত আলোচনা

করিতেছি। ফরাসী-সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে স াঁ বুভের পরেই তাঁহার স্থান বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ফ্রাঁসের দান অল্প নয়। অনেকে তাঁহাকে রেনাঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার "জোয়ান অব্ আর্কের জীবনী" নানাভাষায় অনূদিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির ভিতর ইহা অন্যতম।

ফ্রাঁসের জীবনে তাঁহার মাতার পরেই প্যারী সহরের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। অল্প বয়স হইতেই তিনি প্যারীর ছোট বড় রাস্তা, দোকান, উৎসব, সমাজ ও দারিদ্র্য প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। তাঁহার লেখায় প্যারী সহরের ফটোগ্রাফের মত সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। জীবনে তিনি জ্ঞান ও যুক্তিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সন্মান করিতেন। কৌতুকপ্রিয়তা এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী। ভণ্ডামী ও কপটতাকে একান্তভাবে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঘৃণা মৃদুর্ভৎসনা ও পরিহাসেই পর্য্যবসিত, ক্রোধে উত্তেজিত নয়। তাঁহার প্রতিভা সমালোচকের ও তত্ত্বান্বেষীর। উপন্যাসগুলিকে তিনি সুকৌশলে তাঁহার চিন্তা ও মতামত ব্যক্ত করিবার উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং লিখিবার ভঙ্গী মনোরম। নির্ম্মল মন, অগাধ পাণ্ডিত্য, দীপ্তিশীল কল্পনা, মনোজ্ঞ দর্শন প্রভৃতি গুণ তাঁহার রচনাকে চিরন্তন করিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন।

পরিণত বয়সে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সমর্থন করিতেন। নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত সমস্ত টাকাই তিনি রুশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ দান করেন; রুশ প্রজাদের উপর তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতির ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আনাতোল্ ফ্রাঁসের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক J. Lewis May লিখিত 'Anatole France" উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে। তন্মধ্যে কয়েকখানির ইংরাজী অনুবাদও পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত
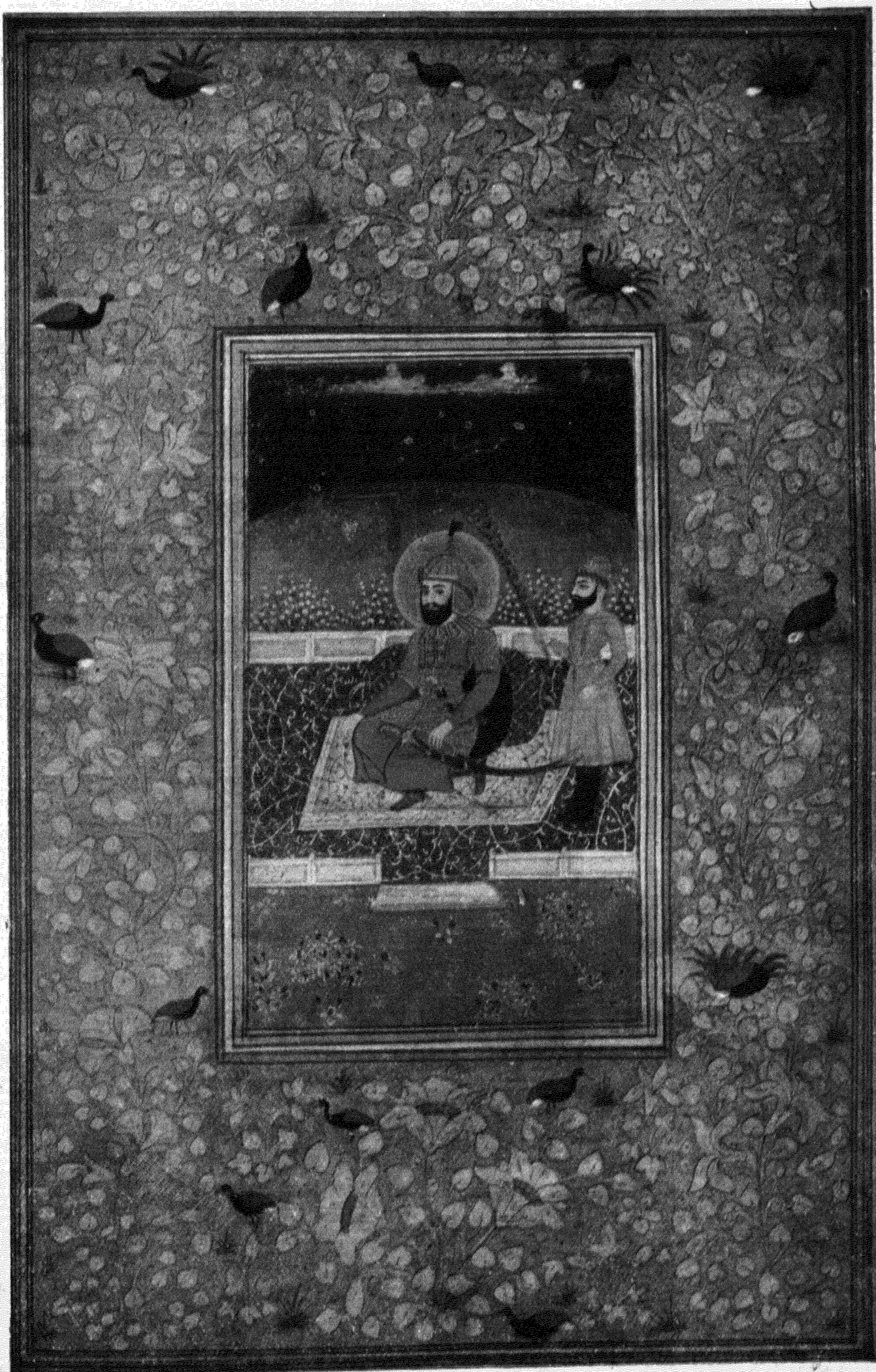
শের-সাহ

[প্রাচীন মোগল চিত্র]

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহ হইতে

সম্রাট অশোকের গিরিলিপি

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

(অপ্রধান লিপি)

কিছুকাল পূর্ব্বে বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সম্রাট অশোকের গিরিলিপিগুলির কথা বলিয়াছি। তাহাতে আটটি আবিষ্কৃত এবং একটি অনাবিষ্কৃত শিলা-লিপির পরিচয় দিয়াছি। ঐগুলি মূল বা প্রধান গিরিলিপি নামে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত। এবারে ক্ষুদ্র বা অপ্রধান লিপি নামে পরিচিত অনুশাসন গুলির (Minor Rock Edicts) কথা বলা যাইতেছে। এগুলি সংখ্যাতে দুইটি ; তদ্ভিন্ন ভাবরা লিপি নামে খ্যাত আর একটি অনুশাসনকে এই পর্য্যায়ে ধরা যাইতে পারে। অপ্রধান লিপিগুলি নিম্নকথিত সাতটী বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম, জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ, মহীশুর রাজ্যে ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও জটিঙ্গা-রামেশ্বর এবং নিজাম রাজ্যে মস্কি। নাম হইতেই প্রকাশ, ভাবরা অনুশান ভাবরা (বা বৈরাট) নামক স্থানে আবিষ্কৃত। প্রথমে এইটির কথাই বলা যাইতেছে।

ভাবরা :—বৈরাট নগরে অশোকের দুইটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী প্রথম অপ্রধানলিপির অন্যতম সংস্করণ এবং দ্বিতীয়টী অপর এক স্বতন্ত্র অনুশাসন। শেষের-টীই প্রথম পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রথমটী হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহা ভাবরা অনুশাসন নামে অভিহিত।

রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যে তোড়বাটি তালুকে বৈরাট নামে একটি প্রাচীন নগর আছে। জয়পুর হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং আলোয়ার হইতে ২৫ মাইল পশ্চিমে ইহার অবস্থান। ভাবরুর (ভাবরা নামটী চলিয়া গেলেও প্রকৃত নাম ভাবরু) ছাউনী হইতে ইহার দূরত্ব ১২ মাইল। তাই ঐ নামেই এখানে প্রাপ্ত প্রথম লেখাটী পরিচিত। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট এ কথা অজানা নয় যে, রাজপুতানার এতদঞ্চলই প্রাচীন মৎস্যদেশ। আধুনিক যুগের এই বৈরাট নগরকেই প্রাচীন মৎস্যরাজধানী বিরাটপুরীর বর্ত্তমান নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রাচীন বিরাট নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ এখন দৃষ্ট হয় তাহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল, প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল এবং পরিধিতে প্রায় আড়াই মাইল হইবে। ইহার চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে বর্ত্তমান নগর অবস্থিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টক খণ্ড, ও তাম্রপাত্রের ভগ্ন খণ্ডসমূহে পরি-ব্যাপ্ত। উপত্যকার সাধারণ দৃশ্য রক্তাভ তাম্রবর্ণ। এখান-কার মাটিতে তাম্রের অস্তিত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। কিম্বদন্তী অনুসারে প্রাচীন বিরাট নগরী বহুকাল পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছিল। দীর্ঘকাল জনশূন্য থাকার পর আবার আকবর সাহের আমলে এখানে মনুষ্যবসতি আরম্ভ হইয়াছে। "আইন-ই-আকবরী"তে বিরাটনগরের এবং তত্রস্থ তাম্রখনির উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউয়েন সঙ্গ বিরাট নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ হইতে বৈরাটের তাৎকালীন অবস্থা জানা যায়। তাহার পর বৈরাটের নাম পাওয়া যায় গজনীর সুলতান মামুদের সময়ে। তাঁহারই সময়ে এই সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংস সাধিত হয়। মামুদের অন্যতম সেনানায়ক আমীর আলি কর্ত্তৃক এই নগর অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় এবং অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। আবু রিহান বা অল্-বেরুণী ও উৎবী নামক দুইজন খ্যাতনামা সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকের রচিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নগর লুণ্ঠনকালে আমীর আলি একটী পুরাতন শিলালিপি দেখিয়াছিলেন। আবু রিহান বলেন তাহাতে লেখা ছিল

যে, ঐ নগরে অবস্থিত নারায়ণদেবের মন্দির চল্লিশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তখন ঐ প্রাচীনলিপি কেহই পড়িতে পারিত না—আমীর আলি যাহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সে একটা মনগড়া ব্যাখা করিয়া দিয়াছিল। বৈরাটে প্রাপ্ত অশোক অনুশাসন দুইটির কোনটাই আমীর আলি-দৃষ্ট শিলালিপি কিনা তাহা সঠিক বলিবার কোনই উপায় নাই। দেববিগ্রহ ও মন্দিরধ্বংসব্রতী মুসলমান সেনার হস্ত হইতে ঐ পুরাতন লিপিটী রক্ষা পাইয়াছিল কিনা তাহাও জানা যায়না।

বৈরাট নগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় একমাইল দূরে "বিজক পাহাড়" নামে একটি ছোট পাহাড় আছে—তাহার উচ্চতা প্রায় দুইশত ফুট হইবে। "বিজক" কথাটার অর্থ লেখা-যুক্ত। এই পাহাড়েই অশোকের প্রথম লিপিটী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাই ইহার এরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। ধূসর বর্ণের সুবৃহৎ গ্রাণাইট প্রস্তরের চাঙ্গড়ে এই পাহাড়টী গঠিত, মধ্যে মধ্যে ঈষৎ লালাভ বর্ণের অপেক্ষাকৃত ছোট প্রস্তরখণ্ডও দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে দুইটি বিস্তীর্ণ ইষ্টকচত্বরের ভগ্ন নিদর্শন দেখা যায়। চত্বর দুইটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত হস্ত হইবে, ইষ্টকখণ্ড এবং প্রাচীরের ভগ্নাবশেষে চত্বর দুটি সমাকীর্ণ। দেখিলে স্বতঃই এদুটিকে কোন বিশাল হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইষ্টকগুলিও খুব বড়, প্রায় ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৪ ইঞ্চি পুরু হইবে। ইহাও ইহাদের প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। পর্ব্বতগাত্রে এখনও সোপানশ্রেণী এবং প্রবেশপথের চিহ্ন দেখা যায়। একটি চত্বর অপরটী অপেক্ষা প্রায় ২০ হস্ত উর্দ্ধে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে নীচে চারিদিকই ইষ্টকখণ্ড এবং ভগ্ন প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। তাই মনে হয় এককালে এখানে বহুসংখ্যক সৌধহর্ম্ম্যাদি ছিল। হিউয়েনসঙ্গ বিরাট নগরে আটটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বিজাক পাহাড়ের উপরের ধ্বংসরাশি তাহারই দুইটির নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বা অপেক্ষাকৃত নিম্নের চত্বরটীর উপরে স্থাপিত রক্তাভ ধূসর বর্ণের একখণ্ড গ্রাণাইট পাথরে উৎকীর্ণ এই অনুশাসনটি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেজর বার্ট নামক জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহীত প্রতিলিপি হইতে বর্ণুফ এবং উইলসন উভয়ে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানে তাহার অনেকাংশ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভাবরা অনুশাসনটি অন্যান্য অশোক-অনুশাসনের ন্যায় পর্ব্বত বা গণ্ডশৈলগাত্রে উৎকীর্ণ নহে; একখণ্ড প্রস্তরপৃষ্ঠে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। জয়পুরের মহারাজা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিকে ঐ প্রস্তরখণ্ড উপহার প্রদান করেন; বর্ত্তমানে উহা এসিয়াটিক সোসাইটির কলিকাতায় পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে রক্ষিত আছে। এ কারণ ডাঃ হুলজ্‌ সম্পাদিত আধুনিকতম "অশোক অনুশাসন" গ্রন্থে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভাবরা অনুশাসন নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং উহা "কলিকাতা বৈরাট শিলালিপি" নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাবরা কথাটী অশুদ্ধ এবং বৈরাট হইতে ভাবরু অনেকদূরে অবস্থিত। এইজন্য ভাবরার নামে অনুশাসনটী পরিচিত হওয়া অনুচিত হইলেও, প্রায় শতবর্ষ ধরিয়াই যে নাম চলিয়া আসিতেছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার সেই নামই প্রদত্ত হইল।

আর এক বিষয়েও ভাবরা লিপির অভিনবত্ব আছে: অদ্যাপিও অপর কোন স্থান হইতে ইহার আর এক সংস্করণ বাহির হয় নাই। এটি সম্রাট অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র বা অপ্রধান গিরিলিপির সমসাময়িক। সে হিসাবে রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষ ইহার প্রচারকাল। অশোক প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে স্বকীয় ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস এবং ভাবরার অনুশাসনে শ্রমণগণের পরিচালনের বিধিব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের তথা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি অশোকের যে কিরূপ ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, ভাবরালিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অশোকের মতামতও ইহাতে বেশ পরিস্ফুট। বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের হৃদয়ে যে কিরূপ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল এবং ভগবান তথাগতের উপদেশবাণীই যে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তাহা ভাবরা অনুশাসন পাঠে বেশ বুঝা যায়। এই অনুশাসনে অশোক বুদ্ধদেবের সুভাষিত, ধর্ম্মের সোপান

বলিয়া উল্লিখিত, বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটী পাঠ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকাগণের পর্য্যালোচনা ও তদ্বৎ আচরণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত অশোক বুদ্ধদেব এবং তাঁহার বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন জগতের ইতিহাসে তাহা একান্তই দুর্ল ভ। বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ অশোক নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহের স্বরূপ এইরূপে নির্ণয় করেন।

বিনয়সমুকসে—পণ্ডিতগণ প্রথমে কোন্ বিশেষ শাস্ত্রাংশ অশোক এই পদটী দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রীজ ডেভিড্সের মতে বিনয়সমুকসে কথাটি কোন ধর্ম্মগ্রন্থের অংশবিশেষের নামরূপে অথবা কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। অন্য অনেকে আবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য নিয়মাবলীযুক্ত বিনয়পিটকের অন্তর্গত কোন সূত্ত অশোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে "তুবট্‌ঠক সূত্ত" বিনয়সমুকসের নামান্তর বলিয়া স্থির হইয়াছে।

অলিয়বসানি—অঙ্গুত্তার নিকায় ২.২৭
অনাগতভয়ানি—অঙ্গুত্তারনিকায় ৩.১০৩
মুনিগাথা—সুত্তনিপাৎ—২০৬-২২০ শ্লোক
মোনেয়সুতে—সুত্তনিপাৎ ১৩১-৩৪
উপতিসপসিন—মঝ্ঝিমনিকায় ১.১৪৬-১৫১
লাঘুলোবাদ—রাহুলোবাদসুত্ত—মঝ্ঝিমনিকায় ১.৪১৮-২০.

পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ অশোকনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রাংশগুলিকে নানারূপে নির্ণয় করিতেন। কিন্তু সে সকল সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানে যে মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই কথা শুধু এখানে বলা গেল।

অশোক-অনুশাসন মধ্যে এই সকল বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নাম দেখিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতসমাজ বড় বিপদেই পড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে পণ্ডিতেরা বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহকে অতটা প্রাচীনত্ব দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন—অথচ এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণকে অস্বীকার করাও শক্ত ছিল। তাঁহাদের বড়ই বিপদ তখন হইয়াছিল। এক্ষণে আর কেহ একথা বলিতে সাহস করে না যে অশোকের সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রচিত হয় নাই। ভাবরা লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া প্রচারিত এই অনুশাসন হইতে কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত মনে করেন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল সঙ্ঘেই বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত মার্গে অশোকের দৃঢ়ভক্তির পরিচায়ক এই অনুশাসনের এক একটী প্রতিলিপি রক্ষিত হইয়াছিল। কালক্রমে হয়ত অপর কোন স্থান হইতে এই অনুশাসনের অপর এক সংস্করণ বাহির হইতেও পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু ভাবরার অনুশাসনটীই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখাটী সম্বন্ধে পরলোকগত ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথেরও নিজস্ব একটি মত ছিল। তাঁহার মতে বৌদ্ধভিক্ষুর পক্ষে সংসারে আবার ফিরিয়া যাওয়া খুবই সহজ; রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট অশোক মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজদণ্ড পুনর্গ্রহণ করিতেন। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে এইরূপ কোন এক সময়ে ভাবরার বিহারে অবস্থানকালে অশোক প্রথম অপ্রধান গিরিলিপিতে নিজ ধর্ম্মজীবনের বিবরণ এবং ভাবরালিপিতে শ্রমণগণের পরিচালনের বিধিব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বৈরাটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উভয় অনুশাসনের আবিষ্কার এবং ভাবরার লেখামধ্যে মাগধসঙ্ঘের উল্লেখ ব্যতীত এ প্রকার অনুমানের স্বপক্ষে অপর কোন বলবৎ প্রমাণ দেখা যায় না।

এবারে বৈরাটে প্রাপ্ত অশোকের দ্বিতীয় লিপির কথা বলিব। এটী অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র বা অপ্রধান গিরিলিপির অন্যতম সংস্করণ। এ ধরণের লেখা সাসারাম, রূপনাথ প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিরাট নগরের এক মাইল উত্তরে "হিন্সগিরি" নামে অভিহিত দীর্ঘ অনুচ্চ একটি গণ্ডশৈল আছে। পাহাড়ে বৃক্ষলতার অস্তিত্ব দেখা যায় না। নিতান্ত ভীষণদর্শন ঘন কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তরের সুবৃহৎ খণ্ডসমূহ স্তরে স্তরে ন্যস্ত দেখিলেই মনে হয় যেন কোন অতিকায় দৈত্যশিশু ক্রীড়াচ্ছলে এই পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। সাধারণের নিকট পাহাড়টী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। পাহাড়ে প্রকাণ্ড

একটী কৃত্রিম গুহা আছে, তাহা "ভীম কা গোফা" নামে পরিচিত। অপরাপর পাণ্ডবভ্রাতৃগণের নামে অভিহিত অপেক্ষাকৃত ছোট আরও কয়েকটী গুহা এখানে ছিল বলিয়া শুনা যায়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর জেনারেল সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম অপর কোন প্রাচীনলিপি এখানে আছে কি না দেখিবার জন্য এই পাহাড়ের উপরের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড বিশেষ যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম সহকারী কারলাইল সাহেবের ভাগ্য তাঁহার অপেক্ষা ভাল। পাহাড়ের দক্ষিণস্থিত বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের এই অনুশাসনটী আবিষ্কারের যশোলাভ তাঁহারই অদৃষ্টে ঘটে। প্রস্তরখণ্ডটী খুব বড়; উহা দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত, উচ্চতায় প্রায় ১২ হাত এবং বিস্তারে ১০ হাত হইবে। উহার দক্ষিণগাত্রে আট লাইনে লেখাটী উৎকীর্ণ। অক্ষরগুলি বেশ বড় বড়, প্রায় ২॥০ ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে। দীর্ঘ দ্বিসহস্রবর্ষেরও অধিক কাল ধরিয়া রৌদ্রবৃষ্টিতে পড়িয়া থাকার ফলে প্রস্তরগাত্রের বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। তজ্জন্য লেখাটীর মধ্যভাগের প্রায় একফুট পরিমাণ অংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একই প্রস্তরখণ্ডে দুইটি বিভিন্ন অনুশাসন ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রথম আবিষ্কারকালে কারলাইলও তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া কানিংহাম বুঝিতে পারিলেন যে তাহা নহে, একই লেখার মধ্যদেশ নষ্ট হওয়ায় এরূপ দাঁড়াইয়াছে; এবং এই নবাবিষ্কৃত অনুশাসন সাসারাম ও রূপনাথ লিপিরই মূলতঃ অপর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র; পদবিন্যাসে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও তজ্জন্য তাৎপর্য্য গ্রহণে কোনই বাধা বা অসুবিধা হয় না।

সাসারাম:—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার সাসারাম মহকুমার সদর ষ্টেসনের নামও সাসারাম। গয়া হইতে মোগলসরাই যাইবার পথে গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে সাসারাম একটি ষ্টেশন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডও সাসারাম হইয়া গিয়াছে। সাসারামে পাঠানকুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সের সাহের সমাধিসৌধ অবস্থিত বলিয়া অনেকেই জানেন। সেরসাহ এখানকার এক সামান্য জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। নিজ অলোকসামান্য প্রতিভা এবং অধ্যবসায়গুণে তিনি দিল্লীর রাজসিংহাসনে বসিলেও, বাল্যলীলাভূমি সাসারামের কথা বিস্মৃত হন নাই। সাসারামেই তিনি জীবদ্দশায় নিজ সমাধি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহও তাঁহার অপরাপর আত্মীয়পরিজনবর্গের শেষ-শয়নস্থানের অদূরেই আশ্রয়লাভ করিতে পারে। বিশাল এক জলাশয়ের মধ্যে নির্ম্মিত সেরসাহের সমাধি-সৌধটী পাঠানস্থাপত্যের অন্যতম সুন্দর নিদর্শন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এবং গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে অনেকেরই নয়নপথে এই সমাধিভবনটী পতিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু সাসারামে যে আরও একটী বহু পুরাতন যুগের কীর্ত্তি—মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের কীর্ত্তি—আছে সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। সাসারামের সন্নিকটে যে গণ্ডশৈলশ্রেণী দেখা যায়, তাহা কাইমুর গিরিমালার সর্ব্ব উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত। সহরের এক ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনপীর পাহাড়। চূড়াদেশে পীরচন্দন সহিদ নামক এক মুসলমান ফকিরের কবর থাকায় উহার এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। চূড়ার কিছু নিম্নে গিরিগাত্রে একটি গুহা দেখা যায়; গুহাটি মনুষ্যহস্ত ক্ষোদিত এবং সাধারণের নিকট "পীরসাহেবের চিরাগদান" নামে পরিচিত। গুহাটীর প্রবেশপথ পশ্চিমমুখী এবং চার ফুট উচ্চ। অশোকের লেখাটী এইস্থানে উৎকীর্ণ। দীর্ঘ এক প্রস্তরখণ্ড উপরে বিস্তৃত থাকিয়া গুহাটীর সম্মুখবর্ত্তী স্থানে ছাদের কার্য্য করিতেছে। এ কারণ রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার ফলে লেখাটী অনেকটা ভাল অবস্থাতেই আছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পাথরের চটা-উঠার ফলে ইহার শেষাংশের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কানিংহামের "অশোক অনুশাসন" সম্বন্ধীয় গ্রন্থের জন্য গৃহীত এবং উক্তপুস্তকে প্রদত্ত ইহার প্রতিলিপি ও ফটোর সহিত মদ্দৃষ্ট অনুশাসনের পাঠ মিলাইতে গিয়া তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল। লেখাটি আট লাইনে সম্পূর্ণ।

সাসারাম অনুশাসনের অস্তিত্ব অনেককাল হইতেই জানা ছিল। কিন্তু প্রথমটায় এদিকে কেহই মনোযোগী হয়েন

নাই। সাসারামে একটি পুরাতন শিলালিপি আছে শুধু এইটুকুই জানা ছিল। প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালার পাঠোদ্ধারের পর এই লেখাটীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাহ কবিরুদ্দিন নামক জনৈক স্থানীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নকল পাইয়া E. L. Ravenshaw ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে এই প্রাচীন লিপিটির কথা সাধারণের গোচরীভূত করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "সাসারামের নিকট চন্দন সহিদ পাহাড়ের চূড়ায় লেখাটী ক্ষোদিত। বেতিয়া এবং এলাহাবাদ স্তম্ভের গাত্রে যেরূপ অক্ষর দেখা যায়, ইহার গাত্রেও সেই ধরণের অক্ষর আছে। লেখাটী এত অসম্পূর্ণ এবং গোলমেলে যে পণ্ডিত কমলাকান্ত ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে সক্ষম হয়েন নাই।" (J. A. S. B, Vol. IX. p. 354).

পণ্ডিত কমলাকান্তের পাণ্ডিত্যের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তখনকার দিনে প্রাচীন বর্ণমালা এবং পালি-প্রাকৃত ভাষায় তিনি সম্ভবতঃ কতকটা অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের জ্ঞান তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক পণ্ডিত কমলাকান্ত না পারিলেও অপরাপর পণ্ডিতরা লেখাটির পাঠোদ্ধার করিয়া বুঝিলেন, এটিও সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের প্রচারিত অনুশাসনসমূহের অন্যতম, কারণ ইহার প্রথমেই আছে 'দেবানংপিয়ে হেবং আহ'—"দেবপ্রিয় এইরূপ বলেন।"

সাসারামের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বস্তনিদর্শন দেখা যায়। তাই মনে হয় বৌদ্ধযুগে এইস্থান এতদঞ্চলে একটি প্রধানকেন্দ্র ছিল এবং সম্ভবতঃ সাসারাম সহস্রারামেরই অপভ্রংশ।

রূপনাথ ঃ—মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলায় সিহোরা তহসিলে স্লীমানাবাদ রেলষ্টেসনের ১৪ মাইল পশ্চিমে রূপনাথ নামে একটি হিন্দু তীর্থস্থান আছে। তীর্থস্থান বলাতে কেহ যেন কাশী, গয়া, পুরী, প্রয়াগ, মথুরার মত বলিয়া মনে না করিয়া বসেন এই অনুরোধ। তীর্থস্থানটি ছোট,—উহার মাহাত্ম্য এতদঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অধিকদূরে আর যাইতে পারে নাই। রূপনাথ জব্বলপুর সহরের প্রায় ৩৫ মাইল উত্তরে হইবে। রূপনাথের নিকটে যে সকল গণ্ডশৈল আছে তাহা কাইমুর গিরিমালার সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত। পাহাড়ের উপর হইতে একটী ঝরণা নামিয়াছে, তিন বিভিন্ন স্থানে তাহার জল জমিয়া তিনটি পৃথক কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ তিনটি যথাক্রমে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবীর নামে পরিচিত এবং সাতিশয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সীতাকুণ্ডটিই সর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। তাহার সন্নিকটে পাহাড়ের গায়ে এক ফাটলে রক্ষিত একটি শিবলিঙ্গ আছে। তাহার নাম "রূপনাথেশ্বর মহাদেব"। কুণ্ডের বামপার্শ্বে অবস্থিত ঘোর রক্তবর্ণ এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে অশোকের অনুশাসনটী উৎকীর্ণ। পূর্ব্বে প্রতিবৎসর শিব-রাত্রির দিন এখানে একটি মেলা বসিত। সেই সময় কুণ্ডে স্নান করিতে এবং রূপনাথেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে বহু লোক-সমাগম হইত। কিন্তু বিগত ৭০ বৎসরের মধ্যে মেলাটী আর হয় নাই। শিবরাত্রির দিন কিছু যাত্রী সমাগম এখনও হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মেলাটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাথরখানার উপর পৃষ্ঠে লেখাটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবে এবং মেলার সময়ে সমাগত লোকেদের ইহার উপরে বসার ফলে লিপিটীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে; স্থানে স্থানে অক্ষর একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ডটী ভাল করিয়া মসৃণ করাও হয় নাই। গাত্রের স্বাভাবিক দাগের জন্য পংক্তিগুলি সরল বা পরস্পর সমান্তরাল নহে। অনুশাসনযুক্ত অংশটী দৈর্ঘ্যে ৩ হাত এবং প্রস্থে প্রায় এক হস্ত হইবে। লেখাটি ছয় লাইনে সম্পূর্ণ। সাসারামী অনুশাসনের মত ইহার ভাষা মাগধী নহে; গির্ণার, সাঁচি, ভরহুত প্রভৃতি পশ্চিম এবং মধ্যভারতের স্থানসমূহে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রাচীনলিপিতে যেমন, রূপনাথেও তেমনই "র" অক্ষরের প্রচলন দেখা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পাঠকের নিকট একথা অজানা নহে যে "মাগধী প্রাকৃতে" 'র' এর স্থানে 'ল' এর প্রয়োগ আছে। মাগধীর সহিত এই ভাষার ব্যাকরণগতও কতকটা পার্থক্য দেখা যায়। কানিংহাম এই ভাষাকে (dialect) "উজ্জৈনীয়" ভাষা আখ্যা দিয়াছিলেন।

কর্ণেল এলিস নামক জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর এক

ভৃত্য কর্ত্তৃক লেখাটি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত কর্ণেল লেখাটির এক নকল এসিয়াটিক সোসাইটিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এতই ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ এবং কদর্য্য হইয়াছিল যে পড়িবার কোনই উপায় ছিল না। সলিমাবাদ পরগণার রূপনাথে উহা পাওয়া গিয়াছে, শুধু এইটুকু পরিচয় তাহার সহিত দেওয়া ছিল। বহুকাল পরে এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে অব্যবহৃত দ্রব্যাদি পূর্ণ একটী বাক্সের মধ্যে ঐ প্রতিলিপিটী দেখিতে পাইয়া কানিংহাম এ বিষয়ে কৌতুহলী হয়েন এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

পরগণা সলিমাবাদ কোথায় তাহা উক্ত প্রতিলিপির পরিচয়পত্রে বলা ছিল না। গয়া এবং মুঙ্গেরের মধ্যে ঐ নামে এক পরগণা আছে। এ কারণ কানিংহাম মনে করিয়াছিলেন যে বিহার সরিফের অদূরে কোন স্থান হইতে উহা বাহির হইবে এবং সেজন্য তিনি প্রথম ঐ স্থানেই সন্ধান আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল যে জব্বলপুরের "সীমানাবাদ" সাধারণ লোকের মুখে 'সলিমাবাদ' দাঁড়াইয়াছে, —সুতরাং রূপনাথ ঐ দিকে হওয়াই সম্ভব। এই কথা মনে পড়ায় কানিংহাম তাঁহার অন্যতম সহকারী বেগলারকে ঐ স্থানে সন্ধান করিতে পাঠাইলেন। এবারে অল্প অন্বেষণের পরই অনুশাসনটী বাহির হইল।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত অনুশাসনগুলি সর্ব্বশেষ বাহির হইয়াছে। মহিশুর রাজ্যে অবস্থিত তিনটী অনুশাসন ১৮৯২ এবং নিজামরাজ্যে প্রাপ্ত লেখাটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর সুদীর্ঘ ষষ্টিবর্ষের মধ্যেও দক্ষিণ ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে তাঁহার লিপি বাহির না হওয়ায় পূর্ব্বে সকলেই মনে করিতেন দক্ষিণাপথে অশোকের আধিপত্য ছিল না, তাঁহার সাম্রাজ্য শুধু উত্তরাপথেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ পরলোকগত ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের কথা বলা যাইতেছে। তাঁহার Early History of the Deccan গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত লিপিগুলি হইতে দেখা যায় পূর্ব্বদিকে কলিঙ্গ বা উত্তর সরকার প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে কাথিয়াবাড় প্রদেশ অবধি অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার দক্ষিণে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অনুশাসনসমূহে অশোকের সাম্রাজ্য 'বিজিত দেশ' নামে অভিহিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে যে সকল জনপদে তাঁহার আধিপত্য ছিল না তাহাদের নাম ধরিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব রাষ্ট্রিক, ভোজ, পেতেনিক, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি জনপদ তাঁহার অধীন ছিল না। মহারাষ্ট্র বা ডেকানদেশে তাঁহার আধিপত্য থাকিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থান হইতে তাঁহার একখানি ঘোষণা পত্র বাহির হইত।" (পৃঃ ১১)

ভাণ্ডারকর এই কথা লিখিবার অল্প পরেই, এমন কি তাঁহার গ্রন্থের সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ক্যাম্বেল এবং পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী সোপারা গ্রামে অষ্টম গিরিলিপির অংশ-বিশেষ আবিষ্কার করেন। ইহাতে ভাণ্ডারকর অশোকের সাম্রাজ্য সোপারা অবধি বিস্তৃত ছিল মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেও মহারাষ্ট্রদেশ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রহিল বলিয়া মনে করেন।—(পৃঃ ১২, ফুটনোট)

সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশুর রাজ্যে জরীপকার্য্যের সময় পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী তিনটী বিভিন্ন স্থান হইতে যখন অশোকের অপ্রধান গিরিলিপির তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইল এবং আরও দেখা গেল যে সম্পূর্ণ নূতন আর একটী অনুশাসনও তাহার সহিত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন সকলেই নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অশোকের সাম্রাজ্য যে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা তখন কেহই মনে করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেন যে, অশোকের গিরিলিপিতে দাক্ষিণাত্যের জাতিবৃন্দের এবং জনপদসমূহের যে উল্লেখ দেখা যায় তাহা শুধুই সম্রাটের আত্মশ্লাঘার ফল। আসলে ঐগুলির সহিত তাঁহার কোনই নিকট-সম্বন্ধ ছিল না, কারণ তাঁহার রাজ্যসীমা উহাদের নিকট হইতে বহুদূর দিয়াই গিয়াছিল।

অশোক যে শুধু দর্পভরেই দাক্ষিণাত্যের জনপদসমূহের ...াম করেন নাই তাহা তখন সকলেই দেখিতে পাইলেন। ...ইরূপে ভারতেতিহাসের একটি পরম মূল্যবান তথ্য সং-...গীত হইল। তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন নিজাম রাজ্যে ...স্কি নামক স্থানে এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশের ...র্ণুল জেলায় অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ পাওয়া গেল তখন আর কেহই ততটা বিস্মিত হন নাই।

যাহা হউক এবারে দক্ষিণাপথে আবিষ্কৃত অনুশাসন গুলির কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহিশুর রাজ্যে তিনটী বিভিন্ন স্থান হইতে অপ্রধান গিরিলিপি দুইটির তিনটি বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। মহিশুর রাজ্যের উত্তরাংশে চিতলদ্রুগ জেলা; তন্মধ্যে "মোলকালমুরু" নামে একটি তালুক আছে। উক্ত তালুকের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে "জনগিহল্ল" নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীর উভয় পার্শ্বে কতকগুলি গণ্ডশৈল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পরস্পরের অনতিদূরে অবস্থিত তিনটী গিরিগাত্রে অশোকের অনুশাসন দুইটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশুর রাজ্যে জরীপ কার্য্যের সময় ঐগুলি L. B. Rice কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনিই প্রথম এ গুলির পরিচয় সাধারণের গোচরীভূত করেন। প্রথম পাঠোদ্ধারের পর দেখা গেল যে বৈরাট, সাসেরাম এবং রূপনাথের লিপি এবং নবাবিষ্কৃত লেখত্রয়ের ভাষা ও বলিবার ধরণে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও মূলতঃ উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। আরও একটি সম্পূর্ণ নূতন অনুশাসন মহিশুরে দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক মহলে অশোকের দ্বিতীয় সংখ্যক অপ্রধান গিরিলিপি নামে পরিচিত। ইহাতে অশোকের ধর্ম্মবিধির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইয়াছে। অশোকের প্রধান চতুর্দ্দশ গিরিলিপির তৃতীয়, চতুর্থ, নবম ও একাদশ সংখ্যক অনুশাসনে এবং সপ্তম সংখ্যক স্তম্ভলিপিতে যে কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে সেই ভাবেরই সার সঙ্কলিত দেখা যায়।

মহিশুরে আবিষ্কৃত লিপিত্রয়ের আরম্ভভঙ্গীতেও কতকটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। অন্যান্য স্থানের লিপিগুলির আরম্ভ অনেকটা সাধাসিধা ধরণের,—"দেবানং পিয়ে হেবং আহ" অর্থাৎ "দেবপ্রিয় এইরূপ বলিলেন।" ইহা অশোকের নিজের মুখের বাণী, স্বয়ং সম্রাট নিজ ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমোক্তগুলির আরম্ভ অন্য ধরণের। উহা হইতে জানা যায় যে, ইসিলার রাজকর্ম্মচারিদিগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সম্রাটের অনুজ্ঞা সুবর্ণগিরির রাজপুত্র এবং তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের নিকট প্রথম প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উহা যথা স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসিলার রাজকর্ম্মচারিদিগের সরাসরি ভাবে সম্রাটের সহিত পত্রব্যবহারের অধিকার ছিল না—সুবর্ণগিরিতে অবস্থিত রাজপুত্র এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহযোগিতায় তাঁহা তাঁহাদের করিতে হইত। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইসিলার কর্ম্মচারিগণ সুবর্ণগিরির রাজপ্রতিনিধির অধীনস্থ ছিলেন। তাহা হইলে উভয় নগর একই অঞ্চলে—অর্থাৎ দক্ষিণাপথে—অবস্থিত ছিল এবং সে ক্ষেত্রে বলিতে হয় যে, সুবর্ণগিরিই মৌর্য্যসাম্রাজ্যের এতদঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অনুশাসনসমূহ হইতে জানা যায় যে, শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অশোকের সাম্রাজ্য পাঁচটী বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে স্বয়ং সম্রাট কেন্দ্র বা মধ্য বিভাগের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। অপরাপর চারিটী প্রদেশের শাসনভার রাজবংশ হইতে নির্ব্বাচিত কুমার বা আর্য্যপুত্র অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ চারিটী প্রদেশ যথাক্রমে উত্তর (প্রধান নগর তক্ষশিলা), পশ্চিম (প্রধান নগর উজ্জয়িনী), দক্ষিণ (প্রধান নগর সুবর্ণগিরি*) এবং পূর্ব্ব (প্রধান নগর তোষলি) প্রদেশ নামে অভিহিত হইতে পারে। পিতা বিন্দুসারের জীবদ্দশায় অশোক ক্রমান্বয়ে উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন সে কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অজানা নহে। সুবর্ণগিরির অবস্থান সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে, এবারে লেখা তিনটী সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মগিরিঃ— মহিশুরে আবিষ্কৃত লিপিত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মগিরি নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখাটিই সর্ব্বাপেক্ষা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। একারণ প্রথমে তাহার কথাই বলা গেল। ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের উত্তর পশ্চিম কোণের

পাদমূলে অবস্থিত সুবৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডের উপরপৃষ্ঠে লেখাটী উৎকীর্ণ। ঐ প্রস্তর দীর্ঘকাল হইতে স্থানীয় অধিবাসিদের নিকট "অক্ষরগুণ্ডু" (কানাড়ী ভাষায় গুণ্ডু অর্থে প্রস্তর বুঝায়) নামে পরিচিত। উহার নানা কঠিন দুরারোগ্য রোগ আরাম করিবার দৈবশক্তি আছে বলিয়া গ্রামবাসিদের বিশ্বাস। কারণ মনুষ্য বা গবাদি পশুর সকল প্রকার রোগেই প্রথমে ঐ পাথর ধোওয়া জল তাহারা রোগীকে পান করিতে দিয়া থাকে। দিবসের আতপতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বতের ছায়াশীতল কোলে অবস্থিত সুবিশাল এই প্রস্তরখণ্ড দীর্ঘকাল হইতেই গোমেষ-চারণকারী রাখালগণের এবং নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের শস্য রক্ষানিরত কৃষককুলের প্রিয় বিশ্রামস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ লেখাটীর বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষোদাই করিবার পূর্ব্বে বন্ধুর প্রস্তর গাত্র ভালরূপে মসৃণ করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহার ফলে পংক্তিগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা ঋজু ভাবে উৎকীর্ণ হয় নাই। বামদিকে প্রস্তর গাত্রে একটা ফাটল থাকার জন্য তন্মধ্যে বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তির আরম্ভের কয়েকটী অক্ষর একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে। ত্রয়োদশ লাইনে সম্পূর্ণ অনুশাসনটী প্রস্তর খণ্ডের প্রায় দশহাত দীর্ঘ এবং আটহাত আয়ত স্থান জুড়িয়া উৎকীর্ণ।

সিদ্ধপুর ঃ—ব্রহ্মগিরির প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সিদ্ধপুর "যেবমন তিম্ময্যান গুণ্ডু" অর্থাৎ মহিষপালক তিম্ম-য্যার পাহাড় নামে অভিহিত এক গণ্ডশৈল গাত্রে লেখাটী উৎকীর্ণ। প্রায় নয় হাত দীর্ঘ এবং ছয় হাত বিস্তৃত জায়-গায় বাইশ লাইনে লেখাটী সম্পূর্ণ। বন্ধুর প্রস্তরগাত্রের জন্য পংক্তিগুলি পরস্পর সমান বা সরল নহে। সুবিশাল এক প্রস্তরখণ্ড উত্তরদিক হইতে লেখাটীর উপর ছাতের ন্যায় হেলিয়া থাকার ফলে স্থানটী বেশ ছায়াশীতল, তজ্জন্য মনুষ্য এবং গবাদি পশুর রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লওয়ার ফলে লেখাটীর সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সিদ্ধপুরার অবস্থান অনুমান ১৪'৪৭´ এবং ৭৬'৫১´ রেখা মধ্যে। ইহার অদূরে ভূগর্ভে প্রোথিত এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসনিদর্শন আজও বিদ্যমান। প্রচলিত প্রবাদা-নুসারে ঐ নগরের নাম ছিল "চন্দ্রাবলী"। বহুকাল হইতেই এখানকার কৃষকেরা ভূমিকর্ষণকালে পুরাতন মুদ্রা ও শিল মোহর, অস্থিখণ্ড, ইষ্টকাদি এবং স্বর্ণালঙ্কারখণ্ড প্রভৃতি পাইয়া থাকে। পরে নগর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে খননের ফলে বিস্তৃত প্রাচীর ও গৃহাদির ভগ্ননিদর্শন, বহু সংখ্যক পুরাতন যুগের শিলমোহর ও মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িল। মুদ্রাগুলির মধ্যে অন্ধ্ররাজগণের এবং রোমক সম্রাট অগষ্টস সিজারের মুদ্রাও দেখা যায়। বিধ্বস্ত নগরীর এক মাইল পশ্চিমে গিরিগাত্রে খোদিত এবং ভূগর্ভে-স্থিত কতকগুলি গুম্ফা বা গুহা আছে। বৌদ্ধ যতিগণের নির্জ্জন বাসের জন্য ঐগুলি তাৎকালীন ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গুলিতে এককালে মনুষ্য-বাসের বহু নিদর্শন আজও দেখা যায়। ঐ প্রাচীন নগরী-টীর নিদর্শনকেই অনুশাসনোক্ত ইসিলার ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই মনে হয়।

জটিঙ্গা-রামেশ্বর ঃ—ব্রহ্মগিরির প্রায় তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জটিঙ্গা-রামেশ্বর পর্ব্বত। প্রবাদ এইখানেই সীতাহরণকালে বাধা দিতে গিয়া রাবণের হস্তে জটায়ু প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিল। পাহাড়ের উপরে জটিঙ্গা-রামেশ্বর-মহাদেবের এক মন্দির। যে চত্বরে অশোকের অনুশাসনটী উৎকীর্ণ তাহা মন্দিরে উঠিবার সোপানশ্রেণীর ঠিক সম্মুখেই পাহাড়ের পশ্চিম চূড়ার প্রান্তভাগে অবস্থিত। লেখাটীর দক্ষিণে বিশাল এক পাষাণখণ্ড ছাতের ন্যায় উপর হইতে লম্বমান রহিয়া রৌদ্র জল হইতে লেখাটীকে রক্ষা করিতেছে। যে প্রস্তরে লেখাটী উৎকীর্ণ তাহার বহুলাংশ অতীতে গ্রামবাসিগণ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। চারিদিকেই প্রস্তর-গাত্রে এখনও কারিগরের লৌহাস্ত্রের দাগ দেখা যায়। মন্দিরে যাইবার সোপানশ্রেণীর ঠিক সম্মুখে উৎকীর্ণ থাকার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়াই যাত্রিগণ অনুশাসনটীর উপর দিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে লেখাটীর বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উপরে লম্বমান প্রস্তরখণ্ডের প্রদত্ত ছায়ার জন্য ঠিক এই স্থানটীতেই প্রতি বৎসর মেলার সময় বালা-বিক্রেতাগণ নিজ নিজ মাল সাজাইয়া বসিবার জন্য নির্ব্বাচন

করিত। এ কারণ সাধারণের নিকট ঐ শিলাখণ্ডটী "বালেগার গুণ্ডু" (বালাবিক্রেতার পাথর) নামে পরিচিত। প্রস্তরখণ্ডের বিভিন্ন অংশে উহারা নিজ নিজ সামিয়ানা ও আটচালা টাঙ্গাইবার বংশদণ্ড পুঁতিবার গর্ত্ত করিয়াছে। এই সকল কারণে লেখাটীর আজ নিতান্তই চরম দশা। উহার প্রায় সবটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতি সামান্য পরিমাণ অংশমাত্র পাঠযোগ্য আছে; এমন কি পংক্তিগুলি কোথা হইতে আরম্ভ এবং কোথায় শেষ হইয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। তবে যতদূর মনে হয় লেখাটী আটাশ লাইনে সম্পূর্ণ ছিল।

ইতিহাসানুরাগী পাঠক শুনিয়া তৃপ্ত হইবেন, বৎসর কয়েক হইল লিপিত্রয়ের সংরক্ষণ সম্বন্ধে মহিশুর দরবার অবহিত হইয়াছেন। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম সর্ব্বপ্রকার ধ্বংস-চেষ্টা হইতে রক্ষার জন্য ঐগুলির উপরে ছোটছোট কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের মোড়লের উপর উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত—তাহারই নিকট কুঠরীতে প্রবেশ পথের চাবী রক্ষিত থাকে।

মস্কি ঃ—এতদিন পর্য্যন্ত এইটিই সর্ব্বশেষ আবিষ্কৃত অশোক অনুশাসন বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হইল মান্দ্রাজ প্রদেশের কুর্নুল জেলায় অশোক অনুশাসন বাহির হওয়ায় ফলে ইহার সে গৌরব গিয়াছে।

নিজাম রাজ্যের দক্ষিণাংশে রায়চুড় নামে একটী জেলা আছে। উক্ত জেলার লিঙ্গসুগুর তালুকে মস্কি নামে একটি গ্রাম আছে। রায়চুড় সহর হইতে ইহার দূরত্ব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৪৬ মাইল হইবে। মস্কি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে অনেকগুলি পুরাতন যুগের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অদূরে হুটির পুরাতন স্বর্ণখনির খাতসমূহ অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এতদঞ্চল স্বর্ণোত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে M. C. Beadon নামক জনৈক খনিজ-ভূতত্ত্ববিদ কর্ত্তৃক এই প্রাচীন লেখাটী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি তখন সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে স্বর্ণের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। একটী গুহামুখে অবস্থিত বিশাল একখণ্ড পাষাণগাত্রে কতকগুলি অদ্ভুত ধরণের চিহ্ন তিনি দেখিতে পান। তাঁহার মনে হয় সম্ভবতঃ ঐগুলি প্রাচীনযুগের কোনপ্রকার বর্ণমালার অক্ষর হইবে। সন্দেহ নিরাকরণের জন্য কতকগুলি অক্ষরের নকল লইয়া তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের প্রাচীনলিপিপাঠকের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি দেখিবামাত্র ঐগুলিকে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার অশোকযুগের অক্ষর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কালবিলম্ব ব্যতিরেকে অতঃপর তিনি মান্দ্রাজ ও নিজাম সরকারের অনুমতি লইয়া মস্কিতে আগমন করিলেন। লেখাটী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইল। এটিও যে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অপর একটি অনুশাসন এবং অপ্রধান গিরিলিপি পর্য্যায়ে ধৃত তাঁহার অপরাপর লেখের সহিত ইহা যে সমশ্রেণীর সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

মস্কি গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত একটি গণ্ডশৈলগাত্রে স্বাভাবিক একটি গুহার দক্ষিণাভিমুখী প্রবেশপথে রক্ষিত ধূসরবর্ণের একটি গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ডের ভিতরের পৃষ্ঠে অশোকের লেখাটী উৎকীর্ণ। ঐ প্রস্তরখণ্ডটী ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৫ ফুট আয়ত। স্থানে স্থানে প্রস্তরগাত্র ঝরিয়া যাওয়ার ফলে লেখাটীর কতকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মস্কিগ্রাম সান্নিধ্যে কতকগুলি পুরাতন শিলালেখ দেখা যায়। এগুলি মধ্যযুগের। উহাতে মস্কি নামেরও উল্লেখ আছে। মস্কির প্রকৃত নাম লইয়া এখানকার অধিবাসিদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় এই গ্রামকে অভিহিত করে। অজ্ঞ কৃষিজীবীদের 'মশগি', বা 'মস্গি', স্থানীয় ব্রাহ্মণদের 'মস্কি' এবং মুসলমানদের 'মসগি' এই স্থানেরই নাম। চালুক্যরাজ জগদেকমল্লের এক লিপিতে (৯৪৯শক—১০২৭ খৃষ্টাব্দ) এই স্থানের "রাজধানী পিরিয় মোসঙ্গি" আখ্যা দেখা যায়। গ্রাম মধ্যে আবিষ্কৃত উক্ত নৃপতির আর একটী শিলালিপিতে ঐ অঞ্চলকে "মোসঙ্গির ব্রহ্মপুরী" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মস্কিতে প্রাপ্ত অচ্যুতরায় এবং সদাশিব রায়ের দুইটি লেখে "মোসগে নাড়ু"র (নাড়ু অর্থে, তামিল ভাষায় দেশ) প্রধান নগর "মোসগে"র উল্লেখ

আছে। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তামিল প্রাচীনলিপি হইতে জানা যায় চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহকে "মুশংগি" যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন Epigraphia Indica, Vol. IX, P. 230)। সেই মুশংগিও বর্ত্তমান মস্কির সহিতই অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এই সকল পুরাতন লিপি হইতে বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন মৌর্য্যযুগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ পর্য্যন্তই মস্কি এতদঞ্চলের এক সমৃদ্ধ জনপদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

মস্কি লিপি হইতে কয়েকটি নূতনতর তথ্য অবগত হওয়া যায় যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুশাসনসমূহ হইতে সুপরিস্ফুট হয় নাই। সমগ্র অশোক অনুশাসন মধ্যে শুধু এইটিতেই তাঁহার নিজ নাম ব্যবহার দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, এ কথা সত্য যে, সমগ্র অনুশাসন মধ্যে কুত্রাপি অশোকের নিজ নাম দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই 'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী' নামে অশোক নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ কারণ অনুশাসনোক্ত প্রিয়দর্শী এবং সংস্কৃত ও পালিসাহিত্য বর্ণিত অশোক নৃপতির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু মস্কিলিপি আবিষ্কারের পর হইতে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কারণ ইহাতে স্পষ্টই লিখিত দেখা যায় "দেবানং পিয়স অসোকস।"

৬

এবারে অশোকের অনুশাসনগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, নচেৎ প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাবরা অনুশাসন এবং দ্বিতীয় অপ্রধান গিরিলিপির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। একারণ এখানে শুধু প্রথম লিপিটীর পরিচয় দিব এবং ইহা হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকের নিকট এই অনুশাসনটী সবিশেষ মূল্যবান। ইহা অশোকের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস। এ বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে নমুনাস্বরূপ একটী লিপির অনুবাদ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নানা-কারণে লিপিসপ্তকের মধ্যে সাসারামে আবিষ্কৃত পাঠের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"দেবপ্রিয় এইরূপ বলেন—আড়াই বৎসরের অধিক কাল হইল আমি উপাসক হইয়াছি। বিশেষ কিছু করি নাই। এক বৎসরের অধিক হইল (কিছু কার্য্য করিয়াছি)। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপে যে-সকল অমিশ্র (অপ্রচলিত দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যের সহিত মিশ্রিত (অর্থাৎ প্রচলিত) করিয়াছি। ইহা চেষ্টার ফল। ইহা যে কেবল মহৎগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে। ক্ষুদ্রও চেষ্টার দ্বারা বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে (সক্ষম হয়)। এতদুদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোষণা করা যাইতেছে—ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই চেষ্টা করিতে থাকুন। পার্শ্ববর্ত্তী (জনপদসমূহের অধিবাসীরাও) জানুক। এই চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। এই উদ্দেশ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, ইহার বিপুল বৃদ্ধিই হউক। অন্ততঃপক্ষে দেড়গুণ বৃদ্ধি হউক। এই ঘোষণা (আমার) প্রবাসের (ব্যুথেন) দ্বিশত ষটপঞ্চাশৎ (২৫৬) রাত্রে প্রচার হইল। এই অর্থ পর্ব্বতে লেখান হউক। যেখানে যেখানে শিলাস্তম্ভ আছে। তাহাতেও লেখান হউক।"

অন্যান্য অনুশাসনে ঐ ২৫৬ সংখ্যাটি শুধু অঙ্কচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল সাসারামেই অঙ্কচিহ্ন ব্যতীত বাক্যদ্বারাও ঐ সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে দেখা যায়। এই ২৫৬ সংখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে, এবং অদ্যাবধিও এ সম্বন্ধে সকল রহস্যের সমাধান হয় নাই। পূর্ব্বে জর্ম্মন পণ্ডিত ডাক্তার বুলার বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ২৫৬ বর্ষপরে এই অনুশাসন প্রচার হইয়াছিল এইভাবে ঐ অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ পণ্ডিত সমাজে তাঁহার কৃত অর্থই গৃহীত হইত। তদনুসারে নানাজনে নানাভাবে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের এবং এই অনুশাসন প্রচারের অব্দ নিরূপণের প্রয়াস পাইতেন। কেহ কেহ বা ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। Senart ইহাতে ২৫৬ জন প্রচারক প্রেরণের সংবাদ পাইয়াছিলেন। Boyer-এর মতে বুদ্ধদেবের গৃহপরিত্যাগের পর ২৫৬ বর্ষ অতীত হওয়ার বৃত্তান্ত

ইহাতে পরিস্ফুট। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার টমাসই সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রকৃত অর্থভেদ করেন। সাসারাম লিপিতে "ৱবেসপংনা"র পর "লাতি" (রাত্রি) শব্দের অস্তিত্বের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এতকাল ধরিয়া কেহই ঐ শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতেও যে "দ্বে ষটপঞ্চাশে রাত্রি শতে" (এখানে 'শতে' কথাটীর প্রয়োগ পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হইলেও) ইত্যাকার পদের প্রচলন একেবারেই অজানা নহে তাহাও তিনি দেখান। "ব্যুথেন" বা প্রয়াত কথাটী মৃত বুদ্ধদেবের নির্দ্দেশক এ অর্থে গ্রহণ করা অপেক্ষা বিবাসিত বা প্রবাস-যাত্রায় গত স্বয়ং সম্রাট অশোকের দ্যোতক এই ব্যাখ্যাই যে অধিকতর সঙ্গত তাহাও তিনি সেই সময়ে সবিশেষ যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এখানে বলা ভাল যে অধুনাতন বিদ্বৎ-সমাজে টমাসকৃত ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে।

এই লিপিটীর আর একস্থলেও পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে সকলে মনে করিতেন যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই অশোক এই আদেশবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। "জম্বুদ্বীপে যাঁহারা এতদিন সত্য-দেবতা বলিয়া গৃহীত হইতেন তাঁহাদিগকে আমি মিথ্যা ও মনুষ্যসমান করিয়াছি," এইরূপে দীর্ঘকাল যেখানে জম্বুদ্বীপ কথাটীর প্রয়োগ আছে সেই অংশের ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু এক্ষণে সে ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কি কারণে সে কথা বলিতে গেলে পালি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হয়। সাধারণ পাঠকের তাহা ভাল লাগিবে না বলিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইল।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের কালনির্ণয় লইয়া পণ্ডিত-গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। একমতে রাজত্বের নবমবর্ষে কলিঙ্গবিজয়ের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন; সে হিসাবে রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (৯+২॥০+১) প্রথম অপ্রধান গিরিলিপির প্রচারকালে তিনি রীতি-মত বৌদ্ধ। আর একমতে রাজত্বের শেষভাগে বা অন্ততঃ ৩০-৩২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ হন। ডাক্তার বুলার এবং ডাক্তার ফ্লীট এই মত পোষণ করিতেন। বুলারের মতে অশোক বরাবর বৌদ্ধ ছিলেন না। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর ব্যথিত হইয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই রাজত্বের ২৯শ বর্ষে তিনি আবার উহা পরিত্যাগ করেন। সাড়ে তিন বৎসর পরে অর্থাৎ রাজত্বের ৩২॥০ বর্ষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন বলবৎ যুক্তিই দেখা যায় না।

ডাক্তার ফ্লীটের ক্ষুদ্র গিরিলিপি সম্বন্ধে এক নিজস্ব মত ছিল। এবং তাহা তিনি বহু বিভিন্ন প্রবন্ধে সবিশেষ যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মতে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮২ অব্দে বুদ্ধদেবের দেহাবসান হওয়ার ২৫৬ বৎসর পরে এই অনুশাসন প্রচার হয়। অশোকের রাজ্যাভিষেকের আটত্রিশেরও অধিক বৎসর পরে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল—তখন তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করতঃ সুবর্ণগিরিতে পূর্ণ বৌদ্ধভিক্ষুজীবন যাপন করিতে-ছিলেন। রাজগৃহ বা রাজগিরকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত শৈলপঞ্চকের অন্যতম, বর্ত্তমান সোনেগিরি পাহাড়ই সেই সুবর্ণগিরি বলিয়া ফ্লীট মনে করিতেন।* নানা কারণে ফ্লীটের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অশোক রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ ও ভিক্ষুজীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহার স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ নাই। এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে দ্বীপবংশ, মহাবংশ, দিব্যা-বদান, অশোকাবদান প্রভৃতি পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটীতে কি তাহার প্রসঙ্গক্রমেও আভাস থাকিত না? স্বতন্ত্র কোন দৃঢ় প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধু এই অনুশাসনের "সুবর্ণগিরির রাজপুত্র" এই কথা দুইটির জোরে গঠিত ফ্লীটের সিদ্ধান্ত শুধুই কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়াই আমার মনে হয়। রাজগৃহের অন্যতম নগণ্য সোণগিরি পাহাড়কে এতটা প্রাধান্য দিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অশোকের কালে বর্ত্তমান সোণ-

* ফ্লীটের অভিমতের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য, Imperial Gazetteer of India, Vol. II, pp. 42, 435; J. R. A. S., 1904, p. 355.

গির যে সুবর্ণগিরি নামে অভিহিত হইত, তাহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের নানাগ্রন্থে রাজগৃহের শৈলপঞ্চকের বিভিন্ন যুগে প্রচলিত বিভিন্ন নাম দেখা যায় না। ফ্লীটের সিদ্ধান্ত যদি সত্যই হয় তাহা হইলে অনুশাসনে অশোক সুবর্ণগিরির পরিবর্ত্তে রাজগৃহের নামোল্লেখ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। রাজগৃহের সোণ্‌গিরি যদি নামসাদৃশ্যবশতঃ সুবর্ণগিরি হইতে চাহে তবে সে দাবী করিবার অধিকার আরও অনেক স্থানেরই আছে। ধীর-ভাবে সকল কথার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ফ্লীটের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনই বলবৎ যুক্তি নাই।

সুবর্ণগিরি অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল সে কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। উত্তর ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত এবং স্বয়ং সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক প্রচারিত লেখ-গুলিতে সুবর্ণগিরির নাম নাই। আর দাক্ষিণাত্যে মহিশুর রাজ্যে আবিষ্কৃত এবং অশোকের আদেশে সুবর্ণগিরির রাজ-পুত্রের সহযোগিতায় ইসিলার রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রচারিত লিপিগুলিতে সুবর্ণগিরির উল্লেখ আছে। ইহাই কি সুবর্ণগিরির দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের যথেষ্ট প্রমাণ নহে? সত্য বটে দাক্ষিণাত্যে সুবর্ণগিরির প্রকৃত অবস্থান এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। সিদ্ধপুর এবং মস্কি এতদ-ঞ্চলের মধ্যে কোন স্থানে উহা সম্ভবতঃ ছিল। প্রথমোক্ত-স্থানের সন্নিকটে ইসিলার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মস্কি অনুশাসনে সুবর্ণগিরির রাজপুত্রের বা ইসিলা অথবা অপর কোন স্থানের মহাসাত্রগণের কোন প্রসঙ্গ নাই; উহা স্বয়ং "দেবানং পিয়স অসোকস" বাণী। এ কারণ সিদ্ধপুরের ন্যায় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা কতকটা উত্তর অঞ্চলে মস্কির ন্যায় স্থানেই দক্ষিণপ্রদেশের শাসনকেন্দ্র সুবর্ণগিরির অবস্থিত থাকার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই মনে হয়। মস্কির নিকটে নানাস্থানে স্বর্ণখানি আছে। বহুপ্রাচীন কালেও যে এখানকার সুবর্ণের অস্তিত্ব লোকেরা অবগত ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ এতদঞ্চলে নানাস্থানে এখনও অনেক পুরাতন অব্যবহৃত খাত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত দুটির খনিই পৃথিবীতে গভীরতম স্বর্ণখনি। সুবর্ণগিরি নামেও ঐস্থানে সুবর্ণের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তাই মনে হয় অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রদেশের রাজধানী সুবর্ণগিরি বর্ত্তমান মস্কির সমীপেই কোনস্থানে অবস্থিত ছিল।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
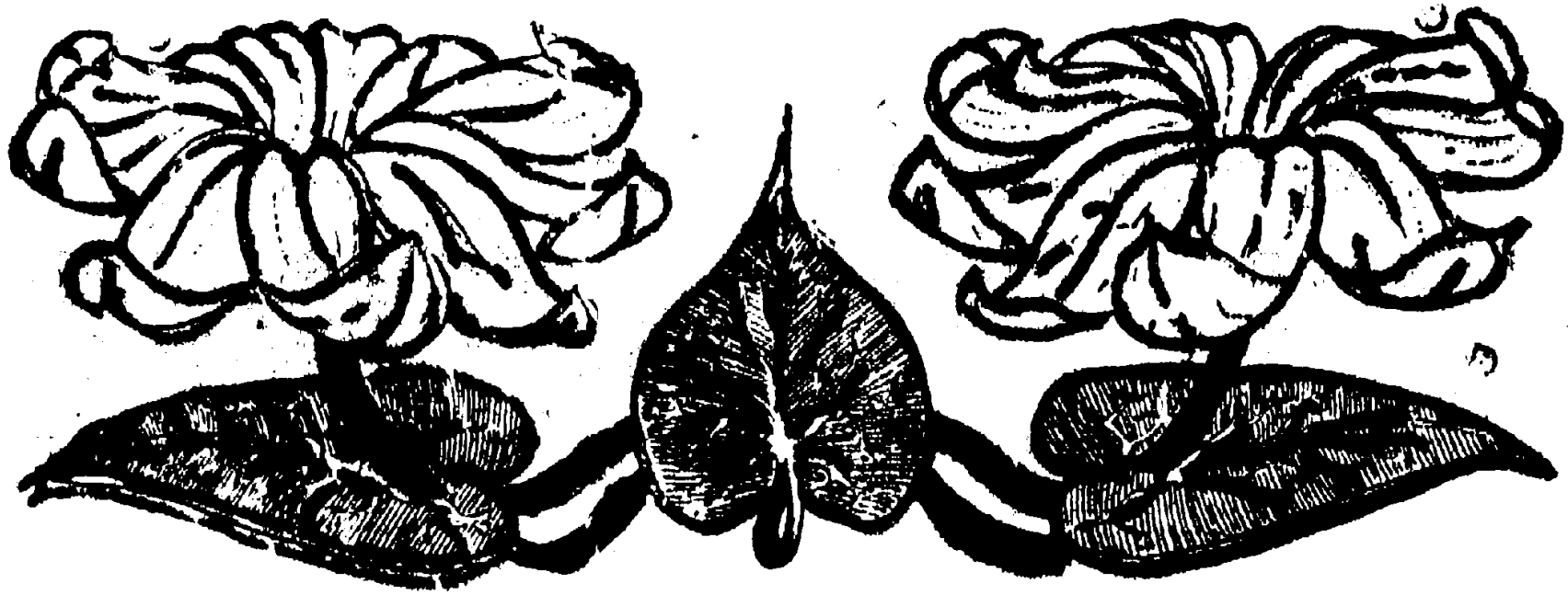
যুগসন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্

পঞ্চম খণ্ড

কর্ত্তব্য-সংঘাত

প্রথম স্তবক

বিজয়ান্তের সংগ্রাম

১

ল্যান্টিনেক ধৃত হইল।

শ্যেন-দৃষ্টি সিমুর্দ্যাঁনের তত্ত্বাবধানে লাটুর্গের নিম্নতলস্থ অন্ধকূপের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং মার্কুইস্ তথায় নীত হইলেন। একটা ল্যাম্প, এক কলসী জল ও একটি রসদের রুটি কক্ষমধ্যে রক্ষিত হইল। ভূমিতলে এক বোঝা খড় ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পনর মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই সকল ব্যাপার সমাধা হইল, এবং অন্ধকূপের দ্বার পুনরায় সশব্দে বন্ধ হইল।

অতঃপর সিমুর্দ্যাঁন গভেনের সন্ধানে চলিলেন। দূরে প্যারিসের গির্জ্জার ঘড়িতে এই সময়ে ১১টা বাজিয়া গেল। সিমুর্দ্যাঁন তাহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকে বলিলেন, "আমি কোর্ট-মার্শ্যাল (সামরিক বিচার আদালত) আহ্বান কর্‌তে যাচ্ছি; তুমি তা'তে থাক্‌বে না। তুমি গভেন বংশের সন্তান, ল্যান্টিনেকও সেই বংশীয়। তুমি তা'র অতি নিকটতম আত্মীয়, সুতরাং তোমার পক্ষে তা'র বিচারক হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্যাপেটের প্রাণ দণ্ডের আনুকূল্যে ভোট দিয়েছিল বলে' ইগ্যালিটের আমি নিন্দা করি। কোর্ট-মার্শ্যালে তিনজন বিচারক থাক্‌বে:—একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী,—সে পদে থাক্‌বে গেচাম্প; একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী, সার্জ্জেণ্ট রাডুবকে নিলেই চল্‌বে; আর আমি। সভাপতির কাজ আমিই করব। এতে তোমার কোনো সংস্রব আর এখন রইল না। আমরা কনভেনসনের ব্যবস্থানুসারে কাজ কর্‌ব; আমরা কেবল ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের সনাক্ত সম্বন্ধে প্রমাণ নেব। আগামী কাল কোর্ট-মার্শ্যাল, তারপর দিন গিলোটিন। এই বার ভেণ্ডি মরল।"

গভেন একটি কথাও কহিল না। প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তির চিন্তায় সিমুর্দ্যাঁনও ব্যস্ত ছিল। গভেনকে একাকী রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কখন কোন্ স্থানে শেষ কার্য্যটি নিষ্পন্ন হইবে, সিমুর্দ্যাঁনকে তাহার নির্দ্ধারণ ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তখনকার কালে বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া জল্লাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তৎসম্বন্ধে সহায়তা করা বিচারকের পক্ষে সদৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইত। সিমুর্দ্যাঁনেরও সে অভ্যাস ছিল। ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট ও "স্পানিশ ইনকুইজিসন" হইতে তিরনব্বই সালের "বিভীষিকার রাজত্বেও" এই প্রথাটি চলিয়া আসিয়াছিল।

গভেন অন্যমনস্ক।

অরণ্য হইতে একটা শীতল হাওয়া শন্ শন্ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল; কার্য্যভার গেচাম্পের হস্তে সমর্পণ করিয়া গভেন লাটুর্গের পাদমূলে কানন-পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আপনার শিবিরে প্রবেশ করিল। সেনাপতির পদ-মর্য্যাদা-সূচক একটা ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তক আবৃত করিয়া গভেন সেই রক্তাক্ত প্রান্তরে একাকী পাদচারণা করিতে লাগিল। এইখানেই যুদ্ধ হইয়াছিল; তখনও আগুন জ্বলিতেছে, কিন্তু সেদিকে আর কাহারও লক্ষ্য নাই। রাডুব শিশুগণ ও তাহাদের জননীর

নিকট দাঁড়াইয়াছিল—তাহারও বক্ষ সেই জননীর বক্ষেরই মতো মাতৃ-স্নেহে উদ্বেল। সেতু-প্রাসাদ প্রায় ভস্মীভূত। সৈনিকগণ মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল; আহতদের শুশ্রূষা করা হইতেছে; প্রতিরোধ-প্রাচীর ভগ্ন করা হইয়াছে: কক্ষ ও সোপান হইতে মৃতদেহগুলি অপসারিত হইয়াছে; যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতার সহিত যুদ্ধান্তে সব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করা হইতেছিল। এই সব কিছুই কিন্তু গভেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

গভীর চিন্তায় গভেন এতই তন্ময় ছিল যে, সিমুর্ঘানের আদেশে দুর্গরক্ষী সৈন্যগণের সংখ্যা যে দ্বিগুণ করা হইয়াছিল তাহাও তাহার নজরে পড়িল না।

অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয় দুইশত ফুট দূরে গভেন দেখিতে পাইল সেই দুর্গ-প্রাচীরের ভাঙনটা, যাহার কালো মুখের ভিতর দিয়া সে কারাদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সেই ভূতলস্থ কক্ষ, ঐখানে প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্কুইসের কারাকক্ষের দ্বারও এই তলে। ভাঙনের নিকটে দাঁড়াইয়া সশস্ত্র প্রহরী ঐ দ্বারে চৌকি দিতেছিল।

এই রকম অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কাণের ভিতর মৃত্যু-ঘোষী ঘণ্টা-ধ্বনির মতই এই কয়টি কথা বাজিতে লাগিল:—"আগামী কল্য কোর্ট-মারশ্যাল, তারপর দিন গিলোটিন।"

অগ্নি তখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী যতটা জল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহা উহার উপর ঢালিতেছিল। তবু থাকিয়া থাকিয়া বহ্নি তাহার শিখা বিস্তার করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা তল সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল, আর যেন প্রলয়-দেবতার তাণ্ডব নৃত্যে আলোড়িত বিরাট মশাল হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের ঘূর্ণিবৃষ্টি ব্যোমপথে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিদ্যুচ্ছটার মতো তীব্র জ্যোতিতে দূরতম দিক্‌প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং তন্মধ্যে লাটুর্গের ছায়ামূর্ত্তি অকস্মাৎ অতিকায় দৈত্যের মতো কানন-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখাইতেছিল। সেই ভাঙনের সম্মুখে অস্পষ্ট অন্ধকারে গভেন ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছিল। সময় সময় সে দুই হাতে মাথার পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিতেছিল। গভেন ভাবিতেছিল।

২

গভেনের আত্ম-জিজ্ঞাসা।

অতলস্পর্শ চিন্তাসাগরে সে মগ্ন। একটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের এ কি রূপান্তর!

অথচ এই পরিবর্ত্তন গভেন স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জটিল ঘটনাজালের পরিণতি যে এমন অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইবে সে তাহা কখনো কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এমন ব্যাপার সম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তাহা আজ নিতান্তই প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, অপরিহার্য্য সত্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত।

ইহাকে এড়াইবার যো নাই। সঙ্কল্প এখন স্থির করিতে হইবে। যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহার উত্তর না দিয়া উপায় নাই। কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল?—ঘটনা-চক্র।

কেবল ঘটনা-চক্রই বা বলি কেন? ঘটনা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু বিবেক অপরিবর্ত্তনীয়। ঘটনা-চক্র যখন আমাদের অন্তরাত্মার নিকট কোন প্রশ্ন উপস্থিত করে, আমাদের অন্তরস্থ চিরজাগ্রত বিবেক তখন আমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য করে।

আকাশের মেঘ আমাদিগকে ছায়ায় আবৃত করে, কিন্তু মেঘের উপর হইতে নক্ষত্র-নিচয় তাহাদের কিরণরেখা আমাদের দিকে প্রেরণ করে। ছায়া কিংবা আলো—ইহাদের কোনটাকেই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

গভেন যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া; নির্দ্দয় বিচারকের কঠোর প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেছে। বিচারক—তাহার নিজেরই বিবেক।

গভেন অনুভব করিল তাহার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প, পবিত্র শপথ, সুচিন্তিত

সিদ্ধান্ত—সমস্তই তাহার অন্তরস্থ এই ভীষণ ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এই মাত্র সে যাহা দেখিয়াছে যতই সে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে সমস্ত ওলট পালট হইয়া যাইতে লাগিল।

গুরুতর সমস্যা! আর গভেন তাহার সহিত সংসৃষ্ট। সিমুর্দ্যান যতই কেন বলুন না, "এর সঙ্গে তোমার আর কোন সংস্রব নাই," গভেন কিছুতেই এ ব্যাপার হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে পারিল না। প্রভঞ্জনের বেগে মহান্ মহীরুহ যখন সমূলে উৎপাটিত হয় তখন তাহার বক্ষে যে বেদনা বাজে গভেনও বুকের মধ্যে সেইরূপ বেদনা অনুভব করিল।

মনুষ্য-চরিত্র মাত্রেরই একটা ভিত্তিভূমি থাকে। তাহা টলিয়া উঠিলে বড়ই বিপদ। গভেনের এখন সেই দারুণ বিপদ সমুপস্থিত। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সে এই সমস্যার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই রকম একটা ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সহজ নহে; মানসিক যন্ত্রণা তাহাতে খুবই বেশী। তাহার সম্মুখে যেন রাশীকৃত অঙ্ক সংখ্যা, সে গুলির সমষ্টি তাহাকে করিতে হইবে। গণিতের নিয়মে যেন মানুষের অদৃষ্টকে কষিয়া দেখিতে হইবে। গভেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিষয়টা সে ভাবিয়া দেখিতে বিশেষ চেষ্টা করিল; চিন্তা-সূত্র একত্রিত করিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে করিতে অন্তরমধ্যে উদ্ভূত বিদ্রোহ-ভাবকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইল; মনের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাবলী সে যেন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিল।

এই রকম প্রশ্ন সময় সময় কাহার না মনোমধ্যে উদিত হয় যখন জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া কি পশ্চাৎপদ হওয়া —ইহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়?

গভেন এইমাত্র এক অলৌকিক ব্যাপ্যার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পার্থিব সংগ্রামের সমাপ্তি হইতে না হইতেই এক স্বর্গীয় সংগ্রামের সূচনা—সু ও কু-এর দ্বন্দ্ব। অবশেষে পাষাণ হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে।

সমস্ত অনর্থের মূল—সমস্ত অকল্যাণের আশ্রয়, হিংস্র, ভ্রান্ত, অন্ধ, গর্ব্বিত, আত্মম্ভরী, একগুঁয়ে এই লোকটার অকস্মাৎ একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মানব-প্রেম মানবত্বকে ছাপাইয়া উঠিল। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল? ক্রোধ ও জিঘাংসার অভ্রংলিহ পর্ব্বতশৃঙ্গ কিরূপে ভূমিসাৎ হইল? কোন্ অস্ত্রে কোন্ যুদ্ধোপকরণের সাহায্যে? সে যে শিশুর দোল্না শয্যা।

গভেনের চোখে ধাঁধা লাগিল। সামাজিক বিরোধের সংঘর্ষ যখন দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কৃষ্ণ মূর্ত্তি যখন পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাস্য করিতে করিতে দারুণ বিষ উদ্গীরণ করিতেছে, যখন প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি কামানের গোলার মতো প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেছে, আর ন্যায় সাধুতা ও সত্যের ধারণাও একেবারে তাহাদের চিত্তপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই কিনা অজ্ঞেয় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অদৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চিরন্তন সত্যের মহতী জ্যোতিতে চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

মিথ্যা ও আপেক্ষিক সত্যের অন্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে সহসা যেন সার সত্যের শান্ত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। দুর্ব্বলের অকথিত আবেদনই যেন সন্ধি স্থাপনের সুযোগ ঘটাইল।

অতি অল্পকালের মধ্যে গভেন পর পর কত চিত্রই না দেখিল। সে দেখিল, তিনটি অসহায় জীব—সদ্যঃপ্রসূত বলিলেই হয়—অনাথ, পরিত্যক্ত অনুন্মেষিত-বিচারবুদ্ধি, এখনও ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, মহাবিপদের মুহূর্ত্তেও হাস্যময়—এইরূপ তিনটি শিশুও প্রতিহিংসা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি গৃহ-যুদ্ধের সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়ী হইল। সে দেখিল পাপ-যজ্ঞের আহুতির জন্য প্রজ্বলিত ভীষণ নরকাগ্নিও অবশেষে নির্ব্বাপিত হইল এবং সমস্ত সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রই নিষ্ফল হইল। সে আরও দেখিল, প্রাচীন আভিজাত্যের দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা—যাহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকল প্রকার অন্যায়েরই সমর্থন করে, বৃদ্ধ বয়সের পাষাণ-কঠিন কূট রাজনীতি—সমস্তই শিশুর সরল দৃষ্টির সম্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা —শিশু যে এই সকলের সমষ্টি। শিশু-আত্মাকে ঘিরিয়া দেববালাগণ বুঝি নিঃশব্দ-চরণপাতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

যুদ্ধের ভৈরব হুঙ্কার, হত্যার গুপ্ত মন্ত্রণা, বজ্রপাণি মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য—এই সকলের মধ্যে সহসা শিশুর

শুভ্র নির্ম্মলতা পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে পদদলিত করিয়া সগর্ব্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, আর সেই শিরে বিজয় মুকুট।

তথনকার মতো মনে হইতেছিল বুঝি অন্তর্বিপ্লব আর নাই; বর্ব্বরতা নাই; বিদ্বেষ নাই; পাপ নাই; অন্ধকার নাই। শিশুহাস্যের উষালোকে এইসব বিকট প্রেতছায়া বুঝি মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই দ্বন্দ্বে ভগবান ও শয়তানের উভয়েরই হস্ত যেমন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল, ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর তেমন হয় নাই। মানুষের বিবেকেই এই দ্বন্দ্বের সংগ্রামের ক্ষেত্র। এতক্ষণ সংগ্রাম চলিয়াছিল ল্যান্টিনেকের বিবেকে। এখন আবার সেইরূপ সংগ্রাম—বুঝি তদপেক্ষাও গুরুতর তদপেক্ষাও কঠিনতর সংগ্রাম—আরম্ভ হইল আর এক বিবেকে। তাহা গভেনের।

গভেন ভাবিতে লাগিল।

শত্রু-পরিবেষ্টিত, দণ্ডিত, আইনের আশ্রয়বঞ্চিত মার্ক্ইস সার্কাসের বন্য জন্তুর মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও লৌহ ও অগ্নি-বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ যে অলৌকিক ব্যাপার। এরূপ সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ যে-পলায়ন তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অরণ্য আবার তাহার অধিকারের মধ্যে আসিয়াছিল, কাননের নিভৃত নেপথ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবার তাহার সুযোগ ঘটিয়াছিল; অরণ্যের ভূনিম্নে আত্মগোপন করিয়া আবার নবশক্তিতে যুদ্ধারম্ভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী গভেনকে বরণ করিয়া থাকিলেও ল্যান্টিনেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অচিরেই পুনরায় অসংখ্য-দুর্গ-স্বামী, অসীম-কান্তার-বিহারী, অদৃশ্য, অনভিগম্য, দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-দলপতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, মুক্ত পশুরাজ আবার জালের ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছে। মার্ক্-ইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় বিপদকে পুনরায় বরণ করিয়া লইয়াছেন।

তিনি যখন অগ্নি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, তখন গভেন লক্ষ্য করিয়াছিল, তিনি কী নির্ভীক। নিজে পুড়িয়া মরিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার যখন কাঠের মই দিয়া নামিয়া আসিয়া কোনো দিকে দৃক্-পাত না করিয়া শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন তখনও তিনি কেমন নির্ভীক্।

কেন তিনি এরূপ করিলেন? তিনটি শিশুকে বাঁচাইবার জন্য। তাহারা—সাধারণতন্ত্রের দল—তাহারা এই লোকটার সম্বন্ধে কি করিতে যাইতেছে? গিলোটিনে তাহাকে হত্যা করিতে?

এই শিশুত্রয় কি মার্ক্ইসের নিজের সন্তান? না। তাহার বংশের দুলাল? না। তাহার সমাজের? তাও নয়। অজ্ঞাত-কুলশীল, জীর্ণচীর-পরিহিত, নগ্নপদ, কুড়িয়ে-পাওয়া, তিনটি ভিখারী ছেলেমেয়ের জন্য এই অভিজাত বংশীয় বৃদ্ধ সামন্তরাজ বিপন্মুক্ত, স্বাধীন নিরাপদ হইয়াও আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছেন! শিশুদিগকে বাঁচা-ইতে গিয়া তিনি আপনার গর্ব্বোন্নত শির—যাহা এতাবৎ কাল জনগণের ভীতিস্থল ছিল, কিন্তু অধুনা আত্মত্যাগে মহান্, সেই শির—অনায়াসে শত্রুর উদ্যত খড়্গতলে পাতিয়া দিলেন। তার তাহারা সেই বলি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত হইয়াছে।

আত্মরক্ষা ও অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, এই দুইএর মধ্যে বাছাই করিয়া লইবার সমস্যা যখন উপস্থিত হইল তখন মহাপ্রাণ মার্ক্ইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। আর তাঁহার এই উদার নির্ব্বাচনই বিনা দ্বিধায় মঞ্জুর করিয়া তাহাকে বধ করা হইবে। বীরত্বের কি অদ্ভুত পুরস্কার! মহত্ত্বের প্রতিদান বর্ব্বরতায়! রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে কি কলঙ্কের কথা! সাধারণতন্ত্রের কি মহাপতন!

কুসংস্কারপূর্ণ, দাস-মনোভাবাপন্ন এই লোকটা সহসা যেন রূপান্তরিত হইয়া মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া আসিল; আর জগতের মুক্তি ও স্বাধীনতাকামীরা এখন ভ্রাতৃবিরোধ, রক্তপাত প্রভৃতি গৃহযুদ্ধের মলিন পঙ্কেই ডুবিয়া থাকিবে? ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে ভ্রান্তির পক্ষীয়েরা, কিন্তু সত্যের সৈনিকগণের নিকট তৎসমুদয়ের আদর নাই!

তবে এই পরাজয়কেই মানিয়া লইতে হইবে? মহাপ্রাণতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জগতের চক্ষে প্রবলতর পক্ষই কি নিজেদের দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? বিজয়-গৌরব-দীপ্ত ললাট কি হত্যাপরাধে কলঙ্কিত হইবে? লোকে বলাবলি করিবে, রাজপক্ষীয়েরা শিশুদের রক্ষা করিল, আর সাধারণতন্ত্রীরা বৃদ্ধদের প্রাণসংহার করিল!

মুগ্ধ জগৎ চাহিয়া দেখিবে,—এই বীর, অশীতিবর্ষীয় শক্তিমান্ বৃদ্ধ, এই নিরস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ, যাহাকে শৌর্য্যাভিভূত করিয়া ধৃত করা যায় নাই, পরন্তু কাপুরুষসুলভ পন্থাবলম্বনে আটক করা হইয়াছে, একটা সুমহৎ কার্য্য সমাপনের পরক্ষণে যিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—জগৎ দেখিবে—নির্ভীক্ পাদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের সোপান আরোহণ করিতে করিতে তিনি কোন্ মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্লোকে মহাপ্রস্থান করিতেছেন। সেই শির, যাহাকে ঘিরিয়া হুতাশনের কবল হইতে সদ্যঃরক্ষিত শিশুত্রয়ের সকৃতজ্ঞ মূক আবেদন নিঃশব্দে ব্যক্ত হইবে, কোন্ প্রাণে তাহারা সেই শির ঘাতকের কুঠার নিম্নে স্থাপন করিবে! কসাইয়ের পক্ষেও নিন্দনীয় এইরূপ শাস্তিতে মার্ক্ইসের বদনমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল, আর সাধারণতন্ত্রের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিবে! পরিতাপের কথা আরও এই যে, এমন একটা নৃশংস কাণ্ড সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি গভেনের সম্মুখেই অনুষ্ঠিত হইবে!—যে ইহা বারণ করিতে পারিত, সে-ই চুপ করিয়া থাকিবে। "ইহাতে তোমার আর কোনও সংশ্রব নাই"—এই সদম্ভ অভয়বাণীতেই সে কি নিজেকে পাপমুক্ত মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে? এরূপ স্থলে স্বীয় ক্ষমতার অব্যবহারই কি দুষ্কার্য্যের সহায়তা নহে? গভেনের মনে এই কথা না উঠিয়া পারিলনা যে, এই পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত যাহারা তাহাদের মধ্যে অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষাও যে বিনা আপত্তিতে উহা অনুষ্ঠিত হইতে দিতেছে, তাহার আচরণই অধিকতর ঘৃণ্য, কারণ সে ত কাপুরুষ!

কিন্তু এই প্রাণদণ্ড—সে নিজেই কি এই প্রাণদণ্ডের ভয় দেখায় নাই? গভেন, দয়াশীল গভেনই কি ঘোষণা করে নাই যে, ল্যান্টিনেকের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হইবে না—যে, ল্যান্টিনেক্ ধৃত হইলে সে নিজেই তাঁহাকে সিমুর্দ্যানের হস্তে সমর্পণ করিবে? গভেন তো সেই মস্তক সিমুর্দ্যানকে দিতে বাধ্য। তাই হৌক্। কিন্তু,—বাস্তবিক, ইহা কি সেই মস্তক?

এতদিন গভেন ল্যান্টিনেকের কেবল একটা দিকই দেখিয়া আসিয়াছে। সে নিষ্ঠুর যোদ্ধা, রাজ-কেন্দ্রীয় সামন্ত-প্রথার উন্মাদ ভক্ত, বন্দীর হত্যাকারী, রক্তপিপাসু দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ। এরূপ লোককে গভেন ভয় করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করিতে গভেনের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। দুর্দ্দান্তের প্রতি সেও কঠোর হইতে পারিত। যাহারা হত্যা করে, সেও তাহাদিগকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পথ সরল ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার অনুসরণ করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কিন্তু সহসা সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে পথের ঋজুরেখা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা বাঁক,—ঘুরিবামাত্র চক্ষে নূতন জগৎ, দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্ত্তন, রঙ্গমঞ্চে ল্যান্টিনেকের এক অপরিচিত মূর্ত্তির আবির্ভাব। রাক্ষসের স্থলে বীরপুরুষ, তাহার চেয়েও বেশী, মানুষ—হৃদয়বান্ মানুষ। আর এ তো হত্যাকারী নহে, এযে রক্ষক। স্বর্গীয় জ্যোতিতে গভেনের চক্ষু ঝল্সিয়া গেল। মহানুভবতার বজ্রাঘাতে গভেন আহত হইল।

এই আলোকের আঘাত কি আলোকের প্রতিঘাত উৎপন্ন করিবেনা? অতীতের প্রতিনিধি কি ভবিষ্যতের প্রতিনিধিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে? বর্ব্বরতা ও কুসংস্কার-যুগের মনুষ্য সহসা দিব্যপক্ষ বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধব্যোমে উড়িয়া যাইবে, আর দেখিবে যে, আদর্শের পূজারী নিম্নে তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল ভূপৃষ্ঠে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে! অতীতের শোণিতার্দ্র পঙ্কে গভেন গড়াগড়ি দিবে, আর ল্যান্টিনেক মহান্ ভবিষ্য-নবজীবনের অরুণ-কিরণে মণ্ডিত হইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিবে!

আর একটা কথা—বংশের দাবী! সে যে রক্তপাত করিতে যাইতেছে—রক্তপাত হইতে দেওয়া এবং রক্তপাত করা একই কথা—তাহা কি তাহার নিজেরই রক্ত নহে? গভেন বংশেরই রক্ত নহে? তাহার পিতামহ মৃত কিন্তু তাহার খুল্ল-পিতামহ এখনও জীবিত। মার্ক্ইস ডি ল্যান্টিনেকই সেই খুল্ল-পিতামহ। গভেনের মনে হইল,

যেন তাহার পিতামহের প্রেতাত্মা সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় ভ্রাতার এই যে বলপূর্ব্বক সমাধির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। যেন তিনি দিব্য-জ্যোতির্মণ্ডিত স্বীয় মস্তকের অনুরূপ সেই শুভ্র শিরের সম্মান করিতে গভেনকে আদেশ করিতেছেন। গভেন ও ল্যান্টিনেকের মাঝখানে যেন এক অশরীরী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া—চক্ষে তাহার তিরস্কারসূচক সরোষ দৃষ্টি।

মানুষকে অমানুষ করাই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের লক্ষ্য? সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ছেদন করা এবং অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক সংস্কারকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা—এই করিতেই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপত্তি? কখনই নহে। এই সকল চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য নহে, পরন্তু সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই '৮৯ সালের অভ্যুদয়। ব্যাষ্টিল-ধ্বংস মানব জাতির মুক্তিরই সূচনা করিয়াছে; সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ বংশ প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছে।

প্রশ্ন এই, ল্যান্টিনেক যখন পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদার মানব-প্রেমের প্রশস্ত ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল, গভেন কি তখন সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে ফিরিয়া যাইবে? খুল্ল-পিতামহের অগ্রগতি কি ভ্রাতুষ্পৌত্রের পশ্চাদ্-গমন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে? না, উভয়েই আসিয়া আলোকের উচ্চস্তরে মিলিত হইবে?

স্বীয় বিবেকের সহিত লড়াই করিতে করিতে এই প্রশ্নই এখন গভেনের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার উত্তরটাও যেন মন হইতে স্বতঃই বাহির হইয়া আসিল, ল্যান্টিনেককে বাঁচাইতেই হইবে। হ্যাঁ, তা তো বটেই; কিন্তু—কিন্তু ফ্রান্স?

সমস্যা এইখানে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ফ্রান্সের মহাবিপদ উপস্থিত—জার্মাণী রাইন নদী অতিক্রম করিয়া আসিতেছে; ইটালী আল্পসের এবং স্পেন পিরে-নীজের গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। একমাত্র ভরসা—সাগর। পরিখীকৃত-সাগরা ফরাসীভূমি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু সেই সাগর এখন আর তাহার আয়ত্তের মধ্যে নহে। সেখানে ইংলণ্ডেরই প্রভুত্ব। সত্য, ইংলণ্ড এই সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু একজন ইংলণ্ডের জন্য এই সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উদ্যোগী; সে আপনার অনুকূল হস্ত ইংলণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়াছে; পিট, ক্রেগ, কর্ণ-ওয়ালিশ, ডাণ্ডাস প্রভৃতি জলদস্যুগণকে সে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিতেছে, "এসো ইংলণ্ড, ফ্রান্স্‌কে আসিয়া অধিকার কর।" এই ব্যক্তিই মার্ক্ইস্ ডি ল্যান্টিনেক্।

সে এখন ধরা পড়িয়াছে। তিন মাসের উন্মত্ত প্রচেষ্টা ও অনুসরণের ফলে অবশেষে শিকার জালে পড়িয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের হস্ত এই মাত্র এই দেশ-বৈরীকে ধরিতে পারিয়াছে; '৯৩ সালের বদ্ধমুষ্টি এই মাত্র এই রাজপক্ষীয় হত্যাকারীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। বিধাতার রহস্যময় অমোঘ বিধানে—দেশমাতৃকার এই কুসন্তান এখন স্ববংশেরই অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইয়া শাস্তির প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বদেশের শত্রুতাসাধন করিতে যাইয়া এই কুলাঙ্গার এক্ষণে স্ব-বাসের পাষাণ কারায় নিজেই বন্দী। ইহাতে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের হস্ত স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। কালের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাশত্রুনিপাতের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এত হত্যা, এত রক্তপাতের পর সে এখন শৃঙ্খলিত। আর তাহার যুঝিবার শক্তি নাই, আর সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইবার তাহারই বুদ্ধিতে পরিচালিত ভেণ্ডির বিদ্রোহানল চিরতরে নির্ব্বাসিত হইবে। যে এতদিন নির্দ্দয় ভাবে নরহত্যা করিয়া আসিয়াছে,—এইবার তাহার মরিবার পালা উপস্থিত। এমন লোককেও কি কেহ বাঁচাইতে চেষ্টা করে?

সিমুর্দ্যান অর্থাৎ '৯৩ সাল, ল্যান্টিনেক অর্থাৎ রাজতন্ত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কে তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে শিকার ছিনাইয়া লইবে? সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ল্যান্টিনেক আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মন্দিরে। বাহির হইতে কেহ আসিয়া সেই দ্বার অর্গলমুক্ত করিবে কি? এই সমাজদ্রোহী আজ মৃত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ, জিঘাংসা ও গৃহবিবাদের অবসান হইয়াছে। তাহাকে পুনর্জীবিত করা কি সঙ্গত হইবে? মৃতমুখে ক্রূর হাসি কি তাহা হইলে পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়া বিদ্রূপ করিবে না, "বেশ তো আবার বাঁচিয়া উঠিলাম, -ওরা কি নির্ব্বোধ?"

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, আবার গৃহদাহ, গ্রাম ধ্বংস, নরহত্যা, নারী-হত্যা, শিশুহত্যা অবাধে চলিতে থাকিবে।

তারপর, ল্যান্টিনেকের যে কার্য্য গভেনকে এত মুগ্ধ করিয়াছে বাস্তবিক বলিতে গেলে গভেন সেটাকে একটু বেশী বাড়াইয়া দেখিতেছে নাকি? তিনটি শিশুকে ল্যান্টিনেক ভীষণ অপমৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্কটের মুখে কে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছিল? ল্যান্টিনেক নিজেই নয় কি? সজ্জিত ইন্ধনের মাঝখানে শিশু-শয্যাগুলিকে স্থাপন করিয়াছিল কে? ইমানুস্ নয় কি? আর সেই ইমানুস্ কে? সে তো মার্কুইসেরই তাঁবেদার। তাহার কার্য্যের জন্য তাহার প্রভু মার্কুইসই তো দায়ী। ল্যান্টিনেকই অগ্নিদ এবং হত্যাকারী। কি এমন বাহাদুরীর কাজ সে করিয়াছে? তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি সে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করে নাই—এই মাত্র। নিজেরই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভীষণ পরিণামে শেষটায় সে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। মহাপাপীরও অন্তরে কিছু না কিছু করুণার লেশ প্রচ্ছন্ন থাকে—আতঙ্কিতা জননীর মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনে ক্ষণেকের জন্য মার্কুইসের অন্তরে সেই সুকুমার বৃত্তিটি জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই প্ররোচনায় সে অন্ধকারের গর্ত্ত হইতে আলোকে ফিরিয়া আসে, প্রারব্ধ অপকর্ম্মের সমাপ্তি ঘটিতে দেয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সে রাক্ষসের কাজ করে নাই—এইটুকুই তাহার স্বপক্ষে বলিবার। এই যৎসামান্য কর্ম্মের প্রতিদানে তাহাকে সব ফিরাইয়া দিতে হইবে? জীবন, মুক্তি, অরণ্যের আধিপত্য, প্রান্তরের অবাধগতি, শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য্য সব তাহাকে দিতে হইবে? আর সে তৎপরিবর্ত্তে দাসত্বের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর বিস্তারে তাহার সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিতে থাকিবে?

এই উদ্ধত লোকটার সঙ্গে কোনো আপোষ মীমাংসা, বোঝাপড়াও হইতে পারেনা। আর সে বিদ্রোহ করিবে না এবং সকল প্রকার দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইবে এইরূপ সর্ত্তে যদি তাহার নিকট মুক্তির প্রস্তাব উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্তাবকারীর মুখের উপরই বলিবে—"এরূপ লজ্জা তোমাদেরই থাক্, আমাকে হত্যা কর।"

এক কথায়, উহাকে বধ করা কিংবা মুক্তি দেওয়া ভিন্ন আর তৃতীয় পন্থা নাই। সে যেন এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান—উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতে কিংবা নিম্নে ঝম্প প্রদান করিতে সে সর্ব্বদাই সমান প্রস্তুত। অদ্ভুত লোক! তাহার প্রাণ নেওয়া?—ইহাতে কত না উদ্বেগ! তাহাকে ছেড়ে দেওয়া?—কত বড় দায়িত্ব! ল্যান্টিনেক রক্ষা পাইলে ভেণ্ডির সংগ্রাম আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে; নির্ব্বাপিত অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে পুনঃপ্রজ্জলিত হইয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে। সাধারণ-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিয়া, ফ্রান্সের বুকের উপর ইংলণ্ডের আসন না পাতিয়া ল্যান্টিনেক নিরস্ত হইবে না। সুতরাং ল্যান্টিনেকের প্রাণরক্ষা মানে ফ্রান্সের বলিদান—নির্দ্দোষ নরনারী, বালকবালিকার জীবন-বিনাশ, রাষ্ট্র-বিপ্লবের সংহার! পরস্পর-বিরোধী চিন্তাসংঘর্ষের অনিশ্চিতা-লাকে গভেন দেখিল, তাহার সম্মুখে এই দুরূহ সমস্যা—শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের মুক্তিদান!

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রথম প্রশ্ন তখন গভেনের মনে উত্থিত হইল,—বস্তুতঃই কি ল্যান্টিনেক এক হিংস্র ব্যাঘ্র? হয় তো সে ইতিপূর্ব্বে সেইরূপ ছিল কিন্তু এখনও কি তাই? গভেনের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ধারা ওলট পালট হইয়া গেল। বিবেকের সহিত বুদ্ধির আভ্যন্তরিক সংগ্রামে তাহার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ল্যান্টিনেকের অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মহান্ আত্মত্যাগ, এবং অসাধারণ নিঃস্বার্থপরতা অস্বীকার করা যায় না। এই গুলিই আসল সত্য। রাজত্ব, রাষ্ট্রবিপ্লব পার্থিব সকল ব্যাপারের বহু উর্দ্ধে মানবতার মহাসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সবলমাত্রই দুর্ব্বলের আশ্রয়স্থল, পিতার মতো শিশুদিগকে রক্ষা করা সকল বয়স্ক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য—ল্যান্টিনেক নিজের জীবন বলিদান দিয়া তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। সে একজন সমরকুশল সেনাপতি হইয়াও উপস্থিত-প্রতিহিংসার সুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজতন্ত্রের এক বিশাল স্তম্ভ হইয়া

সে তিনটি অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকশিশুর তুলনায় দেড় হাজার বৎসরের রাজতন্ত্র তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে। ইহার পরেও কি তাহাকে ব্যাঘ্র বলা চলে? এখনও তাহার প্রতিহংস্র পশুবৎ ব্যবহার করা কি সঙ্গত হইবে? গৃহযুদ্ধের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরতল যে সুমহৎ আত্মত্যাগের দিব্যালোকে আলোকিত করিয়াছে, সে রাক্ষস নহে। কৃপাণপাণি নরঘাতক এখন দেবত্বের জ্যোতিতে মণ্ডিত। স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান আবার অমরায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি মাত্র ত্যাগের কার্য্যদ্বারা ল্যান্টিনেক তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। পার্থিব জগতে হারিয়া গিয়া সে অধ্যাত্ম জগতে জয়ী হইয়াছে। সে আজ নিষ্পাপ, সে আজ মুক্ত। এখন হইতে সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সাধারণ মানুষ যাহা করিতে পারে না ল্যান্টিনেক এইমাত্র তাহাই করিয়া আপনার অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে। এইবার গভেনের পালা। এই ঘাতপ্রতিঘাতময় যুগসন্ধির অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে ল্যান্টিনেক মানব-শিশুকে রক্ষা করিয়াছে। এখন সেই স্ববংশীয়কে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গভেনের। এমন অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি? বিধাতা তাহার উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছেন সে কি সেই ন্যায়-রক্ষায় পশ্চাৎপদ হইবে? কখনই নহে। তাহার মুখ হইতে অনুচ্চস্বরে এই কথা বাহির হইল, "ল্যান্টিনেককে বাঁচাইতেই হইবে।" অমনি তাহার মনের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠিল,—"বেশ, ভাল। তাই কর। ইংরেজদের তাহাতে খুব সুবিধা হইবে। শত্রুর সহায় হও। ল্যান্টিনেককে বাঁচাও, আর ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ কর।" গভেন কাঁপিয়া উঠিল। "হায়, স্বপ্নমুগ্ধ! তুমি যেরূপে সমস্যার সমাধান করিতে চাও, তাহা কোনো কাজের সমাধানই নয়।"

অন্ধকারে গভেন দেখিল, দুর্জ্জেয় মহাকালের আননে যেন বিদ্রূপের হাসি। সে তখন এক সঙ্কটময় ত্রি-পথে উপস্থিত—একদিকে মানবপ্রেম, একদিকে গোত্র, একদিকে স্বদেশ। প্রত্যেকেই সত্য—অথচ সকলেই পরস্পরের বিরোধী, এ বলে এইটে কর, ও বলে, এইটে কর। সে কি করিবে? যুক্তি বলে এক, হৃদয় বলে আর। এ যেন দুই প্রতিপক্ষ কৌসুলির বক্তৃতা। তর্কশাস্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ভাবাবেগ বিবেকের উপর। যুক্তি আসে মানুষের মন হইতে; অন্যটি—আরও গভীরতর উৎস হইতে। এইজন্য ভাবাবেগ যুক্তি অপেক্ষা অস্পষ্ট হইলেও অধিকতর ক্ষমতাশালী।

তবুও নিরেট যুক্তির প্রভাব কম নহে। গভেন দ্বিধায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে কি পাগল হইয়া যাইবে? দুইটি অতলস্পর্শ গহ্বর তাহার সম্মুখে। সে কি মার্কুইসকে মরিতে দিবে? না তাহাকে বাঁচাইবে? হয় এই, না হয় ওই গহ্বরে তাহাকে ঝম্প প্রদান করিতে হইবে। কে বলিবে, ইহার কোনটির ভিতর দিয়া কর্ত্তব্যের পথ?

৩

সৈন্যাধ্যক্ষের শিরচ্ছেদ

এই বিজেতৃগণকে এখন 'কর্ত্তব্য' লইয়াই বুঝাপড়া করিতে হইতেছিল। কর্ত্তব্যটি সিমুর্দ্যানের চক্ষে কঠোর মাত্র; কিন্তু গভেনের চক্ষে ভয়ঙ্কর। একজনের নিকট উহা সহজ; অপরের নিকটে জটিল, বক্র, বিভিন্নমুখী।

রাত বারোটা বাজিয়া গেল; তারপর একটা।

নিজের অজ্ঞাতসারে গভেন ক্রমে ক্রমে দুর্গ প্রাচীরের ভাঙনের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ব্বাসিতপ্রায় অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া আলোকের ঝলক নিক্ষেপ করিতেছিল। সেই আলোকে কারাদুর্গের অপর পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষণে ক্ষণে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছিল, আবার ধূমে আবৃত হইয়া যাইতেছিল। এই আলো আঁধারের সংমিশ্রণে শান্ত্রীগণকে ছায়ামূর্ত্তির মতো দেখাইতেছিল। চিন্তামগ্ন গভেন পুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া এই ধূম ও অগ্নিশিখার লড়াই দেখিতেছিল। তাহার মনের ভিতর যে সংগ্রাম চলিতেছিল, উহা তাহারই অনুরূপ।

নিভন্ত চুল্লী হইতে সহসা একটি দীর্ঘ বহ্নিশিখা বহির্গত হইয়া মালভূমির শীর্ষদেশ আলোকিত করিয়া তুলিল, এবং তাহাতে সিন্দুর-রাগরক্ত পটের উপর একটা মালগাড়ীর কৃষ্ণ ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

গভেন বিস্ফারিতনেত্রে ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। শকটের চতুস্পার্শে অশ্বারোহী—তাহাদের মস্তকে মিলিটারী পুলিশের শিরস্ত্রাণ। সূর্য্যাস্তকালে গেচাম্পের দূরবীণ দিয়া সে দূরদিগন্তে যে শকট লক্ষ্য করিয়াছিল ইহা তাহাই বলিয়া গভেনের অনুমান হইল। কেহ কেহ গাড়ীতে উঠিয়া উহা হইতে একটা বোঝা নামাইতেছে। বোঝাটা খুব ভারী বোধ হয়। মাঝে মাঝে লৌহঝনৎকার শব্দ শোনা যাইতেছিল। জিনিষটা কি ঠিক ঠাহর করা কঠিন। কাঠের ফ্রেমের মতো যেন কি। দুইজন লোক একটা বাক্স নামাইল, তন্মধ্যে, যতদূর দেখা যায়, একটা ত্রিকোণ পদার্থ।

আলোকরেখা মিলাইয়া গেল। আবার সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গভেন সেই আঁধারে ঢাকা পদার্থটার দিকে চাহিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

লণ্ঠন জ্বালা হইল। মালভূমির উপর লোক সকল আনাগোনা করিতে লাগিল। গভেন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সব স্পষ্ট দেখা যায় না। কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে, কিন্তু কথা বুঝা যায় না। কখনো যেন কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেছে, এরূপ শব্দ শোনা যায়। কাস্তে ধার দেওয়ার মতো ধাতবপদার্থের ঘর্ষণজনিত এক প্রকার শব্দও মাঝে মাঝে তাহার কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল।

দুইটা বাজিল।

ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি-পরিচালিত হইয়া গভেন সেই ভাঙনের নিকট উপস্থিত হইল। অন্ধকারের মধ্যেও সৈন্যাধ্যক্ষের ওভার-কোট চিনিতে পারিয়া শান্ত্রী তাহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। গভেন কারাদুর্গের নিম্নতলে প্রবেশ করিল। উহা এখন রক্ষীগৃহে পরিণত হইয়াছে। ছাদ হইতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। তাহার ক্ষীণালোকে তৃণাবৃত মেঝের উপরে শয়ান সৈনিকগণকে না মাড়াইয়া কোনরূপে কক্ষতল অতিক্রম করা যায়।

ইহাদের অধিকাংশই নিদ্রিত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহারা লড়াই করিতেছিল; এখন ক্লান্ত হইয়া যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়াছে। এই কক্ষে কি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল—ভীষণ আক্রমণ ও সংঘর্ষ! কত আঘাত, কত প্রতিঘাত; কত হুঙ্কার, কত আর্ত্তনাদ। এখন সব শেষ হইয়াছে। এই সৈনিকগণের কত সাথী এখানে অন্তিম-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে; আর এখন তাহারা সেইখানেই সুপ্তিমগ্ন। এই ত যুদ্ধ! আগামী কল্য হয়তো আবার সুপ্ত ও মৃত একই নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।

গভেন প্রবেশ করিলে কয়েকজন উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের মধ্যে একজন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। গভেন অন্ধকূপের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে বলিল, "খোলো"।

অর্গল অপসারিত হইল; দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

গভেন সেই কারাকক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পশ্চাতে দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

পঞ্চাগ্নিতত্ত্বে ক্ষরাক্ষর প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ

ব্রহ্মগতপ্রাণ ঋষিদের মনোবীণায় অনিশ দীপক রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিত—তাঁহারা ভোগ-বিলাসের সংসারে হোমানল-শিখা জ্বালিয়া নিত্য কামনার মুখাগ্নি করিতেন, ইন্দ্রিয় লালসাকে ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞের অঙ্গারে পরিণত করিতেন এবং আহিতাগ্নি হইয়া জীবন-অধ্বরে মূর্ত্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেন। অগ্নি তাঁহাদের জীবনের কতখানি নির্ভর হইয়াছিল, অগ্নিতে তাঁহাদের প্রাণের মন্ত্র কিরূপ নিপুণতার সহিত লেখা হইয়াছিল তাহা ছান্দ্যোগ্যের রহস্যময় পঞ্চাগ্নিতত্ত্বে সুব্যক্ত। বেদে যেরূপ তিন অগ্নির কল্পনা বেদায়তন জুড়িয়া আছে, ছান্দোগ্যে তেমনি পাঁচটি অগ্নির পরিকল্পনা সৃষ্টিরহস্যটিকে একটি অপরূপ রূপ দিয়াছে। ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, Napoleon—a name that deserves a volume to itself, নেপোলিয়নের নাম লইতে যদি volume লিখিতে হয় তবে নেপোলিয়নের যিনি স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করিতে কত volumeএর প্রয়োজন ঘটিবে ইহা ত সহজ চিন্তার বিষয়। কিন্তু ছান্দোগ্য কি অতুলনীয়, কি অচিন্ত্যনীয় শক্তির প্রভাবে এই আকাশের মত মহাবিশাল বিষয়টিকে কয়েকটি মাত্র মন্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন! ধন্য সেই ঋষির তপোবল—যাঁহার মানস-সরোবরে এই অপরাজেয় সৃষ্টিরহস্যটি কমলের ন্যায় দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় মানুষের সাহিত্য মানুষের ভাষা কত দুর্ব্বল, ভাববহনে কত অপারগ।

আরুণির পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রবাহণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যায় শ্বেতকেতুর অধিকার জন্মিয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস; তাই যখন ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জীবলনন্দন প্রবাহণ, কুমারকে প্রশ্ন করিলেন 'কুমারানু ত্বাশিষ্য পিতেতি'—পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন কি? কুমার উত্তর করিলেন, 'অনু হি ভগব ইতি'—ভগবন্ অনু, অর্থাৎ হাঁ অনুশাসন করিয়াছেন। কুমারের এই উত্তরে জৈবলি প্রবাহণ তখন তাঁহাকে প[রলোক] লোক বিষয়ক পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন—

১। বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি?—মৃত্যুর প[র] ঊর্দ্ধে কোথায় প্রাণিগণ গমন করে জান কি?

২। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি—ইহলোকে কিরূ[পে] ফিরিয়া আইসে?

৩। বেত্থ পথোর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যবর্ত্তনা- দেবযান পিতৃযানের বিয়োগস্থান কোথায়?

৪। বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ইতি—পিতৃযা[ন] গত প্রাণিদের দ্বারা সেই চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না?—

৫। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভ[ব]ন্তীতি,—তুমি জান কি পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল কিরূ[পে] পুরুষরূপে পরিণত হয়? এই পাঁচটির উত্তর একই হইল- 'ন ভগব' ইতি।' প্রবাহণ এই উত্তর পাইয়া বুঝিলে[ন] এমন প্রয়োজনীয় তত্ত্বের খবর না-জানা ব্রহ্মবিদ্যার নি[গূঢ়] কক্ষটিকে দেখিতে না-পাওয়া—তাই বলিলেন,—

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিদ্যাৎ ক[থং] সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি।

প্রবাহণ-বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আসন কত ঊর্দ্ধে তাহ[া] প্রমাণিত হইল। চক্ষু থাকিয়া যদি কেহ আকাশ ও তদ[্গত] সূর্য্যচন্দ্রতারকার দীপাবলী দেখিতে না পায়, তাহার দর্শ[ন] শক্তির সার্থকতা যেমন অত্যন্ত পরিমিত হইয়া পড়ে, ব্রহ্ম[া] সন্ধিৎসু কাহারও চক্ষুও তেমনি পঞ্চাগ্নির আকাশভুব[ন] জোড়া পঞ্চশিখা দেখিতে না পাইলে, তাহার ব্রহ্মদৃষ্টিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল তাহা বলাই বাহুল্য। প্রবা[হণ] এমনি করিরা শ্বেতকেতুকে চক্ষুহীন প্রমাণ করিয়া তাঁহা[কে] পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যে-বিষয়টিকে জানি[লে] ব্রহ্মতত্ত্বে চক্ষুষ্মান্ হওয়া যায় এবং যাহার প্রয়োগ জীব[নের] উপর ফলাইতে পারিলে 'পরশ পাথর' পাওয়া ঘটে তা[হা]

ালোচনা সাধকের মনে 'পরশ পাথর' ছুঁয়াইতে পারে সত্য, ন্তু পাঠকের মনে একটুকু হইলেও তাহার ঝিলিক লাগিতে ারে, কেননা লেখকের মন ইহার চমকে সজাগ হইয়া ঠিয়াছে।

পিতা প্রবাহণ-সমীপে সমাগত হইয়া সেই প্রশ্নের পুনরু- াপন করিলেন এবং যে-বিদ্যা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়- ানের বিষয়ীভূত ছিল তাহার বিবৃতি প্রার্থনা করিলেন। াজা তখন সেই বিদ্যা দান করিলেন। পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে শষোক্তটির প্রাধান্যই সুপরিস্ফুট। ইহার সহিত বাকী ারিটির শাখা-সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই প্রথমে মূল ধরিয়াই ালোচনা সুরু হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহার মধ্যে সৃষ্টির গাপন সঙ্কেত ও অজ্ঞাত সৃষ্টিপরিচালনার সকল তথ্য নিহিত াহিয়াছে। দৃক্‌পাতেই প্রশ্নোত্তরটি একটি যজ্ঞের ফটোগ্রাফ লিয়া অনেকের নিকট প্রতীয়মান হইবে এবং নীরস যজ্ঞীয় সকেলে করণকারণ জ্ঞানে ইহাকে হয়ত অনেকে anachro- ism ভাবিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিবেন। কিন্তু লেখকের ানুনয় প্রার্থনা এই যে, মানুষের সহিত মানুষের যেমন যুগ- গান্তব্যাপী একই সম্বন্ধ, বর্ত্তমান ঋষিপ্রবচনের সহিতও বিংশ াতাব্দীর আমাদের সেই একই সম্বন্ধ। যজ্ঞের আবরণ উন্মো- ন করিলে আমরা দেখিতে পাইব শুধু মানুষের কথাই বলা ইয়াছে। যে-নিয়মপদ্ধতি হোমধূমের মধ্যে যজ্ঞাঙ্গের ন্যায় াজ্জিত দেখা যায় উহার বাহিরের রূপটি হুবহু যজ্ঞীয় হইলেও ইহার ভিতরের কথাটি অতি সরল ও সত্য—সেই কথাটি ইতেছে এই :—প্রতি মানুষের জীবন একটী যজ্ঞের নলের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাই সহজ কথায় বলা চলে প্রতি ানুষের জীবনই একটি যজ্ঞ বিশেষ, তাহার আশে পাশে ছড়ান উপাদানে তাহারি জীবন-যজ্ঞের নিত্যকার অনুষ্ঠান লিতেছে। এই ব্যক্তিগত জীবন-যজ্ঞের ছবিটি মনে আঁকিয়া যেন নিতান্ত বিমুখ পাঠকও পাঠে মনোযোগী হয়েন ইহাই ঐকান্তিক অনুরোধ।

পুরাকালে ঋষিরা যজ্ঞ-গত প্রাণ ছিলেন—তাঁহাদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন হোম করিত, হবন ক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা এমনি মণ্ডিত হইয়াছিলেন যে আহুতি যেন তাঁহাদের প্রাণ স্বরূপ হইয়াছিল। যে দেবতার উদ্দেশে তাঁহারা হোম করিতেন সেই দেবতার নিকট যেন তাঁহাদের আহুতি তন্মুহূর্ত্তেই পৌছিত। সেই সেই দেব সমীপে আহুতির পৌছান যে-কথা, সেখানে তাঁহাদের সশরীরে পৌছানও সেই কথা, কারণ আহুতি ছিল তাঁহাদের অভিন্ন অভিব্যক্তি। আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চম প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বাজসনেয়কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চান,—জীবনব্যাপী যজমানের যে যজ্ঞাহুতি তাহারই ঠিক অনুকরণে তাঁহার নিজেরও জীবন দেহান্তে ঊর্দ্ধলোকচারী হয়।

অগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ, স উক্তো বাজস- নেয়কে—'তং প্রতি প্রশ্নাঃ। উৎক্রান্তিরাহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ী ইতি।

আহুতির গতি কোন্ কোন্ লোকে পৌছিত এবং কি ভাবে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত তৎসম্বন্ধে বাজসনেয়ক একটি নির্দ্দেশ আঁকিয়া দিতেছেন—

'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ, তেহন্তরিক্ষমা- বিশতঃ, তেহন্তরিক্ষমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে······তে অন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ······এবমেব পূর্ব্বদ্দিবং তর্পয়- তস্তে ততঃ আবর্ত্তন্তে।'

বাজসনেয়কের উক্তি এতৎপ্রসঙ্গের পূর্ব্বাভাস রূপে দাঁড় করাইয়া আচার্য্য শঙ্কর ইহার সহিত ছান্দোগ্য বর্ণিত বিদ্যার এই পার্থক্য করিতেছেন—

ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ব্ববিপরিণামলক্ষণং পঞ্চধা প্রবিভজ্য······বাজসনেয়কে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে আহুতিদ্বয়ের কার্য্যারম্ভ আর এখানে সেই আহুতি- দ্বয়ের পরিণাম স্পষ্টরূপে ফুটাইবার জন্য সেই কার্য্যারম্ভকেই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়া পাঁচ অগ্নি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাই ছান্দোগ্যের মন্ত্র এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে—

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্ রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ৫. ৪. ১

যজমানের প্রাতঃসন্ধ্যায় 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, উহাই আহবনীয় অগ্নি—উহাতে যজমান হোম করেন। মর্ত্ত্যের অগ্নির স্বরূপ হইতেছে দ্যুলোকের আদিত্য—এ অগ্নিতে হবনাদি ক্রিয়া চলিলে ইহার বিস্তৃতি

তত্দূর পর্য্যন্ত পৌছে। ভূলোকে অগ্নির যেমন সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গাদি থাকে, দ্যুলোকের সূর্য্যেরও সেই সব আছে। আচার্য্য শঙ্কর এই উপমানত্ব উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

তস্যাগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্য এব সমিৎ, তেন হি ইদ্ধোঽসৌ লোকা দীপ্যতে······রশ্ময়ো ধূমঃ, তদুত্থানাৎ, সমিধো হি ধূমো উত্তিষ্ঠতি। অহরর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ···, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ, অর্চ্চিষো হি প্রশমে অঙ্গারা অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব······ইহাতে সুনিপুণ কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে—আদিত্য জলন্ত কাষ্ঠের ন্যায় জলিতেছে, অগ্নি হইতে ধূমের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি নির্গত হইতেছে, অগ্নির প্রকাশবৎ সূর্য্যের প্রকাশ হইল দিবা, অগ্নি নিভিলে যেমন অঙ্গার প্রকাশ করে তেমনি সূর্য্যাস্তে চন্দ্র প্রকাশমান হয় এবং নক্ষত্রগুলি অঙ্গারের স্ফুলিঙ্গবৎ দিগদিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অতি সুষ্ঠু উপমা।

এইরূপে ভূর্লোক ও দ্যুলোকে দুই অগ্নি পাইলাম, ইহারা দুই এ এক। যজমান যখন মর্ত্ত্যাগ্নিতে হোম করিবে ইহা তখনি উপরি-উক্ত দিব্যাগ্নিতে অর্পিত হইবে। সুতরাং এখানেই পঞ্চাগ্নির প্রথমটিকে পাইলাম। যজমান এই অগ্নিতে হোম করেন—

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।

এই অগ্নিতে যজমান (দেবাঃ) শ্রদ্ধাকে আহুতি স্বরূপ প্রদান করেন। শ্রদ্ধা কাহাকে বলি?—'অগ্নিহোত্রাহুতি-পরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ শ্রদ্ধা উচ্যন্তে।' আহুতির সাধীন স্বরূপ সোমঘৃতাদি সংযুক্ত জলই শ্রদ্ধা শব্দে অভিহিত। তাহা হইলে দাঁড়াইল—দেবগণ বা যজমানেরা জলরূপ শ্রদ্ধার হোম করিয়া থাকেন, 'তাং শ্রদ্ধাং অবরূপাং জুহ্বতি'। পাঠকের দৃষ্টি 'সূক্ষ্ম অপ্' কথাটির প্রতি আকর্ষিত করিতেছি, কারণ আদ্যন্ত 'অপের' মধ্যে সমগ্র পঞ্চাগ্নিতত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। শ্রদ্ধাখ্যা এই অপেরই ক্রমিক পরিণতি দেখান শ্রুতির অভিপ্রেত।

শ্রদ্ধাখ্যা অপ্ আহুত হইলে ইহার ফল কি হইল? সোমো রাজা সম্ভবতি। ইহার অর্থ কি? সোম হইল চন্দ্র, যজমানগণ এই সংসারে থাকিয়া কিরূপে চন্দ্রলোকে যাইবে? পূর্ব্বভাষ্যাংশে দেখিয়াছি আহুতির গতি ইত্যাদি আলোচনার বিষয়, যজমানের স্বয়ং উৎক্রান্তি নহে। এখানে শঙ্কর তাহা পরিষ্কার করিয়া কহিতেছেন—'ন যজমানানাং গতিঃ।' তবে চন্দ্রলোকে কে যায়? 'ঋগ্বেদাদিপুষ্পরসা ঋগাদিমধুকরোপনীতাঃ তে আদিত্যে যশ আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারভন্তে' ইত্যুক্তম—ঋগ্বেদ পৃথিবীতে প্রচারিত অবস্থায় যেমন উহার জ্যোতিঃ আদিত্যলোকে জল জল করে সেইরূপ এখানে কৃত আহুতি ও চন্দ্রলোকে দীপ্তি জাগায়—তথা ইমা অগ্নিহোত্রাহুতিসমবায়িন্যঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্যা আপঃ দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য চান্দ্রং কার্য্যমারভন্তে···।

আহুতিকে আমরা পূর্ব্বে যজমানের স্বরূপ বলিয়াছি। যদি আহুতি সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রমণ্ডলে পৌছিতে পারে তবে যজমানের মনেও সেই স্বর্গলোকের ঝঙ্কার উঠিবে। শঙ্কর কহিতেছেন—'যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহুতিময়া আহুতিভাবনাভাবিতা আহুতিরূপেণ কর্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শ্রদ্ধাপ্সমবায়িনো দ্যুলোকমনু প্রবিশ্য সোমভূতা ভবন্তি।' যজমান মর্ত্ত্যধামে থাকিলেও তাঁহার মন আহুতি সহযোগে চন্দ্রলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তিনি চন্দ্রদ্যুতিসম্পন্ন হয়েন। শঙ্কর এই যাহা বলিলেন 'যজমান আহুতিভাবভাবিত হইয়া······সোমস্বরূপ হন···।' কিন্তু যজমান প্রত্যুত চন্দ্রলোকে গমন করেন না—"অত্র তু আহুতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধক্রমেণ বিবক্ষিত, উপাসনার্থম্, ন যজমানানাং গতিঃ।' এখানে শুধু আহুতির পরিণাম দেখানই লক্ষ্য।

আমরা জানি মনের অধিদৈব চন্দ্র, মন আহুতি দ্বারা চন্দ্রময় 'সোমভূত' হয়—ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে আহুতি ক্রিয়া দ্বারা যজমানের মন অধিদৈব চন্দ্রের পূর্ণাধিষ্ঠানে স্বীয় অর্থাৎ মন যজ্ঞসঙ্কল্পময় হয় —যথা 'ক্রতুময়ঃ পুরুষ।' ক্রতু যজ্ঞবোধক, যেমন শতক্রতু। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি।' শ্রদ্ধাখ্যা অপ্‌কে হোম করিলে যজমানের মন ক্রতুময় হয়, ইহাই 'সোমো রাজা সম্ভবতি।'

প্রথমাগ্নিতে হোম করার ফলে আহুতির পরিণাম কি

দেখাইতে হইলে আর একটি রসাত্মক শব্দ আনা প্রয়োজন, অথচ যজ্ঞের অর্থও যেন তাহাতে স্ফুট থাকে। সোমরস যজ্ঞের সেরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ব্যঞ্জনা আছে—১ম ব্যাপক যজ্ঞার্থ, ২য় অপজনিত রসের বিশেষার্থ। সর্ব্বোপরি ওষধীশ-রূপে সোম ত চন্দ্র হইবেই।

এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় অগ্নির স্মরণ করিতে পারি। ছান্দোগ্যোক্ত মন্ত্রটি এইরূপ ঃ—

পর্জ্জন্যোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদ-প্রাণো ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

আচার্য্য ইহার উপর লিখিতেছেন—'পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতা বিশেশঃ,…বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে……' পর্জ্জন্য প্রসিদ্ধ বৈদিক দেবতা, ইহা দ্বিতীয় অগ্নি, বায়ু, সমিধের ন্যায় কার্য্য করে; ঝড়ের সময়ের চিত্র মনে আনিলে'ই ইহার উত্তম প্রতীতি জন্মে। জমকাল মেঘের কোণে যে পাতলা মেঘ খেলে ইহা যেন পর্জ্জন্যরূপ অগ্নির ধূম বিশেষ—আর যে বিদ্যুৎ ঝলসায় উহা যেন পর্জ্জন্যের প্রভা, ঝড়ে কড়্ কড়্ যে বাজ পড়ে উহা হইল কিনা অঙ্গার এবং হুঙ্কারটি হইল বিস্ফুলিঙ্গ।

অগ্নি দেখা গেল—এখন আহুতির পালা।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যাহুতে র্বর্ষং সম্ভবতি।

ভাষ্যঃ—'শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নিং প্রাপ্য বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্তে।'

পূর্ব্বে শঙ্কর কহিয়াছেন—'শ্রদ্ধাই জলস্বরূপা এবং অপ্ই শ্রদ্ধাবলম্বনে সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গমন করে!'—'শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি।' ইহার ফল স্বরূপ দাঁড়াইল ক্রতুময় মন; সেই মনকে ক্রতুশীল যজমান পর্জ্জন্যে হোম করেন। সে কিরূপ? যজমান অচঞ্চল মহামন লইয়া পর্জ্জন্যে হবন করেন। সহজ সরল কথায় ইহার অর্থ বৃষ্টির জন্য পর্জ্জন্যদেবকে তপস্যা করা। শ্রদ্ধাসংজ্ঞক জলের পরিণাম হইল 'সোম' বা ক্রতুময় মন—সেই সোমের পরিণাম হইল 'বৃষ্টি'।

তৃতীয় অগ্নির শরণ লইতেছি—

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তর দিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

পৃথিবী অগ্নি, সংবৎসর তাহার কাষ্ঠ, আকাশ তাহার ধূম, রাত্রি হইল অর্চ্চি, দিকসকল অঙ্গার এবং অবান্তর দিক সমূহ (কোণ সমূহ) যেন বিস্ফুলিঙ্গ। সংবৎসর কিরূপে সমিৎ হইতে পারে তদ্ধেতু শঙ্কর নির্দ্দেশ করিতেছেন—'সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে ভবতি'—সমিৎ দ্বারা যেরূপ অগ্নি জ্বলে, সময় দ্বারাও সেইরূপ শস্য জন্মায় ও আহারযোগ্য হয়। আর আকাশ?—'পৃথিব্যা ইবোত্থিত আকাশো দৃশ্যতে যথা অগ্নের্ধূমঃ' আগুণ হইতে যেমন ধূঁয়া উপর ছাইয়া যায় আকাশও যেন ঠিক তেমনি পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে মনে হয়। কি অপরূপ কবিত্ব! এই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে ক্রতুশীল যজমান বৃষ্টিকে আহুতি দেন। শ্রদ্ধাখ্যা অপ্ই ক্রমে বৃষ্টিতে পরিণত হইল। দ্যুলোকে শ্রদ্ধা আহুত হইয়া ফল প্রসব করিল 'সোম,' আবার সোম পর্জ্জন্যে আহুত হইয়া প্রসব করিল—এইবার বৃষ্টিকেও আহুতি দেওয়া হইল মৃত্তিকাতে।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি।

চতুর্থ অগ্নি হইতেছে পুরুষ—

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ, প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চি শক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। এই অগ্নিতে অন্নকে আহুতি দেওয়া হয়—তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি।

সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে আহুত হইলে উহার ফলে রেতঃ সঞ্চার ঘটে। ক্রমে আমরা শ্রদ্ধাখ্যা অপ্কে রেতোরূপে পরিণত হইতে দেখিলাম। ইহার পরে পঞ্চমাগ্নি আসিতেছে যোষা।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্, যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দং বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ এই সর্ব্বশেষ অগ্নিতে যজমান রেতকে আহুতি দেন,—তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতে গর্ভঃ সম্ভবতি।' আচার্য্য শঙ্কর ইহার উপর ভাষ্য করিতেছেন—'এবং শ্রদ্ধা-সোমবর্ষান্নরেতোঽহবন পর্য্যায়ক্রমেন আপ এব

গর্ভীভূতাস্তাঃ।’ শ্রদ্ধাপদবাচ্যা অপ এমনি করিয়া অবশেষে গর্ভীভূত হইল—তবেই পঞ্চম প্রশ্নটি ‘ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবতি’—সুমীমাংসিত হইল।

গীতায় শ্রীভগবান পঞ্চাগ্নিকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছেন :—

অন্নাদ্ভবতি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি··· ··· ···
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

৩, ১৪, ১৫।

সমস্ত ব্যাপার যজ্ঞটি হইতে উদ্ভূত বলিয়া গীতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, যজ্ঞ অর্থে সেই ক্রতুশীল মন বা সোম—ইহা আসিতেছে কোথা হইতে—‘কর্ম্ম’ হইতে। ছান্দোগ্যে পাইয়াছি শ্রদ্ধা হইতে। সুতরাং উভয়ে এক। শ্রদ্ধা বা কর্ম্ম আসিতেছে কোথা হইতে—এই প্রেরণা শ্রীভগবান্ জীবব্রহ্মে জাগাইয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।

শ্রীভগবান্ প্রাণাদি করণ সমন্বিত করিয়া জীবকে তাহার কল্যাণকর যজ্ঞে প্রেরণা দিয়াছেন—এই ভগবৎদত্ত প্রেরণাই শ্রদ্ধা বা কর্ম্ম—‘যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।’ সুতরাং মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য দেবোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করা। কেননা ‘দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ’—যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, দেবগণও তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ‘ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ’—যজ্ঞাহুতির দ্বারা প্রীত হইয়া পর্জ্জন্যদেব বৃষ্টি বর্ষণ করেন ইহা ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে পাঁচটি অগ্নিই জ্বালা হইল এবং পাঁচটি আহুতিই সমর্পিত হইল—সেই সর্ব্বপ্রথম আহুতির অপই রেতোরূপে পরিণত হইয়া নূতন জন্মের কারণ ঘটাইল। ইহার উদ্দেশ্য বোধ করি এইটুকু দেখান যে যজ্ঞ হইতেই সন্তান উদ্ভূত হয়, যেমন যাজ্ঞসেনী। ঋষিরা এইরূপে সন্তানলাভটিকে কামাত্মক না করিয়া ইহাকে যজ্ঞার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন—কাজেই জন্মটি ছিল পবিত্র এবং ফলেও সন্তানসন্ততিতে ব্রহ্মনিষ্ঠা জাগিত। এখন যদি কেহ প্রশ্ন তুলেন—বর্ত্তমান জগতে ত যজ্ঞ নাই—হোমধূম নাই তবে পর্জ্জন্যদেব কৃপাই বা কেন করেন, কেনই বা অন্ন হয় এবং সন্তান উৎপাদনে কেনই বা বাধা ঘটে না! ইহার উত্তরে উপরি লিখিত মর্ম্মানুসারে এই মাত্র বলা যায় যে জন্মের সে ব্যাখ্যা যেমন লুপ্তপ্রায়, জন্মের ফলাফলও ঘোর জড়প্রীতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন—এখন আর সে মানুষ প্রায় [illegible] যদি কেহ তবু বলিতে চান— ‘ও হরি’—এই [illegible]ন্দোগ্যের অতি বিখ্যাত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—ইহার অসারত্ব [illegible]নি সিদ্ধ হয় যখনই না চাইতেই বর্ষার ধারা আ[illegible]য়া আইসে! ইহার উত্তরে আমি শুধু এই বলিতে [illegible]—বর্ষণানুকূল ফসল কি অম্নি হয়, প্রতি মানুষের [illegible] বুভুক্ষা নাই এবং সেই বুভুক্ষিত প্রাণের অ[illegible]দন কি বিধাতৃচরণে পৌছে না?—ক্রীশ্চিয়ানেরা [illegible]কে—‘O Lord, Give us our daily bread’—[illegible]ওয়া তাহাদের মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—কিন্তু [illegible]ওয়া প্রতি জীবের মর্ম্মে গোপনে ধ্বনিত হইতেছে। [illegible] মিলে এবং স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সংসার রচনা সম্ভব [illegible] ইহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব—সংসারের সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল আহার্য্য, ইহা মুখ্য; অতঃপর গৌণ হইল যৌনাহার। আজ যে ভারতবর্ষ লইয়া অত টানাটানি চলিতেছে ইহার মূল কথাটি ‘অন্নম্’। তবেই দেখা যাইতেছে মানুষের জীবনটি একটি রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় অন্নসূয় যজ্ঞ। ক্রীশ্চিয়ানেরা ইহাকে prayer এ দু’ কথায় নিবেদন করিয়াছে আর ছান্দোগ্যে ইহা সৃষ্টির মানদণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। আমরা এখন সেই সৃষ্টিরহস্যের পরম দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী হইতে সৃষ্টির মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষ-

ধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ॥ ৩

ইহার দিকে এক চক্ষু রাখিয়া অপর চক্ষু যদি পঞ্চাগ্নির উপর ধরা যায় তবে আমাদের মনে ইহাদের উভয়ের অন্তর্নিহিত একই সুর বাজিয়া উঠিবে। তৈত্তিরীয় যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, পঞ্চাগ্নিও যে সেই তত্ত্বেরই সালঙ্কার অবতারণা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উভয়ের উদ্দেশ্য এক—পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবের জন্মপ্রদর্শন। তবে উভয়ের ছন্দ একরূপ নহে—তৈত্তিরীয় দেখাইতেছেন সৃষ্টির ক্রম আর পঞ্চাগ্নি দেখাইতেছে আহুতিক্রম; কিন্তু শেষ কথা উভয়েরই এক—জন্ম। আমরা উহাদের একার্থকতা এইভাবে সাজাইতে চাই :—

পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির ক্রমিক বর্ণনা দেখা যায় সেখানে প্রথমেই বলা হইয়াছে—'তত্তেজোঽসৃজত' (৬'২)। তৈত্তির আকাশ ও বায়ুকে ডিঙাইয়া একেবারে প্রথমেই কেন তেজে (অর্থাৎ অগ্নিতে) পৌছিল, ইহা লইয়া গোল দাঁড়াইয়াছে। প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক পাঁচ ভূতের মধ্যে তৃতীয়টি হইতে সুরু কেন করান হইল! আচার্য্য শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে তেজের অন্তর্ভাবরূপ,—রূপাত্মকং জগৎ, তাই রূপটিকে প্রথম ফুটাইয়া সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্তর্ভাবতত্ত্ব'টি বেশ একটু জটিল—যাঁহারা ইহার বিশদ আলোচনার পক্ষপাতী তাঁহারা দয়া করিয়া যেন ১৩৩৬ পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র লেখকের 'পঞ্চপানপাত্র' পাঠ করেন। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের ত্রি-ধারা পাইতেছি—তৈত্তিরীয় দেখাই-

দ্যু ———————— পর্জ্জন্য ———————— পৃথিবী
আকাশ | বায়ু | অগ্নি | আপঃ | পৃথিবী

উপরিউক্ত সজ্জানুসারে দেখা যায় তৈত্তিরীয় আদর্শ এই পঞ্চাগ্নিতেও অবিকল রহিয়াছে। ছান্দোগ্য শুধু 'পর্জ্জন্য' দ্বারা যে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এখানে বায়ু, অগ্নি, আপ, মিলিয়া সেইটি হইয়াছে। তৈত্তির পৃথিবী পর্য্যন্ত আমরা ছান্দোর পৃথিবীও ঠিক সমান তালে পাইতেছি। তৈত্তিতে অতঃপর 'পৃথিব্যা ওষধয়ঃ······পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ'—এই অংশটুকুতে পুরুষ ও যোষাকে যদিচ লুপ্ত রাখা হইয়াছে তথাপি যৌন প্রক্রিয়াকে অতি পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত এত সহজবোধ্য যে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে ইহাকে ভাঙ্গিয়া বলা একেবারেই অনাবশ্যক—তাই তৈত্তিরীয়ে ইহার উল্লেখ নাই। পাঞ্চভৌতিক পারম্পর্য্য সাজাইতে রেতঃ পর্য্যন্ত ফুটাইলেই কার্য্য সমাধা হইল, কিন্তু ছান্দোগ্যের উদ্দেশ্য আহুতিক্রম ফুটান, সুতরাং যোষাকে আহবনীয় করিয়া ইহাতে রেতঃসেক প্রদর্শন করান হইয়াছে। কাজেই ছান্দোগ্যের পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চভূতের সকলগুলিই বলা হইয়াছে—ইহার পরে পুরুষ ও যোষা আসিতেছে শুধু হবণ ক্রিয়ার সম্যক নির্দ্দেশ করিবার জন্য। ছান্দোগ্যে যেখানে

তেছেন সৃষ্টিক্রম, পঞ্চাগ্নি হইতেছে আহুতিক্রম আর ছান্দোগ্য ফুটাইতেছেন অন্তর্ভাব-ক্রম। কিন্তু এ-তিনেরই লক্ষ্যস্থল জন্ম।

তারপর? নূতন অতিথি যজমানের গৃহে শুভাগমন করিল। সেও সমস্ত জীবন ভরিয়া পঞ্চাগ্নিতপ করিল, তাহার মরণ ঘটিল। তখন?—'তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি, যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি'—শঙ্কর ভাষ্য যথা—'যত এব ইত আগতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ শ্রাদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ···তস্মৈ এব অগ্নয়ে হরন্তি।' 'যে অগ্নি হইতে শ্রাদ্ধাদি আহুতি পরম্পরায় আগত হইয়াছে সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায়।' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ এখানেই কৃত হয়, ইহার ফল দ্যুলোকাদি পর্য্যন্ত পৌছায়—সেই যজ্ঞীয় অনল হইতেই তাহার দেহের উৎপত্তি, এই অনলেই তাহার দেহের শেষ বিসর্জ্জন ঘটে। এইবার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাগ্নির প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি রাখিব—তাই অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন :—

অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতাবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপোধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য……। শরীর ভস্মসাৎ হইলে শরীরোত্থিত জল সমূহ যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমের সহিত উর্দ্ধে যায়। সেই শ্রদ্ধাখ্যা অপসম্ভূত দেহের পরিণামস্বরূপ এই জল ও সেই শ্রদ্ধাযুক্তঅপ্ এক জিনিষ। তাহার দেহযোনি অগ্নি যেমন শ্মশানাগ্নির সহিত এক তেমনি এক্ষেত্রেও এ দুই অপেও একতা। বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদে এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে, আমরা একটু চক্ষু বুলাইয়া যাইব মাত্র। 'তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ; প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম।১'। পরলোকযাত্রায় যে অপ্ যজমানকে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধলোকে যায় তাহাতে অপের বাহুল্য থাকিলেও ইহাতে অপরাপর ভূত অল্প পরিমাণে থাকে—'ত্র্যাত্মকাত্বাত্ত্ু ভূয়স্ত্বাৎ।২' যজমানের আহুতি যেমন উর্দ্ধে চন্দ্রলোকে যায় দেহান্তে যজমানও তেমনি ঐ লোকে যায়। আমরা বাজসনেয়ক ও পঞ্চাগ্নিপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি সেখানে থাকে ঠিক ততকাল যাবৎ তদুপযোগী কর্ম্মের হ্রাস না ঘটে—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ যথৈতমনেবং চ।৮

কর্ম্মক্ষয়ে যে পথে গমন সে পথেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।' কিরূপে—'যথেতমাকাশম্ আকাশাদবায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমোভবতি ধূমোভূত্বা অভ্রং ভবতি।' তৎপর?—'অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে……যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।' চন্দ্রমণ্ডলে জীবের পুণ্যভোগান্তে তাহাকে return ticket করিয়া আবার সেই পথেই মর্ত্ত্যলোকে চলিয়া আসিতে হইবে। পঞ্চাগ্নির আহুতি-ক্রম দ্বারা এই পথের নিশানা পাইয়াছি, তবে সেখানে কোনও জীব যে পর্জ্জন্যদেবের সহিত মিশিয়া বর্ষণযোগে পৃথিবীতে নামিতেছে এবং আহার্য্য শাকসব্জীতে যুক্ত হইয়া পুরুষের দেহে উপগত হইয়া রেতঃ সহযোগে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতেছে, সে তথ্য আমরা সেখানে পাই নাই। সেখানে দেখিয়াছিলাম জীবন-চক্রের অর্দ্ধেক, এখানে পাইলাম বাকী অর্দ্ধেক, উভয়ে মিলিয়া পূরা চক্রটি পাইলাম। ইহারই অনুরূপে বোধ করি বুদ্ধদেবের জীবন-চক্রটি কল্পিত হইয়াছিল।

Rhys Davids "Wheel of life' নামক অধ্যায়ে (Buddhism) জীবন চক্রটির যে আলেখ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন উহা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেরই যেন একটি সজীব ছবি। জীবনচক্রটির প্রথম আবর্ত্তন অবিদ্যা হইতে, তৎপরের অর হইতেছে সংস্কার (মহতত্ত্ব), তৃতীয়-চতুর্থ বিজ্ঞান ও নামরূপ (অহঙ্কার), তৎপরের অরগুলি পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং তৎসাহচর্য্যে [illegible] সম্ভোগে জীবের জন্ম। জন্ম হইল সেই প্রথম অর [illegible] হইতে। এইরূপে এক একটি অর ছুঁইয়া যখন [illegible]ল তখন আবার তাহাকে প্রথম 'অর' অবিদ্যায় [illegible]ল। ১,২,৩, ৪,৫ একটি চক্রে লিখিয়া দিলে [illegible]ই যেমন ১ আরম্ভ হয়—এও ঠিক্ তেমনি, এই স[illegible] জীবন-চক্র হইতে রেহাই পাওয়া কখনই সম্ভব নয় [illegible] পর্য্যন্ত অন্তরে অবিদ্যা বর্ত্তমান আছে। অবিদ্যা অ[illegible]র অগণিত জন্মের কর্ম্মরাশি। ইহাই, সেই কা[illegible] উপর জীবকে আরূঢ় করাইয়াছে—'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূত[illegible] রূঢ়ানি মায়য়া'। এই কালচক্রটিকে বুদ্ধদেব সাংখ[illegible] দেখিয়াছেন কিন্তু পঞ্চাগ্নিতত্ত্বটিও সেই কালচক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত—উহার সার্ব্বভৌমত্বই ইহার বিশেষত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাল যতদূর হু হু করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে ততদূরই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আপনার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে, কারণ কাল দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র সকলি বিধৃত রহিয়াছে। এই কালচক্রেই জীব অনিশ ঘূর্ণিত হইতেছে—ইহার অর্দ্ধেক ঘোরা ইহলোকে, বাকী অর্দ্ধেক পরলোকে। তাই মানুষের সম্বন্ধে বলা হয় ইহকাল পরকাল—কাল ব্যতিরিক্ত তাহার থাকিবার যো নাই সে যে কালচক্রে সমারূঢ়। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে'—চাকাটি যখন ইহকালে ঘুরিতেছে তখন সে ইহলোকে, আর চাকার নিম্নভাগ যখন উর্দ্ধে উঠিতেছে তখনি সে পরলোকে।

এখন আমরা শেষ অঙ্কে শেষ কথা বলিতে চাই। পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপোদ্ঘাতে দেখিয়াছি ইহা সকল মানুষেরই জীবনের নক্সা আঁকিয়া রাখিয়াছে; মানুষ জন্মায়, অন্নান্বেষী হইয়া জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয় এবং ইন্দ্রিয়াহারে যৌনক্ষুধা

[illegible]ত্তীয় ও সঙ্গে সঙ্গে সন্তান লাভ করে। এ কয়েকটি কথা পৃথিবীর প্রায় পৌণে ষোল আনা লোকের জীবনের সারাংশ। কাজেই ইহার পাঠে সকলেরই দাবী আছে, যজ্ঞার্থ না বুঝিলেও যে পঞ্চাগ্নি বুঝা যাইবে না এমন নয়। তবে আমরা যজ্ঞীয় ব্যঞ্জনা পরিহার করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে পারি না। এই প্রকারে যে উপাসনা, শাস্ত্র ইহাকে সকাম বলেন; ইহাকে সকাম বলার হেতু কি? সেইটি একটু প্রনিধানযোগ্য। অন্ন যখন পুরুষাগ্নিতে [illegible] হয় তখন আহুতির ফল হইল রেতঃ, এই রেত[illegible] যৌনমিলনের ফলে যোষিৎ উপস্থে আহুত হয় ত[illegible]মের উদ্দীপনায় নির্গত হয় বলিয়া এবং ক্রিয়া[illegible] বলা যায়। রেতঃসেক ব্যাপারটি তাহা হই[illegible] দাঁড়াইল, কেননা ইহাই হইল অন্ত্যাহুতি এবং [illegible] স্বরূপ অন্ন কার্য্য করে, যেহেতু অন্ন না খাই[illegible]ন সম্ভবপর নয়। তাই সমস্ত সাধনটি কা[illegible]ক হইয়া পড়ে। শাঙ্কর ভাষ্যে এতৎসম্পর্কে [illegible]ংগ্রহ করা হইয়াছে। তথাচ পৌরাণিকাঃ—

> [illegible] প্রজামীষিরেহধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
> যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেহমৃতত্বং হি ভেজিরে॥

[illegible]যোষিৎসঙ্গকারী রেতঃসেকের ফলে শ্মশানগতি লাভ করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মায়, কিন্তু রেতঃসঞ্চয়ী অমৃতলোক প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে প্রতীত হয় জীবের সম্মুখে দুই পথ খোলা রহিয়াছে, রেতঃসিঞ্চনের পথে গেলে সে কালচক্রে 'যন্ত্রারূঢ়ানি' হইয়া সৃষ্টজগতের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেল! কেন বাঁধা পড়িল? রেতঃক্রিয়াকে জীবনের সহিত মিশান আর পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বসৃষ্টিকে নিজের জীবনে সূতার ন্যায় পাক খাওয়ান একই কথা। রেতঃ পদার্থটি কি?—রেতঃ হইল বিশ্বজগতের একটি অনুপ্রমাণসংস্করণ—শ্রদ্ধাখ্যা অপ্, [illegible]পর্জ্জন্যপৃথিবীগতা হইয়া রেতোরূপে পরিণত হয়, সুতরাং রেতঃ হইল দ্যুলোকভুবর্লোক, ভূর্লোকের একখানি ক্ষুদ্র আলেখ্য—উহারা যে যে উপাদানে প্রস্তুত ইহাও সেই সেই উপাদানভূত! রেতঃক্রীড়া জীবনে প্রবেশ করিলে জীবের অমর অজর প্রাণে জড়ের ছাপ জরার ছাপ মৃত্যুর ছাপ পড়িতে লাগিল। কাদার মধ্যে হীরার গড়াগড়ি দিলে যে অবস্থা 'অত্যনচ্ছংবপু'তে 'স্বয়ংস্বচ্ছের' রতিতেও সেই অবস্থা। রেতঃ ক্রীড়ার ফলে যে অনচ্ছ প্রলেপ প্রাণের পাশে লাগিয়া গেল—ঐগুলিই পুনর্জন্মের হেতুভূত। সহজ সরল ভাবেও যদি চিন্তা করা যায় তবে দেখা যায় জীবদেহ একটি চলন্ত জগৎ—'তিলেষু তৈলম্'বৎ, দেহজ রেতঃও দেহের অর্থাৎ পঞ্চভূতের সার বিশেষ। এই রেতঃ সম্ভোগের অর্থ যে পঞ্চভূতে ডুব্ দিয়া থাকা, ইহাতে আর কি সন্দেহ? ইহাতে সংযুক্ত থাকা আর বিশ্বজগতে আটক থাকা একই কথা। এবং এই আটক এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। শ্লোকাক্তটিকে modern interpretation বলা চলে, ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে rational'ও।

যদি জীবদেহে কাম না থাকিত, তবে রেত কখনো পরিজ্ঞাত হইত না, কিন্তু 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'— দেহের মধ্যে কামের আলোড়ন জাগে, তাই যোষিৎসঙ্গে রেতঃ নির্গত হয়, ইহার পরিচয় মানুষ পাইয়াছে। পঞ্চভূতের অন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে, অনঙ্গের অঙ্গ ভাগ ভাগ রাখা হইয়াছে—সময়ে কামের স্ফুরণ ঘটে। যদি বিধাতা কামকে সৃষ্টি না করিতেন তবে দেহী অক্ষর পুরুষকে ধ্যান করিয়া দেহান্তে অনায়াসে নিঃশ্রেয়স লাভ করিত। কিন্তু কাম হইল দেহের cement স্বরূপ, ইহাই দেহীকে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে। দেহ হইল একটি ছোট ব্রহ্মাণ্ড—ইহাতে বাঁধা পড়িয়া যাওয়া অর্থে কালচক্রেরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। এবং তাহাও জন্ম জন্মান্তরের জন্য।

আমরা পৌরাণিক প্রবচনের এক পথ দেখিলাম—ইহা মৃত্যুর পথ। যে পথে গেলে মৃত্যুর অধিকার আক্রমণ করে সেই পথ হইতেছে রেতঃসিঞ্চনে। প্রশ্ন উঠিতে পারে রেতঃসেক যদি না করাই বিধি হয় তবে রেতঃসৃষ্টি কেন বিধাতা করিলেন? রেতঃ তবে কোন্ কাযে লাগিবে? এই কথাটিকে বুঝানই বোধ করি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার গূঢ় উদ্দেশ্য। রেতঃক্রীড়া আমরা দেখিয়াছি পাঞ্চভৌতিক ভোগলীলা—পঞ্চাগ্নির অন্তরালে পঞ্চভূতেরই পঞ্চদীপ জ্বলিতেছে। এই ভোগ-প্রদীপে রেতের আহুতি দিলে মৃত্যুকেই বরমাল্য দেওয়া হয়। তবে কোথায়—আর কোন্ অগ্নিতে রেতঃ সমর্পণ

করা যায়? বেদান্ত বলিতেছেন—'গুণাদ্বালোকবৎ'—(২, ৩, ২৫) গৃহ যেরূপে গৃহস্থ দীপ দ্বারা আলোকিত হয়, দেহ-গেহেও তেমনি এক আলোক-দীপ জ্বলিতেছে। গীতাও সেই জড়াতীত দীপকে বুঝাইতেছেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ১৩, ৩৩॥

সেই দীপাগ্নিতে রেতঃ আহুত হইলে মৃত্যুর পথ রোধ করিয়া অমৃতের পথ আপনি খুলিতে থাকে। এই অগ্নিতে রেতঃ সিঞ্চন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' (গীতা ৪, ২৬)। ফলে তাহাকে 'ঊর্দ্ধরেতস্সু চ শব্দে হি' (বেদান্ত—৩, ৪, ১৭) ঊর্দ্ধরেতা হইতে হয়। রেতঃ হইল 'ব্রহ্ম-হবি'—যজ্ঞ করিতে 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া যে হবি আহুতি দিতে হয়, তাহা হইল 'গব্য-হবি'। যজ্ঞার্থে যে-যজমান লক্ষ কলস গব্য-হবি ব্যয় করে অথচ তাহার 'ব্রহ্ম-হবি'কে ইন্দ্রিয় সেবায় উৎসর্গ করে, তাহার যজ্ঞের সার্থকতা কোথায়? অথচ যে যজমান শ্রুব বা চমস ধারী নহে এবং যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে কিঞ্চন্মাত্রও ঘৃত প্রক্ষেপ করে না কিন্তু জীবনযজ্ঞের অন্তরাগ্নিতে অনিশ রেত উৎসর্গ করে, তাহার তপস্যার হোমানল ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দীপ্তি ছড়ায়। এমন যে তপস্বী, গীতা তাহাকে ছবির ন্যায় আঁকিতেছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। (৪, ২৪)

সূতা যখন পাক খাইয়া যায় তখন তাহাকে প্যাচ খুলিবার জন্য বিপরীত দিকে চালাইতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অগণিত জন্ম ধারণ করিতে করিতে আমরা দেহের তথা কালচক্র-ঘেরা বিশ্বজগতের সহিত এমনি পাক খাইয়া গিয়াছি যে সে প্যাচ খুলিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের দেহানুকুলতাকে প্রতিকূলে চালাইতে হইবে এবং এমনি ভাবে চালাইতে চালাইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে দেহাতীত এক অভিনায়ক অক্ষর রহিয়াছেন যাঁহার সহিত আমরা অ-ভিন্ন এবং যাহাকে চিনিতে না পারিয়া আমরা এক অত্যনচ্ছং বপু'কে স্বস্বরূপত্বের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিয়া বসিয়া আছি। আপনার আসল 'আমিত্ব'কে জানিতে হইলে প্রথমে পঞ্চাগ্নির পঞ্চপ্রদীপে নিজকে ভাল করিয়া ঈক্ষণ করা ভাল। তারপর নকল হীরা ধরা পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসল হীরার অজর অমর আলো চোখে ঠেকিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চক্রবাক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত জগৎ মিত্র

প্রকাশ বিয়েতে রাজি হয়েছে। বৃদ্ধ অবিনাশবাবুর মনে তৃপ্তির আর শেষ নেই। যাক্, তাহ'লে রাণী একবারে তাঁর চোখের আড়ালে চ'লে যাবে না। তাঁর ব্যর্থ জীবনের শেষ সম্বল ঐ রাণী—[illegible] প্রাণের 'রানু' তাকেও যদি হারাতে হয় বৃদ্ধ তা'হলে বাকি দিনগুলি কা'কে অবলম্বন ক'রে কাটাবেন? অবিনাশবাবুর কল্পনায় তাঁ'র শেষের শান্তিময় দিনগুলি [illegible] উঠলো সুখস্বপ্নের মতো! অবিনাশ বাবু ভবিষ্যতের [illegible] আত্মহারা হ'য়ে পড়্লেন। তিনি তখনি কন্যা মণিমালাকে এই সম্মতির সংবাদটা দিতে ছুটলেন।

এই শুভসংবাদে মণিমালা মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম ক'রলো, হেসে বল্লো—কিন্তু বাবা, আশ্চর্য্য এই যে, প্রকাশ যে আমাদের ঘরের ছেলেরই মতো, অথচ ওর কথা সকলের আগে তো আমাদের মনে ওঠেনি। হাতের কাছে এমন একটি সুন্দর পাত্র থাকতে আমরা মিছিমিছি বাইরে খুঁজ্‌ছিলাম, আর সব চেয়ে মজা এই যে, রাণুর জন্যে পাত্র খোঁজার সমস্ত ভার প্রকাশের ওপরই তুমি দিয়েছিলে।

অবিনাশ বাবু হেসে বল্লেন—প্রকাশের কথা মনে যে একেবারে ওঠেনি তা' নয় মা, কিন্তু বাইরে তা' প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি; কেননা গরীবের হা'তে মেয়ে দিতে পাছে তুমি রাজি না হও। তা' ছাড়া প্রকাশ বেশ উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করবেনা, এ কথা ওর মুখে আমি আগেই শুনেছি।

—বাবা, প্রকাশ কেন এখন থেকেই অত ক'রে টাকার কথা ভাবছে? আমার বা তোমার যা কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে সে তো ওদেরই হবে। তুমি কেন প্রকাশকে সে কথা বল্লে না?

অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে বল্লেন—না মা, প্রকাশকে সে কথা বলা যায় না, ওর মধ্যে বেশ আত্মসম্মান-বোধ আছে। তা'ছাড়া আমাদের যা-কিছু সে তো প্রকাশের নামে থাক্‌বে না, রাণীরই নামে থাক্‌বে,—সুতরাং বিষয়ের কথা তুল্লে ওকে ছোট করাই হবে—প্রকাশ তা'তে দুঃখ পাবে। আরো একটা কারণে ওকে আমি অনুরোধ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি মণি,—পাছে ও মনে করে, আমরা যে ওকে স্নেহ করি তার মধ্যে আমাদের কোন গোপন স্বার্থ আছে। কিন্তু ওকে আমি কি ব'লে রাজি করলাম জান মা? বল্লাম—তোমার প্রতি রাণুর শ্রদ্ধা আছে প্রকাশ, ওকে তো তুমি ছেলেবেলা থেকেই জান? টাকার কথা যদি বল, তুমি ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র, পাঁচ জনের সঙ্গে জানা শোনাও আছে, সুতরাং তুমি আইন পাশ করে বেরুলে তোমার যে উন্নতি হবেনা তাই বা কে বল্লে? যাক্, প্রকাশকে যখন রাজি করানো গেছে তখন শুভকাজটা যতো শীঘ্র হয় ততোই ভাল।

অবিনাশবাবু তৃপ্তির হাসি হাস্‌লেন। বিধবা মেয়ে মণিমালা, তারই একমাত্র ষোড়শী মেয়ে রাণী এবং অনেক কালের দাসী শান্তকে নিয়ে অবিনাশবাবুর সংসার। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং জামাই একে একে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। রাণীর বাবা যখন মারা যান তখন তা'র বয়স মাত্র এক বৎসর। বিধবা হ'য়ে মণিমালা বাবার কাছেই আছে।

প্রকাশও অতি শৈশবেই পিতৃহীন হয়। মামার কাছে সে বরাবর মানুষ হয়েছে। অবিনাশবাবু তা'র মামার বিশেষ বন্ধু। সেই সূত্রে প্রকাশ এ বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করে, সকলেই ঐ প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ছেলেটিকে ভালবাসে। প্রকাশের মামার কিন্তু অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাই পড়াশুনায় প্রকাশের যথেষ্ট যত্ন থাক্‌লেও অর্থাভাবে হয়তো তার উচ্চশিক্ষা হ'ত না যদি-না অবিনাশবাবু নিজের থেকে

প্রকাশের পড়ার ভার নিতেন। কলেজে ঢুকেই প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ীর ছেলে হ'য়ে গেল। কাজে কর্ম্মে অসুখে বিসুখে সর্ব্বদাই সে এ বাড়ীতে হাজির থাক্‌ত। অবিনাশ বাবুর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না।

রাণীকে প্রকাশ ছোটটি থেকেই দেখ্‌ছে। প্রকাশদা'কে পেয়ে রাণীর ভাই-এর সাধ মিটেছিল। ভাইদ্বিতীয়ার দিনে প্রকাশদা'র কপালে ফোঁটা দেবার তার কি উৎসাহ! পড়ানোর ভার প্রকাশের উপরেই। অবিনাশবাবু যখন প্রকাশকে রাণীর জন্যে একটি মাষ্টার দেখ্‌তে বল্‌লেন তখন সে নিজেই এই কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। মাসের শেষে অবিনাশবাবু প্রকাশকে মাইনে দিতে এসে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে টাকাগুলি পকেটে রাখ্‌লেন।

প্রকাশ বলেছিল—রাণী আমার নিজের বোনেরই মতো, ওকে একটু পড়ানোর জন্যে যদি আপনার কাছে মাইনে নিতে হয় তা'হলে আমাকে স্নেহ ক'রে আপনি ভস্মে ঘি ঢেলেছেন দাদামশাই।

সেই রাণীর সঙ্গে আজ প্রকাশের বিয়ের কথা। এর চেয়ে শুভসংবাদ আর কি হ'তে পারে? বিশেষ ক'রে হিন্দুর ঘরে, যেখানে পাত্রপাত্রীর মধ্যে আলাপ-পরিচয় তো দূরের কথা, বিয়ের আগে একবার চোখের দেখাও হয়তো থাকে না। প্রকাশের মা বা মামা তা'র এ সৌভাগ্যের কথা অবিশ্যি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। রাণী তাঁদের বাড়ির বৌ হয়ে আস্‌বে একি কখনো আশা করা যায়? কিন্তু কথাটা যখন সত্যি, তখন প্রকাশের মামা বিশ্বাস তো করলেনই বরং বন্ধুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করলেন পাঁজি নিয়ে।

বিয়ের কথা উঠ্‌বার পর ওবাড়ীতে প্রত্যহ যাওয়া প্রকাশের পক্ষে একটু শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। রাণীর সঙ্গে তা'র বিয়ে, সে যে স্বপ্নেও কখনো একথা ভাবেনি! রাণীর সঙ্গে দেখা হ'লে প্রকাশ হয়তো মুখ তুল্‌তে পারবে না লজ্জায়!

কল্পনাকে সঙ্গী ক'রে প্রকাশ দিন কতক পার্কে মাঠে সন্ধ্যাটা কাটালো। মনের মধ্যে খোঁজ ক'রে দেখ্‌লো রাণীকে সে বহুদিন থেকেই ভালবেসেছে, কিন্তু দারিদ্র্যের কুণ্ঠায় কোনদিন তা'র অনুভূতি বাইরে ফুটতে পারে নি। কিন্তু রাণীর মনের খবরটাই বা কি? সেও কি প্রকাশকে ভালবাসে? তা'র মতো গরীব স্বামীর ঘরে সে কি সুখী হবে?

ছোট বোনটির আদর আব্দার ঝগ্‌ড়া নালিশ নিয়ে রাণী প্রকাশের কাছে এমনি সহজ এবং স্পষ্ট ছিল যে আজ তা'কে সলজ্জগুণ্ঠনবতী প্রেয়সীর রূপে কল্পনা করা প্রকাশের পক্ষে শক্ত ঠেক্‌ছে। রাণীর তৈরী একখানা কাজকরা রুমাল তা'র পকেটে রয়েছে, সেইখানা বার করে প্রকাশ নিবিষ্টচিত্তে দেখ্‌তে লাগ্‌লো - যদি রুমালের ফুলগুলির মধ্যে রাণীর আসল রূপটি ধরা পড়ে যায়।

* * *

কথাটা সকলের মতো রাণীও শুনলো। প্রকাশের সঙ্গে তা'র বিয়ে! পরিহাস মনে করে প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস করলে না। শেষে তা'র ঝিমা অর্থাৎ বৃদ্ধা দাসী যখন তাই নিয়ে রসিকতা করতে এলো তখন রাণীকে বিশ্বাস করতেই হোল, কিন্তু মুখে সে অবিশ্বাস জানালো; বল্‌লো—যাঃ, সব মিথ্যে, এ কখনই হোতে পারে না।

শান্ত বল্‌লো, হাঁা লো হাঁা, তুই সেই খুকীটেই আছিস কিনা তাই তোর বিয়ে নিয়ে সবাই তোর সাথে ঠাট্টা কর্‌ছে! ধেড়ে মেয়ে কোথাকার, এত ঢংও জানিস্! তাইতো বলি প্রকাশদা' যে চট্ ক'রে রাজি হ'য়ে গেল। ভেতরে ভেতরে তোদের সব ঠিক ছেল, না লা?

শান্ত আদর ক'রে রাণীর মুখে চুমু খেলো। হাতে ক'রে সে-ই রাণীকে মানুষ করেছে। রাণীর মঙ্গল কামনায় ঝিমাও প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু শান্তর ঠাট্টায় রাণীর মুখে হাসি দেখা গেল্‌লা না। কোন উত্তর না দিয়ে রাণী গম্ভীর মুখে তা'র ঘরে চলে গেলো।

প্রকাশ সেদিন সন্ধ্যায় এ বাড়ী এল। কতদিন আর লুকিয়ে বেড়াবে? বিয়ের কথা উঠেছে বলেই কি পালিয়ে বেড়াতে হবে? অবিনাশ বাবু বল্‌বেন কি? তা'ছাড়া রাণীর মনের ভাবটাও প্রকাশ একবার জান্‌তে চায়। অনুপস্থিতি

কারণ দেখাতে গিয়ে বল্‌লো—তা'র কোন বন্ধুর হঠাৎ ভয়ানক অসুখ করেছিল তাই সে আসতে পারেনি।

এ বাড়ীতে এসে রাণীর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী দেখায়, তাই প্রকাশ নিজেকে যতদূর সম্ভব আগেকার মতোই সহজ ক'রে নিয়ে রাণীর পড়্‌বার ঘরে গেলো। দেখলো রাণী পড়ছে না, টেবিলে মাথা রেখে ব'সে রয়েছে।

—হ্যাঁরে, রাণী পড়ছিস্ না যে বড়? রাণী চম্‌কে উঠে দাঁড়ালো। প্রকাশ চেয়ারে ব'সে সোচ্ছ্বাসে বললো—রাণী, তুই আমাকে সেদিন একটা বুদ্ধির আঁক দিয়েছিলি না? ক'দিন চেষ্টা ক'রে সেটা পারছিলাম না, আজ হঠাৎ আঁকটা হয়ে গেলো। দে, একটা খাতা দে দিকি, দেখিয়ে দি।

প্রকাশ নিজেই একটা খাতা টেনে নিয়ে অঙ্কটা কর্‌তে লাগলো কিন্তু একবার রাণীর মুখের দিকে চেয়েই সে বুঝলো রাণী অঙ্ক দেখছে না, প্রকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। মুখে তা'র হাসি নেই।

রাণী গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্‌লো—প্রকাশদা'! প্রকাশ চম্‌কে রাণীর দিকে চাইলো। রাণী বল্‌লো—মা বা দাদুর বিষয়কড়ি তো খুব বেশী নেই; ওতো সামান্যই হবে প্রকাশদা'।

একি অদ্ভুত কথা! প্রকাশ বুঝতে না পেরে বল্‌লো—কি বল্‌ছ রাণী?

প্রকাশ রাণীকে আজ অনেক দিন পরে 'তুমি' বল্‌লো। রাণী বল্‌লো—বল্‌ছি যা' তা' স্পষ্টই। বল্‌ছি আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি তো খুব বেশী বড়লোক হ'তে পারবে না—টাকা কড়ি তোমার নামেও কিছু থাক্‌বে না? তবু তুমি রাজি হ'লে?

রাণীর ইঙ্গিত এতো তীব্র এবং নিষ্ঠুর যে, প্রকাশের সর্ব্বশরীর শিউরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ, রাণী তা'কে এমনই মনে করে? শুধু বিষয়ের লোভেই রাণীকে সে বিয়ে কর্‌তে চায়? রাণীর আজ এ কি রূপ? এই রাণীকেই সে এতদিন ভাল বেসেছিল, এই রাণীরই কথা ভেবে তার কয় রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে? রাণীর মন এত নীচু?

রাণী পুনরায় বল্‌লো, তা'র কণ্ঠস্বরে তেমনি উগ্রতা, তুমিই না ব'লেছিলে উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে কর্‌বে না? আজ হঠাৎ তোমার ক্ষমতা হোল কোথা থেকে? শেষে স্ত্রীর টাকার ওপর নির্ভর ক'রে তুমি বিয়ে কর্‌বে?

প্রকাশ তখনো আবেগে কাঁপছে। চেষ্টা করেও সে কিছু বল্‌তে পারলো না—জিব্ জড়িয়ে গেছে। সে কিইবা বল্‌বে। যেখানে তার আসন এমনি ভাবে ধূলিশায়ী হয়েছে সেখানে মুখের কথায় কি ক'রে তা'কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বে? প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলো। চোখে তা'র জল এসেছিল কিন্তু রাণী তা দেখেনি।

প্রকাশ চ'লে যাবার পর রাণী স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো। সে রাত্রে তার চোখে ঘুম এলো না। কেন সে প্রকাশকে আঘাত দিলো? সত্যই কি প্রকাশ এমনি হীন? সত্যই কি টাকার লোভেই সে রাণীকে বিয়ে করতে চায়? তাই যদি হয় তবে রাণীর পাত্র খোঁজবার ভার প্রকাশ নিজে নিয়েছিল কেন? হায়! প্রকাশকে সে কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছে? রাণী কেঁদে ফেল্‌লো, তা'র ইচ্ছে হচ্ছিল তখুনি প্রকাশের কাছে ছুটে গিয়ে ক্ষমা চায়। প্রকাশকে যে সে কখন ছোট ভাব্‌তে পারে না। রাণী সারারাত্রি কাঁদ্‌লো, শেষে ভাব্‌লো কাল প্রকাশ এলে সে তার পায়ে ধর্‌বে।

কিন্তু প্রকাশ পরদিন এলনা, তারপরের দিনেও না। প্রতীক্ষার শেষ সীমায় এসে রাণী কঠিন হ'য়ে উঠলো।—বেশ তোমার সঙ্গে আমিও কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চাই না। রাণী মাকে গিয়ে বল্‌লো—মা, প্রকাশদার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ে? ছিঃ ছিঃ, ওকে যে আমি দাদা ব'লে জানি তোমরা কি পাগল হ'লে না?

মণিমালা বল্‌লো—সে কি কথা রে রানু? ঝিমা শান্তর কানে কথাটা যাওয়ায় সে এসে বল্‌লো—বিয়ের কথা বি বল্‌ছিলি না?

রাণী বল্‌লো—এই দেখ্ না ঝিমা, যাকে রোজ দেখ্‌ছি যাকে খুব চিনি, সে নাকি আবার বর হয়?

শান্ত মুখ নেড়ে বললো—এত বিদ্যেও জানিস, ধন্যি মেয়ে বাবা তুই। মেয়ে-মানুষের আবার পছন্দ কি লা?

কিন্তু মুখে যা'ই বলুক, শান্তর মনে কথাটা লেগেছে। হিন্দু মেয়ের কাছে বিয়েটা একটা সুখ-স্বপ্নের মতো। বর হয়ে যে আসে সে সেই স্বপ্নলোকেরই মানুষ—ধ্যানের মধ্যেই তা'র অস্তিত্ব। বর হয়ে যে আস্‌ছে তাকে সে জানে না, চেনে না, তাকে সে শুধু কল্পনা ক'রেছে। তা'র বর আস্‌বে চতুর্দ্দোলায় চোড়ে, আগে পিছে তা'র বাজনা বাজবে। ······কিন্তু রাণীর কাছে প্রকাশ একেবারে জানা, ভয়ানক আটপৌরে। তাই বোধকরি প্রকাশকে ওর মনে ধরেনি। শান্ত সেই কথাই ভাব্‌লো কিন্তু মুখে বল্‌লো—ওসব পাগলামি রাখলো রাখ, অমন বর ভাগ্যে জুটলে হয়।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রকাশ অবিনাশ বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করলো। মুখ তা'র শুকনো ফ্যাকাশে, দেখে মনে হয় রাত্রে সে ঘুমোয় না। অবিনাশ বাবু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা এড়িয়ে প্রকাশ বল্‌লো—আপনাকে একটা শুভ-সংবাদ জানাতে এসেছি।

—কি খবর প্রকাশ?

—রাণীর জন্যে একটি খুব ভাল পাত্র পাওয়া গেছে।

অবিনাশবাবু বল্‌লেন—সেকি কথা প্রকাশ, তুমি না সেদিন মত দিয়ে গেছ্‌লে?

প্রকাশ অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্‌লো—আমাকে ক্ষমা করুন দাদামশাই। আমি এ কদিন অনেক ভেবেছি, কিন্তু মনের মধ্যে সাড়া পেলাম না—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা আমার পক্ষে ভারি অন্যায় হবে।

অবিনাশবাবু অধীর হ'য়ে বল্‌লেন—টাকার কথা কেন ভাব্‌ছ প্রকাশ? আমার যা' কিছু আছে সে তো তোমাদেরই হ'বে, তুমি কি তা' জান না?

প্রকাশ স্তব্ধ হ'য়ে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চাইলো। এঁর মুখেও বিষয়ের কথা! ইনিও কি ভাবেন, বিষয়ের লোভেই প্রকাশ রাজি হয়েছিল?

—না দাদামশাই, পরের ওপর নির্ভর ক'রে বিয়ে ক'রলে আমার আর লজ্জার শেষ থাক্‌বে না। আমি যে পাত্রটির কথা বল্‌ছিলাম, সে খুব ভাল ছেলে, কলেজে দু'বছর একসঙ্গে পড়েছি, এখন সে প্রফেসারি কর্‌ছে। ইচ্ছে হ'লে তা'দের ওখানে লোক পাঠিয়ে জান্‌তে পারেন সব। আমাকে কিন্তু ভুল বুঝ্‌বেন না দাদামশাই। আপনার স্নেহের ঋণ আমি কখনই ভুলবো না।

প্রকাশ অবিনাশ বাবুকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। অবিনাশ বাবু ক্ষুব্ধ হ'লেন বটে, কিন্তু প্রকাশের দৃঢ়-চিত্ততাকে ভুল বুঝ্‌লেন না। আহা, এমন একটি সুন্দর ছেলে কেবল গরীব বলেই দূরে [illegible] গেল! এদিকে রাণীর আপত্তিও তিনি শুনেছি[illegible] সেটা ছেলে-মানুষী বলে তিনি হেসে উড়িয়েছিলেন[illegible]ন দেখ্‌লেন প্রকাশ ও রাণী উভয়ের মধ্যেই সঙ্কোচ [illegible] তখন তিনি ভাব্‌লেন এ মিলন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশের নির্দ্দেশ মত অবিনাশ বাবু [illegible]ত্রটির সন্ধান ক'রে দেখ্‌লেন ছেলেটি ভালই। [illegible]শের সাহায্যে কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হ'য়ে গেল। [illegible] বাড়ী কাছাকাছির মধ্যে, সুতরাং মণিমালাও বিশেষ দুঃখিত [illegible] না। মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পেলেই তা'র যথেষ্ট।

প্রকাশ নিজেকে সান্ত্বনা দিলো—যাই হোক, নিজেকে সে ছোট করে নি, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থলে কি জানি কি একটা কাঁটা বিঁধেই রইলো। যখন রাণী রাণীই ছিল তখন তা'র সম্বন্ধে চিন্তাও সহজ ছিল—এখন রাণীর রূপ বদলেছে, তা'র কথা ভেবে প্রকাশ এখন ব্যথাই পায়। যে রাণীকে সে এতখানি স্নেহ করেছিল, যার কাছে তা'র কিছুই গোপন ছিল না, সেই রাণী তা'কে এতখানি হীন মনে করতে পারল কি ক'রে?

রাণীর বিয়ের ব্যাপারে প্রকাশ দূরে থাক্‌বার চেষ্টা করেছে কিন্তু অবিনাশ বাবু একদিন তা'র হাত দুটি ধ'রে বল্‌লেন—দাদা, তুমি বাড়ীর ছেলের মতো, তুমি যদি রাণুর বিয়েতে না খাটো তা'হলে আমি বুড়োমানুষ তো পেরে উঠিনে, ভাই!

সুতরাং প্রকাশকে অনেক কাজের ভার নিতে হোল। দিন হঠাৎ রাণীর সঙ্গে তার চোখোচোখী হ'য়ে গেল। কাশ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—ভাল আছ তো ণী ?

রাণী হাস্‌লো না, বল্‌লো—হ্যাঁ, তুমি যখন আমার মঙ্গল য় উঠে প'ড়ে লেগেছ তখন ভাল থাক্‌ব বৈকি। আচ্ছা কাশ দা, তুমিই বা হঠাৎ গায়ে প'ড়ে আমার ভাল করতে ক্ল করলে কেন ?·········

রাণীর চোখ দুটি জলে ভ'রে এল, সে ধরা গলায় ল্‌লো—কেন তুমি আমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও ?

প্রকাশ বিস্মিত হ'য়ে রাণীর দিকে চাইলো। তা'র মস্ত কাজই কি রাণী এমনি ক'রে ভুল বুঝ্‌বে! প্রকাশ ণ্ঠে তীব্র ব্যথা নিয়ে বল্‌লো—রাণী, কেন তুমি আমার সঙ্গে গড়া করতে চাও ? আমি তো তোমার প্রতি কোনই ন্যায় করি নি। তোমার দাদামশাই থাকতে আমি তোমার য়ে দেবার কে ? এটুকু মনে রেখো রাণী, এ সংসারে রা সত্যই তোমার মঙ্গল প্রার্থনা ক'র্‌ছেন আমিও তা'দেরি কজন। গরীব ব'লে আমাকে তুমি যত ছোট মনে ক'রে ক, আমি কিন্তু ততো ছোট নই।·········

পাকা দেখা হ'য়ে গেল। বিয়েরও আর মাত্র দিন পাঁচ য় বাকি। সময় অল্প ব'লে গায়ে হলুদ এবং বিয়ে এক নেই হবে। প্রকাশকে বেশ খাট্‌তে হচ্ছে। অন্তরে তা'র ই থাক্ অবিনাশ বাবুকে সে দুঃখ দিতে চায় না। প্রকাশের স্ত চৈতন্য ঘিরে একটি নির্ম্মল অশ্রুসজল দুঃখ। প্রতিটি শ্বাস তা'র ভারি হাল্কা। একটি লঘু উদাস বৈরাগ্য তা'র খানিকে কমনীয় ক'রে তুলেছে। তাকে দেখ্‌লে নে হয় সংসারের কারুর প্রতিই তা'র অভিমান নেই, নিজের রিদ্র্যের প্রতিও না। তা'র যেন কিছু চাইবার নেই বার নেই, কেবল পরের জন্যে খাট্‌তেই যেন এ পৃথিবীতে স এসেছে।

বিয়ের আগের দিন কিন্তু প্রকাশের জীবনে এক অদ্ভুত-র্ব কাণ্ড ঘ'টে গেলো। রাণী প্রকাশকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। প্রকাশ যখন এলো রাণী তা'র পা দুটি ধ'রে কেঁদে ফেল্‌লো—প্রকাশ দা, এ বিয়ে তুমি ভেঙ্গে দাও, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে দূরে তাড়িয়ে দিও না।······

প্রকাশ পা সরিয়ে নিয়ে রাণীর মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লো—সে কি ? এ বিয়েতে তোমার আপত্তি কিসের রাণী ? তোমার যিনি স্বামী হবেন তিনি তো খুব ভাল লোক, তবে তুমি এ সব কি বল্‌ছ ? ওঠো চোখ মোছ, ছিঃ লোকে শুনলে কি বল্‌বে বল তো ?—তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও ?

রাণী অধীর হ'য়ে বল্‌লো—না, প্রকাশ দা এ বিয়ে তুমি বন্ধ করো লক্ষ্মীটি। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি মেয়েদের কথা বুঝ্‌বে কি ক'রে ? তা'ই আমি তোমায় সেদিন কটু কথা বলেছি এইটুকুই জান্‌লে আর কিছু জান্‌লে না। বেশ জেনো না, কিন্তু এ বিয়ে তোমায় বন্ধ করতেই হবে। আর সত্যই যদি তোমাকে হীন ভেবে থাকি তা'র জন্যে তোমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইছি প্রকাশদা, বলো ক্ষমা করলে·········

প্রকাশের বিস্ময় বাড়্‌তে লাগ্‌লো। রাণী আজ এ সব কি বল্‌ছে ? এই কি সেদিনকার সেই গর্ব্বিতা রাণী ? প্রকাশ বল্‌লো—তোমার ওপর আমার কোন দুঃখ নেই রাণী, তোমাকে আমি আমার সেই ছোট বোনটি ব'লেই জানি, কিন্তু এ বিয়ে আমি ভাঙ্গবো কি ক'রে ? কাল বিয়ে, আজ কি ক'রেই বা তা' সম্ভব ? পাঁচজনেই বা বল্‌বে কি ?

রাণী কাতর কণ্ঠে বললো—তবে কি হবে প্রকাশদা ? একটা ভুলের জন্যে কি সারাজীবন এমনি ক'রে দুঃখ করতে হবে ? প্রকাশদা', কেন তুমি সেদিন চুপ ক'রে রইলে, নিজেকে লুকোলে ? কেন তুমি বল্‌লে না ভালবাসার জোরেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে, টাকার লোভে নয়! কেন তুমি আমায় কিছু জান্‌তে দিলে না, কেন তুমি বল্‌লে না, রাণী আমি গরীব—গরীবের মতোই আমার ঘরে এসো···

প্রকাশের চোখে ধাঁধাঁ লাগ্‌লো। তা'র সর্ব্বশরীর কাঁপছে। মনে হোল তা'র ব্রহ্মতালু বুঝি এখনি ফেটে যাবে। রাণীর মুখে আজ সে কি শুন্‌লো ? রাণী তাকে দুর্ব্বাক্য বলেছে হীন ভেবে নয়, শ্রদ্ধা করে ব'লেই! অসহ্য

পুলক ও ব্যথায় প্রকাশের বুকে রক্ত তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। কিন্তু হায়! এই আশার আলো যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মতো—মেঘাচ্ছন্ন ঘনান্ধকারকে চকিতে ঝল্‌সে দিয়ে এসে তা'কে আরো ভীষণ ভয়াবহ ক'রে তোলে। প্রকাশের জীবনে দুঃখব্যথার একটি ম্লান অশ্রুসজল ছায়া ছিল কিন্তু আজ রাণীর প্রকাশোক্তিতে তা' গাঢ় কালিমায় পর্য্যবসিত হোল।

প্রকাশ চীৎকার ক'রে বল্‌লো - রাণী, এ তুমি কি করলে, যা আড়ালে ছিল তা'কে আড়ালেই রাখ্‌লে না কেন? এখন আমি কি করতে পারি? জান ত কিছুই করবার নেই। কেন তুমি আমায় কাঁদাতে চাও? যা হয়ে গেছে ভুলে যাও, নতুন যিনি আস্‌ছেন তাঁ'কেই মেনে নাও······প্রকাশ-দা'কে ভুলে যাও রাণী·········

প্রকাশ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সমস্ত দিন সে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো, এর কোন কি উপায় নেই? সামান্য ভুলের জন্য সত্যই কি এতখানি শাস্তি মাথায় পেতে নিতে হবে? পাত্র তো প্রকাশের বন্ধু, তবে তা'কে গিয়ে সব খুলে বল্‌লে হয় না? ছিঃ ছিঃ,······ প্রকাশ লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লো। সে কি পাগল হোল? এ সংসারে প্রেমের মূল্য ক'টা লোকেই বা বোঝে? আর অবিনাশ বাবু—তিনি কি প্রকাশকে তা'হলে ক্ষমা করতে পারবেন?

* * * * * *

বিয়ের দিনে প্রকাশের দেখা নেই। অবিনাশ বাবু বার বার লোক পাঠিয়ে জান্‌লেন, প্রকাশ আগের দিনে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে এখনো ফেরে নি। রাণী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। তা'র কান্নার কারণ কেউ জানলে না, তবে অনেকে অনুমান করলো; কিন্তু বল্‌লো, এও ছেলেমানুষী—এরও কোন মানে হয় না।

বিয়ে হয়ে গেলো। রাণী ভেবেছিলো বিয়ের পরদিনও প্রকাশ একবার এসে শেষ দেখা দিয়ে যাবে - তা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে। রাণী পথের দিকে চেয়ে বসে আছে কখন প্রকাশ আস্‌বে, কিন্তু কোথায় প্রকাশ!

বিদায়ের ক্ষণে শান্ত'র কাঁধে মাথা রেখে রাণী আড়ালে অনেক কাঁদলো। ঝিমা সব জেনেছে, সেও কাঁদলো।

রাণী তা'র হাতে এক টুকরো চিঠি এবং একখানি রুমাল দিয়ে বল্‌লো—এগুলো তোর কাছে রাখ্‌ ঝিমা, প্রকাশদার সঙ্গে দেখা হলে তা'কে দিস।···

রাণী চ'লে যাবার পর শান্ত সন্ধ্যায় প্রকাশদের বাড়ী গেলো। দেখলো প্রকাশ ফিরেছে—নিজের ঘরে শুয়ে আছে। শান্ত'র ডাকে প্রকা[illegible]লো—তার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ। শান্ত সে মূর্ত্তির দিকে চো[illegible]তে পারলো না। রাণীর জিনিষ প্রকাশের হাতে দি[illegible]তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

রুমালটিতে হরেক রকমের ছুঁচের [illegible] পাতা-ফুলের মধ্যে প্রকাশের নাম লেখা। একটি [illegible] ছোট অক্ষরে 'রাণী' লেখা। অনেকগুলি পাতা [illegible] ঘিরে, সহজে লোকের চোখে পড়বে না। প্রকাশ [illegible] দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো।

তারপর চিঠিটি আস্তে আস্তে খুলে সে পড়্‌লো,—[illegible] দু তিনটি লাইন।

প্রণাম নাও। শাস্তি আমরা দুজনেই পেয়েছি, তা' যদি সত্যি হয় দুঃখকে আমি সুখের মতোই উপভোগ করতে পারব। তাহলে এ জীবনের পথচলা আমার সহজ হবে। যদি জন্মান্তর থাকে তোমাকেই যেন বারে বারে পাই—এবারের মতো ক্ষমা করো···ইতি।

প্রণতা রাণী

প্রকাশ কাঁদলো না। চোখে তা'র বাদল নামেনি, তবে কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড গতিবেগ তা'র দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। সেই ভীষণ ঘনায়মান সংহত শক্তি-প্রবাহ কখন যে আকুল বর্ষণে ভেঙে পড়্‌বে তা' কে বলতে পারে?

শ্রীজগৎ মিত্র

দুর্দ্দিনে

শ্রীযুক্তা কল্পনা দেবী

[illegible] রজনীতে
সহসা [illegible] নিস্তরঙ্গ চিতে !
ছিল [illegible], ছিনু নিঃসংশয়,
জানি [illegible] তৃপ্ত কত যে নির্ভয়
করেছ আমায় তুমি ; প্রতি পদে পদে
হাতে ধরে ফিরায়েছ ; সম্পদে বিপদে
[illegible] করনি ত্যাগ। আমি যদি কভু
ভুলিয়াছি মনে মনে, ভোলনিক' তবু,
আপনি কঠিন করে দিয়েছ চেতনা—
আঘাতে তুলেছ সাড়া, পাছে অন্যমনা
আপন কর্ত্তব্যে ভুলি।
কত কাঁদিয়াছি,
করিয়াছি অনুযোগ—"কেমনে যে বাঁচি
এত যদি ব্যথা দাও ?"
তুমি শুনে হেসে
আরো কাছে নেছ টেনে—কত ভালবেসে
মুছায়েছ সিক্ত আঁখি, বলেছ মধুরে—
"ওরে সে আঘাত নয়, অজ্ঞান বিধুরে
সে শুধু জাগায়ে তোলা"—
তাই অসংশয়ে
কাটে রাত্রি কাটে দিন—নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে
বিশ্বাসে সুদৃঢ় চিত্ত। কাল অকস্মাৎ
কে তাতে দিয়েছে সাড়া, কেন সে আঘাত
আমারি বুকেতে এল !

হে চিন্তাহরণ,
কেন কাল আশ্রিতেরে দিলে না শরণ ?
আলো, আলো কই ?
যে মন জানিত নাক' শুধু তোমা বই,
সে কেন নিঃসঙ্গ আজ ? কেন সে লুটায়
ধূলি-ম্লান গৃহতলে—ক্ষুব্ধ বেদনায়
সহসা অধীর হোল ! ওই আর্ত্তস্বর
ছুটে তা'র দিকে দিকে ভেদি চরাচর—
"আলো কোথা—আলো কই ?"
কই কোথা আলো—
পাখীর মুখর কণ্ঠ আজি কি ভুলিলো
সমস্ত সঙ্গীত তার ? স্তম্ভিত আকাশ
কি যেন অজানা ভয়ে, আজি কি বাতাস
থেমে গেল একেবারে ?
আলো—আলো কই ?
তুমি যার চিত্তে রাজ আঁধার-বিজয়ী
সে আজও আলোক খোঁজে—এও সত্য হোলো
হে নিত্য হে সনাতন, তুমিও কি ভোলো
একান্ত আশ্রিত জনে ? চপল, নির্ম্মম
ধরণীর ধূলিম্লান ক্ষুদ্র চিত্ত সম
তোমারো বিচার যদি, তবে কিবা দিয়ে
ভোলাব এ আর্ত্ত প্রাণ—বাঁচিব কি নিয়ে ?

শ্রীকল্পনা দেবী

রাগ রাগিণীর ভাব

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন

১

পুরাণে আছে দেবাদিদেব মহাদেবই আমাদের সঙ্গীতের স্রষ্টিকর্ত্তা। মহাদেবের নিকট গৌরী কণ্ঠ-স্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; ইহাতে মহাদেব বলেন—

"স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরম্ ধনম্
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন চ শ্রুতম্।"

"হে দেবি! স্বর-জ্ঞানের অপেক্ষা প্রধান মিত্র, শ্রেষ্ঠ ধন অথবা গুপ্ত বিষয় আর দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় না।" অতএব কণ্ঠ-স্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের সকলেরই প্রথমে জানা উচিত।

প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ স্বর উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় গত ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বিচিত্রায়' বিশদভাবে লিখিয়া সঙ্গীত-আলোচকদিগের বিশেষ ধন্যভাজন হইয়াছেন। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাক্‌তন্তুর (vocal chord) কম্পন (vibration) হইতেই স্বরের উৎপত্তি হয় এবং দাঁত, গাল ও তালুতে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্বর প্রবল হয়। যেমন—

"It has been proved by observations on living subjects, by means of the laryngoscope, as well as by experiments on the larynx taken from the dead body, that the sound of the human voice is the result of the inferior laryngeal ligaments, or true vocal chords which bound the glottis, being thrown into vibration by currents of expired air impelled over their edges" (Hand Book of Physiology by William Senhouse Kirkes, M.D.)

"জীবিত ব্যক্তির কণ্ঠনালী পরিদর্শন করিয়া ও মৃতদেহের গলনালী পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মুখগহ্বরে নিবদ্ধ স্বরোৎপাদক কণ্ঠনালীর সূক্ষ্ম তন্তুপ্রান্তে ফুস্ ফুস্ হইতে নিঃসৃত বায়ু আহত এবং কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদিত করে।"

এই গেল ঐ দিক্‌কার কথা। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"আত্মাবিবক্ষমাণোহয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোহথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরণ্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিঃ॥"

(সঙ্গীত রত্নাকর)

"কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে মন দেহস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে। শরীরে ব্রহ্মগ্রন্থি নামে যে গ্রন্থি আছে এবং তাহাতে যে বায়ু থাকে দেহাগ্নি গিয়া সেই বায়ুকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে চালনা করে। সেই বায়ু ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে আসিয়া যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও বদনে ধ্বনি উৎপন্ন করে।"

নাভি এবং হৃদয়ও (বক্ষ) যে স্বর-উৎপত্তির সহায়তা করে তাহা প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ বলেন না। আমরা কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণের সহিত একমত হইতে পারি। কারণ যে সুর গাহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে বক্ষের স্পন্দন বিশেষ ভাবেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয় বক্ষ স্বর-উৎপত্তিতে সহায়তা করে। অতি-খাদ সুর গাহিতে নাভিও সূক্ষ্মভাবে কম্পিত হয় এবং স্বর-উৎপত্তিতে সাহায্য করে এরূপ মনে করিতে পারি।

২

আমাদের গীত ভাবপ্রধান এবং তাহা বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু কি ভাবে তাহা ব্যক্ত করে এবং কি তাহার রীতি তাহা জানিবার প্রয়োজন আমাদের হয় না। কারণ গান বাজনা শুনিতে আরম্ভ করিলে তখন ও সব ভাবিবার কথা কাহারও মনেই থাকে না। কেবল একটা কথা মনের কোণে উঁকি দেয়, আমাদের কানে যখন একটু সুরের রেশ বা এক টুক্‌রা সুর ভাসিয়া আসে তখন আমরা কান পাতিয়া শুনি কেন? কি রহস্য ইহাতে আছে? কোথায় কোন্ তেপান্তরের মাঠ হইতে একটা অচেনা অজানা গানের সুর কাণে পৌছিতেই আমাদের মন সেইদিকে আকৃষ্ট হয় কেন? প্রতীচ্য বলে যে, আমাদের কাণ স্বভাবতঃ মিষ্ট ধ্বনি অনুকরণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ ইহা কাণের স্বভাবিক ধর্ম্ম। আমরাও পূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, সুরের মিল যে যে সুরে আছে মানুষ সেই সেই সুরের একত্র বা পাশাপাশি সমাবেশ শুনিতে ভালবাসে ও তাহাতে সুখানুভব করে। কিন্তু কেন এইরূপ সুখানুভব হয়? আমাদের শরীরে এমন কী আছে যাহাতে এরূপ হইতে পারে? সুরের দূরত্ব, সুরের মিল ও অনুপাত, কি কি অনুপাতের ধ্বনিত সুরের রেশ আমাদের কাণে মিষ্ট লাগে, কানে কি আছে যাহাতে আমরা শুনিতে পাই, এই সব ব্যাপারে পাশ্চাত্য মনীষীগণ অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সুর কেন মিষ্ট লাগে, এক এক সুর কি ভাব ব্যক্ত করে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের শরীরের স্থানে স্থানে এমন সব সূক্ষ্মতন্ত্রী আছে যাহার আন্দোলনে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবের মিলন হয়। কাণ সম্বন্ধে যেমন প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের কাণের ভিতর অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে. বাহিরের ধ্বনির কম্পন সেই সব তন্ত্রীকে কাঁপাইয়া দেয় ও আমরা শুনিতে পাই,—সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্র মতে বলিতে গেলে আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলীতে ছয়টী চক্র আছে, সেই সকল চক্রে কতকগুলি সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে, বাহিরের প্রকৃতির ভাব সেই সকল তন্ত্রীতে আঘাত করে ও আমাদের দেহে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়।

স্বর-উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে লেখা আছে যে, ব্রহ্মগ্রন্থির বায়ু ঊর্দ্ধদিকে চালিত হয়, সেইখানেই মূলাধার নামে এক চক্র আছে তাহা অধোভাগে coccyx-এ অবস্থিত। সেই চক্রে চারিটি পদ্ম (বর্ণ) আছে। সেই চক্রে 'স' সুর উৎপন্ন করিবার মত তন্ত্রী আছে, তাহা রক্তবর্ণ ও তাহার তত্ত্বের নাম পৃথিবী। এর উপরে এবং প্রজনন স্থানের নিম্নে (lumbar-এ) স্বাধিষ্ঠান নামে চক্র অবস্থিত। সেই চক্রে ছয়টি পদ্ম (বর্ণ), সেখানে 'র' সুর উৎপন্ন করিবার তন্ত্রী আছে, তাহার তত্ত্বের নাম বারি। কারণ ইহা বরুণের (জল) স্থান।

তন্ত্রশাস্ত্র হইতে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় যে তালিকা করিয়াছেন তাহা তাঁহার লিখিত "রাগরাগিণীর মাধুর্য্য" নামক প্রবন্ধ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনিই প্রথমে হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্য কোথায় ও তাহার বিজ্ঞান কি তাহা লিখিয়া সঙ্গীত আলোচকদের যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

তালিকাটি এই—

চক্র	পদ্মের সংখ্যা	স্থিতির ক্ষেত্র	তত্ত্বের নাম	আহত স্বরের নাম
মূলাধার	৪	অধোভাগ (Coccyx)	পৃথিবী	ষড়্‌জ——সা
স্বাধিষ্ঠান	৬	প্রজনন স্থানের নিম্নে (Lumbar)	বারি (রস)	ঋষভ——রে
মণিপুর	১০	নাভি (Dorsal)	অগ্নি (রূপ)	গান্ধার——গা
অনাহত	১২	হৃদয় (Cervical)	বায়ু (স্পর্শ)	মধ্যম——মা
বিশুদ্ধ	১৬	কণ্ঠ (Thoracic)	আকাশ (শব্দ)	পঞ্চম——পা
আজ্ঞা	২	কুর্ম্মাখ্য (Medulla)	—	ধৈবত——ধা
সহস্রার	—	মন, মস্তিষ্ক (Cerebrum, Brain)	—	নিষাদ——নি

"সঙ্গীতশাস্ত্র বলে যে, সঙ্গীতের ভিত্তি 'নাদ' (ধ্বনি বা শব্দ)। মূলাধারস্থিতা নাদরূপা কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগ-দ্বারা সহস্রারস্থিত বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিত সংযোগ করিতে পারিলেই যোগে সিদ্ধিলাভ হয়। এইজন্য কেহ প্রাণায়াম দ্বারা কেহ বা স্বরসাধনা দ্বারা ষটচক্রভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে সংযোগ করিতে সিদ্ধ হয়েন।" সঙ্গীতের চরম লক্ষ্য ভগবৎপ্রেম লাভ। সহস্রার স্থিত পরম শিবের সহিত (সা) কণ্ঠ মিলাইয়া সুর, মন ও ভাবসম্পদ তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারিলেই তৃপ্তি। যেন এইখানেই সুরের, কথার ও ভাবের চিরসমাপ্তি। আমরা ভগবৎ-প্রেম লাভ করিবার জন্য ভিখারী। ভিখারী মাত্রেই করুণ বা ব্যাকুল ভাবে ভিক্ষা পাইবার অপেক্ষা করে। এইজন্য সঙ্গীত মাত্রেই অর্থাৎ সকল দেশের সঙ্গীতই ব্যাকুলতাপূর্ণ। আমাদের সঙ্গীতও ব্যাকুলতার সুর।

সঙ্গীতের মধ্যে তিনটি বস্তু আবশ্যক,—কথা, সুর ও ভাব। কথার ভাবের সহিত সুরের ভাবের ঐক্য হইলেই গায়কের মুক্তি। কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব রহিয়াছে।

“কোথা আশ্রয়-শাখা” ?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"যতই চিন্তা করিয়া দেখিবেন ততই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের তিনটিরই অভাব। সুরের শেষ নাই; কথারও শেষ নাই; ভাবেরও শেষ নাই। ভাবগ্রাহী বলেন ভাবই অবলম্বন কর; কবি বলেন কথাই অবলম্বন কর, ছন্দের সহিত; সঙ্গীতাচার্য্য বলেন সুর অবলম্বন কর, কেন না প্রথম নাদই ওঁকার, তাহারই মধ্যে কথা ও ভাব। যোগী বলেন প্রাণ সংযত কর নচেৎ তোমার সুর, কথা ও ভাব তিনটিই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব মাত্রা ও ছন্দ কিংবা তালের দরকার।"

৩

এখন কথার ভাব ও সুরের ভাবের ঐক্য কিরূপ দেখা যাক্।

কথা—

"এস হে এস, সজল-ঘন বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।"

রবীন্দ্রনাথ

স্বরবিন্যাস—

রা	মা	মা	মা	মা	পা	পা	পা	মা	পা
এ	স	হে	এ	স	স	জ	ল	ঘ	ন
ধা	র্সা	নর্সা	ধা	পা	মা	ধপা	মা	-া	-া
বা	দ	ল	ব	রি	ষ	০	নে	০	০
রা	গা	মা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা	সা
বি	পু	ল	ত	ব	শ্যা	ম	ল	স্নে	হে
সা	রা	রা	রা	রা	গা	রা	গমা	-মা	-গা
এ	স	হে	এ	জী	ব	০	নে	০	০

কথার ভাব—

সজল ও ঘন বাদলকে তাহার বিপুল ও শ্যামল স্নেহ দিয়া এই জীবনে অর্থাৎ হৃদয়ে আসিতে আহ্বান করা হইতেছে, ব্যাকুলতার সুরে বা ব্যাকুল ভাবে।

সুরের ভাব—

পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে, মধ্যম (মা) হৃদয়ে অবস্থিত ও তাহার নাম বায়ু; ঋষভ (রে) বারির স্থানে অর্থাৎ জলে; গান্ধার (গা) অগ্নিতে (তড়িৎ বুঝায়)। স্বরবিন্যাসের প্রথমেই আরম্ভ হইতেছে—রা মা মা মা মা এস হে এস; কিন্তু কোথায়? হৃদয়ে। অর্থাৎ সুরের কথায় মধ্যমে—সাতটি সুরের হৃদয় মধ্যমে, অর্থাৎ 'মা'তে। 'এস হে এস' গাওয়াতেই সঙ্গে সঙ্গে সুরের ভাব বুঝাইয়া দিতেছে যে, সুরের হৃদয় ('মা') ডাকিতেছে জলকে ('রে') 'এস হে এস'। যেমন—রা মা মা মা মা।

পা পা পা মা পা ধা র্সা র্সা ধা পা মা ধা পা মা মা। সজল ঘন বাদল বরিষণে। আরম্ভ পা সুর হইতে, সমাপ্ত মা সুর পর্য্যন্ত। অর্থাৎ আকাশ (পা) বা ঊর্দ্ধ পথ হইতে

হে সজল ঘন বাদল, ঝর ঝর ধারে হৃদয় (মা) পর্য্যন্ত 'এস হে এস'।

রা গা মা পা ধা পা মা গা মা রা সা সা রা রা রা রা গা রা গা মা মা গা। বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে। "এস হে এস" রা গা মা পা ধা পা হইতে। অর্থাৎ রা (জল) গা (তড়িৎ) মা (বায়ু) সাহায্যে পা ধা পা (আকাশ) হইতে তুমি এস। সঙ্গীত শাস্ত্রে বলে র স্বর করুণ রসাত্মক। এখানে শেষের 'এস হে' কথাটিতে একটু বিশেষ করুণভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বর বিন্যাসে র স্বরই ধ্বনিত হইতেছে,—যেমন সা রা রা রা রা।

এখানে কথার ভাবের এবং সুরের ভাবের মিলন হইতেছে অপূর্ব্বভাবে। গানের কথা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভের ভাব আনিতেছে। গ্রীষ্মকালের অগ্নিসম-রৌদ্র-দগ্ধ হৃদয় বাদলকে আহ্বান করিতেছে। ইহাতে মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাস সংযোজন করা হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখুন মল্লার রাগিণীতে বর্ষার ভাব আসিতেছে কিনা।

৪

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণেরও পরিবর্তন হয়। লজ্জায় মুখ-মণ্ডল লাল হয়, ভয়ে কাল হয়, ক্রোধেও লাল হয়, কাম ভাব রক্ত হইতে পীত পর্য্যন্ত অধিকার করে। এই সবের আভাস আমরা মুখের বাহ্য ভাবেও দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গেও বর্ণের পরিবর্তন হয়। বসন্তে নানা রঙের ফুল ফুটে। বর্ষার প্রারম্ভে পৃথিবী সবুজ হইয়া যায়। কাজেই, প্রাকৃতিক ভাবের সঙ্গে বর্ণে যেমন যোগসূত্র রহিয়াছে তেমনি আবার মানুষের ভাবের সঙ্গেও বর্ণের সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। প্রতি সুরেও যে এক একটা বর্ণের মিল আছে তাহা ১৩৩৬ সালের 'বিচিত্রা'র চৈত্র সংখ্যায় "হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্য" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে। কাজেই এখানে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সা = রক্ত (লাল)
রে = কমলা (গোলাপী)
গা = পীত
মা = সবুজ
পা = নীল
ধা = অতি নীল (কাল)
নি = বেগুনী

পূর্ব্বের মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাসটি লইয়া দেখা যাক্ উহাতে ভাবের সঙ্গে বর্ণের মিলন হয় কিনা। কথার ভাব—বর্ষার প্রারম্ভে বাদলকে আহ্বান। স্বর-বিন্যাস—রা মা মা মা মা এস হে এস।

এখানে আমরা মা সুরই প্রবলতর দেখিতেছি। মা স্বর সবুজ বর্ণ। এই ধরাতল সবুজ করিয়া হে বাদল এই হৃদয়ে (মা) এস, অথবা হে বাদল তুমি [illegible]সিয়া ধরাতল সবুজ কর। মা গা মা রা সা—শ্যামল [illegible] এখানে মা প্রবলতর ও সা-তে বিশ্রাম। মা শ্যামল ([illegible]) স্নেহে পৃথিবীতে (সা) এস। কথায়, সুরে এবং বর্ণে [illegible] প্রারম্ভ সূচনা করিতেছেন।

৫

সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে, এক একটা স্বর এক একটি ভাব প্রকাশ করে। যেমন—

"মূলং রসানাং ষড়্‌জাখ্য ঋষভঃ করুণাত্মকঃ।
গান্ধার স্তথা শান্তাত্মা ভয়ানকোঽস্তি মধ্যমঃ॥
বীরাত্মকঃ পঞ্চমস্তু ধৈবতঃ করুণাত্মকঃ।
নিষাদো রৌদ্র বীরাত্মা গন্ধর্ব্বাভিজ্ঞসম্মতঃ॥"

(সঙ্গীত-মহাদধৌ)

অর্থাৎ—

সা = সকল রসের মূল
রে = করুণ রসাত্মক
গা = শান্ত রসাত্মক
মা = ভয়ানক
পা = বীর
ধা = করুণ
নি = রৌদ্র ও বীর

পূর্ব্বের মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাসটিতে আমরা রে, মা ও ধা এই কয়টিই প্রবল সুর পাইতেছি। রে সুর প্রবলতম। নি, পা ও গা সুর অল্প ব্যবহৃত হইতেছে। রে—করুণ, মা—ভয়, ও ধা—করুণ। এই প্রবল সুরগুলিতে ভয় ও করুণ ভাব পাইতেছি; করুণভাবই বেশী। নি—রৌদ্র ও বীর, পা—বীর, আর গা—শান্তরসসূচক। মল্লারে বীর ও শান্তভাবের অভাব। ভয় ও করুণ ভাবের আধিক্যে বীর ও শান্তভাব নাই। ভয়ে মন চঞ্চল। আর সা সুর সকল ভাবের মূল; যে কোন ভাব সা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। মল্লারে নি সুর অতি অল্প ব্যবহৃত হয়। স্বর-বিন্যাসে তাহাই আছে। নি সুরের ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নি—রৌদ্র সুর, সুরের আর রৌদ্র ভাব ভাল লাগিতেছে না, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় হইয়া আর প্রাণ রৌদ্র চায় না। তাই রৌদ্র-ভয়ে ভীত সুর করুণভাবে জলের জন্য ও সবুজ মাঠের আশায় বাদলকে আহ্বান করিতেছে। এই জন্যই মল্লার করুণ রাগিণী। মল্লার রাগিণীতে যেমন আকাশ ছাইয়া বাদল আসে, হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও করুণ সুর মিলিয়া বাদল আসে। প্রকৃতির বাদল হইতে যেমন ঝর ঝর বরিষণ হয়, মনের বাদল হইতেও ক্রন্দন আসে এবং নয়নের বাদল ঝর ঝর ধারে বরিষণ হয়।

৬

উপরে লিখিত কথাগুলির প্রমাণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা এখনও পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যে বিষয়টুকুর উপরে বেশী ঝোঁক দেন তাহা সুরের harmony (স্বরসম্বাদ)। কম্পনের অনুপাতে যে যে সুরে অধিকতর মিল আছে সেই সেই সুরগুলির একত্র ধ্বনি মিষ্ট লাগে। তাহাই harmony। তাঁহাদের সঙ্গীত harmonyর কড়া গণ্ডীর ভিতরে। আমাদের সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ আইনের বাঁধাবাঁধি [illegible] বেশী নাই। অর্থাৎ পশ্চিম দেশের মত নাই। তবে আমাদের সঙ্গীতেও স্বর-সম্বাদের মিলন আছে। অবশ্য আমরা ইহার উপর বেশী ঝোঁক দিই না।

আমাদের সঙ্গীতে একটা সংজ্ঞা আছে 'বাদী সংবাদী সুর'। প্রাচীন সঙ্গীতমহারথীগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাগের স্বরূপ প্রকাশক স্বর-বিন্যাসের বাদী সুর রাজার ন্যায় ও সংবাদী সুর মন্ত্রীর ন্যায়।

হিন্দুস্থানী কথায় বাদী সুরকে 'জান্' বলে। জান্ অর্থ প্রাণ। বাদী সুরই রাগের প্রাণস্বরূপ এইরূপ বুঝায়। জান্ সুর ব্যতীত রাগের রূপ প্রকাশ করা অসম্ভব। রূপ প্রকাশ করিতে সংবাদী সুর বাদী সুরকে সাহায্য করে।

আমাদের বাদী সংবাদীর মিলনই প্রকৃত স্বর-সম্বাদ (harmony)। সাধারণতঃ, যে সুর বাদী হইবে তাহার পঞ্চম সুর সংবাদী হয়। গা বাদী হইলে নি সংবাদী হয়। কারণ গা-কে সা ধরিলে তাহার পঞ্চম সুর অর্থাৎ পা সুর নি হইবে। কম্পনের অনুপাতে কোন্ কোন্ সুরের সঙ্গে কোন্ কোন্ সুরের মিল আছে ও আমাদের সঙ্গীতে তাহা কিরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত এবং আমাদের সঙ্গীত সুরের মিল অনুযায়ী কিরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহা 'হিন্দু-সঙ্গীতের মাধুর্য্য' নামক প্রবন্ধে একবার লেখা হইয়াছে। এখানে পুনরায় ইহার আলোচনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাস লইয়া দেখা যাক্ তাহার বাদী সংবাদী কি ভাব প্রকাশ করে। মল্লার রাগিণীর রে সুর বাদী ও তাহার পঞ্চম ধা সুর সংবাদী। রে সুর করুণ রসাত্মক, ধা সুরও করুণ রসাত্মক। মল্লার এই জন্যই খুব করুণ রাগিণী। ইহা শান্ত ও বীর রসে গাওয়া যায় না।

৭

দেখা যাক্ এই গানটির 'অন্তরা' কি ভাব ব্যক্ত করে, এবং কথায়, ভাবে ও সুরে মিলন কতটুকু হয়।

কথা—

'এস হে, গিরিশিখর চুমি' ছায়ায় গিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এস হে তুমি গভীর গরজনে।

স্বরবিন্যাস

পা পা	পা নধা না	র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সধা
এ স	হে, গি রি	শি খ	র চু মি	ছা য়া

না র্সা র্রা	র্সা না	র্সা ধা পা	মা মা	মা মা মগা
য় ঘি রি	কা ন	ন ভূ মি	গ গ	ন ছে য়ে

রা পা	মা পা পা	ধা র্সা	নর্সা ধা পা	
এ স	হে, তু মি	গ ভী	র গ র	

পা মা	ধা পা মগা	রা গা	মা ধা পা	মা গা
জ ০	নে ০ ০	বি পু	ল ত ব	শ্যা ম

মা রা সা	সা রা	রা রা রা	গা রা	গা মা মগা
ল য়ে হে	এ স	হে, এ জী	ব ০	নে ০ ০

গিরি-শিখর অনেক উঁচু। কথায় বলিতেছে— এস হে গিরি-শিখর চুমি। কিন্তু গিরি-শিখর চুম্বন করিতে হইলে অনেক উচ্চে আরোহণ করিতে হইবে। সুর বিন্যাসেও ঐরূপই আছে—পা পা পা নধা না র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা।

সা-ই মূলাধার সুর। এক তারার সা সুরে সুর মিলাইতে পারিলেই আমাদের তৃপ্তি। এখানে সা সুরে বা পরম-শিবে সুর মিলিতেছে। এইজন্য আমরা এইটুকু স্বর-বিন্যাসেই বিশেষ আনন্দ পাইতেছি। গিরি-শিখর বা সুরের শিখরে আরোহণ করিয়া আবার ফিরিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া ফিরিলে চলিবে না, কাননভূমি ছায়ায় ঘিরিয়া তবে ফিরিতে হইবে। সুরও চড়া র্সা হইতে অবরোহণ করিতেছে—যেমন র্সা র্সা ধা না র্সা র্রা র্সা না র্সা ধা পা। এই কয়টি সুরের মধ্যে ধা সুরে ঝোঁক্ পড়িতেছে বেশী। সা সুরও বেশী ব্যবহৃত হইতেছে কারণ সা মূলাধার সুর। ধা সুরই এখানে বিশেষভা[illegible] ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধা— কালবর্ণ। বাদল কৃষ্ণবর্ণ হই[illegible] না আসিলে কাননভূমি ছায়ায় ঢাকা পড়িতে পারে না সুরই তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই স্বর-বিন্যাসটুকুর স্ব[illegible] পা সুরে সমাপ্ত। পা সুর পর্য্যন্ত আসিয়াই অর্থাৎ আকা[illegible] পর্য্যন্ত আসিয়াই সমাপ্ত। এই ধরাতল ছায়ায় ঢাকা দি[illegible] হইলে কৃষ্ণবর্ণ বাদলের আকাশেই পরিভ্রমণ করিতে হইবে তারপর—গগন ছেয়ে এসে হে তুমি গভীর গরজনে। বা[illegible] গগন ছেয়ে আসে আবার হৃদয় ছেয়েও আসে। গগন এখা[illegible] হৃদয়ের গগনও হইতে পারে। স্বর বিন্যাসে আছে—

মা মা	মা মা মগা	রা পা	মা পা পা
গ গ	ন ছে য়ে	এ স	হে তু মি

স্বর-বিন্যাসে মা সুরের প্রাধান্য ও পা সুরে সমাপ্ত। মা সুর হৃদয়। হৃদয়েও বাদলের ভাব আসুক্ তাহাই এখানে সুরে বুঝাইতেছে। 'গগনে বাদল' এখানে হৃদয়ের বাদল। সুর পা সুরে সমাপ্ত। যেন পা সুর ধ্বনিত হইয়া বলিতেছে, হে বাদল, হৃদয় ছেয়ে তুমি এস আকাশ (পা) হইতে। কাতর স্বরে যেন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছে ও তাহাই বুঝাইতেছে। গর্জ্জন এবং গভীর গর্জ্জন হইলেই সুর চড়ায় উঠিবে। স্বর-বিন্যাসের সুরও চড়া হইয়া গিয়াছে। যেমন—ধা র্সা নর্সা ধা পা পা মা ধা পা মগা।

উপরে[illegible]ন্যাসে রে-মা, ধা-র্সা, মা-ধা, র্সা-ধা, মা রে, [illegible]রে-পা প্রভৃতি সুরের মিল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃ[illegible] কম্পনের অনুপাতে উপরোক্ত সুরের বিশে[illegible] দেখা যায়। কাজেই স্বর-বিন্যাসের সুর 'হারমণি' বর্জ্জিত এইরূপ বলা যায় না। সুরের চলনভঙ্গী অতি স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ভাবে কোথায়ও সুর চলাফেরা করে নাই। কাজেই স্বর-বিন্যাসে সুরের মিল নাই বা স্বর-বিন্যাস সুতরাং 'হারমণি' বর্জ্জিত এ কথা বলা যায় না।

হিন্দী গানেই কথার, সুরের ও ভাবের মিলন বিশেষভাবে দেখা যায়। আমাদের যত উৎকৃষ্ট গান সবই প্রায় হিন্দী ভাষায় রচিত। সব দেশের ওস্তাদগণই হিন্দী গানগুলি শিক্ষা করেন ও তাহাই গান করেন। Hindu classical music বলিতে আমরা এখনও হিন্দী গানকেই বুঝি। বাংলা ভাষায় হিন্দীর অনুকরণে মাত্র সামান্য কয়েকটী গান আছে। এখানে একটি হিন্দী গানের সামান্য পরিচয় দিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছি। এ গানটিতে পূর্ব্বোক্ত গানটীর পরবর্ত্তী সময়ের ভাব।

কথা—

পাতুরা সম নিরতত
বিজরী সঘন গরজে গরজে।
আইরে পাওয়াসদল সাজে
বরখত কোটি কোটি শিল।
পূরবাইয়াঁ চলত পবন
কঠিন সঘন দলত দ্রুম,
অতি আঁধিয়ারী রএনা একেলি
পিয়া বিন ডর লাগে মুঝে।

ভাব—

নর্ত্তকীর মত নৃত্যশীলা বিজলী ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে; আর আকাশে সাজ-সজ্জা করিয়া মেঘরাশি আসিতেছে এবং কোটি কোটি শিল বর্ষণ করিতেছে।

পূবের হাওয়া বহিতেছে এবং গাছপালা কঠিনভাবে দলিত হইতেছে। এই অতি ঘন ঘটা ও অন্ধকারে—পিয়া ছাড়া আমি একা—আমার ভয় করিতেছে।

স্বর-বিন্যাস—

ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	নর্সা	ধা	+পা	মা	মা	মা
পা	০	০	০	০	০	০	তু	রা	০	০	০

মা	মা	মা	রা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	মা	পা	ধা	র্সা
স	ম	নি	০	০	র	ত	০	ত	০	বি	জ	রী	স

নর্সা	ধপা	মা	মা	গা	মা	মা	মা	মা	রা	রা	মা	রা	রা
ঘ	ন	গ	র	০	জে	গ	র	০	জে	আ	ই	রে	পা

রা রা | সা সা | রা রা | সা সা | সা সা || ধা ধা |
ওয়া স | দ ০ | ০ ল | সা ০ | জে ০ || ব র |

ধা নসা | ধা পা | মা মা | গা মা | মা মা | মা রা |
০ ০ | খ ত | কো ০ | ০ টি | কো ০ | ০ টি |

মা গা | রা রা | রা সা ||||
শি ০ | ০ ০ | ০ ল ||||

\+
পা পা | র্সা ধা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা
পূ র | বা ০ | ই য়া | চ ল | ০ ত

র্সা র্সা | র্সা র্সা || মা পা | ধা র্সা | র্রা র্রা | র্সা র্সা | না র্সা
প ০ | ব ন || ক ঠি | ন স | ঘ ন | দ ল | ০ ত

র্সা র্সা | নর্সা ধপা || মা পা | ধা র্সা | ধা পা | মা মা
দ্রু ০ | ০ ম || অ তি | আঁ খি | য়া রী | র এ

মা মা | মা মা | মা মরা || মা মরা | পা পা | পা পা
০ না | এ কে | ০ লি || পি য়া | ০ ০ | বি না

মা মা | মা মা | মা মা | মা মা || মা মা | রা রা
ড ০ | র ০ | লা ০ | গি ০ || মু ০ | ০ ০

রা সা ||||
০ ঝে ||||

কথার ভাবে—

নর্ত্তকীর মত বিজলীর চমক ও গর্জ্জন, ধারাবাহী বাদল ও শিলা-বর্ষণ, পূবের হাওয়ার কঠিনভাবে গাছপালা দলন, প্রকৃতির ঘনঘটায় ও অতি অন্ধকারে পিয়া ছাড়া একা নারীর কাতর উক্তি ও ভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

সুরের ভাবে—

সেইরূপ নর্ত্তকীর মত সুরের এক সুর হইতে অন্য সুরে নৃত্য, ধারাবাহী সুরের রেশ পা ধা র্সা ধা পা ইত্যাদি আকাশে সুরের দলন; সর্ব্বশেষে ব্যাকুলতার সুর রহিয়াছে। ব্যাকুলতার ও ভয়ের সুর মিলিয়া ইহা অতি করুণ রাগিণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই গানে ভয়টুকু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

মা পা	ধা র্সা	ধা পা	মা মা	মা মা	মা মা	মা মা
অ তি	আঁ ধি	য়া রী	র এ	০ না	এ কে	০ লি
মা [illegible]	পা পা	পা পা	মা মা	মা মা	মা মা-	মা মা
লি[illegible]	০ ০	না	ড ০	র ০	লা ০	গে ০

[illegible]এখানে মা সুর অতি প্রবল। মা সুর ভয় সূচক। মা সুর ধ্বনিত হইয়া 'ডর লাগে' (ভয় করে) গীত হইতেছে। কথার ও সুরের কি অপূর্ব্ব মিলন! এই 'ডর লাগে' কথাটি অন্য যে কোনরূপে গীত হউক না কেন এমন মধুর হইবে না।

স্বর-বিন্যাসের প্রতি চরণে বা আওয়াদ্দায় মা ধা ও রে সুর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়াতে ভয় ও করুণভাব প্রকাশ করিতেছে। কথাতেও বর্ষা, ভয় এবং করুণভাব। সুরেও তাহাই। ইহা মল্লার রাগিণীর গান। এখন দেখুন গানে কথার ভাব আসে কিনা। এই গানটি আর যে কোন রাগিণীতেই গীত হউক না কেন, এমন ভাব কথা ও সুরের মিল হইবে না।

৮

পাশ্চাত্য কম্পনের অনুপাতে মিল অনুযায়ী সুরের ঐক্য ধ্বনি করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু আমাদের আনন্দ আসে কথার ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের মিলনে। সুরের মিল বাদী-সংবাদী ইত্যাদি গীতের ভাব প্রকাশের সহায়তা করে মাত্র। সুরের মিল বা বাদী-সংবাদী, কম্পন, অনুপাত ইত্যাদি আমাদের সঙ্গীত শিক্ষায় বর্ণপরিচয়ের ন্যায়। এই সব প্রথমেই শিক্ষা করিতে হয়। প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের ঐক্য করিবার ও সহস্রারস্থিত পরম শিবে মনের সুরের মিলন করিবার মত মনের অবস্থা পরে আসে। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত কিন্তু বর্ণ পরিচয় লইয়াই ব্যস্ত। এই জন্যই তাহাদের গান আমাদের গীতের মত ভাবময় নয়। খ্যাত-নামা গ্রন্থকার এড্ওয়ার্ড মুর সাহেব 'হিন্দু প্যানথিয়ন' নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একস্থলে হিন্দু ও বিলাতী সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে অল্প কথায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কতকটা আত্মহীনতা বোধ, কতকটা লজ্জার সহিত আমি স্বীকার করিতেছি যে, ললিত মধুর সঙ্গৎ সহকারে বীণা কিংবা সারঙ্গ যন্ত্র হইতে একধারাবাহী যে সরল স্বরলহরী সমুত্থিত হয় উহা আমার হৃদয়কে যেরূপ স্পর্শ করে 'ফ্যাশা-নেব্‌ল্' কণ্ঠগীতি সহযোগে ইতালীয় বাদ্যভাণ্ড বিনিঃসৃত বহুবিস্তৃত জটিল স্বরসমূহের ঐক্যতান আমার নিকট সেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুসঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতার মনে লেশমাত্র বিস্ময় উৎপন্ন হয় না সত্য, কিন্তু কি জানি কেন, একপ্রকার আত্মহারা ভাব উপস্থিত হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। ইতালীয় অর্থাৎ 'ফ্যাশানেব্‌ল্'

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক জটিলতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয় সত্য কিন্তু উহার দ্বারা অন্যান্য উচ্চতর প্রীতিকর রসভাবের উদ্রেক হয় না।"

আমাদের সঙ্গীত কি কি ভাবে দেখিলে তাহার রসের সম্পূর্ণ বিচার করা যায় তাহারই ইঙ্গিতে এই প্রবন্ধ লেখা হইল। আমাদের সঙ্গীত সার্ব্বজনীন ভাব ব্যক্ত করে কি না ও তাহাতে কাল অনুযায়ী ভাব আসে কি না তাহার মধ্যে বোধহয় তর্কের স্থান নাই। বসন্তরাগে বসন্তের ভাব, মল্লারে বর্ষার ভাব ও ভৈরবে শরতের ভাব আসে এ সব কথা নেহাৎ অযথা নয়। আমাদের সঙ্গীত ভাব প্রধান। প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের মিলন হইলেই গায়কের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। তবে আমাদের সঙ্গীতও অভাবের সুর। আমাদের সুরেরও শেষ নাই, কথারও শেষ নাই, ভাবেরও শেষ নাই।

শ্রীমণিলাল সেন

জোনাকী

শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোনাকী, তোমার বুক-ভরা ঐ আলো—
না জানি এমন সহজ সাধনে কেমন করিয়া জ্বালো।
আঁধার যে তোরে পারে না ত্রাসিতে, প্রবেশিতে তোর্ প্রাণে,
প্রাণের দুয়ারে জাগে উৎসব আঁধার জয়ের গানে॥
বনের আঁধারে, ঝিল্লীর ডাকে, আঁধার ঘুমায়ে ঢুলে,—
তুমি তারি বুকে খেলো উল্লাসে জয়ের পতাকা তুলে॥
সারা নিশি ধরি আলোক মেলিয়া কোথায় লুকাস্ ভোরে ?
প্রভাত-অরুণ সে আলো চুমিয়া তুলে নিল বুঝি তোরে ?

"উদিতা"

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম্-এ

প্রত্যেক রসসৃষ্টির মূলে দুটি জিনিষ আছে, চিত্র এবং সঙ্গীত। এই দুটি উপাদানের একটিকে বাদ দিয়া কখনো প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে না। চিত্র আনিয়া দেয় বস্তুর চোখে-দেখা রূপ, সঙ্গীত তাহাতে যোগ করিয়া দেয় অপূর্ব্বতা।

শিল্পীর নিকট বস্তুজগতের মত চিন্তার জগতেও এই উপাদানই বর্ত্তমান। চিন্তারও রূপ এবং ধ্বনি দুইই আছে। কারণ শিল্পীর চিন্তা যুক্তির ঘাত প্রতিঘাত হইতেই উৎপন্ন হয় না—তাহা উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে বস্তুজগতেরও অসংখ্য সৌন্দর্য্যানুভূতির ব্যঞ্জনারূপে। কবির চিন্তা রূপবান চিন্তা—তাহা concrete, এই রূপটিকে বাদ দিয়া নিছক চিন্তা যেখানে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেইখানেই কবিতা তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। আবার শুধু কেবল রূপ দিয়া চিন্তাকে প্রকাশ করিলেও তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার সহিত চাই সঙ্গীত। তাই দেখা যায় চিত্রহীন ভাব একদিকে যেমন তত্ত্ব হইয়া উঠে, সঙ্গীতহীন ভাব অপর দিকে তেমনি স্থূল এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'উদিতা' নামক কাব্য গ্রন্থখানি পড়িয়া এই কথাটাই বার বার মনে পড়িয়া গিয়াছে। ইনি তত্ত্বের জগতেই ঘুরুন আর রূপের জগতেই ঘুরুন, ইঁহার মধ্যে শিল্পীর সেই রস-দৃষ্টিটি পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে যাহা তাঁহাকে বার বার করিয়া এই গোপন সত্যটি জানাইয়া দিয়াছে যে এই দুইটি জগতের মূলে একই উপাদান বর্ত্তমান,—চিত্র এবং সঙ্গীত, রেখা এবং রং।

'উদিতার' মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর কবিতা পাই,—তত্ত্বাশ্রয়ী এবং রূপাশ্রয়ী, কিন্তু কবির রসবোধ এই উভয়কেই একটি বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছে।

তাই কবি যেদিন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন—

"নাই কোনো অবসান শেষ নাহি হেরি,
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি নাচে পুরাতনে ঘেরি"

তখন দেখি এই তত্ত্বটি রূপ-জগতের বাহিরের তত্ত্ব নয়,—একেবারে অন্তরের। এ তত্ত্ব খণ্ড খণ্ড চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে উৎপন্ন নয়,—এ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে খণ্ড খণ্ড রূপ-দৃশ্যের ব্যঞ্জনা রূপে। ইহার মূলে যে সকল উপাদান রহিয়াছে তাহা চিন্তা-জগতের অশরীরী মালমসলা নয়, তাহা বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় রূপবস্তু। ইহার মূলে রূপজগতের যে অপূর্ব্ব ক্ষণটুকু বর্ত্তমান, কবি তাহাকে তাঁহার কবিতার মধ্যে কি চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ আছিল দাঁড়ায়ে,
সে আজিকে আপনারে ফেলিল হারায়ে
সবুজের রঙ্গিন আভাতে,
লাল হ'ল কৃষ্ণচূড়া
যেন কার হৃদিরক্তপাতে।"

এমন দিনে প্রকৃতির পানে চাহিয়া মুগ্ধ কবি বলিতেছেন—

"আজ পার্শ্বে চেয়ে দেখি শুধু মনে হয়
এ বিপুল ধরণী যে মহাপ্রাণময়।"

ধরণী যে মহাপ্রাণময়, তাহার মধ্যে যে মৃত্যু নাই, অবসান নাই—সৃষ্টি যে নিত্য নূতন জন্মলীলার চিরনবীনতার মধ্যে বারে বারে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া লীলা করিতেছে, এই তত্ত্বটি কবির গবেষণার ফল নয়। সৃষ্টি নিজেই এই তত্ত্বটি জীবনের পর্য্যায় পর্য্যায় রূপে রসে শব্দে গন্ধে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে,—মুগ্ধ কবি তাহাই উপভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার কবিতা সেই উপভোগেরই বহিঃপ্রকাশ। কবি

এই তত্ত্বটিকে সমাধান করিতে বসেন নাই,—সৃষ্টির মধ্যে যাহার সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছে তাহাকেই উপভোগ করিয়াছেন। এক কথায় এই তত্ত্বটি কবির নিকট সৃষ্টির একটি বিশেষ রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়,—শব্দ গন্ধ স্পর্শের মতই concrete। এই কথাটা অনেক শিল্পী ভুলিয়া যান, তাই তাঁহারা তত্ত্বকে যখন কবিতার জগতে আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন তখন তত্ত্বও হাঁপাইয়া উঠে কবিতারও প্রাণান্ত হয়। কবিতার মধ্যে তত্ত্বও যে একটা রূপবস্তু একথাটি অনেক নামজাদা কবিকেও ভুলিতে দেখা যায়;—কিন্তু 'উদিতার' কবির মধ্যে এমন একটি সত্যকারের রসগ্রাহীর সন্ধান পাওয়া যায়,—যিনি তত্ত্বকে রূপের বাহির হইতে ভাড়া করিয়া আনেন না,—তাকে রূপের ব্যঞ্জনার হিসাবে রূপের ভিতর হইতেই উচ্ছ্রিত করিয়া তুলেন। তাই 'উদিতার' তাত্ত্বিক কবিতাগুলি রূপজগতকে ছাড়াইয়া গেলেও তাহার বৃন্তটি রূপজগতের মাটি হইতেই রস শোষণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

সৃষ্টির এই চিরনবীনতা, সৃষ্টির অন্তরের এই নিত্য জন্ম-লীলা,—সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই জীবন-স্পন্দন কবি যেদিন রূপজগতের অণুতে পরমাণুতে অনুভব করিলেন সেদিন তাঁর কি উচ্ছ্বাস!—কবি তখন বলিতেছেন—

"আজ মনে হয়
যারে শেষ মনে করি সে ত শেষ নয়।
সে ত শুধু জনমের নানা মুগ্ধ ভুল
আপন প্রকাশ লাগি নূতন কৌশল,
চারিদিক হতে এসে নানা সৃষ্টি ধারা
এ জন্ম জলধি তলে হল আত্মহারা।"

চিত্র দিয়া যে কবিতার আরম্ভ হইয়াছিল সঙ্গীতে তাহা সম্পূর্ণ হইল। রূপের মধ্য দিয়া যাহা যাত্রা করিয়াছিল অরূপের মধ্যে আসিয়া তাহা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল। ইহাকেই বলে সার্থক রস-সৃষ্টি। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতা খুব বেশী পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

'উদিতার' অন্তর্গত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার একটি মাত্র নমুনা দিলাম। এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা গ্রন্থখানির মধ্যে আছে। পাঠকগণ নিজেরা সেগুলি পড়িয়া রসগ্রহণ করুন ইহাই আমার ইচ্ছা, বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের সমগ্রতার সুরটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাই না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'উদিতার' মধ্যে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যাহা সম্পূর্ণরূপে রূপাশ্রয়ী। এই সকল কবিতার ভিতর দিয়া কবি রূপজগতকেই উপভোগ করিয়াছেন—কোন তত্ত্বকে নয়। এই কবিতাগুলি আমার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। যেমন ভাষা, তেমনি ছন্দ, তেমনি বলিবার ভঙ্গি। এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া কবির রসপিপাসু অন্তরের কি আন্তরিক একটি দরদ অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বর্ষার আয়োজন' কবিতাটি যখন প্রথম পড়িলাম তখন সত্য সত্যই মনে হইয়াছিল আমার অন্তর্লোকেও কোথায় যেন আসন্ন বর্ষার আয়োজন চলিতেছে, তার সজল স্নিগ্ধ হাওয়া যেন হৃদয়ের কোন্ খোলা বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া চিত্তলোকে একটি নবমায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন চমৎকার নিসর্গ কবিতা আমি খুব কম পড়িয়াছি। কবিতাটির কতকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"বিজলী থেকে থেকে চমকি যায় মন,
বর্ষা নাই, তার রয়েছে আয়োজন।
গভীর কালো মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে
এ জল নাহি জানি কাহার অভিষেকে।
দুয়ার খুলে রেখে বসিনু তারি পাশে,
ও ধারে ছেয়ে গেছে সবুজ ঘন ঘাসে।
একটি পাশে জমী এসেছে নীচু নেমে,
সকাল হতে জল রয়েছে থেমে থেমে।
আকাশ কালো হোলো গভীর ব্যথা লয়ে,
তাহারি ছায়া জলে পড়িল কালো হয়ে।
অশথতলে গরু গোয়ালা গেল বেঁধে,
বাছুর কোথা ওর ফিরিছে কেঁদে কেঁদে,
সবুজ কচুবন জলের বুকে বুকে
দুধারে হেলে-হেলে পড়িছে ঝুঁকে ঝুঁকে।
মলিন রঙ্গে আজ মেলেছে নবমায়া,
আমার বুকে তার ফেলেছে ঘন ছায়া॥"

কি চমৎকার একটি চিত্র! পড়িতে পড়িতে মনে হ

যেন হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির প্রতি কি আন্তরিক একটি অনুরাগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

'সপ্তপর্ণ' কবিতাটির মধ্য দিয়াও প্রকৃতির প্রতি কবির আন্তরিক দরদটুকু কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! কবি সম্ভবতঃ প্রবাসে কোথাও একটি 'সপ্তপর্ণ' বৃক্ষের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন; তারপর একদিন বিদায়ের ক্ষণটি যখন আসন্ন হইয়া আসিল তখন কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন :—

"আজকে যাবার কালে
সেই প্রেমেরি পরশ ছড়াক তোমার ডালে ডালে,
সেই দিনেরি গন্ধখানি ভোরের আলোয় মাখি
আমি আমার বক্ষে নেব আঁকি।
তোরও কিরে পাতার নীচে
কঠিন মর্ম্মতল
আমার স্মৃতির বেদন ভরে
করবে না টল মল?"

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইলাম একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া। 'উদিতার' কবি যখন তাঁর কবিতাকে তত্ত্বাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছেন তখন তাঁর কাব্যের মধ্যে একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক বিরাট একটি সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আবার অপরদিকে তিনি যখন শুধু কেবল রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তখন তিনি তাঁর দৃষ্টিকে কি অদ্ভুদ ভাবে সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন! তখন অতিবড় খুঁটিনাটি ব্যাপারটি পর্য্যন্ত কবির দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। আসল কথা কবির মধ্যে চিত্র এবং সঙ্গীত—দুই সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। অথবা এক কথায় কবি জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন চিত্র এবং সঙ্গীত, রেখা এবং রং ইহারা একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই রূপের প্রত্যেকটি খুটিনাটি তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়; তাই রূপকে যখন তিনি ভোগ করিতে যান তখন রেখাকে যত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলেন তার ব্যঞ্জনা ততই বাড়িয়া যায়,—রূপের ধর্ম্মই যে তাই। কবি যখন রূপের পানে চাহিয়াছেন তখন একেবারে চিত্রকরের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়াছেন;—তাই প্রকৃতির যেখানটিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন সেখানটি সুনির্দ্দিষ্ট একটি ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইস্থানে কবির ভাষা-চিত্রের গুটি কয়েক উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"যেথানে বটগাছে দুইটি জটা নেমে
কে জানে কবে হতে জড়ায়ে আছে থেমে।"

কি চমৎকার একটি ছবি!

আবার একস্থলে পাই—

"ছড়ান সাদা কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ থেকে থেকে প্রকাশে আপনাকে।"

একবারে চমৎকার!

আবার এক স্থলে কবি লিখিতেছেন :—

"একটা বটগাছ একটা ডোবা আছে
তাদের মাঝখানে ধানের ক্ষেত নাচে,"

অথবা—

"শুক্ল পক্ষ স্তব্ধ আকাশ ছেয়েছিল ছেঁড়া মেঘে
ঘন কাশ বন করে শন্ শন্ উত্তর বায়ু লেগে।"

শুক্ল পক্ষের আকাশের বর্ণনা করিতে বসিয়া কবিরা সাধারণতঃ নির্ম্মেঘ গগনকেই পছন্দ করেন। 'উদিতা'র কবি কিন্তু তাহা করিলেন না, তিনি আকাশে গুটিকতক ছেঁড়া মেঘ ছড়াইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। এইখানেই বোঝা যায় কবির মধ্যে একটি চিত্রকর লুকাইয়া আছে, যে চিত্রকরটি তাঁহাকে দিয়া শুধু লেখায় না—ছবি আঁকাইয়া লয়। অর্থ এবং সঙ্গীতের দিক দিয়া পূর্ণিমা রাত্রের সহিত ছিন্নমেঘের সম্পর্ক যতই দূর হউক না কেন, রূপের দিক হইতে, চিত্রের দিক হইতে জ্যোৎস্নার সহিত ছিন্ন মেঘের সম্পর্ক যে কত নিকট তাহা চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। এইখানেই 'উদিতার' কবির বিশেষত্ব। তিনি যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সময় চিরাচরিত সংস্কার মানিয়া চলেন না—নিজের চোখ দিয়া রূপকে উপভোগ করেন, এই সকল টুকরা চিত্রগুলি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ গুণটি বড় কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

সনাতন সমস্যা

স্ত্রী-চরিত্র বুঝিয়া উঠা দুষ্কর, নারী-মনের অন্ত পাওয়া ভার—এই পুরাতন তথ্যে নূতন বেশবিন্যাস করিয়াছেন জনৈক চিকিৎসক। লণ্ডন রঞ্জন-রশ্মি হাঁসপাতালের ডাঃ জর্জ্জ ভিল্‌ভগুর্‌ তাঁহারই এক বন্ধুকে প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া বলেন—হাঁসপাতালটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, এখানে রঞ্জন-রশ্মির সহায়তায় সকলই চাক্ষুস দেখিতে পাইবেন, বাদ শুধুই রমণীর মন !

এক গানে ধনকুবের

মিঃ জোস্‌ পাদিল্লা স্পেনদেশীয় সঙ্গীত-রচয়িতা। 'Valencia' নামক একটি সঙ্গীত-রচনায় ও তাহারই সুর সংযোগে অর্জ্জন করিয়াছেন ২৫ লক্ষ মুদ্রা! গানটির রচনায় মাত্র ১২ মিনিট সময় লাগে। সম্প্রতি ইনি কলিসিয়ম্‌ থিয়েটারে আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী লিডিয়া ঐখানে পৃতির রচিত আরও কয়েকটি গান গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ব্যক্তি কে ?

কাগ্‌ওয়া এই ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহার একখানি গ্রন্থ—'মৃত্যু-পারে' তিন মাসে দুই লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে। দুই বৎসরে তাঁহারা গ্রন্থাবলী অন্ততঃ ৫০ লক্ষ বিক্রয় হইবে, বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। জাপানী সরকার কিন্তু বহুকাল ইহাঁকে আদৌ আমল দেন নাই। মার্কিণের কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদত্ত হয়। তখন স্বদেশীয় গবর্‌মেণ্টের টনক নড়িল—নানা সম্মানে তাঁহাকে ভূষিত করিতে লাগিলেন। স্বদেশে মনীষীর দুর্দ্দশা এমনই হয়। নোবেল-প্রাইজ লাভের পর রবীন্দ্রনাথেরও আদর ভারতে—এমন কি বাংলায় ঐ ভাবে বাড়ে। ইহাতে সেই পুরাণো কথাই মনে জাগে—'A prophet is not honoured in his own country'.

বাস্তু কুমীর

বাস্তু সাপ চলিত কথা। কিন্তু বাস্তু কুমীর—নূতন জিনিস। কুমীরটি যে অতি বৃহৎ তাহা নয়, দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, বয়সে বৃদ্ধ, নাম লুতেম্বি, ভিক্টোরিয়া হ্রদে বাস। নাম ধরিয়া ডাকিলেই ভাসিয়া উঠে, তটের দিকে দ্রুত আসিতে থাকে—প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করিয়া। একটা মাছ কেহ দেখাইলে মাছ খাইবার লোভে তীরে হাজির হয়। মুখের কাছ হইতে দুই হাত দূরে দাঁড়াইলেও নরনারীকে আক্রমণের কোন চেষ্টাই করে না। অধ্যাপক জুলিয়ন হাক্সলি সস্ত্রীক অতি সন্নিকটে খাড়া হইয়া নির্ব্বিঘ্নে উহার আলোক-চিত্র উঠান।

ঐ অঞ্চলে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাকে হ্রদের তটে লইয়া যাওয়া হয়, লুতেম্বিকে ডাকিয়া তাহার মুখ-বিবরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, অভিযুক্তকে যদি সে কামড়ায় সাব্যস্ত হয় যে লোকটা দোষী, নহিলে নির্দ্দোষ বিবেচনায় তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। ইহাই ঐ প্রদেশের প্রথা। দুই বৎসর পূর্ব্বে চুরির অপরাধে অপরাধী সন্দেহ করিয়া একজনকে ঐভাবে খাড়া করা হইলে লুতেম্বি তাহার এক বাহু কাটিয়া লয়।

আইন আদালত, বিচার বিতর্ক, সকলই বরখাস্ত করিয়া বিচারমূলক সেকালের সহজ পন্থা অধিবাসীরা আঁকড়িয়া আছে, আর সেই সঙ্গে কুম্ভীরের মত কদাকার বিকট জন্তুকে 'বাস্তু'রূপে পরিণত করিয়াছে—দুইই সমান অদ্ভুত।

বেশ বিন্যাসে বাহাদুর

বেশবিন্যাস সভ্যতার একটা মাপকাঠি। বেশের পারিপাট্যে পৃথিবীর সকলকে অধুনা টেক্কা মারিয়াছেন নিম্নের কয়েকজন। মেয়ু নামে এক বিশেষজ্ঞ এই তালিকা তৈয়ারী করিয়াছেন, সারা বিশ্বে অবশ্যই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

১। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস—আমাদের যুবরাজ। ২। এম্ রেকলিং—প্যারি সহরের বিনামা প্রস্তুতকারক ধনকুবের। ৩। ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্—বিখ্যাত বায়োস্কোপ অভিনেতা। ৪। ইতালি নেপ্‌লস্ সহরের কাউন্ট ক্যারা কিত্তলনো। ৫। ফ্রাঙ্ক ইলিয়ট্—ইংরাজ অভিনেতা। ৬। উইলিয়াম হয়েট—মার্কিণ নিউইয়র্ক নগরবাসী। ৭। ক্লাইভ ক্রুড। ৮। এডাঅলফ্ রিন্ গেঁজ—ব্রেজিল বাসী। ৯। জন্ ম্যারি মোর। ১০। ডিউক অফ্ কনাট্—রাজভ্রাতা। ১১। হেনরি লেতোলিয়র—প্যারি সহরের অধিবাসী। ১২। জেনি মার্কি—ছোট গল্প লেখক ও নাট্যকার। ১৩। মার্কুইস্ ডি পোর্টেগো। ১৪। কর্পূরথালার মহারাজা।

নর্ত্তকী পাভলোভার স্থলে মেরি উইগম্যান্

পরলোকগতা বিখ্যাত নর্ত্তকী আনা পাভলোভার স্থান অধিকার করিবেন কে? বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বলিতেছেন মেরি উইগ্‌ম্যান। ইনি জাতিতে জার্ম্মাণ মোটেই সুন্দরী নন—চোয়ালের হাড় উঁচু, চোক বসা, মুখ প্রকাণ্ড, মোটা নাসিকা, কেশহীন ভ্রূ—এই তাঁহার আকৃতি। নর্ত্তনকালে অঙ্গের সকল গ্রন্থি যেন খুলিয়া গেল এমনই মনে হয়। নৃত্যকলার ধাঁজ ধরণ, লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী অরসিককেও চমৎকৃত করে, অপ্সরা উর্ব্বশীকে নাকি স্মরণ করাইয়া দেয়।

বেবিলনের ইতিহাস উদ্ধার

বাগদাদের নিকটে খনন কার্য্যের ফলে ভূগর্ভপ্রোথিত এক নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে—দু'হাজার বৎসরের পুরাতন। মরুভূমির বালুকা রাশির নিম্নে বৈজ্ঞানিকেরা একটি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। বিবিধ প্রমাণ বলে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ইহা একটি ক্রীতদাসের। জীবন্ত অবস্থায় কক্ষের তলদেশে গলা পর্য্যন্ত গাঁথিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। জানলা-বিহীন একটি কক্ষে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং ঐ কক্ষেরই এক স্থানে বহুমূল্য নেক্‌লেস্ ব্রেস্‌লেট চিরুণী প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনুমান করা হইতেছে যে, ঐ অলঙ্কারের মালিক কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার আদেশক্রমেই এই পৈশাচিক হত্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং যখন অভাগা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছিল নিষ্ঠুর নারী তাহাকে বিদ্রূপ করিতে থাকে।

সামান্য কারণেই ক্রীতদাসের নৃশংস হত্যা সংঘটিত হইত, বেবিলনের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বর্ত্তমান নরকঙ্কালটির আবিষ্কার নৃশংসতারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

দীর্ঘায়ু কিসে হয়?

অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও চিন্তার পোষণ (Plain living and high thinking) দীর্ঘায়ুর পক্ষে সহায়ক বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। প্রকৃতই কি তাই? জাপান টোকিয়োর স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞেরা ৮০ হইতে ১০০ বৎসরের অধিক বয়স্ক উনিশ হাজার লোকের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন। গবেষণার ফলে নির্ণয় করিয়াছেন যে, (ক) উহাদের অধিকাংশই দীর্ঘজীবীর বংশ হইতে জাত ও মধ্যবিত্ত পরিবার ভুক্ত, (খ) শতকরা পঞ্চাশজনের প্রধান খাদ্য চাউলের অন্ন, প্রধানতঃ নিরামিষ আহার—কতকাংশ আমিষ, (গ) শতকরা পঞ্চাশজন পুরুষ এবং নব্বই জন স্ত্রীলোক জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই বলা চলে, তবে ধান্যজাত সুরা স্বল্প পরিমাণে পানের অভ্যাস কাহারও কাহারও আছে। এই জন্যই নাকি জাপানে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশ অপেক্ষা দীর্ঘজীবীর সংখ্যা অধিক এবং শিশু-মৃত্যু বিরল। জাপানের পরেই বুল্‌গেরিয়ার খ্যাতি। জাপানীদের আহার শাক-সব্‌জি ও মৎস্য। বুল্‌গেরিয়ার অধিবাসীরাও বিশেষ মাংসাশী নহে, বিলাসিতার পক্ষপাতীও নহে। অধিকাংশেই মাদক-দ্রব্য স্পর্শ করে না। এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি মাত্র ধূমপান করে। ইহাদেরও প্রধান খাদ্য তরী তরকারী, দুধ রুটি ও পনীর।

বর্ত্তমানে বুল্‌গেরিয়ায় এক শত বৎসরের অধিক বয়স্ক ৩১৩৯ জনের সন্ধান মিলিয়াছে। বুল্‌গেরিয়া অপেক্ষা গ্রেট-বৃটেনের লোক সংখ্যা অনেক অধিক। এখানে কিন্তু ১৪৫

জনের অধিক লোক পাওয়া যায় না। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের লোক সংখ্যা গ্রেট বৃটেনের এক-পঞ্চমাংশ, অথচ এখানে ১১৬ জন শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোক আছে। বুলগেরিয়ার পরেই এ বিষয়ে স্পেন দেশের গৌরব—এখানে ৩৫৫ জন শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোক পাওয়া গিয়াছে। বুলগেরিয়ার ৩১৩৯ শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ জন এ পর্য্যন্ত চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। বাকি ৩১২৫ জন কখনও কোন ব্যাধিগ্রস্ত হন নাই।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য যে সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, মাংসাদি-আহার পরিহার, মিতাচার, শাকসব্জী ভক্ষণ ও বিলাসিতাবিহীন জীবন-যাপন দীর্ঘায়ুর কারণ। পুরাকালে হিন্দুরা এই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেন, সুতরাং বল বুদ্ধি ভরসা চল্লিশেই যে ফর্সা হইত না তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

দশ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে নর-বানরে সাদৃশ্য

নরের আদি পুরুষ বানর—মনীষী ডারউইনের সিদ্ধান্ত এই। ইহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের মাথার খুলি পাওয়া যায়—জাভায় ও সাসেক্সে, কিন্তু এই দুইটির কোনটিই পূরা নয়—ভগ্নাংশ মাত্র। চীন দেশের পিকিনে মিলিয়াছে শিলীভূত সম্পূর্ণ একটি খুলি। বানরের খুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য চমৎকার অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা মানুষেরই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ ইলিয়ট স্মিথ পিকিনে উহা দেখিয়া আসিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বলিতেছেন—"আমার স্থির বিশ্বাস অদ্যাবধি যে যে খুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে পিকিনের এইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।"

পিকিন নগরের সন্নিকটে চাউ কাউটিয়েন নামক গুহায় খুলি পাওয়া গিয়াছে। দশ লক্ষ বর্ষের প্রাচীন মানবের মাথার খুলি উহা, এইরূপ অনুমান করা হইতেছে। বানরের সহিত সাদৃশ্য ক্রমশঃ কিরূপে কমিয়া গেল এবং কত কত বৎসর ব্যবধানে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া উভয়ের বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এইবার আরও উদ্যোগী হইবেন। ইতিমধ্যেই সাজ-সাজ র[illegible] পড়িয়া গিয়াছে।

বরাহ অবতার

বিগত মে মাসে বগুড়া-সেলিমপুর নিবাসী সেখ ন[illegible] আলি মণ্ডল একটি বহু প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে ছিলেন। খননকালে অতি সুন্দর বরাহ-অবতারের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। দৈর্ঘ্যে ইহা দুই হস্ত পরিমিত, প্রস্থে প্রায় দেড় হাত। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর দেখা গেল যে কাল উহার বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে বাঙ্গালা সরকার উহার আপাততঃ রক্ষার ভার দিয়াছেন।

সূর্য্য-কিরণ হইতে বিদ্যুত

সূর্য্যকিরণ হইতে সিধা বিদ্যুৎ প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ ব্রুনো লঙ্গী বিবিধ পরীক্ষা-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। রৌদ্রজাত বিজলী ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্যে নিয়োগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বায়োস্কোপের ফিল্ম তুলিবার যন্ত্রে ফটো টেলিগ্রাফি ও টেলিভিশন প্রভৃতিতে এই বিদ্যুতের ব্যবহার বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। পরীক্ষা কার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিলে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে ইহাই বুধগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

সারা পৃথিবীতে এক ভাষা

সারা দুনিয়ায় একই ভাষা প্রচলনের বহু চেষ্টা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নূতন ভাষা তৈয়ারের প্রচেষ্টাই প্রধানতঃ হইয়াছে—সম্পূর্ণ ব্যর্থপ্রয়াস না হইলেও য[illegible] আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। কৃত্রিম ভাষা যে কখনও সজীব ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে সে আশা সুদূরপরাহত। পৃথিবীতে যদি একটি ভাষা সত্যই কখন চলিত হয় তাহার সুবিধা অবশ্য প্রচুর। ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে, জাতি[illegible]

[দ্বারা]তে মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদানের দিক দিয়া [জগ]তে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। একখানা বই বা [এক]খানা সাময়িক পত্র সেই ভাষায় মুদ্রিত হইলে বিশ্বের সকল [দে]শে একই সময়ে প্রচারিত ও পঠিত হইবে এই কথা [ভা]বিলেও মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়।

অধ্যাপক জাক্সনের মতে ইংরাজী ভাষার কতকগুলা উপদ্রব দূরীভূত করিলে এবং ভাষাটিকে আরো সহজ করিলে [বি]শ্বের ভাষা রূপে ইহা অনায়াসে গণ্য হইবে। কারণ [দে]খাইতেছেন যে, ইংরাজী ব্যাকরণ অপর সকল ভাষার [ব্যা]করণ অপেক্ষা সহজ—দৃষ্টান্ত যথা—পুরুষ পুংলিঙ্গ, স্ত্রী [স্ত্রী]লিঙ্গ, পদার্থ ক্লীবলিঙ্গ; কিন্তু জার্ম্মাণ ভাষায় 'হুলো বিড়াল' [স্ত্রী]লিঙ্গ, স্ত্রীলোক ক্লীবলিঙ্গ, আবার ফরাসী ভাষায় প্রহরী ([s]entry) বা নবসংগৃহীত সৈনিক (recruit) স্ত্রী লিঙ্গ।

অধ্যাপক সহজীকৃত ইংরাজী ভাষার খসড়া প্রস্তত [ক]রিয়াছেন। কুড়িটি মাত্র পাঠে উহা সমাপ্ত। উহা এতই [স]হজ হইয়াছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা দেড় ঘণ্টা মাত্র সময়ে এক [এক]টি পাঠ সমাপ্ত করিতেছে এবং কুড়িটি মাত্র পাঠ সমাপ্ত [ক]রিবার পরেই অনর্গল ঐ ভাষায় কথা কহিতে ও প্রচলিত [বা]নানের পুস্তকও সহজে পড়িতে শিখে। এই নূতন ইংরাজী [ভা]ষায় দীর্ঘ বা জটিল বাক্য বা পদ নাই, বানান ব্যাকরণ ও [বা]ক্যের গঠন অতি সহজ। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া [গে]ল—

"Heer iz a spesimen sentens in Anglic so that yue mae see for yuerself how simpl the speling iz; any forjner is not puz'led by wurdz spelt in won wae and pronownsed in another."

ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে Anglic। গ্রেট ব্রিটনে, উত্তর আমেরিকার সর্ব্বত্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিলাণ্ড, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে ইংরাজী ভাষা পঠিত ও ব্যবহৃত। পৃথিবীর মোট অধিবাসী ১৮০ কোটি তন্মধ্যে ২০ কোটি লোকের ভাষা ইংরাজী, অর্থাৎ অপর যে কোন একটি ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাবিদ্ দ্বিগুণ।

প্রেমের দায়ে

প্রিন্স লেনার্ট সুইডেনের নৃপতির পৌত্র—রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আইন অনুসারে অভিজাত বংশেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়; প্রিন্স কিন্তু স্বদেশীয় এক ব্যবসাদারের কন্যার পাণিগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প। ধনদৌলত, রাজতক্ত তাঁহার কাছে তুচ্ছ। তাঁহার বয়স ২১, ভাবী পত্নীর ২০। হিতৈষীরা সদুপদেশ দানের চূড়ান্তই করিয়াছেন, সকলই নিষ্ফল। প্রিন্স বলেন—সম্বন্ধ পাকা, তবে ২ বৎসর পরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে; ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীতে যাইয়া কৃষিবিদ্যা শিখিব, ভাবী ভার্য্যাও দেশান্তরে তাহাই করিবেন, কারণ কৃষিকার্য্যে উভয়ে জীবনযাপন করিব এই অভিলাষ।

প্রেমের দায়ে অনেকেই ঠেকে। কিন্তু দায়ে ঠেকিয়া দুই বৎসর অপেক্ষা করে, রাজতক্ত হেলায় হারাইয়া চাষা বনিতে চায়, নূতন নিশ্চয়ই।

বাঙ্গলার লোক সংখ্যা

সম্প্রতি যে লোক-গণনা হইয়া গেল তাহার বিবরণে প্রকাশ যে, সারা বাংলার মোট লোক সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষ। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে গণনা হয় তাহার তুলনায় শতকরা প্রায় ৮ জন বেশী। শিশু-মৃত্যু, ব্যাধিবাহুল্য, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সত্ত্বেও।

বিশ্বামিত্র

রাজপুতানা ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম্-এ, বি-এল্

কাঁকরোলী—নাথদ্বার হইতে দশ মাইল উত্তরে কাঁকরোলী—বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা রওনা হইলাম। নাথদ্বার ছাড়িয়াই বানাশ নদী (পুল নাই) পার হইতে হইল। বানাশ মেবারের সব চেয়ে বড় নদী, আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বে চম্বল নদের সহিত মিশিয়াছে। আমাদের এই ভ্রমণপথে বানাশের সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এই প্রথম সাক্ষাৎ। নদী-গর্ভ গভীর নয়, প্রায় সবটাই বালুকারাশি—এক-দিকে একটু অগভীর জলস্রোত ছোট ছোট উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। তার পরে রাস্তা অতি সুন্দর, প্রায় সমতল, মোটর হু হু শব্দে ছুটিল। কাঁকরোলী পৌছিতে যখন আরও দু'তিন মাইল আছে তখন দূরে তার মোহন্তের প্রাসাদ এবং ঘরবাড়ীগুলি ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বাঁদিকে দুটি পাহাড় —একটির উপর এক প্রাচীন জৈনমন্দির আর একটীর উপর রাণা রাজসিংহের প্রাসাদ, এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র। বারী নামে আর একটি নদী পার হইয়া আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাঁকরোলী পৌছিলাম।

কাঁকরোলীও বৈষ্ণবদের এক তীর্থস্থান। এখানকার বিগ্রহ দ্বারকানাথ বা দ্বারকাধীশকেও নাকি রাজসিংহের আমলে বৃন্দাবন হইতে আনা হয়। এখানেও এক মোহন্ত আছেন—খুব বড় দরের না হইলেও তাঁর সম্পত্তির আয় লক্ষ টাকার উপর। তাঁরও নিজের আপিশ আদা[লত] আছে, সাইনবোর্ড দেওয়া আদালত-গৃহ মন্দিরের পা[শে] চোখে পড়ে।

রাজসমন্দ হ্রদের তীরে পূর্ব্বদিকের প্রকাণ্ড বাঁধের উ[পর] কাঁকরোলী গ্রাম। এখানে দুটি ধর্ম্মশালা আছে, তার এ[কটির] দ্বিতল একেবারে হ্রদের উপরেই, আমরা সেখানে আ[শ্রয়] লইলাম। ধর্ম্মশালাটি একজন গুজরাটির। তাঁর আর
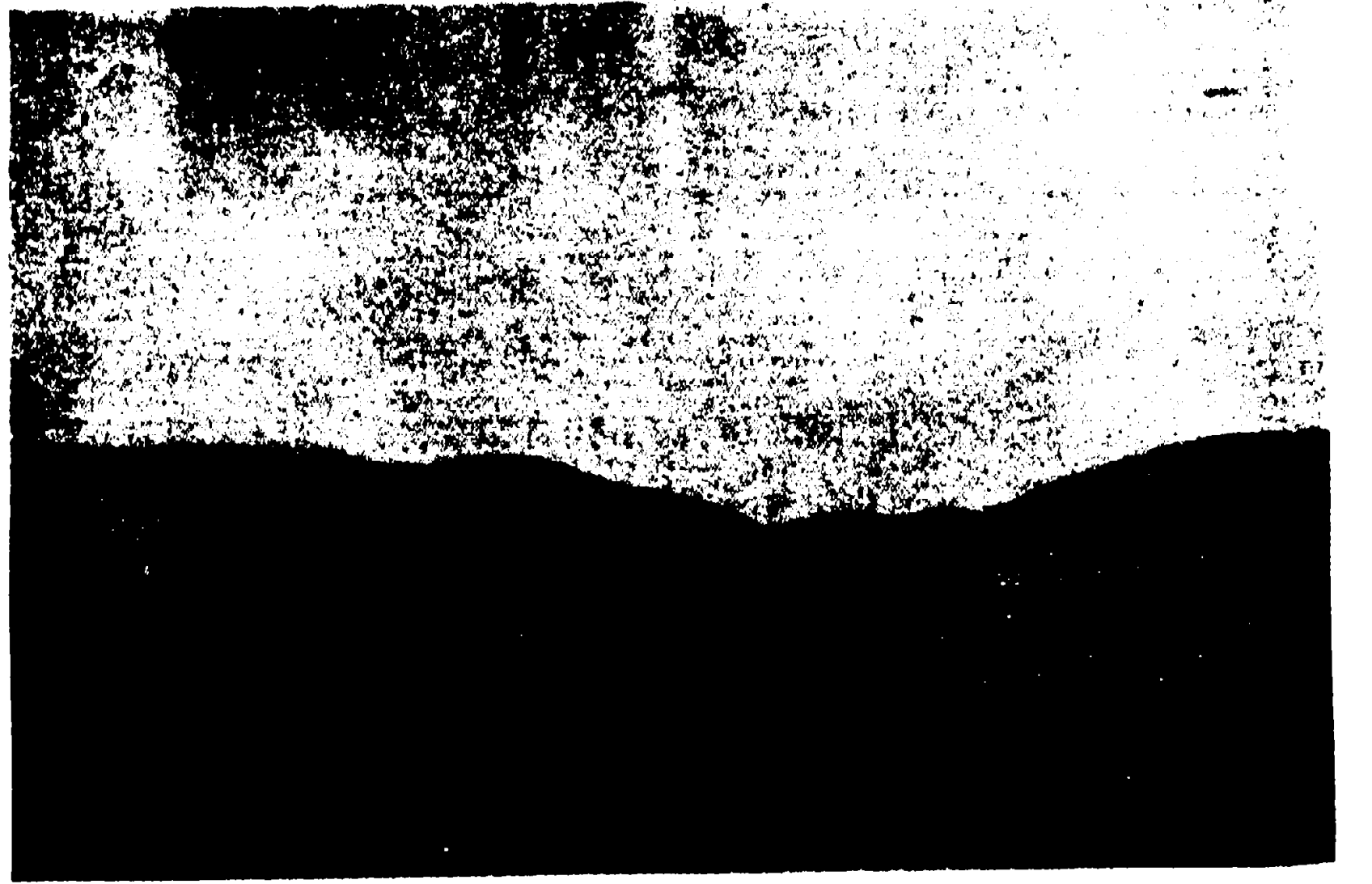
জয়সমুদ্র

[যাই] হৌক সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে। হীরালাল মাণিকলাল নামে এ[ক] পাণ্ডা (নামটি তার অনুরোধেই প্রকাশ করিতে হইল) ধর্ম্ম[-] শালার রক্ষক—তার অবিশ্রান্ত বক্তৃতার জ্বালায় আম[রা] ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেও সে আমাদের আদর যত্নের ত্রু[টি] করে নাই। এখানে বোধ হয় আমাদের মত যাত্রী বড় আ[সে] না—আমরা পৌছিবামাত্রই তাই সমস্ত গ্রামে একটা সা[ড়া] পড়িয়া গিয়াছিল। মাণিকলালের 'ভিজিঠার্স বুকে' দে[খি]

...লে যে দুই বৎসর পূর্ব্বে আর এক দল বাঙ্গালী হাওড়া হইতে এখানে আসিয়াছিলেন—তার পরেই বোধ হয় আমরা। স দল আমাদের পরিচিত—কাঁকরোলীর খবর আমরা তাঁদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালার দ্বিতলে কটি সুন্দর বড় হলঘর আমরা দখল করিলাম, হ্রদের দিকে র বারান্দা, সমস্ত হ্রদটি সেখান হইতে চমৎকার দেখা যায়। দয়সাগরের তীর হইতে আশ্রয়াভাবে পাঁচ মাইল রাস্তা াড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল, জয়সমুদ্রের তীরে বাজরার রুটি র অড়হর কি দালের সন্ধান লইতে হইয়াছিল, আর রাজ-মুদ্রের তীরে হঠাৎ এমন প্রাসাদ আর তদুপযুক্ত খাতির মিলিবে তা একবারও মনে করি নাই।
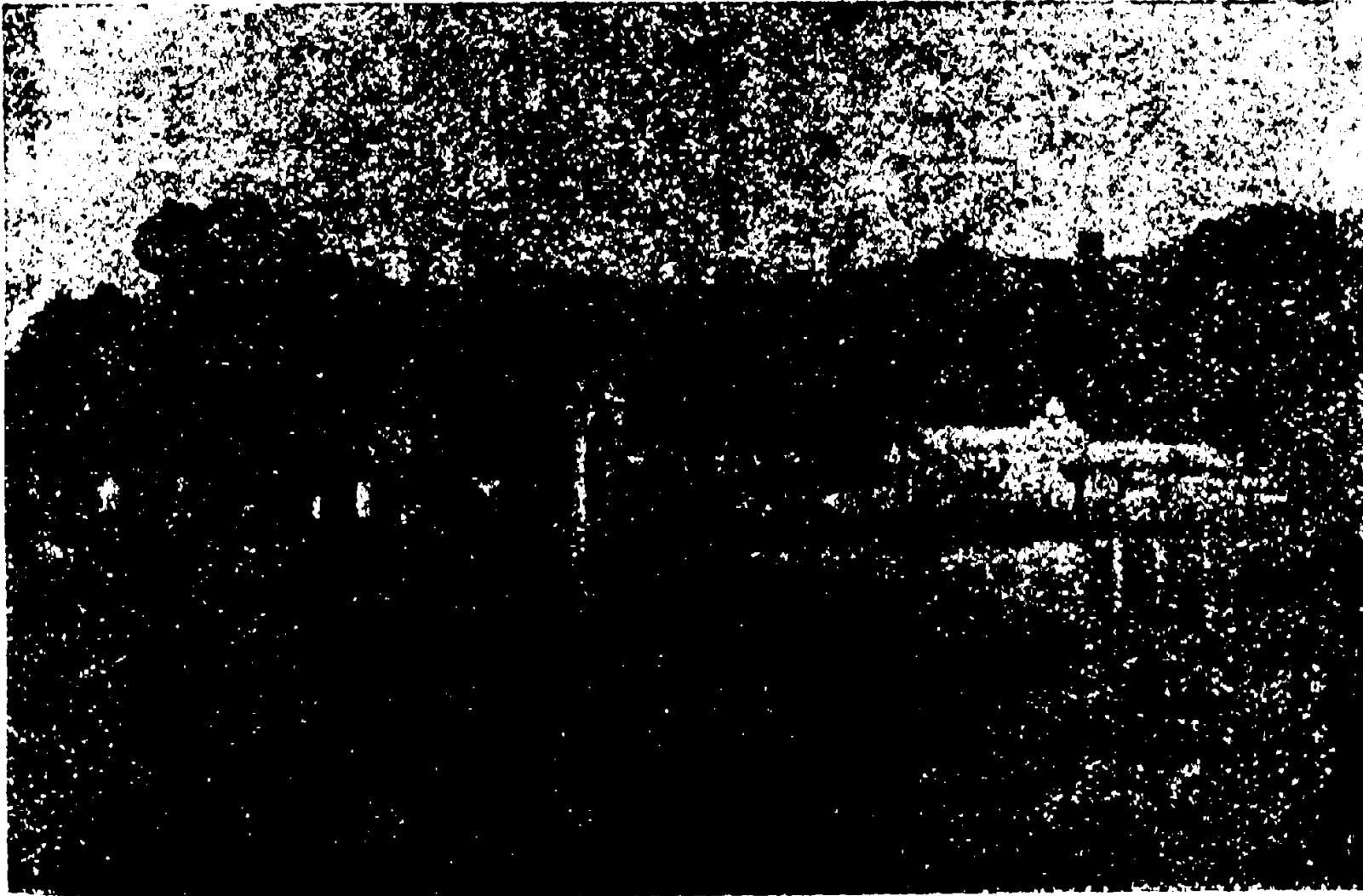
রাজনগর ঘাট

আহারাদির আয়োজনও প্রাসাদের অনুরূপই হইয়াছিল। নিকলালের কৃপায় এ হেন স্থানেও বন্ধুদের চায়ের মৌতা-তের বন্দোবস্তে ত্রুটি হয় নাই। দ্বারকানাথজীরও ভোগ হয়, এবং কাঁকরোলীর অতিথিরা তা হইতে বঞ্চিত হন না। মোহন্তের গদীতে টাকা জমা দিয়া আমরা প্রসাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। আরও দুই তিনটি ছোটখাট দেবতা—ছোট দ্বারকাধীশ, মথুরাধীশ ইত্যাদি এখানে আছেন, আমাদের মত যাত্রীদের তাঁরাও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাত্রে তাঁদের মন্দির হইতে অযাচিত ভাবে বড় বড় প্রসাদের থালা আসিয়াছিল। এর জন্য শেষে অবশ্য আমাদের সব মন্দিরেই কিছু কিছু প্রণামী দিতে হইয়াছিল, তবু অযাচিত সম্মানের একটা মূল্য আছে। তিন মন্দিরের ভোগের উপকরণ একত্র করিয়া আমাদের সে রাত্রের ভোজ মন্দ হয় নাই।

দ্বারকানাথের মন্দিরেও আমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নাই। মন্দির বলিয়া অবশ্য আলাদা কিছু নাই—মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদের মধ্যেই দ্বারকানাথের আস্তানা। আমরা যখন প্রাসাদে গেলাম তখনও মন্দিরদ্বার খোলে নাই, এই অবসরে মোহন্তজীর দেওয়ানের কৃপায় প্রাসাদটি দেখা হইয়া গেল। প্রাসাদটি না কি সপ্ততল, আমরা উপরের তিনটি তল দেখিলাম। একটি তলে ভোগের এবং ফুলের ঘর—প্রথমটিতে স্তূপাকার খাবারের রাশি, দ্বিতীয়টিতে তেমনি স্তূপাকার পুষ্পের স্তবক। প্রাসাদের ছাদ হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়।

দ্বারকানাথজীর আরতিটিও বেশ। দেওয়ালীর আসন্ন উৎসব-উপলক্ষে দেবমূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া এক খোলা ছাদে রাখা হইয়াছিল। ছাদের উপর চন্দ্রাতপের বড় একটি ছোট রূপার সিংহাসনে দেবমূর্ত্তি জমকালো বেশ-ভূষায় সজ্জিত। মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শুনিলাম দেওয়ালীর কয়দিন রোজই সিংহাসন এবং বেশ বদলান হয়—যেমন কোনও দিন বা রূপার, কোনও দিন কাচের, কোনও দিন হাতীর দাঁতের, কোনও দিন বা পাথরের সিংহাসন বাহির করা হয়। দেওয়ালীতে নাথদ্বারে অন্নকূটের খুব ঘটা হয়, তখন আগে নাকি রাজবারার যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমূর্ত্তি আছে সে সমস্তই নাথদ্বারে একত্র করা হইত, এখন মাত্র দ্বারকানাথের নিমন্ত্রণ হয়। সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় মস্ত শোভাযাত্রা

করিয়া তিনি ভ্রাতৃভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, কিন্তু সন্ধ্যায় আবার ফিরিয়া আসেন। মাণিকলালের মতে রাধিকাকে ছাড়িয়া রাত্রিবাস দ্বারকানাথ বড় পছন্দ করেন না। রাধামূর্ত্তি এখানে কোনও মন্দিরেই নাই কারণ তিনি পর্দ্দানশীন—অর্থাৎ তাঁকে বাহিরে আনার প্রথা নাই। দ্বারকানাথের আরতি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল, খোলা আকাশের তলে দেবপূজার পরিকল্পনাটিও অতি সুন্দর মনে হইল।

কাঁকরোলী সম্বন্ধে শেষ কথা—রাজসমুদ্র হ্রদ। উদয়সাগর বা জয়সমুদ্রের চেয়ে আমাদের রাজসমুদ্রই বেশী ভাল লাগিয়াছিল, তার একটা কারণ ঐ দুইটি হ্রদের অনেকটাই পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা থাকে, কোনটিরই বিশাল জলরাশির শেষ দেখা যায় না, কিন্তু রাজসমুদ্রের মাঝখানে কোনও পাহাড় না থাকায় সমস্ত হ্রদবক্ষটিই এক দৃষ্টিতে চোখে পড়ে; বাঁধান তটভূমি হইতে দূরে দিক্‌চক্রবালে যেখানে নীল জলরেখা নীল আকাশের নীচে মিশিয়াছে হ্রদের সেই শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্টি রুদ্ধ হয় না। পাহাড়ের অভাবে জয়সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য ইহাতে নাই, কিন্তু দেখার একটা তৃপ্তি আছে। আর একটা কারণ এমন করিয়া দিনে রাত্রে সকাল সন্ধ্যায় আর কোনও হ্রদ দেখিবার অবসর পাই নাই।

রাজসমুদ্রের পরিধি প্রায় বার মাইল, আর বাঁধটি লম্বায় প্রায় তিন মাইল—, দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে হ্রদ বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। বাঁধের সমস্তটাই মর্ম্মরে বাঁধান, বরাবর সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী জলের নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের বাঁধের উপর রাজসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজনগর প্রাসাদ এবং দুর্গ, আর পূর্ব্ব দিকের বাঁধের উপর কাঁকরোলী গ্রাম। কাঁকরোলী ঘাট মোহন্তের প্রাসাদ, ধর্ম্মশালা এবং আর কয়েকটি বড় ব অট্টালিকায় ঘেরা; ঘাটের নীচের দিকে ছোট ছোট চবুতরা আছে। জয়সমুদ্র বা উদয়সাগরের তীরে লোকালয়ে অভাব, এখানে তা পূরণ হইয়াছে কিন্তু তাতে হ্রদের নির্জ্জন বা সৌন্দর্য্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রাণা রাজসিংহ যখন সবে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছে তখন মেবারে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষে সময় প্রজাদের কাজ যোগাইবার জন্য (অর্থাৎ relief wor হিসাবে) রাণা এই হ্রদসৃষ্টি আরম্ভ করেন। এখা গোমতী নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছিল, তার স্রোত এ
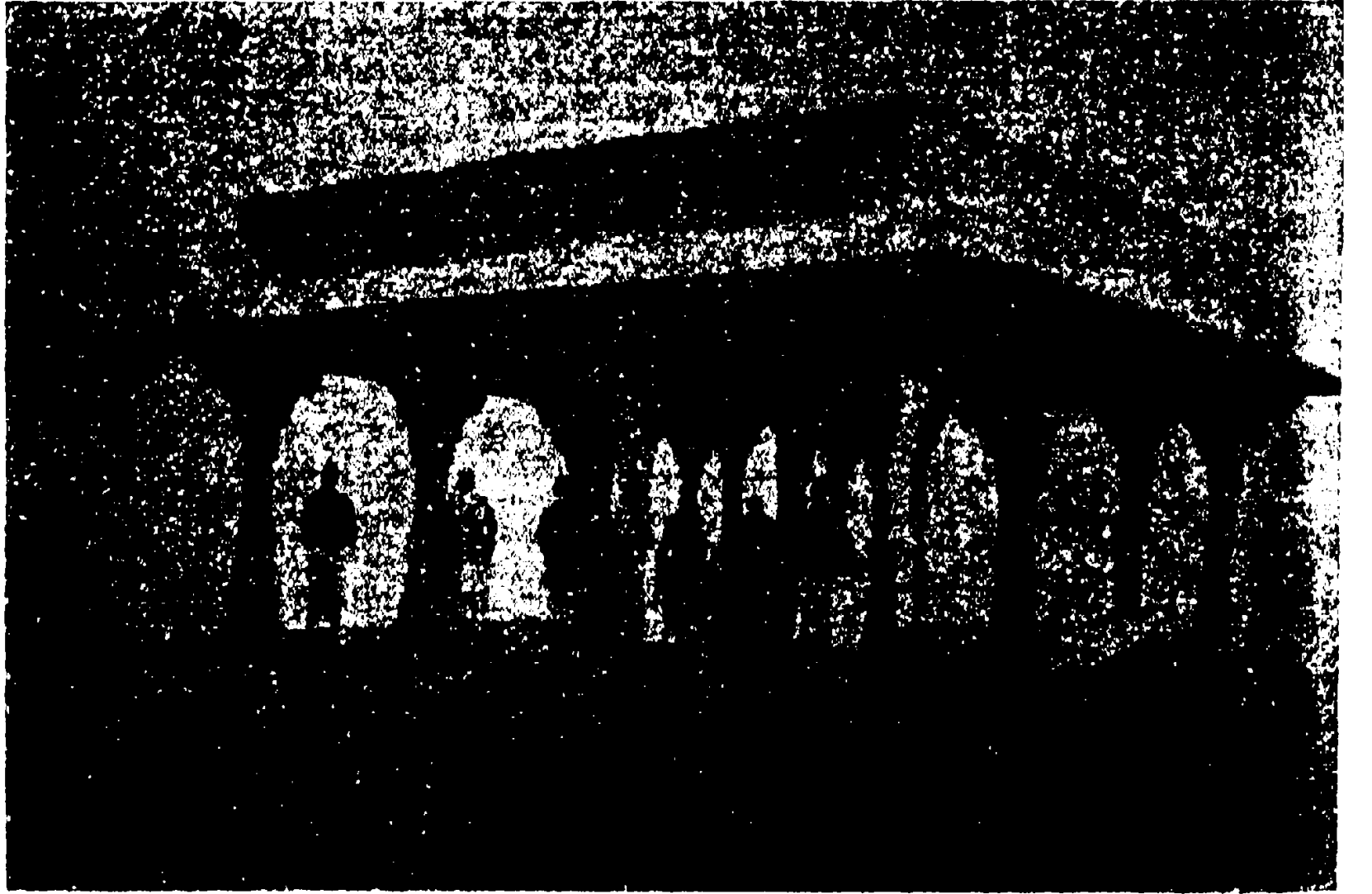
রাজনগর ঘাট—চবুতরা

বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করা হয়। সাত বৎসর বাঁধিয়া এক কোটি টাকা ব্যয়ে হ্রদের কাজ শেষ হয়। রাজসমুদ্রের সৃষ্টির মধ্যে প্রজার কল্যাণও নিহিত আছে, তাই রাজসিংহ শুধু শিল্পী মাত্র ন'ন মানব-প্রেমিকও বটেন। এইটুকু রাজসমুদ্রের সঠিক ইতিহাস, কিন্তু জনপ্রবাদ তাতে সন্তুষ্ট নয়। মাণিকলালের কাছে শোনা গেল সাত বৎসরের পরিশ্রমেও রাজসিংহ হ্রদ জলে ভরাইতে পারেন নাই, অবশেষে কোন এক 'ঘিওর মাতার' প্রসাদে হ্রদ ভরিয়া উঠে। রাজনগরে একটি ছোট মন্দিরে 'ঘিওর মাতার' বাস—এখন তাঁরই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত

অবস্থা, মাণিকলালের এই বক্তৃতার পরও আমরা তাঁর অনশন-ক্লেশ দূর করিবার কোনও চেষ্টা করি নাই।

রাজসমুদ্রের গভীরতা খুব বেশী; আর একটা জিনিস দেখিলাম—ঘাটের কাছে এবং দূরে নানারকমের অসংখ্য মাছের নির্ভয় বিচরণ। এখানে মাছ মারা নিষেধ তাই মৎস্যকুলের বংশবৃদ্ধিতে কোনও বাধা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হ্রদে বেড়াইবার জন্য নৌকার অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল কাঁকরোলীতে নৌকা রাখার 'হুকুম নেহি'। হুকুমের অভাবে কাঁকরোলীর লোকের কোনও দুঃখও নাই। তাই মনে হয় যেন সব হ্রদ যাদের দেশে, তারা এর মর্য্যাদা কিছুই বুঝিল না। জয়সমুদ্র বা উদয়সাগরের ধারে বুঝিবার মানুষই নাই, এখানে মানুষ আছে কিন্তু তাদের দৃষ্টি নাই। হ্রদের এমন পাথর-বাঁধান ঘাট, তা ধূলিমলিন, পঙ্কে পূর্ণ। গোমতী-সলিল গঙ্গাযমুনার মত পবিত্র, হ্রদের জলে স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য—এ কথা অনেকবার শুনিলাম, কিন্তু এর অতীত যে রাজসমুদ্রের কোনও মূল্য আছে তা কেউ জানে না।

মন্দিরের আরতি শেষ হইয়া গেলে আমরা ধর্ম্মশালার দিকের বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না। নক্ষত্রপুঞ্জের মৃদু আলোকে হ্রদবক্ষ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, দুই চারিটি নক্ষত্রের আলো হ্রদের জলে প্রতিফলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দূরে হ্রদের জলরেখা দিক্‌চক্রবালে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, শুধু হ্রদের মৃদু কল্লোলটুকু শোনা যায়; রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ততবারই সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। রাজসমুদ্রের তীরে সে এক রাত্রি বাস অনেক দিন স্মরণে থাকিবে।

রাজনগর—পরদিন (২৬শে) প্রত্যাবর্ত্তনের পালা—কাঁকরোলী হইতে নাথদ্বার, তার পর নাথদ্বার রোড ষ্টেশনে ট্রেণ ধরা। সকালে উঠিয়াই আমি আর বিজয়দা গোমতী-স্নানের পুণ্য অর্জ্জন করিয়া লইলাম, তার পর সকলে রাজনগর যাত্রা করা গেল।

রাজনগর হ্রদের তীরেই কিন্তু মোটরে খানিকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। পথে হ্রদের জল ছোট ছোট নালা দিয়া ক্ষেতের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে দেখিলাম। রাজনগরের ধারে ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়—তার একটির উপর এক জৈন-মন্দির, আর একটির উপর রাজসিংহের দুর্গ বা প্রাসাদ, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। রাজসিংহের সময়ে রাজনগর
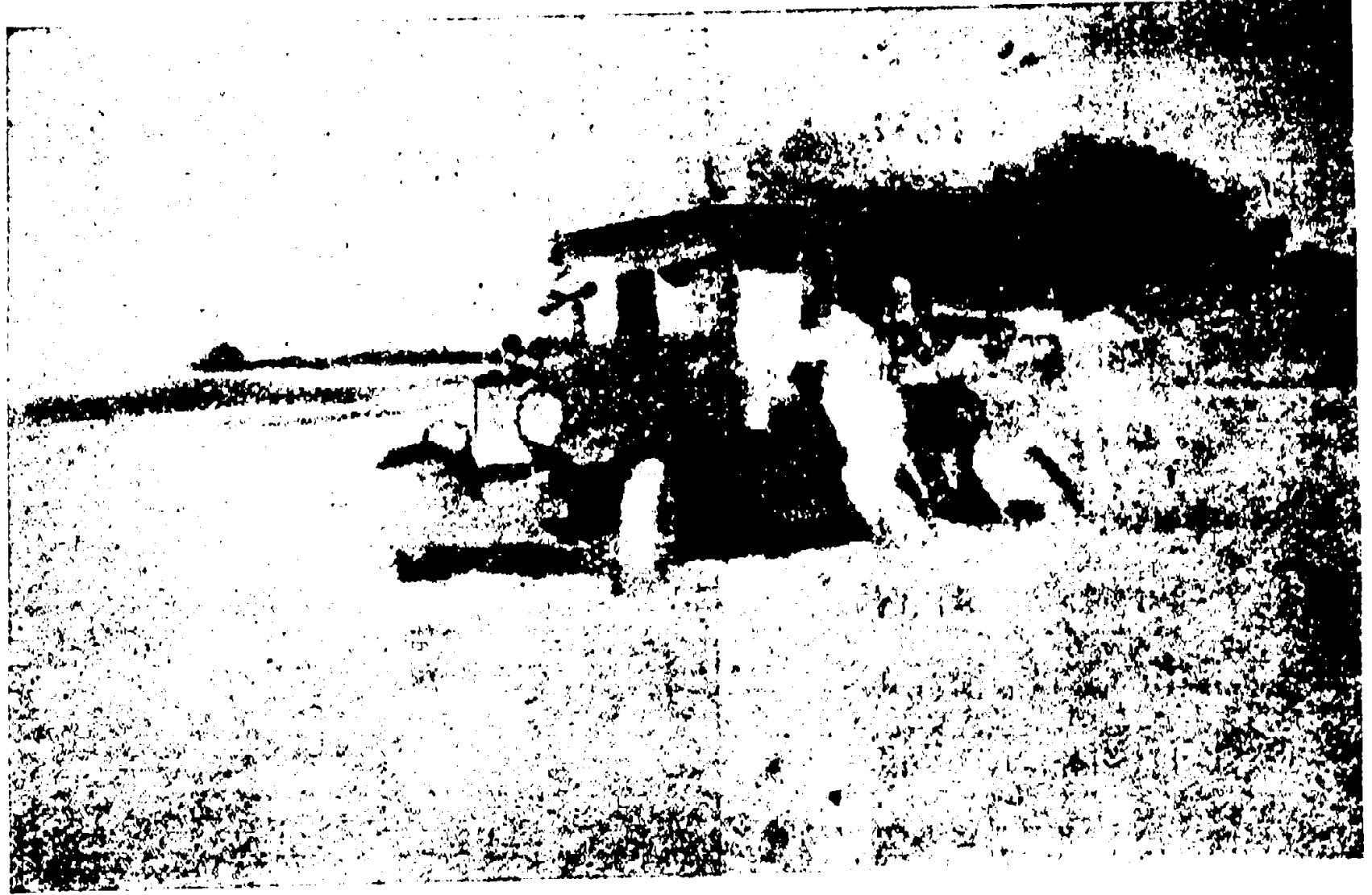
কাঁকরোলী হইতে নাথদ্বারের পথে বানাশ নদী

হয় ত নগরই ছিল—এখন দুই চারিটা কুটির মাত্র তার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষী, আর নূতনের মধ্যে দেখিলাম একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। এখানকার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি 'নচৌকি'—সেটি একটি ঘাট। প্রাচীরে ঘেরা একটা বাগানবাড়ীর মত—বাগানের কোনও চিহ্ন নাই—তার গেট দিয়া ঢুকিতে হইল। ঘাটটি খুব চওড়া, সুন্দর; ঘাটের এক সোপান-বক্ষে কয়েকটি সুদৃশ্য কাজ-করা মর্ম্মর-তোরণ, আর নীচে একেবারে জলের উপরে—তিনটি বড় বড় মর্ম্মর চবুতরা। চবুতরা তিনটি বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস—তাদের স্তম্ভে, ছাদে, খিলানে যা কারুকার্য্য দেখিলাম তা সূক্ষ্ম তক্ষণশিল্পের

অপূর্ব্ব নিদর্শন। চবুতরার ভিতর সমস্তটাই পাথরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি এবং চিত্রে ভরা, পাষাণবক্ষে এমন ফুল ফোটান, ছবি সাজান বড় সামান্য শক্তির কথা নয়। চিতোরের জয়স্তম্ভে যে শক্তির উন্মেষ, এখানে তার পরিণতি। মাণিকলালের মতে, জলের নীচে আরও ছ'টি এরকম 'চৌকি' বা চবুতরা আছে—তাই ইহার নাম 'নচৌকি'। স্থাপত্যশাস্ত্রে মাণিকলালের দখল আছে বোঝা গেল।

রাজনগর দেখিয়া নাথদ্বারের পথে ফেরা গেল। বানাশ নদীতে পৌঁছিয়া আমাদের মোটর বালি এবং পাথরের মধ্যে আটকাইয়া গেল। তখন বেলা দশটা—বন্ধুরা এই অবসরে নদীর শীর্ণ জলধারায় স্নান সারিয়া লইলেন। আমি গোমতী-সলিলস্পৃক্ত সুতরাং দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কিন্তু মনে হইতেছিল গোমতী-তীর্থের অবমাননা করিয়াও এখানে একবার নামিয়া পড়ি।

নাথদ্বারে পৌঁছিয়া আর একবার শ্রীনাথজীর প্রসাদ খাইয়া তিনটার সময় নাথদ্বার রোডের বাসে উঠিলাম, তার পর সন্ধ্যায় ট্রেণ ধরিয়া আবু পাহাড়ের পথে আজমীর রওনা হইলাম।

আবু পাহাড়

পরদিন (২৭শে) আজমীরে যখন গাড়ী হইতে নামিলাম তখন ভোর ছ'টা। এখানে গাড়ী বদল করিয়া বোম্বাই মেল ট্রেণ ধরিতে হইবে—তার তখনও তিন ঘণ্টা বাকী। আজমীর আমাদের সকলেরই পূর্ব্বে দেখা ছিল, একজনের শুধু ছিল না; যাঁর ছিল না তাকে এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সহরটা দেখাইয়া আনিবার জন্য আমরা একদল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম।

আজমীরেও একটি চমৎকার হ্রদ আছে—নাম অনাসাগর, প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, অনাসিং নামে এক রাজপুত রাজার কীর্ত্তি। সহরের প্রান্তে মোগল বাদশাহদের আমলের দৌলতাবাগ উদ্যান, তার নীচেই এই হ্রদ। হ্রদের তীরে উদ্যানের যেটুকু তা শ্বেতপাথরে বাঁধান রেলিং ঘেরা, তার উপর সাজাহানের তৈরী তিন-চারিটি মর্ম্মরের সুন্দর বিশ্রাম-কক্ষ আছে। হ্রদের তিন দিকে পাহাড়; একদিকে তারাগড় পাহাড়, তার উঁচু শৃঙ্গের উপর আজমীরের চীফকমিশনারের বিরাট প্রাসাদ, আর সামনে অপর পারে স্তরবিন্যস্ত গিরিশ্রেণী—তার গায়ে পুষ্করে যাইবার শুভ্র পথটি যেন একটি সরু সুতার মত ঝুলিতেছে দেখা যায়। সেবার অনাসাগর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবার কিন্তু তা চোখেই লাগিল না। মনে পড়িল—সেবার বায়ুহিল্লোলে হ্রদবক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তার উচ্ছলিত জলরাশি যেন এক চঞ্চল কলহাস্যময় শিশুর মত ও পাহাড়ের কোল হইতে এ পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। এবার দেখিলাম হ্রদের জল শান্ত—হ্রদবক্ষ নিস্তরঙ্গ—পাহাড়ের কোলে সে শিশু ঘুমন্ত। তার ঘুম ভাঙ্গিলেই বা কি; অনাসাগর তাই-ই আছে, কিন্তু জয়সমুদ্র রাজসমুদ্রের মোহ যাদের চোখে তাদের কাছে এর বিস্ময় আর কতটুকু।

নাক্কি হ্রদ—মাউণ্ট আবু

তার পর জৈনমন্দির, সেলিম চিস্তীর দরগা, 'আড়াই দিন

কা ঝোপরা' প্রভৃতি দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম। স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইতেই গাড়ী আসিয়া পড়িল—আমরাও চাপিয়া বসিলাম। আজমীরের সীমানা পার হইয়া মাড়বার রাজ্যের মরুপ্রান্তর ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিল; মাড়বার আমাদের প্রথম প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন সকলেরই মন ভ্রমণশ্রান্ত, আবু পাহাড়ে দুই চারিদিন বিশ্রাম করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত, তাই রাজপুতানা-ভ্রমণের অঙ্গহানি করিয়াও এ যাত্রা আমাদের মাড়বার বাদ দিতে হইল।

দিলবারা মন্দিরের মণ্ডপ এবং দালান

আবুরোড ষ্টেশনে যখন পৌছিলাম তখন অপরাহ্ন। এখান হইতে মাউন্ট আবু ১৭ মাইল রাস্তা—মোটর সার্ভিশ আছে। প্রথম তিন মাইল সমতল—তার মধ্যে আমাদের পূর্ব-পরিচিত বানাশ নদী পার হইতে হইল। তার পর বরাবর চড়াই। মাউন্ট আবু প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু, তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখর সাড়ে পাঁচ হাজার। রাজপুতানার পাহাড়ও তার মরুভূমির মত—কেবল শুষ্ক কঠিন স্তূপ। গাছপালা, জঙ্গল আছে বটে—কিন্তু তার মধ্যে হিমালয়ের গিরি-অরণ্যের সে শ্যামলিমা নাই, তেমন বড় বড় বনস্পতির শ্রেণী নাই, পাহাড়ের গায়ে সে ফার্ণ বা মসের শ্যাম শোভা নাই, তার বুকে সাদা সাদা মেঘের সে খেলাও নাই। এক জায়গায় খুব ঘন জঙ্গল দেখা গেল—তার অপর প্রান্তে এক সুবিস্তৃত পর্বত শ্রেণী পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সব আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আর এক মজা দেখা গেল—সন্ধ্যা সাতটার সময়েও গোধূলির আলো রহিল, আবুতে সন্ধ্যাবাতি জ্বালিবার অনেক আগে তার নীচের আলো নিবিয়া গিয়াছিল।

এখানে এক গুজরাটী হোটেলে উঠিতে হইয়াছিল—সেটি মোটর-ষ্টেশনের পাশেই—তার সম্বন্ধে স্মরণীয় তার খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। ঘর বাড়ীগুলি ভাল কিন্তু যত গোল খাওয়া-দাওয়ার বেলায়। হোটেলে মাছ মাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ; আমাদের তাতে আপত্তি ছিল না, যদি অন্য উপায়ে অভাব পূরণ হইত। মাউন্ট আবুর বাজারে আনাজ তরকারীর অভাব নাই কিন্তু হোটেলের 'মেনুতে' যেহেতু এক রকমের বেশী 'শাক্' লেখে না আমাদের পক্ষে তরকারীর প্রাচুর্য্য তাই কোনও কাজের হয় নাই। তিন দিন বকাবকির পর শেষে বন্ধুরা নিজেদের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

রাজপুতনার এজেণ্ট জেনারেল এখানে বাস করেন—সুতরাং আবু রাজধানী। আবার তিনি থাকেন বলিয়া সমস্ত রাজপুত সরকারের এখানে এক একটা 'ভকালত' বা দপ্তরখানা আছে, তার কর্ত্তা এক একজন 'ওয়াকিল' বা ভকিল সাহেব। প্রত্যেক রাজার আবার এক একটা প্রাসাদও আছে—নাই কেবল মেবার রাণার। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে মেবারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণা ফতেসিংহের আবু পাহাড়ে আসিবার সঙ্কল্প কোন কালেই ছিল না, আর একটা বোধ হয় এই যে আবু আগে মেবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন সিরোহী রাজ্যের মধ্যে। এই পাহাড়ে রাণা কুম্ভের অনেক কীর্ত্তি আছে—কোথায় তা জানিতে পারি নাই।

এত রাজন্য-অধ্যুষিত আবু নগরী কিন্তু নিষ্প্রাণ, জনবিরল,

প্রাণহীন। রাজাদের প্রাসাদ ছাড়া বড় বড় বাড়ী কম, এক আছে রাজপুতানা হোটেল আর সেনানিবাস বা অসুস্থ সৈন্যদের জন্য sanatorium। সহরে রাস্তা অনেক, কিন্তু বাড়ীগুলি ছাড়া ছাড়া। বাজারে লোকের ভিড় নাই, রাস্তায় জনকোলাহল নাই, হিলষ্টেশনের শোভা সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধি সবেরই এখানে অভাব।

হ্রদ ছাড়া রাজপুতানার কোনও সহর হয় না, আবুতেও এক হ্রদ আছে তার নাম নাক্কী। তার এক কোণে পাহাড়ের উপর এজেণ্টের প্রাসাদ আর এক কোণে জয়পুর-রাজের প্রাসাদ। এক দিকের পাহাড় খালি, তার মাথায় লম্ফ-প্রদানোদ্যত ভেকের আকারে একটি পাথর খাড়া। হ্রদে একটি ঘাটও আছে—তার উপর দুই তিনটি ছোট মন্দির। নৌকাভাড়া পাওয়া যায়—আমরাও সকালে (২৮শে) ঘণ্টাখানেক বেড়াইলাম। জল অপরিষ্কার—শৈবালে ভরা।

আবুর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি জৈনদের দিলবারা মন্দির, খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানে যাওয়া গেল। দুই মাইল রাস্তা হাঁটিতে হইল—মোটর পাওয়া যায় কিন্তু চার্জ্জ ভয়ানক। পথে বিকানীর এবং আলোয়ার রাজের প্রাসাদ দেখা গেল—দেখিবার মত বাড়ী বটে। রাস্তার বাঁ-পাশে উঁচু পাহাড়ের উপর অধর দেবীর মন্দির—৪৬০০ ফিট উঁচু, আর এমন খাড়া চড়াই যে উঠিবার কথা আমরা মনে স্থানও দিলাম না।

দিলবারা মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করেন সিরোহীরাজ, তার জন্য একজন কর্ম্মচারী এখানে থাকে। শুনিয়াছিলাম এখানে নাকি নোটিশ দেওয়া আছে যে ইউরোপীয় আর সন্ন্যাসী ছাড়া আর সকলকে পাঁচশিকা করিয়া মন্দিরদর্শনী দিতে হয়। নোটিশ আমরা দেখি নাই, কিন্তু দর্শনী দিতে হইয়াছিল। তা' লওয়াও যেন মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ এমনি ভাব। নোটিশে কেবল আছে, মন্দির দর্শনের জন্য আবুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাশের দরখাস্ত করিতে হয়। দর্শকদের বিধি-নিষেধের মধ্যে আছে চামড়ার জুতা পরা থাকিলে খুলিতে হইবে, মন্দির-কর্তৃপক্ষ তার বদলে অন্য পাদুকার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা জুতা অবশ্য খুলিয়াছিলাম কিন্তু অন্য পাদুকা সরবরাহের জন্য কারও আগ্রহ দেখি নাই। জুতার পর আমাদের অঙ্গে আর কোনও চামড়ার জিনিষ আছে কিনা তার খোঁজ সুরু হইল এবং অবশেষে যখন বন্ধুদের বেল্ট ধরিয়া টানাটানি চলিল—আমরা হাফপ্যাণ্ট-পরা ছিলাম—তখন আর ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইল; এর উপর রাজ-কর্ম্মচারীটির মেজাজ এবং ভাষা—হিন্দি ভাষার ভদ্রতা-সূচক পদগুলি যে আবুর পাহাড়ে অপ্রচলিত তা' আগে জানা

একটি গম্বুজের অভ্যন্তর—দিলবারা

ছিল না। নোটিশের দোহাই দিয়া শুনিতে হইল এ সব বিধান কালা আদমীর জন্য নয়। অতঃপর আমাদের ভাষা এবং মেজাজও আর নরম রহিল না, সিরোহীরাজকে নিছক সাড়ে সাত টাকা দান করিয়া শেষে আমরা মন্দির না দেখিয়াই ফিরিলাম।

অতঃপর কি করা উচিত রাত্রে তার জল্পনা চলিল। মন্দিরে এক নোটিশে আছে যে মন্দির-কর্তৃপক্ষ যদি কোনও দুর্ব্যবহার করেন তা যেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানান হয়। একদল বলেন জানানই উচিত, আর একদল বলেন তা নিষ্ফল। প্রথম দলেরই জিত হইল এবং পরদিন সকালে তাঁরা ম্যাজিষ্ট্রেট সন্দর্শনে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন, সিরোহীরাজের 'ওয়াকিল'কে ডাকাইয়া এজন্য বকিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন এবং আমাদের সেদিনের জন্য একখানা পাশও দিয়াছিলেন।

২৯শে অক্টোবর—অপরাহ্ণে আবার মন্দিরে যাওয়া গেল। পথে মন্দিরের সেই কর্ম্মচারীটিকে সামনে দেখিলাম—আমাদের দেখিয়া পাশ কাটাইয়া অন্য পথে গেলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি 'ওয়াকিল' সাহেবের দরবার হইতে ফিরিতেছেন এবং সেখানে তার অভ্যর্থনাটা সুখের হয় নাই। মন্দিরে আজ ভিন্ন ব্যবস্থা—কানাকানি শুনিলাম যে আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 'আদমী' সুতরাং সম্মানার্হ। কর্ম্মচারী মশায় আগেই পৌঁছিয়া সব বলিয়া কহিয়া রাখিয়াছিলেন—আমাদের আর দর্শন দিলেন না। আজ জুতা খুলিতেই সকলে সন্তুষ্ট, একজন আগাইয়া আসিয়া গাইড্ হইলেন। এই আমাদের নেটিভ ষ্টেট!

দিলবারায় মন্দির অনেকগুলি। সমস্ত চত্বরটা প্রাচীরে ঘেরা। বাহির হইতে মন্দিরগুলি কিছুই নয়—নূতন চুণকাম-করা, মন্দির-শিখরের মধ্যে কোনও কারুকার্য্য নাই, অতি সাধারণ রকমের। ভিতরে ঢুকিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। দুইটি মন্দির প্রধান—একটির নির্ম্মাণ-তারিখ ১০৩১ খৃষ্টাব্দ, নির্ম্মাতা রাজা ভীমদেবের বিমল নামে এক অমাত্য, আর একটির ১২৩০ খৃষ্টাব্দ, নির্ম্মাতা তেজপাল—বোধ হয় একজন শ্রেষ্ঠী। এ সব কথা শিলালেখে লেখা আছে—তাতে খরচের যা অঙ্ক দেওয়া আছে তা ভয়ানক—হয়ত অতিরঞ্জিত—৩০ কোটি টাকার উপর। একটি মন্দির তীর্থঙ্কর নেমিনাথের, আর একটি—যেটি বড়—আদিনাথের বা ঋষভনাথের। যেখানে তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—তাকে মন্দিরের গর্ভগৃহ বলা যাইতে পারে—তা স্বল্পালোকিত, কাচের দরজা দেওয়া, মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যায়। গর্ভগৃহের সামনে মণ্ডপ, তার পরে দালান—বড় বড় থামের উপর প্রতিষ্ঠিত—সমস্ত শ্বেত মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত।
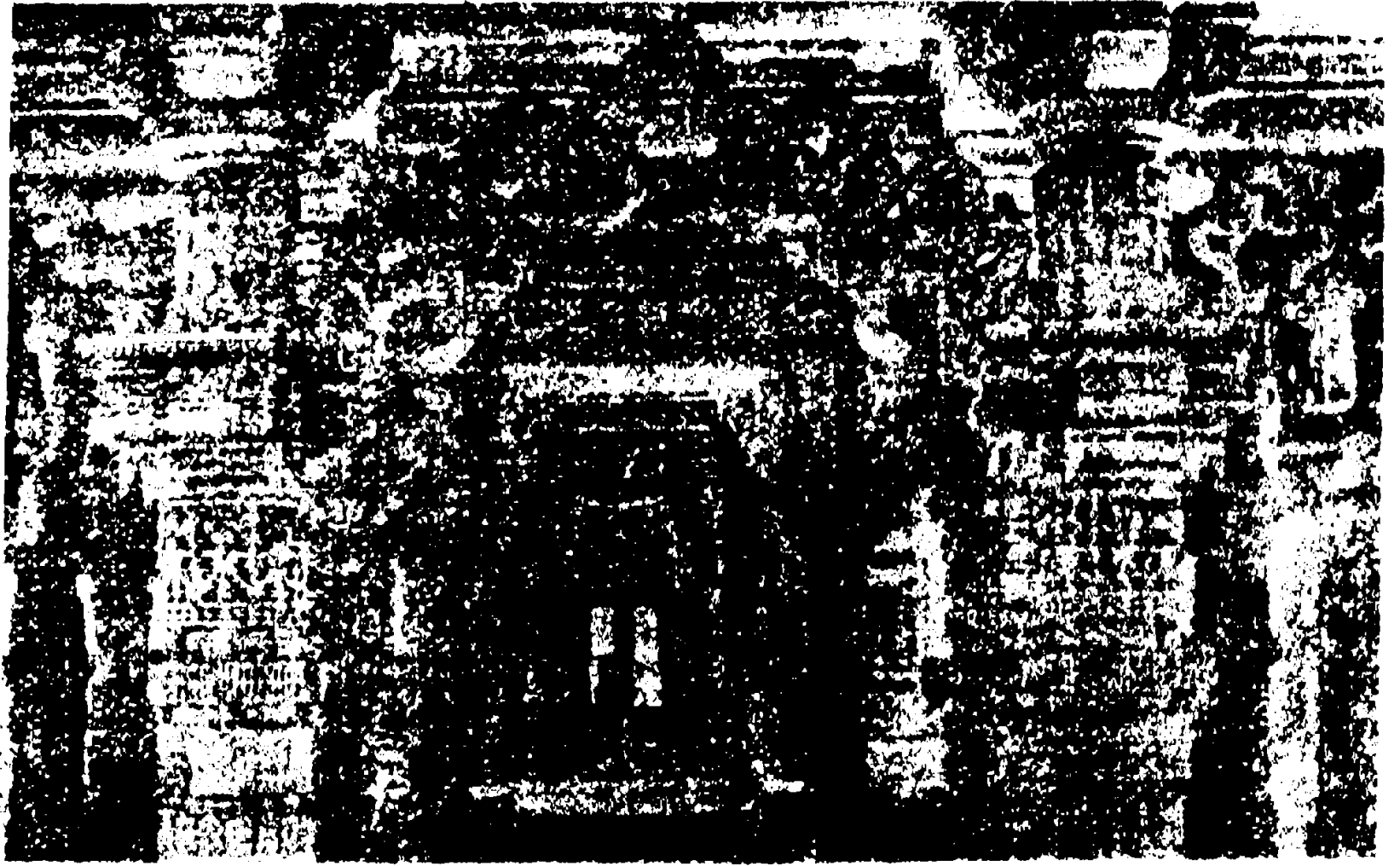
দিলবারা মন্দির গর্ভগৃহের সম্মুখ

মন্দির প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া চারিপাশে প্রাচীরের গায়ে আবার ছোট ছোট কক্ষ। বড় মন্দিরটিতে এই রকম ৫২টি কক্ষ আছে—তার সামনে দুটি সারি করিয়া থামওয়ালা দালান। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি শ্বেত পাথরের জিন মূর্ত্তি বসান—সব মূর্ত্তিগুলিই প্রায় একরকম। একদিকে কক্ষ শেষ হইবার পর কয়েকটি বেশ বড় প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে কতকগুলি

দণ্ডায়মান শ্বেত হস্তীমূর্ত্তি। মন্দিরের এবং এই সব কক্ষের দালানে—তার ছাদে, খিলানে এবং থামের গায়ে—পাথরের উপর খুদিয়া যে কারুকার্য্য ফোটান হইয়াছে তা এক অপূর্ব্ব

দিলওয়ারা মন্দিরের শ্বেতহস্তী মূর্ত্তি

বিস্ময়। দালানের ছাদ গম্বুজের আকারে গঠিত, তার নীচে কত রকমের ফুল, কতরকমের কাজ যে আছে তার তুলনা নাই। কোথাও অসংখ্য পাপড়িযুক্ত পদ্ম ফুটিয়া আছে, কোথায়ও বা অন্য ফুল, কোথায়ও ফুল নয় অন্যরকমের আর কিছু। দুই থাকের মধ্যে ঢেউ-খেলান খিলান—তার কাজ এত সূক্ষ্ম যেন হাতীর দাঁতের বলিয়া মনে হয়। থামের কোণে আবার সূক্ষ্ম আস্তরণের মত পাথরের কাজ—তার সৌন্দর্য্যও অপরূপ। থামের গায়ে এবং ছাদে নানা মূর্ত্তির লীলাও আছে—যেমন নৃত্যপরায়ণা নারীর চিত্র। অন্যান্য আখ্যানের ছবিও আছে, তবে মূর্ত্তির মুখে তেমন ভাবের ব্যঞ্জনা নাই। পাষাণের কঠিন বক্ষ চিরিয়া যে শিল্পী ফুল ফোটাইয়াছেন—ছবি তুলিয়াছেন, যাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রের যাদুস্পর্শে পাষাণ প্রাণ পাইয়াছে তাঁর অসাধারণ শক্তিকে আমরা অভিনন্দন জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তার পর দিন (৩০শে) ভাঙ্গনের পালা। আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, আরও কয়েকজন ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আবুর পাহাড়ে আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দুই দল হইল, দুই জন রহিয়া গেলেন—চারজন ফিরিলাম। দশটার সময় মোটর ধরিয়া বেলা একটায় আবুরোড ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলাম। আমি দিল্লী চলিয়া গেলাম, বন্ধুরা নামিলেন জয়পুরে। পিছনের বন্ধুরাও পরে জয়পুরে নামিয়াছিলেন এবং ভোপালের ঘোষাল মহাশয়ের চিঠির খাতিরে রাজ-অতিথির সম্মান পাইয়াছিলেন। আমার জয়পুর আগেই দেখা ছিল, এ যাত্রা আর হইল না। দিল্লীতে একদিন কাটাইয়া পয়লা নভেম্বর ফেরা গেল—পথে আগ্রায় জয়পুরের বন্ধুরা আসিয়া মিলিত হইলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

শান্তিহারা

৺উমা দেবী

শান্তি যবে ম্লান হেসে, ছল ছল চোখে,
কহিল স্বামীরে তার—"বৃথা মোর শোকে
হয়োনা কাতর তুমি, হে আমার প্রিয়,
তুচ্ছ এ জীবন মম—নহে স্মরণীয়
চির জন্ম কারো কাছে ; নাহি কোনো দুখ্
আমারে ভুলিয়া তুমি পাও যদি সুখ।"
অসহ্য ব্যথায় শমী মুখ চাপি কহে—
"বলিতে দিবনা ইহা ; এ হৃদয় দহে
অন্তহীন যাতনায় ; তুমি যাও যদি,
মৃত্যু শুধু কাম্য করি, রব নিরবধি।"
প্রিয়া হাসে, সোহাগেতে ঢলি প'ড়ে বুকে,
বলে—"ছি, ছি হেন কথা নাহি এনো মুখে।"
অবশেষে একদিন মৃত্যু এল দ্বারে,
সমস্ত উপেক্ষা করি নিয়ে গেল তারে।

"কিছুই চাহিনা আর, দেহ অনুমতি
তোমার করিতে সেবা"—কহিল আরতি
দুয়ারের কাছে এসে। শমী তারে কয়,
"প্রয়োজন নাই কিছু"—অসীম বিস্ময়
দেখে তবু দূর হতে—নীরব সেবায়
সমস্ত বেদনা ওর মুছে নিতে চায়।
বিরক্ত চিন্তিত মনে বোঠানেরে ডেকে
বলে শমী, "বোনটিরে কেন গেছ রেখে
আমার সেবার লাগি? অতিথি হেথায়
সমাদর কর তারে যতনে সেবায়,
আমারে বাঁচাও তুমি"—বউঠান হেসে
বলে—"আমি মরি কেন মাঝখানে এসে?"
কর্ম্ম শেষে সন্ধ্যা বেলা, আপনার মনে
আরতি একেলা বসি ছিল গৃহ কোণে

সহসা প্রবেশি' সেথা শমী তারে বলে
"সুখী হই, এইবার যাও যদি চলে—

আপনার গৃহে ফিরে"—হাসিয়া যুবতী
বলে, "আমি বাঁচিলাম, দিলে অনুমতি।"
সত্যই গেল সে চলি ; শমী চমকিয়া
দেখে কবে অজানিতে ভরেছিল হিয়া,
শান্তি-হারা শূন্যতায় এক বিন্দু সুখ
আপন অজ্ঞাতে আসি জুড়েছিল বুক!
অধীর হইয়া উঠে বলে, "ওগো প্রিয়া
সত্যই কি গেছ চলে সবটুক্ নিয়া?"
মনে পড়ে—শেষ ক্ষণে উঠেছিল ভাসি
শান্তির প্রশান্ত মুখে তৃপ্তিভরা হাসি।

বহুদিন লাগি শেষে চলিল প্রবাসে,
চিত্ত যদি শান্ত হয়—একান্ত এ আশে
ঘুরিল সে দেশে দেশে, কত মত কাজে,
আপনারে সঁপি দিল নূতনের মাঝে।
একদা ফিরিল ঘরে, পুলকিত মন
নূতন জীবনে আজি সাথী প্রয়োজন ;
আরতিরে দিল চিটি—বহু অনুনয়ে
মার্জ্জনা মাগিয়া লয়ে, অতি ভয়ে ভয়ে
জানালো বাসনা তার। দুই দিন পরে
উত্তর আসিল এক সুস্পষ্ট আখরে—
"বৈশাখের শেষে বিয়ে ; আপন ইচ্ছায়
বরণ করেছি তাঁরে। একদা বিদায়
করেছিলে বি'না দোষে যারে অনাদরে
আশীর্ব্বাদ মাগে সেই আজি জোড় করে।"

বিপথে

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুহাসিনী কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল, নারীসৃষ্টি গল্পের কথা, আর ভাবিতেছিল গল্পরচয়িতার কথা।

গল্প কেন এত ভাল লাগিল প্রথমতঃ তাহাই মনে হইল। তাহার প্রাণে রেখাপাত কেন? কারণ আর যাহা হউক, রূপতৃষ্ণা নয়—হেমচন্দ্র যে সুশ্রী, সুপুরুষ। কারণ ভালবাসার অভাবজনিত ক্ষুধা নয়—হেমচন্দ্র স্ত্রীগতপ্রাণ। তবে কারণ কি? জটীল স্ত্রী-হৃদয় যিনি গড়িয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন।
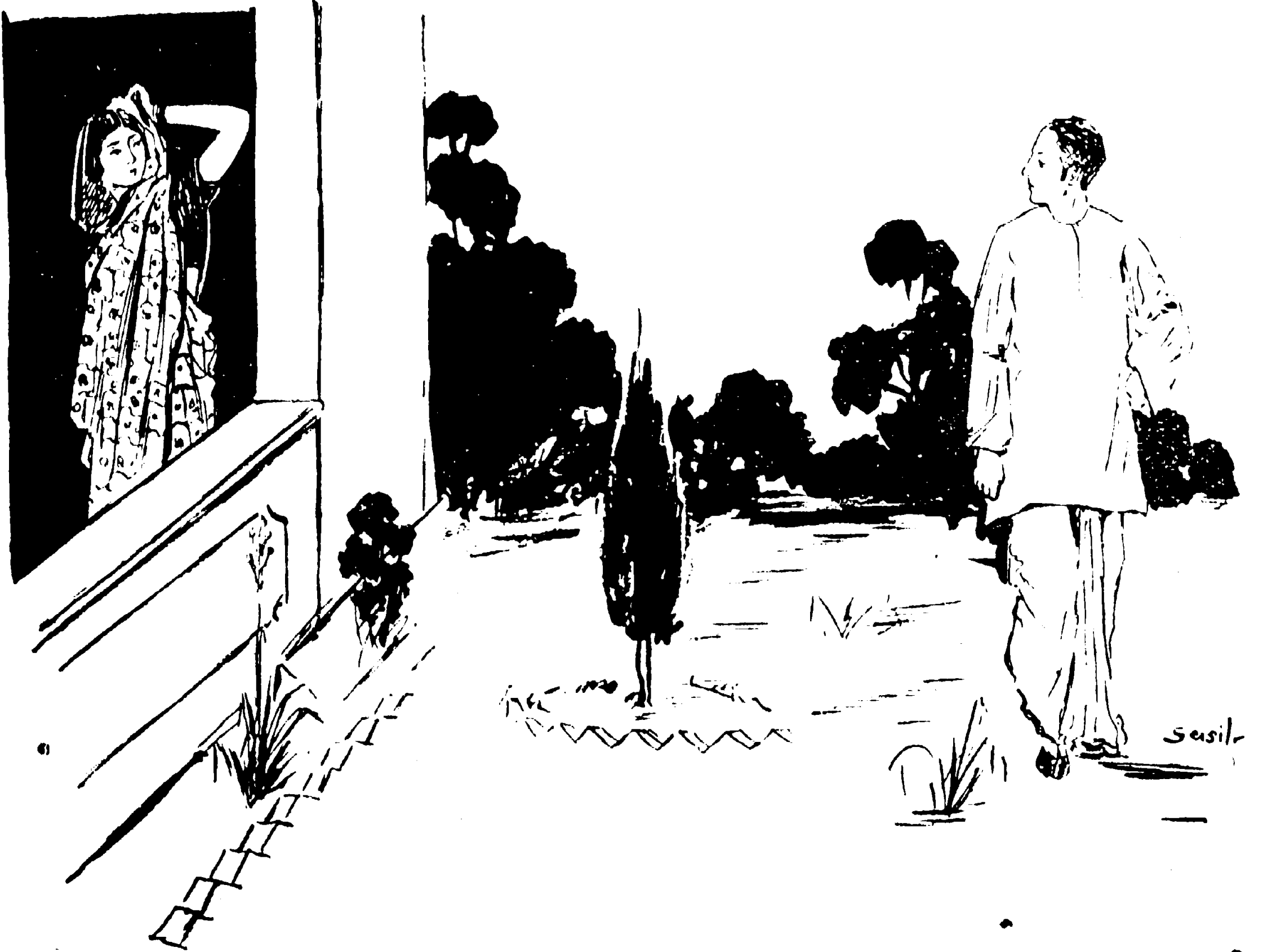
নিদ্রিত শিশুকে শয্যায় শোয়াইয়া সুহাসিনী হাঁফ ছাড়িতে যেমন জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয়নাথও ঠিক্ সেই সময়ে ফুলগাছগুলি বায়ুভরে কেমন সুন্দর দুলিতেছে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল—দুইজনেই চিত্রার্পিত।

নারীচরিত্রে সত্যই কি তবে সামঞ্জস্য নাই, আছে কেবল সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ? হয়ত, কে জানে! নহিলে সুহাসিনী—স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হইতে পারে, একটা কারণ—সৌভাগ্যের আতিশয্য সম্ভোগ-বাহুল্য।

মানুষ ভয় করে দুঃখকে, গালি পাড়ে দুঃখের প্রতি-

খের কষাঘাত যে বড়ই নির্দ্দয়। এই অভিশপ্ত দুঃখই কিন্তু বনের কেন্দ্র; দুঃখ আছে তাই সুখের সম্মান। নিরবচ্ছিন্ন খ—সুখ এবং সম্ভোগ মানুষ সহিতে পারে না, বিরক্ত হয়, র্য্য হারায়, কি চায় জানে না, নূতন কিছু খুঁজিয়া মরে।

সুহাসিনীও সৌভাগ্য সম্ভোগের একটা স্রোতে পড়িয়া তন কিছু খুঁজিতেছিল কিনা কে বলিবে? স্পষ্ট করিয়া ঝিতে না পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অজ্ঞাতসারে হয়ত মনই একটা বিরক্তির ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল। চাহিবার হার কিছু নাই, চাহিবামাত্র যাহার অভাব ষোল কলা পূর্ণ র সে বড় গরীব—দুঃখের অভাবে!

সুহাসিনীর এত সুখ—চাহিবার কছু নাই! তবে কি সুহাসিনী রাজ-রাণী? রাজরাণী!—হাঁ, পতির আদরে য আদরিণী, সে রাজরাণী বৈ কি! রাজলক্ষ্মী যাহার সঙ্গিনী, বসনভূষণাদির প্রাচুর্য্য যাহাকে আকাঙ্ক্ষার অবকাশ দেয় না, রাজরাণী নয়ত সে কি!

রাজরাণী হইলেও সুহাসিনী এখন ভিখারিণী, নূতনত্বের কাঙ্গালিনী। প্রিয়নাথের স্ত্রী-বিচ্ছেদ-ঘটিত সকল কথাই সে স্বামীর নিকট শুনিয়াছিল, খেয়ালীর খেয়াল বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। রচনা বর্ণ বৈচিত্র্যে বিষাদের সুন্দর নক্সা আঁকিয়া দিল! সুহাসিনী এই প্রথম অনুভব করিল—দুঃখের আঘাত; পরের বুকের ব্যথা নিজের প্রাণে স্থান দিল। ভাবিল, বিশ্লেষণ সমালোচনে যাহার এমন শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি এত প্রখর, বিধাতা তাহাকেও নির্ম্মম অঙ্কুশাঘাতে সংক্ষুব্ধ করেন কেন? কণ্টকাকীর্ণ হৃদয়ের একটী কণ্টকও উৎপাটন করিবার উপায় কি নাই? আহা! সহানুভূতি সহমর্ম্মিণী হইয়া অবলার সরল প্রাণ ঘেরিয়া ফেলিল। এখন রোষ প্রতিমার উপর পড়িল। ভাবুক, প্রেমিক, এমন স্বামীকেও সে সুখী করিতে পারে নাই! ধিক্ তাহার নারী-জন্মে! তাহার পর পতির প্রতিও রুষ্টা হইল—এমন বন্ধুর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন কৈ? স্ত্রীপুত্র লইয়া আত্মসুখে মগ্ন—অপরের স্থান বুঝি নাই! ছিঃ!

পরের দুঃখে সুহাসিনী প্রাণ ঢালিল। অভাবহীনার প্রাণে অভাব দেখা দিল অপরের জন্য। কাঙালিনী 'সাত রাজার ধন মাণিক রতন' কুড়াইয়া পাইলে যেমন উত্তেজিত হয়, সুহাসিনী তেমনই আবেগ অনুভব করিল।

তখন শিশু ঘুমাইয়াছে। তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া হাঁফ ছাড়িতে যেমন জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয়নাথও ঠিক সেই সময় বায়ুভরে ফুলগাছগুলি কেমন সুন্দর দুলিতেছে
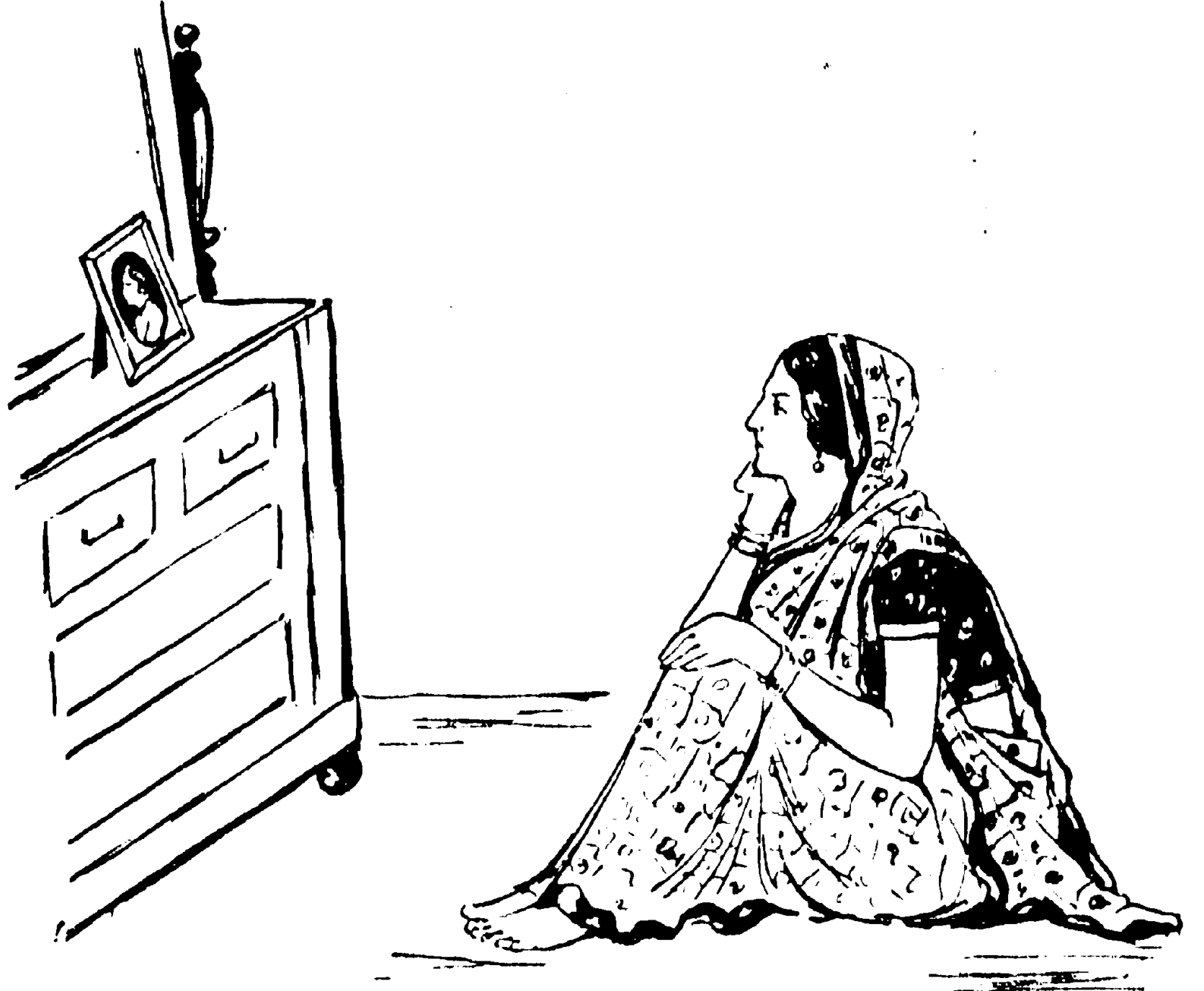
প্রিয়নাথের চিত্রই পূর্ণভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। প্রাণের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া সরমে সঙ্কোচে সুহাসিনী মরমে মরিয়া গেল।

দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল—দুইজনেই চিত্রার্পিত। প্রিয়নাথ সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সুহাসিনী সহানুভূতি-আকৃষ্টা, কৌতুহলাবিষ্টা!

মুহূর্ত্তে চারিচক্ষের মিলন। পরমুহূর্ত্তেই চৈতন্যোদয়—স্ত্রী-সুলভ সরম সঙ্কোচে সুহাসিনী দ্রুত পলায়িতা।

পরবর্ত্তী ঘটনা—প্রিয়নাথের মনোবিকারাদি ডায়েরিতেই সুপ্রকাশ।

নবম পরিচ্ছেদ

ফাঁকি আঁখির ছল—প্রাণের নয়। পলাইয়া চোখের আড়াল হইলেও সুহাসিনী মনের অন্তরালে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারিল না। গৃহকর্ম্মে, শিশুর হাসি খেলায়, সুদূর পল্লীগ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনের ভাবনায় সুহাসিনী মন নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইল। বৃথা চেষ্টা। প্রিয়নাথের চিত্রই পূর্ণভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। প্রাণের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া সরমে সঙ্কোচে সুহাসিনী মরমে মরিয়া গেল।

প্রিয়নাথ কোথাকার কে? তাহার জন্য কাহার দুঃখ, কেন দুঃখ? এ দুঃখে ফলই বা কি? সন্তাপ লাঘবের উপায়ও নাই!

না যাক্! একি বিড়ম্বনা! ঐ ভাবনা, ঐ ছবি—দূর হোক্, বিস্মৃতির অভাব জলে ডুবিয়া যাক্ না কেন?

কিন্তু যায় কৈ? যাহা ভুলিতে চাও তাহাই মানসপটে জলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠে, যাহা চির-জাগরুক রাখিতে চাও তাহারই উদ্দেশ মিলা ভার। একি জটিল রহস্য!

সুহাসিনী যত ভুলিতে চায়, ভাবনা ততই নানা বর্ণে নানা মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনোমন্দিরে 'উকি' মারে।

সুহাসিনী অগত্যা বুঝিল, নিস্তার নাই. অনাহুত যে আসে ছুটিয়া পালাইবার উদ্দেশে সে আসে না। বটবৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাটির ভিতর শিকড়ের পর শিকড় চালাইয়া দাঁড়াইতে চায়।

সুহাসিনী অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল, অবুঝ মনকে বুঝাইতে না, পারিয়া স্রোতের টানে তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

সুহাসিনী নিত্য সন্ধ্যায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রিয়নাথও অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকে। সুহাসিনী কেন আসে, কেন কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না, আবার কেনই বা দ্রুত পালায় তাহাও স্থির করিতে পারে না। প্রিয়নাথেরও অবস্থা ঠিক তাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র
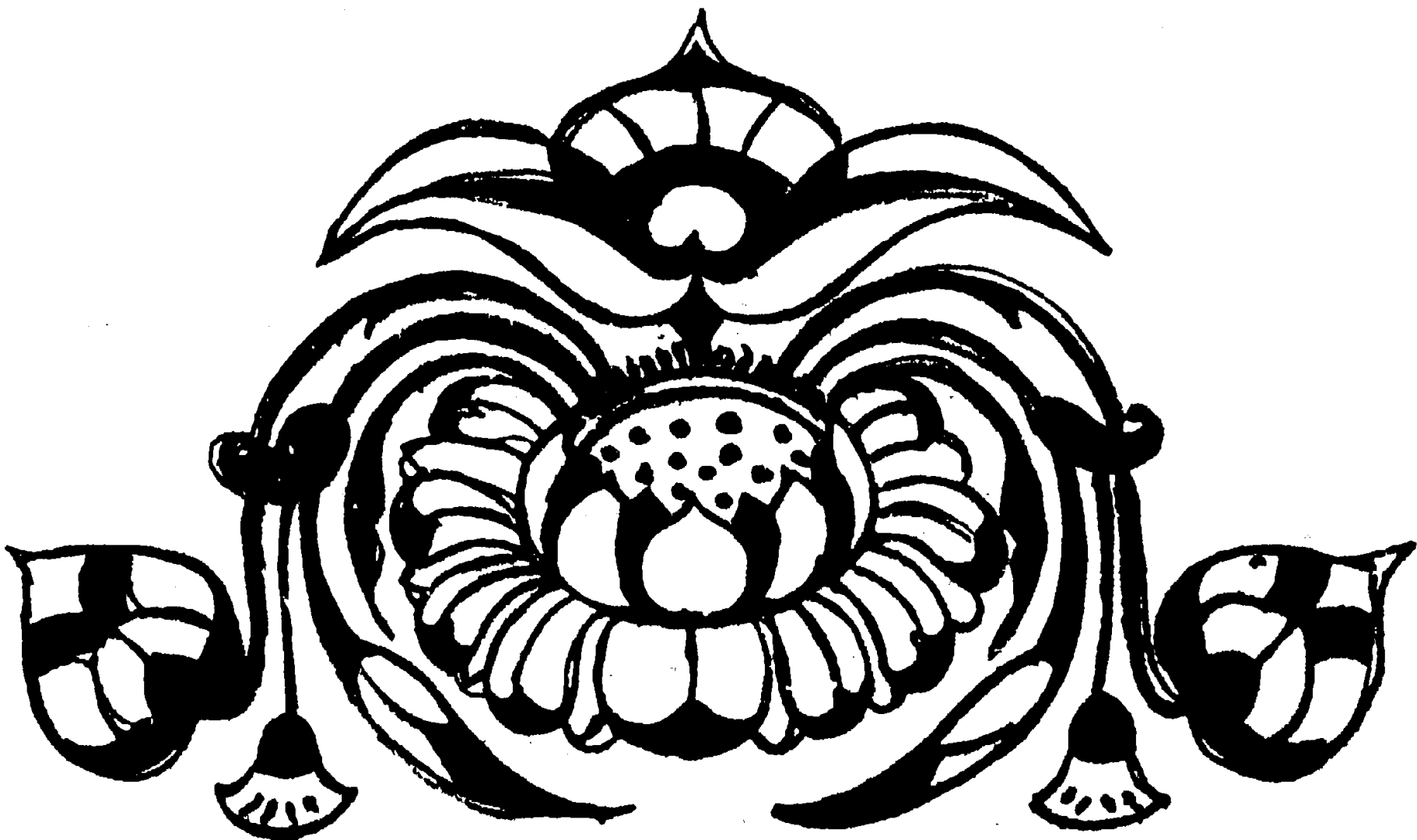
যাদুকর

শ্রীযুক্ত তারাপদ সাহা এম্‌-এ

১

তিন দিন আগে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রা বলে—"ড্যাম ইয়োর মুন্সেফী, এমন জায়গায় মানুষে থাকে! না আছে সিনেমা, না আছে থিয়েটার, দুটো কথা বলব যে এমন একটি লোক নেই। এর চাইতে কল্‌কাতায় এক গরীব কেরাণীর বউ হওয়া ঢের ভালো ছিল।"

রজত চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক বসাইয়া বলিলেন—"বাই দি বাই,—তুমি সেদিন দুঃখু করছিলে না—কিছু দেখতে পাও না বলে? এক সার্কাস পার্টী এসেচে এখানে, যাবে দেখতে? প্রোফেসার বাগ্‌চীর ম্যাজিক নাকি তার মাঝে দেখবার জিনিষ।"

চন্দ্রা কোন কথা না বলিয়া একটু কেক্‌ ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন।

রজত চন্দ্রার ডানায় একটা ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন—"হ্যালো,—তোমার অভিমান এখনও ভাঙ্গেনি দেখচি।"

"কি জানি,—তোমার যদি আবার মান যায়, আমার যাওয়া ঠিক হবে কিনা কি করে বলব?"

রজত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখ, ঠিক ধরেছি, অভিমান এখনও ভাঙ্গেনি তোমার।" তারপর একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না, আমরা যেতে পারি এতে, ডেপুটি বাবুর মেয়েরাও যাচ্ছে কিনা।"

সেদিন সন্ধ্যায় ডেপুটী বাবুর হুইপেট্‌ গাড়ীখানা মুন্সেফ বাবুর ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একখানা স্কারলেট্‌ রেড্‌ বেনারসী পরিয়া চন্দ্রা যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন ডেপুটি-পত্নী তার বাঁ হাতে একটা ঝাঁকুনী দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ—কি চমৎকার মানিয়েচে আপনাকে—ঠিক যেন একটী দীপশিখা!"

লজ্জায় চন্দ্রার মুখখানা আরও একটু লাল হইয়া উঠিল। ওঁরা যখন তাঁবুতে পৌঁছিলেন, তখন খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একটী আঠারো বছরের মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে গেঞ্জির পোষাক আঁটিয়া দড়ির উপর খেলা করিতেছে। কলিকাতায় সার্কাসে চন্দ্রা বহুবার এ সব খেলা দেখিয়াছে, সুতরাং এ খেলা তাহার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, সে ডেপুটী-পত্নী বিভা দেবীর সঙ্গে গল্প করিয়া চলিল।

তাহাদের গল্পের মাঝে দড়ির খেলা কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রা তার খোঁজ রাখে না। সে শুনিল দলপতি আসিয়া বলিতেছেন—'এইবার প্রোফেসার বাগ্‌চী তাঁর অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখাবেন। প্রেফেসার হিপনোটিজম্‌ দেখাবার সময় তাঁর নিজের মিডিয়মই ব্যবহার করবেন,—তবে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে আপনারা কেউ যদি মিডিয়ম্‌ হতে চান তা'হলে সানন্দচিত্তে তাঁকে গ্রহণ করবেন।' অসংখ্য করতালির মধ্যে দলপতি প্রস্থান করিলেন।

সাজঘরের কালো পর্দ্দাটী সরিয়া গেল। যাদুকরকে দেখিয়াই চারিদিকে আবার ঘন করতালি পড়িল। দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবক, মাথায় লম্বা চুল, লাল রঙের সিল্কের আল-খেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। ললাটে সুন্দরীর সিন্দূরটীপের মত একটী রক্তটীকা। সুতীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটীতে অতলস্পর্শ দৃষ্টি। যাদুকর ডান হাতে আয়নার মত স্বচ্ছ একখানা তরবারি লইয়া প্রবেশ করিলেন। তারপর দর্শক মণ্ডলীর চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন। সেই শ্যেনদৃষ্টির সম্মুখে সকলের বুকই একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রা ত চেয়ার হইতে পড়িতে পড়িতে কোনওরূপে সামলাইয়া লইল। যাদুকরের রূপের সঙ্গে চন্দ্রার যেন কোনখানে সাদৃশ্য ছিল। বিভাদেবী চন্দ্রার গা টিপিয়া বলিলেন—"তুমি ও যাদু জানো

না কি ভাই, পোনাকে যে অবিকল মিলে গেছে—ঠিক যেন যাদুকরী।"

চন্দ্রার বুকটা এক অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

যাদুকর দ্রুত-পদক্ষেপে রঙ্গভূমির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পায়ের নীচে একখানা মস্তবড় রুমাল পড়িয়াছিল; যাদুকর তাহাতে পদাঘাত করিতেই—এক সুন্দরী যুবতী বাহির হইয়া আসিল—মাথায় এলোচুল, লাল রঙের একটা জ্যাকেট গায়। যাদুকর তাহার দিকে তাকাইতেই সে একবার প্রদীপের শিখার মত কাঁপিয়া উঠিল।

যাদুকর তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলিয়া—গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজী?"

"হাঁ, রাজী।"

দর্শকেরা বুঝিলেন এ মৃন্ময়ী প্রতিমা নয়—জীবন্ত।

যাদুকর তরবারি ঘুরাইয়া বাঁ দিকে লইলেন, দর্শকেরা কেহ কেহ হয়ত চোক বুজিল,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চোখ মেলিয়াই দেখিল স্ত্রীলোকটীর ছিন্নদেহ মাটীতে ছট্‌ফট করিতেছে, আর যাদুকর তার ছিন্নমুণ্ডটী চুল ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন—এবং তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। এক দারুণ ভয়ে সকলের দম্ আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রার মাথা ঘুরিয়া গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতে লাগিল।

যাদুকর ছিন্নমুণ্ডটা দেহের পাশে রাখিয়া তাড়াতাড়ি বড় রুমালখানা চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। এইবার তিনি চন্দ্রার দিকে ফিরিলেন। চন্দ্রার সারা শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটী বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল। যাদুকরের চোখদুটী যেন অত্যধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দর্শকদের ক্ষণকাল চিন্তার অবসর না দিয়া যাদুকর বাঁ হাতে রুমালটা ধরিয়া টান দিতেই সেই ছিন্নমুণ্ড মেয়েটা সশরীরে বাহির হইয়া আসিল।

ইহার পর পাঁচখানা উন্মুক্ত তরবারির উপর যাদুকরকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁর বুকের উপর একখানা দশমণি পাথর রাখিয়া চা'রজন লোক লোহার হাতুড়ি দিয়া পিটাইয়া ভাঙ্গিল। যাদুকর অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিলেন। চারিদিকে ঘন করতালি পড়িল।

ইহার পর যাদুকরের নির্দ্দেশ মত দলপতি আসিয়া বলিলেন—"প্রোফেসার বাগ্‌চী একসঙ্গে দশজনকে হিপনোটাইজ্‌ড্ করতে চান। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা ইচ্ছা করেন আসতে পারেন।"

দশজন তরুণ যুবক পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়া হাসিয়া সামনের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। প্রফেসার তাহাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—"আমার এ বাঁশীর স্বর শুনলেই আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই জেগে থাকতে পারবেন না।"

যাদুকর একটি কালো নিশমিশে বাঁশী লইয়া ফুঁ দিলেন। কি রাগিণী বাজিল,—বুঝা যায় না, কিন্তু বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী; শুনিলে ভয় হয়। দেখিতে দেখিতে দশটী মিডিয়ামের চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রার মনটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এখনই হয়ত কত বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইবে, হয়ত এই দশটি তরুণের মুণ্ড লইয়া ভাঁটা খেলা সুরু হইবে। তারপর যদি সেই ছিন্নমুণ্ড জোড়া না লাগে? চন্দ্রা আর ভাবিতে পারিল না, উঠিয়া বাহিরে চলিল। বিভাদেবী সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া শুধাইলেন—"কি ভাই, উঠে এলে যে?"

"আর পারছি না—বাড়ী যেতে চাই।"

বলিতে বলিতে রজত রায় আসিয়া দাঁড়াইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেয়ারাটাও।

পাঁচমিনিটের মধ্যে ডেপুটী বাবুর হুইপেট্ গাড়ীখানা মুন্সেফ বাবুর ফটকের সামনে আসিয়া থামিল।

২

চন্দ্রা বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছে। পাশে রজত অকাতরে ঘুমাইতেছে। চন্দ্রা স্বকর্ণে শুনিয়াছে এই কিছুক্ষণ আগে তাহাদের বড় ক্লকটা ঢংঢং করিয়া দুইটা বাজাইয়া দিয়াছে। একরাশ চাঁদের আলো জানালার ফাঁকে আসিয়া তাহাদের শুভ্র বিছানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হয়ত জোছনার আলো চোখে লাগিয়া ঘুম আসিতেছে না—চন্দ্রা জানালা বন্ধ করিয়া আসিল। কিন্তু অন্ধকারে ভয় করে—

পাশের আলনা থেকে তার লাল বেনারসী সাড়ীখানা যেন যাদুকর হইয়া সামনে দাঁড়ায়। চন্দ্রা জানালা খুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

…ঐ সেই বাঁশীর সুর না? অনেক দূরে। চন্দ্রার বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। বাঁশীর সুর যেন ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বংশীওয়ালা হয়ত ক্রমেই কাছে আসিতেছে। সেই যাদুকর নয় ত? ভাবিতেই চন্দ্রার গা ঘামিয়া উঠিল। সলিলদা নয় ত? চন্দ্রার কেমন কান্না পাইতে লাগিল। সলিল দা…! ভয়ে চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। এই যাদুকর যদি সলিলদা হয়! বাঁশীর শব্দ ক্রমেই কাছে আসিতেছে। সামনে গেটের মালতী ঝোপের পাশে কি যেন নড়িয়া উঠিল। চন্দ্রা সভয়ে চক্ষু মুদিল। বংশীরব থামিয়া গিয়াছে। চন্দ্রা ভয়ে চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না—পাছে দেখে জানালার পাশে যাদুকর দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রা তবু ও ভয়ে ভয়ে একবার চোখ মেলিল,…ঐ…ঐ যে পর্দার পাশে ঐ যে দুটি চোখ জল জল করিতেছে। হাজার চেষ্টা করিয়াও চন্দ্রা চোখ ফিরাইতে পারিল না। হাতে শক্তি নাই—স্বামীকে জাগাইয়া দেয়, কণ্ঠে স্বর নাই যে চেঁচায়।

পর্দা সরিয়া গেল। সেই যাদুকর—পরিধানে সেই রক্ত বসন, কপালে সেই রক্তটীকা। চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল।

পর্দার পাশে ঐ প্রভাতের শুকতারার মত উজ্জ্বল চক্ষুদুটী কি এক নিষ্ঠুর আকর্ষণে যেন টানিতেছে। চন্দ্রা কিছু বুঝিল না, ভাবিল না—দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল। হাঁ—এই ত সেই যাদুকর; বাঁ হাতে সেই কালো বাঁশীটা, কটীতে খাপ সমেত একখানা ভোজালী ঝুলানো। যাদুকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রার মনে হইল—যাদুকর যেন বলিতেছে 'ঐ রক্তবর্ণ সাড়ীখানা পরে এস'। চন্দ্রা লাল রঙের সাড়ীখানা পরিয়া বাহিরে আসিল। যাদুকর তাহার দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। চন্দ্রা তাহার পিছু পিছু চলিল।

ছোট আদালতের ধার দিয়া নদীর ধার, তারপর বাঁশের সাঁকোটা পার হইয়া ডিষ্টিক্ট-বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া যাদুকর চলিয়াছে, পশ্চাতে চন্দ্রা। দু'দিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—মাঝে মাঝে দু'একটী বিরাটকায় বটগাছ কালো দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রা অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—'আর কতদূরে আমায় নিয়ে যাবে'—কিন্তু মুখে কথা সরিল না।

যাদুকর তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল—'ঐ যে ডাইনে ভবানী মায়ের মন্দির—ঐখানে'। চন্দ্রার কত শোনা গল্প মনে পড়িল—তবে কি যাদুকর আমায় বলি দিতে চায়? এ কি তান্ত্রিক? ভয়ে তার সারা গা পাথর হইয়া গেল। কিন্তু বাধা দিবার শক্তি নাই—চন্দ্রা যাদুকরের পিছু পিছু চলিল।

লোকের বিশ্বাস ৺ভবানী মা জাগ্রত দেবতা। চন্দ্রা স্বামীর সঙ্গে একবার এখানে আসিয়াছিল। মন্দিরের সেবাইতেরা অচেতন ঘুমাইতেছে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া সামনে আসিতেছিল, যাদুকর তাহার দিকে তাকাইতেই সে চুপ করিল। মন্দিরের সামনেই একটা পুষ্করিণী; বাঁধা ঘাট—তারই দুপাশে দুটা বকুল গাছ পত্রবহুল দুটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছ দুটার নীচে দু'খানি বেঞ্চ পাতা, তারই একখানিতে যাদুকর গিয়া বসিল এবং চন্দ্রাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

যাদুকর চন্দ্রার দিকে তাকাইয়া তার গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী পর্য্যন্ত কয়েকবার অঙ্গুলি চালনা করিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"চন্দ্রা"।

চন্দ্রা ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। এ যাদুকর যে—সলিল দা! যাদুকর লালরঙের আঙরাখাটী খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"গ্যাখো,—এবার চিন্‌তে পেরেচ?"

চন্দ্রার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। দুই হাতে চোখ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিতে লাগিল—"তুমি আবার কেন এলে সলিলদা, এই তিন বছর ধরে……আমি আর বাঁচব না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চলে যাও, আমায় বাঁচাও—আমি আর সামলাতে পারছি না।"

যাদুকর ধীরে চন্দ্রার মাথাটী নিজের কোলে তুলিয়া লইল। ভাবের আবেশে চন্দ্রা তখনও ফোঁপাইতেছিল। যাদুকর তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ডাকিল—"চন্দ্রা, আমার চন্দ্রা—আমার…!"

চন্দ্রা দুই হাতে যাদুকরের মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলিল—"বলো না, আর বলো না—চুপ"।

যাদুকর জোরে চন্দ্রার হাত সরাইয়া বলিল—"কেন বলব না? আজ তিন বছর ধরে মনের কথা বলতে না পেরে আমার দম্ আট্‌কে এসেছে, পাগলের মত এই তিন বছর দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, সে কার জন্যে? তোমাকে ফিরে পাবার বিদ্যা লাভ করতে আমি কামরূপ গিয়েচি, হিমালয়ে গিয়েছি, আসন প্রাণায়াম মুদ্রা করে আমার হাড়গোড় জরজর হয়ে গেছে, ম্যাজিক শিখতে আমি সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় গিয়েচি। সাগর পারের শত শত সুন্দরী আমাকে তোমায় ভোলাতে পারে নি। দেশে ফিরে তোমার খোঁজে তোমাদের বাড়ীতে গেলাম, কেউ তোমার ঠিকানা দিলে না—তাই ত সার্কাসে ঢুকে দেশে বিদেশে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি। আর তোমায় ছাড়ব না চন্দ্রা—বলো তুমি আমার হবে। বিয়ের আগে তুমি আমায় যে কথা দিয়েছিলে —বলো তাই সত্যি, সমাজ সংসার সব মিছে, বলো—বলো।"

চন্দ্রা কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মের পাপড়ির মত করতলে যাদুকরের মুখ আটকাইয়া বলিল,—"আর বলো না সলিল দা, আমায় বাঁচাও,—তুমি এখান থেকে চলে যাও—আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসি—।"

"ওরে হতভাগী, তবে কি হবে আর মিথ্যার অভিনয় করে—চলে আয়! তাঁবুর ধারে আমার আরাব ঘোড়া সাজানো আছে, তুই আমায় আঁকড়ে ধরে থাকবি। এই ত চার মাইল গেলেই ষ্টেশন, রাত থাকতেই আমরা পৌছে যাব।"

চন্দ্রার বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। স্বামী? তিনি যখন সকালে উঠিয়া দেখিবেন চন্দ্রা পাশে নাই, আর শুনিবেন সার্কাসের দলে যাদুকর নাই—তখন? হয়ত বা ষ্টেসন-ফেরতা কোন যাত্রী আসিয়া বলিবে যাদুকর চন্দ্রাকে লইয়া ট্রেনে উঠিল। ছ্যা-ছ্যা, ছ্যা,—না, সে ইহা পারিবে না। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া একটু তেজের সঙ্গে কহিল, "আমি পারবো না সলিল দা। আমি তোমায় ভালবাসি বলে তুমি আমায় এমনি করে অপমান করতে পারো না,—আমি যাবো না। রাত ভোর হয়ে এল, আমায় বাসায় রেখে এস।"

মুহূর্ত্তে যাদুকরের মুখ কঠোর হইয়া উঠিল; লাল সিল্কের আঙরাখাটী গায়ে পরিয়া যাদুকর একদৃষ্টে চন্দ্রার দিকে তাকাইল। চন্দ্রার সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, ক্রমে সে সংজ্ঞা হারাইল।

যখন আবার জ্ঞান হইল—সে দেখিল তাহাদের বাসার সম্মুখে সেই মালতী-বিতানের পাশে সেই রক্তাম্বর যাদুকর তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। নিজের কোন ইচ্ছা বা শক্তি আছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না। যাদুকর তাহাকে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"আমি বলছি—তুমি এই ভোজালী তোমার ঘুমন্ত স্বামীর বুকে বসিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চলে আসবে। তুমি ইচ্ছা করলেও এর অন্যথা করতে পারবে না।"

চন্দ্রার দক্ষিণ হস্ত চন্দ্রার অজ্ঞাতে সেই ভোজালী গ্রহণ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্বামীর মুখের দিকে তাকাইতেই দারুণ ঘৃণায় চন্দ্রার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।...এ-ই ত সলিলদার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েচে......এই তার উপযুক্ত শাস্তি। এক হাতে রূপার মত চক্‌চকে ভোজালীখানা সে রজতের বুকে বসাইয়া দিল। রজত একটা ঝাঁক্‌নী দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পাশের ঘর হইতে একটা ভীতিসূচক শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে হুড়্‌কো খোলার শব্দও বোধ হয় চন্দ্রার কানে আসিয়া পৌছিল, তারপর একদৌড়ে সে যাদুকরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যাদুকর তাহার হাত ধরিয়া বলিল—

"খতম?"

"খতম।"

"তবে এইবার চলে এস আমার সঙ্গে।"

কিছুদূর আসিয়া চন্দ্রা চোখে অন্ধকার দেখিল। যখন আবার সে চোখ মেলিল;—দেখিল যাদুকর নাই। চন্দ্রা নিজের সত্তা যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। তার বুকের ভিতর যেন একটা প্রলয় হইয়া গেল। সে কি করিয়াছে! নিজের হাতে দেবতার মত স্বামীকে সে বধ করিয়াছে। চন্দ্রা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদার শব্দে জাগিয়া রজত স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "দুঃস্বপ্ন দেখেছ চন্দ্রা? ভয় নেই, এই যে আমি রয়েছি।"

পূর্ব্বাকাশ থেকে এক ঝলক সোনালী আভা বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রা তার হারানো মাণিক বুকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

শ্রীতারাপদ রায়

নানা কথা

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত একজন সর্ব্বত্যাগী বিচক্ষণ এবং নির্ভীক নেতার মৃত্যু দেশের যে কোনো অবস্থার ক্ষেই দুর্ঘটনা,—কিন্তু দেশপ্রীতির দুর্ব্বারতার সহিত বিবেচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে যুক্ত করিয়া যখন কিংকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সঙ্কটকাল উপস্থিত, তখন তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নেতার মৃত্যুর মত গুরুতর দুর্ঘটনা আর নাই।

গান্ধী-আরউইন্ সন্ধি দেশের লোকের মনে সার্ব্বজনীন ন্তোষ উৎপন্ন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো য়গায় সভা সমিতি করিয়া ইহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ রা হইতেছে,—একজন নেতা এ কথাও বলিয়াছেন যে, য়োজন হইলে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও সিভিল ডিসো-ডিয়েন্সের কল চালাইতে হইবে। অর্থাৎ অসন্তুষ্ট ক্তিগণ মহাত্মাজীর স্থির বুদ্ধি এবং বিবেচনা-শক্তির পর সম্পূর্ণ আস্থাবান নহেন, তাঁহাদের মতে মহাত্মাজী স্থলে অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নিজের বুদ্ধিকে আঁচলে ধিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়;—কিন্তু সময় বিশেষে, শেষতঃ সামরিক কারকারবারের সময়ে, সেই কার্য্য রাই উচিত। যুদ্ধের চরম অবস্থায় সৈনিকেরা যদি সন্যাধ্যক্ষের আদেশের সমীচীনতায় সন্দিহান হইয়া নিজ নিজ ত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্র র্ক-সভায় পরিণত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। ভারত-ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সেই প্রকারের গোলযোগের সময়ে পণ্ডিত মতিলালের বর্ত্তমানতা ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ইষ্টানিষ্ট সুবিধা-অসুবিধা ওজন করিয়া নিজের অকপট মত, এবং প্রয়োজন স্থলে পরিবর্ত্তিত মত, ব্যক্ত করিবার সাহস এবং সাধুতা মতিলালের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। বার তের বৎসর পূর্ব্বেও তিনি একজন পাকা মডারেট্ ছিলেন—এলাহাবাদের মধ্যপন্থী

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

সংবাদপত্র লীডারের তিনি ছিলেন পরিচালক। কিন্তু হোম রুল আন্দোলনে যোগ দিয়া তাঁহার যখন মতের পরিবর্ত্তন হইল তৎক্ষণাৎ তিনি লীডারের সংশ্রব ত্যাগ

করিয়া নব-প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্র 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'র পরিচালক সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে দেশ যখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল পণ্ডিত মতিলাল সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটসের উপযোগী একটি শাসন-প্রণালীর খস্‌ড়া প্রস্তুত করিলেন, এবং বহু বাদানুবাদের পর ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে উক্ত খসড়া—"নেহেরু রিপোর্ট"—এই সর্ত্তে গৃহীত হইল যে, এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে উক্ত প্রণালী অনুযায়ী ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটস্ না দেন তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সিভিল্ ডিস্‌ওবিডিয়েন্স্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে। এক বৎসরের মধ্যে গভর্মেণ্ট ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটস্ না দেওয়ায় পর বৎসর লাহোর কংগ্রেসে "নেহেরু রিপোর্ট" বর্জ্জন করা হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল। পণ্ডিত মতিলালও অবিলম্বে সদলে লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য ব্যাপারে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। অথচ গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল্ প্রবেশের প্রস্তাব স্বয়ং পণ্ডিত মতিলালই করিয়াছিলেন, এবং সে প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে কংগ্রেসের মীমাংসায় অসন্তুষ্ট হইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি করেন।

মতিলালের জীবনী স্মরণ করিলে চিত্তরঞ্জনকে মনে পড়ে। ত্যাগে, তেজে কর্ম্মপরায়ণতায় উভয়েই উভয়ের সমতুল্য;—বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উভয়ে দেশসেবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য বহুকাল ধরিয়া দিবে বিলাস-বৈভব হইতে মুক্ত দেশের কার্য্যে নিয়োজিত সেবা-সদন এবং আনন্দ-ভবন। যে মতিলালের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রতি মেলে প্যারিস্ হইতে ধৌত হইয়া আসিত—যাঁহার সর্ব্বদা-ব্যবহৃত বিদেশী বস্ত্রের মূল্য দশ হাজার টাকা ছিল, তিনি সামান্য খদ্দর পরিধান করিয়া আনন্দ-ভবনের আরাম-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশ-প্রীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, এ কথা উপন্যাসের মধ্যেও বিস্ময়কর!

চরিত্র-মাধুর্য্যে এবং সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রতিপক্ষের মনেও পণ্ডিত মতিলাল শ্রদ্ধা এবং প্রীতি উদ্রিক্ত করিতেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লিতে স্যার্ জর্জ রেণী তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার কালে বলেন— * * * However the value of his work may be assessed, no one will question his whole-hearted devotion to the interests of India as he conceived them or impute to him any motive other than an unsparing desire to serve his country. * * * He had a personality which impressed itself on the most unobservant. * * * An endearing courtesy ready sense of humour, freedom from malice and bitterness and a wide and deep culture rendered him unrivalled as a host and the most charming of companions.

স্বভাবতঃ কোমল এবং মধুর প্রকৃতির হইলেও চরিত্র এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তায় পণ্ডিত মতিলাল অনন্যসাধারণ ছিলেন। গত দশ বৎসর তিনি একজন অতি পরিশ্রমী যোদ্ধার মত দেশোদ্ধারের মহাযুদ্ধে কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—এবং এই সর্ব্বস্বপণ-করা যুদ্ধ পণ্ডশ্রম নয়, ইহার পরিণামে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবেই—সে বিষয়ে তাঁহার অবিচল বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে মহাত্মা গান্ধী মতিলালকে বলেন, "আপনি যদি স্বাস্থ্য ফিরে পান, তা হ'লে আমি আমার স্বরাজ পাবই।" মৃদু হাসিয়া পণ্ডিত মতিলাল উত্তর দেন, "স্বরাজ ত' পাওয়াই গেছে। ষাট্ হাজার পুরুষ, নারী আর ছেলে-মেয়েরা যখন এত বড় আত্মোৎসর্গ করেছে, লোকে যখন ধৈর্য্যসহকারে লাঠি এবং গুলি সহ্য করেছে, তখন তার পরিণাম স্বরাজ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?"

আমরাও বলি, হে আত্মোৎসৃষ্ট মহাপুরুষ, তোমার উক্তি সফল হউক। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে রিক্ত হইয়া অবশেষে তোমার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলে তাহা যেন সফল হয়।

মতিলাল শক্তিশালী কর্ম্মী ছিলেন—অথচ শক্তিকে সংযমের দ্বারা, বিচক্ষণতার দ্বারা সুপরিচালিত করিয়া প্রবল অশ্বের মত কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, সে রহস্যও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এ শক্তি শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সর্ব্বদিকেই প্রকাশ পাইত। সামাজিক কুসংস্কার বর্জ্জনে তিনি অকুতোভয় ছিলেন। কাশ্মীরী সারস্বত-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রথম জীবনেই তিনি তাঁহার আত্মীয়বর্গের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁহার শিক্ষক Principal Harrisonএর সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬১ সালের ৬ই মে তারিখে দিল্লী সহরে মতিলাল নেহরু জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৎসরে ঠিক ঐ তারিখেই বাংলা দেশের কলিকাতা সহরে আর একজন মহা-মনীষীর জন্ম হয়;—তিনি আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথ। পরস্পর-বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা গঠিত এবং উন্মিষিত উভয়ের জীবনধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পরিণতি একই ভাবে হইয়াছে,—শুধু একজনের কর্ম্মজগতে এবং আর একজনের চিন্তাজগতে। সে কি একই গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের ফলে?

পরলোকগতা উমা দেবী

বিগত ১০ই ফাল্গুন, রবিবার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি উমা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৬ বৎসর। আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ বিচিত্রার পাঠকপাঠিকা সমীপে বহন করিতেছি।

মৃত্যু ত সংসারের প্রতিদিবসের ঘটনা, জীবনের অনিবার্য্য পরিণতি—তাহার অনতিক্রমণীয়তাকে না মানিয়া লইয়া উপায় নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ২৬ বৎসর বয়সে?—জীবন-পুষ্প যখন তাহার দলগুলি মেলিয়া পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন? যাঁহারা উমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের মনে বিশেষ করিয়া বেদনার এই সুরটি বাজিতেছে। বাঙলার সাহিত্যভাণ্ডারে তিনি যে সম্পদ রাখিয়া গেলেন তাহার পরিমাপে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল সে দুঃখ ত সর্ব্বসাধারণের,—কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির অমায়িকতা, সৌজন্য, বন্ধু-বাৎসল্য, অতিথি-পরায়ণতা স্মরণ করিয়া তাঁহার বান্ধব-বান্ধবী আত্মীয়-স্বজনেরা বিষাদে বিমূঢ় হইয়াছেন।

বিচিত্রার প্রারম্ভ হইতে উমা দেবী বিচিত্রার একজন হিতৈষিণী ছিলেন। বিচিত্রাকে তিনি ভালবাসিতেন এবং সে ভালবাসার অভিব্যক্তি শুধু মুখের কথাতেই প্রকাশ পাইত না, মূল যেমন অন্তরালে থাকিয়া বৃক্ষকে রস যোগায়, তিনি তেমনি অগোচরে অনুপরোধে বিচিত্রার উপকার-সাধন করি-

পরলোকগতা উমা দেবী

তেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা এবং কাজলী নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে কথা বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের নিশ্চয়ই মনে আছে।

'বাতায়ন' নামে একটি কবিতার পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাতায়নের কবিরূপে তিনি বাঙলা সাহিত্যের মহিলা-কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন।

শুধু সুলেখিকা হিসাবেই নহে, অন্য বহুবিধ গুণেরও তিনি

অধিকারিণী ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি সুনিপুণা ছিলেন এবং অভিনয়কলাতেও তাঁহার পারদর্শিতা কম ছিল না। সুর ও ভাবের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গাহিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, এবং তাহার মধ্যে স্বকীয় ব্যঞ্জনা প্রয়োগ করিয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই সকল গুণের জন্য উমা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

সামান্য একটু দুর্ব্বলতা ভিন্ন রবিবার সকালেও তাঁহার কোনো প্রকার অসুস্থতা ছিল না। ঘণ্টা দুয়েক অসুস্থ হইয়া বেলা দুইটা আন্দাজ সহসা হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হয় নাই, এবং মৃত্যু তাঁহার মুখমণ্ডলে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। বাঙলা দেশের একটী কোমলহৃদয়া মহিলা কবির অদীর্ঘ জীবনের এই সকরুণ পরিসমাপ্তি।

স্বর্গীয়া উমা দেবী প্রথিতনামা অধ্যাপক ৺ মোহিত-কুমার সেনের কন্যা এবং বার্ড কোম্পানীর এঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের পত্নী ছিলেন। অল্পবয়স্কা একটি কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারকে ও কন্যাটীকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গান্ধী আরুইন সংবাদ—

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেই গান্ধী-আরুইন সংবাদটি একটা স্মরণীয় ঘটনা। মনে হয়, এইখান থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল। ইহার ফলাফল যে কী হইবে,—এখনো সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক, যে সারা পৃথিবীর লোক আজ আকুল আগ্রহে যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশে কোনো দিন তাহা ঘটে নাই। এই যে আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা নূতন পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে চলিল,—না জানি, তাহাতে থাকিবে, পূর্ব্ব-পশ্চিমের মহামিলনের কী অমর বাণী, রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষে ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কী নূতন আলো এবং কোন্ নূতন মন্ত্র, মানুষের সেই এক চির-জাগ্রত, চিরন্তন অথচ চির-নবীন মহান্ আদর্শের প্রতি কেমন নূতন অভিযান। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে এই এক বিরাট্ সম্মিলনের ধারায় অবিচ্ছিন্ন; যুগে যুগে ভারতের মাটিতে কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া কলহ করিয়াছে আবার মিলিয়াছে,—সেজন্য এই হিন্দুস্থান কত আঘাত সহিয়াছে; তবুও নিবিড় বেদনা বহন করিয়া কখনো বলিতে ছাড়ে নাই,—আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। আজও ভারতের কবি সেই কথাই বলিতেছেন,—

> "সেই সাধনার, সে আরাধনার
> যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে,
> আনত শিরে,
> এই ভারতের মহামানবের
> সাগরতীরে" ॥

আজও ভারতের কর্ম্মীর মধ্যে সেই অনুপ্রেরণা। চিরদিন ভারতের কর্ম্ম, ভারতের সাধনা সেই অনুপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যুগে যুগে ভারতবর্ষ তাহার জ্ঞানের আলো দেশে দেশে ছড়াইয়া দিয়াছে। আজ যদি সে তাহার শান্তি-মন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে মুক্ত কণ্ঠে বলিব,—যে আমাদের এই সহস্রবর্ষব্যাপী পরাধীনতার দুঃখও সার্থক।

তবুও একথা গোপন করিয়া কোনো ফল নাই যে যে-সত্ত্বে মহাত্মা গান্ধী সরকারের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া গোল টেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে দেশের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে-প্রাণে সায় দিতে পারেন নাই। এমন কি প্রয়োজন হইলে, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহের অস্ত্র পরিচালনা করিতে হইবে,—এমন রবও কোথাও কোথাও উঠিতেছে। আমরা অবশ্য এ ইঙ্গিতের বেশী মূল্য দিই না। যদি ইহার কোনো মূল্য থাকে, তবে তাহা এই যে, দেশ যে আজ সত্যসত্যই জাগিয়াছে, এই কথাটা ইহা হইতে আমরা

বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারি। মনে হয় ইহার ভিতরে প্রকৃত তেজ অপেক্ষা যৌবন-সুলভ অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যের অনুপ্রেরণাই বেশী। সত্যের শ্রেষ্ঠতম পূজারী যে মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে,—সত্যাগ্রহ না অসত্যাগ্রহ,—সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন এখন ত নাই-ই,—ভবিষ্যতেও যে কোনো দিন হইবে না,—এমন কথা কোনো দ্বিধা না করিয়াই বলা যাইতে পারে। তবে কথা হইতেছে যে, এই যে বিরুদ্ধ মনোভাব—ইহার কি কোনো গভীরতর তাৎপর্য্য নাই? ভারতের রঙ্গশালায় মহামিলনের ঝঙ্কারের মধ্যে ইহা কি বেসুরো বাজিতেছে না? হয়-ত বাজিতেছে,—কিন্তু ইহাও ঠিক যে এই বেসুর ভারতের গোপনতম অন্তরাত্মার নয়,—ইহা চেতনার সেই উপরিতলের জিনিস, যেখানে কি ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে, কি দেশাত্মার মধ্যে নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাব নিরন্তর ক্রমাগতই যাতায়াত করিতে থাকে। বস্তুতঃ যাহা কিছু মহান্, আমরা তাহার সন্ধান পাই, বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়াই। মিথ্যারও এ জগতে একটা সার্থকতা আছে, সত্যের পথ আমাদের সে-ই দেখায়। অথবা এই নিত্য-গতি-শীল জগতে কোনো কিছুই বুঝি-বা নিছক সত্য বা নিছক মিথ্যা নয়। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন সহযোগিতা দিয়া,—তারপর এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অসহযোগিতার পথ অতিক্রম করিয়া আবার এই যে আজ সহযোগিতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন,—এ মন্ত্র নিশ্চয়ই নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধতর, বেদনায় গভীরতর, আশায় প্রবলতর। তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে,—যে মতই তিনি পোষণ করুন না কেন, যে পথেই তাঁহার রথ চালনা করুন না কেন,—সকল সময়েই তাঁহার অন্তরের সত্যের আলোক-সম্পাতে সেই পথ যে উজ্জ্বল হইয়া সমস্ত দেশের লোককে আকর্ষণ করিয়াছে, দীর্ঘনিদ্রাজনিত আড়ষ্টতা দূর করিয়া সেই সত্য যে তাহার রহস্যময় স্পর্শে নির্জীব দেশবাসীর মধ্যে আবার জীবনীশক্তির দ্রুত স্পন্দন জাগাইয়া দিয়াছে,—একথা ত কোনো গান্ধী-বিরোধীই,—কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কি ব্যক্তি-বিশেষে, কি দেশাত্মায়,—সত্য, সৌন্দর্য্য, কল্যাণ বিরাজ করে তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্যের মধ্যে,—অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের পরিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে,—একথা স্বতঃসিদ্ধ। দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যে আমাদের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিতৃপ্তির সন্ধান এতদিন পাওয়া যাইতেছিল না,—তাই মহাত্মা এতদিন দেশের মধ্যে অসহযোগের আন্দোলন বহাইয়াছেন। আজ সেই পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে,—হউক ইহা সূচনা মাত্র,—তবুও এই যে নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমাদের অন্তরে মলয়ের শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দেয় কিনা, অন্ততঃ সেইটুকু দেখিবার জন্যও সেই হাওয়াতে আমাদের মণপ্রাণ মেলিয়া দিতে হইবে,—দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন,—তাঁহারাও বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে তাঁহাদের এই প্রতিবাদ মহাত্মারই প্রজ্জ্বলিত আলোকের শেষ বিলীয়মান রশ্মি; হয়ত এ আলোক আবার প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, হয় ত বা হইবে না;—কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের কথা, মানুষের এখন হইতে তাহা জানা সম্ভব নয়। আপাততঃ এইটুকু দেখিতেছি যে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, হাওয়া দিতেছে,—এখন এই হাওয়ায় এই জ্যোৎস্নায় তনুমন মেলিয়া দিয়া প্রভাতের জন্য কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যদি প্রভাত হয় ভালই, যদি না হয়, যদি এই দীর্ঘরাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যেই এই ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু আবার মিলাইয়া যায়, তবে আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে।

মহাত্মার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইতেছে এই যে, দেশের যে-সকল তথা-কথিত হিংসা-পন্থী রাজবন্দীদের বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা হইয়াছে,—তাহাদের দিকে তিনি তেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাদের কেন মুক্তি দেওয়া হইল না? অবশ্য একথা ঠিক যে তাহাদেরও মুক্তি দিলে দেশের শান্তি আরও নিবিড়তর হইত, এবং গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে সুবিধা ছাড়া কোনো অসুবিধা হইত না, কিন্তু এই মুক্তি-দান ত মহাত্মার হাতে নহে। বলা যাইতে পারে যে এই মুক্তির স্বত্ব গ্রহণ না করিয়া তিনি কেন সন্ধি-স্থাপন করিলেন। ইহার উত্তর সহজ। এই যে

মহাত্মা পুনরায় সহযোগিতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন,—ইহা ত ক্ষণিকের বিবেচনা-হীন প্রবৃত্তির জন্যও নয়, কিংবা দুঃখ-ভোগের ভ্রান্তির জন্যও নয়। লর্ড আরুইনের সহিত দীর্ঘ আলোচনার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে যে নূতন বিশ্বাসের আলোক লাভ করিয়াছেন, সেই আলোকেই তিনি আপনাকে আবার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এ আলোক মহাত্মার অন্তরেরই আলোক,—মধ্যে নিভিয়া গিয়াছিল,—লর্ড আরুইন আবার তাহা জ্বালিয়া দিয়াছেন,—হয় ত ক্রমশঃ তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু যে সকল দেশপ্রাণ যুবকেরা হিংস-পদ্ধতির দ্বারা দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের নিকট মহাত্মার অন্তরের এই আলোক ত কোনোদিনই পৌঁছায় নাই; গত দশবৎসরের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের আকাশ-ব্যাপী অনল-শিখাও না। বস্তুতঃ এই হিংস-পদ্ধতি ভারতবর্ষের জিনিষই নয়,—ইহা বিদেশ হইতে আমদানী,—এখনো ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই,—বোধ হয় কোনো দিনই যাইবে না,—ভারতবর্ষের পূর্ণ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযুক্ত হইলেও হিংস পদ্ধতি এবং অহিংস পদ্ধতির মধ্যে কেমন একটা দুর-পনেয় ব্যবধান আছে; লর্ড আরুইনের সহিত আলোচনায় মহাত্মার পক্ষে সেই ব্যবধান লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় নাই; কেন-না তাঁহার অস্ত্র যে প্রেম, সমবেদনা, সত্যাগ্রহ—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে বিশ্বের কল্যাণ-কামনা। অতি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হইলেও অসৎকাজ সেই উদ্দেশ্যকে একটু কলুষিত না করিয়া যায় না। অন্তরে প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও মহাত্মা যে হিংসা-পন্থী রাজবন্দীদের মুক্তি দান করাইতে পারেন নাই,—এইখানেই,—তাঁহার এই মূলমন্ত্রের মধ্যেই তাহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা হিংসাপন্থীদের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য: "Let them preserve their precious lives for the service of Motherland to which all will be presently called and let them give the Congress an opportunity of securing release of all other political prisoners and may be, even rescue from the gallows those who are condemned to the gallows being guilty of murder."

বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যাটাই যদি চ ছিল গান্ধী-আরুইন সংবাদের আলোচ্য বিষয়,—মূলতঃ কিন্তু ইহার অনুপ্রেরণাটি অনেক বেশী ব্যাপক ও অনেক গভীরতর। বিজ্ঞানের কল্যাণে জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধান আর নাই, সকল জাতিই আজ ক্রমশঃই পরস্পরের সহিত নিবিড়তর সংস্পর্শে আসিতেছে। পূর্ব্ব-পশ্চিম আজ মিলিয়াছে প্রধানতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে। পূর্ব্বের প্রতিনিধি মহাত্মা আর পশ্চিমের প্রতিনিধি আরুইন এই যে দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গভীর নিশীথিনী পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রেমের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মধ্যে একটা মৈত্রীর সূচনা করিলেন,—মনে হয় যেন বিংশ শতাব্দীর নূতন বিশ্ব-রচনার বীজমন্ত্রটি এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম গান্ধী-আরুইন সংবাদটি শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেই একটি স্মরণীয় ঘটনা।

জয়ন্তী উৎসব

আগামী ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে আশ্রমবাসীগণ একটি জয়ন্তী উৎসব করিবেন স্থির করিয়াছেন। এ সংবাদে বাঙালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্কল্পিত উৎসবটির পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

উৎসবটি যাহাতে যথোপযুক্ত সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য আশ্রমবাসীগণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনু-রাগী ব্যক্তিগণের সহায়তা পাইতে চাহেন। তদুদ্দেশ্যে সর্ব্ব-সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বিচিত্রায় প্রকাশের জন্য তাঁহারা যে পত্রখানি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি এমন একটি শুভ এবং আন-ন্দের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে কেহই অবহেলা করিবেন না।

শান্তিনিকেতন

যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে তদুপলক্ষ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের প্রতি প্রীতিযুক্ত সহৃদয়বর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ করিব, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

এই সময় বিশেষভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক কর্ম্মী, অথবা যাঁহারা যেকোনোভাবে আশ্রমের সঙ্গে মনে মনে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা, এবং জন্মোৎসব সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি,— ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৭ সন।

নিবেদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ
শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ
শ্রীআশা অধিকারী
শ্রীহেমবালা সেন

আকবরের আমলে গ্রন্থকার-হত্যা

কাল্পনিক কাহিনী অপেক্ষাও বাস্তব ঘটনা যে অদ্ভুত নিম্নের বিবরণে তাহা প্রকট। মোগল যুগে কলাবিদ্যার উৎকর্ষও ইহাতে স্পষ্টীকৃত। সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভেদ-জ্ঞান ছিল না তাহারও পরিচয় ইহাতে বিদ্যমান।

"তারিখ-ই-অল্ ফি" সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত। নামের অর্থ—"আমাদের সহস্র বর্ষের ইতিহাস।" প্রকৃতই ইহা আরবীয় ও পারস্য-দেশীয় ইতিহাসের সার-সংগ্রহ। হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৬৩২ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের ইহা নিখুঁৎ ও সুলিখিত ইতিহাস—অতি সুন্দর বহু চিত্র সম্বলিত। মৌলিক পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মাত্র সম্প্রতি উদ্ধার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ। পাণ্ডুলিপি অবশ্যই পারস্য ভাষায় রচিত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মহাফজ-উল্ হক্ এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই মূল্যবান অথচ স্বল্প-পরিচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষে বা ইউরোপে কোথাও নাই, অথচ ইহা সম্রাট আকবরের অনুজ্ঞাক্রমে প্রণীত হইয়াছিল। নিজ পরিষদের সাতজন বিখ্যাত পণ্ডিতের হস্তে প্রথমতঃ তিনি এই গ্রন্থ রচনার ভার দেন। কিছুদিন পরে মোল্লা আমেদ নামক অপর একজন শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত গ্রন্থকারের উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হয়।

মোল্লা উৎসাহের সহিত এই গুরুভার সম্পাদন করিতে থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুস্তকের প্রায় হাজার পৃষ্ঠা রচনা করেন, কিন্তু বিধি বাম, ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। রাত্রিকালে কোন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে বাড়ীতে গিয়া ডাকিল, রাজপথে আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল লাহোর সহরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকারী সুন্নি-শ্রেণীভুক্ত ও ধর্ম্মোন্মত্ত। পুস্তকে বর্ণিত মতামতের সহিত লোকটার বিরোধ ছিল, ইহাই হত্যার মূল কারণ খুনের সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইলে হত্যাকারীকে মুসলমানের 'গাজী' নামে অভিহিত করিল এবং যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড না হয় বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজপরিষদে ওমরাহেরা ও অন্তঃপুরের মহিলারা পর্য্যন্ত সম্রাটকে নানাভাবে অনুরোধ ও উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, অবিলম্বে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। হত্যাকারীকে তখন হস্তীর পদতলে বাঁধিয়া

লাহোর নগরের সারা রাজপথে ঘষড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয় —তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

প্রারব্ধ ইতিহাসের বাকি অংশ রচনার ভার অতঃপর অর্পিত হয় আর একজন মনীষীর উপর। ইঁহার নাম নকীব খাঁ। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রাজকীয় চিত্রগৃহে প্রেরিত হইলে বহুলোকে মিলিয়া ইহা নকল করে। তাহার পর চিত্রশোভিত করিবার পর্ব্ব সুরু হইল। সুদক্ষ চিত্রশিল্পীরা অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের নিকট যে পুস্তকখানা রক্ষিত তাহা রাজচিত্রশালায় অঙ্কিত মৌলিক পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ। ইহার লিপিকর্ম্ম যেমন চমৎকার বর্ণবৈচিত্র্যাদিও তেমনই মনোমদ। রাজ-পরিষদের চিত্রকরগণের শিল্পনৈপুণ্যে প্রকৃতই মুগ্ধ হইতে হয়। কালবশে চিত্রগুলির কোন বৈলক্ষণ্য সাধিত হয় নাই। মোগল কলাকুশলতার বিশিষ্ঠতা উহাতে সুপরিস্ফুট।

দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির শেষাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরগণের নামের তালিকা অবশ্য ঐখানেই সন্নিবিষ্ট ছিল। দপ্তরীর দোষেই তালিকা অসম্পূর্ণ। শুধু পাঁচজন চিত্রকরের নাম পরিদৃষ্ট হয়, যথা—শঙ্কর, গুজরাতী, সারোয়ান, দ্রিষিয়া, সুরদাস ও বৃহস্পৎ। মুসলমানী পাণ্ডুলিপিতে হিন্দু নামের উল্লেখে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই, কারণ সম্রাট আকবরের রাজসভায় বহু হিন্দু চিত্রকর নিযুক্ত ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে প্রতি দশজন হিন্দু চিত্রকরের ভিতর একজন করিয়া মুসলমান। ইঁহারা মুসলমান চিত্রকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু পরে দক্ষতায় গুরুকেও ছাড়াইয়া উঠেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির চিত্রকরের একত্র সম্মিলনেই চিত্রবিদ্যার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। মোগল যুগের চিত্রকলা যুগযুগান্তর মানবচিত্তে বিস্ময় উদ্রেক করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পঞ্চম জর্জ্জ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত বেনেট্ রামচন্দ্র রাও এবং দেওয়ান বাহাদুর স্যর্ ভেঙ্কটনম্ নাইডু। উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। গুণীর যথোচিত সম্মাননায় আমরাও সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১৯২৭ সালে বোম্বাই সহরে Indian Philosophical Congress-এর তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ সাধারণ সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য ইয়োরোপ এবং আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কয়েকবার আমন্ত্রিত হইয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন।
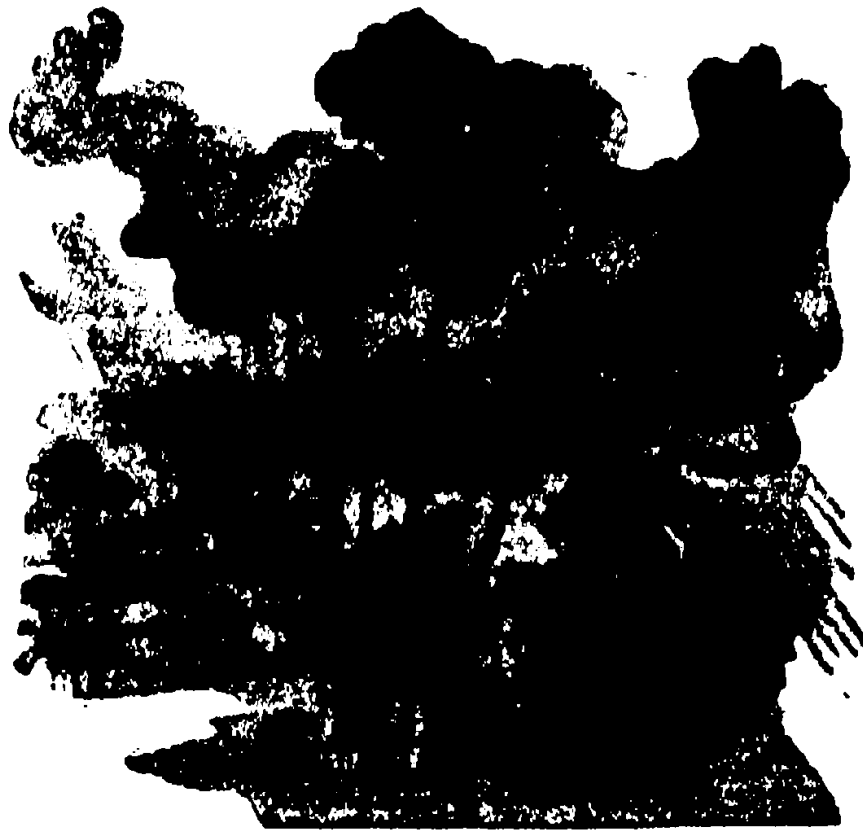
Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 6A. Bhim Ghosh Lane, Calcutta.

শ্রী অমলা বসু

আশীর্ব্বাদ

উদয়নের বৈশাখের সংখ্যা পাইয়া
আনন্দিত হইলাম। আশা করি,
এই পত্রিকা সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ
অক্ষুণ্ণ রাখিবে, এবং বাঙালীর
চিত্তকে নানাপ্রকার কঠিন সাধনার
প্রেরণা আনিয়া উদয়নের নাম
সার্থক করিবে।

শ্রী[illegible]

২৩ বৈশাখ
১৩৪০

উদয়ন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

প্রথম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি চারটি শ্লোক কোনো মতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে ধ্বনিসঙ্গীত মারা যায়—অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসঙ্গীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

...বাঙালীর কান ব'লে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে ব'লে আমি মানিনে। মানুষের স্বাভাবিক কানের দাবী অনুসরণ করলে দেখা যায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব্ব, যথা—

মেঘালোকে। ভবতি সুখিনো। পান্থথাবৃৎ। তি চেতঃ—

মাত্রা হিসাবে ৮-৭-৭-৪। শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ, লাইনের শেষে একমাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য্য। এই ছন্দকে বাংলায় আন্‌তে গেলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ—

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা, জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর-রীতি অনুবর্ত্তন করা যেতে পারে, যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্ব্বাসনে সে রহি' প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি' স'বে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি' রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধ ছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিল-ধারা॥

ছোটগল্প*

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

ছোটগল্প, ভাষান্তরে উপকথা, হচ্ছে পৃথিবীর আদি গল্প। এই উপকথাই বাঙালীর মুখে রূপকথা আকার ধারণ করেছে। আর রূপকথাই যে আদি ছোটগল্প, তা' কে না জানে? এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই হচ্ছে উপকথার জন্মভূমি; অন্ততঃ এ কথা অবিসংবাদী যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে যত উপকথা আছে, পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্যে তার শতাংশের এক অংশও নেই।

বৌদ্ধ-জাতক অসংখ্য। মহাভারত আর পুরাণেও অসংখ্য উপকথা আছে। সেগুলি যদি সব একত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে বৌদ্ধ-জাতকের চাইতেও পরিমাণে বেশি হবে। আর এই উপকথার ভিত্তির উপরেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। তারপর 'কথাসরিৎসাগরে'র নামেই পরিচয় যে, তাতে কত কথা সংগৃহীত হয়েছে। আর পশুপক্ষীর চরিত্র ও ব্যবহার অবলম্বন ক'রে যে কত উপকথার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চতন্ত্রে'।

এই অসংখ্য উপকথার সৃষ্টি করেছে নিরক্ষর লোক-সমাজ, শিক্ষিত সাহিত্য-সমাজ নয়। দণ্ডী বলেছেন যে, "কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।" এর থেকে অনুমান করা যায় যে, দণ্ডীর কালে বেশির ভাগ উপকথাই মানুষের মুখে শুনে সেকালের কবিরা তা' লোক-ভাষায়, আর কোন কোন গল্প সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেন। এই বিপুল সাহিত্যের জন্ম লেখনী দেয়নি, দিয়েছে রসনা।

বৌদ্ধ-জাতক মূলতঃ পালি ভাষাতেই লিখিত, পরে তা' সংস্কৃত ভাষাতেও প্রমোশান পেয়েছে। 'বৃহৎ-কথা' পৈশাচী নামক কোনও অনির্দ্দিষ্ট-প্রাকৃতে নাকি প্রথমে রচিত হয়েছিল, তারপর তা' 'কথাসরিৎসাগরে' রূপান্তরিত হয়েছে। এর থেকে মনে হয় ভারতবর্ষই হচ্ছে যথার্থ ছোটগল্পের দেশ।

(২)

সেকালের সাহিত্যিকগণ এ-সব উপকথা নিজের মাথা থেকে বার করেননি, কেবলমাত্র লোক-কথা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং অল্পবিস্তর রূপান্তরিত করেছিলেন। মহাভারত-পুরাণের উপাখ্যানাবলী, 'বৃহৎ কথার' উপকথাসমূহ, জাতকের ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি, সবই লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণ মাত্র।

এই জনসমাজের সৃষ্ট উপকথাগুলি মানব-সমাজের যে চির আনন্দের সামগ্রী, সেকালের সাহিত্যিকগণ তা' বুঝ্‌তে পেরেছিলেন; আর ঐ সব উপকথা অবলম্বনে যে লোক-সমাজকে শিক্ষাদান করা যেতে পারে, তা' তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই জাতকের গল্পগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের লোকায়ত text-book; 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি রাজধর্ম্মের text-book; এবং মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি হিন্দু ধর্ম্ম ও আচারের প্রচারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁরা উদাসীন, আজ পর্য্যন্ত এর অধিকাংশ গল্প তাঁদেরও আনন্দের সামগ্রী—কারণ "কথারস অবিষাতেন" এ শিক্ষা দান করা হয়েছে।

এর পর আরব্য ভাষায় একটি অপূর্ব্ব গল্পসংগ্রহ

---

* প্রকাশোন্মুখ কথাগুচ্ছের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত।

প্রকাশিত হয়। এবং এ আরব্য-উপন্যাস যে বিশ্ব-মানবের অতি প্রিয় বস্তু, তা' কে না জানে? অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, আরব্য-উপন্যাসের গল্পসমূহ ভারতীয় উপকথার ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত। এ অনুমান আমি সহজেই গ্রাহ্য করি। কেননা, 'কথাসরিৎসাগরে' এমন গুটিকতক গল্প আছে, যা' আরব্য-উপন্যাসে বেমালুম পূরে দেওয়া যায়। আর 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্প যে ইউরোপে অনুবাদের মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রমাণ আছে। সুতরাং আমাদের জাতিই যে ছোটগল্পের প্রধান কর্ত্তা ও ভোক্তা—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩)

এখন ইউরোপের দিকে তাকানো যাক্। গ্রীসের বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্য এ-ক্ষেত্রে অনুর্ব্বর। গ্রীক্ ভাষা আমি জানিনে, কিন্তু গ্রীক্ সাহিত্য যদি উপকথায় সমৃদ্ধ হ'ত, তবে সে সংবাদ আমাদের কাছেও পৌঁছত। গ্রীসেও দেবদেবীর বহু উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলি ছোটগল্পের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। ও ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুরূপ 'Æsop's Fables' আছে, যা' 'কথামালা'র প্রসাদে আমরা সকলেই জানি। এ 'কথামালা'র রূপ অতি চমৎকার। এত অল্প কথায় এমন সুগঠিত এ-জাতীয় গল্প আর কেউ বল্‌তে পেরেছেন ব'লে জানিনে। এবং এই artistic গুণেই এ গল্পগুলি বিশ্ব-মানবের কাছে এত প্রিয় হয়েছে। এ গল্পগুলির স্রষ্টা লোক-সমাজই হ'ক আর যিনিই হ'ন, তিনি সাহিত্য-জগতের একটি প্রধান গুণী।

ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই, সুতরাং যে-সব গল্প-লেখকের নাম আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁদেরই নাম করব।

গ্রীকো-রোমান সভ্যতার অধঃপতনের পর ইউরোপে কোনও অমর কথা-সাহিত্য জন্মলাভ করেনি, সম্ভবতঃ এক রূপকথা ব্যতীত—যে-সব রূপকথা Grimm অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংগ্রহ ক'রে, সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এর পূর্ব্বে Renaissance-এর যুগে ইতালিতে আবার নব-উপকথা-সাহিত্য জন্মলাভ করে। ঐ যুগে ইতালির কথা-শিল্পীদের মধ্যে Boccaccio সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। Boccaccio-র রচিত গল্পের ভিতর সুরুচিও নেই, সুনীতিও নেই—এবং তিনি কোনরূপ ধর্ম্মপ্রচারের উপকরণস্বরূপ এ সব গল্প লেখেননি। কিন্তু এ-সব গল্পের ভিতর ধর্ম্ম ও নীতি না থাক, আর্ট আছে। সর্ব্ব-প্রকার ideality-র দিকে পিঠ ফিরিয়েও যে রক্তমাংসে-গড়া মানুষ নিয়ে চমৎকার গল্প লেখা যায়—এ সত্যের আবিষ্কার বোধহয় Boccaccio প্রথম করেন। এর ফলে ইউরোপের সকল ভাষায় এঁর গল্পগুলি অনূদিত হয়েছে, আর সেগুলি বহুলোকের নিকট পরিচিত। মানুষের হাসি-কান্নার মূল যে তার অন্তর্নিহিত, এবং কোনও দৈবশক্তির অনুগ্রহ বা নিগ্রহের উপর নির্ভর করে না—এই হচ্ছে বকাচিওর ফিলজফি। আর এই ফিলজফিই ইউরোপের নব-উপকথার অন্তরে রয়েছে।

(৪)

এর পর ইউরোপে নানা ভাষায় অবশ্য Boccaccio-র অনুকরণে নানা গল্প লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে-সব লেখকরা প্রতিভায় বঞ্চিত ছিলেন ব'লে তাঁরা কেউই সাহিত্য-সমাজে Boccaccio-র ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন-নি; সুতরাং তাঁরা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত নন্।

তারপর ইউরোপে নভেল নামক নব-কথা-সাহিত্য জন্মলাভ কর্‌লে—এবং দিন দিন এই নব সাহিত্য এমন বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল যে, আজকের দিনে এ-জাতীয় সাহিত্যের তুল্য বিপুল সাহিত্য আর দ্বিতীয় নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ফসলের চাষ মামুলী হ'য়ে ওঠে।

এর ফলে উপকথা আওতায় প'ড়ে গেল। লেখক ও পাঠক এ-জাতীয় সাহিত্যকে উপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ছোটগল্প ছোট-সাহিত্য ব'লে গণ্য হ'তে লাগ্‌ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রধান গল্প-লেখকেরা

প্রায় সকলেই নভেল-লেখক। Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot, Balzac, Tolstoy-এর নাম কে না জানেন?

উপরোক্ত বড় ইংরাজ নভেলিষ্টরা কেউ ভাল ছোট-গল্প লেখেননি; কিংবা লিখ্‌তে পারেননি। অবশ্য নভেলের ভিতরও একটি গল্প থাকে; কিন্তু সে-গল্প নভেলের প্রাণ নয়। অপরপক্ষে গল্পই হচ্ছে ছোটগল্প ওরফে উপকথার প্রাণ। সুতরাং যাঁরা নভেল-লেখক, তাঁরা ছোটগল্প লেখায় মনোনিবেশ করতে পারেন না।

অবশ্য এমন লেখকও আছেন, যাঁরা এ উভয় জাতীয় সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত—যথা ফরাসী দেশে Balzac এবং রুশিয়ায় Tolstoy। কিন্তু সচরাচর এ দুই শক্তি একই লেখকের দেহে থাকে না।

(৫)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ হচ্ছে উপকথার দেশ, আর বর্ত্তমান ইউরোপ হচ্ছে উপন্যাসের দেশ। সুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উপকথা একরকম উপ-সাহিত্য হ'য়ে পড়েছিল।

হঠাৎ Maupassant নামক জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক ছোটগল্পকে আবার সাহিত্য-রাজ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর কারণ, Maupassant-র গল্পের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য, তাঁর ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, ইউরোপের পাঠক-সমাজকে যুগপৎ মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। ইউরোপের সাধারণ পাঠক-সমাজ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা একবাক্যে Maupassant-কে একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ব'লে অবিলম্বে স্বীকার করেন। স্বয়ং Tolstoy ত' তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী বলেন। এর ফলে তাঁর গল্পসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন গল্প-সাহিত্যে Maupassant রাজা। এবং আমরা যা'রা সেকালে ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করতুম, অনেকেই তাঁর গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলুম। ফলে, এ-যুগের বাঙলার ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কি হিসেবে, তা' পরে বল্‌ছি। এখানে শুধু একটি কথা বল্‌তে চাই। ইংলণ্ডের এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক Kipling-এর কোনরূপ প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নেই। এর কারণ, Kipling-এর কথা-সাহিত্য আমাদের কাছে প্রিয়ও নয়, অতএব পরিচিতও নয়। এ-ক্ষেত্রে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কাছে ঋণী নই।

(৬)

তখনকার অনেক লেখক যে Maupassant-র কথাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর সে সাহিত্য যে তাঁদের প্রিয় ছিল—তার প্রমাণ Maupassant-র কতকগুলি গল্প বাঙ্‌লা ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর গল্পের অনুকরণ করেছেন কিংবা তাঁর গল্প চুরি করেছেন ব'লে ত' জানিনে। কারণ তাঁর গল্পের বিষয় চুরি করা যায়, কিন্তু তার রূপ চুরি করা যায় না। আর Maupassant-র অনেক কথার রূপ বাদ দিলে—তার বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রিয় হ'য়ে পড়ে।

তবে তাঁর গল্প-সাহিত্যের দ্বারা আমাদের গল্প-সাহিত্য যে অনুপ্রাণিত, এ কথার মানে কি?

Maupassant-র উপকথা প্রাচীন উপকথার স্বজাত নয়। তাঁর কথা রূপকথাও নয়, 'একাধিক সহস্র রজনী'র কথাও নয়, 'পঞ্চতন্ত্রের' কথাও নয়। এ-সব কথা, লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণও নয়, অনুকরণও নয়। তাঁর সকল কথার স্রষ্টাই তিনি নিজে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতি থেকেই এ-সব গল্পের মাল-মস্‌লা সংগ্রহ করেছেন।

এর থেকে এই ভরসা পাওয়া যায় যে, এ-যুগে আমরা নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতির সাহায্যেই নব-কথা সৃষ্টি করতে পারি। উপরন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ছোটগল্পও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে গণ্য। গল্পের মর্য্যাদা, তার পরিমাণ নয়, তার গুণের

উপর নির্ভর করে। আমরা যদি যথার্থই গুণী হই ত' আমাদের গুণপনার পরিচয় ছোটগল্প রচনা ক'রেও দিতে পারি। আর ছোটগল্পেরও কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নেই; যে-কোন বিষয় হ'ক্ না কেন, গুণীর হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে তা' জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। 'আর্টে' Content-এর মূল্যের চাইতে Form-এর মূল্য ঢের বেশি।

(৭)

বাঙ্‌লার এ-যুগের গল্প-লেখকরা কেউই রূপকথা লেখেন না, আরব্য-উপন্যাসও লেখেন না; সকলেই গল্প লেখ্‌বার নব পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারও কারও বিশ্বাস, এ-পথ প্রথমে আমিই দেখাই। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল।

আমি প্রথমে কলম ধ'রেই, "ফুলদানী" নামক একটি গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করিনি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হ'লেও, আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক Maupassant নন্— Merimée নামক তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

এর পর বাঙালী লেখকরা Maupassant-র বহু গল্প বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেন। আমি যদি এ-ক্ষেত্রে কোনও পথ দেখিয়ে থাকি, তবে তা' অনুবাদের পথ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ ব'লে গ্রাহ্য হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্ব্বপ্রথম "হিতবাদী" পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে সুরু করেন; তারপর "সাধনায়" তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনিই হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোট-গল্পের আদিস্রষ্টা; এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অফুরন্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙ্‌লার অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এর কারণ, কি ভাবে, কি ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া এ-যুগের বাঙালী লেখকদের পক্ষে একরকম অসম্ভব।

(৮)

আমি পূর্ব্বে যা' লিখেছি, তা' ছোটগল্পের ইভলিউসানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নয়; কারণ সে ইতিহাস লেখা আমার স্বল্প বিদ্যায় কুলোয় না। সেকেলে ও একেলে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে একমাত্র পাঠক হিসেবে—ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। এই সূত্রে আমার এই জ্ঞান জন্মেছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে ছোটগল্পের আদি জন্মভূমি। এবং সেকালে এ-দেশে গল্প জন্মেছে ঢের—অথচ সে-সব গল্প সকালে জ'ন্মে বিকেলে মরেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গল্প অমর। ভারতবর্ষের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন ইভলিউসানের কোঠায় ফেলা যায় না; কারণ, ভারত-বর্ষের সভ্যতার ইতিহাস মূল থেকে ফুল পর্য্যন্ত ক্রমঃবিকাশের ইতিহাস নয়,— যুগে যুগে উত্থান-পতনের ইতিহাস।

আমরা আজও বেঁচে আছি, এবং মন নামক জিনিষটি আজও আমাদের দেহে আছে। আর মানুষে যা'কে সাহিত্য বলে,—তা এই মনেরই সৃষ্টি অথবা লীলা। আমার বিশ্বাস যে, এ-যুগে এই সাহিত্যিক মনের স্পষ্ট প্রকাশ বাঙ্‌লাদেশেই বিশেষ ক'রে দেখা যায়।

ছোটগল্প যখন সাহিত্যের একটি সনাতন ও প্রধান অঙ্গ—তখন বর্ত্তমান বাঙ্‌লায় যে তা' ফুটে উঠ্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

আর একটি কথা ব'লেই ছোটগল্পের এই পরিচয়-পত্র শেষ করি। ছোটগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন। কারণ এ-জাতীয়

গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার ক'রে নিতে হয়, পরে ভাষায় মূর্ত্ত করতে হয়। নভেলের মত এতে নানা কথা বলবার অবসর নেই।

তবে এ আর্ট কেউ কাউকেও শেখাতে পারে না। নিজের কল্পনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা' লেখক স্বয়ংই আবিষ্কার করবেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেমন বিচিত্র, তার আর্টও তেমনি বিভিন্ন।

ছোটগল্প যে গানও হ'তে পারে, ছবিও হ'তে পারে, তার পরিচয় আমাদের গল্প-সংগ্রহেই পাবেন; এবং বলা বাহুল্য যে, গান গাইবার আর্ট ও ছবি আঁকবার আর্ট সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপকথা সম্বন্ধে প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। উপকথা মাত্রেই রূপকথা—ও-শব্দের সংস্কৃত অর্থে।

৩০-৪-৩৩

"উদয়ন" 'পোষ্টার' (Poster) প্রতিযোগিতা

রাস্তার ধারের দেওয়ালে "উদয়ন"-এর বিজ্ঞাপন দিবার উপযুক্ত একটি ভাল রঙ্গীন চিত্রের (চার রঙ্গে আঁকা) জন্য উপরোক্ত প্রতিযোগিতায় ১৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রতি-যোগিতার ছবি পাঠাইবার শেষ দিন ছিল ৩০শে এপ্রিল।

প্রতিযোগিতার বিচারকগণ (চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ দাস মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্রটি পুরস্কারের যোগ্য স্থির করিয়াছেন।

পুরস্কার সম্বন্ধে বিচারের সময় চিত্রের মৌলিকতা, আঁকার উৎকর্ষ এবং রঙের সমাবেশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ছবিটির একটি ছোট এক-রঙা ব্লক এবার ছাপা হইল। বলা বাহুল্য, মূল রঙ্গীন চিত্রটির সৌন্দর্য্য এই ছবিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে। মূল চিত্রটি ২০×৩০ইঞ্চি আকারে চার রঙে অঙ্কিত। শীঘ্রই ইহার পূর্ণাকার ছাপা 'পোষ্টার' কলিকাতা এবং মফঃস্বলের রাস্তার দেওয়ালে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রতিযোগিতায় আরও কয়েকটি ভাল ছবি আসিয়াছিল; পুরস্কৃত না হইলেও সেগুলি উল্লেখ-যোগ্য। সম্ভব হইলে তাহাদেরও ছোট ব্লক আমরা ভবিষ্যতে ছাপিব।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ দাস

[এই চিত্রখানি উদয়নের প্রাচীর-চিত্র প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় ও শিল্পীকে দেড়শত

সর্ব্বাণী

(উপন্যাস)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(২)

সুরঞ্জনের বয়স কত তা' আমাদের ঠিক জানা নাই; রঙ্‌টি বেশ হরিতাল-ফলানো, চুলগুলি সাদা ধবধবে, এক সময় হয়ত চুলে কলপ পড়িত, এখন আর পড়ে না; দাড়ি-গোঁফ কামানো, দোহারা গড়ন, উঁচু নাক, চোখেরও টান আছে, বয়সেও তার জ্যোতি হারায় নাই, দাঁতগুলি বেশ সাজানো ও ঝক্‌ঝকে, যদিও সেগুলি এখন আর নিজের নয়—বাঁধানো। পরণে পরিষ্কার সাদা ধুতি-পিরাণ, পায়ে বোধকরি মেয়েরই হাতে বোনা রেশমী কাজকরা শ্লিপার; সকালবেলা যখন বাগানে বেড়াইতে যান, হাতে একগাছি রূপার মুখ-বাঁধানো সৌখীন ছড়ি থাকে, জুতাটাও বদ্‌লাইয়া পরেন, আর সবই ঠিক থাকে। পাকা চুলগুলি সকল সময়েই পরিপাটী করিয়া আঁচড়ানো। জন্মকাল হইতেই যে ভোগে, সুখে, সম্ভোগে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহার সকল-কিছু চিহ্নই এই মানুষটির সমস্ত দেহে-মনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে দেখা যায়; চলিত ভাষায় যাকে বলে সৌখীন।

কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন হইতে তাঁহার একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সাজপোষাক অবশ্য ঠিকই আছে, চেহারাও কিছুমাত্র বদ্‌লায় নাই; কিন্তু পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে যেন এই সুন্দর এবং সুসজ্জ বৃদ্ধ ব্যক্তিটির মন। অবশ্য চিরদিনকার অভ্যাসে অভ্যস্ত পাকা বিষয়ী মন সহজে যে বাগ মানিতে চাহে, তা নয়; কিন্তু সে যে আজ তার চিরাভ্যস্ত পথে আর শান্তি পায় না, সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফেরে, এ সত্য কথা। অভ্যাসমত তিনি করিয়া যান সবই, এমনকি স্নানের জলে টয়লেট ভিনিগার দেওয়া আছে জানিয়াও তা'তে আপত্তি করেন না, স্নানের পর নিত্যকার মতই ঘরে-তোলা মাখম মাখিয়া পেশোয়ারি চা'লের ভাত সমান পরিমাণেই মুখে তোলেন; ভাপা দই, আঙ্গুরের পায়েস, বাদ্‌শাভোগ বা রাজভোগ যেমন বরাবর ঘরেই তৈরি হইত, আজও হয়; রূপার ঢাকাই কাজ-করা রেকাবে তা' সাম্‌নে আসে, শেষও হয়, কিন্তু স্বাদ-গ্রহণ হয়ত বা আর ঠিক তেমনটি করিয়া হয় না। মন যেন উদাস উড়ন্ত হইয়া থাকে; সর-বসান ঘন দুধের বাটীতে চিনির মুড়কি ফেলা আছে, ভাত যে তা'তে পড়ে নাই অথচ আঙ্গুল দিয়া ভাত মাখার একটা মিথ্যা অভিনয় গভীর অন্যমনস্কতায় চলিতেছে, একথাটা আবার আর-একজনকে ঈষৎ একটুখানি দুঃখের ম্লান হাসি হাসিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়; দিতে গিয়া যে দেয় তার হৃদয় মথিত করিয়া একটা সযত্নে চাপিয়া রাখা দীর্ঘশ্বাসের একটুখানি গলার কাছে ভাসিয়া আসে; সেটাকে সাম্‌লাইতে তাহাকে ঈষৎ নত হইয়া পাখার হাওয়ায় একটা কল্পিত মাছিকে তাড়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আবার নিজের অন্তর্নিহিত গভীর বিষাদাচ্ছন্ন উন্মনতা দ্রষ্টার নিকট উহ্য রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় কোনমতে একটুখানি দেঁতো হাসি হাসিয়া তিন আঙ্গুলে চারটি ভাতের দানা তুলিয়া লইয়া উঁহাকেও জবাব দিতে হয়, "ক্ষিধে নেই ব'লেই নিইনি রে; আচ্ছা দু'টি নেওয়াই যাক্।"

শুনিয়া পাখার বাতাস দিতে দিতে যে শোনে তার

বুক একটুখানি ভারি হইয়া উঠে, দীর্ঘশ্বাস চাপিতে আরও একবার চেষ্টা করিতে হয়। এমনি করিয়াই তাদের দু'জনকার মধ্যে লুকোচুরির প্রয়াস চলিতে থাকে, ফলে কে কতখানি যে সফল হইতে পারে বলা যায় না, কিন্তু এটুকু বলা যায়, সকল বিষয়ের মতই এক্ষেত্রেও সেই তরুণীর বিজয়লাভ হয়ত বা কথঞ্চিৎ ঘটে; প্রবীণটির আত্মসম্মান রক্ষা বুঝি আর হয় না, এমনই তাঁর অবস্থাটা হইয়া দাঁড়াইতেছিল। যে-কোন দীর্ঘকাল-স্থায়ী যাপ্য রোগেরই মত, যতই দিন যায় অবনতির দিকে ততই নামিয়া আসে; উন্নতির লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় না, লক্ষ্যও থাকে না। যে একজনই শুধু লক্ষ্য করে, এবং কে যে ইহার উপলক্ষ্য তাও জানে, তারই প্রাণের ভিতরে শুধু পুঞ্জীকৃত হইয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসগুলি জমিয়া উঠে, বুকখানা পাথরের মত ভারি হয়, চোখে জল পড়ে না, সমস্ত মনটা শুধু গুমটে-ভরা ব্যাপ্তমেঘ বিরহিত-বর্ষণ দিবসের মতই থমথমে হইয়া থাকে, যে অবস্থায় আকাশকে বর্ষণমুখর জলধারে অবনত সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, অথচ তার বিন্দুটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে দেয় না,—সে সর্ব্বাণী—সে এই সুরঞ্জনেরই মেয়ে।

বাপে-মেয়েতে বয়সের যে রকম তফাৎ, তাতে পিতামহ-পৌত্রীর সম্পর্ক মনে করাও বিচিত্র ছিল না, অনেকে হয়ত করেনও। সর্ব্বাণী এঁর অনেক বয়সের মেয়ে; তার মা বোধ করি তার বাপের দ্বিতীয় কি তৃতীয় বারের বিবাহ-করা স্ত্রী, সেইজন্যই হয়ত পিতা-পুত্রীতে বয়সের এতটা প্রভেদ। তার মা কোথায়? জীবিত কি মৃত—সে-কথা আমাদের জানা নাই; বাড়ীর বাহিরের লোকে এ-সম্বন্ধে কি বলে না বলে সে-সব কথা আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাই না, তবে কি যেন সব বলে। ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে কোন অভদ্র কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না, নিন্দুকের সংখ্যাও এদেশে একটু বেশী, তাই এ সম্পর্কে কোন কথা আমাদের না তোলাই ভাল; আমরা জানি সর্ব্বাণীর মা নাই। কবে গিয়াছেন, কিসে গিয়াছেন—এই সব কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না, নাই—এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইল; তবে এইটুকুই বলিতে পারি—সে-ঘটনা ঘটিয়াছিল অনেক কাল আগেই, এই সর্ব্বাণী—ষোড়শী সর্ব্বাণী তখন প্রায় শিশু, আর সে-ঘটনা এদেশে থাকিয়াও ঘটে নাই। সে-ঘটনা ঘটিয়াছিল সুরঞ্জনের কর্ম্মভূমিতে সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটা সুপ্রসিদ্ধ সহরে; যে-সহরে এই নিভৃত বঙ্গপল্লী-নিবাসী আজিকার দিনের এই দিন শেষের সীমানা-রেখায় সমুপস্থিতপ্রায় বৃদ্ধ সুরঞ্জন একদিন তাঁর সিবিল জজের কর্ম্মোপলক্ষ্যে কিছু-দিনের জন্যও বসবাস করিয়াছিলেন, যেখানকার সুপ্রশস্ত জাহ্নবীতীরে তাঁর একটি উদ্যান-বেষ্টিত সুন্দর বাংলো-বাড়ী ছিল, যে-বাড়ীখানি তিনি নিজের হাতে মনের মত করিয়া সাজাইয়া নাম দিয়াছিলেন "প্যারাডাইস"; বলা উচিত, তখন ইংরেজীয়ানার দিকেই তাঁর মনটা কিছু বেশী রকম ঝুঁকিয়াছিল, এবং সেই বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই তিনি "প্যারাডাইস-লষ্ট" হন। তারপর তিনি আরজী পাঠাইয়া সে-দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে যান, তারপর আরও কত দেশ-দেশান্তর ঘোরাঘুরি। আজ পাঁচ বৎসর হইল পেনসন লইয়া নিজের পৈত্রিক বাসভূমে—নিজের পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁদের আরও কয়েকজন সরিক ছিল। সুরঞ্জনের জ্যেঠামহাশয়ের পাঁচ ছেলে, পাঁচ বউ, বৃহৎ গোষ্ঠী; এই বাড়ীতেই থাকিত; বাড়ীর অংশ এখন তারা সবাই মিলিয়া সুরঞ্জনের কাছে বেচিয়া দিয়াছে। পিতামহের উইলেই নাকি একথা বলা আছে যে, বাড়ী কোন দিন পাঁচিল তুলিয়া ভাগ করা চলিবে না, একজনকে কিনিয়া লইতে হইবে, বরাবর এ নিয়ম না চলে তো বরং অপর লোককেও বেচায় আপত্তি নাই; কিন্তু এক বাড়ীতে বসিয়া খাওয়া-খাওই করিতে-করিতে এখানে-সেখানে পাঁচিল দিয়া বাড়ীর হাওয়া-বাতাস বন্ধ করা অসহ্য। যিনি এই বাড়ী গাঁথাইয়াছিলেন, মরণের পরেকারও এ-দৃশ্য তাঁর সহ্য হয় নাই।

তাই সুরঞ্জনই আজ এই মস্তবড় বাড়ীটির একমাত্র উত্তরাধিকারী, আর তা' হওয়ার তাঁরই পক্ষে সুবিধা ছিল। এক তো উহারা পাঁচ জনে অর্দ্ধেক, আর তিনি একাই অপর অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেনই, তার উপর মোটা মাহিনার চাকুরী তিনিই করিয়া আসিয়াছেন; এদিকে আবার পোষ্যও কম, হাতে যথেষ্ট নগদ টাকাও ছিল, এঁদের কারও টাকা দিয়া এ-বাড়ী রাখা সম্ভব নয়; বরঞ্চ নগদ টাকা হাতে পাইয়া ছোট-খাট বাড়ী কেনা, অথবা মেয়ের বিয়ের ধার শোধ দিয়া ভাড়া-বাড়ীতে বাস করা—এই রকম যার যেদিক হইতে সুবিধা সেই মতন ব্যবস্থা করিয়া লওয়া—সে ভালই হইয়াছিল। সুরঞ্জন অবশ্য কাহাকেও উঠিয়া যাইতে বলেন নাই, এত বড় বাড়ীটিতে তাঁরা থাকিয়া অনায়াসেই আরও অনেকেই এর মধ্যে বসবাস করিতে পারিতেন, তবে যার যেমন মর্জ্জি! লোকে তো নিজের দিকের সুবিধা-অসুবিধা খতাইয়া দেখিবে! কারও ছেলের পড়ার জন্য সহরে থাকা নেহাৎ দরকার, কারও চাকুরীর খাতিরে শীতবর্ষা-নির্ব্বিশেষে 'ডেলি পেসেঞ্জারী' করিতে করিতে প্রাণ যায়, ঘরের লোকেরও ভোর সকালে উঠিয়া নিত্যই ভাত জোগানোর হুড়াহুড়ি,—তার চাইতে সহরে গিয়া বসাই ভাল, মেয়ে দু'টিও তো ডাগর হইয়া উঠিতেছে, বরের বাজারও কিছু সস্তা হয় নাই, খোঁজ-তল্লাস তো এখন হইতেই করিতে হইবে, এত দূরে বসিয়া সে-সব করে কে? একজন স্পষ্ট বলিলেন, "নিজের ঘরেই আর পরবাসী হ'তে পারব না, দাদা! তার চাইতে ভাড়া দিয়ে থাকব, সে তবু আপন ভাবতে পারব। ভাড়া যদি নাও তো থাকি।"

সুরঞ্জন এ-প্রস্তাবে রাজি হন নাই, হইলেই হইত—তা' হইলে সারা বাড়ীটা ভূতের বাড়ীর মত অমন করিয়া খাঁ খাঁ করিত না; কিন্তু হাজার হউক, হাকিমী মেজাজ, ছোট ভায়ের প্রস্তাবে ঝাঁ করিয়া রক্ত গরম হইয়া গেল। তার আত্মসম্মান-বোধে তুষ্ট না হইয়া এবং রুষ্ট হাস্যে উষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন,—

"বাপ-পিতামোর বাড়ীতে ব'সে তাঁদের রক্ত যাদের গায়ে রয়েছে তাদের কাছ থেকে সেই বাড়ীরই ভাড়া গুণবো, এতটা ছোটলোক বোধ হয় এখনও হ'তে পারিনি। তার চাইতে তুমি না থাক, সেও বরং সইবে।"

ছোট ভাইও সমান মুখে জবাব দিল, "বেশ।" তারপর একদিন শুভদিন দেখিয়া সে সপরিবারে চলিয়া গেল। তার স্ত্রীটি কিন্তু তার চাইতে হিসাবী, বলিল, "ভাসুরঠাকুরের তো ছেলে নেই, কাছে থেকে সেবা-যত্ন করলে হয়ত এর পর এ বাড়ী-ঘর সবই আমাদের নেপালের হ'লেও হ'তে পারত; থাকতে বলছেন, থেকে গেলেই হ'ত না?"

কিন্তু কলিকাতায় নিজের মেজ ভাই-এর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাসা লইলে তাদের নাকি যথেষ্ট সুবিধা হইবে; সেইজন্য সেদিক হইতে বিস্তর প্ররোচনা আসিতেছিল। বুদ্ধি একটু মোটা যাদের তারা দূর ভবিষ্যতের পানে তাকাইতে চায় না, চোখে তাদের 'সর্ট সাইট', কবে কি হইবে বা হইতে পারে, তার জন্য বর্ত্তমানের নূতনত্বের লোভ এবং লাভ সে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। কলিকাতার বাসা ছোট, ঘর সঙ্কীর্ণ, তা হইলই বা! সেখানে রোজ বায়োস্কোপ দেখায় না? হপ্তায় তিনটি দিন থিয়েটার হয় যে! চেষ্টা-চরিত্র করিলে ডিরেক্টার অথবা অভিনেতাদের সম্পর্ক বা নামচেনা সম্পর্ক ধরিয়াও পাশ যোগাড় তো হয়ই, আবার একলা গেলে পয়সাই বা কত লাগে? বরফ, লেমনেড, আইস্‌ক্রিম সোডা, কেক, চপ্‌ কাটলেট কত কি তার হিসাব আছে? দূরতেরি বড় বাড়ী আর তার খাওয়া-খেলা বড় ঘর! শুধু ইট কামড়াইয়া কি চকোলেটের স্বাদ মিলিবে? যার খুসী হয় সে থাকে যেন, তাহার দ্বারা হইবে না। তা ছাড়া কথায় বলে, 'পরভাতি হ'য়ো তবু পরঘরি হ'য়ো না।' এবাড়ী তো সেই পরের ছাড়া কিছুই নয়; এখান হইতে 'দূর' বলিলে তো তখনই দূর হইয়া যাইতে হইবে, না? তা' না গেলেই পুলিশ দিয়া বাহির করিবার ওঁর 'রাইট' নাই নাকি? মনে ভাবে?

যুক্তিগুলি অবশ্য ভালই। বউটি বাক্স গুছাইয়া, বিছানা বাঁধিয়া, ছেলেদের পথে বাহির হওয়ার মত করিয়া কাপড় পরাইল; তারপর নিজের সাজ-গোছ করিয়া লইয়া সর্ব্বাণীকে বলিল, "চল, তোমার বাবাকে প্রণাম ক'রে আসি।"

সর্ব্বাণী সমস্তক্ষণ ম্লানমুখে ছোট-খুড়ির কাছে-কাছে থাকিয়া তার যাওয়ার সাহায্য করিতেছিল, অথচ তারা দু'জনেই জানে, এ চলিয়া-যাওয়ায় তাদের দু'জনকারই মত নাই। মধ্যে-মধ্যে যখন ছুটিছাটায় সর্ব্বাণীরা বাড়ী আসিত, তা' ছাড়া নেপালের ম্যালেরিয়ায় স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য মাসকতক একবার সর্ব্বাণীদের পশ্চিমের বাসায় কাটাইয়া আসাতে এই খুড়িমা'টির সঙ্গে তার বেশ একটুখানি হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। বয়সে দু'জনের তফাৎ ছিল, কিন্তু সে খুব বেশী নয়।

সুরঞ্জনকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "থাক্, থাক্ মা, যখনই কিছু দরকার মনে করবে, সবুকে পত্র লিখে আমায় জানিও।"

বউটি ফিস্‌ফিস্ করিয়া সর্ব্বাণীকে উপলক্ষ্য রাখিয়া কহিল, "সে তো জানাতেই হবে; আমার শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই; আপনাকেই তো জানি, আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে?"

বউটি চলিয়া গেলে সুরঞ্জন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকক্ষণ যেন বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া এক দিক্ পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর যখন পড়িতে পড়িতে নামাইয়া রাখা বইখানা তুলিয়া লইয়া আবার তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন, তখন আরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর নাসারন্ধ্র হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু-তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। এ-লোকটির স্বভাবই যেন এম্‌নি। উচ্ছ্বাস বড় একটা কোন বিষয়েই নাই, অথচ মনের মধ্যে যে বড়-রকমেরই একটা ব্যথা লাগে তা' ঐ উষ্ণ বাষ্পাচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসটুকু হইতেই ধরা পড়ে। সবাই অবশ্য এ'ও জানিতে পারে না, জানে শুধু সর্ব্বাণী। আর তা' জানে বলিয়াই ঐটুকু বাঁচাইয়া চলিবার জন্য চেষ্টাও বুঝি সে বড় কম করে না; অথচ বিধিলিপি কি যে বলবৎ! সেই তাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি না চিরকৌতুক-প্রিয় নির্ম্মম বিধাতা তাঁর জন্য এমনই এক কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন যে, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে পড়িয়া দু'জনকারই প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম হইলেও তার জটিলতার অন্ত হইল না, বুঝি কোনদিনেই তা' হইবেও না। এমনই করিয়া দু'জনকার সঙ্গে দু'জনকে লুকোচুরি-খেলা করিয়াই বুঝি জীবনান্ত করিতে হইবে, অথবা—না; এর কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া মেলে না। গভীর মেঘান্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতই তাদের দু'খানি জীবন-তরণী আজ স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোন্ সুদূরের পথে—কোন্ অনির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে যে তা' বহিয়া চলিয়াছে, তার কি কোন হিসাব আছে? না, না, নাই, নাই—মনে হয় যেন অসীম কালস্রোতে এমনই করিয়া তাদের চিরযুগ-যুগান্তরাবধিই ভাসিতে হইবে, কূল হারাইলে কূলকে আর তারা যেন এই অকূলের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

ফাল্গুন-সন্ধ্যায় আম্রমুকুল চারিদিকে গন্ধ বিলায়, কত মধুলুব্ধ মধুকরকে সে তার যোজনবিসারী মদির সুগন্ধে আমোদিত করিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনে; কাল-বৈশাখীর প্রবল ঝড়ে উর্দ্ধশির তমাল-পিয়ালের উচ্চ শাখা খসিয়া পড়ে, ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গের মরণার্ত্ত উচ্চ রব ঝটিকার ভৈরব গর্জ্জনে ডুবিয়া যায়; বর্ষার জলধারে শুষ্ক তৃণ পুনরঙ্কুরিত হয়; কিন্তু ছন্দোভ্রষ্ট জীবনের হারানো সুরটুকু ফিরিয়া আসে না। ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত তাহা কি চির-বেসুরাই রহিয়া গেল? এমনই করিয়া জীবনের দিন ক্ষয় হইতেছিল ঐ পিতা এবং পুত্রীর, অর্থাৎ সুরঞ্জন এবং সর্ব্বাণীর।

কিসের জন্য? তার অনেকে অনেক রকম অনুমান করে, কোনটাকেই কিন্তু সমীচীন ঠেকে না। কেহ বলে কৃপণ, কেহ বলে অহঙ্কারী, আবার বেশীর-ভাগ লোকেই বলে খেয়ালী। [illegible] হয় যেন এর একটাও না।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ-স্বাস্থ্য

ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

[ডাঃ ডি, এন্, মৈত্র মহাশয়ের নাম ভারতের বহুস্থানে ও য়ুরোপের বহুলোকের মধ্যে সুপরিচিত। তিনি শুধু যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও শল্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক তাহা নহেন; 'বঙ্গীয় সমাজ সেবক সমিতি'র (Bengal Social Service Leagueএর) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধাররূপে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর দ্বারা জনসাধারণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সমাজের যথেষ্ট হিতসাধন করিতেছেন। সম্প্রতি রাশিয়া প্রভৃতি য়ুরোপের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি যে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, আলোক-চিত্র ও চলচ্চিত্র যোগে বক্তৃতা এবং প্রবন্ধাদির দ্বারা তিনি দেশমধ্যে তাহা প্রচার করিতেছেন।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে ডাঃ মৈত্র মহাশয় একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি আমাদের এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। —উঃ সঃ]

প্রথম অধ্যায়

নূতন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

কোনও তথ্য বা তত্ত্বকে একাঙ্গীন বা আংশিক ভাবে দেখিলে তাহার পূর্ণ বা অখণ্ড সত্যরূপটী আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। আর কোনও বিষয়কে যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে দেখি না বলিয়াই আমাদের মতে-মতে হয় বিরোধ, আর প্রচেষ্টাসমূহ হয় না তেমন সার্থক! "অন্ধের হস্তীদর্শন"এর গল্প এদেশে কাহারও নিকট প্রায় অবিদিত নাই। যে 'দেখিয়াছে' কাণ, সে বলিয়াছে হাতী কুলোর মতন; যে ছুঁইয়াছে পা, তার কাছে হাতী থামের মতন, আর হাতী যে এক-গাছি দড়ির মতন সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না তার কাছে, যার হাতে পড়িয়াছে কেবল তা'র লেজ। আমরাও সেইরূপ নিজ-নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের 'নল' বা প্রণালীর ভিতর দিয়া যেটুকু দেখি বা দেখিতে পাই, সেইটুকুই আমাদের কাছে সত্য বোধ হয়, তাহার বাহিরে যেন আর কিছু নাই। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, কোনও বিশেষ সাধনার সময় আমরা অঙ্গ বা ক্ষেত্র বিশেষের উপর দৃষ্টি ও মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণেই প্রয়োগ করি; করিলেও সেই অংশের সহিত পূর্ণের যে যোগ বা সম্বন্ধ, তাহা যদি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি তেমন সম্যক্ ও সমগ্র হয় না, সাধনাও তেমন সিদ্ধ হইতে পারে না।

আদর্শ জীবন

জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক্,

আমরা সকলেই বোধহয় চাই যে আমাদের জীবন সুন্দর হোক্, নিখুঁৎ হোক্ বা সকল দিক দিয়া পূর্ণ হোক্। এইরূপ **সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন** কাহাকে বলি? না, যে জীবন---

সুস্থ—শরীরে ও মনে সমভাবে সুস্থ, পবিত্র ও চরিত্রবান্;

সুখী—জ্ঞানের দ্বারা আত্মজয়ে ও প্রেমে স্বার্থত্যাগের দ্বারা সুখকে আয়ত্ত্বাধীন করিয়াছে;

কর্ম্মশীল (ও কর্ম্মঠ)—সেবায় ও দানে—যে সেবা মানুষ ও সমাজকে গড়িয়া তুলিতে চায়; যে দান কেবল অর্থের নয়—জ্ঞানের, ভাবের এবং চিন্তারও;

ও দীর্ঘায়ু—জীবন্মৃত ভাবে নয়—সজীব ও সক্রিয় অবস্থায়।

আদর্শ জীবনের ইহাই যদি সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই সকল সংজ্ঞার মূলেই স্বাস্থ্য। শরীর ও মনে সুস্থ না হইলে মানুষ সুখী হইতে পারে না, কর্ম্মরত হইতে পারে না, দীর্ঘজীবীও হয় না।

শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বারংবার বলিতেছি এই জন্যই যে, দৈহিক স্বাস্থ্যের সহিত মনের স্বাস্থ্যের যোগ না হইলে স্বাস্থ্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এই মানসিক স্বাস্থ্যের কথা পরে আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্য ও জাতীয় প্রগতি

বহুলোকে বহুদেশে বহুকালে বহুবার এই কথাই বহুপ্রকারে বলিয়া আসিয়াছেন যে, **স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নহে।** আজ আমরা জাতীয় প্রগতির বিরাট অভিযানের পথে সকলে জাগ্রত ও প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রা-পথের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করিয়া সঙ্গে লইতেছি?

একটী ছোট গল্প মনে পড়িল। মাঘের শীত; ভোর বেলা; ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় নদীর গা শিহরিত; একখানি নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার ধারে এক তিনতলা বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া বাবু বালাপোষ মুড়ি দিয়া ফুঁ দিয়া-দিয়া গরম-গরম চা পান করিতেছেন। হালের মাঝি বসিয়া-বসিয়া শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে দাঁড়ীকে বলিতেছে, "বড় সখ হয়, অমনি ক'রে ব'সে কোনও একদিন গরম-গরম চা ফুঁ দিয়ে-দিয়ে খাই!" দাঁড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী সম্বল আছে যে অমন কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে গরমে ব'সে চা খাবে?" উত্তরে মাঝি বলিল, "কেন ভাই, আছে সখ আর ফুঁ।"

এই দীর্ঘ সংগ্রামের পথে আমাদের পাথেয় হইবে কি কেবল মাত্র ইচ্ছা ও উচ্ছ্বাস? না, স্বাস্থ্যকেই প্রধান পাথেয় করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী সকলকেই সমভাবে এই পাথেয় সংগ্রহে সচেষ্ট ও তৎপর হইতে হইবে; এই স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সাধনে একান্ত ভাবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আদর্শ-স্বাস্থ্যের লক্ষণ

(ক) শারীরিক

এখন, স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝি? স্বাস্থ্যের আদর্শ কি? স্বাস্থ্যবান্ বা সুস্থ মানুষের লক্ষণ কি? আদর্শের দিক দিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ছয়টী।

১। **রোগহীনতা।** দেখিতে এমনি কোনও রোগ নাই, শুধু তাহা নহে; উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা যদি দেখিতে পাই যে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, ইন্দ্রিয় ঠিক আছে ও ঠিক চলিতেছে, তবেই শরীরকে রোগহীন বলা যাইতে পারে।

২। শুধু রোগহীনতাও নয়, **রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা** থাকা চাই। স্বাস্থ্যের ইহাই এক প্রধান লক্ষণ। একই স্থানে, একই আবহাওয়ায় ও আবেষ্টনের মধ্যে একজন সহজেই রোগের **বীজ** দ্বারা আক্রান্ত হয়, আর একজন হয় না; কাহারও সহজেই 'ঠাণ্ডা লাগে', কাহারও লাগে না;—এই সকলের মূলে দেহের **জমির** কথা। যেমন ভিন্ন

ভিন্ন গাছের বিভিন্ন বীজ আছে, সেইরূপ বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বীজাণু বা জীবাণু আছে। বৃক্ষের বীজ যেমন সকল জমিতে সমভাবে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ রোগবীজাণুসমূহ, যাহারা অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত, তাহারা সকল শরীরেই সহজে "দাঁত বসাইতে" বা "শিকড় গাড়িতে" পারে না। যাহার রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কম, তাহারই শরীর মধ্যে রোগবীজাণু সহজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; রোগ ফুটিয়া উঠে।

৩। স্বাস্থ্যের তৃতীয় লক্ষণ, **শক্তি**। পেশীসমূহের শক্তি। শুধু হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গাদির নয়, সকল ভিতরের ও বহিরিন্দ্রিয়েরও। শক্তি বলিতে সাধারণতঃ কোনও পেশী বা পেশীসমূহের এককালীন বলপ্রয়োগেরই ক্ষমতা বুঝায়। একজন কত মণ ভারী বোঝা তুলিতে পারে, বা, আর একজনকে কি পরিমাণে টানিয়া বা ঠেলিয়া পরাস্ত করিতে পারে, প্রশ্বাস-ক্রিয়াসংসৃষ্ট পেশীসমূহের বা 'ফুঁ'-এর বা ফুসফুসের জোর কত বেশী, ইত্যাদি ক্রিয়ায় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির পেশীসমূহ খুব মাংসল ও শক্ত, বা যে তাহাদের খুব নাচাইতে-খেলাইতে পারে, সে ব্যক্তি উল্লিখিত প্রথম দুই লক্ষণে হীন হইতে তো পারেই, এমন কি বহুক্ষণ ধরিয়া পরিশ্রম করিতেও হয়ত বা অসমর্থ। অতএব স্বাস্থ্যের আর একটী লক্ষণ হইতেছে—**সামর্থ্য** অর্থাৎ বহুক্ষণব্যাপী অক্লান্তভাবে পেশীসমূহের কর্ম্ম-ক্ষমতা (পরিশ্রম)। যথা, একজন কত মাইল একটানায় হাঁটিতে বা দৌড়াইতে বা কতক্ষণ সাঁতার দিতে পারে; কত উঁচু পাহাড়ে উঠিতে বা কতক্ষণ দাঁড় টানিতে পারে, ইত্যাদি।

৫। যে মানুষ বা জাতি স্বাস্থ্যে আদর্শ হইবে, তাহার এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার সঙ্গেই আরও হওয়া চাই—সুশ্রী, দীর্ঘায়তন, **অঙ্গাদির গঠনে সুপরিমিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন**। আমরা যেন গৌরব করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী জাতি, দেহের আয়তন ও গঠনের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবে, শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে কেন, পৃথিবীর মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারী।

৬। আদর্শ স্বাস্থ্যের আর একটী লক্ষণঃ— **স্বাস্থ্যস্ফূর্ত্তিবোধ**। ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় Vital surplus। যে ব্যক্তির 'যত্র আয় তত্র ব্যয়', সময়-অসময়ের জন্য হাতে দু'পয়সাও থাকে না, তাহাকে যেমন ঠিক সঙ্গতিসম্পন্ন বা স্বচ্ছলাবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলা যায় না, সেইরূপ প্রকৃত সুস্থ ও সামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের কিছু মূলধন থাকা আবশ্যক। ঘরে আসিলে বা সাক্ষাৎ হইলে যেন দেখিতে পাই, সে ব্যক্তি হইতে স্বাস্থ্যের ও শক্তির একটী আভা বা প্রভাব স্ফুরিত ও বিকীর্ণ হইতেছে। সে-সংস্পর্শ অন্যকেও সতেজ ও সক্রিয় করিয়া তোলে।

(খ) মানসিক স্বাস্থ্য

আদর্শ শারীরিক স্বাস্থ্যের এই যে ষড়বিধ গুণলক্ষণ, যথা, রোগহীনতা, শক্তি, সামর্থ্য, রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যস্ফূর্ত্তিবোধ—ঠিক্ এইগুলিকেই আবার মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

শরীর ও মন এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, একের প্রভাব অন্যের উপরে এতই বেশী যে, বর্ত্তমান জটিল, চঞ্চল, কর্ম্মবহুল, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিপ্রবণ জীবনযাত্রার দিনে, ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত, বুদ্ধিকে স্থির, বিচারকে ন্যায়সঙ্গত ও মনকে অপরের দিকটাও বুঝিবার ক্ষমতাপন্ন করিতে হইলে মানসিক স্বাস্থ্যের একান্ত আবশ্যক; নিজে সুখী হইতে হইলে এবং পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি লাভের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা অপেক্ষা কোনও অংশে কম প্রয়োজনীয় নহে।

এখন ঐ ষড়বিধ লক্ষণ মিলাইয়া দেখা যা'ক। যিনি আদর্শ সুস্থ ব্যক্তি হইবেন—(১) তাঁহার মধ্যে কাম

ক্রোধ, লোভ, হিংসার আধিক্য থাকিবে না ; তিনি নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, মিথ্যাপরায়ণতা প্রভৃতি **মানসিক রোগ বর্জ্জিত** হইবেন।

(২) শুধু তাহা নহে, (ধর্ম্ম) সাধনা দ্বারা তাঁহার মনকে এরূপ সজীব ও দৃঢ় করিয়া রাখিতে হইবে যে, নানা প্রকার রিপুর বীজ তাঁহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তাঁহার **রিপু-প্রতিষেধক ক্ষমতা** থাকিবে।

(৩) শোকে, বিপদে, লোভে, উত্তেজনায় ও প্রলোভনে তাঁহার মনের **শক্তি** তাঁহাকে স্থির ও সংযত রাখিবে।

(৪) আবার সেই সঙ্গে কোনও একটা কাজে হাত দিলে তাহা ধরিয়া থাকা, তাহাকে সার্থক করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা, বা দুঃখ ও দারিদ্র্য, অপবাদ, অবহেলা অসহানুভূতি, বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার ধৈর্য্য বা **সামর্থ্য** থাকা চাই।

(৫) দয়া-দাক্ষিণ্যে, সৌজন্য-ভদ্রতায়, সহানুভূতি ও ব্যবহারের মিষ্টতায় ও সংযমে চরিত্র **সুন্দর ও মধুর** হইবে।

(৬) ষষ্ঠতঃ তাঁহার চিত্তের **প্রফুল্লতা ও উৎসাহস্ফূর্ত্তির** মূলধন তাঁহাকে অসময়ে রক্ষা করিবে ও তাঁহার চারিদিকে ব্যাপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া সকলের মনকে উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করিবে।

এই হইল **ব্যক্তিগত** পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যের রূপ।

স্বাস্থ্যের ব্যাপক রূপ

এই স্বাস্থ্য দেখিতে চাই প্রতি ঘরে ও **পরিবারে**—শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগের মিষ্টতায় ও নিঃস্বার্থতায় ; সময় ও নিয়মের অনুবর্ত্তিতায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও ঘরের জিনিষপত্রের সাজানো-গোছানয় ; আনন্দের মধ্যে ও পরস্পরকে সর্ব্বদা বুঝিবার চেষ্টায়।

এই স্বাস্থ্য দেখিতে চাই **সমাজে**,—একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতায়, বিশ্বাসযোগ্যতায়, চরিত্রে—অর্থাৎ খাঁটী হওয়ায়, বা মনে, কথায় ও কার্য্যে এক হওয়ায়, সত্য ব্যবহারে ও বাক্য-রক্ষায় ; দুর্নীতি সকলের সংস্কার-চেষ্টায় ; অপরের দিক্‌টা বুঝিবার ক্ষমতায় ও অপরের কুৎসা-রটানোর কু-প্রবৃত্তি হইতে আত্মসংযমে ; ও দেশহিত ও লোকহিতব্রতে ব্রতী হওয়ায়।

রাষ্ট্রেও এই স্বাস্থ্যের প্রকাশ,—নিন্দা-প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তখন তাহাই ধরিয়া থাকায়, সুবিধা ও প্রলোভনের পাকে ও প্রভাবে আত্মবিক্রয় বা মতপরিবর্ত্তনে নয় ; নিঃস্বার্থতায়, ধর্ম্মবুদ্ধিতে ও বিপদে অপরের দিক্‌টাও বুঝিবার চেষ্টায় এবং দেশ ও লোকহিত ব্রতে।

এক কথায়

যিনি আদর্শ সুস্থ ব্যক্তি হইবেন, তিনি আদর্শ জীবনের রূপ সম্মুখে রাখিয়া নিজ দেহ ও মনে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সুস্থ হইতে সচেষ্ট ও সক্রিয় হইবেন তো বটেই ; তদুপরি ও তৎসঙ্গে, তাঁহার এই সাধনা ও প্রভাব পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দেশকে সুস্থ, সমর্থ, সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

ইহা যেন কি নারী, কি পুরুষ আমাদের প্রত্যেকের সাধনার বস্তু হয়।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

[কি করিলে এই স্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা হয় পরের প্রবন্ধাদিতে তাহার সচিত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

অরুণোদয়

(উপন্যাস)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সেদিন রবিবার।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। কলে জল ভরিয়া সংসারের ছোট-খাটো কাজকর্ম্ম সারিয়া দেওয়ালে-টাঙানো আর্শীটির সুমুখে দাঁড়াইয়া নারায়ণী তাহার চুল আঁচড়াইতেছিল। কালো কোঁকড়ানো একপিঠ চুল। দেহের সৌন্দর্য্য তাহার ম্লান হইয়াছে সত্য, কিন্তু চুলের সৌন্দর্য্য যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ফিরিয়া ফিরিয়া একাকিনী ঘরের মধ্যে নারায়ণী তাহার নিজের চুল নিজেই দেখিতেছে, আর বহুকাল পূর্ব্বে কবে একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী তাহার এই চুলেরই প্রশংসা করিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িতেছে।

কাল হইতে বীরেন বাড়ী ফিরে নাই, আজ রাত্রে সে নিশ্চয়ই ফিরিবে। নারায়ণী তাই চুল বাঁধিয়া সাজিতে বসিল।

এমন সময় মাসি ডাকিল, 'বৌমা!'

চিরুণী হাতে লইয়াই নারায়ণী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমায় ডাক্‌ছেন, মা?'

'হ্যাঁ, মা, ডাকছি। বীরেন কি এখনও আসেনি, বৌমা?'

নারায়ণী একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'না।'

মাসি বলিল, 'প্রায়ই ত' দেখি সে শনিবার রাত্তিরে আসে না, রবিবার আসে না, কোথায় থাকে সে?'

নারায়ণী মহাবিপদে পড়িল। কোথায় থাকে সে জানে না। এত চেষ্টা করিয়াও তাহা সে আজও জানিতে পারে নাই। কিন্তু যা হোক্ কিছু একটা তাহাকে বলিতেই হইবে। না বলিলে মাসি যাহা ভাবিবে তাহা বিশেষ গৌরবের নয়, অথচ মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে গেলেই কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসে। শেষ পর্য্যন্ত কি আর করে, জবাব তাহাকে দিতেই হয়।

নারায়ণী বলে, 'হপ্তার মধ্যে ওই এক রবিবারটি ছাড়া ত' আর ছুটি পায় না, মা, তাই ওরা সব বন্ধুবান্ধব মিলে শনিবার রাত্তিরটা খায়-দায় আমোদ-আহ্লাদ করে, রবিবার দিনের বেলাটা সেইখানেই ঘুমিয়ে কাটায়। টাকা টাকা ক'রে...আপিসের খাটুনি খেটে খেটে...আমি বলি...'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মাসি আগাইয়া আসে। বলে, 'না বাছা, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ। বীরেনের ভাব-গতিক দেখে আমার ত' ভাল ব'লে মনে হয় না।'

নারায়ণী হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করে। বলে, 'না, মা, সে-সব কিছু নয় আমি জানি। স্বভাব-চরিত্তির খুব ভাল।'

মাসি বলে, 'ভাল হ'লে তোমারই ভাল, মা, আমি তোমার জন্যেই বলছি।'

এই বলিয়া দেবুকে সেইখানে নামাইয়া দিয়া মাসি চলিয়া যাইতেছিল, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ওকে কি জন্যে খুঁজছিলেন, মা?'

'কি জন্যে?' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাসি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এখনও বুঝ্‌তে পারিস্‌নি, বোকা মেয়ে? দু'মাস হ'য়ে গেল, ভাড়ার দরুন্ একটা পয়সাও আমি এখনও পাইনি। এইবার ছেলের কাছে কিছু চাইব, বাছা, আর আমি পার্‌ছিনি, বড় টানাটানি পড়েছে।'

নারায়ণী একটুখানি লজ্জিত হইয়া উঠিল। দু'মাস কি তাহারও বেশি তাহারা এখানে আসিয়াছে, অথচ ভাড়ার দরুন্ মাসিকে কিছুই এখনও দেওয়া হয় নাই। লজ্জিত হইবারই কথা। বলিল, 'আজ এলেই আমি ওর কাছে চেয়ে রাখ্‌ব, মা।'

মাসি বলিল, 'আমার হ'য়ে তুই কেন চাইবি, বাছা? বীরেন এলে আমায় জানাস্, আমি নিজেই চেয়ে নেবো।'

'দু'মাসে আপনার কত টাকা হয়েছে, মা?'

মাসি বলিল, 'আমি কি আর বাড়ীভাড়া কখনও দিয়েছি, বাছা, যে জান্‌ব কত হয়েছে! ছেলে আমার যা দেবে তাই আমি হাত পেতে নেবো।'

কলিকাতা শহরে একটির পর একটি অনেক বাড়ীতেই তাহারা ভাড়া দিয়া বাস করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাড়ীর মালিকের মুখে এমন কথা সে কখনও শোনে নাই। ভাড়াটে যাহা দিবে হাত পাতিয়া তাহাই লওয়া দূরে থাক্, পুরা ভাড়ার একটি পাই-পয়সা কম হইলে কিংবা ভাড়া দিতে দু'চারদিন দেরি হইয়া গেলে অনেক বাড়ীওয়ালার অনেক অপমান স্বামীকে তাহার নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। যাই হোক, নারায়ণী ভাবিল, এতদিন পরে ভগবান বোধকরি তাহাদের দিকে একটুখানি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সেদিন তাহার আর ভাল করিয়া চুল বাঁধা হইল না। চুলগুলা কোনো রকমে এলো খোঁপা করিয়া পিন দিয়া আট্‌কাইয়া, সিঁথিতে সিঁদুর লইয়া সে কলতলায় গা ধুইতে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ভাল একখানি কাপড় পরিয়া জামা গায়ে দিয়া আর্শীর সুমুখে দাঁড়াইয়া মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া কি যেন একটা গান গাহিতে গাহিতে সে তাহার কপালে সিঁদুর-কোটা লইতেছে, এমন সময় বাহিরে সদর দরজার কাছে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। যাক্, আজ সে ঠিক সময়েই আসিয়াছে! সিঁদুরভর্তি ছোট হোমিওপ্যাথী ঔষধের শিশিটি সে তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গেল। শুনিল, স্বামী তাহার গান গাহিতে গাহিতে ঘরে ঢুকিতেছে—

'আজ ফাগুনের প্রথম দিনে—'

সেইখান হইতেই হাতের ইসারায় নারায়ণী তাহাকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিল।

কাছে আসিয়াই বীরেন তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কেন? চুপ কর্‌ব কেন শুনি?'

পা টলিতেছে, কথা জড়াইয়া যাইতেছে, সর্ব্বনাশ! মদ খাইয়া আসিয়াছে।

ঘরে একটা সস্তা টিনের চেয়ার ছিল, তাহারই উপর নারায়ণী তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, 'ওগো চুপ করো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। মা এক্ষুনি ভাড়া চাইতে আস্‌বে।'

'ভাড়া! অল্ রাইট্! মাইনে পেলে বীরেন গাঙ্গুলী লাট সায়েবকে খাতির করে না, তা জানো?' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার পকেট হইতে দশটাকার একখানি নোট বাহির করিয়া নারায়ণীর হাতে দিয়া বলিল, 'আজ এই দশ টাকা দাও, বাকিটা এর পর দেবো। মাসে কত করে' দিতে হবে? পনেরো টাকা —না?'

নারায়ণী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল, 'না গো না, দশটাকা করে' দিলেই হবে। তোমায় জিজ্ঞেস করলে বলো—এর বেশি আমি আর দিতে পার্‌ব না, মা, কোথায় পাব বলুন!—কেমন? উনি বড় ভাল মানুষ, এমন মানুষ আর হয় না।'

এই বলিয়াই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি একটু চুপ করে' বোসো, আমি এই টাকাটা দিয়ে আসি আর খোকাকে নিয়ে আসি।—আর ত্থাখো, তুমি এই যে মদ-টদ খাও, একথা উনি যেন না জান্‌তে পারেন। বুঝ্‌লে?'

টাকা দিবার জন্য নারায়ণী বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল, মাসি নিজেই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—'কই বাবা বীরেন, আমার—'

নারায়ণী কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না, ছুটিয়া একেবারে দরজার কাছে আসিয়া দশটাকার নোটখানি মাসির হাতে একরকম গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'এই যে, মা, উনি ঠিক ক'রেই রেখেছিলেন।'

বীরেনের কিন্তু ওদিকে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিল না। টলিতে টলিতে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বোধকরি মাসির কাছেই আগাইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'মাসির চারটি পায়ের ধুলো আজ আমি নেবোই।'

কিন্তু মাসির কাছ পর্য্যন্ত তাহাকে আর পৌছিতে হইল না। নারায়ণী তাহার পূর্ব্বেই ভয়ে লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়া কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে ঠিক ছেলেমানুষের মত ঘরের দরজাটা মাসির মুখের উপরেই হড়াম্ করিয়া দু'হাত দিয়া বন্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা মাসিও প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকি লা! দরজা বন্ধ কর্‌লি কেন?'

কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই সে বুঝিল, কেন বন্ধ করিয়াছে; এবং বুঝিবামাত্র মাসি আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বলিয়া উঠিল, 'যাই, বাবা, যাই!'

বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। এমন ভাণ করিল যেন দেবু তাহাকে ডাকিতেছে।

এদিকে ঘরের মধ্যে নারায়ণী তখন দরজার গায়ে পিঠ রাখিয়া লজ্জায় ঘামিয়া উঠিয়া রাগে দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'তুমি মদ খাও, রাত্রে বাড়ী ফেরো না এ-কথা কি তোমার না জানালেই চল্‌ছিল না? তোমায়-না আমি চুপ করে' বসে' থাক্‌তে বললাম!'

বীরেন বলিল, 'তাতে হয়েছে কি?'

নারায়ণীর চোখ দুইটা ছলছল করিয়া আসিল।—'তোমার কিছু হয়নি, কিন্তু আমার—' বলিতে গিয়া নাচেকার ঠোঁটটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

বীরেন হাসিতে লাগিল।—'ও কি তোমায় কিছু দেবে ভেবেছ, না কী? ও কেউ কিছু দেয় না, বাবা, আমার জান্‌তে কিছু বাকী নেই। এই বয়সে অনেক দেখ্‌লাম।'

স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া নারায়ণী রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'হাস্‌ছ কোন্ লজ্জায়! হাস্‌তে তোমার লজ্জা করে না?'

'ওরে বাবা! এ যে এখানে এসে কথা ফুটল দেখ্‌ছি।'

নারায়ণী বলিল, 'তা মানুষ আর কতদিন চুপ করে' থাক্‌বে শুনি!'

গম্ভীর কণ্ঠে বীরেন কহিল, 'তাই বলে' তুমি কি আমায় শাসন কর্‌বে নাকি?'

নারায়ণী যাহা কখনও বলে নাই তাহাই সে আজ বলিয়া ফেলিল। বলিল, 'হ্যাঁ করব এবার থেকে।'

ঠাস্ করিয়া বীরেন তাহার গালের উপর সজোরে এক চড় মারিয়া বসিল। বলিল, 'চোপ্ রও!'

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গালে হাত দিয়া নারায়ণী সরিয়া দাঁড়াইতেই দরজাটা খুলিবার জন্য বীরেন হাত বাড়াইল। রাগ করিয়া বোধকরি সে পুনরায় বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থাই করিতেছিল, কিন্তু পিছনে টান পড়িতেই ফিরিয়া দেখিল, নারায়ণী তাহার জামার একপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়াছে। মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

সেই একটা গল্প আছে—কোনও এক ভদ্রলোকের অবস্থা খারাপ হইয়া যাইতেই একদিন সে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী চুরি করিতেছিল। বন্ধুর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, ভদ্রলোক তাহার আলমারি খুলিয়া মনিব্যাগ বাহির করিয়াছে। চোর-বন্ধু পাছে লজ্জিত হয় ভাবিয়া নিরতিশয় লজ্জায় গৃহস্থ বন্ধু তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল।

যে চুরি করিতেছে তাহার লজ্জা হইল না, যাহার চুরি করিতেছে লজ্জা হইল তাহার।

মাসির অবস্থা হইয়াছে ঠিক সেই রকম।

পরদিন হইতে মাসি আর লজ্জায় নারায়ণীর সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, এমন ভাবে দেবুকে লইয়া চোরের মত পাশ কাটিয়া কাটিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—দেখিয়া মনে হয় যেন সে নারায়ণীর কাছে কতই না অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এক ঘরে ঘর করিতে গেলে এমন চুরি করিয়া বেশিক্ষণ লুকাইয়া থাকা চলে না। একসময় তাহাকে ধরা পড়িতেই হয়।

হইলও তাই।

ছেলেটা অনেকক্ষণ হইতে বায়না ধরিয়াছিল—বৌমার কাছে যাইবে।

মাসি বলিতেছিল, 'যা না, বাপু, কচি ছেলে ত' নোস্, যা না!'

কিন্তু দেবু জিদ ধরিয়া বসিয়াছে,—'না তুমি দিয়ে আস্‌বে চলো।'

মাসি তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম করিয়া বুঝাইল, বলিল, 'এই ত' বাপু তোকে আমার মানুষ করার লাভ! আমার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, মা'র কাছে যাবার জন্যে ঝোঁক্ ধরেছিস্, তা বেশ ত' যা না, আমি ত' আর ধরে' রাখিনি তোকে।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ পর্য্যন্ত দেবুকে দিয়া আসিবার জন্য মাসিকে নীচে নামিতে হইল। ভাবিয়াছিল, সিঁড়ির নীচে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আসিবে, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নারায়ণী যাইতেছিল কলঘরে বোধকরি জল আনিবার জন্য, মাসির সঙ্গে তাহার চোখোচোখি দেখা হইতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাসিও একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া একটা ঢোক গিলিয়া একবার ইতস্ততঃ করিয়া দেবুকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'এই নে, মা, তোর ছেলে নে। মা'র কাছে আস্‌বার জন্যে ঝোঁক্ ধরেছে সেই কখন্ থেকে তার ঠিক নেই। তাই ত' বলি বাছা পরের ছেলে ভালবাস্‌লেই কি আর আপন হয় কখনও!'

দেবু ছুটিয়া মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী বলিল, 'কেন রে, থাক্ না গিয়ে মা'র কাছে। আমি ততক্ষণ আমার কাজগুলো সেরে নিই।'

কিন্তু ছেলে তাহার আঁচলের কাপড়টা টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মাসির কাছে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। নারায়ণী লজ্জিত হইয়া উঠিল। এ যেন তাহার মস্ত অপরাধ। তাই সে ছেলের হইয়া কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মাসির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'ও! বুঝেছি ও কেন এমন কর্‌ছে, মা। আজ সকালে ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছিলাম, সেই সময় কোত্থেকে ও ছুটতে ছুটতে এসে আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। ঝাঁপিয়ে পড়ে' এমন বিরক্ত কর্‌তে লাগ্‌ল যে, খুব জোরে একটা চড় মেরে দিলাম ওকে কাঁদিয়ে বিদেয় করে'। বল্‌লাম এমন যদি কর্‌বি ত' আমায় আর দেখ্‌তে পাবি না, যাব কোন্ দিক দিয়ে পালিয়ে। সেই থেকে ও আপনার কাছেই ছিল। তারপর এতক্ষণ পরে হঠাৎ হয়ত আমার কথা ওর মনে পড়েছে। তা নইলে কেন থাক্‌বে না, মা, আপনার কাছে ত' ও বেশ থাকে।'

যাক্, দেবুর কল্যাণে লজ্জাটা তাহাদের কাটিয়া গেল। নারায়ণী ভাবিল তাহার স্বামীর মদ খাওয়ার ব্যাপারটা মাসি বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই, পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে কে জানে।

দিনকয়েক পরে, আপিস হইতে বীরেন সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই বলিল, 'ওগো শুন্‌ছ?'

নারায়ণী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবু কোথায়?'

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাও ভাল। আজ এসেই যে ছেলের খোঁজ পড়্‌ল, কেন?'

'বাড়ীউলী বুড়ীর কাছে আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেইখানেই ত' থাকে।'

বীরেন বলিল, 'থাকে ত' বুঝলাম। কিন্তু বুড়ীর মতলবটা কিরকম বুঝছ বল দেখি? বাড়ীটা ত' বুড়ীর নিজের, এছাড়া টাকাকড়ি কিছু আছে বলতে পার?'

নারায়ণী বলিল, 'তা আমি কেমন করে' জানব?'

বীরেন বলিল, 'একেবারে নীরেট বোকা মেয়ে কিনা! চালাক মেয়ে হ'লে বুড়ীর নাড়ী-নক্ষত্র এতদিন সে জেনে নিতে পারত।'

নারায়ণী বলিল, 'তা বাপু আমি পারি না। তাতে তুমি আমাকে বোকাই বল আর যাই বল।'

'হঁ' বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বীরেন কি যেন ভাবিতে লাগিল।

নারায়ণী বলিল, 'কিন্তু বড় ভাল মানুষ উনি। খোকাকে আমাদের সত্যিই ভালবাসেন।'

বীরেন বলিল, 'ন্যাখো ওরকম শুক্‌নো ভালবাসার কোন দাম নেই। দেবুর নামে এই বাড়ীখানা লিখে দিতে পারে যদি ত' বুঝি—হ্যাঁ ভালবাসে।—দাঁড়াও, মুখ ফুটে একদিন ব'লেই ফেলব।'

নারায়ণী হাতজোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই তোমার, তা যেন কোনদিন বোলো না। ছি!'

'বা-রে! কুলীন বামুনের ছেলে, বুড়ীর ধম্ম হবে কত!'

নারায়ণী বলিল, 'তার ধম্ম তোমায় দেখতে হ'বে না। থাক্‌, দেবুকে ডাকব? খুঁজছিলে যে? আচ্ছা বাপ হয়েছ কিন্তু। ছেলেকে একবার আদরও কর না! অথচ তোমার অমন ছেলে—দেশগুনিয়ার লোক কত আদর করে' যায়।'

এই বলিয়া বোধকরি সে দেবুকে ডাকিবার জন্যই বাহির হইয়া যাইতেছিল, বীরেন বলিল, 'দাঁড়াও, তোমায় আজ একটা সুখবর দেবো।'

সুখবরের নামে নারায়ণী খুশী হইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি খবর গো?'

বীরেন বলিল, 'দেবুর জন্যে কিছু করলে না করলে না বল, তাই আজ একটা 'লাইফ্‌ ইন্‌সিওর' করে' এলাম।'

লাইফ্‌ ইন্‌সিওর ব্যাপারটা কি নারায়ণী তাহা জানে না। বলিল, 'সে আবার কি?'

'তাও জানো না?' বলিয়া বীরেন তাহাকে লাইফ্‌ ইন্‌সিওরের মানে বুঝাইতে বসিল। বলিল, 'এখন মাসে মাসে কিছু কিছু করে' টাকা আমি কোম্পানীকে দিয়ে যাব, তারপর আমি মারা গেলে দেবু এক হাজার টাকা পাবে। এই মাসের মধ্যে যদি মারা যাই তাহ'লেও পাবে।'

বীরেন ভাবিয়াছিল খবরটা শুনিয়া নারায়ণী উল্লসিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বীরেন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'খুশী হ'লে না?'

নারায়ণী বলিল, 'না বাপু, ও-সব কেন তুমি করতে গেলে বলত'? তোমার ওই মন্দ চেয়ে বসে' থাকতে হবে? না না না না, তুমিই যদি না থাকলে ত' টাকা পেয়ে কি হবে?'

বীরেন বলিল, 'আরে তখনই ত' টাকার দরকার। এখন ত' আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেমন করে' হোক্‌—'

কথাটা নারায়ণী তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'থামো বাপু, চুপ কর। ও-সব কথা আমার ভাল লাগে না। হে মা কালী, হে ভগবান!'

বলিয়া সে তাহার হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'তার আগেই যেন আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে চলে' যেতে পারি।—বোসো, ডাকি দেবুকে।'

'শোনো, শোনো।'

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছি কে জানে। এত ভাল করে' কথা ত' তুমি কোনদিনই বল না।'

বীরেন বলিল, 'শোনো, আরও ভাল কথা আছে। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—মদ আমি আর খাব না।'

এতক্ষণ পরে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'সত্যি বলছ?'

ঘাড় নাড়িয়া বীরেন বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি বল্‌ছি।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এমনি তুমি ও-বাড়ীতে থাক্‌তে আর-একবার বলেছিলে।'

'এবার কিন্তু এই তোমার গা ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া বীরেন নারায়ণীর হাতখানা স্পর্শ করিল।

নারায়ণী বলিল, 'দেবুর গা ছুঁয়ে বল্‌তে পার?'

'কেন পার্‌ব না? আনো তাকে।'

দেবুকে আনিবার জন্য নারায়ণী অনেকক্ষণ হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এইবার বীরেনও তাহাকে আর বাধা দিল না।

কিন্তু উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াই নারায়ণীর মনে হইল, না, কাজ নাই তাহার ছেলের গায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া। ঝোঁকের মাথায় হয়ত আজ সে তাহাই করিবে, কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই আবার হয়ত সে তাহার শপথের কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া খুব খানিকটা মদ গিলিয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ঢুকিবে। তাহার চেয়ে মুখে বলিতেছে সেই ভাল, তাহার গায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়াছে সেই ভাল, ইহার মধ্যে ছেলেকে আর টানিয়া আনিয়া লাভ নাই। গায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া সে-শপথ রাখিতে না পারিলে না জানি ছেলের হয়ত অমঙ্গল ঘটিতেও পারে।

স্বামী আজ তাহার অনেকদিন পরে এমন ভাল করিয়া কথা বলিতেছে, ছেলের জন্য কি-সব এক হাজার টাকার করিয়া আসিয়াছে, মদ খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে—ব্যাপার কি!

ব্যাপার যাই হোক্‌, নারায়ণীর মুখে আজ হাসি ফুটিয়াছে। সে-হাসির মধ্যে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাও যে নাই তাহা নয়, তবে হাসিতে যাহাকে বড় একটা দেখা যায় না, দুঃখ-দুর্ভাবনা লইয়াই যাহার জীবন কাটে, ওই একটুখানি হাসিতেও তাহাকে বড় সুন্দর দেখায়।

মাসি তাই তাহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'কিরে, আজ যে বড় তোর হাসি-হাসি মুখ?'

নারায়ণী বলিল, 'কেন, মা, আমায় কি হাস্‌তে নেই?'

মাসি বলিল, 'ছি বাছা, ও কি কথা! কেন হাস্‌বিনি, মা, এই ত' তোদের হাস্‌বার বয়েস। হেসে খেলে আনন্দ করে' ছুটিতে ফূর্তি করে' থাক্‌বি,—আমাদের দেখে কত সুখ হবে।'

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবু কোথায় মা, কই তাকে ত' দেখ্‌ছিনি।'

মাসি একবার চোখ টিপিয়া ইসারায় খাটের নীচেটা দেখাইয়া দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, 'কই, মা, অনেকক্ষণ তাকে দেখ্‌তে ত' পাচ্ছিনি। আমার পর্‌বার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, বল্‌লে, দাও দু'আনা পয়সা, বাজার থেকে নিয়ে আসি। তাই বোধ হয় বাজার থেকে সে কাপড় আন্‌তে গেছে।'

রহস্যটা নারায়ণী বুঝিল। বুঝিয়াও তাহা ফাঁস না করিয়া সেও তেমনি গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, 'আমারও ত' কাপড় ছিঁড়েছে, মা, আমারও পর্‌বার কাপড় নেই। কি যে করি তাই ভাব্‌ছি।'

দেবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, 'আমি এনে দেবো।'

'এই যে আমার দেবু গো! কোথায় গিয়েছিলে, বাবা? কাপড় আন্‌তে?'

'না, যাইনি এখনও, যাব।' বলিয়া সে তাহার হাতের মুঠা খুলিয়া সত্য-সত্যই একটি দু'আনি দেখাইল। বলিল, 'তুমিও দাও। তোমারও এনে দেবো।'

নারায়ণী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দেবুকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'আমি পয়সা কোথায় পাব, বাবা, আমার ত' পয়সা নেই। আমার কাপড়ের দাম তোমাকেই দিতে হবে।'

দেবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দেবো।'

ঐ অতটুকু ছেলে তাহার কাপড় আনিয়া দিবে—পয়সা না দিলেও আনিয়া দিবে শুনিয়া আনন্দে নারায়ণীর দু'চোখ ভরিয়া জল আসিয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাসির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'শুন্‌লেন, মা? দেবু নিজের পয়সা দিয়ে আমার কাপড় এনে দেবে।'

মাসি বলিল, 'আর আমার বেলা বুঝি নিজের পয়সা দিবিনি, হাঁ রে নিমক্‌হারাম!'

দেবু বলিল, 'বৌমার পয়সা ত' নেই। আর তোমার অনেক পয়সা—সেই যে আমি দেখেছি।'

'শোন্‌, নারায়ণী, ছেলের কথা শোন্‌।' বলিয়া মাসি হাসিতে লাগিল।

দেবু তখনও নারায়ণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; নারায়ণী তাহার কানে-কানে চুপি চুপি বলিল, 'বাবা যে তোর ডাক্‌ছে রে, যা শুনে আয় কি বল্‌ছে।'

দেবু তাহার চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবারও কাপড় আন্‌তে হবে?'

নারায়ণী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার বাবারও কাপড় ছিঁড়ে গেছে।'

দেবু তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া বোধকরি তাহার বাবার কাছেই চলিয়া গেল। নারায়ণী একবার ভাবিল সেও যায়, কিন্তু গেলেই হয়ত এখনই দেবুর মাথায় হাত দিয়া সে তাহার মদ খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িবে বলিয়া মিথ্যা একটা শপথ করিয়া বসিবে, এই ভয়ে সে উঠি-উঠি করিয়াও আর উঠিল না, মাসির কাছেই বসিয়া রহিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'বীরেন এসেছে বুঝি? সাড়াশব্দ না করে' ত' সে আসে না; আজ এমন চুপি-চুপি এল যে?'

সাড়াশব্দ করিয়া আসিবার অর্থটা যে কি, নারায়ণী তাহা বেশ ভালই বুঝে। মাসিও ঠিক তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন কিনা তাই বা কে জানে! তাই সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্যই বোধকরি নারায়ণী অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল,—

'দেবুর জন্যে ওর বাবা আজ সেই কি-একটা করে' এসেছে, মা, মাসে মাসে কোম্পানীর ঘরে কত টাকা যেন দিতে হবে, তারপর—'

বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া নারায়ণী বলিল, 'তারপর আমি মরে' গেলে দেবু একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবে। কত হাজার টাকা বল্‌লে, মা, দাঁড়াও আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।'

নারায়ণী মিছামিছি চোখ বুজিয়া টাকার অঙ্কটা ভাবিতে লাগিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'জীবন বীমা করেছে বুঝি? তা' তুই ম'লে কেন পাবে?'

স্বামীর মৃত্যুর কথাটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে নাই, তাই সে নিজের মৃত্যুর কথাটা বলিয়াছে।

নারায়ণী বলিল, 'ঐ একই কথা, মা, মা-বাপ ম'লে পাবে আর-কি! আমি কিন্তু মা আগেই মরব।'

মাসি বোধকরি তাহার নিজের কথাটা ভাবিয়াই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'সেকথা কি আর বল্‌বার জো আছে, মা! মরা-বাঁচা ভগবানের হাত। উনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমি দিবারাত্তির ঠাকুরদের কাছে জানাতাম, 'হে ঠাকুর, আমায় যেন ওঁর পায়ে মাথা রেখে মরতে দিও।' কিন্তু কি হ'ল? পার্‌লাম মরতে? যিনি চ'লে যাবার তিনি চ'লে গেলেন, আর এই সুখভোগ কর্‌বার জন্যে আমি রইলাম প'ড়ে।'

কথাটা নারায়ণীর ভাল লাগিল না। বাঁচা-মরা মানুষের হাত নয়, তাহা সে জানে, তবু ভগবানের বিচার বলিয়া কিছু একটা ত' আছে! স্বামীর অবর্তমানে একেবারে নিঃসহায় নিরবলম্ব অবস্থায় নাবালক ছেলেটার হাত ধরিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। ভাবিতে গিয়া নারায়ণী শিহরিয়া উঠিল। —না না, জীবনে এমন কিছু পাপ সে করে নাই যাহার জন্য এ শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। হে ভগবান, তাহার মৃত্যুই যেন আগে হয়।

নারায়ণী উঠিয়া দাঁড়াইল।—'যাই আবার রান্না চড়া'তে হবে।'

এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া জানালার পাশটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল এবং জানালার একটি কপাট হাত দিয়া ঠেলিয়া ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে পিতাপুত্রের আলাপ চলিতেছে।

দূর হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া সে-দৃশ্য দেখিবার জন্য নারায়ণী তাহার রান্নার কথা ভুলিয়া গিয়া সহজে আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না।

(ক্রমশঃ)

অসময়ে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অতিথি আমার !
সাজাইয়া শত উপচার
যেদিন বসিয়াছিনু খুলি' দ্বার, হিয়া,
আরতি-প্রদীপ সম নয়ন তুলিয়া,
মঞ্জুরিত কুঞ্জে মোর মেলি' বাহুশাখা,—
তুলিয়া পতাকা
সেদিন আসনি তুমি রাজ-অধিরাজ,
আসিয়াছ আজ।
দিগন্তের ধূম্রাকাশে রাগরেখা ধীরে ফুটি' উঠি'
ধরার শ্যামল বক্ষে ছড়াইছে ফাগ মুঠি মুঠি;
তারি সাথে তন্দ্রাবেশে বিভোর নয়ন!
সে কোন্ স্বপন,
তাহা নাহি জানি;
শুধু মেলি' শীর্ণ বাহুখানি
তোমারে বাঁধিতে চাই বাহু-কারা মাঝে;
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের অবসন্ন সাঁঝে
নবসুরে বাঁধিতে আবার
চাহি আজ জীবনের তার॥

দেবতা আমার !
সাজাইতে চাহি আরবার
আরতির দীপ-দানি,—বরণের ডালা
নব উপচারে; গাঁথিবারে চাহি ফুলমালা
কাননে কুসুম খুঁজি' লতিকা-বিতান।
তব জয় গান
গাহিবারে চাহি পুন' ভগ্ন কণ্ঠে আজ,
মনে মানি' লাজ।
শত বেদনায় জীর্ণ হৃদয়ের এ ব্যর্থ মন্দিরে,
তোমারে চেয়েছি কেঁদে, ডাকিয়াছি কত ফিরে ফিরে,
কত রুদ্ধ দ্বারে দ্বারে; কত রুদ্ধ তোরণে তোরণে
তব অন্বেষণে
ভুলিয়াছি সব।
কর্ম্মের অশান্ত কলরব
শান্ত ঐ; নিদ্রাতুর আমার হৃদয়
ত্যজি' তার অবসাদভার নিঃশঙ্ক নির্ভয়
জাগরণ চাহিছে আবার;
দেবতা আমার !

বাংলায় আর্য্যসভ্যতা-বিস্তার

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইতিহাসের আদিযুগে বাংলা দেশে কয়েকটি আদিম জাতি বা 'জন' অর্থাৎ tribe বাস করিত এবং সমগ্র দেশটি কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি অধিবাসীজনের নামেই অভিহিত হইত। বাংলার ঐ সমস্ত প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে সাত আটটির নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—অঙ্গ (ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা), বঙ্গ (আধুনিক বাংলার দক্ষিণাংশ, ভাগীরথীর পূর্ব্ববর্ত্তী ভূখণ্ড), কলিঙ্গ (আধুনিক উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগ), উড্র (উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশ), পুণ্ড্র (রাজসাহী বিভাগ, মতান্তরে আধুনিক ছোটনাগপুর বিভাগ), সুহ্ম (রাঢ় বা বর্দ্ধমান বিভাগের দক্ষিণাংশ), ব্রহ্ম (উত্তর-রাঢ়) এবং কর্ব্বট (বর্দ্ধমান বিভাগেরই কোন অংশে ইহাদের বাস ছিল; ইহার চেয়ে নিশ্চিততর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই জনগুলির সমস্তই পশ্চিম, দক্ষিণ এবং হয়ত উত্তর বঙ্গেও বাস করিত। সেই আদিযুগে পূর্ব্ববঙ্গে কাহারা বাস করিত বলা যায় না। তবে আমরা এইটুকু জানি যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে পূর্ব্ববঙ্গই (বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগ) বঙ্গ নামে অভিহিত হইত এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূ-খণ্ডের নাম ছিল সমতট। তা'ছাড়া, আধুনিক চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাম ছিল হরিকেল, একথা মনে করিবার কারণ আছে।

যাহা হোক্, এখন দেখা যাক্ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি বাংলার এই প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তরভারতের বৈদিক আর্য্যদের কি সম্বন্ধ ছিল। বৈদিক-সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ আছে অতি সামান্যই। কিন্তু যে কয়েকবার ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কয়বারই ইহাদের প্রতি বৈদিক আর্য্যদের অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) অঙ্গদিগকে আর্য্যবাসভূমির বহির্ভূক্ত ঘৃণ্য জাতিরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) পুণ্ড্রদিগকে বলা হইয়াছে দস্যু অর্থাৎ অনার্য্য। আর বঙ্গদিগকে ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১৫) পাখী (বয়াংসি) বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে (১।২।১৪) বিধান আছে, পুণ্ড্র এবং বঙ্গ-কলিঙ্গদের দেশে গেলে আর্য্যদের পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা নামক প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। তা-ছাড়া, উক্ত ধর্ম্মসূত্রে (১।২।১৫) কলিঙ্গ দেশে যাওয়ারূপ পাপের জন্য বৈশ্বানর নামক একটি অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (২।৪।১৮) কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতির ন্যায় সুহ্মদিগকেও 'পাপ'-জাতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র ও পুলিন্দদিগকে বলা হইয়াছে দস্যু। সুতরাং দেখিতেছি, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা বৈদিক আর্য্যদের নিকট ঘৃণিত অনার্য্য বা দস্যু বলিয়াই গণ্য হইত।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে জাগে, বাংলার এই প্রাচীনতম অধিবাসীরা কোন্ অনার্য্য মহাজাতি বা race-এর অন্তর্গত ছিল। বাংলা ও বিহারের প্রাচীন জন বা tribeগুলিকে উত্তরভারতের বৈদিক আর্য্যরা সমষ্টিগতভাবে 'প্রাচ্য' বলিয়া অভিহিত করিত। আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৮।১।৫) দেখিতে পাই, প্রাচ্যদিগকে বলা হইয়াছে 'অসুর' (আসুর্য্যাঃ প্রাচ্যাঃ) এবং তাহাদের শ্মশান-নির্ম্মাণপদ্ধতি ছিল আর্য্যদের পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। আর্য্যদের শ্মশান ছিল চতুষ্কোণ, আর প্রাচ্য অসুরদের শ্মশান গোলাকৃতি (পরিমণ্ডল)। শতপথ ব্রাহ্মণে আর্য্য ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী

সংগ্রামের আভাসও পাওয়া যায়। মহাভারতে (১।১০৪) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশের অধিপতি 'অসুর'-রাজ বলীর মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত ক্ষেত্রজ সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, এই পাঁচ ভ্রাতার নাম অনুসারেই উক্ত পাঁচটি জন ও জনপদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হোক্, মহাভারতের এই উপাখ্যানটি হইতেও মনে হয়, বাংলার প্রাচীন জনগুলি, অসুর-বংশজাত বলিয়াই গণ্য হইত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা ২৩২) দেখিতে পাই গৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি জনপদের ভাষাকে আসুরী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—"অসুরাণাং ভবেদ্ বাচা গৌড়-পৌণ্ড্রোদ্ভবা সদা * * * সর্ব্বেষামসুরপক্ষাণাং বঙ্গ-সামতটাশ্রয়াৎ"। আধুনিক কালেও ছোটনাগপুরে মুণ্ডা বা কোল জাতীয় অধিবাসীদের কথিত ভাষা-সমূহের মধ্যে "আসুরী" নামে একটি উপভাষা বর্ত্তমান আছে (Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Introduction, p. vi, by P. C. Bagchi)। সম্ভবত' প্রাচীনকালের সমগ্র প্রাচ্যদেশের কথিত ভাষাগুলির সাধারণ "আসুরী" নামটি এখন একটি ছোট উপভাষার নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জনগুলিকে সাধারণ-ভাবে অসুর বলিয়া অভিহিত করার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু ইহা যে প্রাচীন ভারতের গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যা-সমূহের অন্যতম সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাভারতে (আদি, ৬৭।১৩-১৪) অশোককেও মহাসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮৮।৫) মৌর্য্যদিগকেই অসুর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। যাহা হোক্, এখন দেখা যাক্, আধুনিক ঐতিহাসিক বিচারে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জনগুলিকে কোন্ race বা মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা জানি, আর্য্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান অন্-আর্য্য বা প্রাক্-আর্য্য জাতি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একটিকে দ্রাবিড় ও অন্যটিকে মুণ্ডা বা কোল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা এখন নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। সম্ভবত' মুণ্ডা বা কোলরাই প্রাচীনতর। ইদানীং সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মোহেঞ্জোদড়ো এবং দক্ষিণ পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সভ্যতার সহিত প্রাক্-আর্য্য-দ্রাবিড় এবং কোল বা মুণ্ডাদের কি সম্বন্ধ, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই আপাতত' এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই কীর্ত্তি। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, ঐ নিদর্শনগুলি আর্য্যদেরই সৃষ্টি। অপর মতে এই সভ্যতার সঙ্গে কোল-মুণ্ডাদের সম্পর্ক থাকাও বিচিত্র নয়। যাহা হোক্, দ্রাবিড়, কোল-মুণ্ডা এবং সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা ভারতের এই প্রাচীনতম তিন জাতির সহিত প্রাচীন বাংলার অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জাতিগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল কি না এবং থাকিলে কাহার সহিত ছিল তাহা নির্ণয় করা বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধানতম সমস্যা। আমরা এস্থলে সে-সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক পণ্ডিত আজকাল মনে করেন, দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জাতি (race) নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ, বহুকালব্যাপী রক্তসংমিশ্রণের ফলে জাতিগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন-কি, আধুনিক ভারতীয় দ্রাবিড় ও কোল-মুণ্ডাদের দেহগঠনগত কোনো প্রকার পার্থক্য নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যই জাতিনির্ণয়-কার্য্যে পণ্ডিতদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ভাষাগত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলার

আদি ভাষাগুলি ছিল Austric বা Austro-Asiatic ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অষ্ট্রিক্ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষার মধ্যে আধুনিক কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি জাতিগুলির কথিত ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনের কোনো কোনো স্থান এবং ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অনেক জাতির কথিত ভাষাও এই অষ্ট্রিক্ ভাষার অন্তর্গত। এই সব নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে জলপথে এদেশে আগমন করিয়াছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচীন নামগুলিও অষ্ট্রিক্ ভাষারই শব্দ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—বঙ্গ প্রভৃতি দেশের ভাষাকে মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে আসুরী ভাষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আধুনিক ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে এখনও আসুরী নামে একটি উপভাষা বিদ্যমান আছে। প্রাচ্যদেশীয় অসুরদের ভাষা যে আর্য্যভাষা হইতে বিভিন্ন ছিল তাহা শতপথ ব্রাহ্মণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানা যায়। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন জনগুলির কথিত আসুরী ভাষা মুণ্ডাদের ভাষা অর্থাৎ অষ্ট্রিক্-জাতীয় ভাষার গোষ্ঠীভুক্তই ছিল।

যাহা হোক্, আমরা দেখিলাম যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার অধিবাসীরা খুব সম্ভবত' অষ্ট্রিক্-ভাষী অনার্য্য ছিল। তাহাদের ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতি-নীতিও যে বৈদিক আর্য্যদের থেকে বিভিন্ন ছিল, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে আর্য্য-ভাষা, আর্য্য-ধর্ম্ম, আর্য্য সামাজিক বিধান, এক কথায় আর্য্যসভ্যতা, পূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; তাহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা আর্য্যসভ্যতা যতখানি গ্রহণ করিয়াছে বাংলা-দেশ তাহার চেয়েও বেশী গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্-আর্য্য বাংলাদেশে আর্য্যসভ্যতা কোন্ সময় এবং কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আর্য্য-সভ্যতা বাংলাদেশে প্রথম কোন্ সময়ে প্রবেশ করিল তাহাই প্রথমে বিচার করা যাক্। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং কালিদাসের রঘুবংশকে বাংলায় আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের দুই সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেঘ মাথব সম্বন্ধে যে-উপাখ্যানটি আছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি রচিত হইবার পূর্ব্বে বিদেহ বা মিথিলায় আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রাচ্য অসুরজাতিদিগকে শ্মশান-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এবং ভাষা সম্বন্ধে আর্য্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর্য্য ও অসুরদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের কথাও এই গ্রন্থেই দেখা যায়। সুতরাং বিদেহে আর্য্য-আগমনের সময় এবং সম্ভবত' শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময়েও মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য অসুরভূমিতে আর্য্যপ্রভাব প্রসারিত হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

পক্ষান্তরে, কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাসের সময়ে বাংলা দেশে এবং এমন কি কামরূপেও আর্য্য-সভ্যতা পরিপূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালিদাস গুপ্তসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ৩৮০-৪১৩) সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। ফা-হিয়ানের (৪০৫-৪১১) বিবরণ হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। ফা-হিয়ান খুব সম্ভবত' কালিদাসের সমসাময়িক। এই চৈনিক পরিব্রাজক বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভারত-ভ্রমণের সময় বাংলার প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; তাম্রলিপ্তি হইতে বাণিজ্যপোত সমুদ্রপথে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে

যাতায়াত করিত এবং সে সময়ে যবদ্বীপেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান ছিল (Legge's Fa-hien, p. 100, 113)। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভেই যখন সুদূর যবদ্বীপেও ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার এতটা প্রসার ছিল তখন বাংলা দেশ যে তার বহুপূর্ব্বেই আর্য্য-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকেও বাংলায় আর্য্যসভ্যতা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাই মল্লনাগ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এবং মহাকবি ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নামক নাটকে। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতের একটি উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ভাস কবির সময়ে বঙ্গের রাজবংশ মর্য্যাদায় কাশী, সুরাষ্ট্র, মিথিলা, মথুরা এবং অবন্তীর রাজবংশসমূহের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। চক্রস্বামীর উপাসক পুষ্করণারাজ চন্দ্রবর্ম্মার শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) গিরিলিপি হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাই গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ-স্তম্ভলিপিতে। ঐ লিপি হইতে জানা যায়, সমতট (বর্ত্তমান ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জিলা), ডবাক (আসামের অন্তর্গত নওগঙ্ জিলা) এবং কামরূপের প্রত্যন্ত নৃপতিরা কর এবং উপঢৌকনাদি দান করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে সহজেই অনুমান হয়, সমগ্র বাংলা দেশই তৎকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—হিমালয়, বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র উত্তর ভারতকেই 'আর্য্যাবর্ত্ত' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের এই সংজ্ঞা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মনুসংহিতার সময়ে বাংলাদেশকেও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিঃসন্দেহরূপে মনুসংহিতার কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেও যে আর্য্যপ্রভাব বাংলাদেশকে অতিক্রম করিয়া সুদূর যবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল তার প্রমাণ পাই গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে। টলেমি সুদূর মিশর দেশে বসিয়া তাঁহার ভৌগোলিক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। অথচ তাহাতে বাংলাদেশ সম্বন্ধেও বিশদ জ্ঞানের পরিচয় পাই। তিনি গঙ্গানদীর পাঁচটি বিভিন্ন মোহনার নাম এবং ঐগুলির তীরে অবস্থিত শহরগুলির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই মোহনাগুলি যে-ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল সেই ভূখণ্ডকে তিনি Gangaridai নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই দেশের রাজা যে-নগরীতে বাস করিতেন তাহার নাম Gange বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে 'গঙ্গরিডই' নামে কোনো রাজ্য বা দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, 'গঙ্গে' নামে কোনো নগরীরও পরিচয় জানা যায় না। খুব সম্ভবত' ইহারা সংস্কৃত সাহিত্যে অন্য নামে পরিচিত ছিল। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে "নৌসাধনোদ্যত" বঙ্গদিগকে "গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু" অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং টলেমির গঙ্গরিডই রাজ্য প্রাচীন বঙ্গরাজ্য হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে করিতে হয়। আমরা সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে বঙ্গ-দেশে বঙ্গ-নগরে এক বঙ্গ-রাজার উল্লেখ পাই। অনুমান হয়, মহাবংশের বঙ্গ-রাজ্য টলেমির গঙ্গরিডই রাজ্য হইতে অভিন্ন এবং টলেমির 'গঙ্গে-নগর' মহাবংশের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর মাত্র। যদি তাই হয়, তবে বলিতে হইবে, মহাবংশের বঙ্গরাজা পূর্ব্বোক্ত গঙ্গরিডই রাজ্যেরই রাজা এবং ভাস কবির উক্ত 'বাঙ্গ' রাজবংশও এই গঙ্গরিডই রাজ্যেরই রাজবংশ। দিল্লীর লৌহস্তম্ভলিপিতে (তৃতীয় শতাব্দী) উল্লিখিত আছে, চন্দ্রনামে কোনো নৃপতি এই বঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, টলেমির গ্রন্থ হইতে নিঃসংশয়রূপেই প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বঙ্গরাজা এবং বঙ্গনগরের নাম মিশর দেশ পর্য্যন্ত প্রসার

লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ঐ সময়ে যে বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য দেশের সভ্যতার আদান-প্রদান চলিতেছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, টলেমির সময়ে ভারতীয় সভ্যতা যবদ্বীপেও প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তাঁহার, গ্রন্থে এই দ্বীপটীকে Iabadio নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তিনি "island of barley" বলিয়া এই নামটির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। সুতরাং Iabadio যে সংস্কৃত যবদ্বীপেরই রূপান্তর সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ঐ দ্বীপটি শুধু যে ভারতীয় সভ্যতা লাভ করিয়াছিল তা' নয়, উহার নাম পর্য্যন্ত সংস্কৃত রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সেই সংস্কৃত নাম মিশরের গ্রীক্ ভৌগোলিকের নিকটও অবিদিত ছিল না।

এবার দেখা যাক্, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বাংলা দেশ সম্বন্ধে কি কি তথ্য জানা যায়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন গ্রীক্ নাবিক সমস্ত দক্ষিণ এসিয়া ভ্রমণ করিয়া নানাদেশের বাণিজ্য বিষয়ক এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে অন্যান্য বিবরণও লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার নাম জানা যায় নাই। এই অজ্ঞাতনামা গ্রীক্ নাবিক জলপথে বাংলা দেশেও আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবরণ হইতেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়; ভৌগোলিক টলেমির ন্যায় এই গ্রীক্ নাবিকও বঙ্গকে 'গঙ্গা'-দেশ এবং ইহার প্রধান নগরীকে 'গঙ্গা'-নগরী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই গঙ্গা-রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে অভিন্ন এবং গঙ্গা-নগরী মহাবংশের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর। এস্থলে গঙ্গাদেশ ও বঙ্গদেশের অভিন্নতা সম্বন্ধে আরেকটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত গ্রীক্ নাবিক বলিয়াছেন, তৎকালে গঙ্গা-নগরী হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন-বস্ত্র (muslins of the finest sort) বিদেশে রপ্তানী হইত এবং এই মসলিনের নাম Gangetic অর্থাৎ গাঙ্গেয় (Periplus, p. 47), কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও (২।১১) আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গের দুকূল এবং কার্পাস-বস্ত্র রত্নতুল্য মূল্যবান্ দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইত। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে "বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলম্"। অন্যত্র আছে "মাধুরমপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠম্"। এই বাঙ্গক দুকূল ও কার্পাস-বস্ত্র Periplus-এর Gangetic muslin হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রকে যখন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তৎসমীপবর্ত্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে (Roy Chaudhuri's Political History, pp. 7-8), তখন Periplus-এর Gangetic এবং অর্থশাস্ত্রের বাঙ্গক-কে অভিন্ন মনে করাই সঙ্গত বোধ হয়। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে গ্রীক্ লেখকদের গঙ্গারাজ্য ও গঙ্গানগরী যে বঙ্গরাজ্য ও বঙ্গনগর হইতে অভিন্ন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। যাহা হোক, উক্ত গ্রীক্ নাবিকের বর্ণনা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তৎকালে উৎকৃষ্ট মসলিন ছাড়া বাংলা দেশ হইতে প্রচুর মুক্তা, তেজপাতা (malabathrum) এবং জটামাংসি (Gangetic spikenard) রপ্তানী হইত। এই সমস্ত দ্রব্য সাধারণত', বাংলাদেশ হইতে জলপথে দক্ষিণ ভারতে যাইত এবং সেখান হইতে রোম-সাম্রাজ্যে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। যে-সমস্ত বৃহৎ বাণিজ্যপোত দক্ষিণ ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে যাতায়াত করিত সেগুলিকে উক্ত নাবিক Colandia নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তৎকালে বাংলাদেশে Caltis নামে এক প্রকার সুবর্ণ-মুদ্রাও প্রচলিত ছিল এবং বাংলাদেশে কয়েকটী সোনার খনিও অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে সহজেই মনে হয়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেও বঙ্গের অধিবাসীরা নৌসাধনপটু ছিল। আর, এমন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও দেশদেশান্তরের সহিত বাণিজ্যপরায়ণ বঙ্গ যে

তখনও আর্য্য-সভ্যতার বহির্ভুক্তই ছিল, একথা কিছুতেই মনে করা যায় না।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরও দুয়েকটি তথ্য আলোচনা করিলে আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। আমরা জানি, এই শতাব্দীতেই কাশ্যপ মাতঙ্গ (খ্রীঃ ৬২) চীনদেশে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আর, ভৌগোলিক টলেমি যখন দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেই যবদ্বীপের সংস্কৃত নাম অবগত ছিলেন তখন অন্তত' প্রথম শতাব্দী কিংবা তাহারও পূর্ব্বেই ঐ দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে-সময়ে ভারতীয় সভ্যতা একদিকে চীন ও অপর দিকে যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল সে-সময় ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত বাংলা দেশ ঐ সভ্যতার বাহিরে থাকিতে পারে না, ইহা অতি সহজেই বোঝা যায়।

তারপর দেখিতে পাই, এই শতাব্দীতেই কলিঙ্গ দেশের জৈন সম্রাট খারবেল উত্তরে মথুরা হইতে দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বভারতে মগধের অন্তর্গত রাজগৃহেও সমরাভিযান করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মহাভারতের উপাখ্যানে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গদিগকে অসুর-রাজ বলির বংশজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা যে পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল, ইহা মনে করিবার অনেক কারণ আছে। শুধু তাই নয়। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হেতু আছে। এস্থলে ঐরূপ দু'য়েকটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪৪।৭) অঙ্গ ও বঙ্গকে একই 'বিষয়' বা রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহাবীর কর্ণকে ঐ রাজ্যের অধিপতি (বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষ) বলা হইয়াছে। আবার, বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে (১।২।১৪) বঙ্গ ও কলিঙ্গদিগকে (বঙ্গকলিঙ্গান্) এমন ভাবে একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় তাহারা তৎকালে একই রাজ্যভুক্ত ছিল। ল্যাটিন লেখক সুবিখ্যাত প্লিনি (Pliny the Elder, খ্রীঃ ২৩-৭৯) তাঁহার Historia Naturalis নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে বলিয়াছেন, গঙ্গানদীর শেষ অংশ Gangarides-Calingae দের রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; ঐ দেশের রাজধানী Parthalis এবং সে দেশের অধিপতির সেনাদলে ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্ব এবং সাত শত হস্তী ছিল (Monahan's Early History, pp. 4—5)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বভারত হইতে জলপথে তাম্রপর্ণী (Taprobane) অর্থাৎ সিংহলদ্বীপে যাইতে সাত দিন লাগিত। এই বর্ণনা হইতে ঐ দেশের সামরিক শক্তি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের পক্ষে সব-চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা এই যে, প্লিনিও Gangaridae ও Calingae-দিগকে একই রাজ্যভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য লেখকদের গঙ্গারাজ্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গরাজ্য একই। সুতরাং প্লিনীর Gangarides-Calingae এবং বৌধায়নের "বঙ্গ-কলিঙ্গাঃ"-কে অভিন্ন বলিয়া মনে করাই সঙ্গত বোধ হইতেছে। বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ থাকার তৃতীয় প্রমাণ পাই সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে (ষষ্ঠ অধ্যায়)। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, কলিঙ্গ রাজবংশ এবং বঙ্গ রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও হইত। বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহুর মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গ-রাজকন্যা এবং সিংহবাহুর পিতার (বঙ্গরাজের) রাজত্বকালে কলিঙ্গ-রাজপৌত্র (বঙ্গরাজের শ্যালক-পুত্র?) ছিলেন বঙ্গীয় সেনাদলের সেনাপতি। শুধু তাই নয়, সিংহবাহুর পিতার মৃত্যুর পর উক্ত কলিঙ্গ-রাজপৌত্রই বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপাখ্যানটীর ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হোক্ না কেন, ইহা হইতেও বৌধায়নের বঙ্গকলিঙ্গাঃ এবং প্লিনীর Gangarides-Calingaeদের

সুক্ষরাজ্যের অস্তিত্বের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং যে-সময়ে কলিঙ্গের জৈন সম্রাট খারবেলের সাম্রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল সে-সময়ে বঙ্গরাজ্যেও যে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিঙ্গ-সম্রাট খারবেল ছিলেন জৈনধর্ম্মাবলম্বী। বাংলাদেশেও যে জৈন ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ষ্ট্রাবোর একটি উক্তি হইতে মনে হয়, এই সময়েই গ্রীক্ নাবিকরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে মিশর হইতে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মনুসংহিতা গ্রন্থখানিও যে এই সময়েই বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কিছু হেতু আছে। এই গ্রন্থে (২।২২) আর্য্যাবর্ত্তকে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে বাংলাদেশও আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যেই পড়ে। অথচ এই গ্রন্থেই অন্যত্র (১০।৪৩-৪৪) বলা হইয়াছে—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা "ব্রাহ্মণাদর্শন"-হেতু অর্থাৎ আর্য্য সমাজে অনুষ্ঠিত উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পৌণ্ড্র এবং উড্ররা প্রাচীন বাংলার অধিবাসী জনসমূহের মধ্যে অন্যতম। মনুসংহিতার এই দুইটি উক্তি হইতে মনে হয়, পৌণ্ড্র ও উড্ররা যবন, শক, পহ্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতির ন্যায় আর্য্যসমাজ-বহির্ভুক্তই ছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে আর্য্য প্রভাব লাভ করিতেছিল। তাই তাহারা মনুসংহিতা গ্রন্থে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, মনুসংহিতার পৌণ্ড্র, উড্র প্রভৃতি পতিত ক্ষত্রিয়দের তালিকায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি জনগুলির উল্লেখ নাই। সুতরাং মনুসংহিতার সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ আর্য্যসমাজ এবং আর্য্যাবর্ত্তভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে শুঙ্গসম্রাট পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ১৮৫-১৪৯) বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি তাঁহার 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। এই গ্রন্থে আর্য্যাবর্ত্ত ভূ-খণ্ডকে 'কালকবন' নামক অরণ্যের পশ্চিমে (প্রত্যক্ কালকবনাৎ) অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কালকবনের অবস্থিতি সম্বন্ধে সংশয় আছে। তবে সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের নিকটে সম্ভবত' ঝাড়খণ্ডে শতযোজনব্যাপী একটী গভীর অরণ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। খুব সম্ভবত' এই অরণ্য ও মহাভাষ্যের কালকবন অভিন্ন। যাহা হোক্, বঙ্গদেশ যে এই কালকবনের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং পতঞ্জলির মতে বাংলাদেশ আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরেই ছিল। কিন্তু তিনি অন্যত্র অঙ্গের রাজা আঙ্গ, বঙ্গের রাজা বাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের রাজারা তৎকালে, ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে প্রায় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোক (২৭২-২৩২)। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এরূপ অনুমানের অনুকূল যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ হিউ-এন্‌-সাঙের ভারতবিবরণ ও মহাবংশ, দিব্যাবদান ও প্লিনির Historia Naturalis প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া যে-সাম্রাজ্য দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ এবং পশ্চিমে পারস্য-রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বঙ্গদেশ মগধের অব্যবহিত সীমান্তবর্ত্তী হইয়াও যে সে-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তৃতীয়ত', যে কলিঙ্গদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশ অনেক সময়েই যুক্ত থাকিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই কলিঙ্গদেশ যখন ঘোরতর সংগ্রামের

পর মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল তখনও বাংলাদেশের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থত', আমরা জানি—অশোক চোল, চের, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী (সিংহল) পর্য্যন্ত সমগ্র জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপে গ্রীস্‌ ও আফ্রিকায় মিশর পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাংলাদেশেও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না। অতএব তাঁহার রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকেও বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, একথা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। এই অনুমান অপেক্ষাও দৃঢ়তর প্রমাণ রহিয়াছে অশোকের প্রচারিত ও প্রস্তরগাত্রে খোদিত ধর্ম্মানুশাসনে। তাঁহার একটি ধর্ম্মানুশাসন (Rock Edict, XIII) হইতে স্পষ্টই জানা যায়, ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে বহু ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। অতএব অশোকের রাজত্বের বেশ কিছুকাল পূর্ব্বেই যে কলিঙ্গে আর্য্য-সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করার বিষয়, খারবেলের হাতিগুম্ফা-লিপিতে সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, অথচ 'খারবেল' নামটি যে অনার্য্য শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে-সময়ে কলিঙ্গ জনপদ আর্য্য-সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছিল বঙ্গ-জনপদও প্রায় সেই সময়েই ঐ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা নিঃসংশয়েই মনে করা যাইতে পারে। ইহার চেয়েও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মানুশাসনেই অশোক বলিতেছেন, একমাত্র যবনদের (অর্থাৎ গ্রীকদের) জনপদ ছাড়া ভারতবর্ষে এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষু) নাই। অশোকের এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষেই আর্য্য-সভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং কলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গ জনপদেও ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের বসতি ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মনুসংহিতার সময়েও যবন, শক, পহ্লব, পৌণ্ড্র, উড্র প্রভৃতি কতকগুলি জনপদ ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সুতরাং দেখিতেছি, অশোকের অনুশাসন (Rock Edict, XIII) এবং মনুসংহিতার উক্তি (১০।৪৩-৪৪) আর্য্যসভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে একই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও (৩২২-২৯৮) বঙ্গদেশ মগধের অধীন ছিল মনে করিবার হেতু আছে। যে বীরের প্রতাপ মগধ হইতে গুজরাট এবং গুজরাট হইতে পারস্য দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, যাঁহার শক্তির নিকট আলেক্‌জাণ্ডারের পরাক্রান্ত সেনাপতি সেলিউকস্‌কেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি যে মগধের সীমান্তবর্ত্তী বাংলাদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা মনে হয় না। প্লিনির একটি উক্তি হইতে মনে হয়, গঙ্গার শেষ অংশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগেই (the whole tract along the Ganges) মগধের আধিপত্য স্বীকৃত হইত। মহাবংশের একটি উপাখ্যান হইতে মনে হয়, অশোকের সময়ে মগধের রাজশক্তি সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তিতেও অব্যাহত ছিল। তিব্বতের লামা তারনাথ লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার "ভঙ্গল" (অর্থাৎ বাংলা) দেশের অন্তর্গত গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, চন্দ্রগুপ্ত যে বঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তথ্যটি হইতেই চন্দ্রগুপ্ত বাংলাদেশেও রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে মগধের নন্দ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'সর্ব্বক্ষত্রান্তক', 'একরাট্' মহাপদ্ম নন্দ (আনুমানিক ৩৬২—৩৩৪) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্যকেই মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই ভারতের ইতিহাসে

সর্বপ্রথম সম্রাট্ এবং তাঁহার স্থাপিত মগধ সাম্রাজ্যই ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য। এইজন্যই পুরাণগুলিতে তাহাকে 'সর্ব্বক্ষত্রান্তক' ও 'একরাট্' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হোক্, তাঁহার বিজিত রাজ্যগুলির মধ্যে কলিঙ্গ অন্যতম। কলিঙ্গাধিপতি "খারবেলে"র হাতিগুম্ফা-লিপিতেও নন্দরাজ কর্ত্তৃক কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাপদ্ম কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ-বিজয়ের কোনো প্রত্যক্ষ বা সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। নন্দরাজ-বংশের শেষ সময়ে দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (৩২৭—৩২৫)। তিনি যখন বিপাশা (Hyphasis) নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন তিনি 'ভগল' (Phegelas or Phegeus) নামক জনৈক স্থানীয় ক্ষত্রিয় রাজার নিকট Prasii এবং Gangaridaeদের সামরিক শক্তির বিষয় অবগত হইলেন। কুইন্‌টাস্ কার্টিয়াসের লিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যায়, Prasii ও Gangaridae দুইটি স্বতন্ত্র জাতির নাম, কিন্তু তাহারা একই (নন্দবংশীয়) রাজার অধীন ছিল। Prasii সংস্কৃত 'প্রাচ্য' শব্দের রূপান্তর মাত্র এবং এস্থলে প্রাচ্য শব্দের দ্বারা মগধকেই বুঝায়; কারণ, পাশ্চাত্য লেখকরা Palibothra অর্থাৎ পাটলিপুত্রকে এই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর, প্লিনি ও টলেমির বর্ণনা হইতে দেখা যায়, গঙ্গার শাখাসমূহের দ্বারা বিধৌত বর্ত্তমান বাংলার দক্ষিণ অংশকেই গঙ্গারাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু 'গঙ্গরিডি' কথার সংস্কৃত প্রতিরূপ কি তাহা এখনও পণ্ডিতরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অথচ গ্রীক্‌রাই যে সর্ব্বপ্রথমে এই নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন তাও বলা যায় না। কারণ, ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজা ভগলই আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট ঐ নামে গঙ্গাবিধৌত রাজ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয়, আরও অনুসন্ধান করিলে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঐ নামের আসল প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'গঙ্গাধিপত্যের' রাজা মেরুর নাম পাওয়া যায় (Buddhist Literature of Nepal—by R. L. Mitra, p. 76)। এই গঙ্গাধিপত্য বা গঙ্গারাজ্য যে গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের 'গঙ্গরিডি' হইতে অভিন্ন একথা মনে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে রঘুবংশ, মহাবংশ, টলেমির ভূগোল, Periplus এবং অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, 'গঙ্গরিডি' বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝায়। আর, এখন দেখিলাম গঙ্গাধিপত্য বা গঙ্গা-রাজ্য নাম সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বঙ্গ ও গঙ্গারাজ্য একই দেশের দুইটি নাম মাত্র। এক দেশের দুই নামে পরিচয় থাকা বিচিত্র নয়। একটু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, গ্রীক্‌রা মগধকেই 'প্রাচ্য' নামে জানিতেন; গ্রীক্‌রা যেমন মগধকে সর্ব্বদাই Prasii বলিয়াছেন, মগধ নাম কখনও ব্যবহার করেন নাই, তেমনি বঙ্গকেও তাঁহারা সর্ব্বদাই শুধু 'গঙ্গরিডি' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। সুদূর বিপাশাতীরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় রাজা ভগল মগধ এবং বঙ্গকেই আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট প্রাচ্য ও গঙ্গারাজ্য নামে পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

যাহা হোক্, আমরা দেখিয়াছি বঙ্গ বা গঙ্গারাজ্যকে কার্টিয়াস্ মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় ভিন্ন রকমের উক্তিও দেখা যায়। যথা, ডিওডোরাসের উক্তি হইতে মনে হয় মগধই গঙ্গারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আবার, প্লুটার্ক গঙ্গারাজ্য ও মগধকে দুই জন স্বতন্ত্র রাজার অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এস্থলে এই সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গদেশ উত্তর-ভারতব্যাপী সুবিস্তৃত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে অনেক হেতু আছে।

সুতরাং ঐ সময় কিংবা তাহারও পূর্ব্বে বাংলায় আর্য্য প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ বা মিথিলায় আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারের সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আর ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৮।২২) অঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালেই আর্য্যধর্ম্ম প্রবেশের প্রমাণ আছে। এই দুইটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মোটামুটি ভাবে ধরা যাইতে পারে। সুতরাং শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময় হইতে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব-কালের (৩৬২-৩৪) মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাংলাদেশে আর্য্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্র হইতেও এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে 'সংকীর্ণ' অর্থাৎ মিশ্র জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১।২।১৩)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সময়ে এই দুইটি জনপদে বৈদিক সভ্যতা কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু অঙ্গ ও কলিঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ঐ দুই জনপদে গেলে আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে এবং কলিঙ্গে যাওয়ার জন্য বৈশ্বানর নামক অপর একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, ঐ সময়েও বঙ্গ এবং কলিঙ্গ আর্য্যভূমির বহির্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত, অথচ বৈদিক আর্য্যরা ঐ দুই জনপদে যাতায়াত করিত। নতুবা প্রায়শ্চিত্তের বিধানই দেওয়া হইত না। আর-একটি স্মৃতির বিধানে বলা হইয়াছে —

> অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সুরাষ্ট্রে মগধেষু চ
> তীর্থ-যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

এই শ্লোকটিতে বৌধায়নের যুগের পরবর্ত্তী অবস্থা সূচিত হইতেছে। কারণ, ইহাতেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বটে, কিন্তু এই সময়ে বৈদিক আর্য্যরা অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে অধিক সংখ্যায় যাইতে সুরু করিয়াছিল এবং ঐসব জনপদে বৈদিক আর্য্যদের তীর্থস্থানাদি পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে পূর্ব্ব-ভারতের কয়েকটি তীর্থের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে এ স্থলে কামাখ্যা, লৌহিত্য, করতোয়া, বৈতরণী এবং গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম তীর্থের নাম করিলেই যথেষ্ট। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফল পাওয়া যায়। আরও আছে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে গিয়া স্নান করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এই দু'টি স্থান বঙ্গদেশে অবস্থিত। আর বৈতরণী-তীর্থ কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাভারতে তীর্থযাত্রা ছাড়াও পূর্ব্বভারতে গমনের দৃষ্টান্ত আছে। যথা, পাণ্ডুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় আছে, তিনি পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (আদি, ১১৩ অধ্যায়)। পাণ্ডুর পুত্র ভীমও দিগ্বিজয়-কালে পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন (সভা, ২৯ অধ্যায়)। বৌধায়নের বিধান অনুসারে পাণ্ডু বা ভীমকে কোনো প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। শুধু তাই নয়, মহাভারতের বহু স্থানে আর্য্য ও অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতির পারস্পরিক সংস্রবের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোথাও প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। তারপর হরিবংশে দেখিতে পাই, তীর্থযাত্রা কিংবা দিগ্বিজয় ছাড়া আর-একটি তৃতীয় এবং প্রবলতর কারণেও আর্য্যরা অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জনপদে শুধু আগমন নয়, স্থায়ী ভাবে বাস করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। সে কারণটি হইতেছে—ক্ষুধা ও ভয়ের তাড়না। এই গ্রন্থে আছে, আর্য্যরা ক্ষুদ্ভয়ের তাড়নায় বিদেহের পূর্ব্ব সীমাস্থিত কৌশিকী নদী অতিক্রম করিয়া অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং ম্লেচ্ছগণের সহিত বাস করিবে।—কৌশিকীং প্রতরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ। অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ

* * * সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ * * * নিবৎস্যন্তি নরাঃ ম্লেচ্ছগণৈঃ সহ॥ সুতরাং মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গে এবং অন্যান্য জনপদেও যে বহু ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমরা এই প্রবন্ধে বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে শুধু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদিক সমাজভুক্ত আর্য্যদের প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। সুতরাং এস্থলে ঐ সব জনপদে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিস্তারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না।

বৈদিক আর্য্যরা যে বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে আগমন করিয়া অনার্য্য, অসুর বা ম্লেচ্ছগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন শুধু তাহাই নয়, পরন্তু কালক্রমে ঐ সব ম্লেচ্ছগণকেও আর্য্যভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। এই প্রক্রিয়াটিও শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্যদিগকে আসুর্য্য বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, তাহারা আর্য্যগণের ন্যায় একই প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তাহাদের ভাষা আর্য্যভাষা হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহারা বিকৃতভাবে আর্য্যভাষা উচ্চারণ করিতে পারিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দস্যু পুণ্ড্রদিগকে পতিত আর্য্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মহাভারতের মতে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি অসুর-রাজ বলির বংশধর বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ মহর্ষি দীর্ঘতমার স্পর্শজাত সন্তান এবং অসুররাজ বলিকেও গঙ্গাস্নানপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অসুররাজ বলির বংশধরদিগকে 'বালেয় ক্ষত্রিয়' এবং 'বালেয় ব্রাহ্মণ' বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। যথা—

মহাযোগী স তু বলি র্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে॥
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি।

(হরিবংশ, ৩১ অধ্যায়)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে পুণ্ড্রদিগকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দস্যু বা অনার্য্য বলা হইয়াছে সেই পুণ্ড্রদিগকেই মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণাদর্শন হেতু পতিত ক্ষত্রিয় বা বৃষল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং মনুসংহিতার সময় অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি অন্য জনরা সম্ভবত' পূর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইত।

এইরূপে শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় হইতে তিন চার শত বৎসর ব্যাপী সময়ের মধ্যে বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য-ভারতীয় জনপদে একদিকে ক্রমে ক্রমে আর্য্য-সমাগম হইতেছিল, অপরদিকে প্রাচ্য-ভারতীয় অনার্য্যরা কালক্রমে আর্য্যভাবাপন্ন ও আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া গেল এবং অনেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। অবশেষে আনুমানিক মহারাজ অশোকের সময়ে বাংলার জন-সম্প্রদায় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আর্য্য-সভ্যতা লাভ করিল ও কালক্রমে সমগ্র বাংলা দেশটিই আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

চাঁপা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

এক দেশের এক রাজা—রূপে-গুণে সত্যি কার্ত্তিক। রাজা এখনো বিয়ে করেননি।

তাঁরি রাজ্যে এক বনে পাতার ঘরে থাক্‌ত মা আর মেয়ে চাঁপা। কে তার নাম রেখেছিল চাঁপা জানিনে। চাঁপার গায়ে রূপ আর ধরে না।

বুড়ী-মা ম'র্‌বার আগে কেঁদে খুন—"আমি ম'লে আমার চাঁপাকে কে দেখ্‌বে?"

চন্দনের দিকে চাইতেই চন্দন বুক ফুলিয়ে বল্‌লে—"আমি দেখ্‌ব"। বুড়ী খুসী হ'য়ে চোখ বুজ্‌ল। বছর কাট্‌ল। চন্দন বল্‌লে, "চাঁপা, এবার আমায় বিয়ে কর।"

চন্দন কাঠুরে; গরীব, কিন্তু গায়ে অসুরের জোর। চাঁপাকে এক হাতে উঁচুতে তুলে পুতুলের মতো নাচায়; গাছের মস্ত মোটা ডাল একটানে মড়মড় ক'রে ভেঙে ফেলে। বছর পঁচিশ বয়স চন্দনের।

চন্দনের কথা শুনে চাঁপা বল্‌লে—"দাঁড়াও, বসন্ত আসুক—"

চাঁপার সংসারে অনটন নেই কিছু। মালা গাঁথে, ময়ূরের পাখার মুকুট তৈরী করে, রঙীন্ কাপড় বোনে। চন্দন এসে বনের ফল, ঝরণার জল তুলে দিয়ে যায়। সকলেই জানে চাঁপা-চন্দনের বিয়ে হ'বে।

চাঁপার দু'টি বন্ধু ছিল, মিনি আর চন্দন। মিনি খালি 'মিঁয়াও করত। আর চন্দন তাকে ভালবাস্‌ত।

দিন যায়—

শীতে-মরা গাছে আবার নতুন পাতা গজা'তে সুরু ক'রেছে। চন্দনের আর তর্ সয় না।

চাঁপা বলে,—"সবুর-সবুর; গাছে-গাছে ফুল ফুটুক—তবে তো?"

সে-দিন চাঁপা গেল সরোবরে নাইতে। রাজা বেরিয়েছেন মৃগয়ায়। চাঁপার সঙ্গে দেখা। রাজার চোখে আর পলক পড়ে না। তিনি জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"তুমি কে?"

চাঁপা বল্‌লে—"আমি চাঁপা।"

রাজা ব'ল্‌লেন, "তুমি রাণী হ'বে?"

"কেমন ক'রে?"

রাজা হেসে বল্‌লেন, "আমায় বিয়ে ক'রে।"

চাঁপা মুখ লাল ক'রে পালিয়ে গেল। রাত্তিরে খড়ের বিছানায় শুয়ে চাঁপা স্বপ্ন দেখ্‌লে, সে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে; কাছে দাঁড়িয়ে রাজপুত্তুর—লাল-পোষাক-পরা, মাথায় হীরার মুকুট, গলায় মুক্তার মালা। চাঁপা উঠে বস্‌ল।

ভোর হ'ল। লাল শাড়ীখানা প'রে—মাথায় ময়ূরের পালকের মুকুট প'রে চাঁপা জল আন্‌তে চল্‌ল সরোবরে। রাজার সঙ্গে দেখা—

ঘোড়ায় চ'ড়ে চাঁপা রাণী হ'তে চল্‌ল।

চন্দন এসে দেখে মিনি বেড়াল বাঁধা; ঘরের ঝাঁপ বন্ধ; চাঁপা ঘরে নেই, বকুল-তলায় নেই, সরোবরে নেই—কোথায় তবে চাঁপা!

এদিকে চাঁপা হ'ল রাণী। কত দাস-দাসী লোক-লস্কর হীরা-জহরৎ মাণিক-মুক্তা! চাঁপার গরব আর ধরে না। রাত্তিরে সোনার পালঙ্কে চাঁপা ঘুমিয়ে আছে; ঘুমের ঘোরে শুনলে, রাজার বাগানে কে "চাঁপা" "চাঁপা" ক'রে কাঁদ্‌ছে। চাঁপা ঘুম ভেঙে উঠে বস্‌ল। জান্‌লায় দাঁড়িয়ে শুন্‌লে, কে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে—"চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা।"—চাঁপা চিন্‌ল চন্দনের গলা। পরদিন চাঁপা রাজাকে বল্‌লে—"সারারাত একটা লোকের কান্নায় আমার চোখে ঘুম আসেনি; লোকটাকে তোমার রাজ্য থেকে দূর ক'রে দাও।" চন্দনকে দূর ক'রে দেওয়া হ'ল। দিন গেল।

রাত্তিরে চাঁপার চোখ ঘুমে ভারী হ'য়ে

উঠেছে—এমন সময় শুন্‌লে রাজার বাগানে মিনি বেড়াল ডাক্‌ছে—"চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা"! চাঁপা মুখে আঁচল জড়িয়ে ঘুমুতে চাইল, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। পরদিন রাজার কাছে বল্‌লে,—"একটা বেড়ালের জ্বালায় আমি ঘুমুতে পারিনে; ওটাকে জলে ডুবিয়ে মারো।"

মিনিকে জলে ডুবিয়ে মারা হ'ল। কিন্তু তবু রাত্তিরে চাঁপা ঘুমুতে পার্‌লে না। বকুল-ফুল এসে বল্‌লে, "আমি এসেছি, মালা গাঁথো।" ময়ূরের পালক এসে বল্‌লে, "কই মুকুট?" কল্‌সী এসে বল্‌লে, "কই নাইতে যাবে না?" চাঁপা উঠে বস্‌ল। কেউ কোথাও জেগে নেই। অন্ধকারে চুপি-চুপি গিয়ে চাঁপা পাতার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল।

পাতার ঘর পুড়ে গেল; আর গেল চড়াই পাখীর স্বামী ছেলে-পুলে নিয়ে। চড়ায়ের বৌ পুড়্‌ল না, পালিয়ে গেল।

আর পুড়্‌ল চাঁপার কপাল।

পরের রাত্তিরে চাঁপা ঘুমুবে—কানের কাছে চড়াই-মা ডেকে উঠ্‌ল—"চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা"—চাঁপা চম্‌কে উঠে সোনার পালঙ্কে ব'সে রইল।

রাণী হ'য়েও চাঁপার সুখ নেই। না ঘুমিয়ে চাঁপার অমন সোনার বরণ কালি হ'য়ে গেল। পরদিন চড়াই-মাকে মার্‌তে সৈন্য ছুট্‌ল, সেনাপতি ছুট্‌ল, স্বয়ং রাজা ছুট্‌লেন। চাঁপা তার সর্ব্বস্ব পণ কর্‌লে—যে মার্‌বে চড়াইকে—

কিন্তু কেউ পার্‌ল না। চড়াই পাখী পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আর রাত্তিরে চাঁপা চোখ বুজ্‌লেই বলে, "চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা—আমার ছেলে কই, মেয়ে কই?—"

চড়াই-মাও মরে না—চাঁপার চোখে ঘুমও আর আসে না।

ফ্লাসে রুশো'র বেল্‌জিয়ান্ গল্প অবলম্বনে
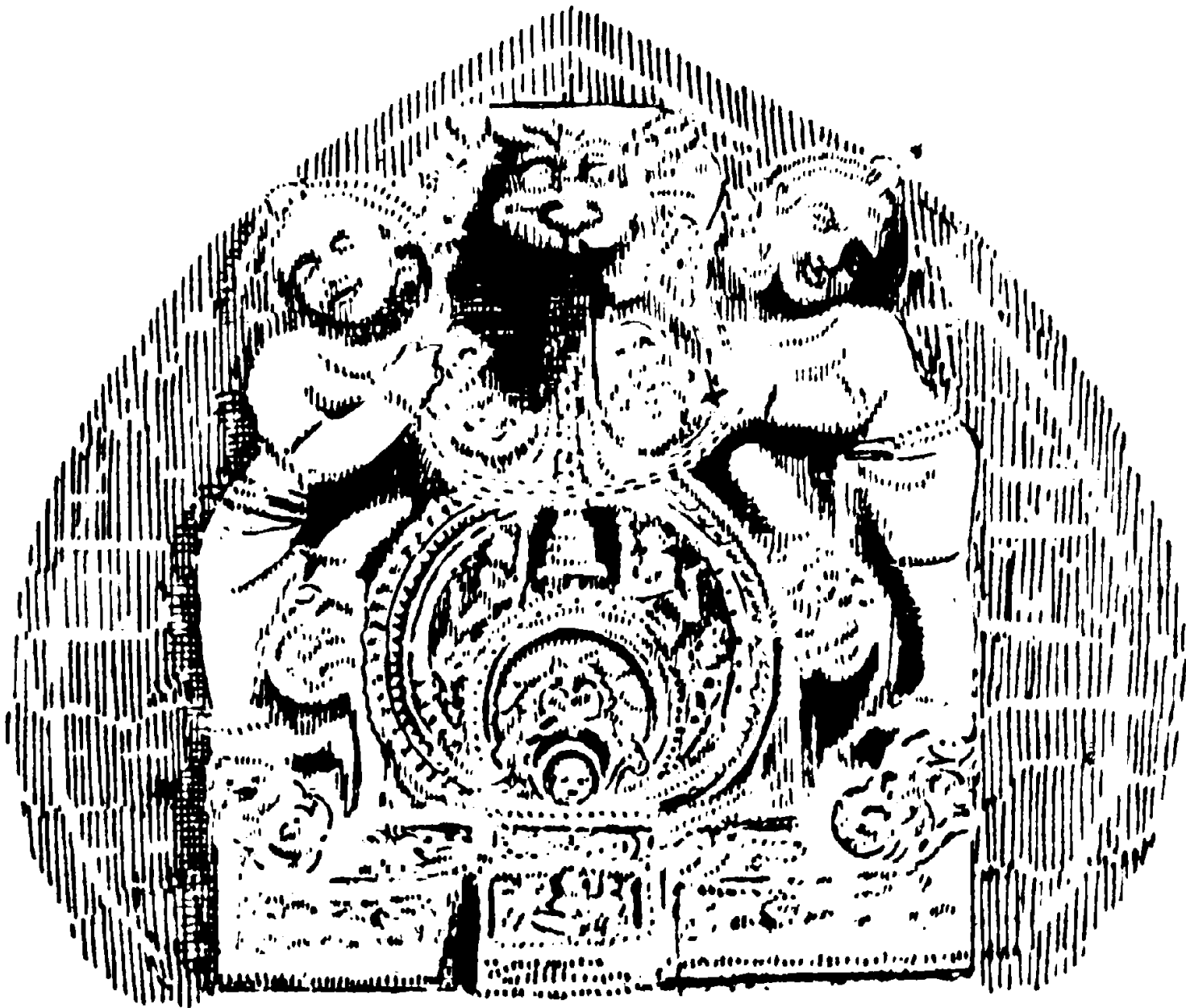
জলাঙ্গী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

দেখিলাম শ্যামা মেয়ে প্রান্তরের বটতরুমূলে
শিথিল কবরী বন্ধ; গুচ্ছ দুই শুভ্র ভাঁট ফুলে
রচিয়া সীমন্ত-শোভা, তরঙ্গিত সুদীর্ঘ অঞ্চল
প্রসারিয়া চৈত্র-রৌদ্রে একাকিনী শান্ত অচপল
চেয়ে আছে দূর শূন্যপানে। মেঘ সম নীল শাড়ী
আলিঙ্গিয়া সর্ব্বতনু চ'লে গেছে দেহসীমা ছাড়ি'
দিগন্তে স্বপ্নের মত—শস্যহীন ক্ষুধাতুর দেশ,
ক্লান্তকণ্ঠে ডাকে ঘুঘু, নেত্রে নামে তন্দ্রার আবেশ!
তরুচ্ছায়াতলে আসি' মনে হ'ল চিনি যেন তা'রে,
তাহার মুখের রেখা জন্ম-জন্মান্তের অন্ধকারে
অর্দ্ধ-বিস্মৃতির দীপে উদ্ভাসিয়া উঠিল হৃদয়ে—
স্নেহস্বরে সম্ভাষিয়া কহিলাম, 'অয়ি অবিস্ময়ে,
ভুলেছি তোমার নাম—বহুদূর আসিয়াছি চলি'!'
'জলাঙ্গী—গঙ্গার সখী'—স্নিগ্ধহাস্যে কহিল শ্যামলী।

সহসা পড়িল মনে, পুরাতন পরিচয়-পথে
একটি মালার মত দিনগুলি গাঁথা এর স্রোতে।
এর জল-কলধ্বনি, শ্রাবণের ঘন-সমারোহ,
উদয়-অস্তের লীলা, দিনান্তের সন্ধ্যারাগমোহ,
আমার কাব্যের মাঝে এর লঘু গোপন সঞ্চার
প্রথম করিনু অনুভব। হৃদয়ের গুরুভার
দূরে গেল, কহিলাম, 'চিনিয়াছি, হে শ্যামলী মেয়ে,
কিশোর-স্বপ্নের সাথী, কতদিন মৃদুগান গেয়ে
ফিরেছি তোমার পাশে। তুমি ছিলে অদূরবর্ত্তিনী
তটপ্রান্তলীনদেহা বহুদূর-দিগন্ত-সঙ্গিনী—
ঋতুর বিস্ময়ঘেরা মূর্ত্ত স্বপ্নসম ছায়াময়ী;
আজ দেখি নদী নহ, নারী তুমি কবি-চিত্ত মোহি'
ব'সে আছ একাকিনী প্রান্তরের পথতরুমূলে।
শুনিছ কি সেই বাঁশী বাজিত যা' তব কূলে কূলে?'

'বঙ্গের যমুনা তুমি মেঘকৃষ্ণা অয়ি অপরূপে,—
বৈষ্ণবী রসের ধারা সুরভিত অনুরাগ-ধূপে।
তব ঘন কালো জলে পলে পলে লহরে লহরে
আত্মবিসর্জ্জনী গান বাজিতেছে তরলিত স্বরে
উদার বঙ্গের মাঠে। শুনি গৌড়-সারঙের সুরে
অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-কথা—সে কাহিনী আসে ঘুরে ঘুরে
স্বপ্নশেষ শতাব্দীর রূঢ় রৌদ্রে, অয়ি উদাসিনি!
তুমি ত' জানো না নিজে উঠিছে কি বিস্মৃত রাগিণী
অবিশ্রাম গতির ভঙ্গীতে!' জলাঙ্গী উঠিল হাসি'—
মল্লিকা-বকুল-কুন্দ শুভ্র ফুল যেন রাশি রাশি
নিঃশব্দে ঝরিয়া গেল—'সে কাহিনী পড়ে না ত' মনে,
আমার নূতন জন্ম, নব স্রোত, নূতন প্লাবনে
সে স্মৃতি ফেলেছি দূরে; নারী নহি;—নিত্যগতিশীলা
কালস্রোতে ছুটে চলি—ভুলে যাই—এই মোর লীলা।'

'হে নদি, দেখেছি আমি মানবীর মুহূর্ত্ত-বিলাস;
সে-ও ত' তোমারি মত ভুলে যায় স্নিগ্ধ অবকাশ!
কত কাব্য, কত গান বৃথা রচে চরণ-শৃঙ্খল!
গতির গভীর বেগে বিচ্ছেদের ধ্বনি অবিরল
বাজিছে গম্ভীর মন্দ্রে! একরূপ—নদী আর নারী
নিশিদিন চেয়ে আছি—সে রহস্য বুঝিতে না পারি;
বেগস্থির জলদেহ, তলহীন পরিণামহীন—
অজ্ঞাত ইঙ্গিতে ছুটে, চেয়ে আছি মুগ্ধ নিশিদিন!'
দিন শেষ হ'য়ে এল; শৈবালের ঘন গন্ধ সনে
আসন্ন গোধূলি-ছায়া;—মোহমন্ত্র পশিল শ্রবণে!
কম্পমান পল্লবের প্রান্তচ্ছেদে দেখিলাম চেয়ে
অস্ফুট ছায়ার মত নেমে গেল শ্যামলী সে মেয়ে,—
মিশে গেল নীল জলে; স্রোতোবেগ উঠিল উচ্ছলি'—
'আপনারে ভালোবাসি—নদী আমি!'—কহিল শ্যামলী!

সতী

শ্রীসীতা দেবী

সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে। যেন প্রলয়-ঝড়ের আগের আকাশ, যেন অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বের আগ্নেয় গিরি। মানুষ কয়টী পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে, কথা পারতপক্ষে কেহই বলিতেছে না। এমন কি ছেলে-মেয়ে তিনটাও গোলমাল করিতে বা কাঁদিতে ভরসা পাইতেছে না। পাড়ার মানুষ দুই চারি জন সারাক্ষণই রহিয়াছে, কেহ ডাক্তারের বাড়ী যাইতেছে, কেহ পাশের বাড়ী গিয়া টেলিফোন্ করিতেছে, কেহ বা রোরুদ্যমানা ছোট খুকীকে সাম্‌লাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

খাইবার মত অবস্থা বা উৎসাহ কাহারো নাই, তবু গৃহস্থের বাড়ী হাঁড়ি না-চড়া অলক্ষণ, বামুন ঠাক্‌রুণ অতি বিষণ্ণভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। সে এ বাড়ীতে আছে দশ বৎসর, পরিবারের একজনেরই মত, ইহাদের বিপদ-আপদ যেন তাহার নিজের বিপদের মতই বোধ করে।

বছর বারোর একটি মেয়ে অতি ম্লান মুখে রান্না-ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বামুন ঠাক্‌রুণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, বেলা দিদি? ডাক্তারবাবু এলেন?"

বেলা বলিল, "না, তাঁর এখনও আস্‌তে ঘণ্টা-খানেক দেরি হবে। 'কলে' বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে বাড়ীতে মোটে পাওয়াই গেল না। দুধ জ্বাল হয়েছে?"

"হয়েছে", বলিয়া পিতলের কড়া হইতে ঝক্‌ঝকে একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা দুধ সে ঢালিয়া দিল। বেলা আঁচলের খুঁটটা হাতের উপর পাতিয়া তাহার উপর বাটি বসাইয়া দুধ লইয়া চলিয়া গেল। বামুন ঠাক্‌রুণ, মাছের কড়াটা আবার উনুনের উপর চাপাইয়া দিয়া আপন মনেই যেন বলিল, "কি গতি হবে, মা দুর্গাই জানেন। আহা কচি-কাচা নিয়ে ঘর করছিল, তাও পোড়া দেবতার সইল না।"

বাড়ীতে মানুষ নিতান্ত কম নয়। বৃদ্ধা মা আছেন, বিধবা দিদিও শ্বশুরবাড়ীর উৎপাত বেশী সহ্য করিতে পারেন না, নাবালক পুত্রটিকে লইয়া ভাইয়ের সংসারেই বছরের দশটা মাস কাটাইয়া দেন। তাহার পর ভবতোষ নিজে, পত্নী কল্যাণী, ছেলে-মেয়ে তিনটি; আরও একটির আগমনের সম্ভাবনা জানা গিয়াছে। বড় মেয়ে বেলা, বছর বারো বয়স, তাহার পর একটি সন্তান মারা গিয়াছে, খোকা কল্যাণের বয়স আট বৎসর হইবে, তাহার পরও শোকের ব্যবধান, ছোট খুকি রত্নমালা তিন বৎসরের।

সুখে দুঃখে দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। ভবতোষ চাকুরি মন্দ করে না—সওয়া দুশো টাকা মাহিনা। আজকালকার বাজারে কয়টা মানুষ আনিতে পারে? তাহার উপর বাড়ীখানা তাহার নিজের। ছোট হইলে কি হয়, মাথা গুঁজিয়া থাকা ত' চলিতেছে? একমাস ভাড়া গুণিতে না পারিলেই পথে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে না।

দিন দশ বারো আগে হঠাৎ আফিস হইতে ফিরিয়া ভবতোষ কিছু খাইতে চাহিল না। কল্যাণীকে বলিল, "বেশ কড়া ক'রে এক পেয়ালা চা ক'রে দাও ত'; আর কিছু খাব না।"

কল্যাণী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কেন গা, কি হ'ল? কিছু খাবে না কেন?"

ভবতোষ বলিল, "গা-টা কেমন যেন গুলচ্ছে, এখন জ্বর-জারি না হ'লেই বাঁচি। এই গেল-মাসে খোকার অসুখে তিন দিন কামাই করতে হ'ল। রোজ রোজ এমনি হ'লে সায়েবই বা মনে করবে কি?"

কল্যাণী চা করিয়া আনিল। কিন্তু চা ভবতোষের সহ্য হইল না। খাওয়া মাত্র সমস্তটা বমি করিয়া সে শুইয়া পড়িল। সন্ত্রস্তা কল্যাণী গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে।

সেই জ্বর এখন অবধি সমানে চলিয়াছে; বরং বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ডাক্তার দেখিতেছেন, তিনি নিজেই গরজ করিয়া একজন বড় ডাক্তার শুদ্ধ আনিয়া দেখাইয়াছেন, সকলেরই এক অভিমত—টাইফয়েড্। চৌদ্দ দিনের দিন জ্বর ত' ছাড়িল না, একুশ দিনের দিন যদি ছাড়ে, সেই আশায় সকলে পথ চাহিয়াছিল; ইতিমধ্যে কাল হইতে রোগের আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন, নিউমোনিয়াতে দাঁড়ানও বিচিত্র নয়।

মা ত' আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। তিনি সকল কাজের বাহির, তাঁহার কাছে কেহ কিছু কাজ অবশ্য প্রত্যাশাও করিতেছে না। সবাই আড়ালে বলাবলি করিতেছে, "বুড়ীর কি কপাল গা! এই দেখ্বার জন্যে এতকাল বসেছিল? বুড়ো মানুষের রোগ হ'য়ে সার্তে নেই, সেবার পুরীতে অমন কঠিন রোগ হ'ল, গেলেই পার্ত? তা' না এখন কাণ্ড দেখ! যমদূত কখনও এম্নি ফির্বে না, কাউকে না কাউকে নিয়েই যাবে।"

দিদি সংসার দেখিতেছেন, ছেলেমেয়েদের খানিক খানিক সাম্লাইতেছেন, আবার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে জুটিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। কল্যাণীকে ডাক্তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রোগীর ঘরে যাওয়া-আসা করিতে বারণ করিয়াছিল, সে কথা শোনে নাই। স্বামীর সেবা সে দিনরাত অবিশ্রান্ত করিতেছে, ছোট মেয়েটাকে ননদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে, পাছে ছোঁয়াচ লাগে বলিয়া তাহাকে আর স্পর্শও করে না। স্নানাহারের জন্য কেহ যখন তাহাকে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, তখন নাওয়া-খাওয়ার বদলে সে ঠাকুর-ঘরে গিয়া মাথা কোটে। কপালের যা চেহারা হইয়াছে, মানুষটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আজ সকাল হইতেই ভবতোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ার লোক আসি জুটিয়াছে, বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক হইবা মত কেহই নাই, তাই টেলিগ্রাম করিয়া কল্যাণীর খুড়তুতো ভাইকে আনান হইয়াছে। বিপদের উপর বিপদ, যে ডাক্তারবাবু এতদিন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে সকাল হইতে পাওয়াই যাইতেছে না, আর এক কোন্ মরণাপন্ন রোগীর বাড়ী গিয়া বসিয়া আছেন। অথচ এমন সময় হট্ করিয়া ডাক্তার বদল করাও চলে না। টেলিফোন্ করিয়া, লোক পাঠাইয়া বিশেষ কোনই ফল হইতেছে না।

ভবতোষের কাছে এখন দিদি বসিয়া আছেন। খুকিকে কখনও বেলা আগ্লাইতেছে, কখনও পাশের বাড়ীর একটি বউ আসিয়া কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণী ঠাকুর-ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি যে করিতেছে, তাহা সে-ই জানে। ছেলেমেয়েদের খাওয়া একরকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, বড়রা কেহই খায় নাই। বামুন ঠাকরুণ বেলা দুইটা অবধি হেঁসেল আগ্লাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার পর সেও হাঁড়ি তুলিয়া দিয়া, দুইটা মুখে গুঁজিয়া আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরে শুইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় সদর দরজার কাছে ডাক্তারের গাড়ী থামিবার শব্দ শোনা গেল। কল্যাণী আর খুকি বাদে সবাই প্রায় দৌড়িয়া রোগীর ঘরের দরজায় হাজির হইল। ডাক্তার ভবতোষের অবস্থার কথা জানিয়াই আসিয়াছিলেন, কোনদিকে না তাকাইয়া গট্ গট্ করিয়া সোজা ভবতোষের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করা, রোগীর অবস্থার বর্ণনা শোনা, জ্বরের 'চার্ট' দেখা চলিতে লাগিল। তাহার পর ডাক্তার তেমনি গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভবতোষের মা একেবারে তাঁহার সামনে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন, "ও বাবা, একটু কিছু ভরসা দিয়ে যাও। কেমন দেখ্লে আমার বাছাকে?"

ডাক্তার থম্কিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাহার পর

বলিলেন, "দেখুন, এটা মানুষের ত' হাত নয়, যথাসাধ্য চেষ্টা মাত্র আমরা করতে পারি। তা' আপনারা এখনই এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন? এর চেয়ে কত খারাপ 'কেস্' ভাল হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা হ'লে কি না হ'তে পারে?"

বৃদ্ধা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। বেলা বেচারীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরমার পিছন পিছন চলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কল্যাণীর ভাই সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম বুঝছেন? 'কেস্' কি খুব 'সিরিয়াস্'?"

ডাক্তার বলিলেন, "সিরিয়াস্ বৈ কি? টাইফয়েডের উপর নিউমোনিয়া দাঁড়ান, সাংঘাতিক ব্যাপার।"

সরোজের মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "একেবারে সারবার chance নেই?"

ডাক্তার জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, অত ভয় পেলে চলে কখনও? Chance থাকবে না কেন? তবে আপনারা ইচ্ছা করেন ত' আবার কাউকে consultationএর জন্যে ডাকা যেতে পারে।"

তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন সেটা দোতলা ও একতলার ঠিক মাঝামাঝি স্থান। এইখানে একটি ছোট নীচু ঘর, বাড়ীর লোকে বলে দেড়তলা। ইহাই ঠাকুরঘর।

ডাক্তারের কথা শেষ হইতে না হইতে ঠাকুরঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। দেখা গেল, কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। পরণে ময়লা লালপেড়ে শাড়ী, চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত, চোখ দুইটী রক্ত-জবার মত লাল, তাহা হইতে দর্ দর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। কপালটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, রক্ত জমিয়া আধখানা কপাল জুড়িয়া কালশিরা।

ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কল্যাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি এ করছেন কি? শেষে কি একটা প্রাণীহত্যা করবেন, না নিজে মারা যাবেন? ছেলেমেয়েদের কথা একবার ভাবুন। সংসারে থাকতে গেলে শোক-দুঃখ ত' আছেই, তাই ব'লে একেবারে হাল ছেড়ে দিতে হবে?"

কল্যাণী ভাঙা গলায় বলিল, "ঠাকুর দয়া ক'রে তাঁকে রাখেন ত' সবাই থাকব, নয়ত তিন জনেই যাব।"

ডাক্তার সরোজকে বলিলেন, "আপনারা এঁকে neglect করবেন না। এঁর অবস্থাও খুব আশঙ্কা-জনক। আমি আপনাদের সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি, এই ভাবে চললে 'সিরিয়াস্' ব্যাপার ঘটবে।"

সরোজ বলিল, "কি যে করা যায়, আমরা যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়েছি। একে কে-ই বা দেখে, আর কে-ই বা বোঝায়? উল্টে ও দিন নেই, রাত নেই, রোগীর সেবা করছে।"

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আপনারা বরং নার্স রেখে দিন, এই অবস্থায় ওঁকে ও রকম ক'রে খাটতে দেওয়া criminal folly."

ডাক্তারের গাড়ী চলিয়া গেল। সরোজ উপরে উঠিতে গিয়া দেখিল, কল্যাণী তখনও ঠাকুরঘরের চৌকাঠের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই খেয়েছিস্ কিছু?"

কল্যাণী বলিল, "সকালে দুধ খেয়েছিলাম।" সরোজ রাগ করিয়া বলিল, "কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি? একে ত' এই বিপদ, তা'র উপর তুই একটা অনর্থ বাধাতে চাস্? ছেলেমেয়েগুলো কোথায় দাঁড়াবে?"

কল্যাণী পাগলের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ও দাদা, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে আর জ্বালিও না। আমার বেঁচে কি হবে? পোড়া কপাল নিয়ে আমি বাঁচতে চাইনে। তার আগে এ কপাল আমি পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেলব। ছেলেমেয়েকে যে পারে সে দেখবে।"

সরোজ উঠিয়া চলিয়া গেল। এই অর্দ্ধ-উন্মাদিনীকে

কি সে বুঝাইবে? স্বামী ভিন্ন জগৎ-সংসার ইহার কাছে অর্থহীন। স্বামীকে হারাইবার আশঙ্কায় পৃথিবী ইহার কাছে বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। এমন কি সন্তান-স্নেহও এই মহাভয়ের কাছে পরাভব মানিয়াছে।

কল্যাণী নিজে শৈশবে মাতৃহীনা, তবু মাতৃহীন শিশুর দুর্ভাগ্যের কথা আজ সে ভাবিতে পারিতেছে না। দারুণ আশঙ্কা তাহাকে গ্রাস করিতেছে, পায়ের তলার সমস্ত আশ্রয় তাহার হঠাৎ খসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। অশিক্ষিতা, অবরোধবাসিনী, বাংলার মেয়ে সে। তাহার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নাই, সে আর-এক জীবন-তরুর পরগাছা মাত্র। সেই বৃক্ষমূলেই যদি আজ শমনের কুঠারাঘাত বাজিয়া উঠে, তবে কল্যাণী বাঁচিয়া থাকিবার সাহস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে?

সমস্ত দিনটা একই ভাবে কাটিয়া গেল। কল্যাণী আবার স্বামীর ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার শাশুড়ী দরজার কাছে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছেন। সরোজ নার্স আনার কথা বলিতে গিয়াছিল; কল্যাণী, তাহার ননদ এবং শাশুড়ী একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে কোনো খ্রীষ্টানীকে আসিয়া ভবতোষের সেবা করিতে হইবে না।

নীচের তলায় বেলা রান্নাঘরে বসিয়া চিঁড়া ভিজান খাইতেছে। কল্যাণের ওসব বাজে জিনিস পছন্দ না, সে নিজেই মোড়ের দোকান হইতে হিঙের কচুরি কিনিয়া আনিয়াছে, দরজার আড়ালে লুকাইয়া তাহাই খাইতেছে। লুকানর প্রয়োজন এইজন্য যে, দেখিতে পাইলে মামাবাবু শুধু যে বকিবে তাহা নয়, কচুরি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিবে। ছোট খুকী সম্প্রতি একলাই ঘুরিতেছে, পিসীমা কাপড় কাচিতে ঢুকিয়াছেন, বেলাকে বলিয়া গিয়াছেন খুকীকে দেখিতে। বেলা খাইতে ব্যস্ত, কথাটা বিশেষ কানে নেয় নাই। খুকী দাওয়া হইতে কয়েকটা মুড়ির দানা কুড়াইয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে।

বামুন ঠাক্‌রুণ উপরে গিয়াছিল বার্লির জল পৌছাইয়া দিতে। কল্যাণীকে ডাকিয়া বলিল, "অ বৌমা, এধারে একটু শুনে যাও, বাছা।"

কল্যাণী বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

বামুন ঠাক্‌রুণ বলিল, "কাতী বল্‌ছিল কি যে, গলির মোড়ে শেঠেদের বাড়ী ভারি একজন সাধু মহাত্মা এসেছেন; এপাড়া-ওপাড়া ঝেঁটিয়ে সব তাঁর দর্শনে আস্‌ছে। আমি বলি তুমি একবার যাও না, মা? তাঁদের দয়া হ'লে কি না হ'তে পারে?"

কল্যাণী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় যাব।"

ডাক্তারবাবু সন্ধ্যার সময় আর একজন ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখিলেই কল্যাণী পলায়ন করিত। তাঁহার উপদেশগুলি তাহার গায়ে যেন তপ্তজলের ছড়ার মত লাগিত। পুরুষের জাত, কি করিয়া বুঝিবে কল্যাণীর বুকে কি চিতার আগুন জ্বলিতেছে? সুতরাং ডাক্তারের সাড়া পাইয়াই সে কলের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

ডাক্তারেরা আধঘণ্টা থাকিয়া, ঔষধ-পথ্যাদির খানিক খানিক বদল করিয়া প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী তখন বাহির হইল। গা ধুইয়াছে বটে, তবে চুলের অবস্থা আগেরই মত, একখানা ময়লা শাড়ী বদ্‌লাইয়া আর একখানা পরিয়াছে।

কাতী-ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "তুই হারিকেনটা নিয়ে আমাকে একটু শেঠেদের বাড়ী পৌছে দিবি চল।"

কাতী হারিকেন আনিতে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিল। কল্যাণী বামুন ঠাক্‌রুণকে ডাকিয়া বলিল, "মা কি ঠাকুরঝি যদি খোঁজে ব'লে দিও কোথা গেছি। দাদা এখন ওপরের ঘরে আছে, সে-ই দেখ্‌বে।" কাতী লণ্ঠন লইয়া আসিল, দুই জনে গলির পথে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু জগতে আজ কল্যাণীর জন্য কোথাও সান্ত্বনা নাই। প্রেমানন্দ স্বামীর কাছেও সে কোনো আশ্বাস

পাইল না। শোকার্ত্তকে, দুঃখীকে পথ দেখাইবার কাজই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কোনো পরোয়ানা তাঁহারা লাভ করেন নাই। কল্যাণী অল্পক্ষণ পরেই কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল। সরোজ তাহাকে বকিতে আসিয়াছিল, কান্না দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

ভোর হইতে না হইতে কল্যাণী নীচে নামিয়া আসিয়াছে। রাত্রে দুই এক ঘণ্টার বেশী সে ঘুমায় না, যদিও সরোজ এবং পাড়ার একটি ছেলে পালা করিয়া বেশীর ভাগ রাত্রি জাগিয়া থাকে। বামুন ঠাক্রুণ সবে তখন রান্নাঘর ঝাঁট্ দিতেছে। কল্যাণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বৌমা, এত সকালে নেমে এলে যে? দাদাবাবু কেমন?"

কল্যাণী বলিল, "তেমনিই। আমি একবার কালীঘাটে যাব, বামুন-মা, আমার সঙ্গে যাবে কে?"

বামুন-মা বলিল, "তাই ত' কে যায় এখন? সকাল-বেলাটা সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তা' তুমি না হয় লাটুর পিসীর সঙ্গে যাও, চল তাদের দরজা অবধি আমি পৌছে দিয়ে আসি।"

কল্যাণী তেমনই মলিন বস্ত্রে, মুখ-হাতে জল পর্য্যন্ত না দিয়া বামুন ঠাক্রুণের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

খানিক বাদে রোগীর গোঙানীতে সরোজের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া ক্যাম্প খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ব্যস্! কলি গেল কোথায়? এই না আমাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিল, যে এর পর সে দেখ্বে, বাতাস কর্বে। ওষুধটাও খাওয়ায়নি দেখ্ছি। এদের সেবা কর্তে আসা মানে খালি নিজেদের হিষ্টিরিয়াকে চরিতার্থ করা।" বিরক্তমুখে উঠিয়া-বসিয়া সে কল্যাণীর ত্রুটিগুলি সারিতে প্রবৃত্ত হইল।

কল্যাণী যখন ফিরিল, তখন প্রায় বেলা দশটা। ভবতোষের অবস্থা ভাল ত' কিছু নয়ই, বরং হয়ত বা আরও একটু খারাপ। কিন্তু কল্যাণীর মুখের ভাব বদ্লাইয়া গিয়াছে। কোথায় কি যেন অবলম্বন সে পাইয়াছে। এই মহাবিভীষিকার অন্ধকারের ভিতর কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল?

স্বামীর ঘরে আর সে বসিতে চায় না। পঞ্চাশ বার খালি ঠাকুরঘরে গিয়াই দরজা বন্ধ করে। মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে কি সব বলিতে থাকে, পাষাণের দেবতা হয়ত বা শোনেন, মানুষের কর্ণগোচর কিছুই হয় না। কল্যাণী রোগীর ঘর ছাড়াতে সরোজ বরং খুসিই হইয়াছে, সে কল্যাণীকে আর একবারও ডাকে নাই। পাড়ার দুই একটি ছেলে-ছোক্রা আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে সে কাজ চালাইয়া লইতেছে। কাজ ভালই চলিতেছে, কারণ ইদানীং কল্যাণীর অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল তন্দ্রাবিষ্টের মত, সে কি যে করিত, আর কি যে না করিত, তাহার ঠিকানা ছিল না।

সরোজ একবার বাহিরে গিয়া কল্যাণীর খোঁজ করিল, সে ঠাকুরঘরেই আছে। কল্যাণীর ননদকে সামনে দেখিয়া সরোজ বলিল, "কলিকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলুন না, এখন যখন এদিকে আস্ছেই না, একটু বিশ্রাম করুক।"

ভবতোষের দিদি বিরক্তভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঘুমুবারই তার এখন সময় বটে! তার যা হচ্ছে সে-ই জানে। আর আমি ডাক্লেই সে শুতে আস্বে কিনা; সে ত' এখন ঠাকুরঘরে।"

সরোজ চলিয়া আসিল। কল্যাণীরই বা দোষ কি? বাংলাদেশের মেয়ের জীবনের মূল্য অন্য কাহারও কাছে যখন নাই, তখন তাহার নিজের কাছেই বা থাকিবে কেন?

কল্যাণী সেই যে দশটায় ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করিল, আর সে বাহির হইল না। এদিকে ভবতোষের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে গড়াইয়া চলিল। বিকালে ডাক্তার আসিয়া মুখ একেবারে গম্ভীর করিয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করিয়া বলিলেন, "আপনারা আর যদি কাউকে দেখাতে চান, দেখাতে পারেন। আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি বিদেশে থাকেন ত' wire ক'রে দিন।"

মা আর দিদি ডাক্তার আসিলেই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজও দাঁড়াইয়া ছিলেন। দরজাটা ছাড়িয়া ইঞ্চি-দুই পাশে সরিয়া আসিয়া তাঁহারা এমন বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন যে, মোহাবিষ্ট রোগী পর্য্যন্ত খাটের উপর নড়িয়া উঠিল। ডাক্তার এবং সরোজ মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদিগকে টানিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেল। ডাক্তার বলিলেন, "আপনাদের একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকা উচিত। ওঁর এখনও জ্ঞান রয়েছে, আপনাদের এরকম কান্নাকাটি শুন্‌লে মনে কষ্ট পাবেন যে?"

মা ও দিদি সমানে কাঁদিতে লাগিলেন, নীচের থেকে বেলা এবং কল্যাণ উপরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সরোজ রোগীর ঘরে ছুটিয়া গিয়া দরজাটা ভাল করিয়া ভেজাইয়া দিল। তাহার সহকারী ছেলেটিকে বিখ্যাত এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য ট্যাক্সি করিয়া পাঠাইয়া দিল।

কান্নাকাটির মধ্যে ঠাকুরঘরের দরজা খুলিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল। একজন প্রতিবেশিনী বসিয়া মাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল গা? আমার কপাল পুড়েছে?"

প্রতিবেশিনী দাঁতে জিব কাটিয়া বলিল, "এখনই ওকি কথা, বেলার-মা? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কত মানুষ মর্‌তে মর্‌তে টাল সাম্‌লে যায়।"

কল্যাণী দ্রুতপদে স্বামীর ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভেজান, ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। সরোজ উঠিয়া আসিয়া বলিল, "তুই যা দেখি এখান থেকে। এখানে থেকে কোনো দরকার নেই। ছেলে মেয়েদের কাছে যা।"

কল্যাণী নীচে নামিয়া চলিল। ছেলেমেয়েরা কোথায়? বেলা ঠাকুরমার মাথার কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে, কল্যাণ গলিতে দাঁড়াইয়া আছে। ছোট খুকিটা কলতলায় বসিয়া জল-কাদা ঘাঁটিতেছে। কল্যাণী চাহিয়া দেখিল মাত্র, তাহার পর ঠাকুরঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

বামুন ঠাকরুণের চীৎকারে বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক একসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরঘরের দরজায় জড় হইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু বিকট পোড়া গন্ধে সিঁড়িতে পর্য্যন্ত দাঁড়ান যায় না।

চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকিতে কোনো ফল হইল না, শেষে কুড়াল দিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলা হইল। সরোজ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করিল। পাড়া-প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সরাইয়া লইল। যাক্ কল্যাণীর ভয়ের অবসান হইল, তাহার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হইয়া রহিল।

তাহার পর কয়েক ঘণ্টার ইতিহাস উহ্য থাকাই ভাল। কল্যাণীর শ্মশান-যাত্রায় শহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। খাটের উপর আপাদ-মস্তক চাদর ঢাকা দিয়া কল্যাণী শুইয়া আছে। দেখা যাইতেছে, আল্‌তা-পরা ছোট দুইটা পা, আর চাদরের উপর রাশি রাশি সিঁদুর। কলি-যুগের ধন্যা সতী! যমের মুখে যেন লাথি মারিয়া নিজের এয়োতি বজায় রাখিয়া চলিয়া গেল। সরকার বাহাদুর সতীদাহ উঠাইয়া দিলে হইবে কি? বাংলার মেয়ের মন হইতে ত' ইহা উঠে নাই? সেই সিঁদুরের এক কণার জন্য শ্মশানঘাটে যেন কাড়াকাড়ি বাধিয়া গেল। কল্যাণীর খবর বাহিরের লোকে এই প্রথম বড় বেশী করিয়া শুনিল এবং এই শেষ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভবতোষ বাঁচিয়াই রহিল! কল্যাণীর অপমৃত্যুর পরদিন হইতেই তাহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে সে সারিয়াই উঠিল। কল্যাণীর সুখ্যাতি প্রতিবেশিনী মহলে অক্ষয় হইয়া রহিল। ভবতোষের বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, বাঁচিল কেবল কল্যাণীর আয়ু পাইয়া। নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, আর-একটা অস্ফুট জীবনকলিকাকে ধ্বংস করিয়া কল্যাণী যমের খোরাক জুটাইয়া দিয়া গিয়াছে—ভবতোষকে আর মৃত্যু-দেবতার প্রয়োজন নাই।

* * *

মাস আট পরের কথা। ছোট খুকীটা মেঝেতে শুইয়া আছে ছেঁড়া কাঁথার উপর। তাহার হাত-পা কাঠির মত, মুখের রং ছাইএর মত, পেটটা খালি মস্ত বড়। বড় যেন দুর্ব্বল, হাত-পা নাড়িবারও ক্ষমতা নাই।

ভবতোষ বিকালে অফিস হইতে ফিরিয়া আসিল। ঘর-দোর বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যস্ত, শ্রীহীন। ঠিক সময় চা পাওয়া যায় না, জলখাবার পাওয়া যায় না, ঘরের শ্রী দেখিলে শেয়াল-কুকুর কাঁদিয়া যায়।

নিজের জুতা-জামা খুলিয়া রাখিয়া, চাদর ঘুরাইয়া ভবতোষ বাতাস খাইতে লাগিল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই যেন মরিয়াছে, কাহারও আর সাড়া-শব্দ নাই। মানুষটা সারাদিন যে তাতিয়া-পুড়িয়া ফিরিয়া আসিল, তাহাকে এক গেলাস জল পর্য্যন্ত দিবার লোক নাই। একখানা হাত-পাখাও কি রাখা যায় না? ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর বেলা আসিয়া হাজির হইল। বলিল, "বামুন ঠাকরুণ চা আন্‌ছে, চা ছিল না কিনা, কাত্তী বাজারে গিয়ে আন্‌ল তবে—"

ভবতোষ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরো ঘণ্টা দুই পরে আন্‌লেই হ'ত! চা নেই ত' ছ'দিন থেকে শুন্‌ছি, আনান হয় নি কেন?"

বেলা উত্তর দিবার আগেই বৃদ্ধা মা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, অত কথা কি মনে থাকে? তা' রাগ করলে চল্‌বে কেন? এক ত' তোমার মেয়ের জ্বালায় সারারাত ঘুম নেই চোখে, ট্যাঁ ট্যাঁ লেগেই আছে। এমন মেয়েও আর কারো ঘরে নেই।"

খুকীর দিকে ভবতোষের চোখ পড়িল, বলিল, "ওটা আছে কেমন?"

মা বলিলেন, "একই রকম। একটা লোকজন না রাখ্‌লে আর ত' চলে না, বাছা। আমিই বা কত রাত জাগি, আর সদুই বা কত জাগে? আর নাইতে নাইতে ত' প্রাণ গেল, সর্দ্দি আর ছাড়ে না। তোমার মেয়ের নোংরা কাচ্‌বার আর ঘাঁট্‌বার ক্ষমতা কি এ বুড়ো হাড়ে আছে?"

বেলা খুকীর কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল, "আবার ভিজিয়েছে।"

ঠাকুর-মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "কেতাথ করেছেন। আমি সবে কাপড় কেচে এসেছি, এখনই নরক ঘাঁট্‌তে বস্‌তে পারব না।"—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ভবতোষ রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সারাদিন খাটিয়া সে এই কুঁড়ের পালের অন্ন জুটাইবে, আর তাঁহারা তাহাকে বাধিত করিবেন গিলিয়া? বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ ও ভিজের প'ড়ে আছে শুনি? তোর পিসীও কি ওকে একটু দেখ্‌তে পারে না?"

বেলা বলিল, "পিসী ত' জপে বসেছে, এক ঘণ্টার আগে উঠ্‌বে না।"

ভবতোষ নিজেই খুকীর কাঁথা বদ্‌লাইতে অগ্রসর হইল। বেলাকে বলিল, "একে এই অসুস্থ মেয়ে, তাকে মেঝেতে ফেলে রেখেছে কেন? তক্তপোষে ওর জায়গা হয় না?"

বেলা বলিল, "পিসী বলে, রোজ কি তক্তপোষ ধোব নাকি? তার চেয়ে মাটিতেই থাক্।"

ভবতোষ বলিল, "তা বেশ, একেবারে রাস্তায় ফেলে দিলেই হয়, আর পরিষ্কার করার হাঙ্গাম থাকে না। দে একখানা শুক্‌নো কাঁথা; আর আমার গায়ে দেবার কম্বলটা নিয়ে আয়।"

বেলা বলিল, "কাঁথাগুলো অবেলায় কাচা হয়েছে, এখনও শুকোয় নি।"

ভবতোষ এক লাফে উঠিয়া গিয়া নিজের একটা শান্তিপুরে ধুতি টানিয়া আনিল। গায়ে দিবার কম্বলটা দুই ভাঁজ করিয়া পাতিয়া, তাহার উপর ধুতি পাট করিয়া পাতিয়া খুকীকে শোয়াইল, বলিল, "এটাও যাবে, যা অযত্ন হচ্ছে।"

ভবতোষের দিদি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "একটা মানুষ আর ক'দিক্ সামলাব শুনি?

ওমা ওকি, ভাল কম্বলখানা দিলি কেন? এখনি মুণ্ডুপাত হবে।"

ভবতোষ বলিল, "তা হোক্, যা' ক'রে প'ড়ে আছে, এ আর চোখে দেখা যায় না।"

দিদি বলিলেন, "যা' খুসি কর, বাপু। একটা লোক-টোক দেখ। আমিও ত' আর চিরকাল তোমার সংসার আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব না, আমার নিজের ঘর-সংসার আছে ত'?"

অত্যন্ত কঠিন উত্তর একটা ভবতোষের মুখে আসিল; সেটা কোনোমতে চাপিয়া সে বলিল, "তাই দেখা যাবে। বেলা বোস্ ত' খুকীর কাছে, আমি চা-টা খেয়ে আসি।"

দিন কতক কাটিল। খুকী যেন মায়ের অভাব সহিতে পারে না। মায়ের কাছেই সে যাইতে চায়। তাহার নধর কচি দেহের সব লাবণ্য ঝরিয়া গিয়াছে, তাহাকে এখন শুক্‌নো কাঠের পুতুলের মত দেখায়।

ভবতোষ একদিন রবিবার সারাটা দুপুর কোথায় কাটাইয়া আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলি সারাটা দিন? ছেলেটা প'ড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে এক কাণ্ডই কর্‌ল! আমি বুড়ো মানুষ এত তাল সাম্‌লাতে পারি?"

ভবতোষ বলিল, "তাল সাম্‌লাবার লোকের ব্যবস্থাই কর্‌তে গিয়েছিলাম। খোকা কোথায়?"

মা বলিলেন, "সতুর ঘরে শুয়ে আছে। কি লোকের ব্যবস্থা কর্‌লি?"

ভবতোষ বলিল, "লোক আর কি? তোমায় আর একটা বৌ এনে দেবো, শিখিয়ে পড়িয়ে চালিয়ে নিও, বাপু। যা' অবস্থা হয়েছে সংসারের, এ আর চোখে দেখা যায় না"—বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেল।

আবার বৌ আসিল। পাড়া-প্রতিবেশী ভীড় করিয়া বৌ দেখিতে দাঁড়াইল। কল্যাণীর লোহা-গাছি নূতন বৌয়ের হাতে পরান হইল। এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী বলিলেন, "এ লোহার মান রেখ, নতুন বৌমা। সতী-সাবিত্রীর লোহা এ। নিজের প্রাণ দিয়ে যমের মুখ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছে।"

আর সকলে সমস্বরে বলিল, "আহা সতী-লক্ষ্মী ছিল গো! এমনটা এ পাপ কলিকালে দেখা যায় না।"

ঘোম্‌টার ভিতর নূতন বধূর মুখ ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।

ঠাকুর-মা নাতি-নাতিনীদের কাছে বৌকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওরে, তোদের নতুন মা দেখ্; ভাব ক'রে নে।"

কিন্তু ছোট খুকী ভাব করিল না। কয়েক দিন বাদে সে রোগজীর্ণ যন্ত্রণা-কাতর ক্ষুদ্র দেহ ফেলিয়া দিয়া নিজের মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

"ফুল আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

শিল্প-বাণিজ্য

দেশীয় ফিল্মের ভবিষ্যৎ

শ্রীবিলাস

দেশীয় ফিল্ম-শিল্পের শৈশব অবস্থা এখনও পার হয়নি, সবে সূতিকাগার থেকে বা'র হয়েছে। কিন্তু এই অল্পদিনেই দেশী ফিল্মগুলি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এসম্বন্ধে আলোচনা করা চলে। একথা সত্য যে, এগুলি জনসাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করেছে। কেবল এই প্রীতির কতখানি স্ব স্ব কৃতিত্বের জোরে অর্জ্জন করা, আর কতখানি জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে এসেছে তাই নিয়ে সন্দেহ করা চলে।

প্রথম দেশী ছবি যখন দেখি তখন সুখীও হ'তে পারিনি, তার মধ্যে কোন আশার আলোও দেখ্‌তে পাইনি। তখন শুধু এই দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, এমন অপকৃষ্ট ছবি দেখ্‌বার জন্যেও দর্শকের ভীড়ের আর শেষ নেই। তার পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি ছবি বেরুল। তাতে কিছু উন্নতির আভাস দেখা গেলেও সে এমন বিশেষ কিছু নয়। তবু যতবারই গেছি, দেখেছি দর্শকের ভীড় ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। সুতরাং ছবি যেমনই হোক্ ছবি যাঁরা তুলেছেন তাঁদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। দেখা গেল, ফিল্ম-শিল্প লাভজনক। তখন ধনিকদের দৃষ্টি এদিকে পড়্‌ল, এবং একটির পর একটি ক'রে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কিরূপ গতিতে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বেড়েছে একটা হিসাব দিলেই বোঝা যাবে —১৯২১ সালে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা ছিল ১৪৮; ১৯২২-এ হ'ল ১৭১; ১৯২৩-এ ১৮৮; ১৯২৪-এ ২১৯; ১৯২৫-এ ২৮৬; ১৯২৬-এ ৩০৯; ১৯২৭-এ ৩৪৬ আর ১৯৩১-এ প্রায় ৫০০। যে সংখ্যা দিলাম তা' সমস্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ মিলিয়ে। এবং এর পরে আরও বেড়েছে।

এই জনপ্রীতির কারণ কি? প্রথম প্রথম যে-সব ছবি তোলা হয়েছে সেগুলোর কথা ছেড়েই দিলাম। এখন যে-সমস্ত ছবি দেখান হচ্ছে, বিদেশী ছবির তুলনায় সেগুলোও কিছুই নয়। আমাদের দেশে বিদেশী ছবি কম দেখান হয় না, এবং ভাল ভাল ছবিই দেখান হয়। এগুলো দেখ্‌লে দেশী ছবির সামনে ব'সে

থাকাও কষ্টকর মনে হয়। তবু দেশী ছবির ঘরে যে ভীড় জমে, তেমন ভীড় বিদেশী প্রথম শ্রেণীর ছবি দেখতেও জমে না। এক-একটা দেশী ছবি একাদিক্রমে যতদিন দেখান হয় কোন বিদেশী ছবিই ততদিন দেখান সম্ভব হয় না। কতকগুলি সিনেমা-গৃহে নিছক দেশী ছবি দেখান হয়। যখন দেশী ছবি পাওয়া যায় না, মাত্র তখনই তারা বিদেশী ছবি দেখাতে বাধ্য হয়। ১৯২৭-২৮ সালে সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটির রিপোর্টে আছে —

"There are some cinemas which show Indian films almost exclusively, and only resort to Western films when they cannot obtain Indian. The fact is that the supply of Indian films is not equal to the demand."

এবং "Exhibitors cannot always obtain Indian films, as the demand is greater than the supply. In particular, there is some difficulty in obtaining the better products, which command relatively high prices as compared with the ordinary Western film."

এর থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, দেশী ছবির শুধু যে চাহিদা আছে তাই নয়, যে পরিমাণ চাহিদা সে পরিমাণ তৈরী হয় না। এবং "As regards the relative popularity of Indian and Western films, there is no doubt that the great majority of the Indian audience prefer Indian films. Generally, an Indian film draws much larger audience than a Western film." – Report of The Indian Cinematograph Committee, 1927-28.

যদিও দেশী ফিল্ম-কোম্পানীর কল্যাণে বেকার-সমস্যা সমাধানের একটা পথ খুলেছে, এই শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে দেশের হাজার হাজার লোক অন্ন-সংস্থানের উপায় খুঁজে পেয়েছে, এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকছে, তবু এই জনপ্রীতির মূলে যে একমাত্র দেশাত্মবোধ তাও সত্য নয়; বিদেশী শিল্পের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় সাধারণতঃ জনসাধারণের দেশপ্রীতিই কাজ করে। এবং দেশী ছবির দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে সাধারণের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনও হয়নি। ভীড় এমনি জুটেছে দেশীয় গল্প-কথা দেশীয় ভাষায় সহজেই লোকের ভাল লাগে।

এর কারণ এই যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এমনিতেই অতি সামান্য। ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যা আরও কম, এবং ইংরেজীতে সবাক্ ছবি বোঝবার লোকের সংখ্যা তার চেয়েও কম। সুতরাং ছবি দেখার আনন্দ পেতে হ'লে দেশী ছবি-প্রদর্শনীতে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, ইংরেজী যারা জানে না, অথবা ইংরেজী জানলেও সবাক্ ছবির কথা বুঝতে যাদের কষ্ট হয় তারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদেশী ছবির চেয়ে যে-কোন দেশী ছবি দেখে আনন্দ পাবে বেশী। দেশী সবাক্ ছবির একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে, সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকের পক্ষেও তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। এর একটি সুবিধা এই যে, শুধু জনসাধারণের দেশাত্মবোধের উপর নির্ভর ক'রে কোন ব্যবসা দীর্ঘ দিন চলে না। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্যে মানুষ কিছুদিন ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। মানুষ বেশীদিন ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না, এবং ভাবপ্রবণতাও কখন চিরস্থায়ী হয় না। সেই জন্যে যে-সমস্ত শিল্প শুধু মানুষের স্বাদেশিকতাকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়ায়, ভাবপ্রবণতা ক'মে এলে বিদেশী প্রতিযোগিতার সংঘাতে সেগুলি ধূলিসাৎ হ'তে দেরী হয় না। ফিল্ম-শিল্পের সেই ভয় নেই।

সেদিকে ভয় নেই বটে, কিন্তু অন্যদিকে রয়েছে। পূর্ব্বেই দেখিয়েছি, দেশী ছবিঘরের সংখ্যা বেশ দ্রুতগতিতেই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যদেশের তুলনায় সে বৃদ্ধি কিছুই নয়। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রতি ৫৭৬০ লোকের জন্যে একটি ক'রে ছবিঘর আছে। গ্রেট্ ব্রিটেনেও প্রতি ১২৫০০ জন লোকের জন্যে একটি ক'রে ছবিঘর আছে। আর ভারতবর্ষে আছে

প্রতি দশলক্ষ লোকের জন্যে একটি। সুতরাং এখনও অনেক ছবিঘরই এদেশে বাড়বে। এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হবে। দেশী ছবির প্রযোজক-গণকে এখন থেকেই সেজন্যে সতর্ক হ'তে হবে।

এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেশী ছবি দেখান হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশেরই উপাখ্যান পৌরাণিক ঘটনা থেকে নেওয়া। আর কতকগুলি, প্রথিত-যশাঃ সাহিত্যিকের সর্ব্বজনপরিচিত উপন্যাস অবলম্বন ক'রে। আধুনিক কালের রস-রচনা ছবিতে খুব কমই স্থান পেয়েছে। এই ব্যাপারে প্রযোজকদের অন্তর্দৃষ্টির আমরা প্রশংসা করি। আমাদের দেশের ফোটোগ্রাফি এখনও অপরিণত। বিদেশী অভিনেতৃ-গণের অর্দ্ধেক দক্ষতাও এখানে দুর্লভ। সেই কথা উপলব্ধি ক'রে তাঁরা সহজ পথে পা বাড়িয়েছেন। পৌরাণিক ঘটনার প্রতি আমাদের সহজাত শ্রদ্ধা আছে। অভিনয় যত কদর্য্যই হ'ক, ছবি যতই বিশ্রী উঠুক, পৌরাণিক ছবি আমরা দিনের পর দিন সশ্রদ্ধ ভাবে দেখে যেতে পারি—একদিনও ক্লান্তি আসবে না। এই স্বভাব আমরা জন্মের থেকে অর্জ্জন করেছি। দেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ীগণ সাধারণের এই ধর্ম্মনিষ্ঠাকে মূলধন ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ফোটোগ্রাফির ত্রুটি তাঁরা গান দিয়ে ঢাক্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। বিদেশী ছবির যত গুণই থাক্ বিদেশী গান দেশী গানের মত মিষ্টি নয়, মানে আমাদের কাছে নয়। সুতরাং এইদিক দিয়ে দেশী কোম্পানীর সুবিধা আছে। এই সত্য প্রথম যাঁরা উপলব্ধি করলেন তাঁদের ছবি হৈ-হৈ ক'রে লোক টানতে লাগল। কিন্তু তাঁদের দেখাদেখি আরও যাঁরা সবাক্ চিত্রে গান জুড়ে দিলেন, বিপদ ঘটালেন তাঁরাই। গান ভাল জিনিষ, এবং ছবির সঙ্গে দু-চারটে গান মন্দও লাগে না। কিন্তু যদি রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে রাখাল বালক পর্য্যন্ত সকলেই ছবিতে সঙ্গীত-চর্চ্চা আরম্ভ করে, অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হয়।

ফোটোগ্রাফির ত্রুটি দেখে আমরা ক্ষুণ্ণ হই, কিন্তু লজ্জিত হই না। আধুনিকতম ফোটো-যন্ত্র রাখ্‌বার সামর্থ্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের যদি না থাকে তো সে অর্থের অভাবে। বস্তুতঃপক্ষে ওদেশে একখানি ছবি তুল্‌তে যে অর্থব্যয় করা হয় এদেশে তা কোনদিন ব্যয় করা সম্ভব হবে ব'লে কল্পনাও করতে পারি না। এই দারিদ্র্য আমাদের পক্ষে ক্ষোভের বিষয়, লজ্জার নয়। লজ্জিত হই তখনই, যখন প্রযোজকদের প্রযোজনা আমাদের রুচি-বোধে আঘাত করে। অর্থের অভাব আমাদের আছে। অদূর ভবিষ্যতে এই অভাব যে দূর করতে পারা যাবে, এমন সম্ভাবনাও আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এসকল কথা জানার পর কেউই বহুব্যয়-সাপেক্ষ দেশী ছবি দেখার প্রত্যাশা করি না। কিন্তু অর্থের অভাব আছে ব'লে রূপবোধের দারিদ্র্য থাকবে কেন? তাই প্রযোজকদের রূপবোধের অভাব এবং রুচির দৈন্য দেখে আমরা লজ্জিত হই। এখন পর্য্যন্ত ভাল ছবি তোলার চেয়ে সাধারণ দর্শকের মন ভোলাবার চেষ্টাই হচ্ছে বেশী। এবং এই ফাঁকি যদি আরও কিছুকাল চলে তা হ'লে দেশীয় ফিল্ম-শিল্প যেমন তাড়াতাড়ি উঠেছে অদূর ভবিষ্যতে তেমনি তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌বে, এ আশঙ্কা করা অমূলক হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা, বৈষ্ণব কবিদের উপাখ্যান অথবা পৌরাণিক কাহিনীগুলি যে আমাদের মনকে স্পর্শ করে তার কারণ, এই সমস্ত কাহিনীর মূলে আছে একটি অপরূপ রস-মাধুর্য্য। বিশেষ ক'রে প্রথমতঃ দুটি কাহিনীর মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য আছে যা গীতি-কবিতার মত সুন্দর। তাই বহুবার শুনেও এগুলি কিছুতে যেন পুরোনো হ'তে চায় না—'নব রে নব নিতুই নব, যখনই শুনি তখনই নব'। দেশী ছবিতে এই মাধুর্য্যের চিহ্নমাত্রও আমরা পেলাম না—না কথায়, না অভিনয়ে। শুধু কতকগুলি ঘটনার কঙ্কালকে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে একত্র করা হয়েছে। এর চেয়ে ঢের নিম্নশ্রেণীর প্লট, বিদেশী প্রযোজকদের হাতে বহুগুণে সুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে। এই রস-সৃষ্টির

জন্যে অর্থের প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলি না। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কবি-মনের। আমাদের প্রযোজকদের অভাব ঘটেছে বোধ করি সেই কবি-মনের।

তবু যে এই সব ছবি দেখার জন্যে দর্শকের ভীড় হয় কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। বিদেশী ছবি বুঝ্‌তে যাদের কষ্ট হয়, ছবি দেখ্‌তে গেলে তাদের পক্ষে দেশী ছবি দেখা ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু এইটেই শুধু একমাত্র কারণ নয়। এই সমস্ত ছবি দেখ্‌তে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি মাঝে মাঝে দর্শকদের চোখ অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। তার কারণ এই যে, ছবি দর্শকদের মনকে স্পর্শ করেছে, তার ভাবকে উদ্রিক্ত করেছে। কিন্তু সে গুণ ছবির নয়। আখ্যান-বস্তুর এমন একটি নিজস্ব রস আছে, যা বহুদিন আগে থেকেই আমাদের স্বপ্নের মধ্যে মাধুর্য্য বিস্তার করেছে। আমাদের চোখ যা দেখে, মন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখে। আমাদের কল্পনা ছুটে চলে স্বপ্ন-লোকে।

এতে ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের আপাততঃ কাজ চল্‌তে পারে বটে, কিন্তু বেশীদিন চল্‌বে না। ফিল্ম-শিল্প শুধুই একটা ব্যবসা নয়, এতে জাতির রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রস-বোধের অভাব ঘটেছে সর্ব্বত্র—প্রযোজকদের মধ্যেও বটে, অভিনেতাদের মধ্যেও বটে। সকলের কথা বল্‌ছি না; আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিনেতাই চেঁচান খুব, লাফান আরও বেশী, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনেও ত্রুটি করেন না। সবই করেন, কেবল অভিনয় করতে পারেন না। চোখের চাওয়ায়, মুখের ভঙ্গিতে কি ক'রে বিনাবাক্য-ব্যয়ে কথা বলা যেতে পারে, সে কৌশল এখনও তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। এঁদের দিয়ে দেশীয় শিল্পের কতখানি উন্নতি হ'তে পারে সে-বিষয়ে আজ অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

দেশীয় ফিল্ম-শিল্পের এই হ'ল সত্যকার অবস্থা। এর চাহিদা আছে যথেষ্ট। যত ছবি বৎসরে তোলা হয় তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ছবি তুল্‌লে তবে এই চাহিদা মেটে। ব্যবসা হিসাবে এর চেয়ে বড় আশার কথা আর কিছুই হ'তে পারে না। বিদেশী ছবির সঙ্গেও এর কোন প্রতিযোগিতা নেই,—এমন নিরঙ্কুশ এর গতি। ফিল্ম-শিল্প যদি বস্ত্র-শিল্প কিংবা অন্য কোন শিল্পের মত শুধুই একটা ব্যবসা হ'ত, যদি অন্যান্য ব্যবসার মত Demand and Supply এবং Competition নীতির ওপর এর ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করত তা হ'লে নিঃসঙ্কোচে বলা যে'ত, এই ব্যবসার মার নেই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, এটা শুধু একটা ব্যবসা নয়। রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে এই শিল্প আজ এতই পিছনে প'ড়ে রয়েছে যে, আশা করবার সূত্রটুকুও পাওয়া কঠিন বোধ হচ্ছে।

বেকারের ব্যবস্থা

বেকার-বান্ধব

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই আজকাল বেকার-সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশেও বেকার-সমস্যা বহুকাল হইতেই আছে; কিন্তু, অন্যান্য দেশের সমস্যা ও আমাদের সমস্যার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্যা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও আমরা তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভালরূপ চেষ্টা করি নাই। চাকুরি জুটিবার আশায় বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া সহস্র সহস্র যুবক বেকার বসিয়া থাকা সত্ত্বেও এতকাল আমাদের চক্ষু ফুটে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতিকে সাবধান করিয়া আসিতেছেন। বহুকাল হইতে তিনি আমাদের চাকুরির মোহ হইতে বাঁচাইবার জন্য নানারূপ সৎপরামর্শ দিয়াছেন, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, পত্রিকায় লিখিয়াছেন, এবিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছেন। এতকাল আমরা সে-পরামর্শ শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ বেকার-সমস্যা যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আর স্থির থাকা চলে না। চাকুরির বাজার যতদূর খারাপ হইতে পারে এখন তাহাই হইয়াছে। ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ, কাজেই আফিসের চাকুরির অবস্থাও শোচনীয়। ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হইলে সরকারী আয়েরও অবস্থা খারাপ হয়; কাজেই, সরকারী চাকুরির অবস্থাও খারাপ। চাকুরী-প্রিয় বাঙ্গালী যায় কোথায়? উকিলের রোজগার মন্দা; —তিনি কোম্পানীর সেক্রেটারীগিরি করিয়া, দালালী করিয়া, প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কায়ক্লেশে সংসার চালান; বি-এ, এম্-এ পাশ বেকার যুবক ২৫৲।৩০৲ টাকা মাহিনার চাকুরির জন্য আজ লালায়িত;—'অন্যে পরে কা কথা'? এই সময়ে যাহাদের চাকুরি গিয়াছে, তাহাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। যে সকল নবীন যুবক চাকুরি খুঁজিতেছে তাহাদের অধিকাংশের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া চাকুরির ভীষণ অবস্থার কথা ভাবিয়া ভগ্নোদ্যম হইতেছে, তাহাদের কথাই একবার ভাবিয়া দেখুন। সকলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

কিন্তু, এই সমস্যা এখন এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন আর দুঃখ করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলে না। বেকার যুবক কি করিতে পারে এবং কি ভাবে তাহা করিতে পারে সে-বিষয়ে এখন স্থির ভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। 'বেকার বান্ধব সমিতি', 'Unemployed Youths' Association' প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে—এরূপ আরও অনেক সমিতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল সমিতি কি ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

বেকারের টাকা কোথায়? সমিতির কাজ চালাইতে হইলে কিছু টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকা অত্যন্ত অনিশ্চিত ব্যাপার। উৎসাহী বেকারগণ ইচ্ছা করিলে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের (Charity Entertainment বা Performance) আয়োজন করিয়া সাধারণের নিকট কিছু টাকা পাইতে পারেন। বড় বড় দু'একটী ফুটবল বা হকি ম্যাচের 'দর্শনী'র টাকা (Gate-money) পাইলে তো বিস্তর টাকা সংগ্রহ হইয়া যায়। এ প্রণালীতে টাকা পাওয়াও সহজ। আরো অনেক প্রকারে—ভিক্ষার ঝুলি না ধরিয়াও—টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

কিছু টাকা সংগ্রহ হইলে সমিতির কাজ রীতিমত চলিতে পারে। সমিতি একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া নানারূপ শিল্পদ্রব্য ও আবশ্যক জিনিস প্রস্তুতের প্রণালী যাহাতে আছে এরূপ পুস্তক বা পত্রিকাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন। যে বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁহার দ্বারা মাঝে মাঝে উপদেশ দেওয়াইতেও পারেন। সমিতির একটি ঘর থাকা আবশ্যক এবং সেখানে বেকারের কাজে লাগিতে পারে এরূপ খবর সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে; যেমন—

(১) ওমুক জায়গায় ওমুক জিনিস পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতায় বা অন্য কোন জায়গায় আনিয়া বেচিতে পারিলে যথেষ্ট লাভে বেচা যায় (যেমন ফল, তরকারী, মসলা, বেত, ডিম ইত্যাদি)।

(২) ওমুক জায়গায় ওমুক জিনিস পাওয়া যায়, তাহা দিয়া সহজেই ওমুক জিনিস প্রস্তুত করিয়া বাজারে যথেষ্ট লাভে বিক্রয় করা যায়।

(৩) কলিকাতার বাজারে ওমুক ওমুক জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। তাহার সবই বিদেশ হইতে আমদানী। ইহার কোন কোনটি এখানে অল্প মূলধনে বানান যাইতে পারে (যেমন বোর্ডের, কাঠের ও কাপড়ের খেলনা, বেতের ছোট ছোট জিনিস; মোজার Suspender, রবর-ষ্ট্যাম্পের Self-inking pad, ফিতা ও Twine, Safety-razor blades, ইত্যাদি)।

(৪) ওমুক জায়গায় ওমুক ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। ভাল করিয়া প্যাক্ করিয়া চালান দেওয়া হয় না বলিয়া অনেক ফল পাঠাইবার সময় রাস্তাতেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল ফল ভাল করিয়া

আধুনিক প্রণালী অনুসারে প্যাক্ করিয়া পাঠাইতে পারিলে, প্যাকিং খরচ উঠিয়াও ফল বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে (যথা, কমলা লেবু, আনারস প্রভৃতি)।

(৫) ওমুক জায়গায় ওমুক ফলের ফসল প্রতি-বৎসর পোকার অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার একটী বিহিত করিতে পারিলে ফসল রক্ষা পায় এবং সেই ফসল বেচিয়া যথেষ্ট লাভ করা যায় (যথা, পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার আম)।

(৬) যৌথ-কৃষিক্ষেত্র, হাঁস-মুরগী পালনের ব্যবসায়, ডেয়ারি-ফার্ম্ম, ফলের ও ফুলের চাষ, তরকারীর চাষ, এ সকল উন্নত প্রণালীতে ও অল্প মূলধনে করিতে হইলে কি ভাবে, কত মূলধনে, কিরূপ স্থানে আরম্ভ করা যায়, সে-বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা কি ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কো-অপারেটিভ্ যৌথ-কারবার সম্বন্ধে সকল প্রকার খবরও সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে।

এই সকল খবর সংগ্রহ করিয়া যাহাতে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা সমিতি করিতে পারেন। খবর সংগ্রহের জন্য যাঁহারা খাটিবেন তাঁহাদের জন্য কিছু কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। খবরগুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে আবশ্যক-মত বাহির করা যায়। একজন সম্পাদকের হাতে ইহার ভার দেওয়া যাইতে পারে।

কে কোন্ কাজটি করিতে ইচ্ছুক জানিতে পারিলে সমিতি তাহাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়া, খা বিশেষজ্ঞের মত জানাইয়া সাহায্য করিতে পারেন। একজনে যাহা করা সম্ভব নয়, তাহার জন্য ছোট কো-অপারেটিভ্ যৌথ কারবার স্থাপনের ব্যবস্থা সমিতি করিতে বা করাইতে পারেন। ছোট ছোট জিনিস (খেলনা প্রভৃতি) প্রস্তুতের প্রথম পরীক্ষা সমিতির গৃহেই হইতে পারে এবং এই 'পরীক্ষা'র খরচ সমিতি বহন করিতে পারেন। সমিতির টাকায় কুলাইলে একটী ছোটখাট পরীক্ষাগার (Experimental Laboratory) স্থাপন করিতেও পারেন।

সমিতির সভ্যেরা সামান্য কিছু চাঁদা দিতে পারিলে সমিতির মাসিক খরচ চালান কিছু কঠিন হয় না। মাসিক ৵৹ আনা দিবেন এরূপ ৫০০ সভ্য হইলেও মাসিক ৬২৸৹ টাকা চাঁদা আদায় হয়। অনেকে বলিবেন, "বেকার চাঁদা দিবে কেমন করিয়া?" উঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মাসিক ৵৹ আনা দিতে পারিবেন; যাঁহারা না পারিবেন তাঁহাদের নিকট চাঁদা লওয়া হইবে না। সমিতি এরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে, "শতকরা ১০, বা ১৫, বা ২০ জনের নিকট চাঁদা লওয়া হইবে না।" বেকার ছাড়া অন্যেও সভ্য হইতে পারেন, তাহাতে বেকারেরই উপকার।

মফঃস্বলের সভ্যদের জন্য সমিতি হইতে মাসিক বা দ্বৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আবশ্যক খবর সকল জানান যাইতে পারে। সম্পাদকের নিকট তাঁহারা অন্যান্য সকল খবরও জানিতে পারেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেকারেরা একত্র হইলে কাজ করার সুবিধা কিরূপে হইতে পারে তাহার সামান্য আভাস মাত্র দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে এবিষয়ে নানারূপ আবশ্যক খবর প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। বেকারের বক্তব্যও কিছু কিছু প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়। সর্ব্বদাই যেন আমরা মনে রাখি—

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈঃ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥"

চটের আসন বোনা

শ্রীতুষারমালা দেবী

তৈয়ারী চটের আসন ও কার্পেটের আসন দেখিতে প্রায় একরকম। এমন ভাল ভাল চটের আসন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কার্পেটের আসন হইতেও সুন্দর। বাজারে আসনের চট বা ভাল ক্যাম্বিস্ কাপড় পাওয়া

যায়। ঐ কাপড় খুব ঘেঁস্ ঘেঁস্ বোনা ও পুরু অথচ মিহি হওয়া চাই। পাত্‌লা জাল্‌তি চটের আসন ভাল হয় না। প্রথমে একখানি আসনের উপযুক্ত চারিকোণ করিয়া চট কাটিয়া লইবে। পরে খড়ি অথবা পেন্‌সিল দিয়া তাহার উপর যথাস্থানের সোজা ও বাঁকা লাইন এবং ফুল অথবা চৌখুপি ঘর আঁকিয়া লইবে। এ সাবধানতা খালি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য। দুই একবার করিয়া হাত অভ্যস্ত হইলে পরে দাগ দিয়া না করিলেও চলে। কার্পেটের আসনে যেমন বাঁকা ভাবে একটার পর একটা করিয়া ফোঁড় তুলিয়া ঘর ভর্ত্তি করিয়া যাইতে হয় (যাহাকে কার্পেট-ষ্টিচ্ বলে) চটের তেমন নহে। চটের আসনে প্রথমে বাঁ দিকের একটী ঘরে স্থঁচ ডুবাইয়া তাহার দুই ঘর দূরে (সেই লাইনেই) স্থঁচ উঠাইবে। পরে ঐ স্থঁচ বাঁদিকের লাইনের গোড়াতে ডুবাইয়া মধ্য দিয়া উঠাইবে। এইরূপে বাঁদিকে দুই ঘর ও ডানদিকে দুই ঘর তুলিতে তুলিতে বাঁদিক্ হইতে ডানদিকে আসিবে। ফুল বা অক্ষর, লতা-পাতা প্রভৃতি যাহাই তোল না কেন, ফোঁড় এই একরূপই তুলিতে হইবে। তবে পূর্ব্বে কাপড়ের উপর যে ড্রয়িং করিয়াছ, সেই অনুসারে ফোঁড় তুলিতে হইবে। স্থতা বা নানা রঙের পশম যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে চটের আসনের স্থতা খুব মোটা অর্থাৎ তিন চার 'খি' স্থতা একসঙ্গে লইবে। পশম হইলে, তাহা না চিরিয়া গোটা লইলেই ভাল হয়। অনেকে আবার কাপড়ের লাল বা কাল পাড়ের স্থতা ব্যবহার করেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে pattern দেখিয়া করাই উচিত।

আসনে বা কার্পেটে ইংরেজীতে নাম বা অক্ষর তোলাই সহজ। তবে বাংলা অক্ষর তুলিতে chain stitch দিলেই দেখিতে সুন্দর হয়। অক্ষর-তোলা উল বা পশম দিয়া কার্পেটের স্থঁচে কার্পেটের উপর করিলেই ভাল হইবে। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, বাঁকাভাবে একটির পর একটি ফোঁড় দিয়া সেলাই করিতে হইবে। বড় বড় করিয়া অক্ষর তুলিতে হইলে ৩।৪টি স্থতা লইয়া এক একটী ঘরের মাঝখান হইতে একবার লম্বা ভাবে, একবার এড়োভাবে আবার একবার ষ্টিচ্ দিবে; তাহা হইলেই দেখিতে সুন্দর হইবে। কাপড়ে নাম তুলিতে গেলে নামের অক্ষর খুব ছোট করিয়া লিখিবে। চটের আসন বুনিতে বা অক্ষর তুলিতে কার্পেটের স্থঁচই ব্যবহার করা উচিত।

আসনের ভিতর অর্থাৎ জমিটা তৈয়ার হইয়া গেলে চটের ধারগুলি সাদা বা রঙ্গিন ফিতাদ্বারা মুড়িয়া দিবে এবং তলাটা একখানা সাদা কাপড়ের উপর লাগাইয়া দিবে। পূর্ব্বে আসন সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি; চটের আসনের ভিতরের ফুল, লতা, পাতা ভিন্ন স্থানটা পশম বা স্থতাদ্বারা ভরাট করিয়া দিবে, যেন কোন স্থান বাহির হইয়া না থাকে।

অনাগতা প্রিয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কার তরে ওঠে বুক
ওঠে নিঃশ্বসিয়া,
কোথা গো সে প্রিয়া মোর
বাতায়নে বসিয়া !

কোন্ আলো-ঝলমল
উজ্জ্বল কক্ষে
আছে প্রিয়া ঢল ঢল
জল-ভরা চক্ষে !

রেশমের গেছে রাঙা
আঙ্‌রাখা খুলিয়া—
উদাস নয়নে ব'সে
ত্রিভুবন ভুলিয়া !

বুটিদার বেনারসী
নামিয়াছে কোমরে,
ফোটা ফুল ব'লে ভুল
ক'রে ফেলে ভোমরে।

এলানো চুলের হাওয়া
অতুলন গন্ধে,
মধুময় গান গায়
যাদুময় ছন্দে !

তারি মাঝে ফুটে আছে
রাঙা ঠোঁট রসিয়া,
হিয়া ওঠে তারি তরে
ওঠে নিঃশ্বসিয়া !

সোনার বরণ তার,
নিটোল সে অঙ্গে
কাঁকন করিছে খেলা
কণ কণ রঙ্গে।

দোলে তার বুক দোলে
মেঘ দেখে গগনে,
উদাস করিল আহা
কে তারে এ লগনে !

বাতায়নে ব'সে প্রিয়া
কার কথা ভাবে গো,
অর্ঘ্যের ডালি নিয়া
কা'র কাছে যাবে গো।

এস এস এইখানে,
এস হেথা প্রিয়া হে,
বিরহের মসীময়
দীপশিখা নিভায়ে !

কেন মিছা আন্‌মনে
বাতায়নে বসিয়া,
আমিও যে রহি' রহি'
উঠি নিঃশ্বসিয়া !
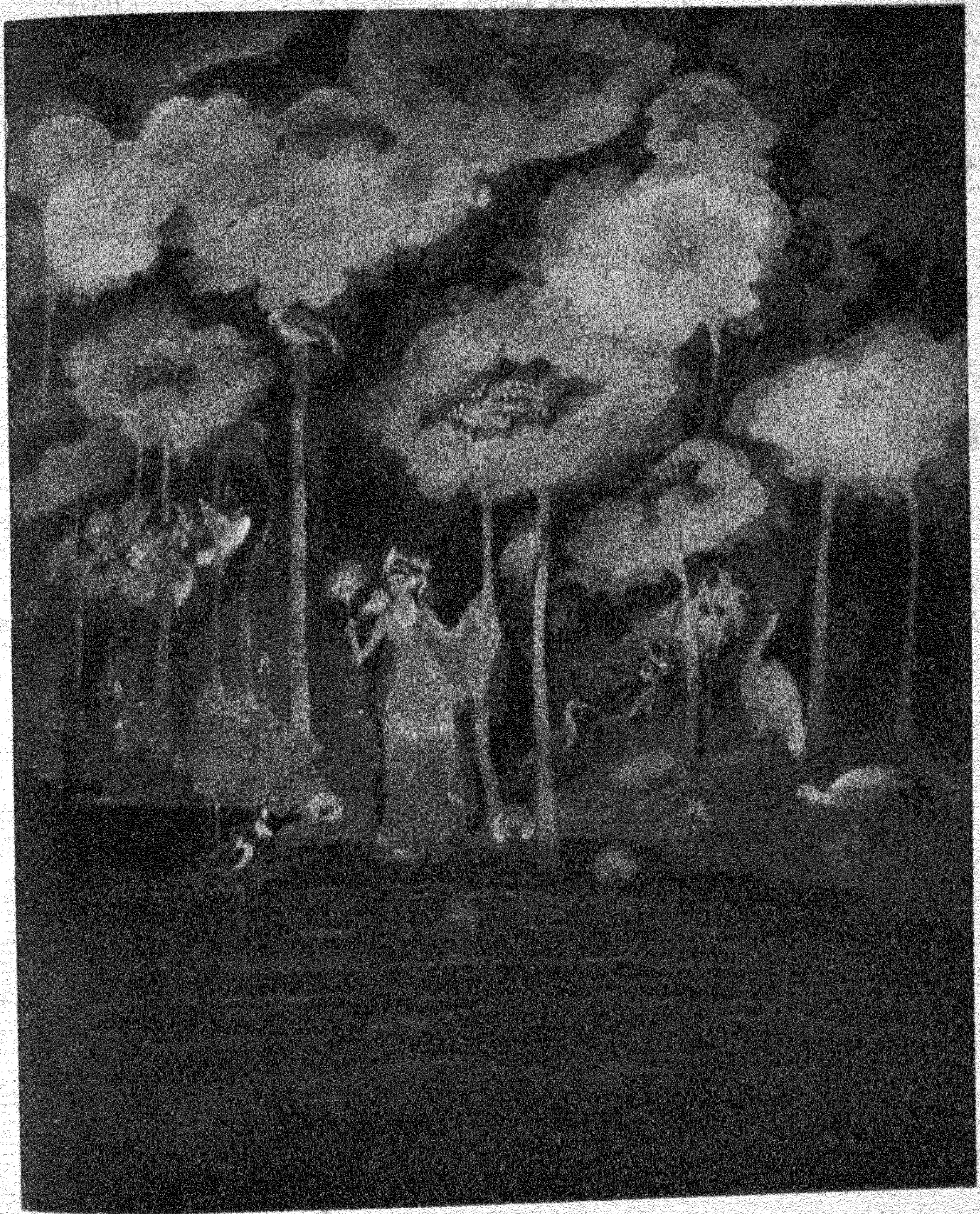
মায়া-কানন

[শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে]

চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চণ্ডীদাস বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী কবি—তিনি বাঙ্গালার সারস্বতকুঞ্জের কোকিল—তাঁহার মত মধুর কণ্ঠে আর কোনও কবি বাঙ্গালীর প্রেমের গান—বাঙ্গালীর প্রাণের গান গাহিয়াছেন কিনা, জানি না। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি—প্রেমের গানে তাঁহার সমতুল জগতের আর কোনও জাতির আর কোনও কবি আছেন কিনা, জানি না। যে প্রেম পার্থিব প্রেমের বহু উর্দ্ধে—যাহা আপনাকে রিক্ত করিয়া, সর্ব্বস্বহারা করিয়া প্রেমের সিন্ধুতে বিন্দুকে মিলাইয়া দেয়, যে প্রেমে এক ব্যতীত দুই-এর সত্তা থাকে না,—চণ্ডীদাস সেই প্রেমের কবি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—এই পরানুরক্তির স্বরূপ যদি কোনও কবির কাব্য-সাধনার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে তিনি চণ্ডীদাস। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, The Sublime and the Beautiful. গল্পের বা রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ যেমন সম্পুটকের অভ্যন্তরে ভ্রমরের মধ্যে নিহিত, গীতি-কবিতার প্রাণ তেমনই এই Sublime and the Beautifulএর ভিতরে সযত্নে সংগোপনে সংরক্ষিত। চিত্রকলা-কৌশলী চিত্রশিল্পীর দুই একটি Brushes বা আঁচড়ের মত মহাকবি দুই একটি শব্দযোজনায় বা পদসমাবেশে আপনার কাব্যে ঐ Sublime and the Beautifulকে রূপ দিয়া থাকেন। চণ্ডীদাস এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্যরত্নাকরের অপার অপরিমেয় অনন্ত ভাণ্ডারে সেই অমূল্য রত্নরাজি থরে থরে সজ্জিত আছে। কাব্যরস-পিপাসুর অন্তরে আগ্রহ থাকিলে —সাধনা ও ভক্তি থাকিলে তাহা আহৃত হইতে পারে। কাব্যরস-রসিক ভক্ত সাধকের অন্তরের অন্তস্তলে তিনি সেই গাঢ় রস কি অদ্ভুত রচনাকৌশলে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হইতে হয়। সেই কৌশল অনুশীলনে আয়ত্ত হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ। যাহা সুন্দর, যাহা মহান্,—কাব্যরস-সমাবেশে তাহা একই আধারে মিশ্রিত করিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার মানস পুত্রকন্যার অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ, মাথুর ও মিলনের গান গাহিয়া গিয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব রসসমাবেশে পাঠকের মনে অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব ঘন আনন্দের সঞ্চার হয়, প্রগাঢ় হর্ষবিস্ময়ে ও ভক্তিশ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে, রসস্রষ্টার সহিত মন কোন্ এক অজানা অচেনা উচ্চস্তরের কল্পনা-লোকে চলিয়া যায়।

চণ্ডীদাসের "তড়িতবরণী হরিণনয়নী" নায়িকা যখন আঙ্গিনা মাঝে দেখা দেন, তখন রসগ্রাহী ভাবুক "চাহিতে চাহিতে পশিলেক চিতে" অবস্থায় আপনাতে আর আপনি থাকেন না, সেই রূপ-সায়রে ডুবিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যান। তাঁহার নায়িকা "চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে, দারুণ চাহনি তার"! সে চাহনি "হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়া" বসে, সে চাহনি শুধু চোখের নেশা নহে! তাঁহার নায়িকা যখন "যমুনা-সিনান" অন্তে ঘরে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহার "চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর।" সে কি যে-সে রূপ, সে কি যে-সে প্রেম? তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে?

চণ্ডীদাসের প্রেম—সে অতি অদ্ভুত—সে যেন এ জগতের নয়—সে প্রেম,—

> "কানুর পীরিতি, চন্দনের রীতি,
> ঘষিতে সৌরভময়।
> ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
> দহন দ্বিগুণ হয়॥"

আশ্চর্য্য এই প্রেম! চন্দন ঘষিতে সৌরভময়,—শীতল,

হৃদয় জুড়াইয়া দেয়। কিন্তু এই প্রেম ঘষিয়া আনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলে দহনের জালা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়! সে এমন প্রেম যে, নায়িকা কাঁদিয়া বলেন—

"জাতি কুল শীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা।"

এ প্রেমে যেমন সুখ, তেমনই দুঃখ। এ প্রেমে,—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইয়াছে, উভয়ে উভয়কে পাইয়াছেন, তথাপি পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ তৃপ্তি নাই, তখনও উভয়ে ভাবিতেছেন, যদি বিচ্ছেদ হয়!

তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি।"

এত দুঃখ, তথাপি এই পীরিতির এমনই রীতি যে,—

"পরাণ ছাড়িলে, পীরিতি না ছাড়ে
পীরিতি গঢ়ল কে?"

এত জ্বালা, এত দুঃখ, তবুও চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার-পরাণ তার?"

কারণ, চণ্ডীদাস জানেন,—

"পীরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পীরিতি মিলয়ে তথা।"

এ পীরিতি এমন সর্ব্বনাশা যে,—

"হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান।
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥"

এমনই সেই বাঁশীর ডাকের আকর্ষণ! স্থাবর জঙ্গম বিশ্বচরাচরের কাহারও নিস্তার নাই সেই আকর্ষণ হইতে! ইহাই এই পীরিতির চরম। এই প্রেমে সুখের মাঝেও দুঃখের আশঙ্কা, মিলনের মাঝেও বিরহের ভয়। অথচ এই পীরিতির রীতিও অদ্ভুত—

"নিতিই নূতন, পীরিতি দুজন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়।"

ইহা,—

"ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়য়,
পরিণামে নাহি থায়।
সখি! অদভুত দুঁহু প্রেম!"

অদ্ভুতই বটে! কেবল অদ্ভুত কেন, অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়। সে প্রেমের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব যে ভাগ্যবান হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, সে ধন্য হয়। সে ভক্তসাধক কবিকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের চরণে মাথা লুটাইয়া বলে,—প্রভু! তুমি যাহা দিয়া গিয়াছ, তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রাণের জিনিস,—তাহার তর্জ্জমা কোন ভাষায় হয় না, কোন বিদেশী তাহার রসাস্বাদ করিতে পারে না, তাহা মনে অনুভবও করিতে পারে না।

চণ্ডীদাসের নায়িকা সেই প্রেমের আস্বাদ কি ভাবে পাইয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছেন,—

"আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমত করিল কে?"

এ দুঃখ, এ জ্বালা বুঝিবে কে? কিন্তু নায়িকা ইহার শাস্তি বিধান করিতে চাহেন, কিন্তু কি সুন্দর, কি হৃদয়দ্রাবী ভাষায়,—

"আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে।"

কত মহান্! কত গভীর! রসজ্ঞ পাঠক ইহা হইতেই বুঝিয়া দেখুন, রাধার অন্তরে কি হইতেছে। ইহার অধিক দহনের শাস্তি শ্রীরাধা দিতে জানেন না।

শ্রীমতী তাঁহার নায়ককেও এই শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেন নাই,—

"বঁধু! কি আর বলিব তোরে!

অলপ বয়সে, পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পীরিতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইয়া,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পীরিতি কেমন জ্বালা॥"

কত বড় অভিমান, কত বড় অভিশাপ! আমি নন্দের নন্দন হইয়া নন্দের বাধা বহিব, আর তোমারে করিব রাধা। শচীর দুলাল গোরা-রূপে পরজন্মে তুমি রাধাভাবে আমার জন্য 'হা কৃষ্ণ!' 'হা কৃষ্ণ!' করিয়া কাঁদিবে, তখন বুঝিবে পীরিতি কেমন জ্বালা!

এই যে আপনার অন্তর দিয়া পরের সুখদুঃখের সমান অনুভূতি, ইহাই মহান্, ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। রাধার প্রেম সেই সর্ব্বোচ্চ স্তরের, যাহাতে দুঃখ, জ্বালা, অভিমান, অভিশাপ অন্তরে গুমরিয়া উঠে অথচ নায়িকা বলিতে পারেন,—

"প্রাণপতি তুমি, কি বলিব আমি,
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল, তুমি সে নয়ন,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥"

যে প্রেমিক দুঃখ-জ্বালা সহিয়াও অন্তরে ভূমানন্দ লাভ করেন, আর সেই পরম রসাস্বাদ করিয়া বলিতে পারেন,—

"সই! পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥"

তাই রাধার—

"খাইতে পীরিতি, শুইতে পীরিতি,
পীরিতি স্বপনে দেখি।"

পীরিতির জ্বালা কি সামান্য? রাধার মুখেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে—

"কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়শী জীয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তরে বাহিরে, কুট্ কুট্ করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥"

কিন্তু তথাপি রাধা এই দুঃখকেই ভালবাসেন। কেন? যদি এতই দুঃখ, এতই জ্বালা, তবে ওনাম ত' মুখে না আনিলেই হয়, ওরূপ ত' নয়নে না দেখিলেই হয়। রাধা কি সে চেষ্টা করেন নাই? বিলক্ষণ করিয়াছেন,—

"কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি যে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পীরিতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥"

এ সবই সত্য। রাধা সবই বুঝেন, সবই জানেন, গহন বনে যাইতেও প্রস্তুত হন, লোকের পাড়ায় যাইতেও সম্মত নহেন, তথাপি তিনি শ্যামসুন্দরকে বলেন,—

"তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম,
শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকি হে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয় হিয়া॥
পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বঁধু! তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥"

রাধা নিশিদিন শ্যামসুন্দরকে পাসরিতে পারিতেছেন না। চণ্ডীদাসও উপদেশ দিতেছেন,—"মনের মন্দিরে তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখ।" এ প্রেমের স্বরূপ কি, মর্ত্ত্যের মানব আমরা, ইহার রসাস্বাদন করিবার শক্তি কোথায়? "স্থির করিয়া" রাখিতে পারিলে ত' আর ভেদাভেদ দ্বৈতাদ্বৈত নাই, তখন অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, পূর্ণ আনন্দ, ভূমানন্দ! অবাঙ্মনসোগোচর সচ্চিদানন্দরূপ শিবোঽহং সোঽহং! সে পরমানন্দের অনুভূতিতে মগ্ন ও তাহাতেই লীন ভক্ত সাধক বৈষ্ণব কবি ভিন্ন কে হইতে পারে?

সেই সাধনার পথ বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য। সেই সাধনায় বসিয়া রাধার,—

"হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল!"

তথাপি রাধা বলেন,—

"পীরিতি নগরে বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি দেখিয়া পড়শী করিব,
তা বিনু সকলি পর॥
পীরিতি দ্বারের কবাট করিব,
পীরিতে বাঁধিব চাল।
পীরিতি আসকে সদাই থাকিব,
পীরিতে গোঙাব কাল॥
পীরিতি পালঙ্কে শয়ন করিব,
পীরিতি শিথান মাথে।
পীরিতি বালিসে আলিস ত্যজিব,
থাকিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি সরসে সিনান করিব,
পীরিতি অঞ্জন লব।
পীরিতি ধরম, পীরিতি করম,
পীরিতে পরাণ দিব॥"

পীরিতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই,—পীরিতির মধ্যেই ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ডুবিয়া যাইবে, পীরিতি অন্তরে, পীরিতি মন্ত্রে, সকল অবস্থাতেই ধ্যান ধারণা জপমালা হইবে,—এমন পীরিতির যে কি রীতি, তাহা চণ্ডীদাসও ধারণা করিতে সাহস করিতেছেন না। কি মহান্, কি সুন্দর, কি গভীর সেই প্রেম! সে প্রেমরসের রসিকই বলিতে পারেন,—

"সাগরে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুখ ক্লেশ।"

সেই প্রেম-সমাধির অবস্থায় সাধক সুখ দুঃখ ক্লেশ, সকলের অতীত,—তিনি তখন বলিবার অধিকারী,—

"একত্র থাকিব, নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

ধন্য আমরা, ধন্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতি যে, আমাদেরই বাঙ্গালী সাধক কবির অমর লেখনী হইতে এই চরম আদর্শ প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই প্রেমসাধনার বলেই চণ্ডীদাস বলিতে পারিয়াছেন,—

"শুন রজকিনী রামি!
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥"

এ প্রেম কোথায় গিয়া কাহার চরণে পৌছিতেছে? প্রেমিকার এই সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেওয়া চরম প্রেমের প্রতিদানে প্রেমিক জগৎস্বামী বলিতেছেন,—

"উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ন তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পুজন,
কিশোরী গলার হারা॥
রাধে! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবে ক্ষমা॥"

বিন্দু সিন্ধুতে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে এমনই মিশামিশি বটে! ইহার রসাস্বাদ করিয়া মহাকবি চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—

"পুত্র-পরিজন, সংসার আপন,
সকলি ত্যজিয়া দেখ।
পীরিতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥"

চণ্ডীদাস এই মহাপ্রেমের কবি, তাঁহার সাধনা সার্থক। এমন প্রেম-পাগল কবি আর কোন দেশে আছে? তাঁহার প্রেম কি যে-সে প্রেম? সে প্রেম কিরূপ?—

"পীরিতি পীরিতি, সব জন কহে,
পীরিতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল, নহে ত পীরিতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পীরিতি অন্তরে, পীরিতি মন্তরে,
পীরিতি সাধিল যে।
পীরিতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে॥"

বাঙ্গালীর কত বড় সৌভাগ্য, কত মহাপুণ্যে এই পীরিতি-পাগল মহাকবিকে সে বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছে? সেই কবির চরণরেণুস্পর্শে কি আর একবার বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল পবিত্র হইবে না?

কত বড় আনন্দের ও গর্ব্বের কথা যে, বাঙ্গালীর প্রাণের এই প্রেম-পাগল সাধক কবির মুখেই বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইয়াছিল,—

"পীরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে॥"

কে বলে, বাঙ্গালী ভূতলে অধম জাতি? বাঙ্গালীর আর কিছুও যদি না থাকে, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর চণ্ডীদাস আছে। সে চণ্ডীদাসের তুলনা চণ্ডীদাস, তাঁহার তুলনা জগতে নাই। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, উদার বিশ্বজোড়া অনুভূতি, মহান্ আদর্শ,—এসকল ত' চণ্ডীদাসের রচনার ছত্রে ছত্রে সুপ্রকাশ, কিন্তু তাহারও উপরে তাঁহার বহু পদাবলীর অন্তর্নিহিত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আমাদের মত সাধারণ মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই, শক্তি নাই, অধিকারও বুঝি নাই। যে কয়জন ভাগ্যবান বাঙ্গালী সাধনা করিয়া সাধনামার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, শুনিয়াছি, তাঁহারাই সে রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মাটীর মানুষ চণ্ডীদাস-ভক্ত বাঙ্গালী আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন বাঙ্গালী তাহার জাতীয় মহাকবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে পারে,—

"ঐছন পীরিতি জগতে আর কি হয়?
এমত পীরিতি না দেখি কখন, কখন হবার নয়॥"

আর সেই গান তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, যেন সেই অমর সঙ্গীত শুনিয়া যুগে যুগে তাহার নয়নে ধারা নামিয়া আসে!

"যিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটী অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ও বাংগালী শক্তির অভিব্যক্তি

শ্রীহরিদাস পালিত

উপক্রম

বৈদিক-সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতবর্ষে কেবলমাত্র দুইপ্রকার জাতি বিদ্যমান ছিল বা আছে। তথাকথিত জাতির মধ্যে,—একটি অ-আর্য্য (অনার্য্য) এবং অন্যটি আর্য্য-জাতি। আর্য্যগণ, অ-আর্য্য-দিগকে—নিন্দা এবং ঘৃণা করিতেন এবং বর্ত্তমানেও সভ্য জাতিরা, অসভ্য, বর্ব্বর বলেন যে গণ-জাতিকে, তাহারাই নীচজাতি—ছোটলোক।

বৈদিক-সাহিত্যে, জাতিগত বিভেদ ধরা যায় না। কেননা উৎপত্তির মূল একই। এক আদি পিতামাতা হইতে,—জম্বুদ্বীপীয় মানব-বংশের বিকাশ হইয়াছে। একই বংশ,—একই পিতামাতার সন্তান। একই বংশের বিস্তার বা প্রবাহ। আর্য্য-অনার্য্যে জাতিত্ব হিসাবে—ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ বিদ্যমান।

সর্ব্বাদি পিতা-মাতা

সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্যে যে উপাখ্যান রহিয়াছে, ইহাতে দৃষ্ট হয় যে,—আদিপুরুষ-দেহে প্রকৃতি লীনা ছিলেন। একই—দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, দু'টি পৃথক হইলেন। দ্বিধা বিভক্তের পূর্ব্বে, তথাকথিত পুরুষটি, শ্রেষ্ঠ এক আদিপুরুষ হইতে,—অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, —আত্মজ, অযোনিজ রূপে,—তাঁহার মাতা ছিলেন না। ভারতের ভগবান ব্রহ্মা—তথাকথিত পুরুষ। সেই পুরুষের শরীর হইতে,—এক নারীমূর্ত্তির বিকাশ হইল, তিনি—শতরূপা, তাঁহাকেই বাণী, সরস্বতী, গায়ত্রী, ওম্ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে; ইঁহারা দেবতা বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মা দেবতা কিন্তু ব্রহ্ম নহেন।

বেদান্তমতে

ব্রহ্ম তিনিই,—যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ভঙ্গ হয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র (১।১।২) হইতে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ। পণ্ডিতেরা বলেন—বেদান্তের কোন কোন সূত্রে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয় (২অ। ২এর ২৮,২৯,৩০ সূত্রাদি)। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, বেদান্তের সূত্র বিশেষ,—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের পরবর্ত্তী কালের রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

সাংখ্য—অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না। ৫৭।

বিশ্ব-মানবের আদি পিতা-মাতা

সম্পর্কে, পরবর্ত্তীকালে অনুসন্ধান যখন আরব্ধ হয়, তখন দর্শনচর্চ্চা সবেমাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। লৌকিক বাস্তব বিষয় চর্চ্চা হইতে, ক্রমশঃ কল্পনাবলে, অবাস্তব জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া, ব্রহ্মা-সাবিত্রীর উপাখ্যান সংরচিত হয়। ইহা ইতিহাসের হিসাবে বলা চলে। এই প্রকার বৈদিক-সাহিত্যের দেব-তত্ত্ববাদ—বাঙ্ময়, প্রকৃত শরীরবিশিষ্ট কিছুর কল্পনা নয়। মীমাংসা দর্শনে—এই মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

শবর স্বামীর ভাষ্যে, কুমারিলের বার্ত্তিকে, এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের মতে,—যাবতীয় দেবতা, মন্ত্ররূপী, —শরীরী নহেন। দার্শনিক ব্যাপার,—এই প্রকারে অদৃশ্য শক্তি বা শক্তিমান কিছু হইতে—নরজাতির অভ্যুদয় কল্পনা ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। অনিশ্চিত বিষয়ের, একটা কূল-কিনারা করাকেই—সিদ্ধান্ত বলা হয়। মানবের আদি পিতা-মাতা ছিলেনই, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ের 'মীমাংসা', তথাকথিত উপায়ে করা হইয়া থাকিবে। ইহাকে 'সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব' বলা যাইতে পারে।

মতসাম্য—

পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, নৃ-তত্ত্ব

সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে—আদি নরমিথুন প্রকটের বিবরণ বা উপাখ্যান মধ্যে, নরদেহ হইতেই নারীর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় 'ভাব-সাম্য' বিদ্যমান আছে। গ্রীক-পৌরাণিক ব্যাপারগত—'দি হিস্‌টরি অব্‌ এমরীশ্‌' নামক প্রেমের ইতিহাসে দেখা যায়—পূর্ব্বকালে নর-নারী এক-দেহী ছিল, তখন অসীম-শক্তি সেই দেহে বিদ্যমান ছিল। যথাকালে—দুইটি পৃথক হইয়া পড়ে এবং শক্তিও কমিয়া যায়। নারী—নৃ-প্রেমের মূর্ত্ত রূপায়ন। প্রেম—মূর্ত্ত রূপায়ন লাভ করিয়া, প্রেমময়ী-নারী হইয়াছেন।

মন্ত্র-রূপী দেবতার রূপলাভ

মানুষেরই কল্পনা; অরূপকে রূপান্বিত করিয়াছে মানুষে। 'অভিমানী-দেবতা' হইতেছেন, ব্রহ্মাদি সাধারণ দেবতাগণ। 'অভিমানী-দেবতা' বলিতে বুঝায়, —মন্ত্ররূপী বাঙ্ময় দেবতার বাস্তব রূপে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বে রূপের আরোপ মাত্র। কল্পনা করা হইল,—নিরাকার দেবতার সাকার রূপ। এই সাকার ব্রহ্মার (অভিমানী দেবতার) হৃদয়স্থ প্রেম—মূর্ত্তরূপে প্রকট লাভ করিয়া, ব্যক্তিত্বে আরোপিত হইয়া, হইলেন—সাকারা শতরূপা দেবী সাবিত্রী।

অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না

এই দার্শনিক মতটি,—সাংখ্যদর্শনের। নর-নারী বাস্তব রূপায়ন। সম্ভবতঃ সাংখ্যমতাবলম্বী সম্প্রদায়গণের মতবাদ যখন আদৃত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তখন অবাস্তব কিছু হইতে পদার্থ বিষয়ক প্রকটন করার কথা, উত্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। তথাকথিত আন্ত-দার্শনিক কালে মন্ত্ররূপী দেবতাদিগকে, 'অভিমানী-দেবতা'রূপে কল্পনা করিয়া, সাকার রূপে প্রবর্ত্তিত করা হইয়া থাকিবে। এইরূপে যদি বাস্তবতায় দেবতাবর্গকে আনয়ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মা-সাবিত্রী হইতে—বাস্তব নর-নারীর অভিব্যক্তিতে কোনই বাধা হয় না। মানবীয় চিন্তা-প্রবাহ, এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্ব-মানবের আদি নর-মিথুনের প্রকট বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাও অনুমান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরস, এরিস্‌টটল্‌ প্রভৃতির মতও প্রায় সাংখ্যের অনুরূপ।

আরম্ভ—

যে প্রকারেই হউক, আদি নর-মিথুনের উদয় পৃথিবীতে হইয়াছিল,—এসকল দার্শনিক মতবাদের কাল গত হইলে, প্রত্যক্ষগোচর মানবের অভিব্যক্তি বিষয়ক বর্ণনার আরম্ভ হয়। বৈদিক-সাহিত্য বলেন, ভারতে আদি নর-মিথুনের সুপ্রকট হইয়া—এই বিশ্ব-মানবের প্রকট হইয়াছে। বিশ্ব-মানব মূলে একই বংশধারাক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এ মতবাদটি 'একজানি' (মনোজেনেষ্টিক) মতবাদ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-শাস্ত্র মতে,—ইহাই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নৃ-তত্ত্ব বিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের ধারণা—'বহুজানি' (পলি-জেনেষ্টিক) মতবাদের অভিমুখে। এই হেতু—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মতবাদীদের সহিত এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। বহুজানি মতবাদটি—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মীরা স্বীকার করিতে পারেন না, কেননা তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রীয় মতের অনশন হইয়া যায়। নৃ-তত্ত্ববিদেরা, প্রমাণ-গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বনে, স্বমত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় মতবাদ গ্রাহ্য করেন না।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক মতবাদ

অবলম্বনে, বৈদিক-সাহিত্য-পুরাণ অবলম্বনে, একজানি মতেই, আদি নর-নারী অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইয়া থাকে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের মত, ভারতীয় পৌরাণিক মত হইতে বিভিন্ন নহে। তত্রাচ পৌরাণিক মত, বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতেছেন না। বাইবেল মতে গড্‌—বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চারি হাজার (১) বৎসরের কিছু পূর্ব্বে, ঐতিহাসিকগণ

১। আমেরিকান্‌ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল দ্রষ্টব্য।

দেখিতেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব্বে, (বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে) ইজিপ্ট দেশে, মিনেশ নামা জনৈক রাজা প্রজাবর্গসহ রাজত্ব করিতেন। ভারতে সম্প্রতি মহেন্‌জোদাড়ো, হরপ্পাদি সিন্ধুনদ উপত্যকা দেশে যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইয়াছে, উহার আদি বিকাশ-কাল, বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার বর্ষের কম নহে। সুতরাং বাইবেলের বিশ্ব-সৃষ্টিকালের সত্যতায় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

সেমেটিক্ জাতিতত্ত্ব মত-বাদ

প্রাচীত্য খ্রীষ্টধর্ম্মী ঐতিহাসিকগণ, তাঁহাদের ইতিহাসে,—'সেমেটিক জাতি' বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ বহু জাতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। তথাকথিত 'সেমেটিক জাতি'-গণের উৎপত্তির বিবরণ তাঁহাদের বাইবেলে আছে। নোয়া (নুহ) ঋষির সময়ে, মহাজলপ্লাবন হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত স্থলচর জীব ধ্বংস হইয়া যায়। কেবল ঋষি নোয়ার পরিবারবর্গ রক্ষা পাইয়াছিলেন। জলপ্লাবনের কিছুকাল পরে, তাঁহার সেম, হেমাদি নামে পুত্র জন্মলাভ করেন। সেই সেমবংশই—'সেমেটিক জাতি' বলিয়া খ্যাত হয়। তথাকথিত বাইবেল মতে,—মহাজলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩৪৯ অব্দে, সুতরাং তথাকথিত কালের পরে, সেমেটিক জাতির প্রকাশ-আগুকাল। সুতরাং ভারত, ইজিপ্ট, চালদীয়, ব্যাবিলনাদি দেশে—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল জাতি বিগুমান ছিল, তাহারা সেমেটিক জাতি কখনই নয়। তদুপরি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে, জলপ্লাবনের সময় ও পরবর্ত্তী কালেও, তথাকথিত জনপদে,—প্রজা এবং রাজার অভাব আদৌ হয় নাই। সুতরাং তথাকথিত দেশে, ঐ-উক্ত কালে জলপ্লাবন হয় নাই—প্রমাণিত হইতেছে।

বাইবেলের জেনিসিস্-নাম পৌরাণিক

বিবরণ,—সত্য কিনা, সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের খনন ব্যাপারে, প্রাচীন চালদীয় নগরের ভূ-মধ্য হইতে, যে সকল লিপি-মালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে একখণ্ড লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানিতে জলপ্লাবনের বিবরণ অক্ষর-মালায় খোদিত আছে; পণ্ডিতেরা সেই লিপি-ফলকের নাম রাখিয়াছেন—'ডেলিউজ্-ট্যাব্‌লেট্'। উহাতে উৎকীর্ণ আছে, চালদিয়ার রাজা উবরলতু ও তাঁহার পুত্র যিশুথ্রাসর সময়ে জলপ্লাবন হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান দেবতার ক্রোধে,—মানবের অবাধ্যতা হেতু, জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল। এবং সেই প্লাবনে—রাজপরিবারবর্গ এবং বন্ধু-বান্ধবেরা, নৌকার সাহায্যে, দেবতার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসরের বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। এই 'ডেলিউজ্-ট্যাব্‌লেটে'র আক্ষরিক অনুবাদ, বাইবেলের জেনিসিস্ অধ্যায়ে হিব্রু-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কেবল রাজার নাম এবং দেবতার নামের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। দেবতার স্থলে—দেবদূত (এঞ্জেল) লিখিত হইয়াছে। রগোজিন্ চালদিয়া পাঠে একথা অবগত হওয়া যায়, 'ডেলিউজ্-ট্যাব্‌লেটে'র চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। কোন্‌টি আসল এবং কোন্‌টি নকল, এ বিচারের প্রয়োজন লেখক করিতে ইচ্ছুক নহেন।

বৈদেশিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মীরা ভারতের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই ইতিহাস পঠন-পাঠন দ্বারা শিখিয়াছি; সর্ব্বাদি প্রাচীন ভারতবর্ষে, মানব বলিয়া কোন জীব বিগুমান ছিল না। তাঁহারা কল্পনানেত্রে স্ব-ধর্ম্ম-ভাবে ভাবিত হইয়া, ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, 'কোলারিয়ান' নামে এক গণ-জাতি, ভারতের বহির্ভাগ হইতে, সর্ব্বাগে ভারতে প্রবেশ করে, এবং বিস্তারিত হয়, ইহারা অবশ্য সেমেটিক জাতি। এই কৃষ্ণকায় সেমেটিক কোলারিয়ানদের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে, ভারত মানব-শূন্য অরণ্য-জীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই অনৈতিহাসিক উক্তির কোন প্রমাণ তাঁহারা কোথাও দেন নাই। কেবল প্রাগৈতিহাসিক কল্পনা (থিওরি)-বলেই, ভারতকে অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তাঁহারা বাইবেলের 'একজানি' মতবাদী, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইতে পারে, প্রকৃত ইতিহাসরূপে নয়।

তার বহুকাল পরে, তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা, কল্পনাবলে বলিয়াছেন, ভারতের বহির্ভাগ হইতে, অন্য এক উন্নত ধরণের জাতি, ভারতে প্রবেশ করে—তাহারা 'দ্রাভিডিয়ান্' গণ-জাতি। কিন্তু—এই ব্যাপারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদান করেন নাই। ইহারা ভারতে বিস্তারিত হয়।

তারপরে, তাঁহারা লিখিলেন, এক শ্বেতকায় অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য বর্ব্বরপ্রায় জাতি, ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা—'এরিয়ান' জাতি নামে খ্যাত। এ সম্বন্ধে শ্বেতকায় বৈদেশিক জাতির ভারত-প্রবেশ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধ-মতবাদের উল্লেখ তাঁহারা করেন নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতকে অবনত মস্তকে, তথাকথিত উপাখ্যান স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। শিক্ষার্থীদিগকে প্রশ্নের উত্তর, তথাকথিত অনৈতিহাসিক উপাখ্যানই—উত্তর স্বরূপ দিতেই হইবে! সুতরাং শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কেই, তথাকথিত 'এরিয়ান উপাখ্যান'—পড়াইতে ও পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। ভারতকে হীন প্রতিপন্ন করা, এবং এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া ভারতীয় জাতিতত্ত্বের বিকৃতি সাধন করা, সম্ভবতঃ মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম-এ, মহাশয় তাঁহার 'বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা' নামক পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এখন তাঁহাদের কেবল এই চেষ্টা—ভারতীয় প্রাচীন ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা, এবং সাহিত্যে যে সকল উক্তি পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করা। এ কথা উইণ্টার্ণিজ সাহেব ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন (ক্যাল্‌কাটা রিভিউ, নভেম্বর ১৯২৩—এজ্ অব্ দি বেদ বাই ডাঃ এম, উইণ্টার্ণিজ), প্রতীচ্যেরা বলেন যে, ভারতবাসী কেহই ভারতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যদি একার্য্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ভারতেতর দেশবাসী। তাঁহারা চাহেন যে, বিদেশীয়েরা ভারতীয় সাহিত্য যেরূপ ভাবে গঠিত করিয়া দিবেন, আমাদিগকে তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।" ইহার উপর আর কথা নাই। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। বৈদেশিক 'এরিয়ান' আগমন উপাখ্যানটি, তাঁহারা ভারতে প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। ইহা যে একটা ভ্রান্ত কল্পনা, তাহা ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্যেই অবগত হই। ভারতীয় সাহিত্য এ কথা স্বীকার করে নাই। অথচ আমরা মোহবশে, ভারতীয় সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, ভ্রান্ত প্রতীচ্য মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকি।

ভারত সর্ব্বাদি সভ্য-জনপদ, এই ভারতবাসী অতীত কালে—য়ুরোপাদি জনপদে বিজয়-যাত্রা করিয়া, তথাকথিত দেশকে সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছিল, একথা এখন আর খ্রীষ্টান শ্বেতকায় পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই। ঐতিহাসিক এইচ, আর, হল তাঁহার—'এনসিয়েণ্ট হিস্‌টরি অব্ দি নিয়ার ইষ্ট' পুস্তকের ১৭২—১৭৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন সেই অংশ পাঠ করা আবশ্যক। তিনিও শ্বেতকায় পণ্ডিত। তিনি লিখিয়াছেন—"ভারত আদিমতম মানব-সভ্যতার কেন্দ্র মধ্যে অন্যতম, এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচিত হয়—আশ্চর্য্য এই যে,—অ-সেমেটিক, অ-আর্য্য লোকগুলা, যাহারা পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিম জনপদকে সভ্যতা দান করিয়াছিল—তাহারা মূলতঃ ভারতীয়।* সুমারীয় জাতি ভারতের।"

এই সুমার জাতির পরিচয়, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের এই জাতিও সুমার (সংস্কৃতে—সৌমার), রামায়ণাদি পৌরাণিক কাব্যাদি সাহিত্যে, এই জাতির বিবরণ আছে, পূর্ণ

বিবরণ—যোগিনী-তন্ত্রে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। "দেশের যোগী ভিক্ পায় না।" বর্ত্তমানে (যোগিনী-তন্ত্র ২।৪৪ পাঠ করুন) দেখিতে পাই—আসাম অঞ্চলে এখন—সুমার ও আকা (আকাদ্) নামে দুইটি প্রাচীন জনপদ বিদ্যমান রহিয়াছে,—এই দেশের সম্বন্ধে, 'গেইটস্-আসাম'—নামক ইতিহাসে কিছু আছে (ই,এ, গেইটস্ হিস্‌টরি অব্ আসাম, ১৯০৬) এবং কিছু তথ্য আছে—'ডল্টন্‌স এথ্‌নলজি অব্ বেংগল্' নামক পুস্তকে, এবং জার্ণাল অব্ দি এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেংগল, সংখ্যা ১, ১৮৫৫ অব্দ। হল সাহেবের মতে, সুমার-আকাদীয়গণ অবশ্য ভারত হইতে গিয়া,—মেসোপটেমিয়ার উত্তর ও দক্ষিণে, মাতৃভূমির নামেই, সুমার ও আকাড্ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। চালদীয়গণের প্রাচীন ইতিহাস-লেখক—রগোজিন, তাঁহার ইতিহাসে,—ভারতীয় সিন্ধুতীরবাসী কৃষ্ণকায় গণ-জাতিদিগকে—হিন্দুকুশের উপর দিয়া লইয়া গিয়া—চালদিয়ার গোড়া পত্তন করিয়াছেন। ব্যাবিলনের, ইজিপ্টের ইতিহাসে—ভারতীয় কালা জাতিদের সম্বন্ধে কিছু আছে। এসকল নব-আবিষ্কৃত মতবাদ, এখনও শ্বেতকায় ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক হল, স্বীকার করিয়াছেন, সুমার-আকাদীরা, 'অ-সেমেটিক,' সুতরাং বাইবেল-উক্ত সেমেটিক জাতি নয়। বর্ত্তমান কালের নৃতত্ত্ব-বিদ্যার বিশেষ আলোচনা এবং আবিষ্কার হেতু বলা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের দক্ষিণে—বর্ত্তমান ভারত-সীমায় আদি নর-মিথুনেরও অভ্যুদয় হইয়াছে।

কোল-জাতি সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান

এ কার্য্যে ব্রতী হইবার কারণ এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক,—ইতিহাস (প্রাচীত্যের) এবং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যেন একটি তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখা যায়। বর্ত্তমান স্বদেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকগণ, যখন 'কোলারিয়ান' নামক গণ-জাতিকে ভারতে আনয়ন করিয়া, অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতীয় গণ-জাতি 'কোল'দিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে, আদ্য-জাতি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, এবং বাইবেলের মত সমর্থন করিয়া ভারতের বহির্ভাগ (পশ্চিম) হইতে ভারত-প্রবেশের গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোল-জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রথমেই আরম্ভ করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ, ইহাদের বংশ-পরম্পরাগত শ্রুতিমধ্যে ইহাদের প্রাথমিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে—এই আশা করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি। প্রথম বাধা ইহাদের কথিত ভাষা, বর্ত্তমান প্রচলিত কোন প্রকারের বাংলা ভাষা নহে। এই বাধা দূর করিতে প্রথম অবলম্বন হইল—'গ্রামার অব্ দি কোল ল্যাংগোয়েজ,' কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল ফলিল না। দুই এক বৎসরের মধ্যে এ বাধা অতিক্রম করিয়া, ছোটনাগপুরের কোল-জাতির তথ্য সংগ্রহ কালে, আসানসোল অঞ্চলে কয়লা খাদের মহিমায় কোলগণের পরিচয়-প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহারা নিরক্ষর জাতি (খৃষ্টান কোল বাদে), তত্রাচ ইহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধগণের জাতীয়-শ্রুতি-জ্ঞান বিলক্ষণ রহিয়াছে। বুঝিলাম, কোলজাতি সাঁওতাল জাতির অন্যতম শাখা-বিশেষ। সুতরাং কোল সম্বন্ধে অনুসন্ধান স্থগিত রাখিয়া, সাঁওতাল (সমেতাল বা হড় জাতি) জাতির তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলাম। প্রথম বাধা—হড় ভাষায় অনভিজ্ঞতা। এক বৎসরে এ বাধা দূর হইল। সুযোগ-ক্রমে বুদ্ধিমান জনৈক সমেতাল মাঝির (মণ্ডলবৎ) সহিত বন্ধুত্ব হইল। সেই ব্যক্তির নাম 'মাতাল-মাঝি', দেখিতে ভীমাকৃতি। তিনিই হইলেন আমার সখা—গুরু। তাঁহার অনুগ্রহে, সাঁওতাল (হড়) জাতির শ্রুতি সম্বন্ধে পরিচয়-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তত্রাচ এক ব্যক্তির কথিত শ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া জাতীয়-তথ্য সংগ্রহ করা উচিত

নহে বিবেচনায়, তাঁহারই সাহায্যে, বিভিন্ন পল্লীবাসী কয়েকজন হড়-জাতীয় মণ্ডলের (মাঝির) সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম। আমার বন্ধু যে সকল শ্রুতি বলিয়াছেন, সেগুলির সত্যতার পরিচয় বিভিন্ন ব্যক্তির কথিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখি, সকল শ্রুতিই এক।

সাঁওতাল বা সান্তাল—

এ জাতির প্রকৃত নাম নয়, ইহাদের জাতীয় উপাধি 'হড়'। হড় অর্থে দেহী-মানব—অর্থাৎ 'আদি-মানব'। ইহারা সমেত-শেখরবাসী আদি-জাতি। সমেত ক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম,—পরেশনাথ পাহাড় শ্রেণী। হড় অর্থে মানুষ। মনুষ্য জাতিকে ইহারা বলে—মানুয়ী। হড় জাতিরা, হিন্দুদিগকে বলে—দেকো। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-দিগকে বলে—ডেংকে। মুসলমানকে বলে—তুড়ুক্। ইংরাজকে বলে—জেটে। ব্রাহ্মণকে বলে—বাব্‌ড়েঁ।

হড়্‌-ছাচ্‌তোর

বলিয়া ইহাদের শ্রুতি-শাস্ত্র আছে, শ্রুতির ভাষাকে ইহারা বলে,—'পারসী' (হড়্‌-পারসী); যে-ভাষায় ইহারা পরস্পর কথা-বার্ত্তা চালায়, ইহার নাম—হড়্‌-রড়্‌ (রড়্‌-ভাষা), মোটের উপর সাঁওতালী ভাষার নাম—'হড়্‌-রড়্‌-ভাকা'।

প্রথম-শ্রুতিতে

উক্ত হইয়াছে, কি প্রকারে ভূমি (ধার্‌তী) প্রকটিত হইল। আদি নর-মিথুনের অভিব্যক্তির কথা, এই শ্রুতিতেই পাওয়া যায়। পৃথিবী-সৃষ্টির কথা ইহারা বলে না। ইহারা বলে—প্রথমে যে ভূ-খণ্ডে তাহাদের সর্ব্বাদি পিতা-মাতা জন্মলাভ করিয়াছিলেন, যথায় তাহারা বাস করিত বা করে, সেই ভূভাগকেই ইহারা 'ধার্‌তী' (ধরিত্রী) বলিয়া থাকে।

প্রথম মূল-শ্রুতি (হড়্‌-শ্রুতি)

"সেদায় সানাম্ এথেন্ দাঃ গি তাঁহেকানা। সেরমা থন্ 'মারাং-বুরু' তোড়ে সুতামতে টিলউ আং,—আঁড়গো লেনায়। আর্ দাঃ চেতানরে, সেনেগর্-মাচি বেল্ কাতে এ ছুম্বুপ্ এনায়। উনি আ বারেআ মাইলাথন্, হাঁস-হাঁসিল্ চ্যাড়ে—কিন্ জানাম্ এনা মারাং-বুরুআ হুকুমতে, ওনা সেনেগর্-মাচি, পয়রাণি বাহা দারে এনা। ওনা পয়রাণি-বাহা-স্বাকাম্ চেতানরে উন্‌কিন্ বারেয়া-চ্যাড়ে কিন্ বেলে কেদা। উন্‌রে ধার্‌তী বেনাও লাগিৎ মারাং-বুরু, আডি আ[illegible] রাজ্‌কয়, মেতাৎ কো আ। তায়ান্ রাজা কাট্‌কোম রাজা, ইচাঃ রাজা, গোংহা রাজা, এমান[illegible] বাংকো দাড়ে আদা; মেন্‌থান্ হর্‌রাজা আর কেঁচুআ রাজা, কিন্ দাড়ে আদা। কেঁচুআ রাজা পয়রাণি-বাহা ডার্ ভিৎরি ভিৎরিতে বল্‌অ কাতে হাসা এ বুরজ রাকাব্ কেদা। আর্ হর্‌রাজা দেয়া চেতানরে ওন হাসাকয় আতাং কেদা। নোংকাতে ধার্‌তী বেনাও এনা। ওনা বারেআ বেলে থন্—'পিল্‌চু-হাড়াম' আর্—'পিলচু বুড়হি' কিন্ জানাম্ এনা। নুকিন্‌[illegible] সানাম্ হড়্‌রেন্ আগিল্ এংগা-আপা। চাবাএনা।"

প্রথম শ্রুতির (সূত্রের) ব্যাখ্যান—

সৃষ্টির প্রথমে—আদিতে (সেদায়) সমুদয় কেবল জলময় ছিল। স্বর্গ হইতে (সেরমা থন্) শ্রেষ্ঠ-প্রভু—(ধরম্-গুরু) বা আদি-দেব, রেশমী সূতা অবলম্বি[illegible] সোনার সিংহাসনে বসিয়া নামিয়া আসেন, এবং জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন। তাঁহার দেহের দুইটি ময়লা (মলা) হইতে, রাজহংস এবং রাজহংসী পক্ষী প্রকট লাভ করে। মারাং বুরুর (আদি-প্রভুর অনুজ্ঞায়, স্বর্ণ-সিংহাসন পদ্ম-ফুলের ঝাড়ে (গাছে) পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ পদ্ম-পাতার উপরে পাখী—দুইটি ডিম পাড়ে। এই কালে, আধার—স্থান (ধরিত্রী) নির্ম্মাণের জন্য, অনেক অনেক (আডি আডি) রাজাকে বলিয়াছিলেন। কুমীর (তায়ান্)-রাজা, কাঁকড়া-রাজা, শামুক-রাজা, চিংড়ী-রাজা (ইচাঃ) ইত্যাদি কেহ পারে নাই; কিন্তু কচ্ছপ-রাজা (হর্) এবং কেঁচো (কেঁচুয়া, সং—কিঞ্চুলুক) রাজা, এই দুইজনে পারিয়াছিল। কেঁচুয়া-রাজা পদ্মের নাল (মৃণাল) মধ্য দিয়া, মাটি (হাসা) তুলিয়াছিল, এবং কাছিম-রাজা, তার দেহে—পিঠের উপরে (দেয়া চেতানরে) মাটি

ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে ভূ-ভাগ নির্ম্মিত হয়। ঐ দু'টি ডিম হইতে,—পিলচু হাড়াম্ ও পিলচু বুড্হি জন্মলাভ করেন। ইঁহারাই সকল মানুষের (হড়রেন্) আদি (আগিল্) পিতা-মাতা। সমাপ্ত।

হড়-শ্রুতিতে পাওয়া গেল, কি প্রকারে আদি-প্রভু ধরিত্রী সৃজন করিয়াছিলেন। এই কল্পনা কেবল সাঁওতালী পরিকল্পনা নয়,—সমগ্র বংগের বাংগালী জাতিরও ধারণা। মালদহে গম্ভীরা উৎসবে, 'শিব-গড়া' বন্দনাতে দেখা যায়—

(১)

"না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম্ম হয়ে শূন্যাকার॥
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তরে।
* * * *
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন॥
কহন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে॥"

—আদ্যের গম্ভীরা, ১৯ পৃঃ।

২য়-বন্দনা

সৃষ্টি

বাংগালীর আদি সৃষ্টি-কল্পনা—

"জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যাকার॥
* * *
সেই ডিম্ব হইল দুইখান॥
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান।"

—গম্ভীরা, ২৪ পৃঃ।

"মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মাটি সৃজন করিল যে॥"

—ঐ।

প্রাচীন বাংগালীর নিরঞ্জন—

"ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্ম-নিরঞ্জন॥"

—ঐ, ২৫ পৃঃ।

"জলেতে আসন গোঁসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥"

—ঐ, ৩৪ পৃঃ।

আদি-প্রভুর দেহ-মলা সম্বন্ধে, বাংগালীর শূন্যপুরাণে দেখা যায়—

"তিলেক পরমাণ মলা* নিল নারায়ণ।"

— শূঃ পুঃ, ১০৭।

"ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে॥"

—ঐ, ১০৮।

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি—

"সম্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিঞা গোঁসাই জপে আদ্য মূল॥"

—গম্ভীরা, ৩৬ পৃঃ।

"আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই কূর্ম্ম রূপ হৈল।
কূর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল॥"

—গম্ভীরা, ৩৭ পৃঃ।

শূন্য-পুরাণে—

"পদ্মহস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্মহস্তে জনমিল জে কূর্ম্মের সরীর॥"

—৭২।

হড়-শ্রুতিতে পাওয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম-গুরুর (মারাং বুরু) দেহ হইতে মলা দ্বারা হংস-হংসীর জন্ম হয় এবং আদি-প্রভু, তাহাদের অবস্থান জন্যই যেন, সূত্র সমেত সিংহাসনটি—একঝাড় পদ্মগাছে পরিবর্ত্তিত করেন। এই ব্যাপারটি,—বাংলার গম্ভীরা পূজা-উৎসবেও গীত হইয়া থাকে।—"আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥"—গম্ভীরা, ৩৮ পৃঃ। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল,—এ সকল ব্যাপার প্রাচীন বাংলার। হড়-শ্রুতিতে—আদি-প্রভু হংস-হংসী সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের আশ্রয়ের জন্য ধরিত্রী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

*মহাপ্রভু—"আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ,"—"তৎপরে গায়ের মলা হইতে বসুমতীর রূপ বিকাশ হইল। এই প্রকার উপাখ্যান—মানিক দত্তের চণ্ডী, বিষহরীর গান, ও গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে দৃষ্ট হয়।"—আদ্যের গম্ভীরা, ২৫৬ পৃঃ।

আকাশে ও ধরায়

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

চিত্ত ধায়, নিত্য ছুটে যায় আকাশের মৌন নীলিমায়,
দূর দুরান্তের ঐ স্বপ্নভরা দিক্‌চক্র পানে,
সারি সারি তরুশ্রেণী যেথা মিশে যায়
নীলে আর ধূসর কালোয়,
সেইখানে এ হৃদয় করে আনাগোনা।
সাঁঝের আঁধারে যবে বিশাল প্রান্তর
ধোঁয়ার চাদর গায়ে ঢেকে
ঘুমাবার করে আয়োজন,
সুদূর পল্লীর বুকে জ্বলে ক্ষীণ আলো
তরুশাখা-ছায়া ভেদি', ভেদি' ধূসরতা—
প্রান্তর-বধূর ভালে যেন এক চন্দন-তিলক—
সে আঁধারে, সেই দীপ্ত তিলকের মোহে
ঢুলে ঢুলে নেচে ধায় এ চিত্ত আমার।
মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত রজত-শোভায়
চিত্ত ধায় অনিবার।
বরষার আকাশের ছিদ্রহীন জমাট সে মেঘ-আবরণ,
তাও ভেদি' বারংবার চিত্ত চাহে হেরিবারে
এই বিশ্বজীবনের কল্লোলিত উৎস সে উদ্দাম।
পশ্চিম আকাশে পুন' সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ-পারাবারে
স্নান করে চিত্ত বারংবার।
পাখী হ'য়ে মাখি' লয় প্রভাত-সূর্য্যের ফাগ ডানায় ডানায়।
এমনি যে নিশিদিন অবিরাম গমন আমার
অসীমের অন্তর আলোড়ি'।
তবু তবু তৃপ্তি নাই,
মন প্রাণ তবু বুভুক্ষিত
জানি না কি গুপ্ত পিপাসায়!

মর্ত্ত্যে পুন' ফিরে আসি।
বিছাইয়া দিই এ হিয়ারে
সুশ্যামল সুকোমল তৃণ-শয্যা'পরে।
সুঘন-সবুজ পাতা-ভরা তরুদের শাখায় শাখায়
চিত্ত ওঠে জড়ায়ে জড়ায়ে।
শৈবালে ও হেলা শাখে আহত যে ক্ষীণা ক্ষুদ্রা
তটিনীর জল,
তারি স্বচ্ছ মন্থর ধারায় প্রাণ মোর ধায়
অতি ধীর এঁকে বেঁকে শিশুর সমান।
ক্ষুদ্র-পল্লী-জননীর আঙিনায় আঙিনায় ঘোরে এই হিয়া;
ফেরে যেথা নত নেত্রে চুমা দেন জননী শিশুরে;
ফেরে যেথা লাজনম্রা মরাল-গমনা,
কপালে সিন্দূর-বিন্দু
রক্তবাসে গৌর কৃশ তনুটিরে ঢেকে
আধেক গুণ্ঠনে আর লাল পাড়ে মুখপদ্ম ঘিরে,
বাঙ্গালীর অতি স্নিগ্ধা বধূ
প্রিয় সাথে স্বল্প ভাষে করে আলাপন।
চিত্ত ফেরে শিশু যেথা করিছে নর্ত্তন
আপনার অহেতুক প্রাণের উল্লাসে,
অবোধ্য ভাষায় তার প্রকাশি' উল্লাস।
চিত্ত ফেরে বন্ধু যেথা রোগশয্যা-শায়িত বন্ধুরে
নিদ্রাহীন যত্নে শ্রমে সেবিছে কঠোর।
চিত্ত ফেরে অবাধ্য শিশুটি যেথা পিতার শাসনে
ভীত-ত্রস্ত ছুটে এসে লুকাইছে জননীর অঞ্চলের কোণে।

হে ধরণী, এই মোর স্থান—
এই মোর প্রিয় প্রিয়তর প্রিয়তম সুন্দর আবাস।
হে মাটী, হে দুঃখ-সুখে নিত্য দোলায়িতা
ক্রন্দনে মুখর কভু, আনন্দেতে কভু উচ্ছলিতা,
তুমি মোর তুমি মোর পরম আশ্রয়
চিরদিনকার আর চিরকামনার।
শূন্যে শূন্যে প্রান্তরের ঔদাস্যে, আকাশে
ঘোরে বটে চিত্ত-পাখী,
তবু তার আরামের নীড় আর পরম শরণ
এই মাটী, এই ধরা, এই তৃণ-ধূলি-ভরা দেশ।

হে জননী পৃথিবী মৃণ্ময়ী,
আমারে ভুল না তুমি।
আমি নাহি ভুলিব তোমায়।
জীবনে তোমার বক্ষে করি বিচরণ,
মরণে তোমারি গর্ভে অনন্ত শয়ন
দিও দিও যুগ যুগ কোটী যুগ ধরি'।
অসীমের সন্তান মানুষ—
জানি তাহা।
কিন্তু তব সীমার আগার,
মধুর মধুর অতি বেদনে হরষে।
দুঃখ মাঝে বুঝি হেথা সুখের স্বরূপ,
শোকে লভি চিত্ত-বল,
প্রেমে পাই স্বরগের অমৃত-আস্বাদ।
দুঃখময়ী, সুধাময়ী, হে ধরা জননী,
তোমারে ছাড়িতে নাহি চাই

* * *

শূন্যে নয়, শূন্যে নয়,
আকাশের নীলিমায় নহে—
আমার আবাস নহে নীল নভস্তল।
আমার আবাস এই মাটীর ধরণী।
রে কবি, রে ক্ষিপ্ত-চিত্ত,
রে উদ্দাম আকাশ-বিলাসী,
ফিরে আয়, ফিরে আয়, মাটীর ভবনে।
মাটীই জননী তোর,
মাটী তোর সত্য দেশ, পরম আশ্রয়।

আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা
নিয়মাবলী

১। প্রাকৃতিক দৃশ্য বাদে অন্য যে-কোন প্রকার ভাল ছবি যথা— আকৃতি (Portrait, Subject study), খেলা, কোন বিশিষ্ট ঘটনা, [illegible] কারুকার্য্য বা ভাস্কর্য্য-শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার চিত্রই প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া চলিবে।

২। ছবি কোয়ার্টার প্লেটের ছোট বা ফুল প্লেটের বড় হইলে চলিবে না।

৩। বিচারের সময় ছবি তুলিবার কৌশল, প্রিন্টে'র উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে।

৪। 'মাউন্ট' করিয়া অথবা মোটা বোর্ডের মধ্যে ভরিয়া ছবি পাঠাইতে হইবে।

৫। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ভাল ছবি ছাপিবার সম্পূর্ণ অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের থাকিবে।

৬। সঙ্গে যথোচিত ডাকটিকিট পাঠাইলে অমনোনীত ছবি ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। ডাকে ছবি পাঠাইবার সময় ভাল করিয়া মোটা বোর্ড দিয়া প্যাক্ করিয়া পাঠাইবেন। কভারের উপরে "আলোক-চিত্র প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৮। প্রেরিত চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কুপন পাঠাইতে ভুলিবেন না। কুপনের উপরে নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৯। প্রেরিত ফোটো অন্যত্র পুরস্কার পাইয়া থাকিলে সে-কথার উল্লেখ করা আবশ্যক।

১০। পুরস্কার বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

১১। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছবি উদয়ন-কার্য্যালয়ে পৌঁছান দরকার।

১ম পুরস্কার ... ৩০৲ টাকা
২য় " ... ২০৲ "
৩য় " ... ১৫৲ "

ইহা ভিন্ন আরও ৫ খানি ভাল ছবির জন্য Consolation পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পদব্রজে ভারতবর্ষ

শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম মাস

মানুষের পায়ে-চলা এই যে অনন্ত পথ, এর ওপর দিয়েই কত পথিক অনন্তকাল ধ'রে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গেছেন। এই সব পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে ভাটপাড়া "টুরিষ্ট-ক্লাব" থেকে বছর দু'য়েক আগে কন্‌কনে এক শীতের ভোরে দু'টী মাত্র দরদীর সজল চোখ, মলিন মুখ ও উদ্বেগ-মৌন বিদায়-বাণী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বহন ক'রে যে-দিন অনিশ্চিত যাত্রার যাত্রী হয়েছিলুম—সে-দিন এ আশা অল্পই ছিল যে, সঙ্কল্পিত পর্য্যটন শেষ ক'রে সশরীরে আবার জন্ম-পল্লীটিতে ফির্‌তে পার্‌ব, বা জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা-সভার উৎসাহ-গর্ভ আশীর্ব্বচনে স্নাত হ'য়ে সেই ভ্রমণের দিন-লিপি সাধারণ্যে উপহার দেবার সুযোগ পাব।

"টুরিষ্ট-ক্লাব" নামে কোনো বনেদী ভবঘুরের আড্ডা না থাকলেও স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত অজপ্রকাশ হালদার মহাশয়কে কেন্দ্র ক'রে জনকতক ভ্রমণ-রস-পিপাসুতে মিলে আমরা একটা দলের সৃষ্টি করেছিলুম; আর, সে-দল থেকে সভ্যগণের পথ-যাত্রা এই প্রথম নয়। আরও কয়েকবার বর্দ্ধমান, কাশী, সিংহল হ'তে কুমারিকা ও পঞ্জাবের জলন্ধর ঘুরে আসা এই দলের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল—তবে সে যাতায়াত ছিল দ্বি-চক্রযান-যোগে, সদলবলে এবং পকেটে পাথেয় রেখে। এবারকার প্রস্তাবের নূতনত্ব ছিল এই যে, যান-বাহনের শরণাপন্ন না হ'য়ে, সকল মাটি মাড়িয়ে চলার স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে পথের খোরাক পথেই সংগ্রহ ক'রে চল্‌তে হবে। তবে ক্লাবের সেক্রেটারী "দু'চাকায় দু'হাজার মাইলে"র অন্যতম পথিক শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য একটা "রিজার্ভ ফাণ্ড" "প্রিজার্ভ" করার চেষ্টায় থাক্‌বেন।

এবারও কথা ছিল তিনজনে একসঙ্গে বেরুবার এবং আয়োজনও হয়েছিল তদুপযোগী; কিন্তু যাত্রা পূর্ব্বে অপর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে "বাড়ীর অমত" বাধা হ' দাঁড়াল। এ ঘটনায় মন মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেও নিজে পেছু পার্‌লুম না,—কারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছে দলে অগ্রণী হ'য়ে দরবার ক'রে যথাযোগ্য অনুমতি-পত্রা সংগ্রহের পর মত বদ্‌লাবার সঙ্কোচ অতিক্রম কর আমার পক্ষে সহজ হ'ল না।

শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

"ভারত-ভ্রমণ" প্রস্তাবের প্রাথমিক সাহায্য-কল্পে গ্রামের জনকয়েকের স্বাক্ষর-সংবলিত এক নিবেদন-পত্র প্রচারিত হয়; ফলে ৪২টী টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ পুঁজিতেই তিন জনের উপযোগী পোষাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণ আহৃত হয়, কিন্তু কাজে লাগে শুধু নিজেরগুলিই। তারাপদ ও গিরিশ

তাদের সঙ্কল্প বজায় রাখ্‌তে পারছিল না, তা আগেই বলেছি।

১৯৩০ সালের ৩রা ডিসেম্বর। শেষরাত্রি। চাটপাড়া চট্‌কলের প্রথম বাঁশী নিদ্রাকাতর শ্রমিকদের উদ্দেশে জানাচ্ছে—

"উঠে পড়্ সব, জাগা কলরব
আয় গুটি গুটি কাজে;
আর ঘুম নয়, হয়েছে সময়—
হাজিরার বাঁশী বাজে।"

ঐ কলের বাঁশীর নিমন্ত্রণ এতকাল আমাকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে—আজ কিন্তু কানে বাজ্‌ছিল কবি-বীণার আমন্ত্রণ-বাণী —

"হের—উষার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয়-অচল-পথে,
কনক-কিরীট তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে ;—"

শুধু কবির বিধিই নয়, "খনা"র বিধানেও নাকি ঐ সময়ে যাত্রা করার কথা আছে। কেননা, মঙ্গলের উষা"ও সেই সুলগ্নে "বুধে" চরণ-স্থাপনার উপক্রম ক'রেছিলেন! তখন খেয়াল করিনি, কিন্তু পরে পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি—উত্তরকালে বাঘের পেটে যেতে যেতেও যে যাইনি, বা অরণ্য-পথে বন্য হস্তীর শুঁড় থেকেও যে পরিত্রাণ পেয়েছি, তা' শুধু অজ্ঞাতসারেও "খনা"কে মান্য করার জন্যে। "অজ্ঞাতসারে" বলছি এই কারণে যে, প্রথমে যাত্রার দিন স্থির হয়েছিল ৩০শে নভেম্বর; কিন্তু এক নূতন "লাইট-পোষ্টের" আলোহীন থামের "কাঁটা-তারে" পায়ের আঙুল বিষম জখম হওয়ায় দিনটীকে কিছু পেছিয়েই দিতে হয়। যাত্রাদিনেও যে সে-ক্ষত নিরাময় হয়েছিল তা নয়; তবু কোন এক পরম শুভার্থীর "নিষেধ"ই যে সেদিন চরণে আঘাত হ'য়ে বেজে, আজ "খনা"র বিধিতে মুক্তি হয়ে গেল, এমন একটা ধারণা করাও অসঙ্গত নয়।

একটু পরেই নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়া'ল দু'টী বালক—দেবপ্রসাদ হালদার ও সীতারাম পাণ্ডে—পূর্ব্ব কথার ব্যবস্থানুযায়ী আমাকে বিদায় দিতে। এদেরই হাতে ঘরের চাবিটী 'মেজ-দা'কে দেবার ভার চাপিয়ে রাজপথে এসে যখন দাঁড়ালুম, তখন কলের অভিমুখে লোক-চলাচল অল্পে অল্পে সুরু হচ্ছে।

১১৫ পাউণ্ড ওজনের দেহের ওপর ৩০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা চাপিয়ে রওনা হ'লুম কলকাতার দিকে। অস্ত্রের মধ্যে রইল, লাইসেন্স-করা ছোরা ও বর্শা; আর বোঝার আধার "হোল্ড-অলের" মধ্যে হাফ্-প্যাণ্ট, হাফ্-সার্ট, টর্চ্চ-লাইট, ছুরি, কম্বল, চাদর, জামা-কাপড়, ছোট ব্যাগ-বন্দী রোড-ম্যাপ, সার্টিফিকেট-গুলো, চাঁদার খাতা, থারমোফ্লাস্ক, প্রসাধনের দ্রব্যাদি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু কিছু উপকরণ।

কলকাতা পর্য্যন্ত চেনা-পথ, যাতায়াত অনেক বারই হয়েছে—তবু আঙুল-কাটা খালি-পায়ে অনভ্যাসের বোঝা ঘাড়ে ক'রে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমেই অবসন্নতা অনুভূত হ'তে লাগ্‌ল। নিরিবিলি দেখে খড়দহে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল, এবং আগড়পাড়ায় সাগর দত্তের বাগানে আধ-ঘণ্টাটাক্ বিশ্রাম করারও দরকার হ'ল।

বিশ্রামের ফলে পা বস্‌ল, বেঁকে—তবু সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের খাড়া ক'রে লজ্জার খাতিরে আবার বোঝাটাকে ঘাড়ে তুল্‌লুম এবং পুরো দমে চল্‌তে আরম্ভ করলুম।

বেলা একটায় টালার পুল পার হ'য়ে বাগবাজারের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে যখন উপস্থিত হ'লুম, তখন তাঁর স্নান হ'য়ে গিয়েছে। বাইরের ঘরে বোঝা নামিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

ডাক্তার-বাবু আমাদের গ্রামের লোক, আত্মীয়, সর্ব্বজনপ্রিয়,—তবু ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রাবল্য সত্ত্বেও এই অসময়ে মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে দারুণ লজ্জা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। আরও মনে হ'তে লাগ্‌ল—প্রথম দিনেই যখন এত কষ্ট হচ্ছে, তখন ভারত-পরিক্রমণ আমার দ্বারা অসম্ভব।

ডাক্তার-বাবুর ছেলে মুরারির সঙ্গে কথোপকথনের ছলে ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করার পর, এক অবকাশে, তার অজ্ঞাতে পাড়ি দিলুম—অতিকষ্টে—হরিতকী

বাগান। এখানে আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাসায় এসে স্নান ও জলযোগ হ'ল; ভগিনী তখন কাশীতে রোগশয্যায়। মাও ছিলেন তাঁর কাছে। সন্ধ্যায় ভগিনীপতি ও তাঁর দাদারা এলেন। ব'ল্লুম, হেঁটে এসে একটু ক্লান্ত; বিশেষ কোন কথা তখন ভাঙ্গ্লুম না। যা' কিছু কথা হ'ল পরে শুধু ভগিনীপতির সঙ্গে। রাত্রে আহার সেরে একটী ঘুম; ব্যস্, পরদিন বেলা ৮টা! ভাটপাড়া থেকে কলকাতা এই ২৩ মাইলই প্রথম দিনের মুখবন্ধ।

ভগিনীপতি ডাক্তার-মানুষ—কাজেই শরীরের ব্যথা যাবার ওষুধ দিলেন হোমিওপ্যাথি। কতকটা উপকার হ'ল; কিন্তু পায়ের তলার যা অবস্থা, তাতে খালি পায়ে মাটি মাড়ান দায় হ'য়ে উঠ্ল।

বিকালে গেলুম ঠনঠনে। এক জোড়া খড়পা কিনে, পাশের এক মুচীকে দিয়ে বেশ ক'রে পেরেক লাগিয়ে নিলুম। পায়ে দিয়ে চল্তে একটু আরামই হ'ল।

আজ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর। সকলেই কাজে গেল বেলা ১০টার মধ্যে; আমিও আহারাদি সেরে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলুম। যখন দেখা গেল বাধা দিতে আর কেউ নেই, তখন বোঝা কমাবার কাজে মন দিলুম। পরলুম কাপড়, জামা; বোঝার মধ্যে রইল—কম্বল, চাদর, ছুরি, টর্চ্চ-লাইট, পটু, গরমের মোজা, গামছা, নোট-বই, ছোট ব্যাগ, টুপি ও থারমোফ্লাস্ক। বোঝাও হ'ল অনেক হাল্কা। বক্রী অস্থাবরগুলো বাসায় রেখে ও একখানা চিঠিতে ওগুলো বাড়ীতে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে বোঝাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল মেটেবুরুজের দিকে। পথে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "হকির ম্যাচ্ বুঝি?"

কলকাতার জনাকীর্ণ পথে কেমন একটা লজ্জা বোধ হ'তে লাগ্ল—যেন কত অপরাধী; কোন প্রকারে শহর পার হ'তে পারলে বাঁচি! এই ভাবে, চৌরঙ্গী থেকে ভবানীপুর হ'য়ে মেটেবুরুজের পথ ধর্লুম। নবাবের বাড়ীর ধার দিয়ে, কিং-জর্জ্জের ডকের পাশ দিয়ে গঙ্গাতীরে পৌছে প্রাণটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এক আনা ভাড়ায় নৌকায় উঠ্লুম রাজগঞ্জের ঘাট লক্ষ্য ক'রে। যাত্রীও ছিল অনেক। তীরে পৌছে বি-এন রেলের পথ ধর্লুম। পাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে দেখা হ'ল একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে, তাঁর বাড়ীর দরজায়; নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, কাজ করতেন ভাটপাড়ার চট্‌কলে। তাঁর বাড়ীতে বৈকালিক চা পান করা গেল; আর জানা গেল যে, বালেশ্বরের সাব-ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ব্রহ্ম মহাশয় তাঁর ভগিনীপতি। উলুবেড়ের পথ জেনে নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিলুম, এবং সাঁকরেলের ষ্টেশনের কাছে রেল-লাইন পেরিয়ে লাইনের পাশে-পাশেই মেটে পথ পাওয়া গেল। ক্ষিদে পেয়েছিল খুব, পথে ভাস্বার ভাবনায় ভাল খাওয়া হয়নি; শরীরটাও অবসন্ন, তায় আবার খড়পার ফোস্কা। এক "চা ও খাবারের দোকানে" ঢুটো রসগোল্লা ও চা খেয়ে পথ চল্তে চল্তে কতকটা আরাম বোধ হ'তে লাগ্ল। রাত্রি আটটায় প্রায় ১৮ মাইল পথ চলার পরে এলুম বাউড়িয়া ষ্টেশনে। অজানা পথ, তায় বিদেশ; অন্ধকার মেঠো রাস্তায় তুর্ব্বল বাঙ্গালী একলা; মনটায় কেমন যেন একটু ভয় হ'তে লাগ্ল। ষ্টেশনে আস্তেই সে ভাবটা কেটেছিল বটে, কিন্তু শরীর প্রথম দিনের অবস্থায় দাঁড়াল। সারা দেহ পাকা ফোঁড়ার মত; পায়ের তলা হ'তে মাথার চুলে পর্য্যন্ত ব্যথা। কাছেই ছিল দোকান; খেলুম কিছু কিনে; পয়সা বাকী রইল মাত্র দশটী।

ষ্টেশনে এসে কোথায় শোব তাই ভাব্ছি। একে শীত, তায় ষ্টেশনে কত রঙ-বেরঙের লোক; ভয়, পাছে হারায় পথের সম্বল—সরকারী কাগজগুলা। বিনা সরকারী অনুমোদনে এই ভাবে পথ চলা যে কত বিপজ্জনক, তা বোধ হয় ভারতবাসী সকলেরই বিশেষ ভাবে জানা আছে। ষ্টেশন-মাষ্টারকে আবেদন করায় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর খোলা বারান্দা দেখালেন। দুঃখ হ'ল মনে; প্রথম দিনেই এই, না

জানি আরও কত লাঞ্ছনা ভাগ্যে আছে। ভাববার সময় কম, শরীর ভেঙ্গে পড়্ছে, কাজেই কম্বল ও চাদর বের ক'রে, খড়পাটাকে বোঝায় রেখে মাথায় দিয়ে একটা বেঞ্চে কাৎ হ'লুম। মাঝ রাত্রে একজন এসে ডেকে বল্লেন, "ওঠো।" ভারী রাগ হ'ল; বল্লুম, "কারণ?"—উত্তর হ'ল, "আমি এখানে রোজ শুই।" দেখ্লুম রেলের বাবু, রাতের কাজ শেষ ক'রে এইখানেই থাকেন; রাগ হ'লেও তা দমন ক'রে বেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে শু'লুম মাটিতে মেঝের ওপর। ভাব্লুম, আমি তো কষ্ট কর্তেই বেরিয়েছি, তখন আর কেন এই একশো-আট-গাধা-মরা কেরাণীর অদৃষ্টে বাদ সাধি!

রাতের ঘুম ফাঁকা জায়গায় যেমন হয়, তেমনি হ'ল। পরদিন শনিবার ফর্সা হ'তেই উঠে, মুখ ধুয়ে, বোঝা-বাঁধা শেষ ক'রে যাত্রার যোগাড় কর্লুম। শরীরটা দুর্ব্বল মনে হ'তে লাগ্ল। পাশেই চায়ের দোকান, কিন্তু খরিদ্দার কম; শীতের ভোর, কাজেই তখনও দোকান খোলেনি। একটু অপেক্ষা কর্লুম, চা না খেয়ে আর পথ চল্তে যেন মন সর্ছিল না। ডেকে দোকানদারকে তুলে পানতুয়া ও চায়ের ব্যবস্থা করা গেল।

বেলা প্রায় ৮টায় মেঠো পথ ধ'রে উলুবেড়ের দিকে রওনা হ'লুম আশাবরীর সুরের সাথে। ছ'মাইল যেতে হবে; শীতের শিশিরে ভেজা অল্প অল্প ঘাসের ওপর দিয়ে খড়পা-পায়ে চলা দায় হ'য়েই পড়্তে লাগ্ল; সুরের ও চলার তাল কেটে যেতে লাগ্ল। আন্দাজ ৯॥০টায় উলুবেড়ের পাকা রাস্তায় প'ড়ে বাজারের একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর্তে তিনি কালীবাড়ীর নাম কর্লেন ও জানালেন যে, থাক্বার ও খাবার ব্যবস্থা হবে, যদি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ধাড়া মহাশয়ের কাছে যাই। এ নাম পূর্ব্ব-পরিচিত, কেননা স্বনামধন্য কন্ট্রাক্টর (contractor) জে, সি, ব্যানার্জ্জীর অধীনে চাকরী নিয়ে ছ'মাস এই উলুবেড়েতে এক সময়ে থাক্তে হয়েছিল। সে পরিচয় গোপন ক'রে উপস্থিত পরিচয়েই আশ্রয়-প্রার্থী হ'লুম। একবেলা খাবার ব্যবস্থা হওয়ায়, কালীবাড়ীর একটা ঘরে জিনিসপত্র রেখে এবং গঙ্গাস্নান সেরে, বাকী দুটি পয়সায় চা পান ক'রে সম্বল শেষ কর্লুম।

মধ্যাহ্নে আহারের পর একটু বিশ্রাম-বাসনা কখন ভেতর থেকে মনটা অধিকার ক'রেছিল ঠিক বোঝা না গেলেও,—পথ চল্তে পা পিছ্লে প'ড়ে যাবার ভয়ে, যখন চেতনা হ'ল, তখন চিন্তা হ'ল পয়সার। কার কাছে যাই? কি বলি? মাত্র এই-টুকু পথ এসে, কেমন ক'রেই বা সাহায্য চাই? পার্ব কি না জানি না, তবে কি ক'রে বলি যে, হেঁটে ভারত ঘুর্তে বেরিয়েছি? নানা চিন্তায় মনের দৌর্ব্বল্য ফুটে উঠ্তে লাগ্ল। অবশেষে ব্যাগ-বন্দী কাগজ সমেত, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দু'এক জনের কাছে গিয়ে প্রস্তাব কর্লুম। এভাবে চাওয়া যে কী ভীষণ ও মর্ম্মান্তিক—তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে আর কি বুঝ্বে!

কিন্তু যে-কাজটা হ'বার, দেখা গেল তার উপায় ঠিক আপনা হ'তে কলের মতই হ'য়ে যায়। আমারও জুটে গেল এক দরদী; নেশা আছে ঘুরে বেড়াবার; পুরী পর্য্যন্ত সাইকেলেও গেছেন; নাম শ্রীযুক্ত নীলরতন চ্যাটার্জ্জী, শরৎ-বাবুর অধীনস্থ চাকুরে। ভ্রমণ-পথে প্রথম বাইরের সাহায্য পাই এঁর কাছে, একটা টাকা; নদীগুলি পার হ'বার ও সামান্য চা-পানের মত খরচা। পথে যিনি যা দিয়েছেন তার হিসাব ও দাতার নাম, স্থান, তারিখ চাঁদার খাতায় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ রয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ যে বিনা-পয়সায় ঘোরা যায় তার সাক্ষ্য দিয়ে।

সন্ধ্যায় নীলরতন-বাবুর দৌলতে আর এক অজানা অপরিচিতের সাক্ষাৎ মিল্ল, ইনি উলুবেড়ে থানার সাব্-ইন্সপেক্টর এবং ২৪ পরগণার গোয়েন্দা বিভাগের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের পুত্র। রাতের খাওয়া তাঁদের হোটেলেই একসঙ্গে শেষ ক'রে, নিঃসঙ্গ যাত্রার কথা উঠ্‌তে তিনি বল্‌লেন, "কেন একটা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেননি, যখন সবই পরিচিত রয়েছেন? যদি বেরুলেন-ই, তবে ভাল ব্যবস্থা ক'রে বেরুনই উচিত ছিল।" কিন্তু তিনি জান্‌তেন না যে, সে-চেষ্টা লালবাজার পুলিশ অফিসে আমার বন্ধু কবিরাজ হরকুমার গুপ্তের মাতুলের কাছে গিয়ে, দেখা ক'রে, সরকারী অনুমোদিত পত্রাদি দেখিয়েও সময়ের অভাববশতঃ কৃতকার্য্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা'ছাড়া সঙ্কল্প-সিদ্ধি সম্বন্ধেও মনের দৌর্ব্বল্য থাকায় চেষ্টায় জোর পৌছায়নি। আর ঐ একই কারণে, কতকটা অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত কাগজেও খবর দিতে মানা করেছিলুম। মনে হয়েছিল যে, ঢাক বাজিয়ে ফেরার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিদায় নিয়ে গঙ্গাতীরে কালীবাড়ীর সেই ঘরের মধ্যেই কম্বলখানা বিছিয়ে রাত কাটালুম।

৭ই তারিখের সকাল-বেলায় মুখ-হাত ধুয়ে খালের পুল পার হ'য়ে এসে ধর্‌লুম উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড্‌। মেটেবুরুজ দিয়ে না এসে বজ্‌বজ্‌ দিয়ে আসাই ছিল সুবিধাজনক; কিন্তু পথের শেষ যেখানে সুদূর—সেখানে এরকমের একটু-আধটু ভুলে কিছু যায়-আসে না। উলুবেড়ে থেকে পথটা কতকটা খালের ধার দিয়ে গেছে; দেখ্‌লে মনে হয়—অনেক দিন সংস্কার হয়নি। এই পথে ৮ মাইল এসে দামোদর নদ খেয়ায় পার হ'লুম। পারে এসে স্থির করা গেল, একদিন পথ চল্‌ব, আর একদিন বিশ্রাম। সারা ভারত ঘোরা এ ত' আর যা-তা নয়; শরীর ঠিক রেখে চল্‌তে হবে; আর থাক্‌তে হবে এমন জায়গায় যেখানে বিপদ্‌ না' হতে পারে, খাই আর না খাই। তারপর অদৃষ্ট। যখন বেরিয়েছি, তখন হয় সফলতা, না হয় মরণ; মাঝামাঝি কিছু চাই না। হিসাব ক'রে দেখা গেল ৩০ মাইল পথ চ'লে তবে ভাল জায়গা "পাঁচকুড়া"য় উপস্থিত হ'তে পার্‌ব। সেখানে থাক্‌বার ঠিকানা পেয়েছিলুম আমার বন্ধু ঠাকুরদাসের কাছে; তার বাবা এ তল্লাটে বহুদিন ছিলেন। নীলরতন-বাবুর দেওয়া ঠিকানা ছিল ১২ মাইল পথের পারে "দেউলটী" গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর। সোজা পথ থেকে সে প্রায় মাইলখানেক দূরে। দেউলটী আস্‌তে পথ ভুলে আর একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ি—পরে আবার বড় রাস্তায় এসে মোহিনী-বাবুর বাড়ী যাই। পথটা মাঝে মাঝে নির্জ্জন। মাথায় টুপি থাকায় গ্রাম্য বে-সরকারী পাহারাদার কুকুরগুলার অযাচিত পাহারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করার চেয়ে আমাকেই বেশী শঙ্কিত ক'রে তুল্‌ছিল; কারণ, তাদের শুক্‌নো দেহের সারবস্তু দাঁতগুলোকে নিতান্ত অবহেলার যোগ্য মনে করা চলেনি।

গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে প্রায় খাবার সময় হাজির হ'লুম মোহিনী-বাবুর গৃহে, গ্রামের পায়ে-চলা পথের দাগ ধ'রে। নিজের দুঃখের কাহিনীর উল্লেখ ও উলুবেড়ের নাম করায় তিনি ভরসা দিলেন এবং জানালেন যে, ভাটপাড়ায় তাঁর গুরুদেবের বাড়ী।

বাড়ীর কাছেই পুকুর থাকা সত্ত্বেও স্নান কর্‌লুম না; কারণ এক-কাপড়ে শীতে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা ছিল,—তা'ছাড়া খেয়ে উঠেই পথ চলার এবং "একা নদী বিশ ক্রোশ" পার হওয়ারও তাগিদ ছিল। আহার সমাপ্ত হ'ল; এতটা পথ দুরমুস্‌ ক'রে আসার ফলে ক্ষুধারও অন্ত ছিল না। বেলা প্রায় ২টায় দেউলটী হ'তে রওনা হ'লুম। অল্প পথ চলার পরেই দেখা দিলেন "রূপনারায়ণ"; বাঁ দিকে চাইতেই দেখা গেল যে, রেলওয়ে-সেতুর স্তম্ভ ভৃগুর চরণের মত এঁর বুকেও নেমে এসেছে—তবু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা'তে পারেনি। দেউলটীর আগে শীর্ণকায় দামোদর পার হ'তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। রূপনারায়ণের তীরে এসে দেখি নৌকা দূরের কথা, জন-প্রাণীর সাড়া পর্য্যন্ত নেই।

নৌকার অভাবে ঐ সেতু-পথে নদী পার হ'বার অভিপ্রায়ে প্রায় আধ মাইল চ'লে এলুম, কিন্তু বাধা পেলুম পুলিশের হাতে—যেহেতু গবর্ণর আস্‌ছিলেন। ফিরতে বাধ্য হ'লুম আবার সেই নৌকার চিহ্নহীন খেয়াঘাটে। ইতিমধ্যে দু'একজন পারের যাত্রী এসে মাঝির অপেক্ষা করছিলেন। ওপারে হচ্ছে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমরক্ষেত্র "কোলাঘাট," তবে আজ ঐ নাম ও রূপনারায়ণ নদ ছাড়া যুদ্ধের অন্য চিহ্ন কিছুই নেই। দূরের যাত্রী নিয়ে বেগে ধাবমান দু'একখানি বাষ্পীয় পোত খেয়াঘাটে ব'সে ব'সেই দেখ্‌তে পাওয়া গেল।

শুনলুম, মাঝির দেরী হচ্ছে, তার কারণ এই যে, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু "রসস্থ" হওয়া বেচারার অভ্যাস। অনেক ডাকাডাকি ও ছাতি-কাপড়-নাড়ার পর ওপার থেকে যাত্রী-ওঠার আভাস পাওয়া গেল; এবং প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আমাদের প্রতীক্ষায় রাখার পর, নাবিকপ্রবর তাঁর নৌকা নিয়ে ঘাটে ভিড়্‌লেন। উঠ্‌লুম সকলে নৌকায় একটু কাদা ভেঙ্গে; কারণ মেটে ঘাট, তার জল গিয়েছিল নেমে। বেলা প্রায় চারটেয় কোলাঘাটে কোলাহল করতে করতে নামা গেল; পারানি দিতে হ'ল দুটী পয়সা। ওপরেই ছিল দু'একখানা দোকান, খড়ের গাদা, ব্যবসাদার জনকয়েকের বাসা আর দু'একটা চা'ল-কল; এখানে কালবিলম্ব না ক'রে "পাঁচকুড়া" পৌছাবার অভিপ্রায়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম।

পথেই সন্ধ্যা এসে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, ক্রমে পল্লী-পথের তরুচ্ছায়া-মসী-ঘন অন্ধকার যেন গ্রাস করতে ছুটে এল; টর্চ্চ-লাইটের সাহায্যে বাকী পথ চ'লে, আন্দাজ ৭৷৹টায় এলাম পাঁচকুড়ার বাজারে। দেখি শীতের প্রকোপে দোকান-বাজার প্রায়ই বন্ধ হ'য়ে গেছে,—ওরি মধ্যে একটা দোকান খোলা পাওয়ায় জিলাপী ও বেগুনী জাতীয় কিছু খেয়ে নিয়ে কাছেই অবস্থিত খালের পুলের পারে ডাক-বাংলায় উপস্থিত হ'লুম। এই খাল সেই উলুবেড়েরই খাল। মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গেছে। রেল হ'বার পূর্ব্বে নৌকাযোগে যাত্রীগণ যাওয়া-আসা করতেন। খানিকক্ষণ ডাকা-ডাকির পর, চৌকীদার দোর খুলেই আমায় দেখে সহাস্যে বল্‌লে, "আরে বাবু যে, নমস্কার! আসুন আসুন"। আমি তো অবাক্! জিজ্ঞাসা করলুম—"তুমি আমায় চেন?" সে কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বই কি; আপনি যে আমার বাবু।" তার কথার জড়তা লক্ষ্য ক'রে বুঝ্‌লুম, তার ভুলের যথার্থ হেতুটি কি। প্রকাশ্যে বল্‌লুম, "দেখ হে, আমি তোমার বাবু নই, পথিক মাত্র, রাতটা থাক্‌তে চাই। হাতে পয়সা নেই যে সুবিধাজনক জায়গা জোগাড় করি; অথচ এই অচেনা জায়গায়, অন্ধকারে, আশ্রয়ও আর খুঁজ্‌তে পারা যায় না।" কি ভেবে সঙ্গে একটা আলো নিয়ে কাছেই তার মনিব ওভারসিয়ারের বাড়ী আমাকে নিয়ে গেল। তাঁকে ডেকে সব কথা ব'লে রাত কাটাবার অনুমতি পেলুম। তবে কথা রইল যে, সকালেই যেন অন্য আশ্রয় দেখি; অফিসার কেউ এলে তাঁর চাকরীর বিপদ অনিবার্য্য। ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে ডাক-বাংলায় ফিরে এলুম।

আরাম-চেয়ারে কম্বল ও চাদরের অন্তরালে "লম্বা" হ'লেও, সারা দেহের বেদনা, পায়ের ফোস্কা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে লাগ্‌ল। শীতের প্রাবল্য ও জায়গার নূতনত্ব হয়ত তার কতকটা কারণ।

সকালে উঠে চৌকীদারের জিম্মায় জিনিসপত্র রেখে চা-পানান্তে কাগজ-বন্দী ব্যাগটী সঙ্গে ক'রে ৫ মাইল পথের অন্তে অবস্থিত রঘুনাথ-বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হ'লুম। শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না এবং সুনিদ্রার অভাবে দৌর্ব্বল্যও অনুভূত হচ্ছিল। পাঁচকুড়ো ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, পাড়াগাঁয়ের পুলিশ, ঝোলায় কাপড়-চোপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেল-লাইনের ধারে। মনে পড়্‌ল গবর্ণরের আসার কথা। তাঁর স্পেশ্যাল ট্রেন, শনিবার থেকে পাহারা দিয়ে, রবিবার যাবার কথা; আজ সোমবার তবুও দেখা নেই। পাহারা-ওয়ালাদের মুখ-চোখ রাত জেগে জেগে শুকিয়ে গিয়েছে;

সময়ে না নেয়ে-খেয়ে মেজাজও হ'য়ে গেছে কড়া; তার ওপর ম্যালেরিয়া-ভোগা দেহগুলিকে প্রচণ্ড শৈত্যের সঙ্গেও যুঝ্‌তে হচ্ছে। পথে-পাওয়া অন্য লোককে পথ জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, যখন পাহারাদার পুলিশের বিরক্তিভরা "জানি না, বাবু" উত্তর কানে বাজ্‌ল।

রঘুনাথ-বাড়ীর মোহান্ত শ্রীঅচ্যুতানুজ দাস মহাশয়ের গৃহে এসে নিজের ও বন্ধুর নাম ক'রে পরিচয় দেবার পর ম্যানেজারের সহিত আলাপ হ'ল; ইনি বেশ ভদ্রলোক। এ সব অঞ্চলে তখন নাকি গণ্ডগোল চল্‌ছিল ব'লে প্রথমে কে, কোথা হ'তে আস্‌ছে, এসব না জেনে ভাল ক'রে কথা বল্‌তে ভয় পাচ্ছিলেন। পরে শুন্‌লুম, লবণ-তৈরী-করা স্বদেশী ছেলেদের জ্বালায় গ্রামবাসী পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। তখনি মনে পড়্‌ল,—পথে আস্‌তে রিজার্ভ মোটর-বাসে, মোট-ঘাট সমেত, অনেক বিদেশীকে আস্‌তে দেখেছি গ্রামের মধ্যে সরকার পক্ষের ছ'একটা ছোট ছাউনিতে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর প্রসাদ পাওয়ার পর চারিধার ঘুরে ফিরে দেখা গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পুকুর, মন্দির, স্কুল, লাইব্রেরী, জমিদারী। মোহান্ত মহারাজকেও দেখ্‌লুম সুশ্রী, সুরুচিসম্পন্ন, এক নবীন সাধুবেশধারী রাজকুমার। বেশ ভাল লাগ্‌ল তাঁর এই "সব-পাওয়া" "সব-ছাড়া" বেশ, ও রাত কাট্‌ল আরামে লেপের মধ্যে।

এই শান্তিময় স্থানে থেকে দেহের ও মনের শান্তি ফিরে এল এবং দেশ ছাড়ার বিরহও যেন কতকটা ভুলে গেলুম।

সকালে উঠে মোহান্ত মহারাজ সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে রত; আমিও তাড়াতাড়ি সকালের কাজ ও চায়ের পালা শেষ ক'রে ৫৲ টাকা পাথেয় খাতায় লিখিয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শরীরটাও ভাল বোধ হচ্ছিল—বেদনা যা একটু ছিল তা পায়ে।

বেলা প্রায় ১০টায় পাঁচকুড়োর বাজার থেকে আরও কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম বোঝা পিঠে। বাজার, দোকান সবই খোলা এবং খরিদ্দার ও লোকের বেশ ভরাটি ভাব চলেছে। পেছু থেকে একটা কৌতূহলী কোলাহলের আওয়াজ এল অস্পষ্ট স্বর নিয়ে; আমার অদ্ভুত পোষাকই বোধ হয় তার কারণ। বড় রাস্তায় এসে, একটু পথ যেতেই এক নদী পড়্‌ল—নাম "কাঁসাই" বা "কংসাবতী"। নদীটী খালের মত হ'লেও পারাপারের ব্যবস্থা নৌকাযোগেই ঘট্‌ল। পারানি লাগ্‌ল এক পয়সা।

(ক্রমশঃ)

খেলাধূলায় বাঙ্গালী

বাঙ্গালী জাতি খেলাধূলায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। মানসিক উন্নতিতে বাঙ্গালী আজ যে-স্থান অধিকার করিয়াছে, শারীরিক উন্নতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখি। শারীরিক উন্নতি না হইলে খেলাধূলায়ও উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না।

আমরা 'ভাত' বেচারার ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়া বলি, "ভেতো বাঙ্গালীর আর কত উন্নতি হবে?" সত্য বটে, আমাদের খাদ্য শারীরিক অবনতির জন্য কতক পরিমাণে দায়ী; কিন্তু, আমাদের আরাম প্রিয়তা ও চেষ্টার অভাবও এই অবস্থার জন্য ততোধিক দায়ী।

সুখের বিষয়, খাদ্য, ব্যায়াম ও খেলাধূলার প্রতি বাঙ্গালীর আজ নজর পড়িয়াছে। তাই আজ বাঙ্গালীরও খাদ্যে ও ব্যায়ামে পুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় এবং খেলাধূলায় অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশীয় জাতির সহিত বাঙ্গালী প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। "প্রয়াসী হইয়াছে" বলিলাম, কারণ অনেকস্থলে বাঙ্গালী জয়লাভের কাছাকাছি গিয়াও সফল হইতে পারে নাই। বিগত "ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা" তাহার একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রতিযোগিতার জন্য একজনও বাঙ্গালী নির্ব্বাচিত হয় নাই। গত বৎসর যে ভারতীয় খেলোয়াড়ের দল বিলাতে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও একজনও বাঙ্গালীর স্থান হয় নাই। নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতা — খেলায় তিনজন বাঙ্গালীকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দলভুক্ত করা হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক টেনিস্-প্রতিযোগিতা Davis Cup খেলায় ভারতীয় দলে বাঙ্গালীর স্থান আজও হয় নাই। একমাত্র ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী বেশ উচ্চ স্থান পাইয়াছে। সম্প্রতি এক দল বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় সিংহলে গিয়া তথাকার সম্মিলিত (ইউরোপীয় ও দেশীয়) ফুটবল দলকে পরাস্ত করিয়া উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদল বাঙ্গালী খেলোয়াড় যবদ্বীপে গিয়া তথাকার সকল দলকে পরাজিত করেন।

সারদারঞ্জন রায় (এন্ রায়)

ভাল খেলোয়াড়ের আদর সর্ব্বত্র;—এমন কি, চাকুরীর বাজারেও খেলোয়াড় হইলে সুবিধা হয়।

রেল, টেলিগ্রাফ, কাস্টম্‌স্‌, পোর্ট কমিসনার্স প্রভৃতিতে খেলোয়াড়দের চাকুরির সুবিধা ত' আছেই; এমন কি, বড় বড় আপিসেও খেলোয়াড়ের চাকুরির সুবিধা হয়। তাই, চাকুরির এই দুর্দ্দিনে আজ খেলাধূলার প্রতি বাঙ্গালীর আরও অধিক নজর পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর খেলাধূলার কথা মনে করিলেই, এ বিষয়ে যাঁহারা অগ্রগামী এবং উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহাদের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। সকলের আগে মনে পড়ে, পরলোকগত প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়ের কথা। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দেশীয় কোন অধ্যাপকের ক্রিকেট বা অন্য কিছু খেলা 'ছেলেমানুষী'—এমন-কি, হাস্যকর ব্যাপারও মনে হইত। তিনিই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া, বহু বৎসরব্যাপী চেষ্টা ও যত্নের ফলে, ক্রিকেট খেলা বাঙ্গালীর মধ্যে—বিশেষতঃ, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজে তিনি ভাল খেলোয়াড় হইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই; ছাত্রদিগের সহিত খেলায় যোগ দিয়া এবং খেলার কায়দা-কানুন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য Harrison Shield ও Lansdowne Shield নামে যে ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা হয়, তাহা ইঁহারই চেষ্টায়। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহে ক্রিকেট খেলায় রীতিমত যোগ দিয়াছেন;—এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি নিয়ম-মত খেলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কলেজ তাঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে ক্রিকেট খেলায় অন্যান্য সকল কলেজকে—এমন কি, বড় বড় ইউরোপীয় ক্রিকেট-দলকে,—পরাজিত করিয়া কলেজ-সমূহের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

তাঁহাকে "Father of Bengali Cricket" বলা হইত; বাস্তবিকই তিনি তাহাই ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়, পরলোকগত ডাক্তার ডব্লিউ, জি, গ্রেসের সহিত তাঁহার চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অনেক সাহেব "W. G. of Bengal" নাম দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, অন্যান্য কাজ যেমন মন দিয়া সাধনা করিতে হয়, খেলাও সেইরূপ মন দিয়া সাধনা করা আবশ্যক। অন্য কাজে বাধা না দিয়া বা অন্য কাজ ফেলিয়া না রাখিয়া খেলা আবশ্যক এবং খেলাকেও বাদ না দিয়া কাজ করা আবশ্যক। "Mens sana in corpore sano," অর্থাৎ—"সুস্থ শরীরে সুস্থ মন"—তাঁহার মধ্যে মূর্ত্তিমান ছিল। বাঙ্গালী যদি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খেলাধূলায় যোগ দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে বলা যায়।

খুঁটিনাটি

দাগ উঠান—

[অভাবের দিনে ব্যবহারের জিনিষের যত্নও বাড়ে। কাপড়-চোপড় বা কাজের জিনিষ দাগ প'ড়ে নষ্ট হ'লে দুর্দিনে তা'র জন্য আপ্‌শোষ হয়ও বেশী। তাই এ বিষয়ের কিছু ফিকির জানা থাক্‌লে এ সময়ে তা' সকলকে বলা দরকার। দাগ উঠাবার কয়েকটি উপায় এবার লিখ্‌ছি। বলা বাহুল্য, দাগ লাগ্‌লে যত শীগ্‌গির সম্ভব সে দাগ উঠাবার চেষ্টা কর্‌তে হয়। দেরি কর্‌লে অনেক সময় কৃতকার্য্য হ'তে পারা যায় না; —অর্থাৎ, দাগটা তখন পাকা রংএর মত স্থায়ী হয়ে যায়। দাগ উঠাবার জন্য যে-সব জিনিষের আবশ্যক, সব সময় সে-জিনিষ ঘরে থাকে না। কাপড়ে দাগ পড়্‌লে, তৎক্ষণাৎ কাপড়টির উপর জল ঢেলে ধুয়ে ফেলা দরকার। দাগ তখনই অনেকটা হাল্কা হ'য়ে যায়। তারপর সে দাগ ছুটাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।]

(১) কালীর দাগ—সুতার কাপড়ে পড়্‌লে Oxalic Acid (অক্‌জ্যালিক এসিড) জলে গুলে লাগাতে হবে। আগে Acetic Acid (এ্যাসিটিক এসিড) দিয়ে, পরে Oxalic Acid দিলে আরও ভাল হয়। রেশমী ও পশমী কাপড় থেকেও এই উপায়েই দাগ উঠান যায়।

(২) চা, কফি বা ফলের রস—সুতার কাপড়ে পড়্‌লে, তখনই সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে উঠে যায়; না হ'লে একটু সাধারণ 'ব্লিচিং পাউডার' দিয়ে ধুলেও উঠে যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলে কাজ হয়। ফলের রসের দাগ গ্লিসারিনে ভিজিয়ে সাবান দিয়ে ধুলেও ওঠে।

(৩) রবর ষ্ট্যাম্পের বেগুণী কালী—সুতার কাপড়ে পড়্‌লে কষ্টিক্ সোডার জল দিয়ে ধুলে উঠে যায়। দামী কাপড় হ'লে স্পিরিট আর এ্যামোনিয়া দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়েও স্পিরিট আর এ্যামোনিয়া দেওয়া যায়।

(৪) চিনির রস, সিরিষ ইত্যাদি—জল দিয়ে ধুলেই যায়। সিরিষের দাগ গরম জলে সহজেই উঠে যায়।

(৫) গালার দাগ—স্পিরিট দিয়ে ভিজিয়ে রাখ্‌লে উঠে যায়। বেশী বড় দাগ হ'লে ২।৪ বার স্পিরিট বদ্‌লিয়ে দিলে আস্তে আস্তে সবটা গালা স্পিরিটে গুলে যাবে।

(৬) বার্ণিশের দাগ—উপরের লেখা উপায়ে বার্ণিশের দাগও উঠাতে হয়। বার্ণিশ স্পিরিটে-গোলা গালা বৈ আর কিছু নয়।

(৭) রক্তের দাগ—জল দিয়ে ধুয়ে একটু ব্লিচিং পাউডারের জলে ধুলে একটুও দাগ থাক্‌বে না। রেশমী কাপড়ে জল আর সাবান দিলেই হবে।

(৮) আল্‌কাত্‌রার দাগ—বেঞ্জিন বা পেট্রোল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে। এ কাজটি খুব সাবধানে কর্‌তে হবে, কাছে যেন কোন আগুন না থাকে; কারণ এই দুটিই দাহ্য জিনিস, অতি সহজে জ্ব'লে ওঠে।

(৯) রং বা এনামেলের দাগ—এ্যাসেটোন, নাইট্রোবেঞ্জিন বা কার্ব্বন টেট্রাক্লোরাইড দিয়ে ধু'লে উঠে যাবে। এই জিনিষগুলি বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যেতে পারে। বেশী পুরানো হয়ে গেলে রং-এর দাগ ছুটান দায়।

(১০) কচি ঘাসের দাগ—সাবান আর স্পিরিট মিলিয়ে জল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে।

(১১) পোড়া দাগ—বেশী পুড়ে গেলে দাগ যায় না। অল্প-স্বল্প হ'লে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা ব্লিচিং পাউডারে উঠে যায়।

(১২) তেল, ঘি, মোমের দাগ—পেট্রোল বা বেঞ্জিনে ওঠে। সাদা কাপড়ে ঘি বা চর্ব্বি জাতীয় জিনিষের দাগ অনেক সময়, কাপড়ের নীচে ব্লটিং কাগজ রেখে ইস্তিরি কর্‌লে উঠে যায়। ইস্তিরির টানে আর গরমে ঘি বা চর্ব্বি গ'লে যায় আর ব্লটিং কাগজে সেটা শুষে নেয়।

(১৩) ঘামের দাগ—দাগের উপর গ্লিসারিন লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে, গরম জলে সাবান গুলে ধুলেই উঠে যায়।

(১৪) ছ্যাৎলা-ধরা দাগ—সুতার কাপড়ে ছ্যাৎলা-ধরা দাগ পড়্‌লে কাপড়টিকে মেলে ধ'রে লুণের গুঁড়ো দাগের উপর ছিটাতে হবে। তারপর, লেবু দিয়ে ঘষ্‌তে হবে। কিছুক্ষণ বাদে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। আবশ্যক হ'লে ২।৩ বার এরকম কর্‌তে হবে।

বৈশাখ-দুপুর *

শ্রীলতিকা দে

আকাশ চিরে ঝর্‌ছে আগুন,
ঝিমিয়ে আসে বনের আঁখি।
শূন্য-ফসল মাঠের বুকে
ঘুর্‌ছে তৃষা-কাতর পাখী।
দূর বনের ঐ শ্যামল পাতা
রৌদ্রে রূপার চুম্‌কি-পরা,
দম্‌কা হাওয়ায় আস্‌ছে ধেয়ে
অগ্নি-ধারা দহনভরা।
আকাশ-গায়ের টুক্‌রা মেঘে
পথিক-চোখে লাগায় ধাঁধা;
ঝোপের মাঝে কোন্ গোপনে
ঘুঘুর প্রিয়ার কাতর কাঁদা।
কুঁড়ের পাশে অশথ্-ছায়ে
ছাগল-শিশু ঘুমায় সুখে;
রাখাল-শিশু বড়ই খুসী
কচি আমের গন্ধ শুঁকে।
রৌদ্র-নেশায় মাতাল ব'শেখ
রক্ত-আঁখির দৃষ্টি হানে;
তপ্ত দুপুর নিঝুম নীরব,
মুষড়ে আছে অগ্নিবাণে।

* লেখিকার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

পখরণা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার সদর (বাঁকুড়া) হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে "শুশুনিয়া" পাহাড়। সমুদ্রতীর হইতে এই পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত ফুট। এই পাহাড়ে বিভিন্ন অক্ষরের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত যে লিপিটীর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা এই—

(১) চক্রস্বামিনো দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

(২) পুষ্করণাধিপতিমহারাজশ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

(৩) মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ

পাহাড়ের উত্তরাংশে ভূমি হইতে কিয়দ্দূর উচ্চে পাহাড়ের গায়ে বহু অরযুক্ত একটী চক্র খোদিত আছে; (ঘূর্ণায়মান) চক্রের কেন্দ্রস্থলে (গতিবেগে উদ্ভূত) জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। প্রথম পংক্তি লিপি-চক্রের দক্ষিণ-ভাগে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি চক্রের নীচে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপির 'পুষ্করণা' এবং তাহার অধিপতি 'মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা'কে লইয়া ঐতিহাসিকগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। সেই গবেষণা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাধারণের নিকট এই লিপির কথা প্রকাশ করেন। বোধহয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক-সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীতে তাঁহার লেখা এই বিষয়ক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয়, ১৩০৩ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় "মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা" শীর্ষক তাঁহার লেখা বাঙ্গলা প্রবন্ধও দেখিয়াছি। বসু মহাশয়ের মতে "শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা এবং দিল্লী লৌহস্তম্ভের চন্দ্র ও এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিলিখিত চন্দ্রবর্ম্মা একই ব্যক্তি।"

অতঃপর ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া রাখালদাস ১৩২০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রে "শুশুনিয়ার পর্ব্বত-লিপি" নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "মালবের অন্তর্গত দশপুর—বর্ত্তমান মান্দাসোরে প্রাপ্ত লিপির সিংহবর্ম্মা, শুশুনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ম্মার পিতা সিংহ বর্ম্মা হইতে অভিন্ন। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মাই দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্র, এলাহাবাদে সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি মধ্যে এই চন্দ্রবর্ম্মার নামই উৎকীর্ণ আছে।" মান্দাসোর লিপির সিংহবর্ম্মার পিতার নাম জয়বর্ম্মা, পুত্রের নাম নরবর্ম্মা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া গত খ্রীষ্টীয় ১৯১৯ সালের "ইণ্ডিয়ান্ এ্যাণ্টিকোয়ারী"তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কোন উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। শাস্ত্রী

গণেশমূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তির অংশ

মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যস্থিত "পোখরণ" নগরই শুশুনিয়া-লিপির পুষ্করণা।

আমাদের ধারণা অন্যরূপ। শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ম্মার সঙ্গে দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্রের অথবা সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি-লিখিত চন্দ্রবর্ম্মার কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে বাঁকুড়া জেলার "পখরণা"ই শুশুনিয়া-লিপির "পুষ্করণা"। বসু মহাশয় "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির" সভাপতি ছিলেন। "বীরভূম-বিবরণ" সঙ্কলনকালে শুশুনিয়া-লিপির আলোচনা প্রসঙ্গে বসু মহাশয়কে আমাদের মতের কথা জানাইয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই "পখরণা—পলাশডাঙ্গা"র (দুটী পাশাপাশি গ্রামের) নাম শুনিয়া আসিতেছি। স্বর্গগত শাস্ত্রী মহাশয়কে সে কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট পখরণা পরিদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অতঃপর স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে শুশুনিয়া-লিপি লইয়া আমাদের আলোচনা হয়। ফলে শুশুনিয়া দেখিয়া আসিয়া তিনি গত ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা "ভারতবর্ষে" "শুশুনিয়া শৈলে" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি, শাস্ত্রী মহাশয় ও রাখালদাসের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পখরণা না দেখিয়া সাহস করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। পখরণায় যাওয়া ঘটে নাই বলিয়া আমরাও এতাবৎ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই, আমাদের সম্পাদিত গীতগোবিন্দে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ পখরণার কথা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। সম্প্রতি চণ্ডীদাস-পদাবলীর সম্পাদন ব্যপদেশে পুঁথির সন্ধানে বাঁকুড়া ভ্রমণকালে প্রথিতযশা অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি পখরণা দেখিয়া আসিয়াছি। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের সৌজন্যে শুশুনিয়া দেখিবার সৌভাগ্যও ঘটিয়াছে। সুতরাং আমরা এইবার আমাদের মতের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। সুনীতিবাবু ইতিমধ্যেই তাঁহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য "বঙ্গশ্রী" ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বলিবার কথা মোটামুটি এইরূপ—

সিংহমূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তির ভগ্নাংশ

(১) আমরা শুশুনিয়ার সিংহবর্ম্মা ও মান্দাসোরের সিংহবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। শুশুনিয়ার সিংহবর্ম্মা পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন। মান্দাসোর-লিপির সিংহ-বর্ম্মার পুত্র নরবর্ম্মা আপনাদিগকে—

"(সিদ্ধম্) সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায় মিতাত্মনে
চতুস্সমুদ্র-পর্য্যঙ্ক-তোয়-পিড়ালবোপমঃ
শ্রীর্ম্মালবগণাম্নাতে প্রশস্তে কৃতসংস্থিতে॥"

"মালবগণাম্নাতে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোধপুরের পোখরণ নগর যে ইঁহাদের রাজধানী ছিল, মান্দাসোর-লিপিতে তাহার কোন প্রমাণই নাই। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই লিপিতে চন্দ্রবর্ম্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং কে বলিবে যে, মালবের সিংহবর্ম্মার চন্দ্রবর্ম্মা নামধেয় অপর এক পুত্র ছিল? এই লিপির অষ্টম শ্লোকে—

"বাসুদেবং জগদ্ধামমপ্রমেয়মজং বিভুম্
মিত্রভৃত্যার্ত্ত সৎকর্ত্তা স্বকুলস্যাথ চন্দ্রমাঃ
যস্য বিত্তং চ প্রাণাশ্চ দেব ব্রাহ্মণে সাগতা॥"

এই যে চন্দ্রমার উল্লেখ, ইহা হইতে যদি কেহ চন্দ্রবর্ম্মাকে উদ্ধার করিতে চাহেন, আমাদের বলিবার কোন কথা

নাই। মালবের সিংহবর্ম্মার পুত্র নরবর্ম্মা ৪৬১ বিক্রমাব্দে, ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে, বোধ হয় দশপুরের (মান্দাসোরের) রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মার পিতা সিংহবর্ম্মা বৈষ্ণব (?) এবং মালবের সিংহবর্ম্মাও বৈষ্ণব ছিলেন, অতএব ইঁহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মাত্র নাম-সাদৃশ্য ও ধর্ম্ম-সাদৃশ্য দেখিয়াই ঐতিহাসিক ঐক্য স্থিরীকৃত হইবে না। ভারতে বৈষ্ণব-

পথরণার মহিষ-মর্দ্দিনী

ধর্ম্মের আন্দোলন খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দ হইতেই বেশ প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল। মালবের রাজা ভাগভদ্রের নিকট আগত যবনরাজদূত হেলিওদোরসের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা ও গরুড়ধ্বজ-প্রতিষ্ঠা (বেসনগর-লিপি) নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডির লিপি, শক সম্রাটগণের বাসুদেব নাম গ্রহণ ও বহু কীর্ত্তি পরিচয় প্রভৃতি নানাবিধ আবিষ্কারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাট্গণের সময়ে রাজধর্ম্মরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অতএব নামসাদৃশ্য বা ধর্ম্ম-সাদৃশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা চলিবে না।

(২) আমরা দিল্লী-লৌহস্তম্ভের চন্দ্র এবং শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না।

লৌহস্তম্ভের লিপি এইরূপ—

"যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেস্বাহববর্ত্তিনোভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকাঃ
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণা
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্মজিতাবনীং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্
নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিত রিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরং চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌ মতিম্
প্রাংশু বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ"

এই লিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়, চন্দ্রের মৃত্যুর পর অপর কাহারো দ্বারা এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই ব্যক্তি যে কে আজিও তাহা জানা যায় নাই। এই চন্দ্রের উপনাম "ধাব" ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। এই চন্দ্র বঙ্গ জয় পূর্ব্বক সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লিকগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র বিষ্ণুপাদগিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্র নিজেকে পুষ্করণাধিপতি এবং মহারাজ নামে পরিচিত করিয়াছেন। যিনি বঙ্গ হইতে বাহ্লিক পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন, তিনি কোনও দেশের নামে পরিচয় না দিয়া মাত্র রাজধানীর নামে, মহারাজাধিরাজ, পরম ভট্টারক ইত্যাদি না লিখিয়া মাত্র "মহারাজ"—এই পদবীতে কেন নিজের পরিচয় দিবেন, কেহ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। বিষ্ণুপাদগিরি বলিতে গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির যেখানে অবস্থিত সেই স্থানকেই বুঝায়। শুশুনিয়া কখনো বিষ্ণুপাদগিরি নামে পরিচিত ছিল না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, লৌহস্তম্ভটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত

আছে, ঐ স্থানই বিষ্ণুপাদগিরি নামে পরিচিত, স্তম্ভটি চন্দ্রেরই প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে শুশুনিয়ার চন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর কে দিল্লীতে এই লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহারও ত' একটি পরিচয় চাই। কিন্তু সে কথাও কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের মতে লৌহস্তম্ভের চন্দ্র গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্তের আদেশে পিতার স্মৃতি-স্তম্ভে এই স্মারক-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে দ্বিতীয়বার বঙ্গ-জয়ের উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, সমুদ্রগুপ্ত পিতামাতার স্মরণার্থ মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সুতরাং পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ দিল্লীর লৌহস্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করানোর অনুমানও বোধ হয় চলিতে পারে। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা বৈষ্ণব (?) এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্রও বৈষ্ণব (?)। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে ইতিহাসের কিছু যায় আসে না।

(৩) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির চন্দ্রবর্ম্মা এবং শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ম্মা যে একই ব্যক্তি, জোর করিয়া তাহা বলা চলে না।

সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের যে কয়জন রাজাকে পরাজিত করেন—তাঁহাদের মধ্যে রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী ও বলবর্ম্মার নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গগত শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির মতে প্রশস্তিলিখিত উক্ত চন্দ্রবর্ম্মা ও শুশুনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ম্মা অভিন্ন। কিন্তু ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত রাঢ়ের বনময় প্রদেশস্থিত পুষ্করণার মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা কি আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্য-তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য? আর্য্যাবর্ত্ত বলিতে সাধারণতঃ উত্তর-ভারতই বুঝায়। অতি পূর্ব্বকালে রাঢ়দেশ সুহ্ম দেশ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহার উত্তরাংশ কঙ্কভুক্তি ও দক্ষিণাংশ বর্দ্ধমান-ভুক্তিরূপে আখ্যাত হইত। একদিকে রুদ্রদেব, মতিল ও নাগদত্ত এবং অন্যদিকে গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী ও বলবর্ম্মার রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণীত হইলে প্রশস্তির চন্দ্রবর্ম্মার অধিষ্ঠান-ভূমির সন্ধান মিলিতে পারে। আর্য্যাবর্ত্ত বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশের রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন। এই আটবিক ভূমির মধ্যে রাঢ়ের সংস্থিতি ধরিয়া লওয়া চলে। দাক্ষিণাত্য-অভিযানের পথে সমুদ্রগুপ্ত যে দুইজন আটবিক ভূমিপতিকে জয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন দক্ষিণ-কোশল-পতি

জিন-মূর্ত্তি-চতুষ্টয়-যুক্ত স্তম্ভাকার শিলা
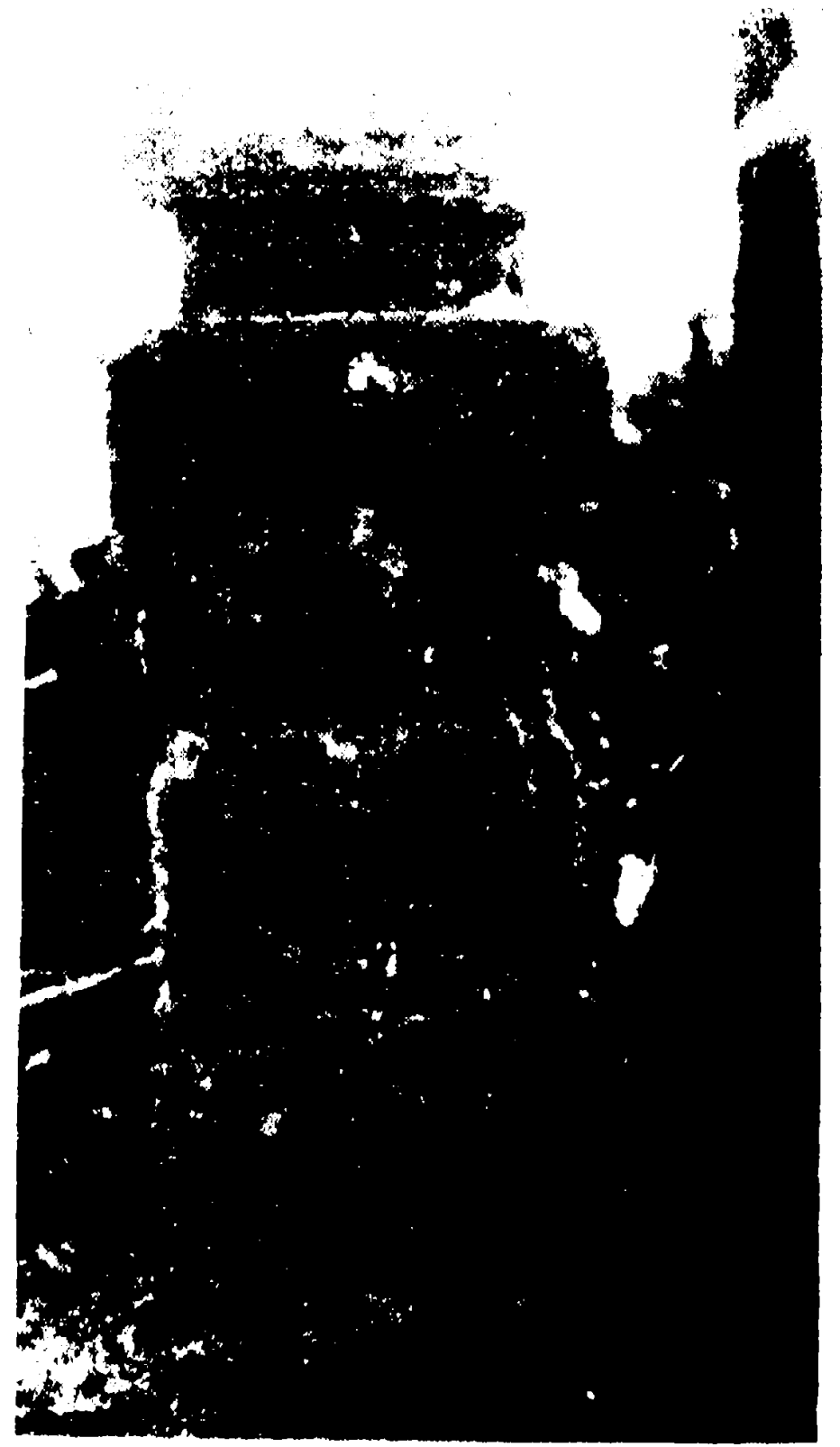
মহেন্দ্র, অন্যজন মহাকান্তারপতি ব্যাঘ্ররাজ। মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যেই ইঁহাদের রাজ্য ছিল। এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে সীমান্ত নরপতিরূপে সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), ডবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্ত্তৃপুরের রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, বঙ্গ-কলিঙ্গাদির সঙ্গে রাঢ় দেশও গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে গুপ্তরাজাদের মুদ্রা ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়

ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। সে সময় রাঢ়দেশে এমন কোন প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন না, যিনি গুপ্তসম্রাটগণের কবল হইতে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি পখরণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মাই যে সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির

পখরণায় প্রাপ্ত কুষাণ (বা প্রাক্‌কুষাণ) যুগের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি
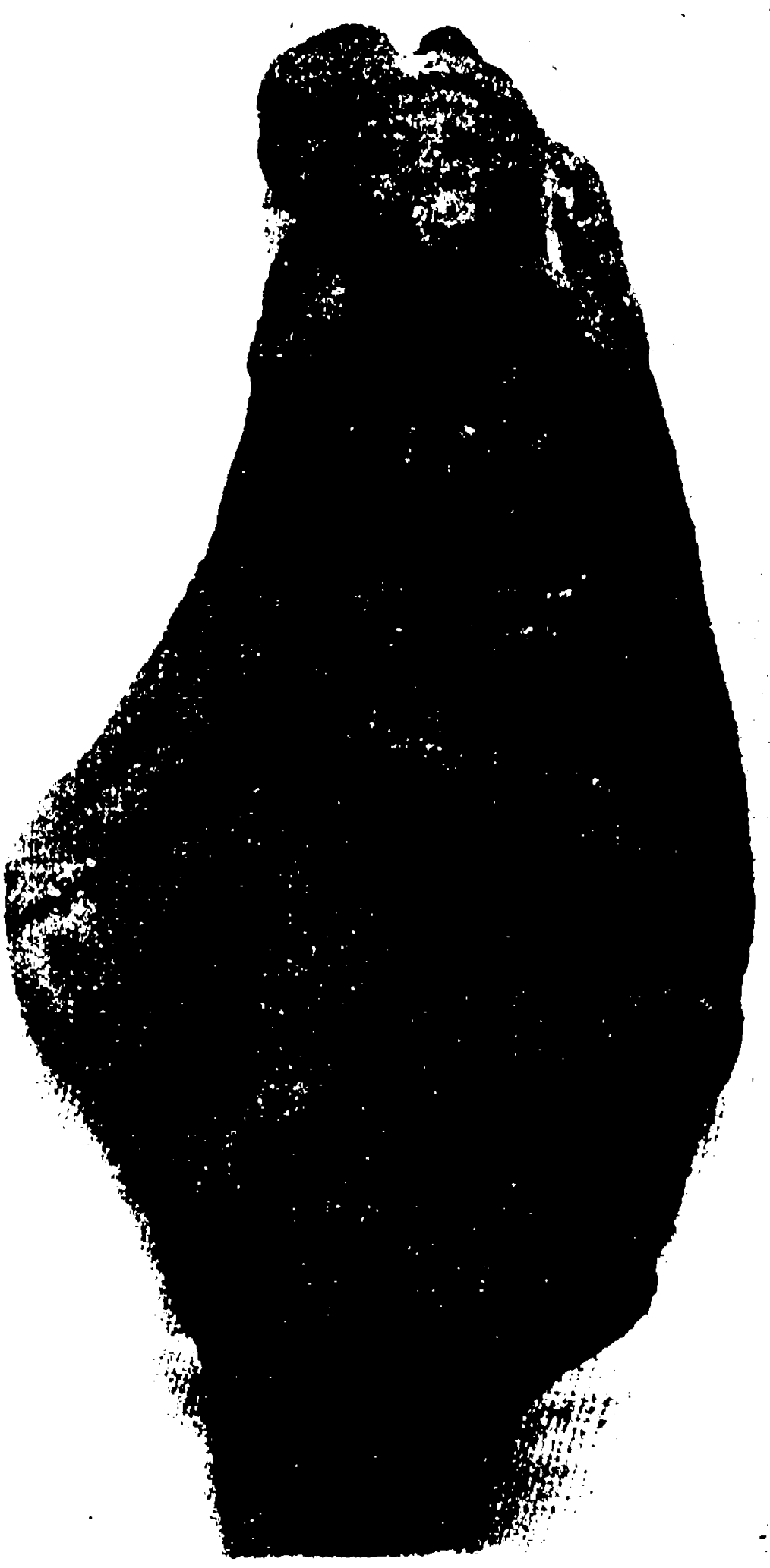
চন্দ্রবর্ম্মা, একথা বলিবার মত ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুও আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৪) আমাদের মতে শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ম্মা বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান পখরণারই অধিপতি ছিলেন।

চন্দ্রবর্ম্মার সময় সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, এলাহাবাদ-প্রশস্তির অক্ষর, দিল্লী-লৌহস্তম্ভলিপির অক্ষর এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপির অক্ষর প্রায় একই প্রকার। অতএব শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা গুপ্তরাজাদের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই অনুমান সমর্থনযোগ্য। তবে শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা যে সমুদ্রগুপ্তের সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। গুপ্ত-সম্রাটগণের "উপরিক"গণ মহারাজ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। আমাদের মনে হয়, গুপ্তসম্রাটগণ এই দেশ জয় করিয়া দেশের শাসন সৌকর্য্যার্থ যে-সমস্ত "উপরিক" পদবীযুক্ত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চন্দ্রবর্ম্মা তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি কোন্ সম্রাটের অধীনে "উপরিক" নিযুক্ত হইয়াছিলেন, জানা যায় না। তবে গুপ্ত আমলের অক্ষর দেখিয়া অনুমিত হয়, দেশ যখন সুশাসিত হইয়াছিল, মগধের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্ম এদেশে যখন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, চন্দ্রবর্ম্মা সেই কালের লোক। ৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (গোপ্তাব্দ ১২৪) রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গার উত্তর তীরে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের অধীনে যে "উপরিক" ছিলেন, তাঁহার নাম চিরাতদত্ত। এই চিরাতদত্ত বর্ত্তমান বরেন্দ্রের উত্তরাংশে কোটীবর্ষ-বিষয়ে কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়, এদেশে সে সময় বর্ম্মা উপাধিধারী শাসনকর্ত্তার অপ্রতুলতা ছিল না। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে পারি চন্দ্রবর্ম্মা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রায় ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে পখরণা গ্রাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে রাজবাঁধ ষ্টেশনের দক্ষিণে দামোদরের দক্ষিণ তীরে পাশাপাশি দুইটী গ্রাম,—অধুনা "পখরণা-পলাশডাঙ্গা" নামে পরিচিত। পখরণা সমৃদ্ধ পল্লী। পলাশডাঙ্গায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ডাকঘর আছে।

পখরণা গ্রামের প্রান্তস্থিত একটী উচ্চ ভূমিখণ্ড

আজিও "গড়ের-ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। ডাঙ্গার উপরে কয়েক ঘর বাউরীর বাস, ইহাদিগকে লোকে গড়ের বাউরী বলে। ডাঙ্গার একদিকে এখন কতকগুলি ঘর মুসলমান বাস করে, তাহারই কাছাকাছি খানিকটা স্থান রাজবাড়ী নামে পরিচিত। বিশাল পরিখা মজিয়া গিয়াছে, তাহারই কিয়দংশে মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া লোকে পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। তথাপি সেগুলি দেখিয়া পরিখার লুপ্তাবশেষ বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। পথরণায় প্রবাদ আছে, এখানে বহু পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পরিখার কিয়দংশের (বর্ত্তমানে পুষ্করিণী) পঙ্কোদ্ধার কালে চৌবাচ্চার আকারে সাজানো কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তরগুলি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। সেগুলি কোন মন্দির বা গৃহের অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পথরণায় প্রাপ্ত গুপ্ত-যুগের সিংহ-বাহিনী দেবী মূর্ত্তি

গ্রামের যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মরাজতলায়, মনসাতলায় এবং অপর দুই একটা গ্রাম-দেবতার বেদীর উপর আমরা কয়েকটা মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। তন্মধ্যে একটী গণেশ-মূর্ত্তি, একটী সূর্য্য-মূর্ত্তির ভগ্নাংশ, একটী বাসুদেব-মূর্ত্তির পাদপীঠ ও ভগ্ন হস্ত ইত্যাদি, একটী জৈন তীর্থঙ্কর বা বুদ্ধমূর্ত্তি, নাগফণাতলে উপবিষ্টা কোন দেবীর ভগ্নমূর্ত্তি, একটী সিংহমূর্ত্তি ও একটী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অনেকটা চৈত্যের আকারে গঠিত একটী প্রস্তরস্তম্ভের চারিপার্শ্বে চারিটী ধ্যাননিরত উপবিষ্ট মূর্ত্তি—প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে দুইপার্শ্বে দুইটী করিয়া সিংহ— ইহা জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি, অথবা বুদ্ধমূর্ত্তিও হইতে পারে। মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন, তবে কত প্রাচীন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটী পাল-রাজত্বের শেষের দিকের অথবা সেন-রাজত্বের প্রথম আমলের বলিয়া মনে হয়। অপরাপর ভগ্নমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কাল-নির্ণয় হয় কিনা সন্দেহ।

পথরণা হইতে তিনটী মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, (১) একটী পোড়ামাটীর নারীমূর্ত্তি; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটী কুষাণ-যুগের, এমন কি তৎপূর্ব্ব কালেরও হইতে পারে। (২) একটী সিংহবাহিনীর ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি, নারী সিংহের উপর উপবিষ্টা, বামক্রোড়ে একটী শিশু। বাম পার্শ্বে আরো দুইটী মূর্ত্তি। সুনীতিবাবু বলেন, এটী গুপ্ত যুগের। শুনিলাম, ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং বিদুষী ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ প্রভৃতিও নাকি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। (৩) একটী বাগীশ্বরী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা। দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে সুধাপূর্ণ কলস, কিংবা একটী কমল, বাম উর্দ্ধ-হস্তে পুস্তক, এবং অপর দুই হস্তে বীণা। এই মূর্ত্তিটী কোন্ যুগের, সুনীতিবাবু অথবা অপরে এখনও ঠিকমত ধরিতে পারিতেছেন না, তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ক্ষুদ্র মূর্ত্তির ভগ্নাংশ দেখিয়া যুগ নির্ণয় বিশেষজ্ঞগণেরই সাধ্যায়ত্ত। তথাপি এ কথা বলা চলে যে, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের কোন বিশিষ্ট রীতির অনুকরণ বহু দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এমনকি একস্থানে কোন শৈলী যখন ধ্বংসমুখে আসিয়া পৌছিয়াছে, অন্যস্থানে তখন সেই শৈলীরই হয়ত প্রথম অনুসরণ সুরু হইতেছে, এরূপও ঘটিয়া থাকে। রাজ্য চলিয়া গেল, সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস হইয়া গেল, বিপর্য্যস্ত দরিদ্র অধিবাসিগণ ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া পুরাতন রীতি-নীতি

াঁকড়াইয়া বাস্তর মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। েগর পর যুগ বহিয়া গেল, তাহাদের অবস্থা ফিরিল না, াহারা নূতনকে গ্রহণ করিতে পারিল না, ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার পরবর্ত্তী কেহ াসিয়া পুরাতনের আদর করিয়াছে, হুবহু পুরাতনেরই

পথরণায় প্রাপ্ত সরস্বতী-মূর্ত্তি

নরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে। সুতরাং প ভগ্নাংশ দেখিয়া কোন বিশেষ যুগ নির্ণয় কত- ি নিরাপদ বলিতে পারি না। বড় জোর এই বলা চলে যে, এই মূর্ত্তি এই যুগের ভাস্কর্য্যের িতে গঠিত।

পথরণায় যে মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, এবং যে মূর্ত্তি তিনটী সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি কতদিন পূর্ব্বে কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অথবা কেহ অন্য কোন স্থান হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, স্থানীয় লোকে তাহার কোন সংবাদ বলিতে পারেন না। সংগৃহীত মূর্ত্তি তিনটী মাটীর উপরেই গ্রাম-দেবতার বেদীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পোড়ামাটীর নারীমূর্ত্তি ও চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী বাগ্‌দী-পাড়ার মনসাতলায় এবং সিংহবাহিনী মূর্ত্তি যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মরাজতলায় ছিল। এই দুই স্থানেই আরো ভগ্নমূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হয়, এগুলি পথরণা বা আশ-পাশের গ্রাম হইতেই সংগৃহীত। নানা কারণে অনুমান করিতে হয় যে, চন্দ্রবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে পাল এবং সেন রাজাদের সময়েও পথরণা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। শুশুনিয়া পাহাড়ে অপর যে কয়েকটী ক্ষুদ্র লিপি আছে, সেগুলির পাঠোদ্ধার হইলে অনেক রহস্যের সন্ধান মিলিতে পারে। এদিকে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পথরণার দক্ষিণে "চাঁদাই" গ্রাম। "সিঙ্গাই" নামে একটী জলনালী (জোড়) ও "চকাই" গ্রামের নামানুসারে সুনীতিবাবু "চন্দ্রাবতী", "সিংহাবতী," এবং "চক্রাবতীর" সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছেন—চন্দ্রবর্ম্মা, সিংহবর্ম্মা এবং চক্রস্বামীর স্মৃতি উহারাই রক্ষা করিতেছে, এইরূপই তাঁহার অনুমান। পথরণার আধ ক্রোশের মধ্যেই চন্দ্রাবতী ও সিংহাবতীর স্থিতি। সিঙ্গাই আবার গ্রামও নয়, গ্রামের জল-নিকাশের বড় নালা। রাজধানীর মধ্যেই তাহা হইলে সিংহাবতী ও চন্দ্রাবতী দুইটী পাড়া ছিল, স্বীকার করিতে হয়। চক্রাবতীতে চক্রস্বামীর মন্দির থাকিলে শুশুনিয়ায় তাহার জন্য শিলা-লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন হইয়াছিল, ভাবিবার বিষয়। গ্রাম উৎসর্গের প্রাচীন রীতি ত' এরূপ ছিল না। লিপিতে কোন বিষয়পতি, বা পুস্তপাল, বা শ্রেষ্ঠী, বা কুলিক বা কায়স্থ প্রভৃতি কুটুম্বীগণকে কোন সম্বোধন নাই। সুতরাং এই সমস্ত অনুমানের সমর্থনযোগ্য আরো প্রমাণ চাই।

(৫) আমাদের মতে চক্রস্বামী বিষ্ণুর নাম

নহে, এবং লিপিতে কোন গ্রাম উৎসর্গের কথা নাই।

প্রত্নানুসন্ধান বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহাশয় "চক্র-স্বামিনে ধোসগ্রামোতি সৃষ্টঃ"—লিপির একাংশের এইরূপ পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন। "ধোস"গ্রাম শুশুনিয়ার নিকটে পাওয়া যায় নাই। চকাই, সিঙ্গাই, চাঁদাই বাঁচিয়া থাকিলে তাহারও থাকা উচিত ছিল। আমাদের মনে হয় শুশুনিয়ার যে অংশে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে একটি গুহা ছিল, এবং সেই গুহা বা উক্ত স্থানটী চক্রস্বামী নামক কোন সাধুকে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। এই সাধু হয়ত চন্দ্রবর্ম্মার গুরু বা গুরুস্থানীয় ছিলেন। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে অথবা কোন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতে বিষ্ণুর "চক্রস্বামী" নাম পাওয়া যায় না।

দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে "কোকামুখ স্বামী" ও "শ্বেতবরাহ স্বামী" দেবতাদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। এই লিপির কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের শেষ ভাগ। এই দুই দেবতার মন্দির পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির কোটীবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত "হিমবচ্ছিখর" নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ ভানুগুপ্তের রাজ্যকালে (খ্রীষ্টীয় ৫৩৩-৩৪ অব্দে) শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির পুনঃসংস্কৃত হয়। শ্বেতবরাহ নাম পুরাণে পাওয়া যায়। "কোকামুখ" শব্দের অর্থ কি? কামশাস্ত্রের অপর নাম কোকশাস্ত্র। কোকামুখ কামদেব, কি বিষ্ণু, কি অপর কেহ—পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। এই দুইটি নাম দেখিয়া চক্রস্বামী যে বিষ্ণুর অপর নাম হইতে পারে না, জোর করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না। তবে সেকালে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বামীযুক্ত নাম অনেক পাইতেছি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর নাম ছিল শিখরস্বামী। প্রথম কুমারগুপ্ত বরাহস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রলিপিতে গোপালস্বামী, বাসুদেব-স্বামী ও সোমস্বামী নাম পাওয়া যায়। গোপালস্বামী শাসনকর্ত্তা, বাসুদেবস্বামী ভূমিদাতা, এবং সোমস্বামী ব্রাহ্মণের পরিচয় পাই। গোপচন্দ্রের তাম্রলিপিতে শাসনকর্ত্তা বৎসপালস্বামী ব্রাহ্মণ ভট্টগোমীদত্ত স্বামীকে ভূমি দান করিয়াছেন। সমাচারদেবের তাম্রশাসনে সুপ্রতীকস্বামীর নাম পাওয়া যায়। চক্রস্বামী এইরূপ কোন ব্যক্তির নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। উৎকীর্ণ চক্রটীকে দেখিয়া বিষ্ণুচক্র বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অনুমান, চন্দ্রবর্ম্মা অথবা চক্রস্বামী অথবা দুইজনেই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; চক্রটী তাহারই প্রতীকস্বরূপ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা "রাজমুদ্রার" মত ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়।

বীরভূমের সীমান্তে মুর্শিদাবাদ জেলায় "গোকর্ণ" নামে একটী স্থান আছে। লোকে এখনো বলে, "গোকর্ণে কে কার কড়ি ধারে।" এইরূপ পখরণার নামও "পোকর্ণ" ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। পোকর্ণ সংস্কৃত রূপ ধরিয়া পুষ্করণা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে "বেঙ্গীনগর", "এরণ্ডপল্ল," "কুস্থলপুর" প্রভৃতি নাম দেখিয়া মনে হয়, সেকালেও রাজধানীর নামে (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র?) রাজাদের পরিচয় দেওয়া রীতি ছিল। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মা আপনাকে "পুষ্করণাধিপতি" নামে পরিচিত করিয়া কাল ও দেশের রীতি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে রচিত সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এইরূপ নগরপুরের নামে পরিচিত সামন্তরাজগণের সাক্ষাৎ পাই। পখরণার সীমানা খুব বড় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শুশুনিয়া শৈলের সম্মুখভাগে, বাঁকুড়া হইতে আসিবার পথের ডাহিনে একটী ঝরণা আছে। প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই ঝরণার পাশে একটী মেলা বসে। এই স্থানের একটী মূর্ত্তিকে লোকে নরসিংহ মূর্ত্তি বলে। একখণ্ড প্রস্তরের উপরে একটী সিংহের প্রতিমূর্ত্তি। নীচে অশ্বারূঢ় কোন সৈনিক বা সেনাপতির

সম্মুখে একজন লোক পথ দেখাইয়া চলিতেছে, পশ্চাতে একজন ছত্রধারী, অশ্বারূঢ় মূর্ত্তির মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। সুনীতিবাবু বলেন, এই ধরণের মূর্ত্তির নাম "বীরকল্"। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রচুর আছে। যুদ্ধে কোন সৈনিক বা সেনানী নিহত হইলে এদেশে সেকালে এই ধরণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইত। ছাতনায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এইরূপ মূর্ত্তি কয়েকটাই দেখিয়া আসিয়াছি। এই মূর্ত্তিগুলি কি দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র-চোলের রাঢ়-অভিযানের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে?

বাঙ্গালার ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। অথচ ইতিহাস না হইলে চলিবে না। নিজেকে চিনিতে এবং জানিতে হইলে ইতিহাস চাই-ই। অন্যথায় জাতি-গঠনের কাজে, লক্ষ্য-নিরূপণে ও পথ-নির্দ্দেশে পদে পদে ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটিবে, বাধা আসিয়া জুটিবে। বাঙ্গালার ইতিহাসে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান উল্লেখযোগ্য। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায় আজিও যে-সমস্ত উপকরণ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, সেগুলি দেখিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রায় অর্দ্ধাংশের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। আমরা এদিকে বাঙ্গালার তরুণ-দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"আপনি খাইব, সুখ হইবে আর একজনের; আপনি পরিব, তুষ্ট হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর এক-জনের ভাবী হিতসাধন হইবে; এই ভাবটি বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ-সংস্কারের কার্য্য। বিবাহ দ্বারা স্বার্থবুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এইজন্যই বিবাহ অতি প্রধান 'সংস্কার'।"

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারবাহী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভবভূতি যে সত্য-সত্যই বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, সে কথা বুঝিতে কাহারও বিশেষ দেরী হইল না। কিন্তু সর্ব্বনাশ, এত বড় একটা বিরাট সংসারের একমাত্র কর্ণধার ঐ ভবভূতি,—অতগুলি লোকের মুখে তাহাকেই দু'বেলা অন্ন জোগাইতে হয়, অথচ সে-ই কিনা আজ উন্মাদ হইয়া গেল। এমনি বিধাতার বিধান।

কিন্তু উন্মাদ সে হইল কেন? সুস্থ, প্রিয়দর্শন যুবক, এই সেদিনও তাহাকে হাসিয়া কথা বলিতে দেখিয়াছি, বিপদের সময় তাহারই পরামর্শ চাহিয়াছি, কিছুদিন আগেও যাহাকে আমাদের গ্রামের গৌরব বলিয়া মনে হইত, আজ আর তাহার কাছে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই, বন্ধু বলিয়া আগের মত তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে সে আর চিনিতেই পারে না। কে-ই বা তাহার বন্ধু, আর কে-ই বা আত্মীয়, কে-ই বা স্ত্রী, আর কে-ই বা কন্যা! এই দু'দিন আগে যাহারা ছিল তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এখন আর যেন তাহাদের সঙ্গে ভবভূতির কোনও সম্বন্ধই নাই, সে যেন তাহার বাস করিবার মত একটা পৃথক্ জগৎ মনে-মনে তৈরি করিয়া লইয়াছে; সেখানে কে যে তাহার সাথী আর কে যে প্রিয়—কে জানে। তবু মনে হয় দিবারাত্রি তাহাদেরই সঙ্গে সে যেন বিড়্ বিড়্ করিয়া কথা বলিতেছে। ডাকিলে সাড়া দেয় না, না ডাকিলেও চীৎকার করে।

ভবভূতিকে দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে।

ডাক্তারকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কেন এমন হ'ল বলুন দেখি?'

ডাক্তার তাহাদের বংশের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, 'ওদের বংশে কেউ কোনদিন পাগল ছিল কি?'

ছিল না আমি জানি। বলিলাম, 'না।'

তাহার পর ভবভূতিকে তিনি একদিন নিজে দেখিয়া গেলেন।

ডাক্তারকে সে বেশ ভালই চিনিত, কিন্তু সেদিন আর তাঁহাকে সে চিনিতে পারিল না। ডাক্তার তাহার কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ভবভূতি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বেরোও ষ্টুপিড্, পাজি কাঁহাকা! টাকা! টাকা! আমি বুঝি টাকার গাছ? টাকা যদি আমার কাছে না থাকে ত' তোর বাবার কি রে—!'

এই বলিয়া সে আপন মনেই বিড়্ বিড়্ করিয়া কি যেন বলিতে বলিতে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলছ, ভবভূতি?'

ভবভূতি প্রথমে সাড়া দিল না। তাহার পর অনেক ডাকাডাকির পর সে মুখ তুলিয়া চাহিল। চাহিয়াই হাত নাড়িয়া সুর করিয়া গান ধরিল—

'দিন ফুরালো আজিকে আমার ব্যাকুল বাদল-সাঁঝে।'

এবং তাহার পরের লাইন হইল—

'অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে নারিনু ঘরে।'

এমনি সব ভবভূতির অনেক কাণ্ডকারখানা ডাক্তারবাবু স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিয়া আমায় আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যদি দয়া ক'রে একটি কাজ করতে পারেন ত' ভাল হয়।'

বলিলাম, 'কি কাজ বলুন।'

ডাক্তারবাবু তাহার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, 'আগাগোড়া একটি কাগজে যদি আমায় লিখে দিতে পারেন ত' কেসটা একবার ষ্টাডি করতে পারি।'

বলিলাম, 'ওকে সারিয়ে দিন, ডাক্তারবাবু, নইলে ওর সংসারে এই এতগুলি মানুষ—'

কথাটা ডাক্তারবাবু আমাকে আর শেষ করিতে দিলেন না, বলিলেন, 'বুঝেছি।'

ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ভবভূতির জীবনী আমি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কোনও কাজে লাগিল না। লেখাটা ডাক্তারবাবু পড়িয়া আমার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'রাবিশ, এসব সাহিত্য করতে তোমায় কে বলেছিল, হে ছোকরা? আমি যা চেয়েছিলাম, এ তা' নয়।'

কি যে তিনি চাহিয়াছিলেন, বুঝিলাম না। আবার যে নূতন করিয়া লিখিব তাহারও অবসর আর নাই। ভবভূতির পাগ্‌লামি আরও বাড়িয়াছে। সংসার ত' একরকম অচল বলিলেই হয়।

ভবভূতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে তুলিয়া দিলাম। উহা ত' কাহারও কোন কাজে লাগে নাই, সুতরাং সাহিত্যের কাজে লাগিতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ভবভূতিকে বাল্যকালে আমরা ভূতি বলিয়াই ডাকিতাম। এখন তাহার বয়স প্রায় পঁইত্রিশ, কিন্তু নাম তাহার সেই ভূতিই রহিয়া গিয়াছে।

ভূতির জীবনের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানা উপন্যাস হইয়া পড়িবে, কাজেই সে-চেষ্টা আমি করিব না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার জীবনের কথা বলিতে চাই।

ভূতির বয়স যখন পনেরো-ষোলো, তখনকার কথাই বলি। ভূতি তখন ইস্কুলে পড়ে। গ্রাম হইতে ইস্কুল প্রায় মাইল-দুইএর পথ। সকলে মিলিয়া হাঁটিয়াই যাই, হাঁটিয়াই আসি। ইস্কুলে যাইবার আগে ভূতিকে এক-একদিন ডাকিতে যাইতাম; সেদিনও গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, ভূতি তাহাদের সদর দরজার কাছটিতে বই-খাতা হাতে লইয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঘরের ভিতরে মা তাহার চীৎকার করিতেছেন। আমি যাইবামাত্র ভূতি বলিল, 'চল্।' বলিয়াই সে আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খেয়েছিস্?'

ভূতি বোধ হয় 'হাঁ' বলিতেই যাইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলে নেহাৎ মিথ্যা বলা হয় বলিয়াই বোধ করি বলিল, 'না।'

ফিরিতে আমাদের সন্ধ্যা হয়। বলিলাম, 'সে কি রে! সন্ধ্যে পর্যন্ত না খেয়ে থাক্‌বি?'

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনিভাবে ভূতি বলিল, 'তাতে কি হয়েছে! রোজই ত' আমি এসে খাই।'

'কেন? সকাল-সকাল রান্না হয় না বুঝি?'

ভূতি কথা বড় কম বলে। অন্য দিন হইলে হয়ত' চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন তাহার কি হইয়াছিল কে জানে, কথা বলিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আজ আমাদের এখনও রান্নাই চড়েনি। ঘরে চাল নেই।'

অবস্থা তাহাদের ভাল নয় জানি, কিন্তু তাই বলিয়া রান্না চড়ে না, সেকথা কল্পনাও করিতে পারি নাই। শুনিয়া দুঃখ হইল। ভাবিলাম, আমাদের বাড়ী লইয়া গিয়া ভূতিকে খাওয়াই। কিন্তু তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতেই চিনি। জানি, সে যাইবে না। কাজেই দু'জনে নীরবেই পথ চলিতে লাগিলাম। খানিক পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোর মা বুঝি ঐজন্যেই ঝগড়া কর্‌ছিল?'

মা অর্থাৎ ভূতির বিমাতা। তাহার মা নাই।

কথাটাকে ভূতি উড়াইয়া দিল। বলিল, 'না না, ও কিছু নয়, সেজন্যে কেন হবে? ও—এম্‌নি।'

যাই হোক, বুঝিলাম—বলিতে সে চায় না।

গ্রামটাকে বাঁ-হাতি ফেলিয়া রাখিয়া ইস্কুলে যাইবার জন্য মাঠের উপর দিয়া যে সোজা রাস্তাটা আমরা

আবিষ্কার করিয়াছিলাম, সবেমাত্র তখন আমরা সেই মেঠো পথ ধরিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে ডাক শুনিলাম, 'ভূতোদা! ভূতোদা!'

দু'জনেই পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, ভূতির বৈমাত্রেয় ভাইটা ছুটিতে ছুটিতে আমাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ছেলেটার নাম নিরঞ্জন। কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা তোমায় ডাক্‌ছে, ভূতোদা।'

ভূতি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

নিরঞ্জন বলিল, 'তা আমি কি জানি! আস্‌বে ত' এসো, না আস্‌বে ত' ব'লে দিচ্ছি—এলো না।'

ভূতি আমার মুখের পানে তাকাইল। তাকাইবার অর্থ—তুই আজ একাই ইস্কুলে যা, আমায় ফিরিতেই হইবে।

বলিলাম, 'চল্ তবে আজ আমারও গিয়ে কাজ নেই। বাড়ীই ফিরে যাই।'

দু'জনেই ফিরিলাম।

ভূতি একটুখানি তাড়াতাড়ি আগে-আগে চলিতেছিল, তাহার পর নিরঞ্জন, তাহার পর আমি। সুযোগ বুঝিয়া নিরঞ্জনকে ডাকিলাম, 'শোন্!'

'কি?'

'ভূতিকে শুধু দাদা বল্‌তে পারিস্ না? 'ভূতোদা' 'ভূতোদা' কি?'

নিরঞ্জন বলিল, 'বা-রে! ঐ ত' ওর নাম।'

'দাদাকে বুঝি নাম ধ'রে ডাক্‌তে হয়?'

'কি বল্‌ব?'

'শুধু 'দাদা' বল্‌বি। 'ভূতোদা' আবার বলে নাকি? ছি!'

নিরঞ্জন বলিল, 'আজ্ঞে বেশ মশাই, তাই হবে।'

ছেলেটি পাকা শয়তান। ভূতির ভাই বলিয়া মনে হয় না। নিরঞ্জনকে চিনি। সুতরাং বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তবু কাছে পাইয়া মাথায় তাহার ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া বসিলাম।

নিরঞ্জন একবার 'উঃ' বলিয়াই আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'ফুঁ দিয়ে দাও, নইলে চুল উঠে যাবে।'

খানিক্ দূর গিয়া ভাল করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁরে নীরু, তোর বাবা ওকে কিজন্যে ডাক্‌ছে রে?'

ভূতি তখন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল। নিরঞ্জন আমাকে সব কথাই খুলিয়া বলিল। দু' তিন মাস ধরিয়া ভূতির ইস্কুলের বেতন দেওয়া হয় নাই। গত কয়েক দিন হইতে ভূতি তাহার বাবাকে সেই কথাই বলিতেছিল। আজ বলিয়াছিল, বেতন না দিলে সে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। অথচ তাহার বাবার হাতে টাকা নাই। সুতরাং মা তাহার বাবাকে একটা খুব ভাল বুদ্ধি শিখাইয়া দিয়াছে। এই মাসেই ভূতির বিবাহ দিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইস্কুলের যাবতীয় খরচ আর তাহাদের দিতে হইবে না, ভূতির শ্বশুর দিবে। তাই তাহার বাবা ভূতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আর ইস্কুলে যাইতে হইবে না।

হাত নাড়িয়া চোখের ইসারা করিয়া কথাটা আমাকে নিরঞ্জন বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু সেইখানেই বলা তাহার শেষ হইল না। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া অত্যন্ত চুপিচুপি কহিল, 'ভূতোদার ইস্কুলের মাইনে এতদিন কে দিয়েছে জানো?'

বলিলাম, 'কে?'

গম্ভীরভাবে নিরঞ্জন বলিল, 'মা। গয়না বিক্রী করে' দিয়েছে।'

•

তাহার পরেই ভূতির বিবাহ।

বিয়ে কি রে! আমরা ত' অবাক্! ভূতি কিন্তু চিরকালই কম কথা বলে। আমাদের প্রশ্নে সে একবার হাসিল মাত্র।

কিন্তু তাহার বাবা রামলোচনের মুখে আমরা সবই শুনিলাম। বাগ্‌দিপাড়ায় হরি মিছিরের গোলদারী দোকানের আটচালার একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া রামলোচনকে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কেন যে তিনি সেখানে এমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া কাটান সে-কথা আমরা জানি, এবং জানি বলিয়াই ভূতিকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নাই।

রামলোচন গাঁজা খান।

অবশ্য একা খান না। সন্ধ্যার আগে গ্রামের আরও অনেকেই শুধু ঐ একই প্রয়োজনে আসিয়া জোটে এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐখানে বসিয়া বসিয়া আড্ডা চালায়।

সেদিন ঐ আড্ডার মাঝখানেই রামলোচন বলিয়া বসিলেন, 'মানুষ তাহ'লে আর কিজন্যে সময়ের ছেলে চায় বল দেখি, বিহারী! এই ত', অবস্থা দেখ্‌ছ আমার এত খারাপ, দু'দিন পরে আবার দেখো, ভূতির বিয়েটা একবার চুকে যাক্।'

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, 'বিয়েতে কিরকম পাওনা হচ্ছে বল দেখি?'

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, 'তা নগদে গয়না-গাঁটিতে প্রায় হাজার-দেড়েক টাকা। কম কি?'

কম যে নয় সেকথা সকলেই স্বীকার করিল।

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, ভূতির বিবাহ রামলোচনের অভাব ঘুচাইবার জন্য।

ভূতির তাহাতে আপত্তি করা চলে না।

আপত্তি সে করিলও না। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

কিন্তু ভূতির বৌ দেখিয়া আমরা ত' আমরা, গ্রামসুদ্ধ লোক একেবারে বৌএর পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। বৌ যেমন পাচপাচি সকলের হয় তেমনি, কিন্তু লম্বায় চওড়ায় এত বড় যে, দেখিলে মনে হয় ভূতিকে সে কোলে করিয়া সারা গাঁ-টা বারকতক্ ঘুরাইয়া আনিতে পারে।

বয়সে সে ভূতির চেয়ে বড় কিনা সে সন্দেহও অনেকে করিতে লাগিল, কিন্তু রামলোচন বলিলেন, 'না হে না, দুঃখীর ঘরের মেয়ে ত' নয় যে, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাবে! অমনি বৌ'ই আমি চেয়েছিলাম।'

ইহার উপর আর কথা চলে না।

তা যেমন শাশুড়ী, তেমনি বৌ।

শাশুড়ীর নাম লক্ষ্মী, আর বৌএর নাম সরস্বতী।

পৈতৃক যে কয় বিঘা ধানের জমি রামলোচন পাইয়াছিলেন, একমাত্র তাহারই উৎপন্ন ফসল হইতে তাঁহাকে সংসার চালাইতে হয়। বারো মাসের খরচ তাহাতে ভাল করিয়া চলে না। একান্তই যখন অচল হইয়া ওঠে লক্ষ্মী-বৌকে তখন তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেন। নিরঞ্জনকে লইয়া লক্ষ্মী-বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া যায়। ভূতিকে বলেন, 'তুইও তোর মামার বাড়ীতে দিনকতক থেকে আয় গে যা। আর আস্‌বার সময় মামার কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনিস্। বলিস্—ইস্কুলের মাইনেটা মাসে মাসে পাঠিয়ে দিও।'

এই ব্যবস্থাতেই বছরের পর বছর কাটিতেছিল।

কিন্তু এরকম সুব্যবস্থা সত্ত্বেও লক্ষ্মী-বৌএর কয়েকটি সোনার গহনা সেই যে বন্ধক পড়িয়াছে, রামলোচন এখনও তাহা ছাড়াইয়া দিতে পারেন নাই।

লক্ষ্মী-বৌএর কাছ হইতে রামলোচনকে তাহার জন্য গঞ্জনাও কম সহিতে হয় না।

লক্ষ্মী-বৌ বলে, 'অকম্মার ধাড়ি! মাগ-ছেলে পোষ্‌বার ক্ষমতাই যদি না থাকে ত' বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলে কেন?'

রামলোচন গাঁজা খাইয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন, আবার কখনও বা হি হি করিয়া হাসেন।

লক্ষ্মী-বৌ বলে, 'হাস্‌ছ কোন্ লজ্জায় শুনি! এই যে গয়নাগুলো আমার—'

গহনার কথা উঠিলে সহজে আর থামিতে চাহিবে না, রামলোচন তাহা জানেন। কাজেই হাঁ হাঁ করিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলেন, 'চুপ কর লক্ষ্মী-বৌ, ভূতির বিয়েটা একবার দিতে দাও, ব্যস্, তোমার গয়না তখন যদি আমি না ছাড়িয়ে দিই ত' গুণে সাত হাত নাকখৎ দেবো।'

তা নাকখৎ তাঁহাকে দিতে হয় নাই। ভূতির বিবাহ দিয়া সর্ব্বপ্রথম তিনি লক্ষ্মী-বৌএর গহনাগুলি ছাড়াইয়া দিয়াছেন, খড়ের ঘরখানা নূতন করিয়া ছাওয়াইয়াছেন এবং বাকি টাকা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দিন তাঁহাদের এখন বেশ ভালই চলিতেছে।

খিড়্‌কির পুকুরে হাত ধুইতে গিয়া সরস্বতী সেদিন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। লক্ষ্মী বলিল, 'প'ড়ে গেলে, বৌমা? লাগেনি ত'?'

সামান্য একটুখানি লাগিলেও বৌমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

লক্ষ্মী বলিল, 'তোমার বাবাকে বোলো, বৌমা, এবার যেন কিছু টাকা তিনি তোমার হাতে দিয়ে দেন। কিছু ইঁট পুড়িয়ে এই ঘাট্‌টা তাহ'লে বাঁধিয়ে দেবো, বাছা। বর্ষাকালে তোমার তাহ'লে কষ্ট হবে না।'

সরস্বতী বলে, 'বল্‌ব।'

লক্ষ্মী বলে, 'আর শুধু ঘাট বাঁধালেই ত' চল্‌বে না, মা, মাটির ঘরে থাকা তোমার অভ্যেস নেই, তোমার জন্যে দালান-বাড়ী ত' একখানি তোমার বাবাকে তৈরি ক'রে দিতেই হবে। তোমার শ্বশুরকে এবার আমি তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। তুমি হয়ত গুছিয়ে তোমার বাবাকে সব কথা বল্‌তে পার্‌বে না।'

সরস্বতী দেখিতে লম্বা-চওড়া হইলেও তখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

কিছুদিন ধরিয়া আকাশকুসুমের চাষ তাহাদের এমনি করিয়াই চলে।

ভূতি আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে যায়। বৌএর কথা তুলিয়া আমরা তাহার সঙ্গে হাসি-রহস্য করিতে ছাড়ি না। কিন্তু তাহার কি যে চুপ করিয়া থাকা স্বভাব, অনেক করিয়া বলিলে হয়ত' একটুখানি হাসে।

কিন্তু তাহার পড়া আর বেশি দূর অগ্রসর হইল না, আর ছ'মাস ইস্কুলে থাকিলেই ভূতি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিত, কিন্তু লজ্জায় সে তাহার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করিল।

ভূতির তখন বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। লজ্জা তাহার সেজন্য নয়। লজ্জা এইজন্য যে, ভূতির স্ত্রী সরস্বতী একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছে।

এই দু'বৎসরের মধ্যে ভূতির শ্বশুর তাঁহার কন্যার জন্য দালান-বাড়ীও তৈরি করাইয়া দেন নাই, পুকুরের ঘাট বাঁধাইবারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। রামলোচন ও লক্ষ্মী-বৌ বৈবাহিকের উপর রাগ করিয়াছেন।

ভূতির মেয়েটি যখন ছ'মাসের শিশু, রামলোচন তখন একদিন নিজে গিয়া বৌমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া আসিলেন। এইবার কেমন করিয়া বৈবাহিক তাঁহাদের দুঃখ ঘুচাইয়া না দেন তিনি একবার দেখিবেন—এইরকম মনের ভাব।

সংসারে তখন তাঁহার অভাবের আর অন্ত নাই।

বাড়ী ফিরিয়া সেইদিন রাত্রেই রামলোচন কসিয়া গাঁজা টানিয়া আসিয়া সকলকে কাছে

ডাকিলেন। বলিলেন, 'বৌমা এসো। ভূতি, তুইও আয়! আর তুমি—হ্যাঁ, তুমিও থাকো।'

এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আচ্ছা বৌমা, এই ত' দেখ্ছ মা আমার অবস্থা, ছ'বেলা হয়ত' ভাল করে' খেতেই পাবে না। কিন্তু মেয়ের এই এত কষ্ট দেখেও তোমার বাবা কি কিছুই করবে না?'

সরস্বতী হেঁটমুখে নীরবেই বসিয়া রহিল। কোনও কথা বলিল না।

লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'কেন করবে না? খুব করবে। মিন্‌সের দেবার ক্ষেমতা ত' নেই তা নয়! দেয় না শুধু তুমি বল্‌তে পার না বলে'। কই এইবার একবার ভাল করে' বল দেখি।'

রামলোচন বলিলেন, 'আহা, সেই পরামর্শ করতেই ত' ডাক্‌লাম সবাইকে।'

লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'বেশ, তবে কালকেই একটি গাইএর কথা লিখে দাও। বল যে, গাইএর টাকা না পাঠালে নাত্‌নী তোমার দুধ খেতে পাবে না।'

কিন্তু শুধু গাইএ রামলোচনের মন উঠিল না। বলিলেন, 'হ্যাঃ, তোমারও যেমন বুদ্ধি! শুধু একটি গাই হ'লেই তোমার দুঃখু ঘুচে যাবে? না, শোন, তার চেয়ে লিখে দিই—অবিলম্বে একশ' টাকা পাঠিয়ে দাও। না দিলে তোমার সঙ্গে ভদ্রতা রাখা আর চল্‌বে না দেখ্‌ছি।'

লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'সেই ভালো।'

সেই পরামর্শই স্থির হইল। ভূতি একটি কথাও বলিল না। পিতার আহ্বানে যেমন সে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আবার তেমনি নীরবেই চলিয়া গেল।

রাত্রে ওদিকে তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীতে কি যে কথা হইয়াছে কে জানে, পরদিন সকালেই দেখা গেল, ভূতি কোথা হইতে একটা গাই কিনিয়া আনিয়াছে।

গাই দেখিয়া রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি রে! গাই কোথায় পেলি?'

ভূতি বলিল, 'ত্রিশ টাকায় কিনে আন্‌লাম।'

'টাকা কোথায় পেলি?'

'ওর কাছে ছিল।'

ওর অর্থাৎ সরস্বতীর।

ব্যাপারটা রামলোচন যে না বুঝিলেন তাহা নয়। গাইটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হুঁ।'

লক্ষ্মী-বৌ ছুটিয়া আসিল, নিরঞ্জন আসিল।

রামলোচন বলিলেন, 'ওগো, শুনেছ? গাই কিন্‌তে তোমার বৌমা যে টাকা বের করে' দিয়েছে।'

সরস্বতী তাহার মেয়েকে কোলে লইয়া একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'তুমি কেন টাকা দিলে, বাছা? গাইএর টাকা তোমার বাবার কাছ থেকে আদায় কর্‌তাম। তা বেশ করেছ, মা, আরও গোটা-দশেক টাকা আমায় আজ দুপুরবেলায় দিও। ঘরে একটি চাল নেই, পাঁচ টাকার চাল কিন্‌ব আর পাঁচ টাকায় আমার সেই চুড়িগাছটা বন্ধক আছে—ছাড়িয়ে আন্‌ব।'

সরস্বতী কি যেন বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কি যে বলিল কিছুই ভাল শোনা গেল না।

দুপুরে আহারাদির পর লক্ষ্মী-বৌ সরস্বতীর কাছে হাত পাতিয়া বসিল। বলিল, 'কই দাও বাছা, দেখে আসি।'

সরস্বতী বলিল, 'কি?'

'ওমা! এ যে আকাশ থেকে পড়্‌লে গো! সেই যে বল্‌লাম সকালে,—দশটা টাকা।'

সরস্বতী বলিল, 'সকালে যে বল্‌লাম, মা, টাকা ত' আমার কাছে আর নেই।'

লক্ষ্মী-বৌ গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভূতি বুঝি শিখিয়ে দিলে?'

সরস্বতী বলিল, 'না মা, তাঁর সঙ্গে ত' আমার এখনও দেখাই হয়নি।'

লক্ষ্মী-বৌ সেদিন আর কোনও কথাই বলিল না, কিন্তু তাহার পরের দিন দেখা গেল, তাহাদের রান্না চড়ে নাই, উনানটা পর্য্যন্ত না ধরাইয়া লক্ষ্মী-বৌ গুম্ হইয়া পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, 'উনোনটা কি আমি গিয়ে ধরাব, মা?'

'কিজন্যে ধরাবে, বাছা, ঘরে চাল বাড়ন্ত।' বলিয়া সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়াই রহিল।

ভূতি বাড়ী ছিল না, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সব চুপ্‌চাপ, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নাই। রান্নাঘরটা একবার দেখিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আপন মনেই জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ আমাদের উনোন ধরেনি কেন গো?'

ও-ঘর হইতে লক্ষ্মী-বৌএর জবাব আসিল, 'কেমন করে' ধরবে, বাছা! বাড়ীতে ভাতের চাল নেই আর নিজের মেয়েটি দুধ খাবে বলে' গাই কিনে আন্‌লে। এইবার মেয়েকে দুধ খাওয়াও আর বাপ-মা উপোস্ দিক্।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভূতি আর কিছু না শুনিয়াই সেখান হইতে ঘরে চলিয়া গেল। সরস্বতী বসিয়া বসিয়া তাহার মেয়েকে আদর করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এদিকে রান্নাবান্না আজ কিছুই চড়েনি।'

ভূতি বলিল, 'জানি। কিন্তু তোমার কাছে ত' আর কিছুই নেই?'

সরস্বতী বলিল, 'স্বচক্ষেই ত' দেখ্‌লে।'

স্বামী তাহার ম্লান মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে দেখিয়া সরস্বতী বলিল, 'অমন মুখভারি করে' দাঁড়িয়ে থেকো না বাপু, আমার একটা গয়না-টয়না নাও, নিয়ে কোথাও টাকাকড়ির জোগাড় করে' কিছু চাল কিনে নিয়ে এসো।'

এই বলিয়া মেয়েকে সে তাহার কোল হইতে নামাইয়া হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, 'নাও।'

সংসারে যাহাদের আয় বলিতে কিছুই নাই অথচ ব্যয় আছে, অভাব-অভিযোগ তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক। রামলোচনেরও সেই অবস্থা। রোজগার তিনি কখনই করেন নাই—এখনও করেন না। অভাব যখন দারুণ হইয়া উঠে, উনানে হাঁড়ি যখন সত্যই চাপে না, তখন হয় তিনি তাঁহার নিজের শ্বশুরের কিম্বা ভূতির শ্বশুরের নিন্দা করিতে বসেন। বলেন, 'আশা দিয়ে দিয়ে ওরাই ত' আমার সর্ব্বনাশ করে' দিলে।'

লক্ষ্মী-বৌ বলে, 'খবরদার বল্‌ছি, আমার বাবার কথা তুমি মুখে এনো না। আমার বাবা তোমাকে অনেক দিয়েছে। পুজোর সময় যখনই গেছি, গুষ্টিসুদ্ধো একজোড়া ক'রে কাপড় দিয়েছে, জামা দিয়েছে, যাবার-আস্‌বার গাড়ী ভাড়া……এমন কে দেয় গো শুনি!'

রামলোচন বলেন, "না গো না, তোমার বাবার কথা বলিনি। বল্‌ছি আমার আগেকার শ্বশুরের কথা —ভূতির দাদা-মশাই। ভূতির মা তাঁকে গিয়ে একবার বল্‌লে, 'বাবা, আমার ওখানে বড় কষ্ট হচ্ছে।' তিনি বল্‌লেন, 'কত টাকা হ'লে তোমার দুঃখু ঘোচে বল ত', মা?' ভূতির মা বল্‌লে, 'হাজার পাচেক্ টাকা দাও, বাবা, আমি আপনার ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই তাহ'লে ঐ থেকেই করে' নেবো।' হেসে বল্‌লেন, 'তাহ'লে পাঁচ হাজারের কম এবার আর তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে না দেখ্‌ছি।' তারপর কথা হ'ল যে, এক মাসের মধ্যে টাকাটা তিনি দিয়ে দেবেন। ব্যস্—সেই মাসেই ভূতির মা গেল মরে'।"

সে-সব দিন আর নাই। সে আশা-ভরসাও ঘুচিয়াছে। এখন ভরসা একমাত্র ভূতির শ্বশুর।

কিন্তু ভূতি কিছুতেই তাঁহাকে বলিতে দিবে না।

রামলোচনের নেশাটা যেদিন একটুখানি বেশি হইয়া যায়, সেদিন হয়ত কথা শুনিয়া ভূতির উপর রাগ করিয়াই বলিয়া বসেন, 'লবাবের ব্যাটা! শ্বশুরের কাছে চাইতেও লজ্জা! কুলীন আমরা—আমাদের চোদ্দ-পুরুষ শ্বশুরের কাছে চেয়ে এসেছে, তা জানিস্? তা' বেশ, চাইতে পারবে না ত'—চালাও সংসার। আর ত' ছোট ছেলেটি নও বাবা,—এখন উপযুক্ত হয়েছ।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলেন, 'আর আমাকেই যদি এই বয়েসে রোজগার করতে হয় ত' বেশ, তাও বল, যাই, কোনও দূর দেশ পানে চলে' যাই, গিয়ে বামুনের ছেলে ভাত রাঁধিগে।'

কথাটা শুনিয়া ভূতির চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিয়া আসে। বাবা তাহার বহু দূর দেশে গিয়া ভাত রাঁধিয়া রোজগার করিবে! না, সে নিজেই এইবার চাকরির সন্ধানে কোথাও বাহির হইবে।

ম্লানমুখে ভূতি সরস্বতীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'শুন্‌লে ত'? এই বয়েসে বাবাকে আমি ভাত রাঁধার চাকরি করতে দেবো না।'

'তা'হ'লে তোমাকেই বেরোতে হয়।'

'কাল সকালেই বাড়ী থেকে যাব ভাব্‌ছি। কয়লাকুঠিগুলো একবার ঘুরে আসি।'

কিন্তু সরস্বতীর ইচ্ছা, স্বামীকে যদি যাইতেই হয় ত' আর কিছুদিন পরেই যেন যায়। কারণ, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। যেমন রৌদ্রের তেজ, তেমনি অসহ্য গরম। সময়টা খারাপ। তাহার চেয়ে—জল পড়ুক, আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষায় মাটিটা একটুখানি ঠাণ্ডা হোক।

ততদিনের জন্য আবার সে তাহার হাত হইতে একগাছা চুড়ি খুলিয়া দেয়। ঘরে আবার কিছুদিনের জিনিস-পত্র আসে।

রামলোচন খুশী হইয়া বলেন, 'দেখ্‌ছ গো, ও লক্ষ্মী-বৌ, দেখো! এতদিন ছিলাম বাপের ছেলে, এখন আমি ছেলের বাপ। আমার আবার ভাবনা কিসের!'

তখন হইতে ভূতিকেই সব ভাবনা ভাবিতে হয়। যেন ভূতিরই সংসার।

এবার আমরা অনেকদিন পরের কথা বলিতেছি। অনেকদিন—প্রায় যোলো বৎসর।

রামলোচনের বয়স হইয়াছে। ভূতিকে দেখিয়া আর চিনিবার উপায় নাই। নিরঞ্জনের বিবাহ হইয়াছে। একটি ছেলেও হইয়াছে। লক্ষ্মী-বৌএর আরও দু'টি মেয়ে আর একটি ছোট ছেলে। হয় নাই শুধু সরস্বতীর। তাহার সেই যে সেই মেয়েটি—তাহার পর আর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। সেই মেয়ে তাহার বড় হইয়াছে। মায়ের মতই বাড়ন্ত গড়ন। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। নাম—অনুপমা।

বছর-দশেক আগে ভূতি একটি চাকরি পাইয়াছে। ঢুকিয়াছিল পঁচিশ টাকায়, এখন হইয়াছে পঞ্চাশ। আমাদের গ্রাম হইতে ক্রোশদুই দূরে নূতন যে কয়লার কুঠি খুলিয়াছে, সেইখানেই তাহার কাজ। রোজ সকালে উঠিয়াই সাইকেলে চড়িয়া তাহাকে কুঠি যাইতে হয়, দুপুরে একবার খাইতে আসে, তাহার পর আবার যায়, বাড়ী ফিরিতে কোনদিন সন্ধ্যা হয়, কোনদিন রাত্রি।

তাও ভাগ্যিস্, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাহেবকে বলিয়া কহিয়া ঐ চাকরিটি ভূতি পাইয়াছিল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে সংসারে আজকাল ঐ অতগুলি লোক,—কাহারও দুঃখ-কষ্টের আর সীমা থাকিত না।

সম্প্রতি দুঃখ-কষ্ট তাহাদের ঘুচিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রামলোচনের নেশা যেন একটুখানি বাড়িয়াছে। বাগ্‌দিপাড়ায় হরি মিছিরের গোলদারী দোকানের আটচালায় তাঁহাকে আর বড় একটা দেখা যায় না। বাড়ীর সুমুখে অশ্বত্থগাছের তলাটা ভূতি ইট দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছে। সেই বাঁধানো

রকের উপরেই সকাল-সন্ধ্যা আজকাল রামলোচনের আড্ডা বসে। সঙ্গী-সাকরেদ্ তাঁহার সেইখানেই আসিয়া জোটে।

তবে তাঁহার বয়েসের দোষেই হোক্ কিংবা নেশার গুণেই হোক্, কাজে-কর্ম্মে আজকাল তাঁহার একটুখানি ভুলচুক হইয়া যায়।

যেমন ধরুন—

ভূতি সেদিন তাহার কুঠি হইতে বাড়ী ফিরিবামাত্র জমিদারের কাছারি হইতে লোক আসিল খাজনার তাগাদায়।

ভূতি বলিল, 'মাইনে এখনও পাইনি, দিন সাতেক্ পরে দেবো।'

জমিদারের লোক বলিল, 'আজ্ঞে দু'বছরের। গত বছরের খাজনাও আপনাদের দেওয়া হয়নি।'

ভূতি একটুখানি অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, 'দু'বছরের? না, আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে, গত বছরের খাজনা ত' আমি বাবার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

'আজ্ঞে না। বাবাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌বেন।'

রামলোচন তখন বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী ফিরিলে ভূতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'গত বছরের খাজনা কি আমাদের দেওয়া হয়নি, বাবা?'

রামলোচন চোখ বুজিয়া একবার চিন্তা করিলেন। তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কই আর হ'ল! তুই দিয়েছিলি ঠিক্, কিন্তু তোর মা'র ব্রত-উদ্‌যাপনের সময় মেজ-বৌমার সেই যে সেই গয়নাটা বন্ধক পড়েছিল, সেইটে দিতে হ'ল ছাড়িয়ে।'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। দু'বছরের খাজনা একসঙ্গে প্রায় তিরিশ টাকা দিতে হইবে, অথচ বেতন পাইবে পঞ্চাশ টাকা। ভূতির মাথাটা একবার ঘুরিয়া গেল। কোনোরকমে মুখ বুজিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরের ফাঁকা বাতাসে গিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা সরস্বতী বোধ করি শুনিতে পাইয়াছিল। ভূতিকে এক সময় একা পাইয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, মেজ-বৌএর গয়না বুঝি ছাড়িয়ে না দিলে চলে না, আর আমার গয়নাগুলো? চাক্‌রি পাবার আগে যা বন্ধক দিলে তা ত' আজও ফির্‌ল না।'

ভূতি বলিল, 'যা গেছে তা গেছে, তার জন্যে আর দুঃখু ক'রো না।'

সরস্বতী বলিল, 'তা না হয় হ'ল, কিন্তু অনুর বিয়ে? মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ? ষোলো পেরিয়ে গেল।'

কথাটা ভূতি বিশ্বাস করিল না। বলিল্, 'ধেৎ! ষোলো পেরোবে কি রকম?'

সরস্বতী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'হিসেব করে' দেখো।'

ভূতি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

এ ভাবনা যে কিসের সরস্বতী তাহা বুঝিল। বলিল, 'টাকার কথা ভেবে আর কি করবে বল? সেই যে বলেছিলে—আপিস থেকে ধার নেবে!'

ভূতি বলিল, 'ধার বোধ হয় পাব না। আপিসের অবস্থা ভাল নয়।'

সরস্বতী বলিল, 'না পাও, আমার সমস্ত গয়না আমি বিক্রি করে' দেবো। ভাল দেখে তুমি একটি ছেলে দেখো।'

এই সেদিনের সেই ছোট অনুপমা ইহারই মধ্যে যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী হইয়া উঠিতে পারে, সে ধারণা ভূতির ছিল না। সেদিন সে তাহার পরিপুষ্ট দেহের পানে তাকাইয়া সহসা চমকিয়া উঠিল। সরস্বতীকে বলিল, 'গয়না তুমি ঠিক করে' রেখো, অনুর বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।'

যাই হোক্, অনুপমার বরের জন্য ভূতিকে খুব বেশি হায়রান হইতে হইল না। চিরকালই তাহার ইচ্ছা ছিল, ভাল ঘর এবং ভাল বর দেখিয়া অনুর বিবাহ দিবে। শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। হুগলী জেলার একটি ছোক্‌রা

তাহাদের আপিসে চাকুরি করিত। তাহার ভাইপোটি সবে এই বৎসর বি-এ পাশ করিয়া আবার কি যেন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলের বাবা মস্ত বড় উকিল। ছেলেটিও দেখিতে চমৎকার।

বিবাহের বন্দোবস্ত সেইখানেই সব ঠিক হইয়া গেল। সরস্বতী তাহার দু'হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি রাখিয়া বাকি সমস্ত গহনা তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

বিবাহের মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি। গহনা বেচিয়া ভূতি টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বরযাত্রীদের খাওয়াইবার আয়োজনও মন্দ হয় নাই।

এমন সময় দেখা গেল, রামলোচন বাঁকিয়া বসিয়াছেন।

রাত্রে সেদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া নেশার ঝোঁকেই বোধ করি চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও!' 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও!' ডাকিলেন, 'ভূতি, শোন্! এতদিন চুপচাপ করে'ই ছিলাম, কিছু বলিনি, ভাব্‌ছিলাম ভূতির আক্কেলটাই দেখি। কিন্তু এবার ত' আর না বলে' থাকা গেল না!'

ভূতি হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, 'কেন, কি হয়েছে, বাবা?'

রামলোচন বলিলেন, 'বৌমার কথা শুনে স্বার্থে তুমি অন্ধ হয়েছ, বাবা, কি হয়েছে না-হয়েছে এখন ত' তা বুঝবে না! তোমার অতবড় ঐ বোনের বিয়েটা রইল পড়ে' আর এখন বিয়ে দিচ্ছ কার? না—নিজের মেয়ের।'

রামলোচনের এ-পক্ষের মেয়েটি বড় হইয়াছে সত্য, দেখিতেও মন্দ নয়, কিন্তু অনুপমার চেয়ে সে প্রায় তিন বছরের ছোট। তাহার যদি হয় ষোলো ত' বুঁদির বয়স তেরো।

ভূতি সেই কথাই বলিল। বলিল, 'বুঁদি ত' অনুর চেয়ে অনেক ছোট, বাবা!'

রামলোচন হাসিলেন। বলিলেন, 'তবে আর বল্‌ছি কেন! আরে, হাজার ছোট হোক্, তবু পিসী ত'! পিসী থাক্‌তে ভাইঝির বিয়ে হয় কখনও? কেউ শুনেছে?'

ভূতি হেঁটমুখে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'ভেবেছিলাম আগে অনুর বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তারপর একবার সাম্‌লে নিয়ে—'

রামলোচন এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'তুই হাসালি, ভূতি! মেয়ের বিয়ে বলে' কথা, সাম্‌লে নেওয়া কি এতই সোজা! তার চেয়ে এ বিয়ে তুই বন্ধ করে' দে।'

কিন্তু তাহাদের সে পাকা কথা দিয়াছে, আগামী উনিশে তারিখে বিয়ে। এখন বন্ধ করিবে বলিলেই বন্ধ করা যায় না।

রামলোচন বলিলেন, 'তার চেয়ে এক কাজ কর্—শোন্। ঐ এক-খরচে দুটো বিয়েই সেরে ফেল্। এইটাই ত' শেষ নয়, আবার ত' আর একটা বোন আছে এখনও! সেটাকেও ত' তোকেই পার করতে হবে।'

ভূতি তেমনি হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল। বলিল, 'আচ্ছা তাই হবে বাবা, আপনি ভাব্‌বেন না, যান।'

এই বলিয়া তাহার বাবাকে সান্ত্বনা দিয়া কথাটা বোধ করি ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য স্বার্থান্ধ ভূতি অন্যত্র চলিয়া গেল।

ভূতি আজকাল একটি দণ্ডের জন্যও ঘরে বাস করে না, সাইকেল লইয়া দিবারাত্রি বাহিরে-বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথায় যে থাকে, কোথায় স্নান করে, কোথায় খায়, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করে, অনুপমা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভাল করিয়া কেহই কোনও জবাব পায় না।

বিবাহের আগের দিন ভূতি জানাইল যে, বুঁদিরও বিবাহ হইবে সুতরাং গাত্র-হরিদ্রা তাহারও হোক্।

কথাটা শুনিবামাত্র লক্ষ্মী-বৌ রামলোচনের কাছে ছুটিয়া গেল। বলিল, 'হ'ল ত' এবার! ঐ নাও, শোনো কি বল্‌ছে।'

রামলোচন বলিলেন, 'ঠিকই ত' বল্‌ছে। কাল বিয়ে, আজ গায়ে হলুদ হ'বে না?'

লক্ষ্মী-বৌ দাঁত কিড়্‌মিড় করিয়া বলিল, 'গাঁজা খেয়ে খেয়ে তোমার কি আর বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে? জামাই দেখ্‌লাম না কিছু না, কোথাকার কোন্ বাঁদর ধরে' এনে কাজ সেরে দেবার মত্‌লব করেছে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?'

রামলোচন বলিলেন, 'না গো না, তা ও করবে না।'

লক্ষ্মী-বৌ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, করবে না! সৎ-বোনের ওপর দরদ কত!'

ঠিক সেই সময়েই ভূতি ঘরে ঢুকিতেছিল, রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, বুঁদির বিয়ে কোথায় ঠিক করলি বল দেখি? জামাইটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ ভাল হবে ত'? দেখিস্, বাবা, আমার বুঁদির মত মেয়ে যেন শেষে জলে না পড়ে।'

ভূতি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। বলিয়া গেল, 'আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না, বাবা, সে ত' আমি আগেই বলে' দিয়েছি।'

অনুপমাকে বিবাহ করিবার জন্য বর আসিল হুগলী জেলা হইতে। চমৎকার ছেলেটি। বড়লোকের ছেলে। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। অনুপমার সঙ্গে মানাইবে ভাল।

কিন্তু বিবাহের সময় যে-ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অদ্ভুত।

রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর-একটি জামাই কই এখনও এসে পৌছোল না ত'?'

ভূতি বলিল, 'অনুর বিয়ে আজ বন্ধ করে' দিলাম, বাবা, আজ বুঁদির বিয়েটাই হ'য়ে যাক্।'

বুঁদির বর যে এত সুন্দর হইবে রামলোচন তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন, 'সেই ভাল।'

সুতরাং অনুপমার বরের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল বুঁদির। অনুপমার বিবাহ সেদিন আর হইল না।

বরপক্ষের বলিবার কিছুই নাই। যাহা পাইবার কথা ছিল সবই তাঁহারা পাইলেন। বুঁদি-মেয়েটিও দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়।

কন্যা সম্প্রদান করিয়া রামলোচন ভাঁড়ারের দরজায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাঁড়ার আগ্‌লাইতে লাগিলেন। ওদিককার কাজকর্ম মেজ-বৌকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মী-বৌ নিজেই দেখাশোনা করিতেছিল। পাড়াপড়শী দু'চার জন মেয়েও আসিয়াছিল। তাহাদেরই মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বড়-বৌকে দেখ্‌ছি না যে, লক্ষ্মী-বৌ? আর তার মেয়েটাই বা গেল কোথায়?'

লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'কি জানি, মা!' বলিয়াই সে তাহার কাছে আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ উল্টাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সবই ত' তোমরা জানো, মা, তবু কেন যে জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কে জানে!'

মেয়েটি বলিল, 'ভুলে যাই, বাছা, মনে থাকে না। তোমার ব্যাভারে সৎ-শাশুড়ী বলে' ত' আর মনে হয় না, মা, তাই আজ তোমার আনন্দের দিনে ও-পক্ষের বৌ-ব্যাটা না যদি আসে ত' বড় দুঃখু হয়।'

আর-একজন তাহার টিপ্পনি কাটিল। বলিল, 'তা আজকের দিনে বৌমার কিন্তু ঘরে খিল দিয়ে পড়ে' থাকাটা ভাল হ'ল না, বাছা, তা তুমি যাই বল, আর তাই বল।'

যাই হোক্, বড়-বউএর অভাবে ক্ষতি কিছুই হইল না। বিবাহ নির্বিঘ্নেই চুকিল।

সরস্বতী এদিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা!

অনুপমা বলে, 'চুপ কর, মা, এর জন্যে তোমার এত কান্না কিসের?'

সরস্বতী কিন্তু কিছুতেই চুপ করিতে পারে না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'কেন যে কাঁদ্‌ছি তা তুই কেমন করে' জানবি, মা! ডাক্‌ দেখি একবার তোর বাবাকে! কাল থেকে আমার সঙ্গে তার দেখাই হচ্ছে না।'

দেখা সে ইচ্ছা করিয়া করিতেছে না কিনা তাই বা কে জানে।

যাই হোক্‌ শেষ পর্য্যন্ত দেখা একদিন হইল।

সরস্বতী কাঁদিল না, অনুপমার বিবাহের কথা তুলিল না, শুধু গম্ভীরভাবে ভূতির সুমুখে হাত পাতিয়া বলিল, দাও আমার টাকাকড়ি দাও, আমার গয়না দাও!'

ভূতি বলিল, 'দেবো।'

'দেবো নয়, এক্ষুণি দাও। তোমার চালাকি আমি বুঝেছি।'

ভূতি বলিল, 'এক্ষুণি কোথায় পাব? দেবো দিনকতক পরে। অনুর বিয়ের জোগাড় ত' আমায় করতেই হবে।'

সরস্বতী বলিল, 'থাক্‌ আর অনুর বিয়েতে কাজ নেই, তার চেয়ে তোমার আর-একটা বোন্‌ আছে, তার বিয়ের জোগাড় করগে যাও।' এই বলিয়া সে একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, স্বামী হ'য়ে এমন শত্রুতা করবে তা জান্‌তাম না। দাও, আমার সব ফিরিয়ে দাও, অনুকে নিয়ে আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব।'

ভূতি বুঝিল—এগুলা রাগের কথা। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা তাই যেও, তোমার সবই আমি ফিরিয়ে দেবো।'

হাসি দেখিয়া সরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বলিল, 'হাস্‌ছ কোন্‌ লজ্জায়! কবে দেবে বল।'

ভূতি বলিল, 'এক সপ্তাহ পরে দেবো।'

সরস্বতী আর কোনও কথা কহিল না। ভাবিল, এক সপ্তাহ সে নীরবে অপেক্ষা করিবে।

করিলও তাহাই।

সপ্তাহ শেষ হইবার আগের দিন বলিল, 'কাল তোমার দেবার কথা, মনে থাকে যেন। না দিলে আমি কিন্তু কিছু বাকি রাখ্‌ব না।'

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে এত টাকা সে দিবে কেমন করিয়া!·····দিতে সে পারিল না।

সরস্বতী কিন্তু 'দাও' 'দাও' করিয়া জীবন তাহার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। শেষে অনুপমাও তাহার মাকে বলিতে ছাড়িল না। বলিল, 'তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু নেই, মা? বাবাকে চব্বিশ ঘণ্টা ওরকম করে' বলে! মানুষটা পাগল হ'য়ে যাবে যে!'

সরস্বতী রাগিয়া বলিল, 'তা হোক্‌ পাগল। তুই চুপ্‌ করে' থাক্‌।'

সেদিন রাত্রে অমনি স্বামীর সুমুখে খাবার ধরিয়া দিয়া সরস্বতী বলিল, 'এবার কি আমরা মায়ে-ঝিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌লে তুমি সুখী হও? আপিস থেকে ধার করবে বলেছিলে, তাই কর না! মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার যে ঘুম হচ্ছে না। ছি ছি, এমন হতভাগা স্বামীর হাতে তুমি আমায় দিয়েছ, ভগবান!'

ভূতি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, 'তুমি এত অধীর হ'য়ো না, শোনো! আমার অবস্থাটা একবার বোঝো। টাকাকড়ি পাবার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু এখনও কিছু পাচ্ছি না।'

সরস্বতী বলিল, 'সৎ-মার গুষ্টির কাপড় ত' এল। কই তার বেলা ত' না-পাওয়া হও না!'

ভূতি বলিল, 'ও ত' সামান্য কয়েকটা টাকা! বাবা বল্‌লেন, কাপড়-চোপড় কারও কিছু নেই, কি আর করি বল।'

সরস্বতী দাঁত কিড়্‌মিড় করিয়া জবাব দিল—'কি আর বল্‌ব তোমাকে! ছি ছি ছি ছি, এমন স্বামীর হাতে থাকার চেয়ে মরা ভালো।—তাও যদি নিজের মা হ'ত!'

হাত নাড়িয়া ভূতি বেশ জোরে-জোরেই বলিল, 'ওগো চুপ কর! শুনতে পাবে যে! ছি!'

ততোধিক জোরে সরস্বতী চীৎকার করিয়া

উঠিল, 'না আমি চুপ করব না। আমি ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ব। ওরা সৎ, ওরা—'

'আঃ, ফের্‌ চেঁচাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, চেঁচাব বেশ করব। ওরা আমাদের শত্রু। ওদের মুখে ছাই দিতে হয়।'

ভূতির মত শান্তশিষ্ট নির্ব্বিরোধী মানুষও একথার পর রাগিয়া উঠিল। ভাতের গ্রাস হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'চুপ করবে না?'

সরস্বতী বলিল, 'কেন, ভয়ে নাকি? না, চুপ করব না।'

কিন্তু ভূতিও যেন এইবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিজেকে আর সে সম্বরণ করিতে পারিল না। হাতের কাছে ডালের বাটিটা তুলিয়া লইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল সরস্বতীর দিকে। বলিল, 'মর্‌ তবে।' বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কাঁসার ঐ অত বড় বাটি সরস্বতীর কপালে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া সেটা ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া দূরে গিয়া পড়িল। অনুপমা বোধ করি কাছেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল, শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখে, মা তাহার দুই হাত দিয়া কপালটা চাপিয়া ধরিয়াছে আর তাহার আঙ্গুলের ফাঁকে পিচ্‌কারির মত ফিন্‌কি দিয়া কাঁচা রক্ত ছুটিয়া গিয়া থালার ভাতগুলাকে পর্য্যন্ত রাঙা করিয়া দিয়াছে।

অনুপমা অনেক করিয়াও তাহার মা'র কপালের রক্ত কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। বলিল, 'রক্ত যে বন্ধ হচ্ছে না, বাবা, কি করি?'

বলিয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখে, বাবা তাহার তখনও পর্য্যন্ত হতভম্বের মত এঁটো হাতে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুইটা জলে ছল্‌ছল্‌ করিতেছে।

তাহার পরদিন, প্রত্যহ যেমন যায়, সাইকেলে চড়িয়া ভূতি তাহার আপিস যাইতেছিল, কোথায় কোন্‌ পথে ধারে ভিন্নগ্রামের শ্মশানে একটা মড়া পুড়িতে দেখিয়া সেইখানেই সে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই দি পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, এক আম-গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ গ গাহিল, তাহার পর আপন মনেই কি যেন বলি বলিতে বাড়ী ফিরিল।

রসিক গোয়ালা দুধের ভাঁড় লইয়া ভিন্নগ্রামে বেচিতে যাইতেছিল, পথে তাহার সঙ্গে ভূতির দেখা। ভাঁড় দুইটি মাটিতে নামাইয়া রসিক তাহাকে একটি প্রণাম করিল, কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভূতি বলিয়া উঠিল, 'হাঁরে রস্‌কে, তুই আমার খাজনার টাকাটা কবে দিবি বল্‌ দেখি?'

রসিক ত' অবাক্‌!

খাজনার টাকা রসিকের পূর্ব্বপুরুষেরাও ভূতিকে কখনও দেয় নাই। বলিল, 'আমার কাছে খাজনার টাকা...'

ভূতি বলিল, 'হ্যাঁ, না যদি দিস্‌ ত' আমি সর্ব্বনাশ করে' ফেল্‌ব বলে' দিচ্ছি! বাটি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্ত বের করে' দিতে পারি — হ্যাঁ।'

এই বলিয়া সে আর অপেক্ষা করিল না। সাইকেলের উপর চড়িয়া-বসিয়া সজোরে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

সেই তাহার পাগলামির প্রথম সূত্রপাত!

তাহার পর পনেরোটা দিন পার হইতে না হইতেই বদ্ধ উন্মাদ!

*

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আমি ডাক্তারকে দিয়াছিলাম। ডাক্তার পড়িয়া ত' হাসিয়া খুন! বলিলেন, 'এ তুমি সাহিত্য ফলিয়েছ, এ আমি চাইনি।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি তবে চেয়েছিলেন?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'সে তুমি বুঝ্‌বে না।'

তখনও আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই জন্যই কি বস্তুতি পাগল হয়েছে, তোমার বিশ্বাস ?'

চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'কখ্খনো না। এর চেয়েও কত ভীষণ ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে' থাকে। আমার জীবনেই ঘটেছে। যদি শুন্‌তে চাও ত' সন্ধ্যের পর এসো।'

গল্প-প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী

১। গল্প ফুলস্কেপ্ কাগজের ৯।১০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। বাঁদিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ মার্জিন' (margin) রাখিতে হইবে।

২। গল্পের আখ্যানভাগ, লিখন-প্রণালী এবং ভাষা—সকল দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিচার করা হইবে।

৩। গল্পের সঙ্গে ভাল ছবি দিতে পারিলে তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ছবি Drawing Paperএ বা Bristol Boardএ আঁকা যাইতে পারে। তুলি বা কলম ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলমে আঁকিতে হইলে লাইনগুলি গাঢ় কালো রঙের এবং পরিষ্কার হওয়া দরকার।

৪। প্রেরিত গল্পের আবরণের (cover) উপরে "গল্প-প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৫। মনোনীত গল্প প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের থাকিবে।

৬। অমনোনীত গল্প ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৭। গল্প পাঠাইবার সময় "গল্প-প্রতি-যোগিতা"র কুপন পাঠাইতে ভুলিবেন না। নিজের নাম ও ঠিকানা কুপনের উপর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৮। এ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণ নিয়মাবলীতে দেখিবেন।

৯। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০এ জ্যৈষ্ঠ।

১০। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রথম পুরস্কার	...	...	**৫০৲ টাকা**
দ্বিতীয় „	...	...	**২৫৲ „**
তৃতীয় „	...	...	**১৫৲ „**
চতুর্থ „	...	...	**১০৲ „**

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাঙ্‌লা দেশের সুঁদরী কাঠের জঙ্গলে
কেমন ক'রে জন্মালি তুই বাঘ ?
মেঘের দেশের অজানা কোন্‌ খোঙ্গলে
সুপ্ত ছিল প্রচণ্ড এ দাপ !

*

যেথায় ভীরু শশক ফিরে শঙ্কাতে,
লাফিয়ে বেড়ায়, দন্ত দেখায় হনু ;
উঠ্‌ল কেঁপে কানন যে তোর ডঙ্কাতে,
যেমন আরাব, তেম্‌নি ভীষণ তনু !

*

চক্ষু ও কি ? দীপ্ত অনল-কুণ্ড যে,
ও কি নখর, ও কি দারুণ থাবা ;
যেমন গ্রীবা, তেম্‌নি ও তোর মুণ্ড যে,
সিংহ সেও হচ্ছে দেখে হাবা !

*

শক্তি বিপুল, বিপুলতর লম্ফ রে,
ধন্য সাহস ! আচ্ছা বুকের পাটা ;
থাকিস্‌ ধরায়, শব্দে কাঁপাস্‌ অম্বরে,
কণ্টকিত শঙ্কাতে হয় গা'টা !

নায়েগ্রার এ জল-প্রপাত মূর্ত্ত কি ?
লাগ্‌ছে 'আঁধি' জীবন্ত এ যম বলি',
সত্য প্রলয়-ঘূর্ণি সাথে ঘুর্‌ত কি ?
দন্তে ধরি' ইন্দ্ররাজের দম্ভোলি !

*

বগ্‌রী-চরা পলি মাটির পৃথ্বী এ,
জম্‌কে ছিল ধান্য, পাণ ও সর্ষপে ;
বুঝ্‌তে নারি কোন্‌ খেয়ালীর কীর্ত্তি এ,
কে জান্‌ত এ বাঘের থাবার ভর স'বে।

*

ভীতু ভেতো ভাঙা দেশের শর-ক্ষেতে
একি ভয়াল ভীষণতার ভাণ্ডারা,
হায় রে ফণি-মনসার এ অর্ঘ্যেতে
লক্ষ্মীরে আজ পূজ্‌লে এ কোন্‌ পাণ্ডারা !

*

এ নয় ফুল আর প্রজাপতির দেশ শুধু,
ভেবো না কেউ কেবল ফেউ আর ছাগ আছে;
হেথায় জাগে লতার বুকে ডাঁশ, মধু,
মোদের বনে আজও এমন বাঘ আছে !

কুলকুণ্ডলিনী রহস্য

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ

মেসের চারতলার উপরের ছোট্ট একরত্তি ঘর। তক্তপোষের ওপর চুপ ক'রে ব'সে আছি। হাতে কোনো কাজ নেই। আজ তিন বৎসর হ'ল বি-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছি। মধ্যে মধ্যে কাজ জোটে—সে কিন্তু টেম্পোরারি গোছের—আজ আছে, কাল নেই। সম্প্রতি কয়েক মাস বেকার ব'সে আছি।

ভেতো বাঙ্গালীর বেতো শরীর,—সারাটা দুপুর ঘুমিয়েও যেন আশ মিট্‌ছে না। চোখের পাতা দুটো বৃষ্টিতে-ভেজা চড়ুই-পাখীর ডানার মত জড়িয়ে রয়েছে। ঘুম ভেঙ্গেছে বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

সুমুখের দেয়ালে কড়িকাঠের কাছ-বরাবর একটা টিক্‌টিকী একটা আরসোলাকে তাক্ করছে; আরসোলাটা আপন মনে আরামে ঝিমোচ্ছে। —বাছা রে! বিষ্ণুশর্ম্মা সাধে লিখে গেছেন—"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" শ্লোকখানি যেন আমার চোখের সাম্‌নে চার পা ছুঁড়ে জ্যান্ত হ'য়ে দাঁড়া'ল।

হঠাৎ দেখি আরসোলাটা চোঁ ক'রে দেয়াল বেয়ে নীচের দিকে নেমে আস্‌ছে, আর টিক্‌টিকীটা তার পেছনে এঁকে বেঁকে ছুটেছে। হয়ত বা বেচারা পালাতে পার্‌ত—কিন্তু পার্‌লে না;—মাঝপথে মহাত্মা গান্ধীর ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিখানা পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়াল। তারপর দু'-চারবার পাখার ঝট্‌পট্ শব্দ এবং পরমুহূর্ত্তেই সব ঠাণ্ডা। কাল বৈকালে মহাত্মাজীর ছবিখানি সখ ক'রে টাঙ্গিয়েছিলাম। কে জান্‌ত, অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের ছবি হিংসার সহায়তা করবে!

হঠাৎ কার ভাঙ্গাকণ্ঠের কাংস-ধ্বনিতে স্বপ্নভঙ্গ হ'ল।—দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখি—রায়বাহাদুরের পেয়ারের খান্‌সামা বনমালী চৌকাঠের বাইরে গরুড় পক্ষীর মত হাত জোড় ক'রে দণ্ডায়মান।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"কি খবর, বনমালী? রায়বাহাদুর কলকাতায় ফির্‌লেন কবে?"

উত্তরে সে যা বল্‌লে তার সারমর্ম্ম এই যে, রায়বাহাদুর আজ তিন দিন হ'ল দেরাদুন থেকে কলকাতায়

ফিরেছেন এবং তাঁর বরানগরের বাগানবাড়ীতে আস্তানা গেড়েছেন। উপস্থিত আমার ডাক পড়েছে।

তথাস্তু!—বড়লোকের হুকুম,—তামিল না ক'রে উপায় নেই। বল্লুম—"আচ্ছা, তুমি এগোও,—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি।"

এই ফাঁকে রায়বাহাদুর নামক জীবটির সম্বন্ধে দু'-চার কথা ব'লে রাখি। রায়বাহাদুর ক্ষেমদাকিঙ্কর রায়চৌধুরী বাংলাদেশের একজন মাঝারি গোছের জমিদার। জমিদারির আয় নিতান্ত কম নয়। অথচ সংসারে ভোগ করবার কেউ নেই বল্লেই চলে। বয়স এখন ষাটের কিছু ওপর হবে। গোলগাল লোকটি—মাথাভরা প্রকাণ্ড টাক্। বছর পাঁচেক হ'ল পত্নীবিয়োগ হয়েছে। একটি মাত্র পুত্র, তাও চিররুগ্ন,—সুতরাং জমার অঙ্ক দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভদ্রলোকের নিজের কোন বাবুয়ানা বা বদ্ খেয়াল নেই। সখের মধ্যে দু'টি জিনিষ এ পর্য্যন্ত আমার নজরে এসেছে,—একটি হচ্ছে সরকারী খেতাব অর্জ্জনের বাসনা, আর একটি হচ্ছে লুপ্ত তন্ত্র-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য উৎকট চেষ্টা।

আজ বছর দুয়েক হ'ল এঁর কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলুম। কাজ আর কিছুই নয়—রোজ ঘণ্টা দুই ক'রে ডিক্‌টেশন্ লেখা। রায়বাহাদুর তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়্‌গড়া টান্‌তে টান্‌তে তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে যাবেন, আর আমাকে তাই লিখে যেতে হবে।—এই হচ্ছে কাজ। এইভাবে প্রায় একটা বছর কাজ চলেছিল। তারপর একদিন বই লেখা শেষ হ'ল।—রায়বাহাদুর বইয়ের নাম দিলেন "কুলকুণ্ডলিনী-রহস্য"! বই ছেপে বেরুতে আরও মাস দুই লেগেছিল। দেড় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট অতিকায় গ্রন্থ—দ্বিতীয় মহাভারত বল্লেই হয়। এক কপি বই আমাকে উপহার দিয়ে বল্লেন—"শীগ্‌গিরই এর একটা ইংরেজী তরজমা করব মনে করছি!—এসব জিনিষ পৃথিবীর লোকে যত পড়্‌তে পায় ততই মঙ্গল,—বুঝ্‌লে কিনা!"

বললুম—"তা তো বটেই।"

তার পরই হঠাৎ একদিন জমিদার-পুত্রের শরীর খারাপ হ'ল। ডাক্তারের পরামর্শে রায়বাহাদুর সপুত্র দেরাদুন যাত্রা কর্‌লেন। বছর খানেক পর আজ খবর পেলুম—ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরেছেন এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বনমালী গরুড় পক্ষীর মত হাত জোড় ক'রে দণ্ডায়মান

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বরানগরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লুম। আমাকে দেখেই রায়বাহাদুর সোৎসাহে ব'লে উঠ্‌লেন—"এস এস, আছ কেমন?"

উত্তরে কি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, তৎপূর্ব্বেই একটা অতিকায় গ্রন্থ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"দেখেছ?"

মলাটের ওপরকার সোনার জলে লেখা ইংরেজী হরফ্‌গুলোর দিকে নজর পড়্‌তেই অবাক্‌ হ'য়ে গেলুম,—বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"Mysteries of the Court of Kulakundalini."

অতিকষ্টে হাসি সাম্‌লে বল্লুম—"খাসা নামকরণ!—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী তর্জ্জমাই বা কর্‌লেন কখন্‌, আর বই-ই বা ছাপালেন কখন্‌?"

একটা চাপা গর্ব্বের হাসি হেসে রায়বাহাদুর বল্লেন—"দেরাদুনে এক রিটায়ার্ড্‌ হেড্‌মাষ্টার জুটে গেল। তাঁকে দিয়েই তর্জ্জমা করালুম—শেষকালে আগাগোড়া অবশ্য নিজে দেখে দিয়েছি। নামকরণ কিন্তু আমার নিজের। তারিণীবাবু নাম দিয়েছিলেন Mysteries of Kulakundalini;—ও-নাম যে ভুল হ'ত তা নয়—কিন্তু কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া ঠেকে —বুঝ্‌লে কিনা!—দেখ, এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে যে, ব্যাকরণ-শুদ্ধ হ'লেই হ'ল না,—শব্দ-ঝঙ্কার একটা মস্ত বড় জিনিষ!—এই দেখ না, রেনল্ড-সাহেব যদি তাঁর বইয়ের নাম রাখ্‌তেন Mysteries of London, তাতে ক'রে কিছু ভুল হ'ত না তো!—কিন্তু তা না ক'রে তিনি যে তাঁর বইয়ের নাম রাখ্‌লেন—Mysteries of the Court of London, সে কেবল শব্দ-ঝঙ্কারের খাতিরে,—বুঝ্‌লে কিনা!"

অতিকষ্টে হাসি সাম্‌লে বল্লুম—"বাস্তবিক এটা এতদিন আমাদের মাথায় আসেনি।"

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে রায়বাহাদুর বল্লেন—"মস্তিষ্কের পরিচালনা না কর্‌লে মাথা কি আপনি খুল্‌বে, পরেশ?"

বল্লুম—"তা তো বটেই!"

উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর ব'লে যেতে লাগ্‌লেন—"তা ছাড়া তোমরা কোন জিনিষ ঠিক নজর ক'রে দেখ না। তুমি তো বি-এ পাশ করেছ, এমন কোন ইংরেজী ক্রিয়াপদের নাম কর দেখি—যা বাংলাভাষা থেকে নেওয়া।"

একটু ভেবে নিয়ে বল্লুম—"আজ কাল দু'একটা দেশী ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে চল্‌ হ'য়ে গেছে বটে,—যেমন 'লুট্‌ করা' কথাটার জায়গায় ইংরেজীতে আজকাল 'loot' শব্দটা অনেক সময় ব্যবহার হ'তে দেখা যায়।"

অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে রায়বাহাদুর ব'লে উঠ্‌লেন—"আরে না না, ও তো হাল্‌ফিল্‌ ব্যাপার। আমি এমন ক্রিয়াপদের নাম কর্‌ব যা কোন্‌ যুগে এদেশ থেকে ওদেশে গেছে তা ওরাও জানে না—আমরাও জানি না।"

বল্লুম—"তাই নাকি?"

বল্লেন—"হ্যাঁ!—এই ধর না, 'অক্কাপাওয়া' কথাটা তো খাঁটি দেশী শব্দ!"

বল্লুম—"সে-বিষয়ে সন্দেহ কি!"

বল্লেন—"আমি যদি এই কথাটাই ইংরেজী গ্রামারের বইয়ে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে দেখাতে পারি—"

বল্লুম—"তাই নাকি!"

বল্লেন—"এখুনি দেখাচ্ছি দাঁড়াও!" কথাটা শেষ ক'রেই একটা স্কুলপাঠ্য ইংরেজী গ্রামারের 'কন্‌জুগেশনে'র 'চ্যাপ্‌টার' খুলে আমার চোখের সুমুখে মেলে ধ'রে বল্লেন—"দাগ-দেওয়া কথাটা প'ড়ে দেখ তো!"

অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে দেখি—লেখা রয়েছে—'Occupy—Occupied—Occupied.'

কিছু বুঝ্‌তে না পেরে হাঁ ক'রে রায়বাহাদুরের মুখের পানে চেয়ে রইলুম। রায়বাহাদুর বল্লেন—"কেমন, পেলে তো?"—তারপর তিনি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লেন—"অক্কাপাই—অক্কাপায়েড্‌—অক্কাপায়েড্‌।"

বলা বাহুল্য, হাসি চাপ্‌তে গিয়ে আমাকে সেদিন হেঁচে, কেশে, ঘাড় চুল্‌কে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে হয়েছিল।

রায়বাহাদুর বল্লেন—"চারদিকে একটু নজর রাখ্‌তে হয় হে—শুধু পড়াপাখীর মত প'ড়ে গেলেই হয় না।"

কথাটা শেষ ক'রেই রায়বাহাদুর হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"আর একটা শুভ সংবাদ আছে; কিছুদিন হ'ল লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার অনুমতি প্রার্থনা ক'রে এক পত্র লিখেছিলুম,—প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; ১৭ই আগষ্ট দেখা কর্‌বার তারিখ পড়েছে। আজ হ'ল তোমার ১০ই জুলাই। তা হ'লে হাতে রইল মোটে একমাস ছ'দিন।—এর মধ্যে সব—"

কথাটা আর শেষ করা হ'ল না—হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"এদিকে কিন্তু এক মহামুস্কিলে প'ড়ে গেছি হে;—আমাদের গ্রামের এক ছোকরা আজ ক'দিন হ'ল স্বদেশী হাঙ্গামায় ধরা পড়েছে।"

বল্‌লুম—"তাতে আপনার বিপদ কোন্‌খানটায় তা তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলেন—"তাকে যে আমিই মাসহারা দিয়ে কলকাতায় লেখা-পড়া শিখ্‌তে পাঠিয়েছিলুম,—রাজদ্রোহীকে অর্থসাহায্য করা কতবড় অপরাধ তা জান?—আমি অবশ্য না জেনে করেছি, কিন্তু পুলিশে কি তা শুন্‌বে!"

এই সব আলোচনার পর ভূরিভোজন সেরে যখন মেসে ফির্‌লুম তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

চার দিন পরে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছি। বেলা তখন পাঁচটা হবে। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ি পার হ'য়ে উঠোনে পা দিয়েই শিউরে উঠ্‌লুম;—দেখি উঠোনের পশ্চিম দিকের রকের উপর দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে লাল পাগড়ীধারী এক পাহারাওয়ালা বিপুল নাসিকা গর্জ্জন পূর্ব্বক নিদ্রা যাচ্ছে।—সে কি আওয়াজ!—পিলে চম্‌কে যায়। মনে মনে ভয় পেলুম—পুলিশ কেন রে বাবা!—সেই স্বদেশী ছোকরাকে অর্থ-সাহায্যের জের নয় তো?

ভয়ে ভয়ে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ ক'রে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"ব্যাপার কি, মশাই,—বাড়ীতে পুলিশ কেন?"

একটু মুচ্‌কে হেসে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"ও হচ্ছে আমাদের ঘাটির পাহারাওয়ালা!—"

বল্‌লুম—"তা তো বুঝ্‌লুম—কিন্তু এখানে কেন?"

বল্‌লেন—"ও রোজই একবার ক'রে আসে।"

পাহারাওয়ালা নাসিকা গর্জ্জন ক'রে নিদ্রা যাচ্ছে

বল্‌লুম—"রোজ আসে কেন?"

হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠে বল্‌লেন—"বনমালীকে পাগড়ী বাঁধা শেখাতে।"

কথাটা শেষ ক'রেই ডাক্‌লেন—"বনমালী!"

সঙ্গে-সঙ্গেই বনমালী ভক্ত হনুমানের মত জোড়করে সুমুখে এসে দাঁড়াল।

পাত্‌লা লিক্‌লিকে লোকটি। আকাশ-প্রদীপের

বাঁশের মত বেঁকে গেছে। বয়েস গোটা পঁয়তাল্লিশ হবে।

অত্যন্ত ভারী কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"পাগড়ী বাঁধা সুরু করিস্‌নি কেন এখনও?"

হাত জোড় ক'রে বনমালী বল্‌লে—"আজ্ঞে, আপনি যে হুকুম করেছিলেন—আজ থেকে আপনার সাম্‌নে পাগড়ী বাঁধা হবে।"

গলার স্বরটাকে আরও ভারী ক'রে তুলে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"আচ্ছা, ভকৎসিংকে এইখানে ডেকে আন্‌, আর আমি যে আধথান্ শালু কাল কিনে এনেছি, ম্যানেজারবাবুকে বার ক'রে দিতে বল্।"

কয়েক মিনিট পরেই আধথান্ শালু বগলে বনমালী এবং তৎপশ্চাৎ ভকৎসিং, ঘরে প্রবেশ কর্‌লে। রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"দেখ ভকৎসিং, আজ্‌সে ঐ আধথান্ শালু বনমালীকো মস্তকমে বাঁধ্‌নে হোগা। পাগড়ী যত বড় হবে ইজ্জত ততই বর্দ্ধিত হোগা কি না।"

"জি!" ব'লে পাহারাওয়ালাপুঙ্গব শালুর থানের পাট ভাঙ্‌তে সুরু ক'রে দিলে। আধথান্ শালু,—চাড্ডিখানি ব্যাপার তো আর নয়। যত খোলে ততই যেন মনে হয় কাপড় বেড়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কথা মনে প'ড়ে গেল। পাট-ভাঙ্গা যদিই বা অতিকষ্টে শেষ হ'ল পাগড়ী-বাঁধা আর শেষ হ'তে চায় না। একে বাঙ্গালীর মাথা—বাগ মান্‌তে চায় না—'ট্র্যাডিসনে'র অভাব। তার ওপর আধথান্ কাপড়!—খানিকদূর অবধি এগোয়, তার পরেই হঠাৎ খুলে যায়। এমনি ক'রে বার বার সাত বার চেষ্টার পর অষ্টম বারে শেলাই ফোঁড় দিয়ে পাগড়ী অতিকষ্টে খাড়া হ'ল, কিন্তু মুস্কিল বাধ্‌ল বনমালীর। পাগড়ী খাড়া হ'ল বটে, কিন্তু পাগড়ীর ভারে বনমালী আর খাড়া হ'তে পারে না। একে লিক্‌লিকে পাত্‌লা মানুষ তার ওপর ঐ আধথান্ কাপড়ের বিরাট পাগড়ী!

ভকৎসিং চ'লে যেতে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"রোজই কি এমনি ক'রে পাগড়ী বাঁধা হয়?"

বল্‌লেন—"হ্যাঁ—রোজই!—এর জন্যে ভকৎসিংকে রোজ একটি ক'রে টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"এত খরচ ক'রে ওকে পাগড়ী-বাঁধা শেখাচ্ছেন যে বড়?"

পাগড়ীর ভারে বনমালী খাড়া হ'তে পারে না

বল্‌লেন—"জান না বুঝি?—লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার সময় বনমালী যে সঙ্গে থাক্‌বে।"

কথাটা শেষ ক'রেই হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বল্‌লেন—"ঐ ব্যাটাকে নিয়েই তো ভাবনা।—ব্যাটা

সেখানে গিয়ে যদি ঘাব্‌ড়ে যায়?" পরক্ষণেই বনমালীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"কি রে, লাট-দরবারে গিয়ে ঘাব্‌ড়ে যাবিনে তো?"

সে পাগড়ীটাকে মাথা থেকে একটু একটু ক'রে খসাতে খসাতে বল্‌লে—"আজ্ঞে ঘাব্‌ড়াব কেনে—লাটসাহেবও মানুষ, আমিও মানুষ।"

রায়বাহাদুর হতাশ হ'য়ে বল্‌লেন—"ব্যাটা সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখ্‌ছি!" আমি তো অবাক্—ভেবেছিলুম, বনমালীর সাহস দেখে রায়বাহাদুর খুশী হবেন—কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টো।

বল্‌লুম—"ভালই তো, মশাই—ওর যদি ভয় না করে সে তো সুখের কথা।" বল্‌লেন—"নাঃ—তুমিও দেখ্‌ছি ওরই মতন মুখ্যু হ'লে।"

বল্‌লুম—"কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, রায়বাহাদুর।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে অত্যন্ত নিরাশ কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"আরে বাপু, ভয়কে জয় কর্‌তে হয় ভয়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে, ভয়কে এড়িয়ে গিয়ে নয়!—এ আমার কথা নয়!—একথা 'বগলা-তন্ত্রে'র মধ্যে লিখ্‌ছে—বুঝেছ!"

বল্‌লুম—"জিনিষটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"এসব কথা যদি এত সহজে বুঝ্‌বে তা হ'লে তো 'কুলকুণ্ডলিনী-রহস্য' তুমিই লিখে ফেল্‌তে হে!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লেন—"ব্যাপারটা খুলে বলি শোনো,—ও ব্যাটা যে বলছে লাটসাহেবও মানুষ, ও নিজেও মানুষ—সে কথা ঠিক—কিন্তু লাটসাহেব না দেখে ওকথা বলা আর লাটসাহেব দেখে ওকথা বলা এক জিনিষ নয়।—লাটসাহেবকে আমি ভয় করি না, একথা বল্লেই ভয় চ'লে যায় না। বরং লাটসাহেবকে আমি ভয় করি, একথা স্বীকার ক'রে একটু একটু ক'রে অভ্যাসের দ্বারা ভয়কে জয় করতে হয়।—তান্ত্রিকরা সেইজন্যে ভূতের ভয়কে অস্বীকার না ক'রে অমাবস্যার রাত্তিরে—শ্মশানে গিয়ে ইচ্ছে ক'রে ভূতের ভয়ে আঁৎকে উঠে, তবে ভূতের ভয়কে জয় ক'রে ফেলেন। ফাঁকি চলে না বাপু—সব জিনিষেরই সাধনা আছে।"

বল্‌লুম—"সে কথা ঠিক বটে।—"

সেদিনও মেসে ফির্‌তে অনেক রাত হয়েছিল।

এমনি ভাবে দিন যেতে লাগ্‌ল। রোজই বৈকালের দিকে একবার ক'রে বরানগর ঘুরে আসি। উদ্যোগপর্ব্ব বেশ ঘটা ক'রেই চলেছে। মাঝে আর সাত দিন মাত্র বাকী।—সবই প্রস্তুত। একখানা Mysteries of the Court of Kulakundalini দপ্তরীকে দিয়ে ভালো মরক্কো-লেদারে বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটা রূপোর ট্রে কেনা হ'য়ে গেছে। রায়বাহাদুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ রূপোর ট্রের ওপর মরক্কো-লেদারে বাঁধানো Mysteries of the Court of Kulakundalini খানা নিয়ে বনমালী যাবে। কাছাকাছি গিয়ে ট্রের ওপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে রায়বাহাদুর নিজহাতে লাটসাহেবকে উপহার দেবেন। ব্যবস্থা সব আগে থাক্‌তেই ঠিক হ'য়ে আছে—এখন কেবল গেলেই হয়। এতদিনেও কিন্তু বনমালীর পাগড়ী কিছুতেই বাগ মান্‌ছে না—কেবল খুলে খুলে পড়ে। রায়বাহাদুরকে বলেছিলুম—"পাগড়ী ছোট ক'রে দিন!" রায়বাহাদুর বলেছিলেন—"তুমি দেখ, পরেশ, ঐ পাগড়ী আমি মাথায় ফিট্ ক'রে দেবো।"

প্রতিদিনের মত সেদিনও বৈকালের দিকে জমিদার-বাড়ী গেছি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি—রায়বাহাদুর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মড়ার মতন প'ড়ে রয়েছেন, আর পাশে ব'সে এক প্রবীণ কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করছেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে, পরীক্ষা শেষ ক'রে, মুখখানাকে বাংলার পাঁচের মত বেঁকিয়ে কবিরাজ বল্‌লেন—"নাড়ী বড় দুর্ব্বল!

সাত দিন আগেও তো দেখে গেছি—তখন তো এরকম নাড়ী ছিল না। সম্প্রতি কি কোন নূতন দুশ্চিন্তা আপনার মাথায় ঢুকেছে? খবরদার, আমার কাছে কোন কথা গোপন করবেন না। প্রতিকারের বাইরে গিয়ে পড়লে তখন আর কোন উপায় থাকবে না।"

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্লেন—"দুশ্চিন্তার

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কবিরাজ বল্লেন—"বড্ড বেশী দুঃস্বপ্ন দেখেন কি?"

"আজ্ঞে দেখি।"

ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে কবিরাজ চ'লে গেলেন। বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"অসুখটা কি, কবিরাজ মশাই?"
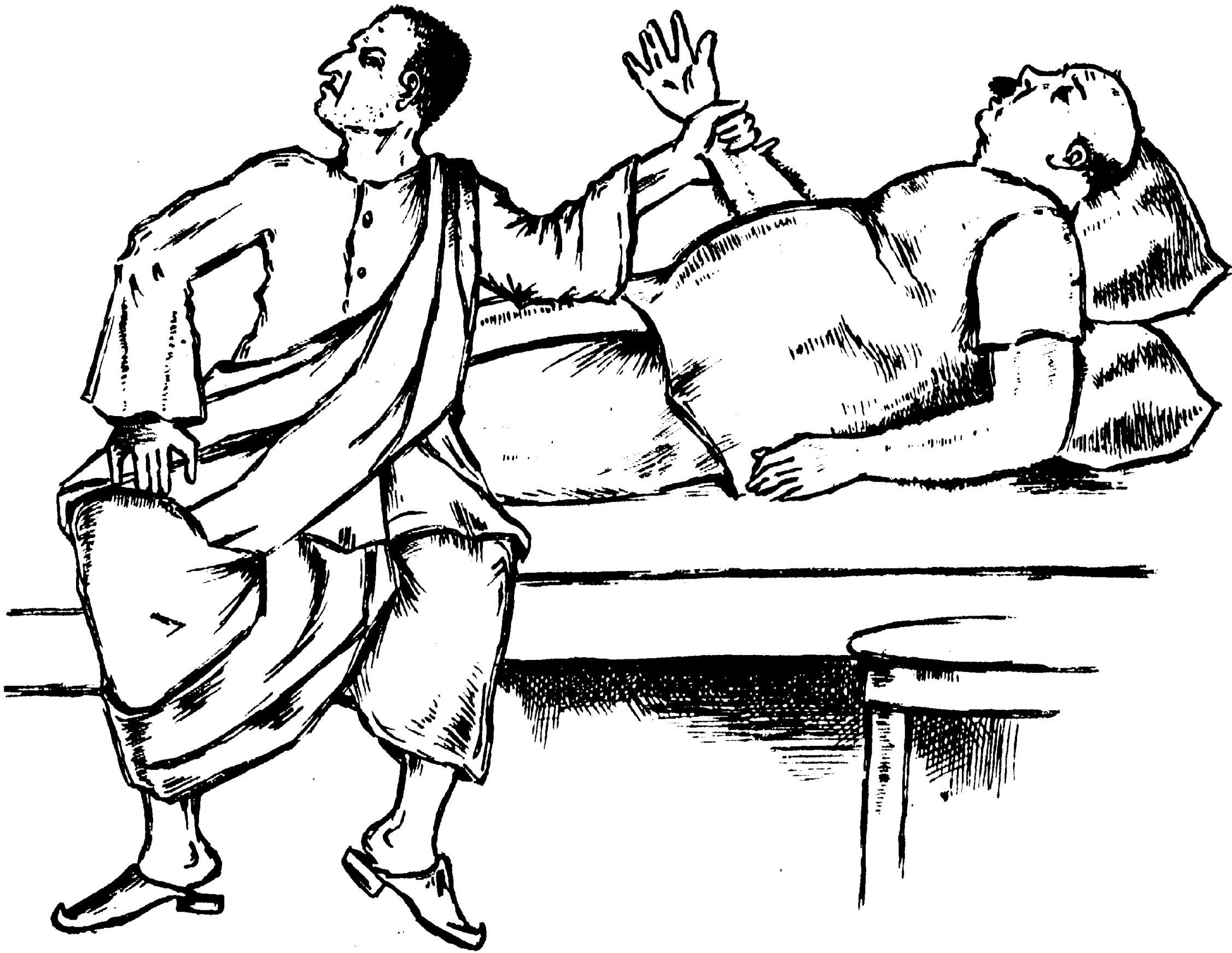
কবিরাজ রায়বাহাদুরের নাড়ী পরীক্ষা করছেন

তো কিছুই দেখ্ছিনে,—তবে চার দিন পর লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে—তারি জন্যে একটু ব্যস্ত আছি বটে।"

কবিরাজ শুধু বল্লেন—"হুঁ"! তার পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভেবে নিয়ে বল্লেন—"রাত্রে কি সুনিদ্রা হয় না?"

পূর্ব্ববৎ ক্ষীণ কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্লেন—"আজ্ঞে না।"

একটু হেসে কবিরাজ বল্লেন—"নার্ভাস্‌নেস্‌ আর কি!—ভয় হয়, লাটসাহেবের সাম্‌নে গিয়ে হার্ট্‌ফেল না করেন।"

ঘরে ফিরে এসে দেখি রায়বাহাদুর চক্ষু বুজে প'ড়ে রয়েছেন—মুখটি কিন্তু অল্প অল্প নড়্‌ছে—কি যেন বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে বক্‌ছেন। মুখের কাছে কান নিয়ে শুনি, তিনি ক্রমাগতই আওড়ে যাচ্ছেন—"জীব-জন্মে ভয় কি রে যার জগদম্বা জননী!"—হাসিও পেল,

দুঃখও হ'ল। বুঝ্‌লুম ভদ্রলোক প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে আদাছোলা খেয়ে লেগেছেন। এখন 'জগদম্বা জননী' মুখ তুলে চাইলেই হয়।

'জগদম্বা জননী' সত্যই মুখ তুলে চাইলেন। পরদিন গিয়ে দেখি কবিরাজের বড়ীর গুণেই হোক্, আর জগদম্বার কৃপা লাভ ক'রেই হোক্, রায়বাহাদুর অনেকটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ কেমন আছেন?"

উত্তরে শুধু বল্‌লেন—"জীব-জন্মে ভয় কি রে যার জগদম্বা জননী।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"দেখ, একটা মত্‌লব এঁটেছি।"

বল্‌লুম—"কিসের মত্‌লব, রায়বাহাদুর?"

বল্‌লেন—"এখনও তো হাতে তিন দিন রয়েছে।"

বল্‌লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বল্‌লেন—"বনমালী ব্যাটার মাথা কামিয়ে দিলে হয় না?"

বল্‌লুম—"তাতে কি লাভ হবে, মশাই?"

বল্‌লেন—"আমার কথাটা আগে শেষ অবধি শোনই না ছাই!"

বল্‌লুম—"বলুন!"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—"আজ যদি বনমালীর মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিই—তিন দিনে নিশ্চয়ই অল্প অল্প খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে।"

বল্‌লুম—"তা গজাতে পারে।"

বল্‌লেন—"গজাতে পারে কি—নিশ্চয়ই গজাবে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ হে!—উপনয়ন হয়েছিল তো তোমার!"

বল্‌লুম—"তা হয়েছিল বৈ কি!"

বল্‌লেন—"উপনয়নের সময় মস্তক মুণ্ডন হয়েছিল তো?"

বল্‌লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বল্‌লেন—"দণ্ড-ভাঙ্গনের দিন, মনে পড়ে, উত্তরীয় দিয়ে মাথা ঢেকে যখন গঙ্গাস্নানে গেছ্‌লে—তখন উত্তরীয় মাথায় কি রকম কাম্‌ড়ে ধরেছিল!"

বল্‌লুম—"মনে পড়ে বটে—উত্তরীয় খুল্‌তে বেগ পেতে হয়েছিল।"

বল্‌লেন—"মনে করেছি, বনমালীর মাথাটা কামিয়ে দেবো। তা হ'লে হবে কি জান,—এই তিন দিনে বেশ খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে, তাতে ক'রে ফল হবে এই যে, পাগড়ী বেশ মাথার সঙ্গে কাম্‌ড়ে ধর্‌বে—সহজে খুল্‌বে না,—তুমি কি বল?"

কি আর বল্‌ব,—অবাক হ'য়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম,—মাথা বটে!

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বনমালীর মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপার সমারোহে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল। বেচারার সে কি দুঃখ, সখের বাব্‌রী চুল,—কতকালের সাধনার ফল। স্পষ্ট দেখ্‌লুম—বেচারার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়্‌ছে। কিন্তু উপায় কি?—চুল আগে, না চাকরী আগে!

বাইরে গিয়ে বনমালীর সে কি আক্ষেপ!—আজও সে-কথা ভুলতে পারিনি। সে বল্‌লে—"বাবু, সব ঠিক্‌ ঠাক্‌—আর পনেরো দিন পরেই দেশে গিয়ে বিয়ে কর্‌ব, এই সময় কিনা মাথা মুড়িয়ে দিলে!"

বল্‌লুম—"এত বয়সে এখনও বিয়ে করিস্‌নি?"

বল্‌লে—"দ্বিতীয় পক্ষ, বাবু,—পনেরো বছরের সোমোত্ত মেয়ে—নেড়া-মাথা দেখ্‌লে কি আর বিয়ে করতে রাজী হবে?"

দেখি, বেচারার দু-চোখ বেয়ে জল পড়্‌ছে।

আজ ১৬ই আগষ্ট। কাল বেলা দু'টোর সময় লাট-দর্শন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ কেমন বোধ কর্‌ছেন?"

বল্‌লেন—"দেখ, আশ্চর্য্য ব্যাপার—আজ আর আমার একটুও ভাবনা হচ্ছে না।—অথচ শিরে সংক্রান্তি।"

বল্লুম—"ভালই তো !"

বল্লেন—"কৈ, আমাকে দেখ্লে কি নার্ভাস্ হয়েছি ব'লে মনে হয়?"

বল্লুম—"মোটেই না !"—মনে মনে কিন্তু বেশ বুঝ্তে পার্ছিলুম—ভদ্রলোক অত্যন্ত নার্ভাস্ হ'য়ে পড়েছেন।

রায়বাহাদুর বল্লেন—"দেখ, ভয় জিনিষটা হচ্ছে মনের ব্যাপার। মন যাদের নিজের বশে—তারা ভয়কে অনায়াসে জয় করতে পারে। এই দেখ না, এতবড় একটা বিপদ্ মাথার উপর ঝুল্ছে—অন্য কেউ হ'লে হয়ত শয্যা নিত—আমি কিন্তু দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি।" আমি কি বল্তে যাচ্ছিলুম, বাধা দিয়ে বল্লেন—"আমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বল্ছিনে, পরেশ !"

বিদায় নিয়ে চ'লে আস্বার সময় বল্লেন —"কাল সকালের দিকে একবার এসো, পরেশ। যাবার সময় তোমাদের মুখগুলি একবার দেখে যাব।"

অতিকষ্টে হাসি সাম্লে বল্লুম—"আস্ব বৈ কি !"

পরদিন বেলা দশটার সময় গিয়ে দেখি রায়বাহাদুর সেজে-গুজে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে রয়েছেন। গায়ে প্রকাণ্ড এক শালের জোব্বা, মাথায় রেশমের বাঁধা পাগড়ী। আমাকে দেখেই বল্লেন—"এসেছ, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এইবার তা' হ'লে 'দুগ্‌গা' 'দুগ্‌গা' ব'লে বেরিয়ে পড়া যাক্।"

সবিস্ময়ে বল্লুম—"এখন তো সবে দশটা;—আপনার তো দু'টোর সময় দেখা করবার কথা।"

বল্লেন—"আহা বাজে বকো কেন?—আমরা তো আর এখন লাটসাহেবের কাছে যাচ্ছিনে।"

বল্লুম—"তবে?"

বল্লেন—"আমরা এখন যাচ্ছি ইডেন্ গার্ডেনে।"

বল্লুম—"তার মানে?"

বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—"বোঝ না, কাছাকাছি থাকা ভাল, সময় হ'লেই সুট্ ক'রে চ'লে যেতে পার্‌ব।"

বুঝ্লুম—এর ওপর আর কথা চলে না।

'দুগ্‌গা' 'দুগ্‌গা' ব'লে রায়বাহাদুর বেরিয়ে পড়্লেন। আগে চলেছেন রায়বাহাদুর, পশ্চাতে গন্ধমাদন মাথায় বনমালী, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

রায়বাহাদুর সেজে-গুজে প্রস্তুত

মোটর ছাড়্বার পূর্ব্বে ম্যানেজারবাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"ভকৎসিংকে নিয়ে আপনি কখন্ যাচ্ছেন?"

ম্যানেজারবাবু বল্লেন—"আপনি কিছু ভাব্বেন না, বারোটার মধ্যেই আপনার কাছে গিয়ে পৌঁচোচ্ছি। প্যাগোডার তলায় থাকবেন তো?"

রায়বাহাদুর বল্লেন—"হ্যাঁ!" তারপর আমার দিকে অত্যন্ত করুণ নয়নে চেয়ে বল্‌লেন—"ওবেলা একবার এসো!"

বল্‌লুম—"নিশ্চয়ই আস্‌ব!"

রায়বাহাদুরের মোটর ছেড়ে দিলে ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ভকৎসিংকে নিয়ে যাবেন কেন?"

ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—"বুঝ্‌ছেন না!—এখন তো সবে দশটা!—এর মধ্যে কতবার পাগড়ী খুলে যাবে তার ঠিক্ কি!—বড়লোকের কাণ্ড, মশাই!"

সমস্ত দুপুরটা ছট্‌ফট্ ক'রে কাটিয়ে বেলা পাঁচটা নাগাদ বরানগর অভিমুখে রওনা হ'লুম। বুক দুর্-দুর্ করছে—না-জানি কি শুনতে হয়। গেট পার হ'য়েই বনমালীর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই সে ছুটে এসে পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে।

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল, তবে কি?—

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপার কি, বনমালী?"

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বল্‌লে—"বাবু, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।"

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে বল্‌লুম—"কি হয়েছে, শিগ্‌গির খুলে বল্!"

সে বল্‌লে—"আমার চাকরী গেছে, বাবু।"

ধড়ে যেন প্রাণ এল। বল্‌লুম—"বাবু ভাল আছেন তো?"

বল্‌লে—"তিনি তো শয্যা নিয়েছেন।—আমার কিন্তু কি হবে, বাবু?"

বল্‌লুম—"হয়েছে কি খুলে বল্ না!"

বল্‌লে—"বাবুর মুখে সব শুনবেন, হুজুর!—আমার কোন কসুর নেই, শুধু শুধু চাকরি গেল।"

বল্‌লুম—"আচ্ছা, বাবুকে বুঝিয়ে বলব'খন—এখন ছেড়ে দে!"

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি—ঘর খালি—কেউ কোথাও নেই। বেরিয়ে আস্‌ছি, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই তিনি বল্‌লেন—"এই যে, আপনি এসেছেন—বাবু আপনাকে অনেক ক্ষণ থেকে খুঁজ্‌ছেন।—চলুন ওপরে।"

বল্‌লুম—"সন্ধ্যে না হ'তেই আজ ওপরে উঠেছেন যে বড়?"

বল্‌লেন—"শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।—কবিরাজ মশাই এইমাত্র ব'লে গেলেন—নাড়ী বড় ক্ষীণ।"

রায়বাহাদুরের তেতলার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। ভদ্রলোক শয্যার উপর হতাশ ভাবে প'ড়ে রয়েছেন,—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" গোছের অবস্থা। বাড়ীর লোকে কেউ বাতাস করছে—কেউ পা টিপ্‌ছে—কেউ কিছু করতে না পেরে শুধুই ভীড় বাড়াচ্ছে।—সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার! আমাকে দেখেই কাছে গিয়ে বস্‌তে ইঙ্গিত করলেন।

কাছে গিয়ে ব'সে জিজ্ঞাসা করলুম—"লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল?"

ক্ষীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, পরেশ!—বনমালী ব্যাটা সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে।"

বল্‌লুম—"কেন, কি হয়েছে?"

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"ব্যাটাকে আমি দেখে নেবো!"

বল্‌লুম—"কেন, সে কি-এমন অপরাধ করলে?"

একটু দম্ নিয়ে রায়বাহাদুর বল্‌লেন—"সব শোন তা' হ'লে;—এখান থেকে তো বেরোলুম। তোমাদের সাম্‌নেই ত দিব্যি গ্যাঁট্ গ্যাঁট্ ক'রে মোটরে গিয়ে বস্‌লুম। তখন পর্য্যন্ত নার্ভাসনেসের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না। তার পর ইডেন্ গার্ডেনে গিয়ে প্যাগোডার তলায় আশ্রয় নিলুম। তখন পর্য্যন্ত বেশ আছি। তার পর বারোটা নাগাদ

ম্যানেজারবাবু আর ভকৎসিং গিয়ে হাজির হ'ল—তখনো দিব্যি আছি।—ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কত কথা হ'ল—দিব্যি স্বাভাবিক অবস্থা।

"তার পর ক্রমে একটা বাজ্‌ল। ভকৎসিং বনমালীর মাথায় নতুন ক'রে পাগড়ী বাঁধ্‌তে বস্‌ল,—আমিও এদিকে তৈরী হ'তে লাগ্‌লুম।

"তখনো দিব্যি চাঙ্গা আছি।

"ক্রমে পৌণে ছটো হ'ল। ওদিকে বনমালীর পাগড়ী বাঁধাও শেষ হ'য়ে গেছে। নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌লুম—পাগড়ী দিব্যি মাথায় কাম্‌ড়ে বসেছে। ভাগ্যিস্ তিন দিন আগে মাথা কামানো হ'য়েছিল। সবই তৈরী—যাত্রা কর্‌লেই হয়।

"ছটো বাজ্‌তে দশ মিনিটের সময় লাটসাহেবের গেটের সাম্‌নে হাজির হ'লুম। যথাসময়ে ডাক পড়্‌ল। ম্যানেজারবাবু আর ভকৎসিং বাইরে মোটরে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। আমি আর বনমালী ভেতরে ঢুকে গেলুম।

"আমি আগে আগে চলেছি—পেছনে রূপোর ট্রের ওপর মরোক্কো-লেদারে বাঁধানো Mysteries of the Court of Kulakundalini নিয়ে বনমালী আস্‌ছে। এঘর সেঘর পার হ'য়ে শেষকালে লাটসাহেবের খাস্‌কামরার দরজার সাম্‌নে এসে তো হাজির হ'লুম। পরক্ষণেই ঘরে ঢুক্‌তে হুকুম এল। সত্যি বল্‌ছি, পরেশ, তখন পর্য্যন্ত একটুও নার্ভাস্ হইনি।

"প্রকাণ্ড হল্—চলেছি তো চলেইছি,—দূর থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি অনেক দূরে প্রকাণ্ড একটা উঁচু চেয়ারে লাটসাহেব ব'সে রয়েছেন। এগুতে লাগ্‌লুম,—মনে মনে কেবলই ডাক্‌ছি—মা জগদম্বা, শেষরক্ষে কোরো, মা!

"আর বোধ হয় হাত দশেক এগুলেই লাটসাহেবের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হই—এমন সময় হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—বনমালী ব্যাটাকে তো দেখা হয় নি—ব্যাটা ঠিক্ আস্‌ছে তো?

"সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন ফিরে একবার তাকালুম।—তাকিয়ে যা দেখ্‌লুম—তাতে সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। মাথাটা টস্ মস্ ক'রে উঠল, চারিদিক্ অন্ধকার হ'য়ে এল। দেখি, বনমালীর মাথায় পাগড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। সঙ্গে-সঙ্গেই নজর প'ড়ে গেল,—অতবড় হল্‌ঘরের দরজা থেকে সুরু ক'রে যে পর্য্যন্ত আমরা চ'লে এসেছি, সমস্ত পথটি কে যেন শাল্ বিছিয়ে দিয়েছে। লাটসাহেবের দিকে ফিরে দেখি তিনি রুমাল মুখে দিয়ে হাস্‌ছেন।—মাথা গুলিয়ে গেল।—দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি বনমালীর কাছে গিয়ে ট্রের ওপর থেকে Mysteries of the Court of Kulakundalini-খানা তুলে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে দেবো ব'লে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ থর্ থর্ ক'রে হাত ছটো কেঁপে উঠ্‌ল; সঙ্গে-সঙ্গেই অতবড় মোটা বইখানা ধপ্ ক'রে হাত থেকে খ'সে মেঝের ওপর প'ড়ে গেল।

"অতিকষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মেঝে থেকে বইখানা তুলে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে দিতে গিয়ে দেখি, মরক্কো-লেদারের মলাটটি কেবল হাতে ঝুল্‌ছে—বইখানা মলাটহীন অবস্থায় মেঝের ওপর প'ড়ে রয়েছে।

"তার পর যে কি হ'ল, জানি না। চোখ চেয়ে দেখি নিজের শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে রয়েছি, আর কবিরাজ মশাই নাড়ী ধ'রে পাশে ব'সে রয়েছেন।"

এই অবধি ব'লেই রায়বাহাদুর চুপ করলেন; তার পর হঠাৎ একসময় ব'লে উঠ্‌লেন—"আমার বুকটা কি-রকম যেন কর্‌ছে, এখুনি কবিরাজ মশাইকে খবর দাও।"

প্রগতি

ভারতের লুপ্ত অতিকায় সরীসৃপ

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে—মানবের জন্মেরও বহু যুগ পূর্ব্বে—পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, কিরূপ শ্রেণীর জীব তখন পৃথিবীতে বাস করিত, তাহাদের প্রকৃতি এবং আকৃতি কিরূপ ছিল, এসকল বিষয়ে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছে। সে-কালের গাছপালার ও লুপ্ত অতিকায় জীবসকলের কথা লইয়া "Palæontology" নামক শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি,এস-সি (লণ্ডন), এ-আর-সি-এস্

মাটির নীচে, প্রস্তরীভূত লুপ্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর অস্থি-কঙ্কালাদি অনেক স্থানে খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, এবং সেগুলিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া ও সে-বিষয়ে গবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। লুপ্ত প্রাণীর সামান্য দুই-চারিটি অস্থি পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞেরা সেই প্রাণীর চেহারা, স্বভাব, আকার প্রভৃতির বিষয় অনেক খবর বলিয়া দিতে পারেন। প্রস্তরের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর লুপ্ত উদ্ভিদ্ ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া প্রস্তরের বয়স নির্দ্ধারণ করার উপায় বাহির করা হইয়াছে। আবার, প্রস্তর দেখিয়া লুপ্ত জীবের অস্থি বা চিহ্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে সেকালের জীব কিরূপ আকারের ছিল এবং কোথায় তাহারা বাস করিত, সে-বিষয়েও অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সি, এ, ম্যাট্‌লি নামে এক বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জব্বলপুরের নিকটস্থ 'বড়-সিমলা' পাহাড়ে 'ডাইনোসর' জাতীয় লুপ্ত অতিকায় সরীসৃপের অস্থি আবিষ্কার করেন। এ বৎসরেও তিনি জব্বলপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ভূতত্ত্ব-জরিপ-বিভাগের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁহাদের চেষ্টায় এবারও

'ছোট-সিমলা' নামক পাহাড়ে খননের ফলে কয়েকটি অতিকায় সরীসৃপের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে, একটি জন্তুর হাড় লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, পায়ের দুইটি হাড় লম্বায় ২ ফুট ৮ ইঞ্চি করিয়া, সাম্নের পায়ের উপর দিকের হাড় লম্বায় ৩ ফুট, একটি পাজরের হাড় ২০ ইঞ্চি। এই জানোয়ার লম্বায় প্রায় ত্রিশ হাত ছিল। ১৯১৯ সালে যে অস্থি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ছিল আরো বড় জানোয়ারের—লম্বায় সে জানোয়ার ছিল প্রায় চল্লিশ হাত। এবারে যে জানোয়ারের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে টাইটানোসরাস। এই জীবের চেহারা ছিল অনেকটা, গোসাপের শরীরে সাপের মাথা ও লম্বা গলা বসাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ; তবে, আকারটি ছিল বিরাট। ইহারা উভচর ছিল—অর্থাৎ জলে-স্থলে বাস করিত; তবে, অধিকাংশ সময় জলেই কাটাইত। মস্তিষ্ক নিতান্তই ছোট ছিল এবং আত্মরক্ষার বিশেষ কোন অস্ত্র ছিল না; সেজন্য জলে বাসই ইহাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল।

এই সকল সরীসৃপের 'ডাইনোসর' নাম দেওয়া হইয়াছে ('ডাইনো' অর্থাৎ ভয়ানক, 'সর' বা 'সরাস্' অর্থাৎ সরীসৃপ—কথাগুলি গ্রীক)। ইহাদের মধ্যে নানা জাতীয় সরীসৃপ আছে; আমিষভোজীও আছে। ভারতবর্ষেও আমিষভোজী ডাইনোসরের অস্থি পাওয়া গিয়াছে।

"জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ, যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।'—যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন কর্ত্তে হবে।"

—বিবেকানন্দ

নূতন বই
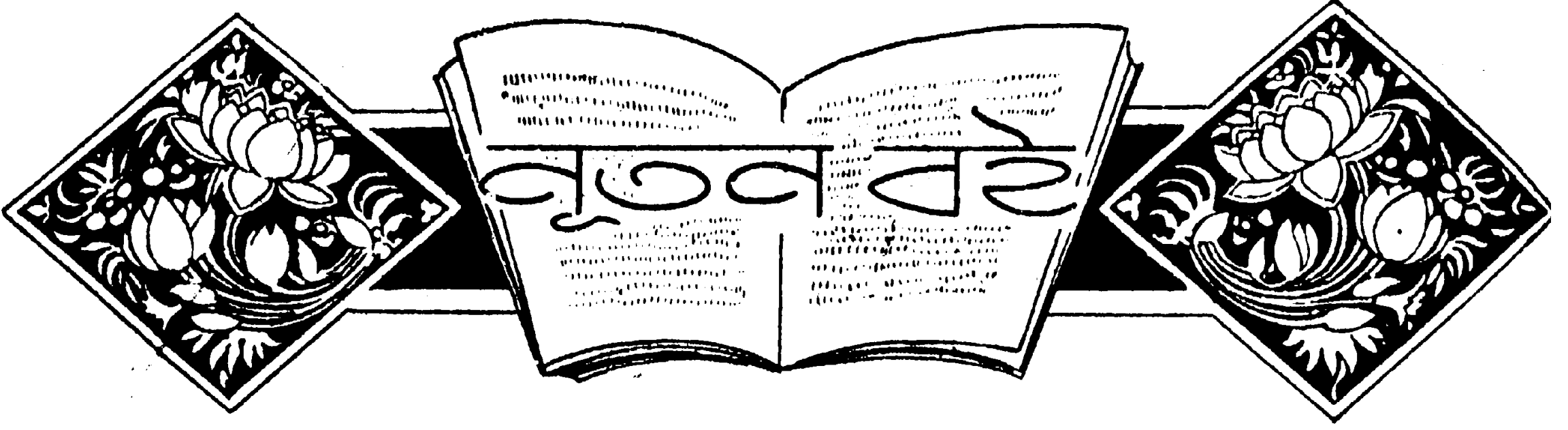
['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

দি ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ— ম্যানেজিং এডিটর—ডাঃ এস্, সি, রায়। এডিটর— শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক।—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। তৃতীয় বার্ষিকী সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

গত তিন বৎসর হইতে এই পত্রিকা দেশীয় ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, বীমা, শিল্প এবং অন্যান্য উপায়ে জাতি-গঠনের বিশেষ সহায়তা করিতেছে। সত্যকার অন্নসমস্যার প্রতি ভারতীয়দের যাহাতে শৈথিল্য না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে এই পত্রিকার অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শুধু সমস্যা-সমূহের বিবৃতি লইয়াই ইহা ক্ষান্ত থাকে নাই, দেশের বিখ্যাত এবং বিশ্বস্ত অর্থনৈতিকদের এবং ব্যবসায়ীদের চিন্তার ফল এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া উন্নতির এবং কর্ম্মকুশলতার নূতন পথ আবিষ্কারে সহায়তা করিতেছে।

এই সংখ্যা বিখ্যাত লেখকদিগের প্রবন্ধে ও নানা প্রকার নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক রামচন্দ্র রাউ, যথাক্রমে বাংলার শিল্পোন্নতির উপায়, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং লণ্ডনের অর্থনৈতিক সম্মিলন সম্বন্ধে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহী এবং সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ দিয়াছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের আশীর্ব্বাচনের সমৃদ্ধি মস্তকে লইয়া সত্যই এই 'ফাইনান্স রিভিউ' গর্ব্বানুভব করিতে পারে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীদিগের বিশেষজ্ঞ রচিত এবং অতি-আধুনিক তথ্য সংবলিত প্রবন্ধগুলি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে; সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিও অত্যন্ত সারবত্তাপূর্ণ।

মিত্র

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (তৃতীয় ভাগ)— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। কাপড়ে বাঁধাই; ৪৮২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। ইহার যে তৃতীয় ভাগ অবধি লিখিত হইল, তাহাই ইহার সুপ্রচারের পরিচয়। অলস ও ঘরমুখো বলিয়া বাঙ্গালী জাতির কুখ্যাতি আছে। কিন্তু এই অলস বাঙ্গালীই জীবিকার সন্ধানে বা নূতন দেশ দর্শনের মোহে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছুটিয়া গিয়াছে, এবং অদম্য সাহসে আপনার ভাগ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে যে-সব বাঙ্গালীর জীবন-কথা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই উদ্যমী, উৎসাহী ও কর্ম্মশীল—অর্থাৎ তাঁহারা অলস বাঙ্গালীর ব্যতিক্রমস্থল। এইসব কৃতী বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালী-সাধারণের দ্বারা পঠিত হইলে বাঙ্গালীর নৈরাশ্যময় জীবন আশাপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে।

গুপ্ত

ঘরে-বাইরে

যে-সব সহৃদয় সাহিত্যিক ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের 'উদয়নে'র সাফল্য কামনা করিয়া প্রীতিপূর্ণ পত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের শুভ-ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র পাথেয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি :—

মাননীয়া লেডী অবলা বসু, মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার বসু, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকা-আফিস হইতে মিঃ ওয়াল্‌টার বাক্‌ন্, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এড্‌ভান্স, লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, বীরভূম-বাণী, বাতায়ন, হিন্দু, জনশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ, "পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়" হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং এফ্, ডবল্যু, হিলজার্স এণ্ড কোং হইতে মিঃ ই, এ, বেলামি, প্রভৃতি।

'উদয়ন' যে সাহিত্য-জগতে একটা কিছু অভিনব ব্যাপার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্যের সেবকমাত্র, 'উদয়ন'ও সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ করিতে চাহে। সেবাকার্য্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নহে। সতর্ক ও সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের লক্ষ্য-সাধনে সহায়তা করিবেন, এ ভরসা আমাদের আছে।

* *

সাহিত্যের সেবা অর্থে কেবলমাত্র বর্ত্তমান লেখকগণের রচনা সংগ্রহ ও তাহা দ্বারাই কাগজের কলেবর পূর্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য, যে-কোনো সাময়িক পত্রিকার এইটিই মুখ্য কাজ; তথাপি, সাময়িক পত্রিকার আর-একটি কার্য্য হইতেছে সাহিত্যের বিবর্ত্তন-ধারার সহিত, তাহার অতীতের সম্পূর্ণতার সহিত বারংবার পাঠক-সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া। 'উদয়ন' সেই কার্য্যেও আপনাকে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।

* *

বর্ত্তমানে একশ্রেণীর পাঠক দেখা যায়, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পাঠ করিয়াই বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ করেন। তাঁহাদের মতে প্রাক্-রবীন্দ্র-শরৎ বঙ্গসাহিত্য সাহিত্য হিসাবে গণ্যই নহে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভাবলে যে বঙ্গসাহিত্য অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, জীবজগতে যেমন, সাহিত্য-জগতেও তেমনি ক্রমবিবর্ত্তন আছে। ভিত্তি-শূন্য জীবন যেমন অসম্ভব, অতীত-উৎস-শূন্য সাহিত্যও তেমনি দুর্ল্লভ। বঙ্গসাহিত্যের বয়স প্রায় হাজার বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার যুগ-বিভাগও কম নহে। অল্প কয়েকটি নাম করিতে হইলেও দেখিতে পাই, রামাই পণ্ডিত, বিজয় গুপ্ত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও ইন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও অক্ষয়-কুমার, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রত্যেকেই যুগ-

বিশেষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সাধনায় বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই যে সেবকদল, ইঁহাদের সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক কি না, এবং আকস্মিক না হইলে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য-ধারার সহিত কি সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে। মুকুন্দরাম না থাকিলে ভারতচন্দ্র কতটা দাঁড়াইতে পারিতেন, ভারতচন্দ্র না থাকিলে কবিওয়ালারা কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, কবিওয়ালারা না থাকিলে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা কতটা খুলিত, এবং ঈশ্বর গুপ্ত না জন্মাইলে রঙ্গলাল, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা কতটা অগ্রসর হইতে পারিত, এবং মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভা কতটা বিকশিত হইতে পারিত, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহাই হইবে সাহিত্যের যথার্থ বিচার। এই সাহিত্য-বিচারে অথবা সাহিত্যের অতীত ধারা ও অতীত গৌরবের সহিত বর্ত্তমান সাহিত্যের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমরা নিযুক্ত থাকিব।

* *

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কাহিনীর যে-সব অবশেষ তাহার ভগ্ন মন্দির ও শৈবালাচ্ছন্ন দীঘি প্রভৃতিতে আজও লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার পরিচয় সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া—সাহিত্য-পত্রিকার কর্ত্তব্য। কেননা, দেশের ঐতিহ্যের অনুসন্ধান সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। আমরা গতবারে এসম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমরা এ জাতীয় কোনো প্রবন্ধাদি এখনও পাই নাই। আমরা আশা করি, এবিষয়ে দেশবাসী আপনাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন, এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণ গ্রাম্য গৌরব-বস্তুর বিবরণাদি পাঠাইয়া আমাদিগকে বঙ্গ-ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিবেন।

* *

স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে ঔদাসীন্য ছিল, আজকাল ধীরে ধীরে তাহা দূর হইতেছে। ইহা একটা বিশেষ আশার কথা। আরও আশার কথা এই—ব্যায়াম-চর্চ্চা যাহাতে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহার জন্য সাধারণের মোটা মোটা চাঁদায় কলিকাতায় গোলদীঘির কাছে একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকগণকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলুক—ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কয়েকজন বীর জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার ব্যতিক্রমস্থল হইয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন,—শ্যামাকান্ত, আশানন্দ, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন্ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ভবানী, গোবর, প্রভৃতি। কেবল সাহিত্য নহে, কলাচর্চ্চা নহে,—শারীরিক বল অর্জ্জনেও বাঙ্গালীকে বিশেষ ভাবে ব্রতী হইতে হইবে।

প্রেমের জয় শিল্পী — মিঃ জি, পাল

(মর্ম্মর মূর্ত্তি)

উদয়ন

আশ্বিন ১৩৪১

দ্বিতীয় বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

মূলতানের সুরে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস —
তোমার চোখে দেখেছিলেম
আমার সর্ব্বনাশ।

এ সংসারের নিত্যখেলায়
প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের
হাস্য পরিহাস —
মাঝখানে তার তোমার চোখে
আমার সর্ব্বনাশ।

আমের বনে দোলা লাগে
মুকুল পড়ে ঝ'রে—
চিরকালের চেনাগন্ধ
হাওয়ায় ওঠে ভ'রে।

মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
মৌমাছিদের পাখায় পাখায়
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন
ফেলেছে নিঃশ্বাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে
আমার সর্ব্বনাশ ॥

দুর্গামূর্ত্তি-পরিচয়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

সন্তানমাত্রই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করে। হিন্দু যে জগৎজননী দুর্গার মূর্ত্তি দেখিতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আবৃত থাকে—সহস্র জন্মের অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশির সংস্কাররূপ অজ্ঞানান্ধকারে আমরা নিমগ্ন থাকি। তাই জগৎজননীর জ্যোতির্ম্ময়রূপ আমরা দেখিতে পাই না। পরমকারুণিক ঋষি জগৎজননীর মূর্ত্তির পরিচয় দিয়া আমাদের সন্তান-জীবন ধন্য করিয়াছেন।

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে দুর্গামূর্ত্তির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুরের নেতৃত্বে অসুরগণ দেবসৈন্য পরাজিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের প্রবৃত্তিই অসুরবর্গ। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিই দেবগণ। সুখভোগের প্রবৃত্তিই আমাদের স্বভাবতঃ প্রবল, শুভ-কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এজন্য দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদেরই জয় হয়। দেবগণ ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য না পাইলে অসুরগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হ'ন না। ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলেই আমরা স্বাভাবিক সুখভোগস্পৃহা সংযত করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হই। চণ্ডীতে উল্লেখ আছে যে, অসুরগণের নিকট দেবগণের পরাভব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বর কোপ প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের বদন হইতে তেজ নির্গত হইল। ব্রহ্মার বদন হইতে এবং অপর দেবগণের শরীর হইতেও তেজ বহির্গত হইল। এই সকল তেজ একত্র সমবেত হইয়া জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইল এবং ক্ষণপরে নারীদেহ ধারণ করিল—ইহাই দুর্গার মূর্ত্তি। মহাদেবের তেজ হইতে মুখ হইল, বিষ্ণুর তেজ হইতে বাহু হইল,

নিতাই পাল

দুর্গামূর্ত্তি

উড়িষ্যার ভাস্কর-শিল্প অবলম্বনে গঠিত। [শিল্পী-শ্রীনিতাই পাল।

ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয় হইল, অপরাপর দেবতার তেজ হইতে কেশ, স্তন, জঙ্ঘা, উরু, নিতম্ব প্রভৃতি দেবীর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইল।

ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের রূপ ধারণ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। দেবগণ ঈশ্বরের আদেশ-অনুসারে নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করিয়া জগতের বিবিধ শুভকর্ম্ম সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং যাবতীয় দেবগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া জগন্মাতার মূর্ত্তি গঠিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, জগতের যাবতীয় শুভ-শক্তির একত্র সমাবেশ হইতেই জগজ্জননীর আবির্ভাব। অসুরগণকে ধ্বংস করাই তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

জননীই সন্তানের সকল প্রকার মঙ্গল সম্পাদন করেন এবং নিজ হস্তে সকল অনিষ্ট দূর করেন। অসুর-বিনাশের জন্য জগৎজননীর দেহ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সুশোভিত। এজন্যই মহাদেব তাঁহার হাতে শূল দিয়াছেন, বিষ্ণু চক্র দিয়াছেন, ইন্দ্র বজ্র দিয়াছেন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিয়াছেন (কমণ্ডলুর পবিত্র জল-স্পর্শে অশুভ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়), সূর্য্য জগৎজননীর সমস্ত রোমকূপ নিজ কিরণমালায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন (সে আলোকের প্রকাশ হইলে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়, আর অন্যায় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি থাকে না), সমুদ্র অম্লান-পঙ্কজের মালা দ্বারা মায়ের শির এবং বক্ষ সাজাইয়া দিয়াছেন (সে সৌন্দর্য্য একবার মাত্র নয়ন-পথে উদিত হইলে জগতের তুচ্ছ সৌন্দর্য্যে আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না)।

এই প্রকারে সর্ব্ব আভরণ এবং সর্ব্ব প্রহরণ-ভূষিতা হইয়া জগৎজননী মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিয়া উচ্চনাদ করিলেন। সে ধ্বনি শুনিয়া সকল লোক ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র কম্পিত হইল, পৃথিবী ও পর্ব্বতরাশি বিচলিত হইল। তাহার পর অসুরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগণের কর্ত্তিত হস্ত-পদ-মুণ্ডে যুদ্ধ-ক্ষেত্র পূর্ণ হইল, তাহাদের শোণিত-স্রোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। জগৎজননী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অসুর সংহার করিতে লাগিলেন। সন্তানের অনিষ্টকারী শক্তি ধ্বংস করিয়া মায়ের যেরূপ আনন্দ হয়, আর কিসে সেরূপ আনন্দ হয়? তাই ঋষি সেই সংগ্রামকে 'যুদ্ধ মহোৎসব' বলিয়াছেন।

মহিষাসুরের সকল সেনাপতি নিহত হইলে মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহার পরাক্রমে দেবীর সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ হইল। দেবী তাহাকে জালদ্বারা আবদ্ধ করিলেন, সে সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী সিংহের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, সে পুরুষরূপ ধারণ করিল। দেবী পুরুষকে কাটিয়া ফেলিলেন, সে হস্তীরূপ ধারণ করিল। আমাদের অশুভ প্রবৃত্তিকে নির্ম্মূল করা অতিশয় কঠিন, সে প্রবৃত্তি মরিয়াও মরে না, নানা রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে মন্দ কর্ম্ম করায়। অবশেষে অসুররাজ পুনরায় মহিষরূপ ধারণ করিল। দেবী মধুপান করিয়া (অর্থাৎ অসুরবধ-জনিত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া) লম্ফ দ্বারা মহিষাসুরের উপর আরোহণ করিলেন, তাহার কণ্ঠ পদদ্বারা পীড়ন করিলেন, শূলের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন অসুর নিজ মুখ হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিল, দেবীর শক্তিতে তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় অসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তরবারিদ্বারা তাহার শির কাটিয়া ফেলিলেন। দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, দেবগণ পরম আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং সুললিত স্বরে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ভাব-সম্পদে এবং ভাষার গৌরবে সে স্তব অতুলনীয়।

দুর্গা অসুরসৈন্যের উপর চরম জয়লাভ করিয়াছেন, ঠিক সেই অবস্থার মূর্ত্তি গঠন করিয়া বাঙ্গালী জগন্মাতার পূজা করে। ঐশ্বরিক শুভ শক্তির নিকট, অশুভ দানব-শক্তি পরাজিত। তাই দুর্গাপূজায় সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না। বাঙ্গালীর পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে সে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে আনন্দে উৎফুল্ল। বর্ষাবারিপুষ্ট শ্যামল বৃক্ষপত্রাবলির উপর শরতের সুবর্ণ রৌদ্রধারা

পতিত হইয়াছে; উজ্জ্বল নীল আকাশ সৌরকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে; নদীর জল নির্ম্মল হইয়াছে; পুষ্করিণী আলোকিত করিয়া পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় সাধকের আনন্দ জল-স্থল-বায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে। বালক-বালিকা নূতন বস্ত্র পাইয়াছে। দরিদ্র তৃপ্তিকর ভোজন পাইয়াছে। প্রবাসী গৃহে ফিরিয়াছে। সানাইয়ের মধুর রাগিণী সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল পুলকিত করিতেছে।

চণ্ডী-বর্ণিত দুর্গামূর্ত্তির উপর বাঙ্গালী কিছু নিজস্ব সাধনা-সম্পদ যোগ করিয়াছে। তাই বাঙ্গালী যে দুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণেশ, বামে সরস্বতী ও কার্ত্তিক। ইঁহারা সকলে মায়েরই পুত্র-কন্যা। যেদিন মা আমাদের ঘরে আসেন সেদিন ইঁহারাও সঙ্গে আসেন। জগৎজননীকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, ঐশ্বর্য্য ও সফলতা, বিদ্যা ও শৌর্য্য সকলই লাভ করা যায়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উর্দ্ধে, কার্ত্তিক ও গণেশ নীচে। রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিন্দু-সভ্যতার বিশেষত্ব। লক্ষ্মী ও গণেশ দক্ষিণে, সরস্বতী ও কার্ত্তিক বামে। ইহার কারণ ঐশ্বর্য্য ও সফলতাই শ্রেষ্ঠ; বিদ্যা এবং শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য ও সফলতা লাভের উপায় মাত্র।

বাঙ্গালী আর একটি কাহিনী দ্বারা দুর্গাপূজা মধুর ও সরস করিয়াছে। দুর্গা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা। তিনি চিরকাল পতিগৃহেই বাস করেন। কিছুকালের জন্যও মাতা মেনকা কন্যাকে কাছে রাখিতে পারেন না। কেবল দুর্গাপূজার সময় মাত্র চারিদিনের জন্য মেনকা কন্যাকে আপনার নিকট রাখিতে পান। কন্যা আসিবে বলিয়া মা দিন গণিতে থাকেন, অবশেষে কন্যা আসেন, চারিদিনের আনন্দ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, বিজয়ার দিন মাকে আবার কাঁদাইয়া দুর্গা পতিগৃহে চলিয়া যান। যশোদার বাৎসল্য-স্নেহে আমরা দেখিতে পাই, পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহকে হিন্দু-প্রতিভা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনারূপে পরিণত করিয়াছে; মেনকার বাৎসল্য-রসে দেখিতে পাই, বিবাহিতা কন্যার জন্য মায়ের স্নেহকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সাধনরূপে পরিণত করা হইয়াছে।

দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য দেখিয়াছি কিন্তু নিরক্ষর বাঙ্গালী শিল্পী জগৎ-জননীর মুখে যে পবিত্র সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে, তাহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। সন্তানের চক্ষে মায়ের মূর্ত্তি যেরূপ মনোহর, বুঝি আর কিছুই সেরূপ নহে।

রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র

রাজরত্ন শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

আমরা হিন্দু, আমাদের কাছে রাজা নামে একটা বড়ই মোহ রাছে, রাজা নাম আমাদের কাছে বড়ই প্রিয়, বড়ই শ্রুতিমধুর। প্রজারা রাজার নিকট হইতে যাহা পায় বা পাইবার আশা করে, তাহা অপর কোনরূপ শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে পায় না। রাজতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসনতন্ত্র প্রায়ই যন্ত্রের মত চালিত, কতকগুলি নিয়ম-কানুন বাঁধা আছে, সকলকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। যিনি শাসক তাঁহাকেও মানিতে হইবে, আবার যাঁহারা শাসিত হইতেছেন—তাঁহাদেরও মানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বাঁধা-ধরা যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত চলায় নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তাহাতে প্রজাদের মন উঠে না, তাহারা অসন্তুষ্ট হয় ও চঞ্চল হয়, এবং এই চাঞ্চল্যের জন্য রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়।

এইরূপ যন্ত্রের মত কাজ করা ছাড়াও রাজার অন্যান্য পালনীয় অনেক জিনিষ আছে, যাহা অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্রে দেখা যায় না। সেকালে হিন্দুদের নিকট রাজা —"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" আবার হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় সৃষ্টি, রক্ষণ ও ধ্বংসের একমাত্র অধিকারী। রাজার বাস্তবিক যে কি কাজ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মালাকারের সহিত তুলনা করিয়া তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই শুনি —

> উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্
> চিন্বন্ লঘূন বর্দ্ধয়ন্
> অত্যুচ্চান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্
> বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
> ক্রূরান্ কণ্টকিনান্ বহির্নিরসয়ন্
> ম্লানান্ পুনঃ সেচয়ন্
> মালাকার ইব প্রপঞ্চচতুরো
> রাজা চিরং নন্দতি॥

"রাজা মালাকালের মত নানাপ্রকার কার্য্যপ্রপঞ্চ দেখাইয়া থাকেন। যদি কেহ উৎখাত হইয়া থাকে, তাহাকে তিনি পুনরায় রোপণ করেন; যদি কেহ কুসুমিত হইয়া থাকে, তাহার নিকট হইতে পুষ্প-চয়ন করেন; যদি কেহ ছোট অবস্থায় থাকে, অবস্থানুযায়ী তাহাকে বড় করিয়া দেন; যদি কেহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তাহাকে তিনি নামাইয়া দেন; যদি কেহ অবনত হইয়া যায়, তিনি তাহার অভ্যুদয় সাধন করেন; যদি অনেকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন করেন; অত্যন্ত ক্রূর ও কণ্টকিদিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন; এবং পরিম্লানিত ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল আশা-বারি সেচনে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।

এইরূপ রাজাই আমাদের আদর্শ রাজা, রাজা আবার সকলেই সমান ন'ন, কিন্তু সে সকল রাজাদের কথা এখানে বলিতেছি না। উদ্দেশ্য এই যে, রাজার এই সকল প্রকারের কার্য্যপ্রপঞ্চ অপর কোনরূপ যন্ত্রচালিত শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া যাইতে পারে না, তাহাই দেখানো।

উৎকট প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবে আমাদের প্রাচীন আদর্শ যে রাজতন্ত্র তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। তাই পুরাতন সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে রাজতন্ত্র ও অন্যান্য প্রকার শাসনতন্ত্রের পার্থক্য একবার দেখাইবার চেষ্টা করিব। তবে গোড়াতে এ-কথা বলিয়া রাখার দরকার যে, কি রাজতন্ত্র, কি প্রজাতন্ত্র, কি অন্যপ্রকার শাসনতন্ত্র—কোনোটাই একেবারে দোষবর্জ্জিত নহে। এবং এ-বিষয়ে এমন কোনো শাসন-ব্যবস্থা থাকিতেই পারে না, যাহা সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত হইবে। কারণ পৃথিবীতে কোন জিনিষই আদর্শরূপে দেখা যায় না, তবে আমাদের বুদ্ধিশক্তিতে আমরা

একটা আদর্শ কল্পনায় আনিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি না। কারণ, এই অনিত্য সংসারের ইহাই আসল স্বরূপ।

পাটনার বিখ্যাত বিদ্বান এবং কৌঁস্থলী মিঃ কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল সাহেব হিন্দু রাজনীতি শাস্ত্রের উপর একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক হইতে দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতে নানা প্রকার শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ সকল প্রকার শাসনতন্ত্রকেই এক একবার চালাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল শাসন-প্রথা নানা নামে পরিচিত ছিল। কাহাকেও বলিত ভৌজ্য, কাহাকেও বলিত স্বারাজ্য, কাহাকেও বা বৈরাজ্য, রাষ্ট্রিক, দ্বৈরাজ্য, উগ্র, আয়ুধজীবি বা রাজন্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করিত। তাহাতে দেখি, রাজ-প্রধান, আমলা-প্রধান ও কুলীন-প্রধান এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাসন প্রথাই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এক রাজপ্রধান তন্ত্র ছাড়া আর কোনটিই চলে নাই, এবং কোন দিগ্বিজয়ী রাজনীতি শাস্ত্রকার তাহা চালাইতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় রাজপ্রধানতন্ত্রে যে সকল দোষ ছিল তাহা অপেক্ষা অন্যগুলিতে বেশী দোষ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই শেষোক্ত তন্ত্রগুলি বেশীদিন আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে নাই। নহিলে এইগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিবার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল শাসনতন্ত্র পৃথিবীতে অব্যবহার্য্য বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যাহা কালবশে আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই দুই-একটি বর্ত্তমানযুগে চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে; বিলাতে তাহা চলিতেছে এবং আমাদের দেশেও যাহাতে এই সকল অব্যবহার্য্য প্রথা চলিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বত্র একটি ধূয়া উঠিয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা সম্পূর্ণ ভবিষ্যতের গর্ভে; এখন শেষ কথা কাহারও বলিবার অধিকার নাই এবং ভবিষ্যতে এই সকল প্রথানুযায়ী শাসনতন্ত্র চালাইলে দরিদ্র প্রজাদের যে কি হইবে, সুখ হইবে কি তাহারা দুঃখের অতল জলে ডুবিবে, তাহা একমাত্র পরমাত্মাই বলিতে পারেন। তবে ইতিহাস যদি দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধূয়া দেশে নানা প্রকার উঠে কিন্তু বাজে জিনিষ কখনই টিকে না।

প্রাচীন নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা রাজতন্ত্র ছাড়া অপর সকল প্রকার শাসন-প্রথাকেই অবজ্ঞা করিয়াছেন। গরুড়পুরাণোক্ত—নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—

অরাজকে ন বস্তব্যং তথা চ বহুনায়কে।
স্ত্রীরাজকে ন বস্তব্যং তথা চ শিশুনায়কে॥

(অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ৬২)

"যে রাজ্যে রাজা নাই সেখানে বাস করিবে না; যেখানে বহুলোক কর্ত্তা, সেখানেও না; যেখানে স্ত্রীলোক বা শিশু কর্ত্তা সেখানেও বাস করিবে না।"

যেখানে রাজা না থাকে সে রাষ্ট্রের নানারূপ বিপত্তি হইয়া থাকে। অরাজতন্ত্রে প্রজাদের যে কিরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা মহাভারত হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লেখে—

অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্ম্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে।
পরস্পরং চ খাদন্তি সর্ব্বথা ধিগরাজকম্॥

(অধ্যায় ৬৬, শ্লোক ৩)

"যে রাজ্যে রাজা নাই তথায় লোকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বথা অরাজক তন্ত্রকে ধিক্।"

নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ত্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূণ্ বিষহতে যুধি॥

(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৪)

"যে জনপদে রাজা নাই সেখানে শাসনের শৃঙ্খলা থাকে না এবং সেরূপ রাজ্যের সেনা যুদ্ধে শত্রুদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না।"

বিপালাশ্চ যথা গাবো যথা চাতৃণকং বনম্।
অজলাশ্চ যথা নদ্যস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৯)

"যে রাষ্ট্রে রাজা থাকে না সেখানকার প্রজাদের অবস্থা পালকবিহীন গাভীর ন্যায়, তৃণহীন বনের ন্যায়, অথবা জলহীন নদীর ন্যায় হইয়া থাকে।"

হরেয়ুর্বলবন্তোঽপি দুর্বলানাং পরিগ্রহান্।
হন্যুর্ব্যাযচ্ছমানাংশ্চ যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৪)

"যেখানে রাজার দ্বারা প্রজারা পালিত না হয়, সেখানে যাহারা বলশালী তাহারা দুর্ব্বলের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া থাকে, এবং যদি সে বাধা দেয় তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।"

যানং বস্ত্রমলঙ্কারান্ রত্নানি বিবিধানি চ।
হরেয়ুঃ সহসা পাপা যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৬)

"যেখানে রাজা প্রতিপালন না করেন, সেখানে দুষ্ট লোকে অপরের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং বিবিধ রত্নাদি জোর করিয়া অপহরণ করিয়া থাকে।"

পতেদ্বহুবিধং শস্ত্রং বহুধা ধর্ম্মচারিষু।
অধর্ম্মঃ প্রগৃহীতঃ স্যাদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৭)

"যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মচারী লোকের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রাদি বর্ষিত হয় এবং চারিদিকে অধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে।"

বধবন্ধপরিক্লেশো নিত্যমর্থবতাং ভবেৎ।
মমত্বং চ ন বিন্দেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৯)

"যদি রাজা পালন না করেন তাহা হইলে ধনী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই বধ ও বন্ধনাদি দ্বারা পীড়িত হন এবং আমার বলিতে তাঁহাদের কিছুই থাকে না।"

ন যোনিদোষো বর্ত্তেত ন কৃষির্ন বণিক্‌পথাঃ।
মজ্জেদ্ধর্মস্ত্রয়ী ন স্যাদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২১)

"যদি রাজা না পালন করেন তাহা হইলে জন্মগত পার্থক্য উঠিয়া যায়, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়, ধর্ম্ম ডুবিয়া যায় এবং ত্রয়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

ন লভেদ্ধর্মসংশ্লেষং হতবিপ্রহতো জনঃ।
হর্ত্তা স্বস্থেন্দ্রিয়ো গচ্ছেদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৭)

"যদি রাজা পালন না করেন, প্রজাদের মধ্যে যাহারা হত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহারা বিন্দুমাত্র ন্যায় বিচার পায় না; যে আঘাত করে সে বিনা শাস্তিতে সুস্থ ইন্দ্রিয়ে পলায়ন করে।"

অনয়াঃ সংপ্রবর্ত্তেরন্ ভবেদ্বৈ বর্ণসঙ্করঃ।
দুর্ভিক্ষমাবিশেদ্রাষ্ট্রং যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৯)

"রাজা পালন না করিলে চতুর্দ্দিকে অনীতির প্রবর্ত্তন হয়, বর্ণ-সঙ্করের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ প্রবেশলাভ করে।"

উপরে লিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, রাজহীন রাষ্ট্র বাসের একেবারে অযোগ্য এবং সেরূপ জনপদে প্রজাদের বিপদ লাগিয়াই থাকে। অতএব যেখানে রাজা নাই সে রাজ্যে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও নাই, কোনরূপ সমাজবন্ধন নাই এবং শৃঙ্খলাও নাই। প্রজাতন্ত্র একপ্রকার রাজহীন শাসনতন্ত্র এবং তাহাতেও বিপদের সম্ভাবনা ঠিক যেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ। কারণ, মহাভারতে দেখিতে পাই প্রথমে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু যখন দেখা গেল প্রজাতন্ত্র সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে অক্ষম তখন রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল। রাজ-তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে বর্ণিত বিবরণ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

নিয়তস্ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্ব্বমশেষতঃ।
যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৩)

"হে নরব্যাঘ্র! পূর্ব্বে কৃতযুগে কিরূপে রাজতন্ত্র

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।"

নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
ধর্ম্মেণৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৪)

"তখন রাজ্য ছিল না, রাজা ছিল না, দণ্ড ছিল না এবং দণ্ড বিধাতা কেহ ছিল না। প্রজারা সকলে পরস্পরে নিয়মবদ্ধ হইয়া পরস্পরের রক্ষাবিধান করিত।"

পাল্যমানাস্তথান্যোহন্যং নরা ধর্ম্মেণ ভারত।
দৈন্যং পরমুপাজগ্মুঃ ততস্তান্ মোহ আবিশৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৫)

"হে ভরত বংশোদ্ভব! এইরূপ ভাবে পরস্পরের পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে বিপত্তি দেখা দিল এবং তাহারা মূঢ়তার পরিচয় দিতে লাগিল।"

তে মোহবশমাপন্না মনুজা মনুজর্ষভ।
প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্ম্মস্তেষামনীনশৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৬)

"হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তাহারা এইরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করার জন্য এবং তাহাদের নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধ হওয়ায় তাহাদের নিয়মাবলী নষ্ট হইয়া গেল।"

অগম্যাগমনং চৈব বাচ্যাবাচ্যং তথৈব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চ রাজেন্দ্র দোষাদোষং চ নাত্যজন্॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ২০)

"তাহারা অগম্যাগমন, রূঢ়ভাষণ, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং নানাপ্রকার অপরাধ হইতে বিরত থাকিতে পারিল না, (এবং তাহাদের সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল)।"

শান্তিপর্ব্বের আর একটি জায়গায় এই বিবরণ একটু অন্যভাবে দেওয়া আছে। তাহাতেও দেখা যায়, সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রই প্রচলিত ছিল এবং প্রজারা কিরূপে আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত, কিরূপে তাহাদের মধ্যে প্রথম আইন তৈয়ারী হইল, এবং কিরূপে পরে আইনগুলি লোকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার জন্য নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, এই সকল বৃত্তান্ত কয়েকটি শ্লোকে অতি বিশদভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রজাতন্ত্র কিরূপে সমাজ-রক্ষণে অসমর্থ হইয়াছিল তাহা শান্তিপর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। প্রজাতন্ত্রের অবসানে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিরূপে রাজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্তও শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ করা আছে। অতি প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৭)

"আমরা শুনিয়াছি কিরূপে রাজহীন প্রজারা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা জলে বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খাইয়া ফেলে, সেইরূপ আপনাদের মধ্যে একে অপরের ধ্বংস-বিধান করিয়াছিল।"

সমেত্য তাস্ততশ্চক্রুঃ সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।
বাক্‌শূরো দণ্ডপরুষো যশ্চ স্যাৎপারদারিকঃ।
যশ্চ নঃ সময়ং ভিন্দ্যাৎ ত্যাজ্যা নস্তাদৃশা ইতি॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৮-১৯)

"আমরা শুনিয়াছি তাহারা একত্র মিলিত হইয়া কয়েকটি নিয়ম তৈয়ারী করিয়াছিল; অর্থাৎ, যাহারা পরুষভাষী, যাহারা আঘাতকারী, যাহারা পরদারাসক্ত এবং যাহারা তাহাদের নিয়মভঙ্গ করিবে তাহাদের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

বিশ্বাসার্থং চ সর্ব্বেষাং বর্ণানামবিশেষতঃ।
তাস্তথা সময়ং কৃত্বা সময়েনাবতস্থিরে॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৯)

"চারিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মনে প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য তাহারা এইরূপ নিয়ম তৈয়ারী করিয়া পরে সেইরূপ নিয়ম অনুযায়ী চলিতে লাগিল।"

সহিতাস্তাস্ততো জগ্মুরসুখার্ত্তাঃ পিতামহম্।
অনীশ্বরা বিনশ্যামো ভগবন্নীশ্বরং দিশ।
যং পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২০-২১)

"পরে (যখন নিয়মভঙ্গ হওয়ায় অশান্তি হইতে লাগিল) তাহারা বিশেষ অসুখী হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমরা রাজাবিহীন হইয়া বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আপনি আমাদের একজন প্রভু দিন। তাঁহাকে আমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিব এবং তিনি আমাদের প্রতিপালন করিবেন।"

উপরি লিখিত বিবরণটি চুম্বকভাবে মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায় এবং ইহা হইতেও রাজার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। মনুতে আছে—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য লোকস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

(অধ্যায় ৭, শ্লোক ৩)

"যখন পৃথিবীতে রাজা থাকে না তখন সকলে য়াতঙ্কে অস্থির হয়। ভগবান সেইজন্য সকলের রক্ষার্থে াজাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বেশ ভালভাবে তুলনা করিলে খা যায়, প্রজাতন্ত্রে এরূপ একটি বিশেষ দোষ আছে াহা রাজতন্ত্রে পাওয়া যায় না। এবং এই একটি াষ এতই সাঙ্ঘাতিক যে, সেই একটি কারণের জন্য জাতন্ত্রের সাফল্য-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। সেটি ন্ত্রগুপ্তির অভাব। এই মন্ত্রগুপ্তির অভাব প্রজাতন্ত্রে রূপ বিশদভাবে প্রকাশ পায়, রাজতন্ত্রে সেইরূপ ওয়া সম্ভব নহে। রাজ্যের যাহা কিছু কার্য্য, যাহা ছু করণীয়, যেমন যুদ্ধযাত্রাদি, প্রথমে বিশেষ াপনে রাখিতে হয়। যদি তাহা অসময়ে প্রকাশ য়, তাহা হইলে রাজ্যের সমূহ বিপদ এবং প্রভূত তি হইতে পারে। রাজ্যের যাহা কিছু গোপনীয় র্য্য তাহাকেই মন্ত্র বলিয়া থাকে। যাহাদের হাতে ত্র সুরক্ষিত থাকে তাহাদিগকে মন্ত্রী বলে, মন্ত্রগোপ্তাও লে। তাহারা মন্ত্ররক্ষণ করে এবং গোপন রাখে লয়াই মন্ত্রী বা মন্ত্রগোপ্তা তাঁহাদের বলা হয়। জাতন্ত্রে গুপ্তি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না, কারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজারাই কর্ত্তা, তাহাদের অনুমতি ভিন্ন কোন বড় কার্য্য তাহাদের প্রতিনিধিরাও করিতে পারেন না। কাজেই যখন যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, তাহা প্রতিনিধি-সভায় উত্থাপন না করিলে উপায় নাই; সেইজন্য এই সকল গুরুতর ব্যাপার গোপন থাকে না এবং শত্রুতে সেই সকল খবর পাইয়া বিপদ আনয়ন করে এবং রাজ্যের ভিতরও প্রতিবাদীর দল ক্ষেপিয়া উঠে। ইহাতে শৃঙ্খলার সমূহ ক্ষতি হয়, সেনানাশ ও অর্থনাশও সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ঘটিতে পারে। এই সম্বন্ধে গুটিকতক শাস্ত্র হইতে প্রমাণ নীচে উদ্ধৃত করিব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে নীতিবিদেরা মন্ত্রভেদকে কিরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং মন্ত্রভেদে দেশের কি ভয়াবহ ক্ষতি হইতে পারে।

মন্ত্রমূলমিদং রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাদ্যথাঽস্য ন বিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, আচারাধ্যায়, শ্লোক ৩৪৪)

"রাজ্যের মূল মন্ত্রে নিহিত, অতএব মন্ত্র এরূপভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে যে, যতদিন তাহা না ফলীভূত হয় ততদিন যেন কেহ জানিতে না পারে।"

মন্ত্রমূলং সদা রাজ্যং তস্মান্মন্ত্রঃ সুরক্ষিতঃ।
কর্ত্তব্যঃ পৃথিবীপালৈর্মন্ত্রভেদভয়াৎ সদা॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ৬৫, শ্লোক ৩৫)

"সদাই রাজ্য মন্ত্রমূল; সেইজন্য রাজারা মন্ত্র সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন এবং দেখিবেন যেন মন্ত্রের প্রচার অসময়ে না হয়।"

মন্ত্রবৎসাধিতো মন্ত্রঃ সঙ্ঘাতানাং সুখাবহঃ।
মন্ত্রচ্ছলেন বিনষ্টা বহবঃ পৃথিবীক্ষিতঃ॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ৬৫, শ্লোক ৩৬)

"যে মন্ত্র ঠিক মন্ত্রের ন্যায় সাধিত হয়, তাহা জনসমূহের হিতজনক হইয়া থাকে। দুর্ম্মন্ত্রের সাধনা করিয়া অনেক রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রাণি বহবঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্‌ভ্যাদ্বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রেষভ্যন্তরীকৃতাঃ।

মন্ত্রিরূপা হি রিপবঃ সম্ভাব্যাস্তে বিচক্ষণৈঃ ॥

(রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, অধ্যায় ৬৩, শ্লোক ১৪)

"যদি একবারও পরামর্শ লওয়া হয়, শাস্ত্র না জানিয়া অনেক পশুবুদ্ধির মানব প্রগল্‌ভতা বশতঃ রাজকার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিচক্ষণেরা তাঁহাদিগকে মন্ত্রিরূপে দেশের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবেন।"

ন চ মূর্খৈর্ন চানাপ্তৈস্তথা নাধার্মিকৈর্নৃপঃ।

মন্ত্রং তু স্বদিতং কুর্য্যাত্তেন রাষ্ট্রে ন ধাবতি॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, খণ্ড ২, অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ২১)

"রাজা কখনও মূর্খকে, অবিশ্বাস্য ব্যক্তিকে, অধার্ম্মিককে মন্ত্রের আস্বাদন দিবেন না। এইরূপ অযোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিলে সে মন্ত্র রাষ্ট্রের অজ্ঞাত থাকে।"

রাজ্ঞাং বিনাশমূলন্তু কথিতো মন্ত্রবিভ্রমঃ।

নাশহেতুর্ভবেন্মন্ত্রঃ কুপ্রযুক্তস্তু মন্ত্রবৎ॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ২২)

"মন্ত্র-বিষয়ক প্রমাদই রাজাদের বিনাশের মূলীভূত কারণ। যদি মন্ত্র কুপ্রযুক্ত হয় তাহা হইলে দুষ্ট মন্ত্রজপের ন্যায় তাঁহাদের নাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।"

মন্ত্র বিষয়ে এই কয়েকটি শ্লোকের উপর টীকা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রজাতন্ত্রে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং অতি গোপনীয় কার্য্য তাহা অতি প্রকাশ্য সভায় বিবেচিত হইয়া থাকে, কারণ, তাহাতে প্রতিনিধিদের মত থাকা চাই। কোন দরকারী এবং ভাল কার্য্যও প্রতিনিধিরা কোন কারণে সমর্থন না করিলে, করিবার যো নাই। তাহা ছাড়া মতানৈক্য ত' আছেই, দল বাঁধা-বাঁধিও আছে। কার্য্য যে দলের মনোমত হইল না, তাঁহারা চটিয়া রহিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, এবং প্রায়ই পূর্ব্ব প্রতিনিধি যাহা করিয়াছেন তাহা উল্টাইতে লাগিলেন। ইহাতে রাজ্যের প্রগতি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কয়েকজন লোকের হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়; তাহাদিগকে নীচে নামাইবার কোন লোক থাকে না। যদি কেহ তাহাদের কুনজরে পড়ে তাহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে হয়।

রাজতন্ত্র সেই হিসাবে অনেক ভাল। রাজা তাঁহার রাজপ্রাসাদে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দেশ ও অভিজ্ঞতা অনুসারে রাজপ্রাসাদের গভীর নির্জনতায় রাজারই ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিও প্রজার ন্যায় ক্ষুদ্র না হইয়া রাজারই ন্যায় বিশাল হয়, সেইরূপ হৃদয়ও বিশাল হয়। ভোগে ও ব্যায়ামে তাঁহার শরীর শক্ত ও কর্ম্মঠ হয়; রাজশক্তি ও উৎসাহশক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং তাহা প্রজার কল্যাণের কার্য্যেই সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়। তাঁহার নিকট সকল প্রজাই সমান, কেহ ছোট, কেহ বড় নহে। তাঁহার একমাত্র চিন্তা কিসে রাজ্য বিস্তৃত হয়, কিসে রাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিসে প্রজারা সুখী হয় ও শান্তিতে থাকে। তাঁহার কল্পনা রাজারই ন্যায় বড়, তাঁহার কার্য্য বিশাল, তাঁহার হাতে শক্তি ও সামর্থ্য কার্য্যের অনুরূপে বিশাল এবং সেইজন্য তাঁহার কার্য্য ফলীভূত হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রজা যদি রাজার সিংহাসনে বসে, তাহা হইলে রাজ্যের বিশাল কার্য্য তাহার নগন্য ক্ষুদ্র মন দিয়া করিবার যোগ্যতা কোথা হইতে আসিবে?

তবে একটা কথা, রাজতন্ত্রে রাজা যদি ভাল হ'ন তাহা হইলেই প্রজার সুখ। রাজা যদি অত্যাচারী ও উৎপীড়ক হ'ন তাহাতে প্রজাদের অশেষ দুঃখ। এই জন্য প্রাচীন রাজনীতিবিদেরা অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং কি করিয়া রাজার অপ্রতিহত রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। রাজার প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের একটা বিধান ছিল; তিনি যাহাতে অধর্ম্ম না করেন, অত্যাচার না করেন, সেই জন্য নানারূপ নিয়

বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং যাহাতে মন্ত্রি-পরিষদের হাত দিয়া রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এককালে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র ভারতবাসীদের সুখ ও শান্তি দিয়াছিল এবং তাহার সাফল্যে জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল।

রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা দরকার, রাজা মন্ত্রি-পরিষদকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন কি-না এবং মন্ত্রি-পরিষদ রাজাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন কি-না, অর্থাৎ কোন একটি অন্যায় হুকুম করিতে রাজা ভীত হ'ন কি-না, কিংবা কোন অন্যায় হুকুম প্রতিপালন করিতে মন্ত্রি-পরিষদ বাধা দিতে পারেন কি-না। যদি রাজা অন্যায় হুকুম দিতে ভীত হ'ন এবং মন্ত্রি-পরিষদের সভ্যেরা অন্যায় হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করেন, তখনই বুঝা দরকার যে, সেই শাসনতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শুনা যায়, অশোক রাজার মন্ত্রী রবিগুপ্ত রাজার কয়েকটি বৌদ্ধবিহারে দেওয়া অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জুনাগড়ের রাজা রুদ্রদামনের মন্ত্রি-সভা সুদর্শন সরোবরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার মেরামতের টাকা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন নিজের পকেট হইতে বিস্তর টাকা খরচ করিয়া সেই সরোবর মেরামৎ করাইয়া দেন। ইহাকেই বলে রাজতন্ত্র অথবা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র। প্রাচীন রাজনীতিবিশারদেরা কখনও রাজার উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করেন নাই, বরং তাঁহার শক্তি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত প্রণালী ধরিয়া সাফল্য লাভে সমর্থ হয় তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিভিন্ন দেশের সমাধির কথা

শ্রীকনক রায়

মৃত্যুর হাত এড়াবার সামর্থ্য আমাদের কারো নেই। তাই এই অপরিহার্য্য জিনিসটা নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনারও অন্ত নেই। কোনো জিনিসের একটা সীমা-রেখা টান্‌তে মানুষ সহজে রাজি হয় না। যে জীবনকে ঘিরে পৃথিবীর সব রকমের সুখ-দুঃখের ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে ওঠে মৃত্যুর পর তার আর কিছুই থাক্‌বে না—এ কল্পনাও মানুষের কাছে অসহ্য। তাই মৃত্যুর পরেও একটা কাল্পনিক জীবনের জের টেনে চল্‌বার ধারণা গ'ড়ে উঠেছে প্রায় সব দেশেই, সব সমাজেই এবং এই পারলৌকিক জীবনের কল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবতঃ বিভিন্ন রকমের সমাধি-প্রথার।

তা ছাড়া এই প্রথাগুলোর সঙ্গে হয়তো স্থানীয় আবহাওয়ারও খানিকটে সম্বন্ধ আছে। যে জল-হাওয়ায় মৃতদেহের যে রকমের ব্যবস্থা কর্‌লে দেশের স্বাস্থ্যের হানি না হয়, হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেইদিকে লক্ষ্য গিয়েছে মানুষের মনের এবং সৎকার-ব্যবস্থাটাও গ'ড়ে উঠেছে কতকটা সেই অনুসারেই। মিশরে মৃতদেহকে মমি ক'রে রাখা হয়। এ পদ্ধতির মূলেও এই রকমেরই একটি হেতু আছে ব'লে অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন। মিশরের মরুভূমির শুষ্ক আবহাওয়ায় মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় না — এই সহজে নষ্ট-না-হওয়া থেকেই, নষ্ট যাতে কিছুতেই না হ'তে পারে তারই পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টার উদ্ভব। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের ভিতর দিয়েই তারপরে উদ্ভব হয়েছে হয়তো এই ধারণার যে, সব মানুষেরই যখন দেহের উপরে সত্যিকারের একটা লোভ আছে, তখন তার

আত্মারও দেহের উপর লোভ থাকা অসম্ভব নয় এবং দেহের উপর যখন আত্মার লোভ আছে তখন যদি কবরের ভিতরে দেহটাকে ধ্বংসের হাত হ'তে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে আত্মাও এসে আবার সেই দেহের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

পেরুর জল-হাওয়ার অবস্থা মিশরের জল-হাওয়ারই অনুরূপ। তাই সেখানেও গ'ড়ে উঠেছে মিশরের মতো মৃতদেহ দিয়ে মমি করবার প্রথা। এই ভাবে পেরুতে মমির ভিতর দিয়ে মৃত দেহের ধ্বংস যখন বন্ধ হ'লো, তখন আবার সুরু হ'লো সেই মমি নিয়ে

দক্ষিণ রোডেসিয়ার কোনো পাহাড়ে অঙ্কিত মমির চিত্র।
[চিত্রটি প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের। এই চিত্র হ'তে প্রমাণ হয়, সেই প্রাচীনতম যুগেও রোডেসিয়াতে মমি করবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। মাঝের বড় মূর্ত্তিটি একজন রাজার। জানোয়ারের চর্ম্মে দেহটি ঢাকা—মাথায় সিংওয়ালা মুখোস। নীচের মূর্ত্তিটি তাঁর রাণীর।]

উৎসবের ব্যবস্থা। পেরুর অনেক পরিবারে উৎসবের সময় তাই পূর্ব্বপুরুষের মৃত দেহটা বা'র ক'রে আনা হয় এবং কখনো কখনো তা নিয়ে তারা শোভা-যাত্রাও ক'রে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মৃতদেহকে যারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তারা বাঁচিয়ে রাখে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একান্ত মমতাবশতই। মানুষের দেহটাই মানুষের কাছে তার জীবনের প্রতীক। আর সেইজন্যই জীবনশূন্য দেহটার মায়াও মানু কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। ফোটো তৈরী ক'রে তা প্রিয়জনের চেহারাটা সে চোখের সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌ চায়, মৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সাহায্যে য টিকিয়ে রাখা যায় তারও চেষ্টার সে কসুর করে না

প্রিয়জনের সমগ্র দেহের উপরে মানুষের এ যে মোহ তার অর্থ সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু দে থেকে একটা অঙ্গকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপরে ঝোঁক দেওয়ার ভিতরে যে রহস্য আছে, তার অর্থ অত সহজে বোঝা যায় না। অথচ এ রকমের ব্যাপারও ঘটে থাকে অনেক দেশে। কতকগুলো দেশে মৃতদেহের এক একটা অঙ্গের প্রতি অতিরিক্ত রকমের মমতা দেখানো হ'য়ে থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা (Maori) তাদের দলপতির মৃত্যুর পর তার মাথাটা কেটে রেখে দেয়। বড় বড় উৎসবের সময় এই মাথাটা তারা বা'র ক'রে আনে—এবং তখন একদফা চলে আবার তাদের শোকের সমারোহ। অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অতি প্রাচীন অসভ্যদের ভিতরেও কতকটা এরই অনুরূপ একটা প্রথা বর্ত্তমান আছে। সেখানে মা তার মৃত শিশু-পুত্রের অঙ্গের কোনো একটা অংশ নিজের সঙ্গে রেখে দেন। আন্দামানের অধিবাসীদের প্রথা আরো বিচিত্র। তারা মৃত আত্মীয়-স্বজনের হাড় দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরে। বর্ত্তমান সভ্যজাতিদের ভিতরেও, ঠিক এতখানি না হোক্, কতকটা এই ধরণের একটা প্রথা আছে। মৃত প্রিয়জনের চুলের একটা গুচ্ছ কেটে নিয়ে অনেকে 'লকেটের' ভিতর পুরে দেহের সঙ্গে ধারণ করেন।

পূর্ব্ব আফ্রিকার কতকগুলি জাতির ধারণা যে, কেবল রাজ-রাজড়ারাই মৃত্যুর পরেও জীবনের জের টেনে চলে। সেইজন্যে যারা সাধারণ লোক তারা আর কোনো রকম সংকারের সৌভাগ্য লাভ করে না—তাদের দেহ ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়, পশু-পক্ষীদের আহার হবার জন্য। অধিকাংশ

আদিম জাতিরই বিশ্বাস যে, মানুষের মৃত্যুর পরের জীবনও ঠিক এইখানকার জীবনের মতোই, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও রাজ-রাজড়া যাঁরা, তাঁরা রাজ-রাজড়াই থাকেন এবং সাধারণ লোক যারা, তারা থাকে সাধারণ লোকের মতো। এই ধারণার ফলে আদিম যুগের কোনো কোনো জাতির ভিতর রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাণী ও অনুচরবর্গকেও তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুকে বরণ করতে হ'তো। পরলোকে রাজার সেবা-শুশ্রূষার ভোগ-বিলাসের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য তাঁর মৃতদেহের সঙ্গেই সমাহিত করা হ'তো এদের মৃতদেহও। প্রাচীন জাপানেও এই প্রথাটার প্রচলন ছিল। মিকাডোর মৃত্যুর পর তাঁর অনুচরগণকে জোর ক'রে সমাহিত করা হ'তো তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পৃথিবীতে সভ্যতার উদ্বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থার বীভৎসতাও ধরা পড়ল তাদের কাছে। তাই পরবর্তী যুগে দেখা যায়, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষকে জোর ক'রে সমাহিত করার পরিবর্তে মাটি দিয়ে মানুষের মূর্তি গ'ড়ে তাই সমাহিত করা হচ্ছে রাজার সমাধিতে তাঁর মৃত দেহের সঙ্গে।

মৃত দেহের সহিত জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমাহিত করার প্রথাও দুনিয়ার বহু আদিম জাতির ভিতরে লক্ষিত হয়। মিশরে এই প্রথাটা একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তুতানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায়—জীবন-যাত্রার চেয়ে ঢের বেশী আড়ম্বরের সঙ্গে তিনি করেছিলেন তাঁর মরণ-যাত্রা। পোষাক-পরিচ্ছদ, যান-বাহন, খাট-পালঙ্ক, আহার-বিহারের অজস্র উপকরণে তাঁর সমাধি কক্ষটা ভরপুর হ'য়ে ছিল। মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মার উপভোগের জন্য এই সব জিনিসের প্রয়োজন—এই কল্পনা থেকেই যে এসব জিনিস মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো জাতি আবার মৃতদেহের সঙ্গে দামী জিনিসপত্র সব ভেঙে ভেঙে সমাহিত করে। নিউগিনিতে কবরের ভিতর এই ধরণের ভাঙা জিনিসপত্র রক্ষিত হবার বহু নিশানা পাওয়া যায়। জিনিসপত্রগুলো ভেঙে দেওয়া হয় কেন তা একটা সমস্যার বিষয়। সম্ভবত প্রথাটার উদ্ভব হয়েছে এই ধারণা হ'তে যে, মৃত আত্মার ব্যবহারে লাগ্‌বার যোগ্যতা যে সব বস্তু আস্ত এবং অবিকৃত আছে তাদের নেই। সুতরাং মৃত আত্মার সেবার জন্য জিনিস-পত্রগুলিকে ভেঙে ফেলে তাদের আত্মাকেও মুক্ত ক'রে দেওয়া দরকার।

এঙ্গোলা পর্ত্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার একটা স্থান। সেখানে কোনো বড় লোকের মৃত্যু হ'লে তাঁর কবরের চার ধারে চারটি ছাতা খোলা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। তা ছাড়া বাসন-পত্র ভেঙে কবরে ছড়িয়ে দেওয়ার রেওয়াজ সেখানেও আছে। ভাঙার উদ্দেশ্য

ওরামাঙ্গারা গাছের উপরে মৃতদেহের সমাধি দিচ্ছে।

উই-এর ঢিপিতে মৃত ওরামাঙ্গের হাড়ের সমাধি।

ও কবরের ভিতরে রাখার উদ্দেশ্য সেই একই—মৃত আত্মার কাজে লাগার উপযোগী ক'রে তোলা।

প্রাচীন চীনে মৃতদেহের সম্মান করবার একটি অদ্ভুত প্রথা ছিল। বাপ-মার মৃত্যুর পর ছেলে অজস্র অর্থ পুড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাত। প্রথাটা এখনও লোপ পায় নি। তবে এখন আর সত্যিকারের অর্থ পোড়ানো হয় না, কতকগুলো মেকি নোট পুড়িয়ে এই নিয়ম পালন করা হ'য়ে থাকে। বাপ-মা পরলোকে যাতে কষ্ট না পান, সেজন্য তাদের সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়াই হয়তো এর মূলের উদ্দেশ্য। সুতরাং

পরলোকের সুখও টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায়— এ রকমের একটা ধারণাও হয়তো ছিল প্রাচীন চীনাদের মনে।

অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অসভ্য জাতির ভিতরে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা আরো অদ্ভুত। স্বাভাবিক মৃত্যুকেই তারা মনে করে যাদুর কারসাজি। সুতরাং যখন ওরামাঙ্গাদের (warramunga) কোনো লোক এই ভাবে মারা যায় তখন প্রথমতঃ গাছের মাথায় সমাধিস্থান তৈরী ক'রে সেইখানে তারা তাকে সমাহিত করে। গাছে উঠে তার আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে আসে মৃতদেহটার। কোনো পাখী বা জন্তু তাকে আহার ক'রে যায় কি-না তার দিকেও লক্ষ্য রাখে। যে পাখী বা জানোয়ারকে তারা দেখে

ওরামাঙ্গারা হাড় নিয়ে শোভা-যাত্রা করছে।

শব-দেহটাকে আহার করতে সেই জানোয়ার বা পাখীকেই তারা মনে করে তার ছদ্মবেশী হত্যাকারী। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন শবদেহের ভিতর হ'তে মাংস ও চামড়া নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, হাড়গুলোই শুধু অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই হাড়গুলোকে নামিয়ে এনে উই-এর ঢিপির ভিতরে তারা দ্বিতীয়বার তার সমাধি দেয়। কেবল একখানা হাড় তারা নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এই হাড় নিয়ে করে তারা আত্মার মানবদেহে প্রত্যাবর্ত্তনের উৎসব। তারা বিশ্বাস করে— এই ধরণের উৎসবের ফলে মৃত আত্মা আবার ফিরে আসে—কেবল পুরুষ যারা তারা হ'য়ে আসে নারী, আর নারী যারা তারা হ'য়ে আসে পুরুষ।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি—তারা সভ্যই হোক্ আর অসভ্যই হোক্—মৃতদেহের সম্পর্কে সাধারণতঃ দুটি প্রথা অবলম্বন ক'রে থাকে—হয় তাকে পুড়িয়ে ফেলে, না হয় কবর দেয়। যারা মৃতদেহকে কবর দেয় তাদের দেহের প্রতি একটা গভীর মায়া আছে—তাই আগুনে পুড়িয়ে তারা তাকে ধ্বংস করতে পারে না। যারা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, অনেকে বলেন — তাদের সে প্রথার মূলে আছে ভূতের ভয়। মৃত আত্মা পাছে কোনো অনিষ্ট ক'রে — এই ভয়ে দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলে তারা নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। মতটি যে আংশিক সত্য তাতে হয়তো ভুল নেই। কিন্তু এ মত যে সর্ব্বত্র সত্য নয় তাতেও সন্দেহ নেই। হিন্দুদের শবদেহ পুড়িয়ে ফেলার ভিতরে ভূতের ভয় ততটা নেই যতখানি রয়েছে আত্মাহীন দেহের প্রতি তার মোহশূন্যতার ভাব। আত্মাই যদি চ'লে গিয়ে থাকে তবে সে দেহটার কোনো দামই নেই, তাকে যত্ন ক'রে রেখে দেবার কোনো সার্থকতাই নেই—এই ধারণা থেকেই হিন্দুরা শবদেহ পুড়িয়ে ফেলে। তা ছাড়া মৃত আত্মার কল্যাণের জন্যও তারা দাহ করে তাদের মৃতদেহকে। আত্মা দীর্ঘদিন যে দেহটার ভিতরে থাকে, হিন্দুরা মনে করে তার উপরেও আত্মার একটা টান থেকে যায়। তাই মৃতদেহটার চারপাশে আত্মা ঘুরতে থাকে মৃত্যুর পরেও। আত্মাকে এই মিথ্যা মোহের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও হিন্দুরা তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে ফেলে।

অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয় তাদের মৃতদেহের সম্পর্কে প্রায় সব দেশেই নানারকমের কুসংস্কার আছে। আত্মহত্যা ক'রে যারা মরেছে, যারা খুন হয়েছে, অথবা যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের দেহটা যে-কোনো রকমে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলার রীতি অধিকাংশ দেশে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। কিছুকাল আগেও আত্মহত্যাকারীকে ইউরোপে তেমাথা

বা চৌমাথার ধারে কবর দেওয়া হতো। আত্মহত্যা-কারীর আত্মা ক্রূর ও মানুষের পক্ষে অহিতকারী এই ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল এই প্রথাটার। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আত্মা পথ হারিয়ে ফেল্‌বে—যাদের সে হানি

হিন্দু-শবদেহের সৎকার।

কর্‌তে চায় তাদের বাড়ীর সন্ধান পাবে না—এর মূলে ছিল এমনি ধরণের একটা বিশ্বাস।

ব্রহ্মদেশে একটা কথা আছে—মানুষ মরে এবং ফুঙ্গিরা নির্ব্বাণ-লোক প্রাপ্ত হয়। তাই ফুঙ্গিদের শেষযাত্রা জয়যুক্ত কর্‌বার জন্য হাজার হাজার টাকা তারা ব্যয় করে। গন্ধ-দ্রব্যে তার দেহকে সিক্ত ক'রে রথে তুলে' দেওয়া হয়। রথের এই ব্যবহার তার জয়-যাত্রারই প্রতীক। তারপর সেই রথ এসে থামে মৃতদেহ রক্ষার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত একটা মন্দিরের কাছে। সৎকারের জন্য একটা দিন স্থির করা হয় এবং সেই দিনটি না-আসা পর্য্যন্ত এই মন্দিরের ভিতরেই থাকে ফুঙ্গির শবদেহ। প্রকাণ্ড তোরণ গড়া হয়। তারপর সৎকারের দিন উপস্থিত হ'লে মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির, তোরণ সমস্তই পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করা হয়।

শ্যামদেশের সমাধি-ব্যবস্থাটাও একটু বিচিত্র ধরণের; বিশেষত সেখানকার বড় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের। এই বিচিত্র পদ্ধতিটার পরিচয় পাওয়া যাবে কয়েক বছর পূর্ব্বে রাজা ষষ্ঠ রামের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যে সব রীতি-নিয়ম প্রতিপালিত হয়েছিল তার দিকে তাকালেই। একটি তাম্রাধারে কাঠের কফিনের ভিতরে সৎকারের পূর্ব্বে চারমাস এই মৃতদেহটি পূরে রাখা হয়েছিল। একটি লম্বা রেশমের তারের এক প্রান্ত রাজার মাথার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়, আর এক প্রান্ত থাকে সমাধি-মঞ্চের পাদদেশে একটি স্বুবর্ণ আধারের ভিতরে। পারলৌকিক-ক্রিয়ার সময় এই আধারে অবস্থিত তারের প্রান্তটি পুরোহিত গ্রহণ করেন নিজের হাতের ভিতরে।

নির্ব্বাণ পথ-যাত্রী ফুঙ্গির রথ ও সমাধি-ব্যবস্থা।

শ্যাম-বাসীদের বিশ্বাস এইভাবে পুরোহিতের সঙ্গে তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকায় উপাসনার প্রভাব সঞ্চারিত হয় মৃতদেহের ভিতরে।

দুনিয়ায় দূর-দূরন্তরের বহু জাতির সম্মিলন হ'য়েছে মানুষের জয়-যাত্রার স্পৃহার ভিতর দিয়ে। একদেশের লোক এসে জয় করেছে অন্যদেশের লোককে, তারপর সেখানে তারা আড্ডা গেড়ে বসেছে। এমনিভাবে মিশ্রণের ভিতর দিয়ে অনেক দেশে উদ্ভব হ'য়েছে একাধিক সমাধি-পদ্ধতির। ভারতবর্ষে তাই মৃতদেহকে কবরও দেওয়া হয়, দাহও করা হয়। এই ভাবেই মেক্সিকোর আজটেক (Aztec) সাম্রাজ্যেও দু'রকমের সমাধি-পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছিল। আজটেকরা ছিল সামরিক জাতি, সুতরাং মৃগয়ার দেবতা ছিলেন, তাদের দেবতা এবং তারা যাদের জয় করেছিল তারা ছিল কৃষি-প্রধান জাতি। তাদের দেবতা ছিলেন জলের যিনি অধিপতি অর্থাৎ বরুণ। বিজেতারা পোড়াত তাদের মৃতদেহ এবং বিজিত যারা তারা দিত কবর তাদের মৃতদেহের। এমনি ভাবে সেখানে গ'ড়ে উঠ্‌ল দু'টো স্বর্গও — একটা তাদের জন্য যারা শবদেহ পোড়ায়। এই স্বর্গের নাম হ'লো সূর্য্যালোক। আর একটা স্বর্গ গ'ড়ে উঠ্‌ল তাদের জন্য, যারা ডুবে মারা যেত অথবা শোথের মতো কোনো ব্যাধিতে ভুগে মারা যেত। এদের স্বর্গ হ'লো বৃষ্টি-দেবতার এলাকাভুক্ত। প্রাচীন রীতি অনুসারেই তারা কবরে সমাহিত করত তাদের মৃতদেহ।

মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান-সম্বন্ধে নানা দেশে নানা রকমের কল্পনা জট পাকিয়ে চলেছে মানুষের মনে। আর এই কল্পনার গতিকে মুক্তি দেবার জন্যই বিভিন্ন দেশে গ'ড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সৎকারের পদ্ধতি। কোনো কোনো স্থানে এ-সব পদ্ধতি এত বিচিত্র যে, তা মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কেবল তাই নয়, মৃতের প্রতি যে মায়ার পরিচয় এইসব পদ্ধতির ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় — তা জগতকে দুর্ল্লভ শিল্প-সম্পদেও সমৃদ্ধ করেছে। প্রিয়জনের কবর বা ভস্ম-স্তূপের উপরে চিরযুগের বিস্ময়ের বস্তু বহু সমাধি-স্তম্ভ গ'ড়ে উঠেছে। এইসব সমাধি-স্তম্ভের ভিতর দিয়েও এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, যে-অনশ্বর আত্মা স্বর্গে চ'লে যায় তার চেয়ে কম প্রিয় নয় মানুষের কাছে তার নশ্বর মৃতদেহটা। স্থূল মাটির মানুষ, স্থূল দেহটার মায়া কোনো যুগেই যে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি এবং কোনো যুগেই যে পারবে না, বিভিন্ন দেশের সমাধি-প্রথা ও সমাধি-স্তম্ভগুলি তারই মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৯

তারপর পূজোর ছুটিতে যখন সে ক'লকাতা গেল, তখন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে' গেল।

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে ব'সে সে প'ড়ছিল আর নোট ক'রছিল।

যখন শেষ ক'রে সে মুখ তুলে চাইলে তখন সে দেখতে পেল যে, তার সামনে ব'সে একটি মহিলা ঠিক তারই মত কতকগুলি বই নিয়ে প'ড়ছেন—ইকনমিক্সেরই সে সব বই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে সে চাইলে। বোধ হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে তাঁর—মাথার সামনের চুলগুলো পেকে গেছে। খুব শীর্ণ মুখ। মহিলাটি চোখ তুলে একবার চাইলেন—তাঁর চোখ দেখে মনে হ'ল চেনা-চেনা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে রবীন দেখে, মহিলাটি এবং তার সঙ্গী একটি পুরুষ সেই ট্রামেই উঠলেন।

এতক্ষণে একটা কথা খেয়াল হ'ল তার—সেই মহিলা যেখানে নেমে গেলেন রবীন সেখানে তাঁর পেছন পিছন নামলে। তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ব'ললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারি মশায়?"

লোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ফিরে চাইলে, ভাবলে, রবীন মাষ্টার এখনি ব'লবে যে, সম্প্রতি তার চাকরি গেছে, কিম্বা দেশে ফিরে যাবার পয়সা নেই, কিম্বা তিন দিন অনাহারে আছে, যেমন ক'লকাতায় প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় এমনি চেহারার লোকেদের কাছে।

রবীন যখন সে কথা না জিজ্ঞেস ক'রে, জিজ্ঞেস ক'রলে, "আপনার সঙ্গের মহিলাটির নাম জানতে পারি কি?" তখন যদিও ভদ্রলোকটির একটা উদ্বেগ কাটলো তবু এ প্রশ্নের স্পর্দ্ধায় সে অবাক হ'য়ে উগ্রস্বরে ব'ললে, "তাতে তোমার কি দরকার?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে রবীন মাষ্টার নিতান্ত কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'ললে, "ঠিক, বড্ড অপরাধ হ'য়ে গেছে, মাপ ক'রবেন—আমি ভেবেছিলাম, আমি একটি মেয়েকে চিনতাম উনি বুঝি—"

মহিলাটি এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে শুনছিল, এখন সে হঠাৎ ব'লে উঠলো, "আপনি কি রবিবাবু?"

রবীন মাষ্টার হেসে ব'ললে, "হ্যাঁ, তা হ'লে আপনিই তড়িৎ!"

মহিলাটি এগিয়ে এসে রবীন মাষ্টারের হাত ধ'রে উৎফুল্ল নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, "কি সৌভাগ্য! আপনি এখানে কোথায় আছেন? কতদিন আছেন?"

রবীন উত্তরে হড়বড় ক'রে অনেক কথা ব'ললে, তার রক্তে তখন নাচন লেগেছে।

তড়িতের স্বামী তখন ব'ললে, "আমার বেয়াদবীর জন্যে আমায় মাপ ক'রবেন। আমি চিনতে পারি নি।"

রবীন হো-হো ক'রে হেসে ব'ললে, "এ আর বেয়াদবী কি? কথা নেই, বার্ত্তা নেই রাস্তার একটা লোক আপনার স্ত্রীর নাম জানতে চাইলে, আপনি তাকে একটা চড় মেরে ব'সলেও কেউ দোষ দিতে পারতো না আপনাকে। আর আপনি চিনবেনই বা কি ক'রে? আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি আপনার কোনো দিন!"

হেসে সুকেশ ব'ললে, "দেখা হয় নি বটে, কিন্তু

আমি আপনাকে বড্ড বেশী চিনি। ওঁর কাছে মুখে মুখে আপনার কথা এত বেশী শুনেছি যে, চোখে দেখে আপনার ভিতর নূতন কিছু পাব ব'লে আশা ক'রছি নে—শুধু চেহারা ছাড়া।"

তারা রবীন মাষ্টারকে টেনে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। খাইয়ে দাইয়ে গল্পগুজোব ক'রে রাত বারোটায় যখন তড়িৎ নেমে এসে তাকে সদর দরজা থেকে বিদায় দিলে, সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল তখন তাদের। শেষে তড়িৎ ব'ললে, "কাল সকালেই আসবেন, কিন্তু বাক্স-বিছানা নিয়ে। মাত্র তো আর পোনেরোটা দিন থাকবেন—এর ভিতর এক দণ্ডও আপনাকে ছাড়ছি নে।"

আনন্দে রবীন মাষ্টারের মাথাটা যেন ঘুরপাক খেতে লাগলো। যে পথ দিয়ে সে চ'লতে লাগলো সেটা ক'লকাতার, না দিল্লীর, না লণ্ডনের, জিজ্ঞেস ক'রলে তা সে ব'লতে পারতো না। কেন না তার মনটা চ'লছিল যে পথে তার চারদিকে সুধুই ছিল তড়িৎ—আর কিছুই ছিল না।

সুধু পথ বা বাড়ী ঘর নয়, অনেক কিছুই তার মনের ভিতর থেকে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তার বয়স যে বাহান্ন, আর তড়িতের ছেচল্লিশ, তার যে একটি স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা আছে এবং তড়িতের একটি স্বামী এবং পুত্র-কন্যা আছে—সে সব পুঁছে গেল মন থেকে। তার মনে নাচতে লাগলো সুধু এই কথা যে, সে আর তড়িৎ আবার মিলেছে—তড়িৎ তাকে মহা সমাদর ক'রেছে। সেই ধ্যানে একেবারে মশগুল হ'য়ে সে হাওয়ার উপর চ'লতে লাগলো।

তড়িৎ তাকে বলেছিল যে, সে এবং তার স্বামী দু'জনেই দিল্লীতে চাকরি করে। সুকেশ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে কাজ করে। তড়িৎ সেখানকার মেয়েদের কলেজের অধ্যাপক। তারা কয়েকমাসের ছুটি নিয়ে ক'লকাতায় এসেছে। বড় ছেলে সঙ্গে আছে আর সব ছেলে-পিলেরা দেশে গেছে তড়িতের বাপ-মার সঙ্গে।

তড়িৎ পড়ায় ইকনমিক্স। শুনে রবীন মাষ্টার ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—সে ব'ললে, "আশ্চর্য্য তো, আপনিও ইকনমিক্স চর্চ্চা করেন আমারই মত!"

তড়িৎ সে কথার উত্তরে যা ব'লেছিল তা অনেক দিন পর্য্যন্ত রবীন মাষ্টারের মনে কিন্নরের সঙ্গীতের মত মধুরস্বরে ঝঙ্কারিত হ'য়েছিল। তড়িৎ হেসে ব'লেছিল, "আমার মনের গতি যে আপনার মতই হবে সে আর এত আশ্চর্য্য কি? আমার মনের সুর যে আপনিই বেঁধে দিয়েছিলেন। তার পর যেই সে যন্ত্র বাজাক্ তাতে ফুটবে আপনারই সুর!"

ওঃ! এত আদর কি সহ্য করা যায়?

পরের দিন রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে তড়িতের অতিথি হ'ল। সেদিন কথায় কথায় যুদ্ধের পর থেকে জগতে যে অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে সে কথা উঠেছিল। আলোচনাটা আরম্ভ হ'ল সুকেশের একটা কথায়। রবীন তাতে কথায় কথায় এমন গোটা কয়েক কথা ব'ললে তাতে বোঝা গেল যে, এ সম্বন্ধে আধুনিক যত আলোচনা হ'য়েছে রবীন তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। তারপর সেই সব আলোচনা ক'রতে ক'রতে রবীন তার নিজের আইডিয়া অনেকখানি ব'লে ফেললে। Planned Economy-র একটা আভাস দিলে। আর সে তার গ্রামের ভিতর ছোট-খাট ক'রে নিয়ত ধন-সৃষ্টির যে একটা স্কীম ক'রেছিল তার পরিচয় দিয়ে গেল।

তার কথা শুনে সুকেশ বুঝলে রবীন পণ্ডিত এবং তার পাণ্ডিত্য সব ধার করা নয়, নিজে ভাববার এবং নূতন সৃষ্টি ক'রবার শক্তি তার আছে। আর তড়িৎ যেন আনন্দে, গর্ব্বে একেবারে ফেটে প'ড়তে লাগলো।

তড়িৎ ব'ললে, "বলি নি আমি তোমায় যে, ওঁর মত পরিষ্কার মাথা আমি কারও দেখি নি? আপনি ঠিক সেই আছেন—wonderful!"

মনোজ্ঞ লজ্জায় রবীন অধোবদন হ'য়ে গেল।

সুকেশ ব'ললে, "আপনি ক'রছেন এই স্কীম অনুসারে কাজ? কেমন কাজ হ'চ্ছে?"

মুখ অন্ধকার ক'রে রবীন ব'ললে, "কাজ কিছুই

ক'রতে পারি নি। বরং গ্রামের লোকে সবাই আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছিল।"

সুকেশ হো হো ক'রে হেসে উঠল, কিন্তু তড়িৎ করুণ সহৃদয়তার সহিত ব'ললে, "আহা! আপনার বড্ড দুঃখ হ'য়েছিল নিশ্চয়।"

ম্লান হাসি হেসে রবীন উত্তর ক'রলে, "ও সব আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।"

তড়িৎ একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে, "আপনি তবু কেন ঐ এঁদো গাঁয়ে প'ড়ে থাকেন মিছে?"

রবীন ব'ললে, "কোথায় যাব? ক'লকাতায় একটা চাকরির চেষ্টা ক'রেছিলাম। কিন্তু এখানে আমার মত বি-এ ফেলের অন্ন জোটা ভার।"

সুকেশ ব'ললে, "ঠিক আপনার মত বি-এ ফেল আছে কি কোথাও? আমার তো মনে হয় না।"

তড়িৎ ব'ললে, "তা ছাড়া কেমন ক'রে আসবেন আপনি? আপনার স্কুল আছে সেখানে! সে স্কুল যে আপনার প্রাণ! এখন কেমন চ'লছে সে স্কুল?"

আর একটা বড় ব্যথার জায়গায় ঘা প'ড়লো রবীনের। তড়িতের কাছে সে-কালে রবীন যে চিঠি লিখতো তার ভিতর স্কুলের কথা বোঝাই থাকতো। কেমন ক'রে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল, কত কষ্ট ক'রে তোড়-জোড় সংগ্রহ হ'ল, কবে কত ছেলে এলো; কি আদর্শ, কি স্বপ্ন তখন রবীনের মাথায় খেলতো স্কুল সম্বন্ধে, শিক্ষার নূতন নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে, রবীন কবে কি ক'রেছে—এ সব কথা তড়িৎ তন্ন তন্ন ক'রে জানতে পেরেছিল রবীনের চিঠি থেকে। তাই তড়িৎ জানতো যে, রবীনের এ স্কুল সাধারণ স্কুলের মত নয়। রবীন বড় বড় আদর্শ নিয়ে নূতন প্রণালীতে তার গাঁয়ে গ'ড়ে তুলবে এক নতুন Rugby, টমাস আর্নল্ডের মত। সে সব আদর্শ যে কোথায় উড়ে গেছে, সে স্কুল যে আর এখন রবীনের স্কুল মোটেই নয়, সে শুধু তার থার্ড মাষ্টার—হিষ্টরী আর হাইজিন পড়ায়—সে সব কথা মুখ ফুটে ব'লতে রবীনের লজ্জা হ'ল।

সে ব'ললে, "বেশ চ'লছে।"

"এখন কত ছেলে আছে সেখানে?"

"তিন শোর উপর?"

"আচ্ছা—নীচু ক্লাসে এখন কোন্ প্রণালীতে পড়াচ্ছেন? Dalton plan-এ না আপনার ফ্রেবেলের সেই সাবেক প্রণালীতে?"

সুকেশ ব'ললে, "তোমরা ব'সে গল্প কর, আমি একবার শ্যামবাজার ঘুরে আসি।"—ব'লে সে চ'লে গেল।

সুকেশ চ'লে যাওয়ায় রবীনের সঙ্কোচটা একটু ক'মে গেল। সে তখন মলিন মুখে ব'ললে, "ফ্রেবেলও নয়, মণ্টেসরীও নয়, ডালটন তো নয়ই। আমাদের প্রণালীটি একটি অদ্ভুত খিঁচুড়ী—আমাদের ইনস্পেক্টার প্রভুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি!"

তড়িৎ অবাক্ হ'য়ে গেল। রবীনের আদর্শ থেকে এতটা পতনের কথা শুনে সে এতগুলো প্রশ্ন ক'রে গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত রবীনের প্রকাশ ক'রতেই হ'ল যে, স্কুলের কার্য্য-প্রণালীর উপর তার কোনও হাত নেই, সে শুধু পড়িয়ে যায় যথাদিষ্ট।

কথাটা তড়িতের বুকে শেলের মত বাধলো। তার কাছে রবীন প্রাণ খুলে তার সব স্বপ্নের কথা, সব আশা-ভরসার কথা লিখেছিল। এই স্কুলটাকে কেন্দ্র ক'রে কত স্বপ্ন যে রবীনের মনে ছিল তা সে জানতো, আর জানতো যে, সেই সব স্বপ্নের সঙ্গে রবীনের সুখ-দুঃখ কত নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই সে এ সংবাদ শুনে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কোনও কথা ব'লতে তার সাহস হ'ল না। সে অন্য কথা পাড়লো।

বেলা হ'ল দেখে তড়িৎ রবীনকে স্নান ক'রতে ব'লে, ব'ললে, "আপনার ব্যাগের চাবীটা আমায় দিন।"

রবীন ব'ললে, "চাবী তো নেই ব্যাগের।"

"তাই না কি!"—ব'লে তড়িৎ ব্যাগটা খুলতে গেল।

মহা আপত্তি ক'রে রবীন তাকে বাধা দিতে গেল।

তড়িৎ ব'ললে, "সরুন ব'লছি, নইলে ভাল হবে না কিন্তু।"

ব্যাগ খুলে তড়িৎ দেখলে তাতে আছে কয়েকখানা পুরোনো বই—এগুলো রবীন কিনেছে, আর তার কয়েকটা নোটের খাতা, আর—একখানি ময়লা কাপড় ও একটা ফরসা জামা।

রবীনের দিকে চেয়ে সে ব'ললে, "এই না কি আপনার সব কাপড়-চোপড়!"

রবীন লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো।

রবীনের থলি খুলে তড়িৎ দু'টো টাকা বের ক'রে নিয়ে তক্ষণি বড় ছেলেকে ডেকে তার হাতে লুকিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে বাইরে পাঠালে। ছেলে বাইকে চ'ড়ে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরোর ভিতর সে একজোড়া ধোয়া মিলের ধুতি, একজোড়া তোয়ালে, একজোড়া গেঞ্জি আরও সব জিনিষ নিয়ে এলো। সেই কাপড় ও গেঞ্জি এবং ব্যাগের ভিতরকার সেই ফরসা জামাটা নিয়ে তড়িৎ রবীনকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং নিজে সেখানে সেই জামা কাপড় রেখে এলো।

এর পর তড়িৎ রবীনকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। নাপিত ডেকে সে তার চুল কাটালে; দাড়ি ছাঁটালে; চেয়েছিল একেবারে কামিয়ে ফেলতে, কিন্তু ভেবে দেখলে অতটা হয়তো সইবে না। স্নানের পর চিরুণী-বুরুশ এনে তাকে সে দেয় চুল আঁচড়াতে। রবীন অমনি যেমন তেমন ক'রে আঁচড়ে রাখে দেখে, একদিন সে নিজেই তার চুল-দাড়ি আঁচড়ে রীতিমত সুসভ্য চেহারা ক'রে দিলে। এতে রবীন এতই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিল যে, তার পর, পাছে আবার তড়িৎ এসে আঁচড়াতে বসে, তাই সে নিজেই ভাল ক'রে আঁচড়াতে লাগলো।

দরজির দোকানে তাগাদা অর্ডার দিয়ে তৈরী হ'ল রবীনের ছ'টা পাঞ্জাবী, আর এল একজোড়া ধুতি। তার দাম তড়িৎ বের ক'রে দিলে রবীনের মণিব্যাগ থেকেই কিন্তু তার সঙ্গে তড়িতের যে কতটাকা গেল তা রবীন জানলো না। তাতে সে ব্যাগের গর্ভ এত ক্ষীণ হ'য়ে উঠলো যে, রবীনের বুক কেঁপে উঠলো। চল্লিশটে টাকা সে বহু কষ্টে সঞ্চয় ক'রে এনেছিল। এসেছিল সে থার্ড ক্লাশে, থাকতো একটা হোটেলে যেখানে দিন ছ'আনায় চলে। বাকী টাকা সে রেখেছিল বই কিনবে ব'লে। এই সব অপব্যয়ের ফলে সে বুঝতে পারলে যে, বই কেনা আর হবে না।

তাতে বুক কাঁপলো বটে রবীনের, কিন্তু অপূর্ব্ব কৃতার্থতায় ভ'রে উঠলো তার চিত্ত। তড়িতের এই সেবা পেয়ে তার বার বারই মনে হ'ল নিস্তারিণীর কথা। নিস্তারিণী না হ'য়ে তড়িৎ যদি তার স্ত্রী হ'ত, তবে তার জীবন কি না হ'তে পারতো!

দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে তড়িৎ তাকে নিয়ে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে যেতো। রবীন সঙ্গে যায় দেখে, সুকেশ আর তড়িতের সঙ্গে যায় না। তার যেতে হ'ত সুধু তড়িৎ একলা বেরুতে পারে না ব'লে। লাইব্রেরীতে সারাদিন কাজ ক'রে তারা বাড়ী ফিরবার বেলায় ঘুরে-ফিরে আসতো। রবীন তড়িৎকে দীক্ষিত ক'রে ফেল্লে পুরোনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটার মন্ত্রে। সেখানে অনেক সময় এত ভাল ভাল বই এত সস্তায় পাওয়া যায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল তড়িৎ। অনেকগুলো বই কিনে ফেল্লে সে, নতুন বইও কতক কিনলে।

বাড়ী ফিরে তড়িৎ নিজে রান্না করে। তার পর ব'সে গল্প-গুজোব করে। রাত্রে খাওয়ার পর অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের গল্প-সল্প হয়।

রবীনের অন্তর যেন আনন্দে লাফাতে লাগলো। জীবনে যে এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আরাম, এত আনন্দ সম্ভব তা সে কোন দিনও জানতো না।

একটি একটি ক'রে তার এ-কয় বৎসরের জীবনের সবগুলি কথা রবীন প্রকাশ ক'রে ফেল্লে তড়িতের কাছে।

একদিন গভীর রাত্রে রবীনের দুঃখের জীবনের

কাহিনী শুনতে শুনতে তড়িতের চোখ ভ'রে গেল জলে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ললে, "এ সবের জন্যে দায়ী আপনি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রবীন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তড়িৎ তিরস্কার ক'রে ব'ললে, "আমি তো আপনার কাছে কোনো কথা লুকোই নি কোনো দিন, মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে কিছুই বাকী রাখি নি। শেষে বি-এ পাশ ক'রবার পর যে চিঠি লিখেছিলাম মনে আছে? সে চিঠির কি জবাব দিয়েছিলেন আপনি?"

কি জবাব সে দিয়েছিল সে-কথা রবীনের খুব মনে ছিল। এ-কয়দিন ব'সে ব'সে সে সুধু সেই কথাই ভাবছিল। যদি সে সেই জবাব না দিয়ে অন্য জবাব লিখতো! যদি লিখতো 'আমি তোমাকে বিয়ে ক'রতে চাই।' তবে, তার জীবন কি ধন্যই হ'য়ে যেতো!

আমতা আমতা ক'রে রবীন ব'ললে, "আর কি জবাব দেব?"

বেশ তীব্রতার সহিত তড়িৎ ব'ললে, "কি জবাব দেব? আপনি সত্যি বুঝতে পারেন নি যে, আমি কি জবাবের আশা ক'রেছিলাম, বোঝেন নি আমি ভাবছিলাম—কাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে?"

রবীন ব'ললে, "হ্যাঁ, তা না, ঠিক বুঝি নি—কিন্তু ভেবেছিলাম তাই।"

"তবে? তবে, ঐ উত্তর দিলেন আপনি—আপনি কোন্ প্রাণে? জানেন, আপনার সেই চিঠি প'ড়ে আমি সাত দিন ধ'রে কেঁদেছিলাম!"

রবীন মাষ্টারের মনে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন ক'রে গেল।

সে সুধু ব'ললে, "আমার অদৃষ্ট!" তার পর ব'ললে, "সত্যি কথা ব'লবো? আপনার বি-এ পাশ ক'রবার আগে অনেকবার ভেবেছিলাম আপনার কথা...... বিয়ে ক'রবার সঙ্গতি তখন আমার ছিল না, কিন্তু ভেবেছিলাম যদি সঙ্গতি হয় তবে আপনাকে সে-কথা লিখবো। আপনি বি-এ পাশ ক'রবার পর ভাবলাম, এটা আমার পক্ষে ভয়ানক স্পর্দ্ধার কথা হয়!"

চোখের উপর রুমাল চেপে ধ'রে তড়িৎ উঠে শুতে গেল।

রবীন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো এই সব কথা। দুঃখ তার হ'ল খুবই, কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'ল যে, আজ এতদিন পরেও তড়িৎ তাকে ভালবাসে, আর সে কথা সে যত স্পষ্ট ক'রে পারে প্রকাশ ক'রেছে।

কোনও লাভ নেই তাতে। তাদের কারও জীবন এতে ঢেলে সাজা যাবে না। এখন তারা তাদের জীবনের দু'দিকে যত বন্ধন আছে সব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়ে এ ভালবাসা সম্ভোগ ক'রতে পারবে না—সে সম্ভোগের কল্পনা মাত্রও রবীনের মনে এলো না, তবু একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি, একটা লোকাতীত আনন্দে তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল এ অনুভূতিতে। রবীন ভাবলে এই সত্যি ভালবাসা। অথচ সমাজের ইতিহাসে এই ভালবাসাটাকে একেবারে বাতিল ক'রে দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে—বিবাহ!

পরের দিন রবীনের ফিরবার কথা। দু'দিন বাদে ভাই ফোঁটা, ভাই ফোঁটার পরের দিন স্কুল খুলবে। তাই ভাই ফোঁটার আগের দিন যেতেই হয়। যেতে তার মন স'রতে চাইলো না, কিন্তু যেতে যে হবেই!

তড়িৎ কিন্তু বাগড়া দিলে যে, ভাই ফোঁটার আগে তার কিছুতেই যাওয়া হবে না। সে ব'ললে, "একদিন ছুটি নিন।"

এ কথা ভাবতে রবীনের ভয় হ'ল। একটি দিন ছুটি চাইলেও যে হেড মাষ্টার তাকে কি নাকাল ক'রবেন তার ভয়ে সে অস্থির হ'য়ে উঠলো।

তারপর তড়িৎ ব'সলো টাইম-টেবল নিয়ে হিসেব ক'রতে। হিসেবে দেখা গেল যে, ভাই ফোঁটার দিন

বিকেলের দিকে একটা ট্রেণে গিয়ে তিন জায়গায় চেঞ্জ ক'রে বাকী রাস্তাটা মোটরে গেলে রবীন গিয়ে বাড়ী পৌছুতে পারে, টায়টোয় স্কুলের টাইমের এক ঘণ্টা আগে।

এর পর আর আপত্তি চ'ললো না।

মহা আড়ম্বর ক'রে তড়িৎ রবীনকে ভাই ফোঁটা দিলে। আর ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে দিলে দু'জোড়া ধুতি, দু'টো পাঞ্জাবী, আর দু'খানা চাদর।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন রওনা হবে তখন রবীন ব'লল, "এইবার আমার ব্যাগটা—"

তড়িৎ ব'ললে, "সেটা পাবেন না। ওটা থাকবে আমার কাছে। রবীন দেখতে পেলো যে, তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে ঝক্‌ঝকে চামড়ার নূতন দু'টো স্যুটকেশ। একখানার ভিতর আছে তার কাপড়-চোপড় এবং একখানার ভিতর, তার স্ত্রী ও ছেলেপিলের জন্ম কাপড়-চোপড়, আর এতদিন তড়িৎ তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে যত বই কিনেছিল—সে সব বই।

দেখে রবীনের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

তড়িৎ তাকে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে কেবলি চোখের জল মুছতে লাগলো।

খুব মৃদুস্বরে সে ব'ললে, "কোনও দিন ভাবি নি যে, আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে এত দুঃখ পাব। এত দুঃখে আছেন আপনি স্বপ্নেও ভাবি নি—ভাবতে বুক ফেটে যায় আমার।"

চোখ মুছতে মুছতে রবীন গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

নারী যার কেশে মেঘের থর

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সাত সমুদ্র তের নদী তেপান্তরের পর,
বসত করে সেই নারী যার কেশে মেঘের থর।
ডান পাশে তার সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি বাঁয়ে,
রূপ ঝ'রে তার আলো ছড়ায় অন্ধকারের গায়ে—
কান্না তারি জ'মে হ'লো মৌক্তিক সুন্দর।

দূর বিদেশের রাজার কুমার কোথায় তুমি থাকো?
তোমার চুমোর একটি রেখা তার ললাটে রাখো।
চোখে তাহার দাও বুলিয়ে নীল-কমলের লেখা,
বুকের মাঝে দাও ছুলিয়ে ঘন ঢেউ-এর রেখা।
পক্ষীরাজ ঘোড়া তোমার শূন্যে মেলে ডানা,
সেই ঘোড়াতে চ'ড়ে তুমি তার কাছে দাও হানা।
জাগিয়ে তোলো মুগ্ধ প্রিয়ার মূর্চ্ছিত অন্তর।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

৪

'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক অনন্যপূর্ব্ব গভীরতা ও কৌশল দেখাইয়াছেন। 'নৌকাডুবি'র সরল-সহজ একটানা প্রবাহের সহিত তুলনায় এখানে পদে পদে সংঘাত ও গভীর ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃজন হইয়াছে। আকস্মিকতার স্থানে সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সমস্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত চরিত্রগত গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী ও আশা—এই চারিজনে মিলিয়া তাহাদের চারিদিকে যে প্রবল ঘূর্ণীবায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্র-গত বিশেষত্ব একটী বিশেষ্ রকমের গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটী অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল এবং সেইজন্য সমস্ত অবস্থাটীর ব্যাপক পর্য্যালোচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর গূঢ় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই এই ঘূর্ণীবায়ুর কেন্দ্রস্থ শক্তি; কিন্তু ইহার মধ্যে বিহারী ও আশাও তাহাদের সবল ও দুর্ব্বল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নূতন জটিলতার সঞ্চার করিয়াছে। বিহারীর সবল একনিষ্ঠ চিত্ত বিনোদিনীকে আকর্ষণ করিয়াছে; ও তাহার অবজ্ঞাসূচক কঠোর প্রত্যাখ্যান এই আকর্ষণকে অনিবার্য্য বেগ ও ব্যাকুলতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার বিহারীর মনের নিভৃততম কোণে আশার প্রতি যে গোপন অনুরাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহাই বিনোদিনীর ঈর্ষ্যাগ্নিতে নূতন ইন্ধন দিয়া তাহাকে আশা ও মহেন্দ্রের সর্ব্বনাশ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছে। আশার সরল বিশ্বাস ও স্বভাব-সিদ্ধ শিথিলতা মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে অবসর ও সুযোগ প্রদান করিয়া বিপদকে ঘনীভূত করিয়াছে; ও বিহারীর প্রতি তাহার বিবেচনাহীন প্রবল বিরাগ বিহারীকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমাভিনয়কে একেবারে বাধা-মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আশার প্রতি বিহারীর প্রেম মহেন্দ্রের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ও বিহারীর কল্যাণ-কামী মধ্যস্থতাকে প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা করিতে মহেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে। এইরূপে এই চারি জনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সূক্ষ্ম ও জটিল শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়া একটী চমৎকার ঐক্য ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

এমন কি রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণাও এই গ্রন্থি-সঙ্কুলতার মধ্যে নূতন ফাঁস যোজনা করিতে সাহায্য করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থপরতা মহেন্দ্রের স্বার্থপরতার স্ত্রী-সংস্করণ মাত্র। মাতা-পুত্র উভয়েই এক ছাঁচে ঢালা—মাতার পুত্র-সর্ব্বস্বতাই পুত্রের নির্লজ্জ অসংযত ভোগ-লিপ্সার মূল উৎস। রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে বিনোদিনীর মন্তব্য তাহার চরিত্রের উপর একটী অপ্রত্যাশিত, শিহরণ-কারী আলোকপাত করে—বধূর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া মাতা বিনোদিনীর দ্বারা পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্দ্দম-অভিমান-প্রবণ রাজলক্ষ্মীই তাঁহার গৃহাঙ্গনে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সদা-জাগ্রত সূক্ষ্ম অনুভূতি যে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ক্রম-বর্দ্ধমান অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে নাই—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বধূর প্রভাব স্বহস্তে খর্ব্ব করিয়া যখন তিনি সেই দুর্ব্বল শৃঙ্খলের দ্বারা পুত্রের দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন সেই চেষ্টার মধ্যে একটা করুণ দিক্ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটের উপর তাহা পাঠকের মনে সহানুভূতি অপেক্ষা তীব্র ব্যঙ্গভাবই উদ্রেক করে। অন্নপূর্ণার অবস্থা-সঙ্কটও এই জটিলতার

সূত্র পাকাইতে সহায়তা করিয়াছে। অন্নপূর্ণা আশার মাসী বলিয়াই রাজলক্ষ্মীর অভিমান-জ্বালা বেশীর ভাগ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইয়াছে—অপক্ষপাত বিচার করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। মহেন্দ্রের লঘু অপরাধে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনি সংসার হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কাশীবাসের দ্বারাই মহেন্দ্রের গুরু অপরাধের দ্বার প্রশস্ততর করিয়া দিয়াছেন।

মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ হইতে উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। আশার প্রতি সর্ব্বগ্রাসী, আত্মবিস্মৃতিকর প্রেমে মহেন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বিনোদিনীর অস্তিত্বকেই আমল দেয় নাই—তাহার সহিত সহজ ভদ্রতার সম্ভাষণটুকু করিতেও বিরত ছিল। আশাকে মহেন্দ্রের বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণু প্রণয়ের নিকট কতকটা দুষ্প্রাপ্য করিয়াই প্রথম বিনোদিনী বিরক্তিকরভাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তারপর আশার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ও চতুরা বিনোদিনীর স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতায় মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রথম পরিচয়ের আরম্ভ হইল। ইহার পর বিনোদিনীর কঠোর আত্ম-শাসনের নিকট মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিল, সে প্রেম নহে, কতকটা আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই বিনোদিনীর সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিতে উদ্যোগী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিনোদিনী তরুণ দম্পতির প্রিয় সখী হইয়া উঠিল, তাহার হাস্যরস-পরিহাস, মনোরঞ্জন-শক্তি ও সেবা-কুশলতার দ্বারা উহাদের প্রণয়ের অবসাদ ঘুচাইয়া তাহাকে নবীন-সঞ্জীবন-রসে ভরপুর করিয়া তুলিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের মনে বিনোদিনীর প্রতি কোনরূপ অনুচিত আকর্ষণের সঞ্চার হয় নাই—সে এখনও তাহাকে আশার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী করিয়াই দেখিয়াছে। কিন্তু এই সময় বিহারীর তীক্ষ্ণ সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি একটু গোলযোগের সূত্রপাত করিল। সকলের, বিশেষতঃ মহেন্দ্রের মনে একটা অপ্রার্থিত কদর্য্য সম্ভাবনার কথা জাগাইয়া দিয়া তাহার আত্মপ্রসাদের স্বচ্ছ প্রবাহ কতকটা পঙ্কিল করিয়া তুলিল। বিনোদিনীর কয়েক ফোঁটা অশ্রু-জলের কৌশলময় অভিনয়ের দ্বারাই এই সন্দেহের প্রথম কলঙ্কস্পর্শ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

ইহার পর মহেন্দ্রের সচেষ্টতার পালা—তাহার ঔদাসীন্য বিনোদিনীর সচেষ্ট অনুসরণে রূপান্তরিত হইয়াছে। দমদমে চড়ুইভাতির আয়োজন এই নব-পরিবর্ত্তনের প্রতীক্। এই দিনটী মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীর জীবনেতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস। এই দিনের ঘটনাবলীর ফলে বিহারীর মূল্য বিনোদিনীর চক্ষে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—বাল্য-স্মৃতির দূরদিগন্তের মায়াময়, শীতল প্রলেপে তাহার ঈর্ষ্যা-কলুষিত খর-জ্বালাতপ্ত প্রণয়-বিকার কাটিয়া গিয়া প্রেমের স্বভাব-স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই নবজাগ্রত প্রেমের স্থির অনুদ্‌ভ্রান্ত আলোকে সে বিহারীকেই নিজ জীবনের পরম আশ্রয়-স্থল বলিয়া চিনিয়াছে।

এইবার মহেন্দ্র নিজ হৃদয়-তন্ত্রীতে সত্যকার টান অনুভব করিয়াছে, কিন্তু ইহাও ঠিক প্রণয় নহে, বিহারীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিহারীর নিকট পরাজয়ের ধিক্কারই তাহার সমস্ত শক্তিকে বিনোদিনীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—বিনোদিনীকে ভালবাসিয়া নহে, তাহার উপর নিজ দখলী-স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য। আশার প্রণয়-মোহ ছিন্ন হইয়া তাহার ত্রুটি-অপূর্ণতার দিকে মহেন্দ্র প্রথম সজাগ হইয়াছে ও বিরক্তি-মিশ্রিত ভৎর্সনা মুগ্ধপ্রেমের একসুরা কপোত-কূজনের মধ্যে একটু তীব্র বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। শেষে মহেন্দ্র পলায়নে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এই ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদের মধ্যে আশার বেনামী বিনোদিনীর তিনখানি সুধা-হলাহল-মিশ্র প্রেমনিবেদন-লিপি মহেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে বিষদিগ্ধ বাণের মতই বিঁধিয়াছে। মহেন্দ্র এক অজ্ঞাত-শঙ্কা-উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া বিনোদিনীর সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়াছে। এইবার

মহেন্দ্র একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া বিনোদিনীর নিকট প্রথম প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু এ ভ্রান্তি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মাত্র। প্রণয়-ভিক্ষার পর মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—তাহার ব্যাকুল-নিবেদনাত্মক কথা কয়টী প্রত্যাহার করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে ও বিহারীর নিকট তাহার আসন্ন পদস্খলনের সম্বন্ধে আবেগময় স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজ অনুতাপের গভীরতা প্রমাণ করিয়াছে। বিহারীও আশার কল্যাণের জন্য বিনোদিনীর নিকট উচ্ছ্বসিত অনুনয়ের দ্বারা তাহার সুপ্ত মহত্বের ক্ষণিক উদ্বোধন করিয়াছে। বিনোদিনীর অশ্রু-গাঢ় আলিঙ্গন ও মহেন্দ্রের অস্বাভাবিক বেগে উৎসারিত-সোহাগ-নির্ঝর যুগপৎ আশার উপর বর্ষিত হইয়া তাহাকে উভয়ের মধ্যে এক নিগূঢ় ঐক্য-রহস্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে এবং এই সম্মিলিত শক্তির স্নেহাতিশয্যের ছদ্মবেশধারী বিরুদ্ধতার ক্ষীণ আভাস তাহার হৃদয়-মনে এক অজ্ঞাত ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছে।

তারপর মহেন্দ্রের দ্বিতীয় বার পলায়ন—এ পলায়ন ঠিক কাপুরুষের পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তীর্থযাত্রা। কাশীতে অন্নপূর্ণার অখণ্ড ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীরব কল্যাণ-কামনার উৎস হইতে প্রলোভন-জয়ের শক্তি আহরণের জন্যই এবার মহেন্দ্র গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে। আশার প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রেম ও অবিচলিত একাগ্রতার আশ্বাস লইয়াই সে ফিরিয়াছে। কিন্তু এইখানে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে। যে ঔষধ তাহার নিজের বিকার-গ্রস্ত মনের নিকট এত উপকারের হেতু হইয়াছে, সুস্থ আশাকেও সেই ঔষধের আস্বাদ দিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগিয়াছে। আশাকে কাশী পাঠাইবার প্রস্তাবে, তাহার ও বিহারীর মধ্যে ব্যবধানের এক নিষ্ঠুর, অতলস্পর্শ গহ্বর মুখ-ব্যাদান করিয়াছে। বিহারী আশাকে ভালবাসে ও সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না—এই দুইটী সুস্পষ্ট উক্তি তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ককে আবার প্রবলভাবে আলোড়ন করিয়াছে—ইহার মধ্যে যতটুকু অন্তরাল ও অপরিচয়ের স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিল নগ্ন সত্যের প্রখর আলোকে সেটুকুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া তাহাদের চারিজনকে অনাবৃত বিরোধের এক ছায়া-লেশহীন ঊষর মরুভূমির মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

আশার অনুপস্থিতির রন্ধ্রপথ দিয়াই মহেন্দ্রের জীবনে শনি প্রবেশ করিয়াছে। বিনোদিনীর অপরিমিত যত্ন ও আশ্চর্য্য সেবাকুশলতার ভিতর দিয়া তাহার অনুক্ষণ সাহচর্য্য মহেন্দ্রের কষ্ট-নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে অনিবার্য্য বেগে উদ্দীপিত করিয়াছে। তথাপি সে প্রাণপণ শক্তিতে আত্ম-সংবরণের চেষ্টা করিয়াছে, প্রলোভনের মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহার মনের দ্বারে আত্মসংযমের অর্গল নাই, তাহার শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর একবার শেষ চেষ্টার পর মহেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। বিনোদিনীও আত্ম-সমর্পণের শেষ সীমায় পা বাড়াইয়াই বিহারী-সম্বন্ধীয় কুৎসিত শ্লেষবিদ্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার উন্মুখতাকে প্রত্যাহার ও সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে—ক্রোধের অগ্নি প্রেমের সজল বিদ্যুৎকে গ্রাস করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তটী মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কে একটী চরম পরিণতির মুহূর্ত (crisis)। এখন হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিমুখতা বিনোদিনীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার জন্য প্রেমাভিনয়ের ছলনাও সে বর্জ্জন করিয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বিহারীর আবির্ভাব ও তৎকর্ত্তৃক বিনোদিনীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান তাহাকে মহেন্দ্রের প্রেম-নিবেদনে সম্মত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সম্মতির মধ্যে এককোঁটা প্রেম নাই, আছে শুধু যে সামাজিক ও নৈতিক শাসন বিহারীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে তিরস্কারের স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছিল, সেই স্পর্দ্ধিত তিরস্কারের প্রতি ক্রুদ্ধ উপেক্ষা ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা।

ইহার পর মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের মধ্যে, অপ্রত্যাশিতত্বের স্পর্শ মিলাইয়া গিয়াছে। আরও দুই-এক অধ্যায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের অসংবৃত, লজ্জা-

সঙ্কোচহীন প্রণয়-নিবেদন সহ্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয় ইহাতে কোন সাড়াই দেয় নাই। মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের সময় সে রাজলক্ষ্মীকে শরীর-রক্ষীরূপে সঙ্গে লইয়াছে, মহেন্দ্রের উন্মত্ত আবেগকে নির্জ্জনতার কোন অবসর দান করে নাই। এখন হইতে সে মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপেই বিহারী-লাভের উপায় মাত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে ভারবাহী গর্দ্দভের দুরবস্থা অনুভব করাইয়াছে। লোক-নিন্দা, সমাজ-গঞ্জনা সে স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত বরণ করিয়াছে, কিন্তু বেচারা মহেন্দ্র লোক-চক্ষে অপরাধী হইলেও তাহার প্রকৃত প্রণয়ভাজনের সংবাদ বহির্জগতের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বিহারী কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান তাহার প্রেমকে রক্ত-মাংসের স্থূল বাস্তবতা হইতে এক উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল, ধ্যানগম্য আদর্শলোকে লইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের কায়িক অনুবর্ত্তনের ছদ্মবেশে তাহার মন বিহারীর অভিমুখে প্রণয়-অভিসারের অতীন্দ্রিয় পথ ধরিয়া উধাও হইয়াছে। এই যাত্রা-পথের চরমতীর্থ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে এলাহাবাদের যমুনাতীরস্থ কুঞ্জবনে। এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে মহেন্দ্র ও বিহারীর সহিত বিনোদিনীর মুহুর্মুহু-পরিবর্ত্তনশীল, অনুরাগ-বিরাগ-পঙ্কিল, ঘাত-প্রতিঘাত-নিষ্ঠুর, প্রত্যাখ্যান-নিবেদনের বিপরীত স্রোতে ঘূর্ণাবর্ত্ত-সঙ্কুল সম্বন্ধের একটা শেষ মীমাংসা ও সমাধান সংঘটিত হইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার সুদীর্ঘ মোহনিদ্রা অবসানে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ক্ষমা-স্নিগ্ধ মাতৃদৃষ্টির তলে আশার পার্শ্বে নিজ সঙ্কুচিত স্থান গ্রহণ করিয়াছে; বিনোদিনী নিজ উদ্দীপ্ত কামনার উপর বৈরাগ্যের ধূসর ছাই ছড়াইয়াছে ও রোমান্সের নায়িকার ন্যায় প্রেমের সহস্র-ঝাড় রঙীন বাতি নিবাইয়া সেবার ম্লান-স্তিমিত ঘৃত-প্রদীপ হস্তে, এক চির-গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন রোগ-কক্ষের অভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া মহেন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রের সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলি এক আতিশয্য ও অসংযমের ঐক্য-বন্ধনে গাঁথা। তাহার অপরিমিত মাতৃভক্তি ও পত্নীপ্রেম, বিনোদিনীর সহিত সম্পর্কে তাহার নির্লজ্জ আতিশয্যেরই পূর্ব্বসূচনা। তাহার পত্নীপ্রেম ও পর-নারী-আসক্তি—উভয়েরই মূলে আছে এক প্রবল আত্মাভিমান। ঈর্ষ্যা বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ প্রণয়েই তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। আশার ব্যাপারে বিহারীকে এত সহজে হঠাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই বিনোদিনীর হৃদয়-আকর্ষণ চেষ্টায় তাহার অবলম্বিত উপায় এত ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষাই তাহার প্রেমের সিংহাসন-লাভের সোপান হইত, কিন্তু মূঢ় মহেন্দ্র নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে পারে নাই। ঈর্ষ্যার দমকা বাতাস বারবার তাহার প্রণয়-দীপটীকে কাঁপাইয়া গিয়াছে, তথাপি সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই। বিনোদিনীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে মহেন্দ্র চাহিবা-মাত্র পাইয়াছে—একমাত্র বিনোদিনীর ব্যাপারেই তাহাকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইয়াছে এবং এই পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। সে যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্ত-জয়ের চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নহে এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য্য বেগের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়—কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনামাত্রই তাহার সমস্ত আত্মদমন-চেষ্টাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। 'আত্মাভিমান-মূঢ়তা' কথাটী মহেন্দ্রের সমস্ত চরিত্র ও ব্যবহারের উপর বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিনোদিনীর চরিত্রে স্থূল বাস্তবতা ও উচ্চ আদর্শবাদ—এই দুইটী বিপরীত ধারার সংযোগ হইয়াছে। অবশ্য এই সংযোগ আর্টের অনুমোদিত সমন্বয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। পিশাচী হইতে দেবীতে অতর্কিত পরিবর্ত্তন রোমান্টিক উপন্যাসে অতি সাধারণ ব্যাপার। এখানে বিনোদিনীর

পরিবর্তন খুব অতর্কিত হয় নাই, মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিহারীর প্রতি উন্মুখতা তাহার চরিত্রে ধীরে ধীরে, অথচ নিতান্ত অনিবার্য্যভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে। একটা প্রচণ্ড-জ্বালাময় ঈর্ষ্যা তাহাকে মহেন্দ্রের সহিত প্রেমাভিনয় করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার সেবাকুশলতা মহেন্দ্রের ঔদাসীন্যকে পরাজয় করিবার অস্ত্রমাত্র; মহেন্দ্রের প্রতি তাহার ইচ্ছা-প্রণোদিত কঠোর শাসন প্রেমের বাজার-দর উঁচু রাখিবার কৌশলময় প্রয়াস। তথাপি যদি সে মহেন্দ্রের চরিত্রে তাহার একান্ত-প্রার্থিত অটল নির্ভর ও বিশ্বস্ততা পাইত, তাহা হইলে তাহার চিত্ত-দুর্গে জয়-পতাকা উড়াইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিত, বিজয়িনীর গর্ব্ব প্রণয়িনীর অন্তরের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে হঠাইয়া দিত। কিন্তু মহেন্দ্রের অন্তঃকরণে দৃঢ় ভিত্তির পরিবর্ত্তে চোরাবালির আবিষ্কার করিয়া, তাহার একান্ত কৃতঘ্নতা ও অস্থিরমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার মন মহেন্দ্রের উপর ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিহারীর শত-ঝঞ্ঝাবাতে অক্ষুব্ধ চিরস্থির হৃদয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বিহারীকে আহরণ-যোগ্য মণি বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে মহেন্দ্রকে খেলার পুতুলের মত ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য তাহার এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের কাহিনী বাস্তব বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবি-কল্পনামূলক সহানুভূতি দ্বারাই পাঠকের মনে প্রবেশ করান হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ দিক দিয়া বিনোদিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী—সে বাস্তব-বিশ্লেষণের পরিধি ছাড়াইয়া উদার অসীম ভাব-রাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় আরোহণ করিয়াছে। তাহার জীবনের শেষ সঙ্কল্পও রোমান্সের রঙ্গীন বাতাসে স্ফুরিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রেমের সহিত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমের তুলনা করিলেই রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুভূত হইবে। কুন্দের প্রেম অতি সলজ্জ ও সঙ্কোচ-জড়িত-আবির্ভাব-অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মুগ্ধ, আত্ম-বিস্মৃত সরলতাই ইহার প্রধান উপাদান। ইহার বর্ণনাও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ, ইহার দৈনন্দিন ইতিহাস ও পরিণতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ নহে। বিনোদিনীর প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—ইহা অতি সুচতুর কৌশল-জালময় মায়া-বিস্তার। কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধজলে ঝাঁপ দিয়াছে—বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কুন্দের অন্ধ, মূঢ় আবেগের সহিত বিনোদিনীর সূক্ষ্ম পরিমাণ-বোধ ও ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতেরও ফলাফল সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার, আবেশজড়িমারহিত অনুভূতি তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাল-বিধবার প্রথম প্রণয়-সঞ্চার কবিত্বময় আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া নব-বধূর লজ্জারক্তিম আভায় চিত্রিত করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ পূর্ণবয়স্কা যুবতীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ লোলুপতার, তাহার যত্ন-রচিত মায়া-নাগপাশের প্রত্যেকটী গ্রন্থির, প্রত্যেকটী ফাঁসের, সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। 'চোখের বালি'র পর হইতে বিধবা প্রেমের এক নূতন অভিনয়ে ব্রতী হইয়াছে। বিনোদিনী হীরা ও রোহিণীর মনোরাজ্য-বহির্ভূত এক উচ্চতর, বিচিত্রতর মঞ্চ অধিকার করিয়াছে; সে অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের পূর্ব্ব-বর্ত্তিনী ও পথ-প্রদর্শিকা।

বিহারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে অত্যন্ত বিলম্বে। গ্রন্থের প্রথম হইতে সে কেবল মহেন্দ্রের অনুচর ও উপগ্রহরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার বন্ধুপ্রীতি এত প্রবল যে, তাহার খাতিরে সে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ পর্য্যন্ত বন্ধুকে তুলিয়া দিয়াছে। তাহার চরিত্র ও ব্যবহারের সর্ব্বত্রই প্রায় বিয়োগ-চিহ্নাঙ্কিত (negative)। মহেন্দ্রের ত্রুটি-অপূর্ণতা ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিহারীর চরিত্রে তদ্বিপরীত গুণগুলি আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ রাহু-গ্রস্ত জীবন প্রায়ই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে অনুকূল হয় না। কেবল-মাত্র এক বিনোদিনীই বিহারীকে মহেন্দ্র হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিয়াছে, তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আকর্ষণের দ্বারা বাহিরে আনিয়াছে। বিনোদিনী-সম্পর্কেও

বিহারী নিজ হৃদয়-ভাবকে আমল দেয় নাই, মহেন্দ্রের হিতৈষী বন্ধু হিসাবেই তাহার কার্য্যাবলীর বিচার করিয়াছে। কেবলমাত্র তাহার নির্জ্জন কক্ষ-মধ্যে বিনোদিনীর নিশীথ-অভিসারই তাহার প্রসুপ্ত যৌবনকে জাগরিত করিয়াছে, সে মহেন্দ্রের আনুচর্য্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন জীবন-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমের সুরা-পাত্র সে ওষ্ঠে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু তাহার তীব্র গন্ধ তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্তকে উতলা ও মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এই অতর্কিত যৌবনোন্মেষই তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ — বিনোদিনীকে বিবাহ-প্রস্তাব তাহার স্বাধীন সত্বার একমাত্র কার্য্য। তাহার চির-প্রবীণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সদ্যো-জাগ্রত তারুণ্যের মধ্যে যে বিরোধ তাহার সমাধান নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিহারীর অর্দ্ধোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়-সমস্যার সুলভ ও আকস্মিক সমাধান তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কতকটা অস্পষ্ট ও ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে।

আশার সম্বন্ধেও অনেকটা এই মন্তব্যই প্রযোজ্য। মহেন্দ্রের দুর্জ্জয় বন্যা-প্লাবনের ন্যায় অসঙ্গত হৃদয়বেগ ও বিনোদিনীর চক্ষুর্জ্বালাকারী তীব্র রূপ-শিখার সম্মুখীন হইয়া সে অনেকটা ম্লান ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র-বিহারীর সম্পর্ক আমাদের একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জগতে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধুত্বই সাধারণতঃ অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের রুদ্ধদ্বার গবাক্ষ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এক বন্ধুত্বের ছিদ্রপথ দিয়া বাহ্য বিপ্লব বাঙ্গালী পরিবারে প্রবেশলাভ করিতে পারে। এক বন্ধুত্ব বা সহপাঠিত্বের দাবীতেই আমরা পরের অন্তঃপুরের অন্তর্গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া ভিন্ন পরিবারের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারি। এখানে স্ত্রী-পুরুষের অসঙ্কোচ মেলা-মেশার সুযোগ যতই সঙ্কীর্ণ, বন্ধুত্বের প্রসার ও সম্ভাবনা ততই সুপ্রচুর। সেইজন্য বাঙ্গালা উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিলতা, বন্ধুত্বের স্নেহ-শীতল অথচ প্রতিযোগিতা-তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই উদ্ভূত। 'গোরা'তে গোরা ও বিনয়, 'ঘরে-বাইরে' নিখিলেশ ও সন্দীপ, 'গৃহদাহে' মহিম ও সুরেশ, 'দিদি'তে অমর ও দেবেন — এই উদাহরণ কয়েকটীই বাঙ্গালা উপন্যাসে বন্ধুত্বের উচ্চ দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

'চোখের বালি'কে উপন্যাস-সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমাজ-নীতির দিক হইতে বিগর্হিত—কিন্তু এই প্রেমের বিচারে কোন নীতিকথার আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ইহার ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এই প্রেম বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে কোন নৈতিক অনুশাসনে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত শোভনতা-বোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা। আবার বিহারী-বিনোদিনীর প্রেমে প্রেমের সনাতন সৌন্দর্য্য ও মহিমা সগৌরবে বিঘোষিত হইয়াছে। লেখক প্রেমের প্রতি পুরাতন মনোভাব একেবারে বর্জ্জন না করিয়া নূতন মনোভাবের স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। 'চোখের বালি' এই নূতন-পুরাতনের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া এক হাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপর হাতে শরৎচন্দ্রের যুগকে এক নিবিড় ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

———

বনলতিকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সেই তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বনলতা সত্যসত্যই একটা কথাও কহে নাই। বস্তুতঃপক্ষে আহারাদির পর সেই যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে উঠিয়াছে। তারপরে মেয়েদের বাহিরে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে প্রসাধন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। ঘণ্টাখানেকের অধিকাংশ তো তাহাতেই কাটিয়াছে। গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে সংবাদ পাইয়া এইমাত্র নীচে নামিয়া আসিল। সকালবেলা তাহার সঙ্গে একটাও ভালো কথা কহি নাই। কেবল আঘাতই করিয়াছি। সে কথা ভাবিয়া সমস্ত দ্বিপ্রহরের মধ্যে একবারও চোখের পাতা বুজিতে পারি নাই। আপনাকে আপনি বারম্বার তিরস্কার করিয়াছি, কাজটা ভালো হয় নাই। হাজার হউক অতিথি। স্থির করিয়াছিলাম, নামিয়া আসিলে তরল পরিহাসে সে অপরাধ ধুইয়া ফেলিব। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলাম। বিষণ্ণ নয়। ক্রোধ, ক্ষোভ অথবা দুঃখের চিহ্নমাত্রও ছিল না। আসন্ন যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে মানুষের মুখ যেমন কঠিন হইয়া ওঠে, এ তেমনি।

একখানি টক্‌টকে লাল রঙের শাড়ী পরিয়া বনলতা উপর হইতে তর্‌-তর্‌ করিয়া নামিয়া আসিল। ললাটে সিন্দুর-বিন্দু জল্‌-জল্‌ করিতেছে। আমার ছেলে-মেয়ে কয়টী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের একটা কথাও বলিল না। কটাক্ষে চাহিয়া একটুখানি হাসিল না পর্য্যন্ত। কিন্তু সে না হয় না-ই করিল — আমি জানি, ছোট ছেলে-মেয়ের উপর কোনোদিনই তাহার স্নেহ নাই—কিন্তু আমার স্ত্রীকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ জানানোও তো উচিত ছিল। বেচারা সমস্ত কাজ ফেলিয়া এই জন্যই ছুটিয়া আসিয়াছিল। বনলতা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিল না পর্য্যন্ত। শুধু আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল — চলো।

প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিরীহ মেষ-শাবকের মতো নিঃশব্দে তাহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে বসিলাম।

মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শোফারটা একটা বুড়া লোককে চাপা দিয়া পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া ফিরিয়াছে। সেই থেকে তাহার সঙ্গে মোটর চড়িতে ভরসা পাই না। তবু তাহাকে ছাড়াইতে পারি নাই। একবার যে রাজদ্বারে দণ্ড দিয়া আসিয়াছে তাহাকে নূতন করিয়া দণ্ড দিতে কুণ্ঠা হয়। তা-ছাড়া মোটর-চালনায় কুশলী না হইলেও লোকটা একেবারে অপদার্থ নয়। এমন চমৎকার রান্না অতি অল্পই খাইয়াছি। কিন্তু রান্নার কাজ সে কিছুতে গ্রহণ করিবে না। মোটর চালাইবে।

গাড়ীতে উঠিয়া মনে মনে হাসিলাম। সামনে আনাড়ী শোফার, যে কোনো মুহূর্ত্তে, কিছু না হইলে, একটা ল্যাম্প-পোষ্টের সঙ্গেই ধাক্কা দিয়া বসিবে। পাশে বনলতা, রূপের আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই দগ্ধ হইয়া যাইতে পারি। যোগাযোগ মন্দ হয় নাই। কেবল ভাবিয়া দেখিলাম, এই একটিমাত্র ভরসা আছে যে, বনলতা কথা কহিবে না। মেয়েদের সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে হইলেই ভয় পাই। সমস্তক্ষণ বকিয়া বকিয়া কানের পোকা আর রাখে না।

কিন্তু আমার সেই একটিমাত্র ভরসাও এক

মিনিটের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। গাড়ীখানা আমার বাড়ী ছাড়াইয়া প্রথম মোড়টা বেঁকিতেই বনলতা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা, নার্সদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় আছে?

— আমার? না, ও-কাজটা কখনো করি নি।

বনলতা হাসিয়া ফেলিল। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন থম্‌থমে আকাশ এক মুহূর্তে কোজাগরী রাত্রির মতো ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর আমি? কিন্তু আমার কথা থাক্‌। কোনোদিকে ভরসা করিবার মতো কিছু রাখিয়া তো বাহির হই নাই।

বলিল — সে কথা জিজ্ঞেস করি নি। বল্‌ছি, ওদের সম্বন্ধে কিছু জানো তুমি?

বলিলাম — জানি। ওরা আছে বলেই হাস-পাতালে বিনা-পয়সার ডাক্তারের অত ভিড়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অজুহাতটা নিতান্তই গৌণ। এমন কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, এম্‌-এ না প'ড়ে ডাক্তারী পড়লেই ভালো করতাম।

কৌতুকে বনলতার ভ্রূ দু'খানি ফুলধনুর মতো নাচিয়া উঠিল। কহিল — তা হোক গে। সে ভয় করি না। ডাক্তারে আর তোমাদের চেয়ে বেশী কি বিরক্ত করবে? —

বলিয়া আমার বাঁ-হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল। তাহাতে মৃদু চাপ দিয়া বলিল — মনে পড়ে না সে সব কথা?

— ক্রমাগত।

বনলতা অন্যদিকে চাহিয়া কি যেন স্মরণ করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে আমার দিকে ফিরিয়া একবার হাসিল।

বলিলাম — হাসছ যে?

কোনো উত্তর না দিয়া ছোট মেয়ের মতো বনলতা আমার হাতখানিকে তাহার দুই হাতের মধ্যে নাচাইতে লাগিল। অবশেষে হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল — জানো, নার্সগিরি আমার মোটে ভালো লাগে না।

কথাটা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি বলিলাম — তাই তো বটে! তোমার নিজেরই যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নার্সগিরি ভালো লাগে না কেন?

— বড্ড একঘেয়ে জীবন। যেমন বাঁধাবাঁধি, তেমনি একঘেয়ে। বিশেষ···বিশেষ···

বনলতা হাসিয়া ফেলিল। কহিল —ওই ডাক্তার-গুলো অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। চিঠিতে, চিঠিতে··

আমি দুষ্টুমি করিয়া বলিলাম — তাতে আর ক্ষতিটা হ'য়েছে কি?

বনলতা তাড়াতাড়ি আমার কথায় সায় দিয়া বলিল — না, সে অবশ্য তেমন বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু এতো বানান ভুল করে! — বলিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া একেবারে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিল। নিজের গাড়ীতে বসিয়া এত হাসাহাসি করিতে আমার ভালো লাগিতেছিল না। কয়দিনই আমার নজরে পড়িয়াছে শোফারটা আমাদের ঝিয়ের সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কি যেন গভীর গবেষণা করিতেছে। যদি এই হাসা-হাসির ব্যাপারটা কোনো-ক্রমে ঝিয়ের মারফৎ গৃহিনীর কর্ণগোচর হয়, আমার আর রক্ষা থাকিবে না।

প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনের জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম — দিনে তোমার ঘুম হ'য়েছিল তো?

— ভালো হয় নি। কেন বলো তো? — বলিয়া বনলতা বিস্মিত-ভাবে আমার দিকে চাহিল।

হাসিয়া বলিলাম — সেই রকমই অনুমান করে-ছিলাম। তোমার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সমস্তক্ষণ কি যেন একটা গভীর বিষয় ভাবছিলে। যখন নেমে এলে তখনও, গাড়ীতে বস্‌লে তখনও, অথচ তোমার চোখ দেখে···

বনলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া-ছিল। বাধা দিয়া বলিল—না, না, আমার চোখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। দু'চার রাত্রি জাগলে আমার কিছু হয় না। রাত তো প্রায়ই জাগতে হয় কি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি অত ভাবছিলে?

হাসিয়া বলিল—সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না।

— বলতে আপত্তি থাকে তো থাক।

ক্লান্তস্বরে বনলতা বলিল — শুনে কি হবে? ভালোবাসার কথা নয়।

বনলতার কথা এবং কথার সুরে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলাম। মনে হইল, তাহার ধারণা, তাহার সুবঙ্কিম হাসি, সুমধুর কথা, সুললিত গতি—শুধু এই সকলেরই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। আমরা যেন তাহার কাছে শুধু ভালোবাসার কথাই শুনিতে চাই। সকল মেয়ের সঙ্গে সকল পুরুষের সম্পর্কই যেন এই। পুরুষে যেন মেয়েদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার সঙ্গে কোনো যোগই রাখিতে চায় না।

দুঃখিতভাবে বলিলাম—যা বলতে চাও না বনলতা, তা শোনবার আগ্রহও দমন করলাম। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কেন যে এমন অবিচার করছ তা বুঝলাম না।

আমার কথায় বোধ করি কিছু আন্তরিকতা ছিল, যা হয়তো বনলতা আশা করে নাই। বড় বড় চোখ মেলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

সে দৃষ্টির উত্তরে একটু কটু কণ্ঠেই কহিলাম — মিথ্যে চেয়ে আছ, বনলতা, আমি অভিনয় করতে পারি না।

বনলতা লজ্জিতভাবে চোখ নামাইয়া লইল।

তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, তা দেখছি না। আজকে, কেন জানি না, তোমাকে বড্ড ভালো লাগছে—সেই প্রথম দিনের মতো। তাই দুঃখের কাহিনী শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কি আবার ভাবব? কিছুই ভাবি নি। ভাবছিলাম, যদি নার্সগিরি ভালো না লাগে? কি করব তখন? এ আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে ভাবি। আবার তখনি ভুলে যাই। এই যে এসে পড়েছি। থামো থামো।

বনলতা দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। যাওয়ার সময় বলিয়া গেল—এখুনি পালিও না যেন আমাকে মাঝ দরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে। আগে দেখে আসি এখানে হালে পানি পাওয়া যাবে কি-না। ফিরতে যদি একটু দেরীও হয়, তবু থেকো। বুঝলে?

আমি একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। বনলতা যে বাড়ীর মেয়ে তাহাদের ঐশ্বর্য্যের কথা কলিকাতা সহরে লোকের মুখে মুখে ফেরে। জীবনে দুঃখের মুখ দেখে নাই। কিন্তু আজ আর সেখানে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। তাহারা বনলতার মুখদর্শনও করিবে না। তাহার প্রথম স্বামীর গৃহেই বা কোন্ অধিকারে ফিরিবে? সর্ব্বশেষে, তাহার দ্বিতীয় স্বামী,—কিন্তু সেখানকার দ্বারও সে নিজের হাতে রুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াছে। বনলতাকে আমি যতদূর জানি, চরম দুর্দ্দিনেও সে কিছুতে সে-পথ মাড়াইবে না।

কিন্তু করিবেই বা কি? যতদিন দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয় নাই, ততদিন দুই মুষ্টি অন্নের কথা ভাবিয়া কোনো প্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণও ঘটে নাই। ঘটিয়াছে এখন। মানুষকে যে কখনও কখনও সত্য-সত্যই দিনের পর দিন উপবাস করিবার মতো অবস্থায়ও পড়িতে হয়, এখন হয়তো সে বিশ্বাসও হইয়াছে। এখন আর তাই দুশ্চিন্তারও শেষ নাই। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকাও আর চলিল না। দারোয়ানটি ঘন ঘন খৈনি টিপিতেছে আর আড়চোখে আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। বনলতাকে সে এই গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছে। আমি যে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি তাহা বুঝিয়া লোকটীর মন বেশ রসস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই অসময়ে হাসপাতালের সামনে গাড়ী দাঁড় করাইয়া অপেক্ষা করিয়া আছি, রাস্তার পথচারীরা পর্য্যন্ত যেন তাহা টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ি দেখিলাম, প্রায় পনেরো মিনিট হইয়া গিয়াছে। অস্থির হইয়া ভাবিতে ছিলাম, গাড়ী রাখিয়া খানিকটা রাস্তায় ঘুরিয়া আসিব কি না,

এমন সময় বনলতার রাঙা শাড়ীর একটি প্রান্ত নজরে পড়িল।

হ্যাঁ, বনলতাই বটে। এমন সুন্দর চলার ভঙ্গি আর কাহারও হইতে পারে না। চাপা হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়াই হুকুম দিল—গড়ের মাঠ।—গাড়ী চলিতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

—কি হ'ল ?

বনলতার মনের কথা দেবতারাও জানেন না। শুধু বলিল—কিছুই নয়।—এবং সমস্ত রাস্তা অনর্গল বকিতে লাগিল। শব্দের পর শব্দ নর্ত্তকীর নূপুরের মতো বাজিতে লাগিল। অথচ কথা বলিবার জন্য এতটুকু প্রয়াস নাই। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, রসে টুলটুলে রাঙা-রাঙা দু'খানি ঠোঁট ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যায়, আর অজস্র বাক্য রঙীন বুদ্‌বুদের মতো অফুরন্ত স্রোতে অনায়াসে বাহির হইয়া আসে। এই ভয়ই করিতেছিলাম। একটু আগে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার যে সকল কথা বলিতেছিল তাহার আর চিহ্নমাত্রই নাই।

এক সময় বলিল—তোমাকে আজ আমার বড্ড ভালো লাগছে। এমন ভালো কোনো দিন লাগে নি।

এতক্ষণ পরে একটা কথা কহিবার ফাঁক পাইলাম। কহিলাম—কেন, আজকে আমার অপরাধ ?

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু হাসিয়া বনলতা বলিল—অপরাধ কোথাও আছে নিশ্চয়। ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো আমারই অপরাধ, কিম্বা এই চমৎকার অপরাহ্লের। সে যাই হোক, তুমি ডায়েরী রাখো তো ?

—রাখি।

বনলতা এক হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—তাহ'লে তাতে লিখে রাখতে পারো, আজকে ১১ই জুলাই অপরাহ্নে, অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেও বনলতা তোমাকে ভালোবেসেছিল। লিখে রাখতে পারো।

বনলতার কাছে জয়ের গর্ব্ব করিবার কখনও অবকাশ ঘটে নাই। আজও সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তাহার মুখের একটা কথায় আমার চারিপাশের পৃথিবী বিপুল জনতা ও কল-কোলাহল লইয়া কোথায় ডুবিয়া গেল! চক্ষের পলকে দেহের শিরায় শিরায় কি যেন কি ঘটিয়া গেল, আমি বাম হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ডান হাতে তাহার মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া ধরিলাম। বনলতা এতটুকু বাধা দিল না। চোখ বন্ধ করিয়া শুধু একবার বলিল—না, না।

হঠাৎ গাড়ীখানা একটা মোড়ের মাথায় ঘস্ করিয়া থামিল। জন-কোলাহলময়ী কদর্য্য পৃথিবী আবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমি বনলতাকে ত্রস্তে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসিলাম। ললাটে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিলাম।

কথা কহিবার শক্তি ছিল না। দারুণ পরিশ্রমের পর প্রত্যেকটি স্নায়ু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। এক সময় চাহিয়া দেখি, ও-প্রান্তে বনলতার সুকুমার তনুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। হুডের কোণে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া গেল, কি জাগিয়া আছে, বোঝা গেল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে কি ঝড় বহিতেছিল, সে আমিই জানি। তাহার অপরিসীম শ্রান্তি দেখিয়াও ক্ষমা করিতে পারিলাম না।

কঠোর কণ্ঠে কহিলাম—আমরা এত দুর্ব্বল ব'লেই কি তুমি আমাদের নিয়ে যখন-তখন এমনিধারা খেলা কর ?

—খেলা !

বনলতা যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। শুধু মুখ ফিরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। যেন এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিল। আমার কথা শুনিতেই পায় নাই। দেখিলাম, তাহার দুই চোখের কোণ বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গালের উপর আসিয়া জমিয়াছে।

মুখে একটা আশ্চর্য্য মালিন্য আসিয়াছে। আমার চোখে, আমার মস্তিষ্কে তখনও যেটুকু স্বপ্ন ছিল, সে মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশেষে উবিয়া গেল। বনলতা ঠিকই বলিয়াছিল, আমরা তাহার চোখের জল চাহি না, চাই ঠোঁটের হাসি। জীবনে এই প্রথম তাহাকে নিজের চেয়ে ছোট মনে হইল। তাহার জন্য দুঃখে ও করুণায় মন ভরিয়া উঠিল।

বনলতা আবার জিজ্ঞাসা করিল — কি বলছিলে? খেলা? খেলা কি?

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম —খেলাই তো কর। কিন্তু যাক্ গে সে সব কথা।

গাড়ীখানা তখন ইডেন-গার্ডেনের ফটকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শোফারকে থামিতে বলিয়া দু'জনে নামিয়া পড়িলাম।

তখনও অফিসগুলির ছুটি হয় নাই। বাগানে ভিড়, বলিতে গেলে, মোটেই জমে নাই। কয়েকটি হিন্দুস্থানী বালক এক টুকরা খোলা মাঠের মধ্যে খেলা করিতেছিল। দুইটি কি তিনটি চানাচুরওয়ালা কেবল আগুন জ্বালিয়া ডালা সাজাইয়া বসিয়াছে। আর গাছের ছায়ায় বেঞ্চে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া একা বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে।

আমরা একটি ছোট কুঞ্জের মধ্যে একখানি বেঞ্চে পাশাপাশি বসিলাম। নিঃশব্দে।

জিজ্ঞাসা করিলাম — কাঁদছিলে কেন?

ভীত চোখ মেলিয়া বনলতা বলিল — গাড়ীখানা হঠাৎ কেমন বিশ্রী থামলো দেখলে না? বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম।

— তুমি ভয় পাও তাহ'লে?

বনলতা হাসিল। বলিল — পেলাম তো।

— এই প্রথম বোধ হয়?

— কি জানি। না, আর একদিন পেয়েছিলাম। আমার প্রথম স্বামী পিঠের ওপর চাবুকের পর চাবুক মেরেও ভয় খাওয়াতে পারে নি। কোনো দিন কেউ পারে নি। কেবল সেই একদিন পেয়েছিলাম। অনেকটা এই রকম। জীবনের দ্বিতীয় ফুল-শয্যার রাত্রে। (বনলতা হাসিল) আমি একটা সোফায় ব'সে ছিলাম, তোমার বন্ধু একগাছা মালা নিয়ে আমার একান্ত সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাত তুলে মালাগাছি আমার গলায় পরিয়ে দিতে যাবেন, ঠিক এমন সময় বাইরে দিয়ে কে যাচ্ছিল তার হাত থেকে একরাশ চায়ের পেয়ালা-প্লেট ঝন্-ঝন্ ক'রে পড়ে গেল। আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। এমন অশুভ বিশ্রী আওয়াজ জীবনে কখনও শুনি নি।

বনলতা এইখানে বসিয়াই শিহরিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম —শুধু তুমি ভয় পেয়েছিলে? আর মোহন? সে ভয় পায় নি?

বনলতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল — দেখ, তোমার এই বন্ধুটি আশ্চর্য্য মানুষ! ওঁর কথা জিজ্ঞেস ক'রো না। তোমাদের সকলকে আমি চিনি, জানি, বুঝি। কিন্তু স্পষ্ট স্বীকার করছি, ওঁকে আমি একবিন্দুও বুঝতে পারি নি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, উনি যেন' রক্ত-মাংসের মানুষই নন। সুখ-দুঃখ ব'লে যেন কিছুই নেই। সামান্য হাসি, সামান্য কথা, আস্তে চলা — সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত সেই একই অব্যয়, অক্ষয় রূপ দেখে দেখে আমি পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম। পালিয়ে তবে বাঁচি!

আমি বলিলাম — তবে অত তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করতেই বা গেলে কেন? ভালোই যখন লাগে নি ···

বনলতা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল — লাগে নি? আশ্চর্য্য লেগেছিল! শুধু ওঁকে বোঝবার জন্যে আমি বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত প্রিয়জন, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছিলাম। কারও সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করি নি। সে তো তুমি জানোই।

— জানি। তবে কেন ছেড়ে এলে?

বনলতা বিষণ্ণভাবে বলিল — ওই তো বললাম, নইলে পাগল হ'য়ে যেতাম। আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, শরৎ—পাথরের দেবতা নিয়ে কি করব বলো?

বলিবার কিছুই ছিল না। বনলতা খরস্রোতা। কুটিল আবর্তে এবং উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে দুই কূল ভাঙ্গিয়া বহিয়া চলিতে চায়। সে কি পারে এক মুহূর্তে সমস্ত বেগ সংহত করিয়া ধ্যানমৌন নিস্তব্ধ পাহাড়ের পাদমূলে দিনের পর দিন মৃদু স্তব-গুঞ্জন গাহিয়া চলিতে? তাহারই বা দোষ কি? ভগবান তাহাকে এমনি করিয়াই তো সৃষ্টি করিয়াছেন।

সত্যই তো। এ মেয়ে পাথরের দেবতা লইয়া করিবে কি? মোহনকে তো আমি ছেলেবেলা হইতেই জানি। সে কখনও হাসে নাই, খেলে নাই, ছুটাছুটি, মারামারি করে নাই, জীবনে কাহাকেও একটা কটু কথা কহে নাই, পরিহাস করিয়াও একটা মিথ্যা কথা বলে নাই। কেবল রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া রাজ্যের বই পড়িয়া জ্ঞান-সঞ্চয় করিয়াছে, আর পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছে। সে পড়ার এখনও শেষ হইল না। আমি তো ভাবিয়াই অবাক হইয়া যাই, বনলতার খরস্রোতে সে আসিয়া পড়িলই বা কখন? এই স্রোতে আমি এবং আমারই মতো আরও কত হতভাগ্য যখন কুটার মতো ভাসিতেছিলাম, সে তখন কাছেই কোথাও ছিল নিশ্চয়। নজর করিয়া দেখি নাই। দেখিবার মতো দৃষ্টিও তখন ছিল না। অকস্মাৎ সংবাদ পাইলাম, বনলতার সঙ্গে তাহার বিবাহ। সংবাদ নয়, একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র। তৎপূর্বে কোনো দিন তাহার মুখে বনলতার কথা, অথবা বনলতার মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না।

দুইজনেই আমার কাছে সমান রহস্যময়। যেমন মোহন, তেমনি বনলতা। এতদিনে কাহাকেও বুঝিতে পারিলাম না। একজন কথাই কহে না। আর একজন এত কথা কহে যে, কোন্‌টা তাহার মুখের কথা, কোন্‌টা মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই। বেশ মনে পড়ে, তাহাদের বিবাহের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, বার-বার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিলাম এবং মোহনকে অজস্র গালি দিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, চিরদিন আমাদের সকলকে ডিঙাইয়া যে 'প্রাইজ' লইয়া গিয়াছে সে এখনও সঙ্গ ছাড়িল না!

বনলতা বলিতে লাগিল — দু'টি বৎসর কি ক'রে যে কেটেছে সে আমিই জানি। এক মুহূর্ত নিজেকে বিশ্রাম দিই নি। ভগবানকে জানবার জন্যে মানুষ যে রকম কৃচ্ছ্রসাধন করে, তাই করেছি। তুমি বুঝে দেখ না, আমার মতো মেয়ে — বহু লোকের সঙ্গ, বহু কণ্ঠের কলরব, প্রত্যেক মুহূর্তে যা-হোক-একটা-কিছু করার উত্তেজনা ছাড়া যার এক মিনিটও কাটে না—সে নিজেকে দু'টি বৎসর অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছিল। প্রত্যেকটি মুহূর্তে তাকে আরাম এবং আনন্দ দেবার জন্যে কী করি নি? দারুণ গ্রীষ্মেও প্রত্যহ নিজের হাতে তার জন্যে বিশেষ একটা কিছু রান্না রেঁধেছি — কোনো দিন মুখে দিয়েছে কোনো দিন দেয় নি। তার পড়ার ঘরখানি দিন-রাত্রি ঠাকুর-ঘরের মতো সাজিয়ে রেখেছি—একদিন চেয়ে দেখেছে? সন্ধ্যা হ'লে নিজেকে কত রকমে সাজিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বই থেকে মুখও তোলে নি। একটিবারের তরে একটুখানি স্নিগ্ধ দৃষ্টির প্রসাদ পাবার জন্যে কী ক'রেছি, আর কী না ক'রেছি, শরৎ, ভাবতেও লজ্জায় মরে যাই।

বনলতা চুপ করিল।

আমি একটু থামিয়া বলিলাম — তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হ'ত না?

— ঝগড়া? ওর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় ভেবেছ ওর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, ভাব করা যায় না, কিছু করা যায় না। কেবল নিষ্কাম সেবায় হাত পাকাতে চলে।

বনলতা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। কণ্ঠস্বর

একটু সংযত করিয়া বলিল — ঝগড়া! ঝগড়া করলে তো বেঁচে যেতাম। ও যে কিছুই করে না, কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে ব'সে ব'সে বই পড়ে। আমি তাই পালিয়ে বেঁচেছি। অন্য মেয়ে হ'লে আত্মহত্যা ক'রত।

একটি দুইটি করিয়া বাগানে ক্রমেই ভিড় জমিতেছিল। কৌতূহলী পথচারীর দৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ করিতে লাগিল। আসিবার সময় যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে একাকী বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সে দেখি ইহারই মধ্যে কখন উৎসাহিত হইয়া আমাদের পিছনে এমন একটি জায়গায় বসিয়াছে যেখান হইতে আমাদের দুইজনকে স্পষ্ট দেখা যায়। কথা কহিতে কহিতে বনলতা কখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পায়ের কাছে হ্রদের জলে কয়েকটি পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। কোটি কোটি পরাগকণা ঢেউ-এর তালে তালে দুলিতেছিল। বনলতা সেই দিকে চাহিয়া আপনার মনে কি যেন ভাবিতেছিল।

বলিলাম—ফুলের ওপর লোভ তোমার এখনও যায় নি দেখছি।

বনলতা ঘাড় ফিরাইয়া একটুখানি হাসিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। বলিল—ফেরার পথে নিউ-মার্কেট থেকে কতকগুলো ফুল কেনা যাবে, কেমন?

বনলতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

বুঝিতেছিলাম অতীত দিনের স্মৃতির ভারে তাহার মন ভারী হইয়া উঠিতেছে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তবু আর কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ হইতে একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল। কিন্তু এখনই তাহা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হইবে কি না, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে সেই প্রশ্নই করিয়া বসিলাম।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম— অপরিমিত ঐশ্বর্যের মাঝে তুমি যেমন ক'রে বড় হ'য়েছ সে আমি জানি। আর আজ এমনই অবস্থায় এসে পৌঁছেচ যে, একটি দিন না খাটলে সে দিনের অন্নসংস্থান হবে না। আমার এই কৌতূহল মেটাবে বনলতা, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হেলায় পরিত্যাগ ক'রে এই দুঃখ বরণ ক'রেছ কিসের লোভে? কী সে বস্তু?

আমার প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিল। বলিল— আশ্চর্য্য! ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম। কিসের লোভে বলো তো?

আমি হাসিয়া বলিলাম—সে কি আমার জানবার কথা?

সে আবার হ্রদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আমিও জানি না। কিসের আবার লোভে! এই আমার প্রকৃতি। খুব সম্ভব, এই উচ্ছৃঙ্খলতা বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। এ আমার রক্তের মধ্যে বইছে।

বনলতা দম লইবার জন্য একটু থামিল। আবার বলিতে লাগিল—কিছুরই লোভে নয়। এমনি ছেড়ে দেওয়া। অকারণে ছেড়ে চলে আসা। জোঁকের মতো আগেরটাকে ধ'রে পরেরটাকে ছেড়ে দেওয়া নয়। হাতেরটাকে ছেড়ে দিয়ে স্রেফ হাওয়ার ওপর ভাসা। ভালো লাগে না। ব্যস্। ছেড়ে দাও। এমনি একটার পর একটা ছেড়ে দেওয়া। কোনো কারণ নেই। কেবল ভালো লাগে না।

গভীর উত্তেজনায় তাহার সমস্ত দেহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। কিন্তু এ অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা জানিয়া চুপ করিয়া গেলাম। এই কুঞ্জের মধ্যে যে এতক্ষণ কাটিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। চাহিয়া দেখি অপরাহ্নের সূর্য্য গোধূলির প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সন্ধ্যা হয়-হয়।

হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝলক হাওয়া আসিয়া আমাদের লতা-মণ্ডপকে নাড়া দিয়া গেল। কতকগুলা শুক্‌না পাতা সর্বাঙ্গের উপর ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমি অতি সন্তর্পণে বনলতার দেহ

হইতে ঝরা পাতাগুলি ফেলিয়া দিতেছিলাম। কয়েকটি পাতা মাথার চুলে এমন ভাবে আটকাইয়া গিয়াছে যে, সহজে তোলা যায় না। সে কয়টি ফেলিয়া দিবার জন্য তাহার মাথাটি একটুখানি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেই পিছনে কে চেঁচাইয়া উঠিল, হায় হায়!

চমকিয়া চাহিয়া দেখি, সেই মাড়োয়ারীটা। মাড়োয়ারী ছাড়া এমন আর কে করিতে পারে! লোকটা এখনও ঠায় তেমনি করিয়া বসিয়া আছে, এবং সম্প্রতি উপরের নীচের দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করিতেছে। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বর্ব্বরটাকে শাস্তি দিবার জন্য উঠিতে যাইব, বনলতা হাত চাপিয়া ধরিল। দেখি এই রসিকতায় সে বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মাড়োয়ারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তরলকণ্ঠে বলিল, —কেয়া বাবুজি, মিজাজ ঠিক হো গিয়া?

আনন্দে লোকটা উত্তর দিতে পারিল না। শুধু দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ঘাড় হেলাইয়া সেলাম জানাইল। ভাবটা, আপহিঁকো মেহেরবাণী!

আমার ভালো লাগিতেছিল না। বিরক্তকণ্ঠে কহিলাম—চলো, চলো, এইবার ওঠা যাক্।

—হ্যাঁ, চলো।—বলিয়া বনলতা আমার পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিল। মাড়োয়ারীটার পাশ দিয়া আসিবার সময় একটা চঞ্চল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—রাম-রাম বাবুজি। আব্ ঘর চলা যাইয়ে।

উত্তরে লোকটা কি বলিয়াছিল শুনিতে পাই নাই। হয়তো কথা বলিবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, বনলতার সম্বন্ধে তাহার ভালো ধারণা হয় নাই। এমন কি তাহার ঠিকানাটা না লওয়ার জন্য বাড়ী গিয়া অনুতাপও করিতে পারে। চাহিয়া দেখিলাম, বনলতার মুখে কয়েক মিনিট পূর্ব্বেকার দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নাই। ঘন মেঘভার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিস্মিত এবং বিরক্তকণ্ঠে বলিলাম—ছিঃ বনলতা, তুমি কী!

বনলতা বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হইল না। লঘুকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—তুমি যা ভেবেছিলে তা নই। দেখলে তো!

ভর্ৎসনা করিবার মতো উপযুক্ত বাক্য খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলাম—আশ্চর্য্য!

বনলতা যেন একটু শান্ত হইল। বলিল—তা না হয় হ'লাম। কিন্তু তুমি কী বল তো! এত jealous!

—Jealous! ওই লোকটা···

—হ্যাঁ, ওই লোকটা। কি ক'রেছে ওই লোকটা?

—কি ক'রেছে? একজন ভদ্রমহিলার সামনে···

—ভদ্র মহিলার!

বনলতা খোলা প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। এত জোরে যে, একটি কলেজের ছেলে দ্রুত ভ্রমণের মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া দেখিল। বাঁ-দিকের খোলা জায়গায় দুইজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত দার্শনিকভাবে হাসিয়া যেমন পায়চারী করিতেছিলেন তেমনি করিতে লাগিলেন। আমি তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে আনিয়া বসাইলাম।

—ভদ্র মহিলার সামনে!—বনলতা বলিতে লাগিল—'ভদ্র মহিলা'র মানে কি মশাই? Lady-র বাংলা তর্জ্জমা তো? আমরা ভদ্রলোকের স্ত্রী বা কন্যাকে বিলিতি কেতায় বলি 'ভদ্রমহিলা'। আগে এদেশে প্রত্যেক মেয়েকেই 'ভদ্রে' ব'লে সম্বোধন করার প্রথা ছিল। পুরুষের কাছে যে-কোনো মেয়েই ভদ্রমহিলা। সেও বাজে কথা। আসলে নারী নারী, পুরুষ পুরুষ। এবং তাদের মধ্যে একটিমাত্র সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ চিরকালের এবং যা হওয়া উচিত। তা না, যত বাজে কথা! ভদ্রমহিলা!

বনলতা আমার কথাকে পরিহাসভরে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়াইয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বিস্ময়ে ও বিতৃষ্ণায় হতবাক্

হইয়া গেলাম। বনলতাকে চিনিতে আমার বাকী নাই। কিন্তু তাহার আজিকার পরিচয় অতীতের সকল পরিচয়কে অতিক্রম করিয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বনলতা আপন মনেই বলিতে লাগিল—কবিতা ক'রে, আর বিশুদ্ধ বাংলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে পরিষ্কার ক'রে মনের কথা বলতে গিয়ে আজ বিকেলটাই মাটি ক'রে ফে'লেছিলাম! ভাগ্যিস্ আমার বাবুজি ছিল! বেশ লোক! খাসা লোক! একেবারে আদিম বর্ব্বর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল···পরিষ্কার মাটির গন্ধ···কি ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল?···হায় হায়!···না-কি? বলো না?

বলিয়া আবার কৌতুকভরে হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কাছে, দূরে, আরো দূরে নীলাভ-কৃষ্ণ মাঠের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে আলোকমালা জ্বলিতেছে। প্রচুর আলো বহন করিয়া মাঝে মাঝে ট্রাম ছুটিতেছে। গঙ্গার জল কোথাও নিকষ কালো, কোথাও আলোয় ঝলমল করিতেছে।

আমার হাতে একটা ঠেলা দিয়া বনলতা বলিল—এ আবার কোথায় চলেছ?

শোফারকে কোনো গন্তব্যের নির্দ্দেশ দিই নাই। বলিলাম—জানি না।

—বাঃ! বেশ তো! নিউমার্কেটে যাবে না? ফুল কিনবে ব'লেছিলে যে! ভুলে গেছ?

শোফারকে নিউমার্কেটের দিকে যাইতে বলিলাম। বনলতা আমার দিকে সুমুখ ফিরিয়া বসিল। আমার পাঞ্জাবীর বোতাম নাড়া-চাড়া করিতে করিতে বলিল—কি ফুল কিনে দেবে জানো? পদ্ম। একটিমাত্র পদ্মফুল। মৃণালশুদ্ধ পদ্ম বুকের ওপর রেখে ঘুমুতে এত ভালো লাগে! সমস্ত মন, সমস্ত চিন্তা, আমার স্বপ্ন পর্য্যন্ত যেন সুরভিত হ'য়ে ওঠে! হাসছ যে!

বলিলাম—না না, হাসি নি। তোমার কবিতা শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, এক মিনিট আগে কবিতা করার কত নিন্দা তুমি নিজেই করছিলে!

বনলতা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তাই না-কি? কি করব? অভ্যেস হ'য়ে গেছে। সভ্যতা আর ভদ্রতার কাছ থেকে এই তো পেয়েছি। সুযোগ পেলে আর ছাড়তে পারি না।

হঠাৎ এক সময় আবার বলিল—আচ্ছা, তোমার শ্রীকুমারকে মনে পড়ে? কবি শ্রীকুমার?

—পড়ে। সে কোথায় আছে বলো তো?

মাথা নাড়িয়া সে বলিল—জানি না। হঠাৎ তার কথা মনে প'ড়ে গেল। একদিন আমি তার কবিতার সুখ্যাতি করছিলাম। শ্রীকুমার হেসে বললে, এ আর কি কবিতা বনলতা দেবী, নিজেকে তো আর সর্ব্বদা দেখতে পাচ্ছেন না, তা হ'লে বুঝতে পারতেন ভগবানের লেখা আসল কবিতা কাকে বলে। বেশ ব'লেছিল, না?

আমি হাসিয়া বলিলাম—চমৎকার ব'লেছিল।

—আচ্ছা, ও কি সত্যি কথাই ব'লেছিল, না ফাঁকা কবিতা?

—সত্যি কথা। তামা-তুলসী নিয়ে শপথ করতে পারি।

—যাও! যত সব···বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একবার নিজেই নিজেকে যতদূর সম্ভব দেখিয়া লইল।

বলিলাম—কেমন? বিশ্বাস হ'ল তো?

বনলতা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া আমাকে ঠেলিয়া দিল। একটু পরে ম্লানকণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে? আমি তো তেমন ভালো নই!

নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না সে ভালো নয়, সে পবিত্র নয়। বলিলাম—কেন? মন্দই বা কি?

বনলতা নিজেই বোধ হয় নিজের কথার প্রতিবাদ খুঁজিতেছিল। আমার মুখের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে লুফিয়া লইয়া বাঁ হাত দিয়া সমস্ত তর্ক হেলায় উড়াইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কিসের মন্দ! তুমিও যেমন! ভালো আর মন্দ! মানুষ কখনও মন্দ হয়?

মার্কেটে তাহাকে একটি ফুল কিনিয়া দিলাম।

মস্ত বড় পদ্মফুল। গাড়ীতে উঠিয়া সেটিকে লইয়া সে যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একবার মাথায় রাখে, একবার বুকে চাপিয়া ধরে, একবার গালে ছোঁয়ায়, একবার অধরে স্পর্শ করে। মৃণালটি বার বার বহু ভঙ্গিতে গলায় জড়ায়। ফুল পাইয়া বনলতা ছোট মেয়ের মতো আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

বলিল—চমৎকার ফুলটি, না?

আবার বলিল—কতকাল যে পদ্মফুল দেখি নি তার ঠিক নেই। তিন বছরের বেশী।

—কেন?

—লক্ষ্ণৌতে পদ্মফুল হয় কি না জানি না। চোখে তো পড়ে নি। আর, তার আগে তোমার বন্ধুর কারাগারে। আমিও সেধে চাই নি, উনিও কোনো দিন দেওয়ার কথা ভাবেন নি। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

সে ফুলটি দিয়া আমার গালে আঘাত করিল। হাসিয়া বলিল—কেমন? খুব মিষ্টি, না?

—খুব মিষ্টি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বনলতা বলিল—সুন্দর ফুলের আঘাতও মিষ্টি, বুঝলে?

হাসিয়া বলিলাম—তাই তো দেখছি।

পরম স্নেহভরে ফুলটিকে সে আবার বুকে চাপিয়া ধরিল—চমৎকার ফুল, না? Splendid! অনেক দিনের পরে দেখা, আমি একেবারে এর প্রেমে প'ড়ে গেছি, heels over head!

বনলতা ফুলটিকে একটি সুদীর্ঘ চুম্বন দিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—Glorious! আজ নিশ্চয় তোমাকে স্বপ্ন দেখব। খুব চমৎকার একটি স্বপ্ন। কাল এসো, বলব কি স্বপ্ন দেখলাম। আসবে তো?

আমারও কেমন নেশা জমিয়া আসিতেছিল। বলিলাম—দেখব!

—না, দেখব নয়। নিশ্চয় আসবে। নিশ্চয়। আমি তোমার পথ চেয়ে ব'সে থাকব, সেই চাতকিনী না-কি বলে তারই মতন। তুমি নিশ্চয় আসবে। তোমার গাড়ীখানা নিয়ে। কালকে পাঁচটায় সময়, বুঝলে?

সে একটি করিয়া কথা বলে, আর ফুলটি দিয়া এক একবার করিয়া আঘাত করে। আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া যায়। গাড়ীখানা তাহাদের হাসপাতালের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বনলতা হঠাৎ আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—শোনো। তোমার কাছে টাকা আছে?

—কত?

—যা পারো। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ…আমার হাত একেবারে খালি হ'য়ে গিয়েছে।

নোট-কেসটা হইতে কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া গণিয়া দিতেছিলাম। বলিল—থাক, আর গুণতে হবে না। ওতেই হবে।

বনলতা ছোঁ দিয়া নোটগুলি তুলিয়া লইল। সেই মুহূর্তে গাড়ীখানা হাসপাতালের ফটকের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নামিয়া পড়িল। ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় আর একবার বলিয়া গেল—কাল এসো কিন্তু।

মোটর বাড়ীর দিকে ফিরাইতে বলিয়া এক কোণে ঠেস দিয়া বসিলাম। আজ সমস্ত দিন একটা স্বপ্নের মতো কাটিয়া গেল। দুই পাশের চলমান্ বিপুল জনতা এবং কলিকাতার কদর্য্যতা দেখিয়া ভাবিতেই পারিতেছিলাম না যে, মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বনলতা আমার পাশে বসিয়াছিল। তাহাকে যতই দেখিতেছি ততই বিস্ময় বাড়িতেছে। আপনার রূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বসময় এমন সচেতন মেয়ে আমি দেখি নাই। এ কেবলই নিজের কথা ভাবে—নিজের অপরূপ রূপের কথা। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও কুণ্ঠা নাই। জানে, তাহার পায়ে মাথা না নোয়াইয়া কাহারও উপায় নাই। রূপ-সম্বন্ধে এই বিশ্বাস যে-দিন ভাঙিবে সেই দিনই ও মরিবে—তার আগে নয়। তার আগে ও এমনি করিয়াই ফিরিবে। স্রোতের শৈবালের মতো—কোনো ঘাটেই ভিড়িবে না। তৈমুরলঙ্গের মতো। কেবল জয়ের পর জয়ই

করিবে। কোথাও সে বিজয়-গৌরব উপভোগ করিবার জন্য দুই দণ্ডের বেশী অপেক্ষা করিবে না। বলে, ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না।

কিন্তু বনলতার সম্বন্ধেও বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন আমার স্নায়ুর উপর ভীষণ টান গিয়াছে। সে দ্বন্দ্বে আমি ভিতরে ভিতরে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। মোটরের এককোণে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিলাম।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্

গত বৈশাখ সংখ্যার 'উদয়নে'র প্রবন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত জর্জ্জর-পূজা-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মার আদেশে দেবলোকে দুর্ভেদ্য নব নাট্যগৃহ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিলেন। পিতামহের সামপ্রয়োগে দেব ও দৈত্যগণের বিবাদ আপোষে মিটিয়া গেল। তাহার পর ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে বিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে নবনির্ম্মিত নাট্যমণ্ডপে যথাবিধি রঙ্গদেবতাগণের ও জর্জ্জরের পূজা সম্পাদিত হইল। অনন্তর মহর্ষি ভরত পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! আদেশ করুন, কোন্ দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করিব?" ব্রহ্মা 'অমৃতমন্থন' নামক 'সমবকারে'র অভিনয় করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এ-অভিনয় এতই স্বাভাবিক ও মনোরম হইয়াছিল যে, দেবাসুরগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া একত্রে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই অমৃতমন্থন সমবকারকেই দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য বলা চলে। ইহার রচয়িতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভরতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"অদ্য দেবাধিদেব মহাদেবকে নাট্য-প্রয়োগ দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব, তুমি প্রস্তুত হইয়া লও।" ইহার পর ব্রহ্মা, অমরবৃন্দ ও ভরত সদলে মহাদেবের আবাসে গমন করিলেন। তথায় ত্রিলোচনের পূজাপূর্ব্বক পিতামহ অভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। উমাপতি সানন্দে অভিনয়-দর্শনে সম্মত হইলেন। তদনুসারে হিমাচল-পৃষ্ঠে অমৃতমন্থন সমবকারের পুনরভিনয়ের আয়োজন হইল। সমবকারের সহিত 'ত্রিপুরদাহ' নামক একখানি 'ডিম'ও অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই ত্রিপুরদাহ ডিমখানিও পিতামহের রচনা। অভিনয়-দর্শনে মহাদেব ও ভূতগণ পরম প্রীত হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভরত নাট্যমধ্যে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তির নিবেশ সম্যগ্‌রূপেই করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেবাধিদেবের নৃত্তদর্শনে কৈশিকী প্রয়োগের ইচ্ছাও ভরতের মনে জন্মিয়াছিল। আর সেই উদ্দেশ্যে কৈশিকীপ্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ প্রার্থনা করায় পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালঙ্কার-চতুরা অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু সম্যগ্ উপদেশের অভাবে ভরত নাট্যমধ্যে সুশ্লিষ্টভাবে কৈশিকীপ্রয়োগ করিতে পারেন নাই। ভরতের এই ত্রুটিটুকু দেখিয়া দেবাধিদেব কৃপা-পরবশ হইয়া পিতামহকে বলিলেন—"হে মহামতি! আপনার

(১) ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা, উদয়ন—শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৭৮।

স্পষ্ট নাট্যাভিনয় অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা যশস্য, পবিত্র, মঙ্গলকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধক। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমিও সন্ধ্যাসময়ে অঙ্গবিক্ষেপ করিতে করিতে নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছি (২)। এই নৃত্য নানাবিধ করণসংযুক্ত অঙ্গহারসমূহের দ্বারা বিভূষিত। অতএব, পূর্ব্বরঙ্গমধ্যে আপনি ইহা নিবেশিত করিয়া দিন। এখন যে পূর্ব্বরঙ্গ প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় "শুদ্ধ পূর্ব্বরঙ্গ" নামে প্রচলিত আছে। নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা "চিত্র পূর্ব্বরঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবে (৩)।

---

(২) মূলে আছে—"ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা" (৪।১৩)। ইহার অর্থ—মহাদেব নৃত্যকলার স্মর্ত্তা মাত্র, কর্ত্তা নহেন। নৃত্য অনাদি। মূলে 'নৃত্য' এই পাঠ থাকিলেও অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকায় 'নৃত্ত' এই পাঠ ধরিয়াছেন। উভয়ের প্রভেদ—উদয়ন—শ্রাবণ, পৃঃ ৩৭৮ ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৯৬১ দ্রষ্টব্য।

(৩) নাট্য—রসাশ্রয়; নৃত্য—ভাবাশ্রয়; নৃত্ত—তাললয়াশ্রয়—দশরূপক মতে ইহাই সংক্ষিপ্ত ভেদ করণ—নৃত্তক্রিয়া, গাত্রসমূহের হস্তপাদ সমাযোগ। করণে স্থিতি ও গতি এ উভয়ই নিষ্পাদ্য। স্থিতিকালে—বিভিন্ন স্থান, পূর্ব্বকায়ে পতাকাদি, আর গতিকালে—চারী, পূর্ব্বকায়ে বিভিন্ন নৃত্যহস্ত, দৃষ্টি প্রভৃতি করণের অন্তর্ভুক্ত। দুইটি নৃত্তকরণে এক নৃত্তমাতৃকা নিষ্পাদিত হয়। দুই, তিন বা চারি মাতৃকায় একটি অঙ্গহারের উৎপত্তি। অঙ্গহার—অঙ্গগণের অক্রটিতভাবে সমুচিত স্থান প্রাপণ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে ১০৮ করণ ও ৩২ অঙ্গহারের লক্ষণ দেওয়া আছে। পূর্ব্বরঙ্গ—রঙ্গে যাহা পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় তাহারই নাম পূর্ব্বরঙ্গ। সভাপতি, সভ্য, গায়ক, বাদক, নটী, নট প্রভৃতি যাহাতে পরস্পরের অনুরঞ্জন দ্বারা আনন্দলাভ করেন তাহাই রঙ্গ।

এই রঙ্গ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় বলিয়া পূর্ব্বরঙ্গ নামে খ্যাত—ইহাই ভাব-প্রকাশনকার শারদাতনয়ের মত। সাহিত্যদর্পণের মতে—নাট্যবস্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে রঙ্গবিঘ্ন শান্তির জন্য কুশীলবগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই পূর্ব্বরঙ্গ। অভিনবগুপ্ত সমাস ভাঙ্গিয়াছেন "পূর্ব্বো রঙ্গঃ"। নাট্যশাস্ত্রের মতে পূর্ব্বরঙ্গের উনবিংশতিটি অঙ্গ। উহার মধ্যে নয়টি যবনিকার অন্তরালে প্রযোজ্য—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত। দশটি যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য—গীতক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত, প্ররোচনা। শারদাতনয় ২২টি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণ, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘট্টনা, মার্গাসারিত, শুষ্কাপকৃষ্টক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, প্ররোচনা, ত্রিগত, আসারিত, গীত, ধ্রুবা, ত্রিসাম, রঙ্গদ্বার, বর্দ্ধমানক, চারি, মহাচারি। মোটের উপর প্রকৃত অভিনয়ের পূর্ব্বে নাট্যের অঙ্গভূত—গীত, তাল, বাদ্য, নৃত্ত, পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ করা হয় উহারই নাম পূর্ব্বরঙ্গ। এই পূর্ব্বরঙ্গ চারি প্রকার—চতুরশ্র, ত্র্যশ্র, চিত্র ও শুদ্ধ। মতান্তরে (কোহলাদির মতে) ইহা ত্রিবিধ—শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র। পূর্ব্বরঙ্গের গীতক বলিয়া যে অঙ্গটি আছে, উহা এক প্রকার গীতবিধি মাত্র। উহার বিষয় দেবতাগণের স্তুতিকীর্ত্তন। এই গীতক যদি অঙ্গচালন ব্যতীত প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে শুদ্ধ পূর্ব্বরঙ্গের প্রয়োগ হইতেছে বুঝিতে হইবে। আর উহাতে যদি নৃত্তের সংমিশ্রণ থাকে, তবে উহা হইবে চিত্র পূর্ব্বরঙ্গ। উদ্ধত পূর্ব্বরঙ্গে মহাদেবের আবিষ্কৃত করণাঙ্গহারের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর সুকুমার পূর্ব্বরঙ্গে মহাদেবীর আবিষ্কৃত অনুদ্ধত অঙ্গহার যোজনীয়। অভিনবগুপ্ত স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ব্বতী যে সুকুমার প্রয়োগকর্ত্রী তাহা নাট্যশাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে (৪।২৫৭)। দশরূপককার বলেন যে, ভাবাশ্রয় নৃত্যে পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান। উহা 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ। আর তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম 'দেশী'। নৃত্য ও নৃত্ত উভয়ই আবার দ্বিবিধ—মধুর ও উদ্ধত। মধুর প্রয়োগের নাম 'লাস্য' ও উদ্ধতের নাম 'তাণ্ডব'। শারদাতনয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। যাহা রসাত্মক তাহাই বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয় তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয়, নৃত্ত রসাশ্রয়। এ উভয়ই নাট্যের উপকারক।

শারদাতনয়ের মতে দৃশ্যকাব্য ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে নাটকাদি দশটি রূপক রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। অবশিষ্ট ডোম্বী প্রভৃতি বিংশতি রূপক ভাবাত্মক ও পদার্থাভিনয়প্রধান। অবশ্য

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে দেবাধিদেব ! অঙ্গহারের প্রয়োগ আপনিই শিক্ষা দিন।" তখন মহেশ্বর তণ্ডু (অর্থাৎ নন্দীকে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি ভরতকে অঙ্গহারপ্রয়োগ শিক্ষা দাও।" তদনুসারে তণ্ডু ভরতমুনিকে নৃত্যশিক্ষা দিলেন। তণ্ডুর নিকট ভরত শিক্ষালাভ করিয়া পূর্ব্বরঙ্গের অঙ্গরূপে করণ-অঙ্গহার-রেচক-পিণ্ডীবন্ধসংযুক্ত অপূর্ব্ব তাণ্ডব নৃত্য যোগ করিয়া দিলেন। তণ্ডু প্রথম এই নৃত্যের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া নটরাজের আবিষ্কৃত নৃত্যের নাম হইল 'তাণ্ডব' নৃত্য (৪); পরে ইহাতে ভগবতীর আবিষ্কৃত সুকুমার অঙ্গহারসম্পন্ন 'লাস্য' নৃত্যও সংযোজিত হইয়াছিল। এইরূপে নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংযোগে দেবলোকের অভিনয় ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

সমবকার ও ডিম—শব্দ দুইটি একটু অপরিচিত ঠেকিতে পারে। উহাদিগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ দৃশ্যকাব্যকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) রূপক, (২) উপরূপক। রূপক আবার দশবিধ—(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) অঙ্ক (উৎসৃষ্টিকাঙ্ক), (৪) ব্যায়োগ, (৫) ভাণ, (৬) সমবকার, (৭) বীথী, (৮) প্রহসন, (৯) ডিম, (১০) ঈহামৃগ (৫)।

উপরূপক আবার অষ্টাদশ প্রকার। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। এইটুকু মাত্র বক্তব্যই পর্য্যাপ্ত যে, সমবকার ও ডিম—দুই প্রকার দৃশ্যকাব্যমাত্র। ইহাদিগের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এখানে দেওয়া গেল।

এই সংখ্যাভেদ লইয়া মতান্তর আছে। কিন্তু শারদাতনয় স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত মত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নটের কর্ম্ম নাট্য, আর নর্ত্তককর্ম্ম পদার্থাভিনয়। নটকর্ম্ম ও নর্ত্তককর্ম্ম—এ উভয়ই আবার নৃত্ত-নৃত্যভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (নৃত্য) 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ ও তদ্রহিত (নৃত্ত) 'দেশী'। ডোম্বী, শ্রীগদিত প্রভৃতিতে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য বলিয়া ঐ বিংশতি রূপককে 'নৃত্যে'র প্রকারভেদ বলা হইয়াছে। এই 'নৃত্যে'র স্বরূপ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গসমূহদ্বারা পদার্থাভিনয়। নাটকাদি রূপকসমূহে যে 'নৃত্ত' প্রযুক্ত হয় তাহার স্বরূপ—লয়তাল-সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপমাত্র। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপশূন্য যে অভিনয় তাহাই 'নাট্য'। মোটের উপর নৃত্ত নটাশ্রিত, রসপ্রধান ব্যাপার; আর নৃত্য ভাবাভিনেয় ও নর্ত্তকাশ্রিত। নৃত্ত ও নৃত্য—উভয়ই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দ্বিবিধ। মধুর 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' উদ্ধত। নট ও নর্ত্তক মিলিয়া রসভাব সমাযুক্ত যে অঙ্গচালন করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত, অঙ্গহার ও লয়গুলি যাহাতে ললিতভাবযুক্ত ও কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য—তাহাই লাস্য। আর যাহার করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত, বৃত্তি আরভটী—তাহাই তাণ্ডব। পূর্ব্বরঙ্গে এ উভয়েরই প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আবার অন্যত্র বলিতেছেন—নৃত্তই তাণ্ডব ও নৃত্য লাস্য। তালমান-লয়যুক্ত, উদ্ধত অঙ্গহারসহ যে অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র তাহাই তাণ্ডবনৃত্ত। আর অনুদ্ধত অঙ্গহারের নাম লাস্যনৃত্য। লাস্য চতুর্ব্বিধ—শৃঙ্খলা, লতা, পিণ্ডী, ভেদ্যক। তাণ্ডব ত্রিবিধ—চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড।

(৪) কোন কোন স্থলে 'তাণ্ড' বা 'তাণ্ডিন্' পাঠ আছে। অভিনবগুপ্ত বলেন যে, 'তণ্ডু' শব্দই ঠিক। 'তণ্ডু' হইতেই তাণ্ডব শব্দের বুৎপত্তি অনায়াসলভ্য (নাঃ শাঃ ৪।২৬৭-৮)

(৫) ইহা নাট্যশাস্ত্রের মত। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতিও এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। গুণচন্দ্র ও রামচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণের মতে দ্বাদশরূপক—উক্ত দশ রূপক ব্যতীত নাটিকা ও প্রকরণীকেও তিনি রূপক মধ্যে গণনা করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নাটিকার লক্ষণও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা নাটক ও প্রকরণের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ সংখ্যা ধরা হয় নাই। দশরূপকেও ইহারই অনুসরণ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা কেহই পৃথক্ উপরূপকের উল্লেখ করেন নাই। শারদাতনয় মোট ত্রিশ প্রকার রূপকের নাম করিয়াছেন। উপরূপক সংজ্ঞাটি তিনি ব্যবহার করেন নাই।

সমবকার — নানাবিধ বিষয় চারিদিকে ইতস্ততঃ সমবকীর্ণ হয় বলিয়া এই শ্রেণীর রূপকের নাম হইয়াছে 'সমবকার'। ইহা দশরূপকের টীকাকার ধনিকের মত। নাট্যদর্পণের মতে — সঙ্গত ও অবকীর্ণ অর্থ (প্রসিদ্ধ ত্রিবর্গোপায়) দ্বারা গ্রথিত দৃশ্যকাব্যই সমবকার (৬)। ইহার বস্তুভাগ অতি প্রসিদ্ধ দেবাসুর-যুদ্ধবীজমূলক হওয়া প্রয়োজন। নাটকাদি রূপকের মত ইহাতেও আমুখ (অর্থাৎ প্রস্তাবনা—prologue) সন্নিবেশ কর্তব্য। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ— এই চারিটি সন্ধি ইহাতে থাকিবে কিন্তু বিমর্শ সন্ধি থাকিবে না (৭)। প্রখ্যাত উদাত্ত চরিত্র নায়ক দেব ও দানব মিলিয়া দ্বাদশটি (৮)। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ফললাভের উল্লেখ থাকিবে (যেমন, সমুদ্রমন্থনে নারায়ণের লক্ষ্মীলাভ, ইন্দ্রের ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রাপ্তি ইত্যাদি)। সমগ্র গ্রন্থখানির বিষয় অষ্টাদশ নাড়িকা পরিমিত সময় নিষ্পান্ন হওয়া উচিত (৯)। অঙ্ক মোট তিনটি প্রথমাঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধিদ্বয় থাকিবে, ও উহা দ্বাদশনাড়ী পরিমিত হইবে। দ্বিতীয়াঙ্কে গর্ভ সন্ধি-উহা চারি নাড়িকা পরিমিত। তৃতীয়াঙ্কে নির্বহণ সন্ধি (উপসংহার)—উহার স্থিতিকাল দুই নাড়ী। ভারতী সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তি যথাযোগ্য নিবেশিত হইবে কিন্তু কৈশিকী বৃত্তির উপন্যাস থাকিবে খুব অল্প বীররস হইবে অঙ্গী (প্রধান); রৌদ্ররসও প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। অন্য রসগুলি অঙ্গরূপে অবস্থিতি করিবে। প্রতি অঙ্ক প্রহসনময় হওয়া প্রয়োজন বীথী নামক রূপকের নৃত্যগীতবহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ আবশ্যকমত উপন্যস্ত হইবে। বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে না (১০)। সমবকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে গায়ত্রী, উষ্ণিক্ প্রভৃতি সাধারণ

(৬) অর্থ — ত্রিবর্গোপায়। ত্রিবর্গ — ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(৭) প্রস্তাবনা, আমুখ — নাট্যশাস্ত্রমতে ইহা দ্বারা কাব্য প্রখ্যাপন হইয়া থাকে। নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক রূপকের যে অংশে সূত্রধারের (অর্থাৎ তৎসদৃশ গুণ ও আকৃতিবিশিষ্ট কাব্যস্থাপকের) সহিত আলাপ করিতে থাকেন, ও নিজ কার্য্যের বর্ণনাচ্ছলে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা প্রকৃত বস্তুসূচনা করিয়া দেন, তাহাই প্রস্তাবনা বা আমুখ। সন্ধি — Junctures of the plot—এক (পরম) প্রয়োজনে অন্বিত ভিন্ন ভিন্ন কথাংশের অবান্তর এক প্রয়োজনসম্বন্ধই সন্ধি। সন্ধি মোট পাঁচটি।

(৮) উদাত্ত—মানবের তুলনায় দেব ও দৈত্যগণ স্বভাবতঃ ধীরোদ্ধত হইলেও স্বজাতি মধ্যে যাঁহারা ধীরোদাত্ত তাঁহারাই নায়ক হইবার যোগ্য। দ্বাদশ—তিন অঙ্কে দ্বাদশ নায়ক; অতএব, প্রতি অঙ্কে চারজন নায়ক। তন্মধ্যে একজন মুখ্য নায়ক, একজন প্রতিনায়ক, আর দুইজন দুই নায়ক-প্রতিনায়কের সহায়।

(৯) নাড়ী, নাড়িকা, নালিকা — ইহার পরিমাণ লইয়া বহু মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রে একস্থানে পাওয়া যায়—নাড়িকা=মুহূর্ত (২০।৬৮); আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, নাড়িকা=অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত (২০।৭২)। দশরূপকমতে—নাড়িকা=দুই ঘটিকা। সাহিত্যদর্পণেরও সেই মত। নাট্যদর্পণের মতে মুহূর্ত্ত=দুই ঘটিকা। ইহাতে 'নাড়িকা' শব্দের উল্লেখ নাই। তবে প্রথমাঙ্ক ছয় মুহূর্ত্ত, দ্বিতীয় দুই মুহূর্ত্ত ও তৃতীয় অঙ্ক এক মুহূর্ত্ত পরিমিত করার উপদেশ আছে। ইহাতে বোধ হয়, নাড়িকা=ঘটিকা=অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত। শারদাতনয়ের মতে নাড়িকা=এক মুহূর্ত্তের চতুর্থাংশ—"মুহূর্ত্তস্তু তুরীয়াংশো নাড়িকা ঘটিকাদ্বয়ম্" (পৃঃ ২৪৯)। প্রতাপরুদ্রের মতে—অঙ্কত্রয় যথাক্রমে তিন যাম, এক যাম ও অর্দ্ধ যাম পরিমিত। এ-সকল বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য। সাধারণ হিসাবে — এক যাম=এক প্রহর=তিন ঘণ্টা=সাড়ে সাত দণ্ড। এক মুহূর্ত্ত=৪৮ মিনিট। এক দণ্ড=এক ঘটিকা=চব্বিশ মিনিট। এক নাড়িকা (যদি মুহূর্ত্তার্দ্ধ হয়)=চব্বিশ মিনিট।

(১০) রস — শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, (মতান্তরে) শান্ত ও বৎসল। প্রহসন শব্দটি এ-স্থলে স্বনাম প্রসিদ্ধ রূপককে বুঝাইতেছে না। ইহার অর্থ — হাস্যোদ্রেক কর ঘটনা। বীথী — একাঙ্করূপক। পাত্র একটি অথবা দুইটি। নায়ক উত্তম, মধ্যম বা অধম প্রকৃতি বিশিষ্ট। মুখ-নির্বহণ সন্ধি। শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য কিন্তু অপর সকল রসই থাকিবে। পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি ইহাতে থাকা উচিত। ইহার নৃত্যগীতবহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ — উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্যন্দিত বা অবস্পন্দিত

অপ্রচলিত কুটিল ছন্দের বহুল প্রয়োগ থাকিবে। মতান্তরে — স্রগ্ধরা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বহ্বক্ষর ছন্দের সন্নিবেশ কর্ত্তব্য; গায়ত্রী প্রভৃতির নহে। গায়ত্রী প্রভৃতির প্রয়োগ থাকিবে কি না— এ-সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠান্তর নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন্ পাঠটি গ্রহণীয়, তাহা বলা বড় কঠিন। আর থাকিবে তিন প্রকারের শৃঙ্গার, বিদ্রব ও কপট। এ স্থলে একটি প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামোপভোগবহুলা কৈশিকী বৃত্তির স্থান সমবকারে প্রায় নাই বলিলেও চলে। অথচ এ স্থলে বলা হইতেছে যে, উহাতে ত্রিবিধ শৃঙ্গার থাকিবে। এ পূর্ব্বাপর-বিরোধের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? নাট্যদর্পণে ইহার অতি সুন্দর সমাধান দেওয়া হইয়াছে। শৃঙ্গার বলিলে মাত্র কামকেই শুধু বুঝায় না। শৃঙ্গারের অর্থ বিলাসোৎকর্ষ। 'বিলাস' শব্দের মোটামুটি অর্থ শোভা। অবস্থিতি, উপবেশন, গমন, হস্তভ্রূনেত্রাদি কর্ম্মের বিশেষ ভাবের নাম বিলাস। ইহা নায়িকার স্বভাবজ অলঙ্কার। অথবা ধীরা দৃষ্টি, বিচিত্রা গতি ও সস্মিত বাক্যের নাম বিলাস। ইহা সাত্ত্বিক নায়কের গুণ। অতএব, সমবকারে শৃঙ্গার থাকিলেও কৈশিকী বৃত্তি অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান। ত্রি শৃঙ্গার, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপট— শব্দগুলি পারিভাষিক। ইহাদিগের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ত্রি-শৃঙ্গার—(১) ধর্ম্মশৃঙ্গার, (২) অর্থ-শৃঙ্গার, (৩) কামশৃঙ্গার। ধর্ম্মশৃঙ্গার—ধর্ম্মই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অভিলাষের মূল ধর্ম্মে পর্য্যবসিত, যাহার দ্বারা সংসারের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, অর্থাৎ যে স্থলে কাম ব্রত-নিয়ম-তপস্যার দ্বারা সংযত, গুণবান্ অপত্যোৎপাদন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ও ইন্দ্রিয়সুখ যে স্থলে আনুষঙ্গিক ফল, তাহাই ধর্ম্মশৃঙ্গার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। ধর্ম্মপত্নী-সংযোগই এ স্থলে শৃঙ্গার শব্দের অর্থ। এই রূপ মনোমত ধর্ম্মপত্নীলাভের হেতু দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠান। পরদারবর্জ্জন-রূপ ধর্ম্ম ইহার ফল। শারদাতনয় ধর্ম্মশৃঙ্গারের পাঠান্তর ধরিয়াছেন—ভোগ-শৃঙ্গার। অর্থ-শৃঙ্গার—অর্থই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অর্থের ইচ্ছাবশে বহুপ্রকারে কামোপভোগ সম্ভব হয়, অর্থাৎ যে স্থলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফলে রাজ্য, সুবর্ণাদি ধন, শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিভবভোগ-সুখের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই অর্থ-শৃঙ্গার। বেশ্যাদিতে বিটাদি পুরুষগণ যে আসক্ত থাকে, অর্থই তাহার হেতু। সাধারণতঃ পণ্যাঙ্গনাগণ যে পুরুষানুরক্ত হয় তাহার ফল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থ বলিতে প্রার্থনীয় পরোপকার প্রতিজ্ঞাপালন প্রভৃতি—এরূপ অর্থও নাট্যদর্পণে দৃষ্ট হয়। পরোপকারার্থ বিবাহাদি অর্থ-শৃঙ্গার মধ্যে গণ্য। কামশৃঙ্গার—"শৃঙ্গার" ও "কাম" শব্দের অর্থ (১) রতি ও (২) তদ্ধেতুক স্ত্রী-পুরুষাদি। কামই যাহার হেতু ও ফল তাহাই কামশৃঙ্গার। রতিরূপ কাম স্ত্রী-পুরুষাদি রূপ শৃঙ্গারের হেতু। আবার স্ত্রী-পুরুষাদিরূপ কাম রতিরূপ শৃঙ্গারের হেতু। এ স্থলে পরকীয়া বা কন্যা

অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, নালিকা, বাক্কেলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মৃদব, ত্রিগত ও গণ্ড। অর্থপ্রকৃতি=প্রয়োজন-সিদ্ধিহেতু। সংখ্যায় পাঁচটি — বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য। বিন্দু — কাব্য সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যদি অবান্তর বিষয়ের (digression) দ্বারা প্রয়োজনের বিচ্ছেদ হয়, তবে বিন্দুই পুনরায় উহার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করে। প্রবেশক—একপ্রকার অর্থোপক্ষেপক। অর্থোপক্ষেপক পাঁচটি—বিষ্কম্ভ, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ। বিষ্কম্ভ—অতীত ও ভবিষ্যৎ কথাংশের সংযোজক রূপকের অংশবিশেষ। নীরস অথচ সপ্রয়োজন ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রথমাঙ্কের আদিতে অথবা অঙ্কদ্বয় মধ্যে উপন্যস্ত হইয়া থাকে। একটি মধ্যমপাত্র বা মধ্যমপাত্রদ্বয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে ইহা শুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়, আর নীচ ও মধ্যম পাত্রদ্বারা প্রযুক্ত হইলে সঙ্কীর্ণ আখ্যা লাভ করে। প্রবেশক — interlude ইহাও অনেকটা বিষ্কম্ভকের মত। কেবল অঙ্কের আদিতে প্রযোজ্য নহে। অঙ্কদ্বয় মধ্যে ইহার নিবেশ কর্ত্তব্য। কেবল নীচপাত্র দ্বারাই ইহা প্রযুক্ত হয়। অতএব, প্রাকৃত ভাষাতেই প্রবেশক নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

নায়িকা; বেশ্যা বা ধর্ম্মপত্নী নহে। অবৈধ অভিরতি, কন্যাবিলোভন, দ্যূত, সুরাপান, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন কামশৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যদর্পণে 'কামশৃঙ্গার' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে প্রহসন-শৃঙ্গার। এ অর্থ নাট্যশাস্ত্রাদিতে উক্ত হয় নাই। নাট্যদর্পণে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ইন্দ্র ও অহল্যা সংবাদ। তবে এই প্রসঙ্গে প্রহসন (হাস্যোদ্রেককর ব্যাপার) সন্নিবেশ করিবার রীতি সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে। এক একটি শৃঙ্গার এক এক অঙ্কে নিবেশনীয়। সাহিত্যদর্পণ ও নাট্যদর্পণের মতে কামশৃঙ্গার প্রথমাঙ্কেই প্রদর্শনীয়। অবশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

ত্রিবিদ্রব—বিদ্রব শব্দের অর্থ অনর্থ। যাহা হইতে ভয় পাইয়া লোক বিদ্রুত হয় (অর্থাৎ পলায়ন করে) তাহাই বিদ্রব। বিদ্রব নামে গর্ভ সন্ধির একটি অঙ্গ আছে। শঙ্কা-ভয়-ত্রাসকৃত সম্ভ্রমই বিদ্রব। দশরূপক ও ভাবপ্রকাশন উহা বিমর্শ সন্ধির অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছেন। বন্ধন, বধ প্রভৃতি এই বিদ্রবের স্বরূপ। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিবিধ বিদ্রব—(১) যুদ্ধজল-সম্ভূত, (২) বায়ু, অগ্নি, গজেন্দ্র প্রভৃতি সম্ভূত, (৩) নগরোপরোধজনিত। দশরূপকেও অনেকটা এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—নগরোপরোধ, যুদ্ধ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিদ্রব মধ্যে গণ্য। শারদাতনয় নাট্যশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। নাট্যদর্পণের মতে ত্রিবিদ্রব, যথা—(১) জীবজ (যেমন হস্তী প্রভৃতি হইতে), (২) অজীবজ (যেমন শস্ত্রাদি হইতে), (৩) জীবাজীবজ (যেমন নগরোপরোধ হইতে)। নগরোপরোধ প্রভৃতিতে চেতন ও অচেতন উভয়কৃত বিদ্রবই বর্ত্তমান। সাহিত্যদর্পণে ত্রিবিদ্রব লক্ষণ এইরূপই প্রদত্ত হইয়াছে—(১) অচেতন কৃত, (২) চেতনকৃত, (৩) চেতনাচেতন কৃত। কেবল চেতনাচেতনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—গজাদি। অবশ্য চেতনাচেতনের ব্যাখ্যা নাট্যদর্পণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা সাহিত্যদর্পণের বিবরণ অপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এই ত্রিবিধ বিদ্রবের মধ্যে এক এক প্রকার বিদ্রব এক একটি অঙ্কে প্রদর্শনীয়।

ত্রিকপট—শারদাতনয়ের মতে কপটের স্বরূপ মোহাত্মক ভ্রম। নাট্যদর্পণে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। যাহা মিথ্যাকল্পিত, অথচ আপাত দৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় তাহাই কপট। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিকপট, যথা—(১) গতিক্রমবিহিত (অর্থাৎ বস্তুর স্বভাবজনিত), (২) দৈববিহিত, (৩) শত্রুকৃত। কপটের দ্বারা সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দশরূপক মতে ত্রিকপট, যথা—(১) বস্তুস্বভাব কপট—ক্রূরপ্রকৃতির প্রাণী হইতে ইহার উৎপত্তি, (২) দৈবিক কপট—অগ্নি, বৃষ্টি, বাত্যা প্রভৃতি সম্ভূত, (৩) শত্রুজ—সংগ্রামাদিজনিত। শারদাতনয় ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। তবে তিনি এ সম্বন্ধে মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের মতে ত্রিকপট, যথা—(১) স্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম, (৩) দৈবজ। নাট্যদর্পণে ত্রিকপটের একটি নূতন ধরণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (১) বঞ্চ্যসম্ভূত কপট—যাহাকে বঞ্চনা করা হইতেছে তাহার যদি অপরাধ থাকে, তবে বঞ্চ্যোত্থ কপট হইবে; (২) বঞ্চকসম্ভূত—যদি বঞ্চনীয় ব্যক্তি নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে বঞ্চকোত্থ কপট হইয়া থাকে; (৩) দৈবসম্ভূত—যে স্থলে বঞ্চিত ও বঞ্চক উভয়েই নিরপরাধ, কেবল কাকতালীয়-ন্যায়ে একপক্ষ বঞ্চিত ও অপরপক্ষ বঞ্চকরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দৈবোত্থ কপট।

বিদ্রব ও কপটের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কপটের দ্বারা জীবিত অবস্থায় বন্দীকরণ বা মোহ (প্রতারণা) সম্ভব হয়; আর বিদ্রব হইতেছে বন্দী বা প্রতারিত হইবার ভয়ে পলায়ন।

ত্রিশৃঙ্গার, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপটের তিন তিনটি ভেদের এক একটি ভেদ এক এক অঙ্কে নিবেশনীয়—ইহা ত' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কপট হইতেছে উপায়; বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই বিদ্রব বা পলায়ন; আর শৃঙ্গার হইল ফল।

অতএব, সমবকারে সংক্ষিপ্ত সহাস্য ত্রিবিধ শৃঙ্গার, বিদ্রব, কপট থাকা প্রয়োজন। দেবাসুর-শত্রুতাজনিত

যুদ্ধই ইহার মূল বস্তুভাগ। অলৌকিক নানাবিধ ঘটনার দ্বারা এই মূল বস্তুর পরিপুষ্টি-সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলেই রূপকখানি সহৃদয় দর্শক-সমাজের সন্তোষজননে সমর্থ হইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্রে ও ভাবপ্রকাশনে ইহার উদাহরণ স্বরূপ 'অমৃতমন্থনে'র নাম করা হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার 'সমুদ্রমথন' বলিতে বোধ হয় ইহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

সমবকারের ন্যায় ডিমও একপ্রকার রূপক। ইহার বর্ণনীয় বস্তু বা ইতিবৃত্ত অতি প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, মহোরগ, অসুর, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সকল জাতীয় পুরুষই ইহার নায়ক। নায়কের সংখ্যা ইহাতে ন্যূনাধিক ষোড়শ—সকলেই প্রখ্যাত ও উদাত্তচরিত্র—মতান্তরে ধীরোদ্ধত (অর্থাৎ মানুষ অপেক্ষা ইঁহারা উদ্ধত হইলেও স্বজাতির তুলনায় উদাত্তই বটেন)। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গাররসবর্জ্জিত। নাট্যদর্পণের মতে করুণ রসও ইহাতে বর্জ্জনীয়। রৌদ্র রসই অঙ্গী; অপর রসগুলি অঙ্গ হইলেও বেশ দীপ্ত-ভাবেই থাকিবে। অঙ্ক চারিটি। সন্ধিও চারিটি। বিমর্শ সন্ধি ইহাতে নাই। শারদাতনয়ের মতে ইহাতে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকিবে। সাহিত্যদর্পণের মতে থাকিবে না। নাট্যদর্পণের মতে ইহাতে চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ নামক তিনটি অর্থো-পক্ষেপকের নিবেশ করিতে হইবে (১১)। নির্ঘাত, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, উল্কাপাত, বাহু ও অস্ত্রযুদ্ধ, বাহ্বাস্ফোট, মায়া, ইন্দ্রজাল, উদ্ভ্রান্ত চেষ্টা, বহু পুরুষের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব, রচনামধ্যে সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তির বাহুল্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতী বৃত্তির প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শৃঙ্গাররসবর্জ্জিত বলিয়া ডিমে কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার নাই (১২)।

"অমৃতমন্থন সমবকার" ও "ত্রিপুরদাহ ডিম"—এই দুইখানি রূপকই স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মার রচনা—ইহা নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানির একখানিও বর্ত্তমানে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। শারদাতনয় আর দুইখানি ডিমের নাম করিয়াছেন—"বৃত্রোদ্ধরণ" ও "তারকোদ্ধরণ"। এই দুইখানির রচয়িতা কে, তাহার উল্লেখ শারদাতনয় করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, দুইখানি ডিমই অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(১১) যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্র কর্ত্তৃক বিষয়ের সূচনার নাম চূলিকা। যে স্থলে রঙ্গমঞ্চে কেহ উপস্থিত থাকে না, কেবল নেপথ্যস্থিত পাত্রের দ্বারা অভিনেয় বিষয়ের সূচনা করা হয়, তাহারই নাম চূলিকা (চূড়া); ইহা অভিনেয় অর্থের শিখাস্থানীয়। একটি অঙ্কের শেষে সেই অঙ্কের কথাংশবিচ্ছেদ না করিয়া যদি নূতন অঙ্ক আরম্ভ করা যায়, তবে তাহাকে অঙ্কাবতার বলে। সমাপ্ত অঙ্ক ও আরম্ভনীয় অঙ্কের মধ্যে বিষয়গত ব্যবধান থাকিলেই বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের দ্বারা অঙ্কদ্বয়ের সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। অঙ্কাবতারে বিষ্কম্ভক বা প্রবেশকের দ্বারা অর্থ-সূচনার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে পূর্ব্বাঙ্কের পাত্রগুলি দ্বারাই পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রারম্ভ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পূর্ব্বাঙ্কের অবসানোক্ত কথাংশ ও পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রারম্ভস্থিত কথাংশ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। (মতান্তরে) যে অঙ্কে অন্য অঙ্কের বীজভূত অর্থের অবতারণা করা হয় তাহাই অঙ্কাবতার। অঙ্কের বিশ্লিষ্টমুখ পূর্ব্ব হইতেই যথায় সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে তাহাই অঙ্কমুখ। ইহা নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ। সাহিত্যদর্পণের মতে—যদি একটি অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে নানা অঙ্কের ও ভাবী ভূমিকাগুলির সূচনা করা হয়, তবে তাহাই বীজার্থখ্যাপক অঙ্কমুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দশরূপকাদিতে অঙ্কাস্য নামে একটি অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বাঙ্কের অন্তে পাত্রপ্রবেশ করায় কথার্থবিচ্ছেদ হইলে যদি উত্তরাঙ্কের সূচনা ঐ নবপ্রবিষ্ট পাত্রের দ্বারা করা হয়, তাহা হইলে অঙ্কাস্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(১২) বৃত্তিসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। উদয়ন—শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৭৭ ও অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, পৃঃ ৯৬০-৯৬১ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমানে মহাকবি ভাসের (যিনি কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী) রচিত একখানি অতি সুপাঠ্য সমবকার পাওয়া গিয়াছে উহার নাম "পঞ্চরাত্র"। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বীয় উত্তরগোগৃহের ঘটনা অবলম্বনে উহা রচিত। কিন্তু মহাকবি রূপকমধ্যে বহু নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৎসরাজ নামে একজন কবি "অমৃতমন্থন" নামে একখানি সমবকার ও "ত্রিপুরদাহ" নামে একখানি ডিম নূতন করিয়া রচনা করিয়াছেন। পিতামহরচিত রূপক দুইখানির সহিত এই অভিনব রূপক দুইখানির নামের মিল আছে। কবি বৎসরাজ ছিলেন কলিঞ্জরপতি পরমর্দ্দিদেবের (খ্রীঃ দ্বাদশশতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত) অমাত্য। গ্রন্থ দুইখানি সম্প্রতি বরোদার "গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সংস্কৃত গ্রন্থমালায়" "রূপক-ষট্‌কম্‌" (৮নং) নামক গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। ভাসের পঞ্চরাত্রও ত্রিবান্দ্রম্‌ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।

আগমনী

শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য, এম্‌-এ

ভুবন ভরিয়া গেল, বনানী ভরিয়া গেল গানে,
কে এলোরে, কে এলোরে, কে অতিথি এলো আজ ঘরে।
শরতের শুক্লা রাতে যৌবন নেমেছে আজ স্নানে—
সিক্তকেশে মুক্তা-দ্যুতি শিহরিছে কৌতুকের ভরে!
পাদস্পর্শে প্রস্ফুটিত গৃহাঙ্গনে শত শতদল,
সায়রে নাচিল নীর, নীল ঢেউ করে টলমল,
তট-তনু রোমাঞ্চিত, তৃণে তৃণে লাগে শিহরণ,
গগনে পবনে ঝরে উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত প্লাবন।

আকাশ ভরিয়া গেল, নীলিমা ভরিয়া গেল স্রোতে—
আলোকের নির্ঝরের অপরূপ অযুত বরণে;
সুধা-ধারা ঝ'রে পড়ে সৌন্দর্য্যের উৎসমুখ হ'তে,
কবি-প্রাণ স্নিগ্ধ হ'ল নীল মেঘে প্রশান্ত গগনে।

আকাশের বুক বেয়ে লঘুপক্ষ মেঘের ভেলায়
এলো কি শারদ-লক্ষ্মী, আনন্দিতা, অনিন্দ্য-লীলায়!

ঝড় ও বৃষ্টি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

গঙ্গার একেবারে ধার হইতে চারতলা বাড়ী উঠিয়াছে, পশ্চিমের পাথরের কাজ।

চারতলার যে ঘর, তারই চারিদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া নিশীথ আজ বর্ষা-উৎসব করিতে বসিয়াছে। নিশীথের কয়েকটী বন্ধু আসিয়াছে, বারকোশ-জাতীয় একটা বৃহৎ থালায় তেল-নুণ-মাখা মুড়ি আসিয়াছে, চিঁড়েভাজা, বেগুনী, পেঁয়াজী, কাঁচালঙ্কা আসিয়াছে—আয়োজনের ত্রুটি নাই।

আকাশ ঘিরিয়া সজল কাজল মেঘ, বর্ষার গঙ্গা কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত, ওপারে সারা বৎসর যে চড়া জাগিয়া থাকে আজ তার চিহ্ন নাই, খেয়া নৌকারও দেখা মিলিতেছে না, বজরার ক্ষেত, জনারের ক্ষেত ছাপাইয়া জল চলিয়া গেছে, আরো দূরে গ্রামের আভাষ দেখা যায়, তারও ওধারে অরণ্য—তারপর পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাহাড় ধরিত্রীর তরঙ্গমালার মত।

অনাথের ছোট মেয়ে যখন গান ধরিয়াছে—

বাদল ঝুমুঝুমু
মাদল বাজে—

তখন আবার বৃষ্টি সুরু হইয়াছে—গঙ্গার গৈরিক বুকে, ওপারে শ্যাম-বন-প্রান্তরে। ঢেউখেলানো পাহাড় তখন আর দেখা যায় না, ছোট গ্রামখানিও আর চোখে পড়ে না।

তাকিয়াটাকে কাছে টানিয়া নিশীথ সুরু করিল—আমার ভালো লাগে—আজ ব'লে নয়, যখন কিছুই বুঝতাম না,—সেই খুব ছোট বেলা থেকে,—কি বলছি তোরা বুঝতে পাচ্ছিস্ ত'? এই বৃষ্টি-ধারার ছন্দ—

রম ঝম্ রম ঝম্
ঝম্ রম রম ঝম্—

এ যেন মানুষের গলায় সকল গানের চেয়েও মধুর—এ যেন indescribable!

সুহৃৎ বলিল, যখন বাঙ্‌লা বলছিস্ বাঙ্‌লাই বল না, বর্ষা-বর্ণনার মাঝখানে আবার বিদেশী বুক্‌নীর কি দরকার?

নিশীথ বলিল, ঠিক বলেছিস্, I withdraw। কিন্তু ঠিক ক'রে বল দেখি, এদেশে নতুন বর্ষা এলে আমাদের কি সুদূর বাঙ্‌লা দেশের কথা মনে পড়ে না, যেখানে বর্ষা আরো মনোরম আরো মনোহর—

অনাথ বলিল—কাদা প্যাচ-প্যাচ্‌টা বাদ দিয়ে এবং কলকাতা সহরের কেরাণীদের আফিস-যাত্রা-সমস্যা বাদ দিয়ে—certainly।

নিশীথ কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—নাঃ, তোরা নেহাৎ অ কবি—আমার কিন্তু আজ নাচতে ইচ্ছে করছে—তা তা থৈ থৈ—শিব-তাণ্ডব নৃত্য—

বৃন্দাবন চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, রক্ষে করো দাদা, ঐ মোটা দেহ নিয়ে—আগে আমরা নেবে যাই আর তুমি life insure ক'রে এসো—

তার কথায় ও ভঙ্গীতে ছোট মেয়ে অমলা অবধি না হাসিয়া পারিল না।

এই সময়ে বারান্দায় ছর্‌র্ ছর্‌র্ আওয়াজ পাইয়া সকলেই বাহিরে আসিয়া দেখিল নিশীথের ময়ূরটা তার বিচিত্র পেখম্ মেলিয়া দিয়া আকাশের দিকে যেন তার আনন্দ-নিবেদন পাঠাইয়া দিতেছে, সেই ছর্‌র্ ছর্‌র্ শব্দ যেন কয়েকটা নূপুরের ধ্বনি, সেই নীল শ্যামলের বাহার যেন কালিদাসের একটুকরা কাব্য। সকলেই মুগ্ধ চোখে দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার স্রোত তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, মেঘের পরে মেঘ জমিয়া আসিতেছে।

সুহৃৎ সুর তুলিল—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয়—

বৃন্দাবন তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া ফরাসে বসাইয়া দিয়া বলিল, কান গেল রে তোর বেসুরো চীৎকারে—নাঃ, আজ দেখছি শেষ পর্য্যন্ত নিশীথের বাড়ীর খিচুড়ীটা খাওয়া কপালে নেই!

হাসি-উচ্ছ্বাস গল্প-গুজবে অন্ধকার সকালটা বেশ কাটিয়া গেল। বাড়ীর নীচে গঙ্গায় স্নান সারিয়া দ্বিতলের বড়-ঘরে সকলে খাইতে বসিল। নিশীথের স্ত্রী মুকুল নিজে রান্না করিয়াছে ঠাকুর থাকিতেও, এবং নিজেই পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইল।

দিনটা সুন্দর সুরু হইয়াছিল, কিন্তু সুন্দর শেষ হইল না।

সকলে চলিয়া গেছে। বর্ষণ-ক্লান্ত দীর্ঘ দিবসের শেষে পশ্চিমের আকাশের অস্তরাগের ঝলমল শোভা, জলচিক্কণ দূরপল্লবচ্ছায়ায় নূতনের দীপ্তি আনিয়াছে, ধ্যানমৌন দৃষ্টি মেলিয়া নিশীথ যখন তাই দেখিতেছিল, হঠাৎ তার স্ত্রীর করুণ আর্ত্তনাদ কানে গিয়া বাজিল। ছুটিয়া নীচে আসিয়া দেখিল পিছল উঠানে চলিতে গিয়া সে পড়িয়াছে এবং রীতিমত আহত হইয়াছে।

বর্ষার জলস্রোত সারাদিন ধরিয়া এইখান দিয়া বহিয়া গেছে।

তখন প্রকৃতির উপরে রাগ করিবার সময় নাই, ভাবিবারও সময় নাই, মুকুলকে তুলিয়া ধরিয়া সে উপরে লইয়া গেল এবং ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিতে ছুটিল।

বাঁ-পাটা বিষম মচ্‌কাইয়া গেছে।

সাতদিনের চিকিৎসায়ও কোনো ফল হইল না, ব্যথা ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল।

অগত্যা নিশীথ একদিন এক টাঙ্গা ভাড়া করিয়া সহরের বাহিরে যে জেনানা হাসপাতাল আছে, সেখানে মুকুলকে দেখাইতে চলিল।

আউটডোরে দেখিয়াই মেয়ে-ডাক্তার মত প্রকাশ করিল case serious, হাসপাতালে রাখতেই হবে, free ward-এই রাখো, cabin নিয়েই থাকো।

অগত্যা পর্দ্দা-ওয়ার্ডে রাখাই ঠিক হইল। চারিধারে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল, অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েরাই patient, সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। ডাক্তারকে অনেক বলিয়া-কহিয়া নিশীথ একটা সম্পূর্ণ আলাদা কটেজ ভাড়া লইল, যেখানে সে-ও থাকিতে পারে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া সে বাহিরে আসিতে পারিবে না। দিনে মাত্র দু'বার, যখন চারিদিকের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন প্রয়োজন হইলে সে কটেজ হইতে বাহির হইয়া হস্পিট্যালের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

কড়া ব্যবস্থা। তার ওয়ার্ডের নম্বর চার।

রাণীগঞ্জের টালি ঢাকা প্রকাণ্ড একটা ঘর, দু'খানা স্প্রীং-এর খাট, একটা আল্‌না, একটা টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা দেয়াল-আলমারী ও আয়না—এই আসবাব।

ঐ ঘরেরই সঙ্গে সংযুক্ত বাথরুম।

ঘরের সামনে খানিকটা বারান্দা, তার পর ছোট্ট একটুখানি প্রাঙ্গণ শ্যামল ঘাসে ঢাকা, কোণে রান্নাঘর।

বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি জিনিসপত্রে চারিধার আচ্ছন্ন করিয়া নিশীথ যেন নূতন সংসার পাতিয়া বসিল।

সুভদ্রা বলিয়া একটি উড়িয়া মেয়েকে রান্নার কাজের জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল, সে তোলা-উনুনে কয়লা চাপাইয়া ধরাইতে বসিল।

দু'টি নার্স আসিয়া বিছানা করিয়া দিয়া গেল, মেট্রন—সে ইয়োরোপীয়ান, আবশ্যকীয় কি কি দিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল।

ঠিক আটটার সময় ডক্টর তারাবাঈ, মারাঠী মহিলা — নিজে আসিয়া রোগী দেখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, ভয়ের কিছু নাই।

তারাবাঈ-এর বয়স হইয়াছে, বিলাত-প্রত্যাগতা— তাঁর কোয়াটার্স একেবারে ওধারে। মোটা মাহিনা পান।

হিন্দীতে অত্যন্ত মিষ্টি করিয়া patient-এর সঙ্গে কথা বলিলেন। আর বলিলেন—তুমারী আদ্‌মি যব হিঁয়াপর হায়, তব তো শোচনেকা ঔর কুচ্ নেহি হায়—অর্থাৎ তোমার স্বামী কাছে আছে, ভাবনা কি?

সারাদিন ধরিয়া নার্সদের খবরদারী, ওষুধ খাওয়ানো, মাসাজিং, মালিশ…রুবি, জেন, শেলি, সোফিয়া, মিনেসিস্, পিয়ারা, কমলা প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কুড়িটি নার্স। বয়স সকলকারই কম, বেশী হইয়া গেলে অন্যত্র বদ্‌লি করিয়া দেওয়া হয় এবং হয় ত' সৌন্দর্য্য না হোক লালিত্য ও শ্রী দেখিয়া নির্ব্বাচন করা হয়, যেন তাহাদের দেখিয়া রোগিনীদের মন প্রসন্নতায় ভরিয়া ওঠে।

সহানুভূতিতে ভরা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, মারাঠিদের মত আঁটসাঁট কাপড় পরিবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, সাম্‌নে অ্যাপ্রন ঝুলাইয়া মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া অনাবৃত দুই বাহু মেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার সহজ প্রবৃত্তি, সব কিছু মিলিয়া শুশ্রূষা যেন মূর্ত্তিমতী!

—আপ্ ক্যায়সা হায়, বলিয়া বিছানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন দিনের মধ্যে অসংখ্য বার, মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, পাশে বসিয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দূতে গল্প বলা,— প্রথম দিন হইতেই সুরু হইল।

পিছনের জান্‌লা দিয়া দেখা যায় যে প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বটগাছ, তার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য পাখীর ডাক, তার ওপারে ধোবী ও জমাদারদের ঘর,— একটা সুস্থ জগতের সাড়া পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলায় এদিকটা কেহ নাই, খালি গায়ে নিশীথ তার বিছানায় শুইয়াছিল। মুকুলও চুপ করিয়া শুইয়া কি ভাবিতেছে, টেবিল-ফ্যানটার একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, সুভদ্রা রান্নাঘরে রুটি বেলিতে ব্যস্ত—এম্‌নি সময় সুইচ্ টিপিয়া মেট্রন বলিল, গুড ইভ্‌নিং মিষ্টার ভট্টাচারিয়া।

উজ্জ্বল আলোকে এক মেমের সাম্‌নে আপনার অর্দ্ধ-নগ্নতায় নিশীথ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল এবং বিছানার চাদরটা খপ্ করিয়া তুলিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, ইয়েস্—গুড ইভনিং।

মেট্রন বলিল, You don't feel any inconvenience, I suppose।

নিশীথ জোর দিয়া বলিল — না-থিং।

তারপর মেট্রন মুকুলের কপালের উপর হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ক্যায়সা হায়!

— আচ্ছা ত' মালুম্ হোতা হায়, লেকিন্ গোড়কা দরদ্ ত' ঐসি হায়—

— কম্ হো যায়গা — মচ্ছড় লাগ্‌তা হায়? সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের দিকে ফিরিয়া বলিল — I say I may arrange for a mosquito-curtain if you feel the necessity for it.

ইতিমধ্যেই মশার ভণ্‌ভনানি সুরু হইয়াছে, পাখার বাতাসের জন্য সুবিধা করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু মশারী খাটাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া নিশীথ ও-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। এরা আবার বলিয়াছে ঘরে পেরেক মারা যাইবে না।

কাজেই জানিতে চাহিল, মশারী ত' তাহারও আছে, টাঙাইবার বন্দোবস্ত কি করা যায়। মেট্রন বলিল সেজন্য ভাবিবার দরকার নাই। 'সিতারা, সিতারা' বলিয়া ডাক দিতে একটি ঝি আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে বলিয়া দিল আটটা বাঁশ আনিতে আর সুধাকে ডাকিয়া দিতে।

সুধা এবং মেট্রন এবং ঝি তিনজনে মিলিয়া X-এর মত করিয়া বাঁশ লাগাইয়া সুন্দর মশারী খাটাইয়া দিল, না হইল দড়ির দরকার না পেরেকের।

শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া মেট্রন চলিয়া গেল। সুধা একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, রাত্তের ডিউটি তার।

সুধা—সুধা নামটি বাঙ্গালীজনোচিত, চেহারা যেন ভাটিয়া মেয়েদের মত।

মুকুল বলিল, সমুচা রাত আপকী ডিউটি?

সুধা জবাব দিল—হ্যাঁ, সারা রাত, আর বলেন কেন, এ সপ্তাহটা এমনি যাবে তারপর ডে-ডিউটি।

নিশীথ বলিল—আপনি ত' বেশ বাংলা বলেন!

কলহাস্য করিয়া সুধা জবাব দিল—আমি যে বাঙ্গালীর মেয়ে, মাতৃভাষা বলব তাতে …… আপনি কি ভেবেছিলেন?

—আমি ভেবেছিলাম সবাই যেখানে অ-বাঙালী—

বাধা দিয়া সুধা বলিল—হ্যাঁ, আমি একলাই শুধু বাঙালী আছি এখানে।

তারপর মুকুলের বিছানার একপাশে বসিয়া সে অনেক কথাই বলিল, কোথায় কতদূর শীতললক্ষ্যার ধারে তার দেশ, পয়সার জন্য কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তার বাপ-মা, ভাই-বোন সকলে আছে অথচ…

হয়ত একটু প্রেমের কাহিনী প্রচ্ছন্ন ছিল,—নিশীথের সন্দেহ হয়।

থুদ্দামা—মাদ্রাজী নার্স—আসিয়া সুধাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, একজন রোগীর না-কি কি হইয়াছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত একটু বেশী হইয়াছে, বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ, নিশীথ অনুচ্চকণ্ঠে মুকুলের সঙ্গে গল্প করিতেছিল,—সুধা দরজার কাছে আসিয়া আদেশের স্বরে বলিল, ওঁকে এবার ঘুমোতে দিন্—অসুস্থ শরীর—

অপ্রস্তুত হইয়া নিশীথ চুপ করিল।

সকালবেলা সিতারা আসিয়া গল্প সুরু করিল—বেৎনাহি মরিজ্‌ লোক হিঁয়াপর আতী হ্যায়, সবকোই ভারী ভারী বক্‌শিশ্‌ দে যাতী, কোই বহুৎসা কিমৎকা লুগা—কোই খানেকা লিয়ে পাঁচদশ রুপিয়া—কোই…

মুখ ধুইবার সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া হেলেন বলিল—আবি ভাগো, ফজিরমে আকে দিক্ করতা হ্যায় কোন্ কব বক্‌শিশ্‌ দে গিয়া……পহেলে মর্জ্জ আরাম হোনে দেও, আখিরমে উসব বাত……

ততক্ষণে সিতারা পলাইয়াছে।

সেদিন ডক্টর তারাবাঈ মুকুলের পা পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন অস্ত্র করা ছাড়া আর উপায় নাই। পরের দিন অপারেশন হইবে স্থির হইল, ক্যাষ্টর অয়েল দু'ডোজ লিখিয়া দিয়া গেলেন। নার্সরা সকলে মিলিয়া আসিয়া অভয় দিয়া গেল, ভয় নাই এমন অপারেশন এখানে কত হইতেছে।

৬নং কটেজে থাকেন যে মোটা গিন্নী, তিনিও তাঁর বিপুল দেহ দোলাইয়া আসিয়া বলিয়া গেলেন, এই ত' আমার মেয়ের নির্ম্মলারও অপারেশন হ'ল, বুকে—কি ভয়? কিচ্ছু ভয় নেই। নির্ম্মলা এখন সেরে গেছে, আয়ত মা নির্ম্মলা, লজ্জা কি—

তাঁর আর এক মেয়ে মিনা তখন দরজার সামনে আসিয়া গেছে।

নিশীথ বলিল, আপনাকে দেখলে আমার বৌদি'র কথা মনে পড়ে, অবিকল সেই রকম চেহারা আপনার। বলুন না বৌদি মেয়েকে আসতে—এসো মা, এসো, লজ্জা কিসের—

অল্প বয়স হইলেও নিশীথ খুব মা-মা করিতে পারে। নির্ম্মলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নিশীথ বলিল, বসো ঐ চেয়ারে, তুমি রুগী মানুষ, বসুন বৌদি আপনি ওটাতে, আর খুকি তোমার নাম কি? মীনা? বসো তুমি আমার পাশে—

হাসি-গল্পে সহজেই আলাপটা জমিয়া উঠিল। বৌদি গল্প করিতে লাগিলেন—ছেলেবেলায় তিনি সিমলে পাহাড়ে মানুষ, জন্ম তাঁর নৈনিতালে, পেশোয়ারে অনেক বড় বয়স অবধি ছিলেন, বাপ তাঁর সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন—

—বলব কি ঠাকুর-পো, আঙুর যে লোকে খায়

তা আমরা জানতুম না, এমনি ক'রে আমরা নষ্ট করতুম, দু'-এক মুঠো খেয়ে—আপেল, মনক্কা, মন্বট্, কিস্‌মিস, আখরোট, আমরা যা খেয়েছি তোমরা বোধ হয় তা চোখেও দেখ নি—মোটা-গিন্নীর কথাগুলি যাকে বলে খুব 'পষ্টপষ্ট'!

দীনা আসিয়া মুকুলের চুল আঁচড়াইয়া দুইগাছা বিনুনী করিয়া দিয়া গেল। আর একবার হেলেন একডোজ ওষুধ খাওয়াইয়া দিয়া গেল।

দুপুরবেলাটা একদম চুপচাপ।

একবার কটেজ হইতে বাহির হইয়া সামনের বাগানে দাঁড়াইয়া নিশীথ দেখে, যে সকল রোগিনী অপেক্ষাকৃত সুস্থ তাহারা লম্বা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে।

উত্তর ভারতের পর্দ্দানশীন্ মেয়েরাই অধিকাংশ। হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় বুঝি কোন্ বাদশাহের হারেমে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সুন্দরীরা কেহ বিশেষ লজ্জা করিল না, যে যেমন দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া ছিল, রহিল। ভাবটা যেন এই পর্দ্দা-ওয়ার্ডের মধ্যে যে পুরুষকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া পর্দ্দা টানিবার প্রয়োজন নাই।

আকাশ নির্ম্মেঘ, কাঁচাসোনার মত রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, শুধু বিকালে দেখা-করিবার-সময় যখন শেষ হইয়া যায়, তখন বুড়ো দরোয়ান ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে ওয়ার্ড হইতে ওয়ার্ডে যাইবার মুখে এ-ধার হইয়া যায়—অনেকক্ষণ ধরিয়া তার ঢঙ্গাঢঙ্গ ঢন্‌ঢন্-ধ্বনি রহিয়া রহিয়া বাজে।

অপারেশন-রুমের কাঁচ-ঘেরা স্ক্রীন-টাঙানো টেবিলের উপর যখন মুকুলকে শোয়ানো হইল, তখন নিশীথকে সে-ধারে যাইতে দেওয়া হইল না। সে একলা-ঘরে বসিয়া একখানা হাত-দেখা-শিক্ষা লইয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অন্যমনস্ক কি হওয়া যায় তার, যার স্ত্রীর পায়ে অপারেশন হইতে চলিয়াছে!

চারিটি ধাই যখন ষ্ট্রেচারে করিয়া মূর্চ্ছিতা মুকুলকে ৪ নং ঘরে লইয়া আসিল তখন নিশীথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন প্রাণ নাই। তবে কি?—

অপারেশন successful but the patient—

না-না।

নার্স'রা ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া পাশে বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে একটু বমি-ভাব হইতেই মুখের কাছে জেন্ পট্‌টা আগাইয়া দিল।

মেট্রন আসিয়া খোঁজ করিল।

ডক্টর তারাবাঈ একটু পরে আসিলেন।

পনেরোদিন হইয়া গেল, পা কমিয়া আসিতেছে কিন্তু পিঠের শির-দাঁড়ায় যে ব্যথাটা অল্প-অল্প হইয়াছিল সেটা বাড়িতে লাগিল।

প্রথমে মনে করা গিয়াছিল, শুইবার দোষে হইয়াছে, কিন্তু শেষে একদিন তারাবাঈ অন্য সন্দেহ করিয়া বসিলেন।

X-Ray লইয়া নিশীথকে বাইরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগ হয়েছে। প্ল্যাষ্টার অফ প্যারিসের বেল্ট ক'রে কোমরে বেঁধে রাখতে হবে, ঐ একমাত্র চিকিৎসা—

নিশীথ চারিদিক অন্ধকার দেখিল। বলিল—সারে ত'?

তারাবাঈ বলিলেন—সারবে না কেন, কত সারছে। তবে সময় লাগে।

নিশীথ ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল—কতদিন?

অচঞ্চলকণ্ঠে ডাক্তার জবাব দিলেন—বছর আড়াই ত' এ-রকম থাকতে হবে। তারপর খুলে দেখে—ভয় নেই এ-case তেমন serious নয়, আমরা কত দেখছি!

নিশীথ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই পুষ্পিত-যৌবন, নিত্যমুক্ত কল্পনায় ভরা সুস্থ মন, এই লইয়া সুদীর্ঘ দিন সুদীর্ঘ রাত্রি অহল্যা-পাষাণীর মত কাটাইতে হইবে? কাজে যার বিশ্রাম ছিল না, তা'কে হইতে হইবে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী! এ-কি বিধাতার নিষ্ঠুর অবিচার! শাস্তি দিবার আর কি লোক মিলিল না, এই ফুলের মত কোমল প্রাণের প্রয়োজন হইল!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

মুকুল জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার কি বললে গো?

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিশীথ বলিল—বললে কোমরের ব্যথার জন্যে একটা কোমর-বন্ধ পরতে হবে—

—কি, প্যারিস প্ল্যাষ্টারের?

—হ্যাঁ। তুমি কি ক'রে জানলে?

মুকুল বলিল, তবে কি আমার থাইসিস্ হয়েছে পিঠে? নিশ্চয়। কি বললে বলো, কি রোগ?

—না-না, থাইসিস্ কেন? নিশীথ চাপিতে চেষ্টা করিল।

মুকুল বলিল, তুমি জানো না, আমি জানি, আমাদের পাড়ার হরিধন কাকার মেয়ের হয়েছিল। বাবাঃ, সে ত' তিন বচ্ছর পাথর হয়ে থাক্‌তে হবে—

নিশীথ বলিল, সে সেরেছিল ত'?

—সারল ত' কিন্তু কতদিন পরে বলো। আমি অতদিন থাকতে পারব না, আমার কান্না পায়—কি যেন সব।

নিশীথ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে বসিল—কেন ছেলে-মানুষী করছ মুকুল, তোমার ততদিন থাকবার দরকার না-ও হতে পারে! প্রথমেই রোগ ধরা পড়েছে, মুকুল ত্যাখো—

না, মুকুল দেখিবে না। তার ব্যথা কোথায়, সে কি নিশীথ জানে! সে যে স্বামীর কোনো কাজেই লাগিবে না, তাঁহার বুকের মধ্যে আশ্রয় লওয়াও যে তার হইবে না, পূর্ণিমারাত্রি আসিবে যাইবে, গঙ্গার বুকে বরষা ঝরিবে, দুঃসহ শীতের সন্ধ্যা কুয়াসা লইয়া নামিয়া আসিবে—তার শবরীর প্রতীক্ষা কবে শেষ হইবে? আজ ত' সবে সুরু। সে ভাবিতে পারে না।

এমনি সময়ে মোটা-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, কাবুলের আসল খোবানী তোমরা খাওনি—

নিশীথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। মুকুল ঠিক হইয়া শুইল।

বিকালে দুই নম্বর কটেজে আসিয়াছে একটি মেয়ে আসন্ন-প্রসবা।

ছেলে না-কি বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, এমনি অবস্থায় ছত্রিশ মাইল রাস্তা লরিতে চড়িয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

সিসেরিয়ান অপারেশন করিতে হইবে, চার্জ্জ পঞ্চাশ টাকার কম নয়, তার স্বামী ও শ্বশুর মেট্রনের সঙ্গে দর-দস্তুর করিতেছে, কুড়ি টাকায় করিয়া দিতে হইবে।

তবু free ward-এ থাকিবে না, ইজ্জত যাইবে, জমীদার-পুত্রবধূর ইজ্জত!

মেট্রন তিরিশে রফা করিয়া টাকাটা আগাম দিতে বলিল, শত্তুভোজীর দল জবাব দিল, আগে অপারেশন হোক্, ছেলে না হোক্ অন্ততঃ রোগী না বাঁচিলে কি হইবে?

সেই অপারেশনের তোড়জোড় চলিতেছে, সেই ধারে সমস্ত নার্স চলিয়া গেছে।

মুকুলের ঘরে শুধু একলা আছে সুধা, কাল কোমর-বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে। মুকুলের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। জানালার ওধারের বটগাছের পল্লবের ফাঁক দিয়া নির্মেঘ আকাশের যেটুকু দেখা যায়, সে যেন নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের ছবি—অপরাহ্ণের মিলাইয়া-আসা আলোয় তার জীবনীশক্তিও যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। এ কী জীবন?

প্রমীলারাজ্যের মত নার্স পরিবেষ্টিত কটেজে নিশীথের দিন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে।

তাহাদের ঘরে যায়, মাছ ভাজিয়া পাঠাইয়া দেয়, মাংসের কোর্ম্মা রাঁধিয়া খাওয়ায়।

নিত্য নূতন রং-এর শাড়ী পরিয়া যে এসিষ্ট্যাণ্ট লেডি ডাক্তারটি আসে তার ইংরাজী চমৎকার, নিশীথের সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গেছে, কোনোদিন তারও ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ থাকে।

ওদিকে আপিসের ছুটিও শেষ হইয়া আসে।

মুকুলকে বাড়ী লইয়া গিয়া কে দেখিবে, কে নার্স করিবে এখন এই তার ভাবনা।

কয়দিন হইল মুকুল একটু গম্ভীর হইয়া গেছে।

সেদিন বিকাল বেলা হেলেন আসিয়া ম্যাজিক দেখাইয়া অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিল। কতকগুলো তাসের ম্যাজিক দেশলাইয়ের ম্যাজিক দেখাইয়া অবাক করিয়া দিল। তারপর একটা রুমালের ফাঁসের ম্যাজিক দেখাইল যাহাতে যত শক্ত করিয়াই হাত বাঁধা হোক্, অনায়াসে খুলিয়া ফেলা যায়। সেইটা সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য।

মিসেসিস্ ও রুবি মিলিয়া কিন্তু আর এক কাণ্ড করিল, একটা রুমাল লইয়া এমন করিয়া গেরো দিয়া দিল যে, হেলেন কিছুতেই খুলিতে পারিল না।

মুকুল তাড়াতাড়ি সেই রকম গেরো দিবার পদ্ধতি দেখিয়া লইল, ট্রেনে যারা চুরী করে তারা না-কি পিছন হইতে আসিয়া এই রকম করিয়া গলায় রুমাল বাঁধিয়া দেয়, যাহা হাজার চেষ্টা করিয়াও খোলা যায় না, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া লোকে মারা পড়ে, একটু শব্দও করিতে পারে না।

তাসের ম্যাজিকও কিছু শিখিল, কিন্তু দেশলাইয়ের ম্যাজিক হেলেন কিছুতেই শিখাইল না। ও বড় আশ্চর্য্য ম্যাজিক, রুমালের মধ্যে একটা চিহ্নিত দেশলাইয়ের কাঠি রাখিয়া উপর হইতে মচ্‌কাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দাও, পরে আস্ত কাঠিটা বাহির হইয়া পড়িবে।

একবারের জায়গায় দশবার দেখাইল, তবু কেহই ধরিতে পারিল না। অবাক্ কাণ্ড!

এম্‌নি সময় মেট্রন আসিয়া খবর দিল, দুই নম্বরের ঘরের যে পেশাণ্টটির পেট কাটিয়া ছেলে বাহির করা হইয়াছে সেই ছেলে ও প্রসূতি দু'জনেই সুস্থ আছে কিন্তু তাহাদের পুরুষরা এখন ডাক্তারের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, দশটাকার বেশী কিছুতেই দিতে পারিবে না, 'মাইবাপকে' মাফ করিতে হইবে।

নিশীথ শুনিয়াছিল ত্রিশ টাকায় রফা হইয়াছিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মেট্রন বলিল এ বিষয়ে বাঙালী বাবুরা খুব ভালো, যেমন মিষ্টার ভট্টাচারিয়া—পেমেণ্টে কোনো গোলমাল নাই।

নিশীথ শুধু বলিল—Thank you so much for your kind compliments!

নিশীথ নার্সদের সঙ্গে ইদানীং অত্যন্ত হৈ-হৈ করে।

দিনরাত ঘরে বসিয়া আছে, খালি তাহাদের সহিত ফষ্টিনষ্টি। ঠাট্টা করিতে করিতে ছুটাছুটি, হাত-কাড়াকাড়ি, গায়ে পড়া—ওসব মুকুলের ভালো লাগে না। কিছু বলিতেও পারে না, কোনো কালে বলে নাই। চিরদিন সে ঠাণ্ডা স্বভাবের। তা-ছাড়া নিশীথেরও প্রকৃতি এ রকম ছিল না। মেয়েদের কাছ হইতে সে সব সময়েই দূরে দূরে থাকিত। মেয়ে-মহলে কোনো দিনই তাহাকে দেখা যাইত না।

আজ পুরুষ-বর্জ্জিত নারী-রাজ্যে এতগুলি তরুণীর মাঝখানে পড়িয়া তাহার কি চিত্তবৈলক্ষণ্য ঘটিল? সচ্চরিত্রতায় যে আদর্শ ছিল, আজ কি তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙিবার কারণ দেখা গেল?

আর মেয়েগুলাও ত' কম বাচাল নয়!

নার্সদের চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ ভাল ধারণা কোনো দিনই মুকুলের ছিল না, আজ যেন তার মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ইচ্ছা হইল, মেট্রনকে সব খুলিয়া বলে, নার্সদের সৎ আচরণের তদারক করার ভার ত' তাহারই উপরে। কিন্তু পারিল না, নিশীথ যদি রাগ করে। একে ত' সে নিজে চিরদিনই ভীরু, আজ একেবারে অসহায়, পরমুখাপেক্ষী।

নিশীথও বুঝিতে পারিতেছে তাহার নিজের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। স্ত্রীকে ভয় করিবার তাহার কখনো প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু যাহাতে সে আঘাত পায় এমন কাজ করিবার প্রবৃত্তিও ইহার আগে তাহার হয় নাই।

আজ বুঝিতেছে সে সুস্থ সবল স্ত্রীকে সম্ভ্রম করিয়া চলিত, শিশুর মত দুর্ব্বল রুগ্ন স্ত্রীর প্রতি সে সমীহ-ভাব তাহার নাই। মনের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সে অনুকম্পা করিতে সুরু করিয়াছে। মুকুলের রাগ-অভিমানে হয়ত এখন তাহার আসিয়া যাইবে না।

নহিলে সন্ধ্যা হইতেই সুধা আসিতেই সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বিছানায় বসাইতে পারে, তাও মুকুলের সামনে?

এমন ঘটনা-সংস্থান কোনোদিন সে কল্পনা করিতে পারিত? সে কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছে দুরারোগ্য-রোগ-শয্যায় শায়িত তাহার সামনে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মুকুলের এমনি আচরণে তাহার মনের অবস্থা কি হইত?—যখন সে পঙ্গু, সেবা ও শুশ্রূষা, অর্থ ও সামর্থ্য—প্রতিটি সাহায্যের জন্য পরের মুখ চাহিয়া মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটাইতে হইতেছে, দেহ-মনের সেই চরম অসুস্থতার দিনে তাহার স্ত্রী তাহারই চোখের উপর অন্য এক পুরুষকে টানিয়া বিছানায় বসাইতেছে, অন্য অনেক পুরুষের সহিত খেলা-ধূলায় গল্প-আমোদে মত্ত, তখন নিজের হৃদয়ের সেই বিপরীত ভাব সে কি অনুমানে, অনুভূতিতে আনিতে পারে?

সে ভাবিবার তাহার সময় নাই, এরকম বাছা-বাছা তরুণী-সম্মিলন—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নিরলস প্রেমাভিনয় এবং সকলের চেয়ে বড় কথা—যেখানে সকলে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে অনায়াসলভ্য—সেখানে বিবেকের সংযমের বুলি আওড়াইয়া লাভ নাই।

সুধাকে ধরিয়া বসাইতেই বসিয়াছে এবং গা-ঘেঁসিয়াই বসিয়াছে, লজ্জায় তাহার কাণ অবধি রাঙা হইয়া যায় নাই, আর একটি মেয়ে যে ঘরে শুইয়া আছে তাহার অস্তিত্ব অবধি যেন সে লক্ষ্য করে নাই।

নিশীথ তার এলো খোঁপাটা টান মারিয়া খুলিয়া দিল, দুই হাত দিয়া খোঁপাটা ফিরিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সে বলিল—কি করেন?

নিশীথকে এ কি পৈশাচিক আনন্দ পাইয়া বসিল, সে কি মোম বাতির ক্ষীণ আলোকে দুর্ভাগিনী মুকুলের চোখ দেখিতে পাইতেছে না, যা একবার জ্বলিয়া উঠিয়া জলে ভরিয়া গেল? সে একটি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু নিশীথ কি শয়তান না উন্মাদ?

ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ—জানালা দরজা কাঁপাইয়া ঝড় উঠিল। হিমস্পর্শ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে মাতামাতি করিতে লাগিল, সুধা উঠিয়া অন্য পেশান্টদের দেখিতে গেল।

নিশীথ মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, জানলাটা বন্ধ ক'রে দোব?

মুকুল জবাব দিল না।

— অসুখ কর্চ্ছে কিছু?

এবারেও কোন উত্তর দিল না।

না দিক্। অত খোসামোদ করিবার প্রবৃত্তি নিশীথের নাই। মাস-মাস এতগুলা টাকা খরচ করিতে হইতেছে এবং হইবে, তাই কি যথেষ্ট নয়! নিশীথের সন্দেহ হইল, বাড়াবাড়িটা হয়ত মুকুলের চোখে ভালো লাগে নাই। না-ই লাগুক। তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

ও যদি আজ মরিয়াই যায়, একটা ছেলে একটা মেয়ে, তারা ত' দিদিমার কাছে আছে, সে আবার

বিবাহ করিবে। হাঁ, এবারে একটু দেখিয়া শুনিয়া করিবে, একটু অন্য রকমের।

মুকুলের মত নিখুঁত সুন্দরী খুব কম মেলে, মুকুলের মত গুণবতীও দুর্লভ, দীর্ঘদিনের সংসার-যাত্রা —দুই সন্তানের জননী, তাহার সম্বন্ধে এমন নিষ্ঠুর কল্পনা করা কিছুদিন পূর্ব্বেও নিশীথের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

রাত্রে মুকুল কিছু খাইল না, খাইতে ইচ্ছা নাই। কেহ জোর করিল না। একবার ডাক্তার আসিয়াছিলেন। মুকুল বলিল — একটু সর্দ্দিভাব হয়েছে। রুমালে খানিকটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ দিয়া শুঁকিতে বলিলেন—direct draught-টা যেন না লাগে।

রাত্রের খাওয়া সারিয়া নিশীথ শুইয়া পড়িল, বারান্দায় ক্যাম্বিসের পর্দ্দা নামাইয়া সুভদ্রা যেমন শোয়, শুইল।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ক্ষীণ তার আলো, ঝড়-জল, বটগাছের শাখাপ্রশাখার আন্দোলন, চারিধারের বাগানের অসংখ্য গাছপালার সোঁ সোঁ শব্দ— দুর্য্যোগময়ী রজনী, অথচ কি এক মায়ায় মদির — এমন রাত্রেই অভিসারিকার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে ভালো লাগে, গুরু-গুরু আওয়াজের সঙ্গে বুকের দুরু-দুরু কম্পন, যে জগৎ চোখের সামনে হইতে মুছিয়া গেছে তাহাকে বিস্মরণের মোহে চঞ্চল হইয়া ওঠার স্বপ্ন —নিশীথকে ঠেলিয়া যেন বিছানা হইতে তুলিয়া দিল।

মুকুল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টাইম্‌পিস্‌টার টিক্-টিক্ শব্দ, দূরে কোন ঘরে নবজাত শিশুর কান্না··· ঝড়ের ঝাপ্‌টা, বৃষ্টির ছাঁট্—রহস্যময়ী রাত্রি।

আকাশে বাতাসে রিম্‌ঝিম্ রম্‌ঝম্ সুর—নিশীথ আজ ঘুমাইতে পারিবে না।

নিঃশব্দপদে সুধা আসিয়া দাঁড়াইল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, উনি ঘুমিয়েছেন?

তাহার সেই অতি আস্তে বলা কথা নিশীথের কানে প্রেমের গুঞ্জরণের মত মনে হইল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি অনুচ্চস্বরে বলিল, হ্যাঁ ঘুমিয়েছে। তুমি বোস।

আজ নিশীথের সকল সঙ্কোচ, সকল ভয় নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গেছে। সুধা বসিল, তাহার ভয়ও নাই, সঙ্কোচও নাই।

দেয়ালে টাঙানো দু'-গাছি যুঁইফুলের মালা— যা সে আজ গোধূলি বেলায় চৌক্ হইতে কিনিয়া আনিয়াছে—নামাইয়া আনিয়া সুধার খোঁপায় নিশীথ জড়াইয়া দিয়া পাশে বসিয়া পড়িল।

মৃদু অথচ উগ্র সুরভি দেহকে মাতাল না করুক মনকে করে।

ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো ভাবে বহিতে লাগিল, মুকুলের মশারি হাওয়ায় ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িতে লাগিল, মোমবাতিটার ক্ষীণ শিখা নিভিতে নিভিতে জ্বলিয়া উঠিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া গেল।

তখন প্রবল বর্ষণ সুরু হইয়াছে।

একটা তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্যুতের আলোক-রেখায় দেখা গেল সুধার দুইটা হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া নিশীথ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

সুধা ছুটিয়া দরজার দিকে গেল, তাহার আঁচলটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিশীথ টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সুইচ্ টিপিবার শব্দ হইল এবং আলো জ্বলিয়া উঠিল।

রুবি আসিয়াছিল, ব্যাপারটা দেখিয়াই আলো নিভাইয়া দিয়া পাশে আসিয়া বলিল — ৩ নম্বর কটেজমে চলিয়ে, উ ত' খালি হ্যায়। যেন তাহার কাছে ব্যাপারটা কিছুই নূতন নয়।

তাহার পরণে স্কার্ট এবং পায়ে হিল-উঁচু জুতা, সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

ঝড়ের মাতামাতিকে ছাপাইয়া তিনটি প্রাণীর

মাতামাতি রুক্ষভাবে হস্পিট্যাল কটেজের চিরন্তন প্রশান্তিকে আহত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতা লইবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া রুবি দেখিল বাতির আলো নিভিয়া গেছে।

এ সময়ে একবার রোগীকে দেখিয়া যাওয়া উচিত ভাবিয়া রুবি electric light জ্বালিয়া দিল।

মশারি তুলিয়া দেখে patient ঘুমাইতেছে।

তাহার গলায় একটা রুমাল বাঁধা,—এ কি? এ যে সেই সর্ব্বনাশা গ্রন্থি! সে নিজ-হাতে যা শিখাইয়াছে!

গায়ে হাত দিয়া দেখে ঠাণ্ডা। pulse নাই।

সে 'Oh God' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে নিশীথ ও সুধা দু'জনেই বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার?

রুবি শুধু বলিল — Dead.

শত বজ্রের ধ্বনির মত শুনাইল — DEAD.

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলিয়া নিশীথ শুধু ভাবিতে লাগিল—সব শেষ, এত দ্রুত এবং এত অকস্মাৎ!

নিশীথ এতক্ষণে বুঝিল কি ঝড় মুকুলের বুকে বহিতেছিল, বাহিরে প্রকৃতির ঝঞ্ঝার সঙ্গে হয় ত' তাহার তুলনাই হয় না।

রোগে মৃত্যু হইলে আফশোষ থাকিত না, এ যেন চিরজীবন ধরিয়া আফশোষ করিয়া জ্বলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

একদিন মূর্চ্ছিতা তাহাকে যে ভাবে ষ্ট্রেচারে করিয়া এই ঘরে আনা হইয়াছিল সেই ভাবে চারপাই করিয়া আজ ঘর হইতে বাহির করা হইল। নিশীথ শুধু দেখিল।

দুইজনে আসিয়াছিল, দুইজনে হাঁসপাতালের ফটক পার হইয়া যাইবার কথা, তা হইল না। তাহার ক্ষণিকের সাজানো সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া, ক্ষণিকের অস্থায়ী প্রেমের অভিনয়ের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া একাকী নিশীথ গঙ্গার ঘাটের দিকে বাহির হইয়া গেল।

তখনো সকালের আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে। সমৃদ্ধনগরীর অগণিত সৌধমালা গঙ্গার তীরতটে জলস্নাত হইতেছে।

যে বর্ষাকে নিশীথ চিরদিন ভালোবাসে আজ শোকের দিনে, দুঃখের দিনে তাহারো সুর যেন হাহাকারে ভরা, তাহারো রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ যেন বুকফাটা কান্নারই প্রতিধ্বনি।

চার নম্বর ঘর একেবারে খালি হইয়া গেছে।

সকালবেলা গয়লানী দুধ দিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। মোটা-গিন্নী আলু-বোখরার গল্প বলিতে আসিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ফিনাইল ঢালিয়া আবার নূতন রোগীর জন্য ঘর পরিষ্কার করা হইতে লাগিল।

নার্সদের আজ কাজে মন নাই, সুধা ঘরে গিয়া খিল দিয়াছে। পর্দ্দা-ওয়ার্ড চার নম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া মেট্রন শুধু বলিয়া উঠিল—Poor Soul!

বাংলা কবিতার ছন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্‌-এ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় সাধু ছন্দের ওই 'স্থিতি-স্থাপকতা' গুণের ফলেই কবিরা প্রয়োজনমতো যথেষ্ট যুগ্মধ্বনির আমদানী করতে পারেন। সাধু ছন্দের এই স্থিতিস্থাপকতা ও ভারবহনশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র 'শোষণশক্তি' ব'লে বর্ণনা করেছেন। কেন-না এ-ছন্দ আপন প্রকৃতিটিকে বজায় রেখেও বহুল পরিমাণে ব্যঞ্জনধ্বনি শোষণ ক'রে নিতে পারে। যাহোক্, এ-ছন্দের এই শক্তিটিকে স্থিতিস্থাপকতাই বলি আর ভারবহনশক্তি বা শোষণশক্তিই বলি, এর একটা সীমা কোথাও আছে অবশ্যই। এই সীমা কোথায় তার বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তির লীলা দেখাবার উদ্দেশ্যে যে দৃষ্টান্তগুলি রচনা করেছেন তাই উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

(১) পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে
(২) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে
(৩) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে
(৪) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে
(৫) সঙ্গীত তরঙ্গি' উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে
(৬) সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস
(৭) দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটিও নেই। তারপর ক্রমে ক্রমে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটি একটি ক'রে বাড়ানো হয়েছে। সপ্তম দৃষ্টান্তটিতে সর্ব্বশুদ্ধ ও-রকম যুগ্মধ্বনি আছে ন'টি। তার পর তিনি আর দৃষ্টান্ত রচনা করেননি। এর থেকে স্বভাবতই অনুমান হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে একটি পয়ার-পঙ্ক্তিতে ন'টির বেশি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি সমাবেশ করা সম্ভব নয়। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সাধারণ পয়ারের পঙ্ক্তিতে ন'টির বেশি শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির সমাবেশ করা সম্ভবপর হ'লেও তা পাঠকের দন্ত এবং শ্রোতার কর্ণ কোনোটার পক্ষেই নিরাপদ্ হবে না। শুধু তাই নয়, উদ্ধৃত সপ্তম দৃষ্টান্তটিকেও উক্ত প্রত্যঙ্গ-দ্বয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ বলা যায় না। অন্তত এ-কথা বলা চলে যে, ব্যঙ্গ-কবিতায় এ-রকম ন'টি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি-ওয়ালা পংক্তি ব্যবহার করা চললেও সাধারণ কবিতায় বোধ করি চলে না। যাহোক, উপরের সপ্তম দৃষ্টান্তটিকে আশ্রয় ক'রে অমূল্যধনবাবু যে সিদ্ধান্ত করেছেন সে-বিষয়ে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই ব'লে রাখ্‌ছি আমার বিবেচনায় তাঁর এই সিদ্ধান্তটিও 'দুঃসাধ্য' ব'লেই মনে হয়। তিনি খুব জোরের সহিত সূত্র তৈরী ক'রে বিধান দিয়েছেন, "হ্রস্বীকরণের একটা সীমা আছে। একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি মাত্র দুইটি যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি পর পর তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকে তবে তাহাদের মধ্যে একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—১৮ নং সূত্র, পৃঃ ৯ এবং ৩৪ দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখা যাক্ তাঁর এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসহ কি না।—

(১) তাম্রি অন্তরালে
রহিয়া 'অসূর্য্যম্পশ্য', নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্য রূপে
জীবনে যৌবনে।
—রবীন্দ্রনাথ, মানসী, অহল্যার প্রতি।

(২) আবর্ত্তিয়া তৃণপর্ণ, 'ঘূর্ণ্যচ্ছন্দে' শূন্যে
আলোড়িয়া,
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
—ঐ, কল্পনা, বৈশাখ।

(৩) তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান,
চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব 'নৃত্যচ্ছন্দের'
সন্ধানে।

* * *

আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী
তব জটা হ'তে
উত্তারি' আনিতে পারে নির্ঝরিত
রস-সুধা স্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে 'নৃত্যচ্ছন্দ'-মন্দাকিনী
ধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায়
প্রাণহারা।
—ঐ, নটরাজ (বনবাণী), উদ্বোধন।

(৪) বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি' শুধু কাহিনীর
'বাক্যপ্রান্তে' আছে ছায়া-প্রায়। কত জাতি
'কীর্ত্তিস্তম্ভ' রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
—ঐ, পরিশেষ, বিস্ময়।

(৫) বীর-'কীর্ত্তিস্তম্ভ' হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানব-কঙ্কাল-স্তূপে।
—ঐ, বিচিত্রিতা, যাত্রা।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। আশা করি অসূর্য্যম্পশ্যা, ঘূর্ণ্যচ্ছন্দ, নৃত্যচ্ছন্দ, বাক্যপ্রান্ত, কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি শব্দে "পর পর তিনটি হ্রস্ব যৌগিক অক্ষরের" ব্যবহার দেখে অমূল্যধনবাবু বুঝতে পারবেন যে, তাঁর সিদ্ধান্তটি সুসাধ্য নয় এবং তাঁর এই মূলসূত্রটির কিছুমাত্র মূল নেই। কেন-না উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-ক'টিতে ছন্দ ভুল হয়েছে, এ-কথা বলবার সাহস বোধ করি কারও নেই। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে 'বাক্যপ্রান্ত' ও 'কীর্ত্তিস্তম্ভ' সম্বন্ধে এই আপত্তি হ'তে পারে যে, এই শব্দ-দু'টির মধ্যে পর পর তিনটি যুগ্মধ্বনি বা যৌগিক অক্ষর নেই, এদের আসল রূপ হচ্ছে বাক্য-প্রান্ত, কীর্ত্তি-স্তম্ভ। অর্থাৎ এই শব্দ-দুটি সমাসের দ্বারা যুক্ত হ'লেও উচ্চারণে এরা বিযুক্ত। ইন্দ্রপ্রস্থ, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, বঙ্গপ্রান্ত (শিবাজী উৎসব, পূরবী) প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও এরকম আপত্তি হ'তে পারে। কিন্তু আমার উচ্চারণে কীর্ত্তিস্তম্ভ, বাক্যপ্রান্ত শব্দে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি থাকে এবং তাতে আমি আবৃত্তিকালে কোনো অসুবিধা বোধ করি নে। আর, আমার বিশ্বাস কবিগুরুও এ-সব শব্দগুলিকে বিযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করেন না। যদি করতেন তাহ'লে এই সব শব্দের মধ্যে অতি অনায়াসেই একটি ক'রে বিভাগ-সূচক হাইফেন-চিহ্ন বসাতে পারতেন। তা ছাড়া, ঘূর্ণ্য-ছন্দ ও নৃত্য-ছন্দ না লিখে তিনি যে এ-সব স্থলে সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করেছেন তাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উচ্চারণে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি থাকতে কোনো বাধা নেই। আর, 'অসূর্য্যম্পশ্যা' শব্দটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমূল্যবাবুর এই সূত্রটি একেবারেই মূল্যহীন। তাঁর এই সূত্রটির যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তা'হলে বাংলা যৌগিক বা পয়ারজাতীয় ছন্দ থেকে আত্মোৎসর্গ, যুদ্ধোন্মত্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, মন্দাক্রান্তা, অত্যাশ্চর্য্য, হর্ষোৎফুল্ল, বিদ্যুদ্বহ্নি প্রভৃতি শব্দকে একেবারেই বাতিল ক'রে দিতে হয়। কিন্তু বাংলা দেশের কবিরা তাতে রাজি হবেন কি? আমি যদি সাহস ক'রে লিখি—

আঁকি দিল বিদ্যুদ্বহ্নি যুগান্তের দিগ্-দিগন্তরে
মহামন্ত্র শিখা।

কিংবা—

তোমার সে আত্মোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন, ইত্যাদি

তাহ'লে অমূল্যধনবাবু কিংবা বাংলার কবি-সমাজ ক আমাকে ছন্দঃপাতন দোষে অপরাধী সাব্যস্ত রবেন ?

বাংলা ছন্দে "যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণের" সীমা অর্থাৎ আমার পরিভাষায় সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সমাবেশের সীমার প্রসঙ্গটা যখন উঠেই পড়েছে তখন এই বিষয়ে আরেকটু অগ্রসর হওয়া যাক্। দেখা গেল যে, যৌগিক বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সমাবেশ করতে কোনো বাধা নেই। অবশ্য এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাংলায় সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সচরাচর একাকীই থাকে; দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির একত্র সমাবেশ বিরলতর এবং তিনটির সমাবেশ আরও বিরল কিন্তু অপ্রাপ্য নয়। এইটেই বোধ করি অমূল্যধনবাবুর কথিত হ্রস্বীকরণের সীমা। কারণ যৌগিক ছন্দে তিনের অধিক সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির একত্র সমাবেশ সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ব'লে গণ্য করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং এ ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির প্রশ্ন আসে না। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট। এ কথা অমূল্যধনবাবুও স্বীকার করেন। এখন দেখা যাক্ এ ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি-সমাবেশের সীমা কোথায়। প্রথমেই দেখতে পাই যে, যৌগিকের ন্যায় স্বরবৃত্তেও সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সচরাচর এককই থাকে এবং এইটিই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। কিন্তু যৌগিক (অর্থাৎ সাধু পয়ার-জাতীয়) ছন্দে পর পর দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি যেমন বহুল পরিমাণে ও সুষ্ঠুরূপে ব্যবহৃত হয়, স্বরবৃত্ত ছন্দে তেমন হয় না। কিন্তু তা ব'লে স্বরবৃত্ত ছন্দে যে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব আছে তা নয়। যথা—

(১) দৈবে হতেম | 'দশম রত্ন' | 'নব রত্নের' | মালে

(২) 'নব রত্নের' | সভার মাঝে | 'রৈতাম একটি' | টেরে

—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল।

(৩) 'শেষ বসন্তের' | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে উঠল হা হা | করি।

—ঐ, ঐ, পরামর্শ।

(৪) 'জান্তাম নাক' | 'চিন্তাম নাক' | তোমায় আমি | প্রিয়তমে

* * *

হঠাৎ তুমি | 'পূর্ব্বাঙ্গনে' | উদয় হলে | 'শরচ্চন্দ্র' শান্ত গরি- | মায়।

— দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, অষ্টাদশ চিত্র।

(৫) 'সাম্রাজ্যেরি' | স্বর্গ-সিঁড়ি | গড়্‌ছ তখন | অতন্দ্র

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।

(৬) যাদের লাগি | 'ধনুর্ভঙ্গ' | যাদের লাগি | লক্ষ্যবেধ

—ঐ, ঐ, মৃত্যু-স্বয়ম্বর।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে এগারোটি পর্ব্বে পর-পর দুটি ক'রে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি আছে। আরও তলিয়ে দেখ্‌লে এদের মধ্যেও একটু পার্থক্য টের পাওয়া যাবে;—কতকগুলিতে (যেমন দশম রত্ন, শরচ্চন্দ্র, ধনুর্ভঙ্গ) যুগ্মধ্বনিগুলি পর-পর স্থাপিত হ'লেও এদের দুই পূর্ব্বার্দ্ধে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু আর কতকগুলিতে (যেমন, নবরত্নের, শেষ বসন্তের, পূর্ব্বাঙ্গনে, সাম্রাজ্যেরি) যুগ্মধ্বনি-দুটি একই পর্ব্বার্দ্ধে অবস্থিত। যৌগিক ছন্দে পর-পর দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির সহায়তাই করে। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে উপর্য্যুপরি দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি বিশেষ সুখশ্রাব্য হয় না, বিশেষত' যদি এদুটি একই পর্ব্বার্দ্ধে স্থাপিত হয়।

পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, অমূল্যধনবাবুর নিষেধ-বিধি থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যের যৌগিক ছন্দে একই পর্ব্বে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখন আমরা দেখ্‌ব বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেই এর নিদর্শন আছে—যথা, রৈত্তাম একটি। এ দৃষ্টান্তটি হয়তো খুব সন্তোষ-জনক নয়। কারণ ছন্দ-সন্ধি বা metrical **liaison**-র নিয়ম অনুসারে এ পর্ব্বটিকে 'রৈত্তামেকটি' ব'লেও গণ্য করা যেতে পারে। ছন্দ-সন্ধি সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহোক্, রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' (ক্ষণিকা) কবিতাটি থেকেই অন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

জীবন-তরী | ব'হে যেত | মন্দাক্রান্তা | তালে

এখানে 'মন্দাক্রান্তা' শব্দে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-ধ্বনি আছে। তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, এ শব্দটিকে দু-ভাগে বিচ্ছিন্ন ক'রে মন্দা-ক্রান্তা এ ভাবে উচ্চারণ করতে হবে। অতএব অন্য দৃষ্টান্তের সন্ধান দেওয়া যাক্।—

(১) রোগের ঋণের | শেষ রাখ না | 'কলঙ্কের
শেষ' | রাখ্‌বে কি ?
—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, মৃত্যু-স্বয়ম্বর।

(২) যাহার কাছে | 'কইতাম নিত্য' | গৃহ আঁধার
| কোরে
চোলে গিয়ে- | ছে সে।
—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, পঞ্চম চিত্র।

এখানে 'কলঙ্কের শেষ' এবং 'কইতাম নিত্য' এ দুটি পর্ব্বে স্পষ্টই পর-পর তিনটি হ্রস্ব যৌগিক অক্ষর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি রয়েছে, একটিকেও দীর্ঘ ধরতে হয় না। অতএব এখানেও অমূল্যধনবাবুর মূল সূত্রটি খাটছে না। শুধু তাই নয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে একই পর্ব্বে পর-পর চারটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তও আছে। যথা—

(১) সে যদি তোর | থাকতো, থানিক | 'আব্দার
কর্ত্তিস্' | শোবার আগে
দাবী কর্ত্তিস্ | চুমা।
—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ষষ্ঠ চিত্র।

(২) অনেক বাক্য | হানাহানি
'গর্জ্জন বর্ষণ' | অনেকখানি।
—ঐ, ঐ, সপ্তম চিত্র।

অতএব দেখ্‌তে পাচ্ছি যৌগিক ছন্দে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এরূপ যুগ্মধ্বনি পর-পর চারটে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। কাজেই এই উভয় প্রকার ছন্দেই অমূল্যধনবাবুর বিধান টেঁকে না। তাঁর আরেকটি নিয়ম হচ্ছে এই। "স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে নিত্য-হ্রস্ব হওয়া দরকার।" (বাংলা ছন্দের মূল-সূত্র, পৃঃ ৪০)। উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর এই নিয়মটিও সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নয়। যাহোক্, একথা বলা দরকার যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে এক পর্ব্বে চারটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সমাবেশ সুখশ্রাব্য নয় এবং তাই এ রকম দৃষ্টান্তও খুব বিরল; আর চার সিলেব্‌ল্ বজায় রেখে (পর-পর কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে) তিনটি যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বেশি নয়; তা-ছাড়া এ ছন্দে একই পর্ব্বে, বিশেষত' একই পর্ব্বার্দ্ধে, উপর্য্যুপরি দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তও অপেক্ষাকৃত কম—কেন-না এ রকম সমাবেশ খুব শ্রুতি-সুখকর হয় না।

৪

এবার আমাদের মূল প্রসঙ্গে অর্থাৎ যৌগিক বা পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে দুয়েকটি কবিতায় সাধারণ পয়ার ছন্দে "যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে" একটি নবতন ছন্দ-রীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করেছিলেন। অর্থাৎ 'মানসী'র ওই দুয়েকটি কবিতাতেই আধুনিক কালে "মাত্রাবৃত্ত পয়ার" রচনার প্রথম প্রয়াস হয়েছে। "নিষ্ফল উপহার" ও "কবির প্রতি নিবেদন", এই দুটি কবিতার মাত্রারীতির প্রতি লক্ষ্য করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। "নিষ্ফল উপহার" কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন হচ্ছে এই—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।
(মাত্রিক পয়ার)

কিন্তু এই 'মাত্রিক পয়ার' নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের কানকে প্রসন্ন করতে পারেনি। তাই দেখতে পাই তিনি পরবর্ত্তী কালে এই কবিতাটিকেই মাত্রিক ছন্দ থেকে যৌগিক ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন। যথা —

নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল।
দুই তীরে গিরি-তট, উচ্চ শিলাতল॥
(যৌগিক পয়ার)
—কথা ও কাহিনী।

মাত্রিক পদ্ধতির পয়ার রবীন্দ্রনাথের কানকে কেন প্রসন্ন করতে পারেনি এবং কেন তিনি এই কবিতাটির মাত্রিক পয়ারকে যৌগিক পয়ারে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমি অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি (প্রবাসী — চৈত্র, ১৩৩৮, পৃঃ ৭৭৯-৮১)। সুতরাং এ-স্থলে ও-বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গত বৈশাখের "উদয়নে" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অনতিকাল পরেই বোঝা গেল পয়ারের উপর এ আইন (যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা গণ্য করার) চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। বিনা বাধায় লেখা যেতে পারে —

উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্ত্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল।"
(যৌগিক পয়ার)

তাঁর এ-উক্তি থেকে মনে হ'তে পারে পয়ারে "যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব" দেবার অর্থাৎ মাত্রিক পয়ার রচনা করার "কোনোই প্রয়োজন নেই।" কিন্তু এ-রকম ধারণা যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। 'মানসী'র পর বহুকাল রবীন্দ্রনাথও মাত্রিক পয়ার রচনা করেননি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে তিনি মাত্রিক পয়ার ছন্দে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটিতে আমি বহু দৃষ্টান্ত যোগে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছি। সুতরাং এ-স্থলে একটিমাত্র নিদর্শন দেখিয়েই ক্ষান্ত হব। যথা—

শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদ-গীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণ-রিক্ত
নিঃশেষ বিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুক-বীথিকা।
—নটরাজ (বনবাণী), শেষ মিনতি।

শিশুপাঠ্য "সহজপাঠ" (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকখানিতেও 'মাত্রিক পয়ারের' অতি চমৎকার দুটি দৃষ্টান্ত আছে। একটু নমুনা দেখাচ্ছি—

(১) আমাদের ইস্কুল ছোটে হন্ হন্,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ঘণ্টা কেবলি দোলে ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক্ তবু থামে না যে।

(২) সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।
'হরি হরি' রব উঠে অঙ্গন মাঝে
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি খঞ্জনি বাজে।

অতএব দেখতে পাচ্ছি পয়ার ছন্দে 'যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব' দেবার 'কোনোই প্রয়োজন নেই', এ-কথা বলা যায় না। বরং প্রয়োজন মতো পয়ারে যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে অতি চমৎকার ছন্দ রচনা করা যায়। অর্থাৎ দরকার মতো যৌগিক পয়ার ও মাত্রিক পয়ার দুটোই চলে, কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ।

এই যৌগিক পয়ার ও মাত্রিক পয়ার ছাড়া আমাদের কাব্য-সাহিত্যে আরেক রকম পয়ারের প্রচলন আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বল্‌তে পারি 'প্রাকৃত পয়ার'। এই প্রাকৃত পয়ারকেই আমার পরিভাষায় বলি স্বরবৃত্ত পয়ার। গত বৈশাখ মাসের 'বঙ্গশ্রী'-তে (পৃঃ ৪২৬-২৭) রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র

ছন্দের ন্যায় 'পলাতকা'র ছন্দকেও 'বেড়া-ভাঙা পয়ার' ব'লে অভিহিত করেছেন। আর একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, 'বলাকা'য় হচ্ছে যৌগিক বা সাধু ছন্দের পয়ার আর 'পলাতকা'য় স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের পয়ার। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথও বাংলা ছন্দের তিন শাখার এই তিন প্রকার পয়ারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই এই ত্রিবিধ পয়ারের বিষয় আলোচনা করেছি। সুতরাং এ স্থলে এই ত্রিবিধ পয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।—

(১) নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
উর্দ্ধে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল॥
(মাত্রিক পয়ার)

(২) উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্ত্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল॥
(যৌগিক বা সাধু পয়ার)

(৩) নীচের পানে বয় যমুনা, স্বচ্ছ শীতল জল
দুর্গম ওই শৈল-তটে উদ্দাম উচ্ছল॥
(স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত পয়ার)

'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দের প্রসঙ্গ যখন উঠেই পড়েছে তখন প্রয়োজন-বোধে এস্থলে একটি কথা ব'লে রাখ্‌তে চাই। "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান" নামক পুস্তিকায় (পৃঃ ২৩-২৪) আমি লিখেছি, "ছন্দের ধারা যখন অক্ষরসংখ্যা ও পংক্তির অন্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম ক'রে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখনও প্রতি ছত্রকে একটি নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। এ তত্ত্বটি অনুভব ক'রেই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পংক্তি-নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডি দৃঢ়হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।...'বলাকা'য় যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে এই কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে।" আমার এই উক্তির উপর অমূল্যধনবাবু মন্তব্য করেছেন, "অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যে run-on ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, সেখানে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পংক্তি রচনা করিয়া কেবলমাত্র একটা কৃত্রিম নিরর্থক রীতির দাসত্ব করিয়াছেন। এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।" (বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৩৯, পৃঃ ৮৩)। তৎপর তিনি আমার নানা প্রকার গুরুতর 'ভ্রম' প্রদর্শন ক'রে দেখিয়েছেন যে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দে পংক্তি-বন্ধনের মুক্তি ঘটেনি। এস্থলে এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে কি বলেন, শুধু তাই দেখিয়েই আজ ক্ষান্ত হব। আমি যাকে বলি প্রবহমান (বা enjambed) ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দ, আর অমূল্যধনবাবু তাকেই বলেছেন run-on ছন্দ। এই পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ গত বৈশাখ মাসের 'বঙ্গশ্রী'-তে লিখেছেন, "অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব প্রথমে পাল্কির দরজা গেছে খুলে, তার ঘেরাটোপ হয়েচে বর্জ্জিত। তবুও পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চল্‌তে সুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পর্ব্বশেষ-রূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে র'য়ে গেচে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দর-মহল, তার দেয়ালগুলো সরানো হয়নি কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার ক'রে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করচে। অবশেষে হাল আমলের তৈরী ইমারতে সেই দেয়ালগুলো বাদ দেওয়া সুরু হয়েচে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডি-ভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম 'নিস্ফল প্রয়াস'। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য়, 'পলাতকা'য়।" আমার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লেই এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকবে না যে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র মুক্ত ছন্দ সম্বন্ধে আমার কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথার কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। আমি যাকে বলেছি চোদ্দ বা আঠারো

অক্ষরের পংক্তির গণ্ডি-ভাঙা ছন্দ, তিনিও তাকে গণ্ডি-ভাঙা বা বেড়া-ভাঙা পয়ার ব'লে অভিহিত করেছেন। অমূল্যধনবাবু কিন্তু 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দকে চোদ্দ বা আঠারো অক্ষরের পংক্তিতে সাজাতেই উৎসুক। কিন্তু তাও তিনি সর্ব্বত্র পারেননি। যেখানে যেখানে পেরেছেন সেখানেও ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিক এবং কতকটা তাঁর কষ্টপ্রয়াস-প্রসূত। যাহোক্, 'মানসী'র গণ্ডি-ভাঙা পয়ার ছন্দের কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিষ্ফল প্রয়াস'। সম্ভবত অনবধানতা-বশতই তাঁর একটু ভুল হয়েছে, কেন-না 'মানসী'র 'নিষ্ফল প্রয়াস' নামক কবিতাটির ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের বেড়া-ভাঙা পয়ার নয়। বেড়া-ভাঙা পয়ারে লিখিত কবিতাটির নাম হচ্ছে 'নিষ্ফল কামনা'। এই কবিতাটি সম্বন্ধেই আমি আমার পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকায় লিখেছি, "এ কবিতাটিকে বলাকার যুগের স-মিল মুক্তক ছন্দের অগ্রদূত মনে করা যেতে পারে।" (পৃঃ ২৬)। ইদানীং "পরিশেষ" গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথ অ-মিল মুক্তক ছন্দে আরও অনেকগুলি সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আগন্তুক', 'জরতী', 'প্রাণ' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। এ সকল অ-মিল মুক্তক ছন্দের কবিতাকে মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার সমশ্রেণী-ভুক্ত ব'লে গণ্য করা যায়। এ সকল কবিতায় অক্ষর বা পংক্তির বন্ধনের ন্যায় মিলের বন্ধনও ঘুচে গেছে। ধ্বনিগত ছন্দের মুক্তি এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হ'তে পারে না। অতঃপর কবিতার মুক্তি ঘটেছে পুরোপুরি ভাবগত গদ্যছন্দের মধ্যে, 'পুনশ্চ' গ্রন্থে।

যাহোক্, আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'পরিশেষে'র অ-মিল মুক্তক ছন্দের কবিতাগুলিতে শুধু যে পংক্তি-দৈর্ঘ্য ও মিলের বন্ধন থেকেই ছন্দের মুক্তি ঘটেছে তা নয়, সাধু ভাষার বন্ধন থেকেও ছন্দের মুক্তি ঘটেছে। দৃষ্টান্ত দিলেই এই ভাষাগত বন্ধন-মুক্তির অর্থটা পরিষ্কার হবে।

> সে না হ'লে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
> উঠ্‌ত না শঙ্খধ্বনি,
> মিল্‌ত না যাত্রী কোনোজন,
> আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হ'য়ে
> রইত নীরব।
>
> —পরিশেষ, প্রাণ।

এখানে উঠ্‌ত, মিল্‌ত, রইত প্রভৃতি হসন্ত-মধ্য প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির ছন্দের ঠাট হচ্ছে সাধু, কিন্তু ভাষার ঠাট হচ্ছে প্রাকৃত। এ ভাবে সাধু-ছন্দের ঠাটের মধ্যে প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল এই 'পরিশেষ' কাব্য গ্রন্থ-খানিতে। এইটেও পরিশেষের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। যাহোক্, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবিতায় ব্যবহৃত ভাষার ঠাট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। এ উপলক্ষ্যে "বিচিত্রা" (পৌষ, ১৩৩৮, পৃঃ ৭১৫) এবং "পরিচয়ে" (মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৮৯) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যথাসময়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। যাহোক্, 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির ছন্দ অমিল মুক্তক বটে, কিন্তু ভাষা সাধু; আর 'পরিশেষে'র অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতাগুলির ভাষার ঠাট প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাকৃত। এ পার্থক্যটুকু স্মরণীয়। অবশ্য 'পরিশেষে' অমিল মুক্তক ছন্দে রচিত কবিতায় সাধু ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'জরতী'-নামক কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং 'নিষ্ফল কামনা' ও 'জরতী'র মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই তা শুধু ছন্দোগত নয়, ভাষাগতও বটে।

(শেষ)

চিত্র-লেখা

শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ

অপরূপ রূপ রচনার লাগি বিধাতা নিজের ধ্যানের যোগে,
সৃজিলা যে নারী চির মনোরমা ভুলাতে এ তিন ভুবন-লোকে,
ঋষি দিল তারে পুণ্যের ফল, কবি দিল পায়ে পূজার ফুল,
অনুরাগময়ী ছবি অতুল।
তারই আলেখ্য লিখেছে শিল্পী তুলি-সম্পাতে টানিয়া রেখা,
বহুভাবময়ী রস-কদম্ব, রূপবালা নাম—'চিত্র-লেখা'।
নিটোলা গৌরী, মুকুতা-দশনা, পক্কবিম্ব অধর পুটে,
ঘন কুঞ্চিত কাজল চিকুর এলায়ে কপোল বেলায় লুটে,
শশীকলা সম বিমল ললাট নীচে তার বাঁকা ভুরুর পাঁতি,
আনত নয়নে রোমরাজি ঢুলে কমল যেন বা ভ্রমর-সাথী!
অতুল রাতুল কপোল দু'টি!
আলোকে ঝলকে কানে দু'টি দুল, পুলক পাথর পড়িছে লুটি!
বেগুনীফুলের রঙ শাড়ীখানি, ধারে পুষ্পিত বনজলতা,
বক্ষে আঙুলে প্রকোষ্ঠ ঘিরে রতণ ভূষণ জড়িত তথা।
দক্ষিণ করে লীলা-বিহঙ্গ; পয়োধর-মূলে চাপিয়া ধ'রে,
বাম কর দিয়া চঞ্চুতে রাণী আহার যোগায় আদর ক'রে।
অধরে, গ্রীবায়, কণ্ঠে, চিবুকে, কটিতট বেড়ি' কক্ষে তারি,
নব বসন্ত ছানি' কি মাধুরী জড়ায়ে ছড়ায়ে বলিতে নারি!
নয়নে যেন বা কুমুদী-বিভা!
কে জানে চোখের আড়ালে—নিভৃতে, আরো সে মোহিনী রয়েছে কিবা!

* * * * *

যতবার চাই মুখপানে তার, কত কথা কহে চিত্র-লেখা,
নয়নের কোলে নবনী উথলে কপোলে জাগায়ে রক্ত-রেখা!
বলে বিরহিণী, 'রে বুল্ বুল্!
বল্ দেখি কবে আসিবে সেজনা? ত্রিভুবনে যার নাহিক তুল!'
বেদনা-হরষ ছাপিয়া যায়,
জল ঢলঢল আঁখির কোণায়, শ্বাস নিতে ভুল হয় বা হায়!
চোখ পালটিতে মনে হয় যেন প্রিয় সমাগমে বরষ পরে,
হাসিরাশি এই ফাটিয়া পড়ে!

মাণিক-ঝরানো ওষ্ঠ-অধরে থর থর করে দুইটি বাণী,
'এতদিন পরে এলে প্রিয়তম? মনে কি পড়িল তোমার রাণী?'
এ কি দেখি? প্রেম লীলাভিনয়?
'ভালোবাসি কি না জানি না, জানি না।' তবু সে কথা কি গোপন রয়?

* * * * *

হায় কোন্ জনা হেন সুভাগ্য, তোমার মনে যে বেঁধেছে বাসা?
অমৃত পশরা বহো কার তরে? কোন্ তাপসের পূরাবে আশা!
বলিবারে বাধে, সে-জনা কি…? ওই দিকে দিকে ছুটে রক্ত-রেখা,
নবনী বদন নত হ'য়ে নামে, স্তবকাবনত চিত্র-লেখা।
'মুখ তুলে চাও, এদিকে তাকাও; ওগো ভালো ক'রে নয়ন মেলো,
অমিয় সাগর তীরে বসি হায়, পিপাসায় যে গো পরাণ গেলো।'
পাষাণ প্রতিমা! শুধু সেই হাসি মেরু-প্রভা সময় অধরে ফুটে,
নভোনীল, ধরা, অনল, অনিল, দুটি চরণের ছায়ায় লুটে!
মহাভাবময়ী রহস্য-লতা! বিদায়-ব্যথা কি বাজিছে মনে?
'মোরে ছেড়ে কেন চলে যাবে প্রিয়?'—
এই ভাষা জাগে নয়ন কোণে!

* * * * *

ওগো কবি আমি, কেহ কোথা নাই, মূক যবনিকা বারেক তোলো,
কবি-শিল্পীর মানস দুহিতা, কি তুমি? কে তুমি? অধর খোলো।

* * * * *

'আমি সেই নারী, অনাদি নূতন; রামধনু-রাঙা তোরণ বেয়ে
স্বরগ হইতে ঝরিয়া পড়েছি, ধরণীর ধূলা রেখেছি ছেয়ে।
দেহের কলসে রূপের মদিরা, আঁখিতে আমার প্রহেলি-আলো,
নিখিল-চিত্তে কুহক লাগাতে অজানিতে তারে বেসেছি ভালো।
প্রহেলিকা আমি! তবুও বুঝি না আপন মনেরই কেমন ধারা,
বিজয়িনী আমি, সর্ব্বহারা!
মেঘের বিজুরী বন্দী করেছে কনক-বলয়ে মাটির গেহ,
বারে বারে তাই ফিরে ফিরে চাই, মানুষের প্রেমে বিকাই দেহ।
বাহুপাশে মোর মিলন যখন বিরহ তখন নয়নে ভায়,
মোর জীবনের চির ইতিহাস—রৌদ্র মেঘের খেলা সে হায়!'

———

সংস্কার ?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

হঠাৎ চোখে চোখ পড়িয়া গেল ; দু'জনেই দু'জনকে নয়ন ভরিয়া, বুঝি বা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল ; নয়নে সুপ্রকাশ গভীর বিস্ময় অপসৃত হইয়া আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের বিস্মিত দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে যবনিকা উঠিয়া, অত্যুজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ প্রকাশ পাইল। দু'জনের কালো চোখে আনন্দের আলোক ফুটিয়া উঠিল। হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া, অসিত কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, আপনি, কোত্থেকে ? কোথায় যাবেন ?

নীলা নমস্কার করিতে, অসিত অপ্রস্তুত হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল। নীলা বলিল, আসছি লক্ষ্ণৌ থেকে, যাবো কলকাতায়। আপনি কোথা থেকে, কোথায় যাবেন ? কেন, আপনি কি জানেন না, আমরা এখন লক্ষ্ণৌ-এ থাকি ?

—জানি, বলিয়া অসিত ওয়েটিংরুমের বেহারাকে দু'খানা চেয়ার আনিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসিল, সঙ্গে কে ? সেন আছেন ?

—না, ছোট দেওর আছে। কলকাতায় বড়দার অসুখের খবর পেয়ে ছুটছিলাম, পথে এই বিপদ ! তিনি ছুটী পেলেন না। আপনি কি কোন খবর পেলেন, ট্রেন চলবে কি-না ?

—৪৮-ঘণ্টার আগে ত' নয়ই ; তবে চেষ্টা চলছে, যত তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন সারাতে পারা যায়।

বেহারা দু'খানা চেয়ার আনিয়া প্ল্যাটফর্মে পাতিয়া দিল। অসিত নীলার দিকে একখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া অনুরোধ করিল, বসুন ! তারপর কহিল, আমারও বিপদ দেখুন-না, কাল রাত্রে কলকাতায় বিশেষ একটা জরুরী কাজ পড়েছে, অথচ যাবার উপায় নেই। লাইন ভাঙ্‌বার আর সময় হ'ল না।

নীলা কিছুক্ষণ কথা কহিল না, তারপর ক্ষুব্ধ-করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি হয়ত দাদাকে আমার শেষ দেখাও দেখতে পাব না। দাদা কি আর আছেন !

নীলা বলিতে লাগিল, খুব বেশী অসুখ। কাল রাত্রে একখানা, আজ সকালে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। শেষখানা ভীষণ—"কোন আশাই নাই, তবু এসো।"—আর্দ্রকণ্ঠে কথাগুলো বলিয়া নীলা কোলের উপরে রক্ষিত ছোট্ট ব্যাগটি খুলিয়া একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিল। ভাঁজ খুলিয়া একবার পড়িয়া অসিতের প্রসারিত হস্তে দিল।

অসিত বলিল, তাইত !

নীলা বলিতে লাগিল, পাঁচ ভায়ের এক বোন, আর সকলের ছোট, দাদা আমাকে কি ভালই বাসতেন ! সুখে দুঃখে আমাকে না হোলে দাদার আমার একটি দিনও চলতো না। সেই দাদাকে একবার, শেষবার চোখের দেখাও হয় ত' দেখতে পাব না।—তাহার কণ্ঠস্বরে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছিল।

অসিত টেলিগ্রামখানা ভাঁজ করিতে করিতে বলিল, দেখবো কোনও উপায় করতে পারি কি-না ?

—কি করে পারবেন ? ট্রেন ত' চলছে না।

—আপনি একটু বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। কিন্তু, দেওরটি কোথা ?

—সে গেছে ষ্টেশন মাষ্টারের খোঁজে।

—আমি আসছি বলিয়া অসিত উঠিল। বিদায় লইবার পূর্ব্বে সেই চোখ দু'টিতে আবার চোখ পড়িল। বর্ষার স্বচ্ছমেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ যেন ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মৃদুমন্দ ধারা ঢালিয়া দিতেছে। এই

চোখ দু'টি, কত কাল, কত দীর্ঘকাল অসিতের অন্তরে স্বপ্ন সৃজন করিয়াছে, তাহা শুধু অসিতই জানে। নীলাও বোধ হয় জানিত; কিন্তু প্রকাশ নাই। অসিত চলিয়া গেল, কৃতজ্ঞতায় করুণ দু'টি চক্ষু তাহাকে দূর—অতি দূর, যতদূর দেখা যায়, অনুসরণ করিয়া চলিল।

নীলার দেবর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, না বৌদি, কালকে রাত্রের আগে কোন আশা নেই। 'ব্রিচ'টা খুব বেশী হয়েছে, বুঝলে না, আর এক জায়গায় নয়, দু' জায়গায়। এদিকে মোগলসরাই ষ্টেশনের থার্ডক্লাশ যাত্রীঘরে যাত্রী আর ধরছে না। ষ্টেশন মাষ্টার তাদের যে কোথায় বসায়, কি করে, তা ঠিক করতেই পাচ্ছে না।

এ সবের কোন খবরের জন্য নীলার কোনই আগ্রহ ছিল না। সে নয়ন দুইটি পথে পাতিয়া সেই লোকটির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবর বলিতে লাগিল, ঘণ্টা দুই পরে-পরে লক্ষ্ণৌ-এর দিকে দু'খানা গাড়ী ছাড়বে বৌদি, ইচ্ছে করলে আমরা এখন ফিরতেও পারি। আমি বলছি কি, এখানে দু'দিন দু'রাত্রি পড়ে থাকার চেয়ে ফিরেই যাই চল।

নীলা নীরবে পথের পানে চাহিয়া রহিল। প্ল্যাটফর্মেও অসাধারণ ভিড় জমিয়া গিয়াছে, দশহাত দূরের লোককেও দেখা যাইতেছে না।

দেবর বলিল, চা আনতে বলবো বৌদি?

যত্নপরায়ণ দেবরটির আগ্রহাতিশয্যে বাধা দিতে নীলার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু যে লোকটি গিয়াছে সে যতক্ষণ না ফিরে, কিছুতে মন দিতেও সে পারিতেছিল না; বলিল, একটু পরে ঠাকুরপো।

বলিতে বলিতেই, অসিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাস্য-ফুল্ল মুখ দেখিয়া নীলার অন্তরে আশা ও আনন্দ যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অসিত বলিল, উপায় হয়েছে। এইটি দেবর বুঝি?

—হ্যাঁ। কি উপায় হোল?

—একখানা মোটর আছে। এখন ছাড়লে, কাল বিকেল নাগাদ পৌঁছোন যায়। কিন্তু প্রায় সাত'শ মাইল মোটরে দৌড়োতে কি আপনি পারবেন?

—পারবো।

যুবাবয়স্ক দেবর কৌতূহল-অধীর হইয়া কহিল, মোটরে কলকাতা? ভাড়া মোটর? কত ভাড়া লাগবে?

—ভাড়া মোটর নয়।—নীলাকে বলিল, কিন্তু দেরী করলে হবে না। চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়, আমারও না। ওরে পরমা, কেল্‌নারে খবর দে, তিনটে কেক্, রুটী-মাখন, চা—চট্ ক'রে।

নীলা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের ভার যেন বহিতে পারিতেছিল না; মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, মোটর এসে গেছে?

—মোটর বাইরেই আছে। কাশীর রাজার গাড়ী, আমি ঐ গাড়ীতেই এসেছি, আমার জিনিষপত্র গাড়ীতেই রয়েছে। রাজাকে একখানা 'তার' করে দিয়ে জানিয়ে এলুম শুধু। সে সব ঠিক আছে, তার জন্যে নয়, আমি ভাবছি, মোটর ঝাঁকানির কষ্ট আপনার সইবে কি? যে শরীর আপনার!

নীলার মুখে হাসি ফুটিল, চোখে বুঝি খানিক দুষ্টামিও দেখা দিল; বলিল, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই। কি হয়েছে আমার শরীরে! আমি খুব শক্ত, তা জানেন না বুঝি? দেখতে রোগা, কিন্তু কখনও আমার অসুখ হয়েছে শুনেছেন কি?

অসিত সস্নেহ-দৃষ্টিতে সেই কৃশঋজু স্নিগ্ধকোমল দেহটিকে দেখিয়া লইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, অসুখ না হওয়াই ত' ভাল। আমাকে দু'মিনিট মাপ করুন, মুখ হাতগুলো ধুয়ে ফেলি, চা আস্‌ছে।

সে চলিয়া যাইতে, দেবর জিজ্ঞাসিল, উনি কে বৌদি?

নীলা একটু অন্যমনস্ক ছিল, শুনিতে পায় নাই। দেবর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতে, ভাবমধুরস্বরে কহিল—বিশেষ বন্ধু।

দেবর বলিল, মোটরেই যাবে না-কি বৌদি?

নীলা বলিল, ওমা, যাব না আবার! অমন সুবিধে কেউ ছাড়ে! তুমি কি করবে, ঠাকুরপো, যাবে, না ফিরবে?

—তুমি যা বল্‌বে?

—ফিরেই যাও তুমি, কি হবে মিছে কলেজ কামাই করে?

দেবর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, কি বল্‌বো দাদাকে, ওঁর নামটা ত' বল্লে না?

নীলা বলিল, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, চিঠি দিলেই হবে। ওঁর নাম অসিতবাবু।

দেবর সম্ভবতঃ প্রসন্ন হইল না। তরুণ যুবকটি সুন্দরী বউদিদির পরম অনুরাগী, ভক্ত। সুন্দরী বৌদিদির দেবররা তাহাই হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাইল-পোষ্ট দেখিয়া ঘড়ি, কাগজ-কলম লইয়া হিসাব করিতে করিতে স্থির হইল, রাত্রি এগারটা আন্দাজ গয়া পৌছান যাইবে। রাত্রিটুকু সেখানকার ডাক্ বাঙলোয় নৈশ আহার সারিয়া বিশ্রাম লইয়া শেষ রাত্রে আবার ষ্টার্ট দিলে, বাকি চারশত মাইল আট ঘণ্টায় অতিক্রম করা যাইতে পারিবে। পাঁচ ঘণ্টা হয় নাই, তিন'শ মাইল পার হওয়া গিয়াছে, গয়া পৌছিতে বড় জোর দুই ঘণ্টা দেরী। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে, আকাশের এক কোণে ছোট্ট একখানি চাঁদ হাসিতেছে। শান্ত প্রকৃতির চক্ষুতে যেন তন্দ্রা নামিয়াছে। নীলা যত জোরেই প্রতিবাদ করুক, যতই অস্বীকার করুক, শ্রান্তি ও ক্লান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে; চক্ষু চাহিতেও আর পারিতেছে না। অসিত থার্ম্মো ভরিয়া চা আনিয়াছিল, একবার তাহাও খাওয়া হইয়াছে, তবুও ক্লান্তি দূর হইতেছে না। মনের জোর না-কি নীলার কম ছিল না, তাই সে এখনও বসিয়া থাকিতে পারিয়াছে, অন্য কেহ হইলে, পারিত না। বারবার অনুরোধ করিয়া বিফল হইয়াও অসিত আবার অনুরোধ করিল, তুমি একটু শোও নীলা, পা দু'টো জুড়ে হুডের ওপর রেখে, আমার এইখানে মাথা রেখে একটু শুয়ে পড়।

—না, না, কিছু দরকার নেই, আমি বেশ আছি আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

অসিত তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয় আদরের স্বরে বলিল, তুমি বেশ বল্লেই হবে! শো বলছি।—বলিয়া অসিত হাত ছাড়িয়া, তাহার মাথা ধরিয়া নমিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নীলা পুলক-ঝঙ্কৃত বীণাধ্বনির মত বলিল, সত্যি আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

অসিত এবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, না-হচ্ছে ভালই, তবু তোমায় শুতে হবে। লক্ষ্মীটি, একটুখানি শুয়ে পড়।

অগত্যা নীলা জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিল। চাঁদের আলোর কৃপণতা ছিল না, অবিরল ধারায় নামিয়া মুখখানিকে স্নান করাইতে লাগিল। অসিত দুইহাতে তাহার বিক্ষিপ্ত কেশগুলিকে সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল, নীলা?

নীলা আবেশভরে কহিল, কি?

—রাগ করছ?

—কেন? রাগ করবো কেন?—সে যে রাগ করে নাই সেইটুকু বুঝাইবার জন্যই, অসিতের কোলে মাথাটার চাপ দিল।—'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলছি, তাতে রাগ করছ না ত'?

—না। ও ত' আমার ভালই লাগে। কেউ আপনি বল্লেই আমার বরং রাগ হয়। মনে হয় আমি মস্ত একটা ভারিখ্‌কে লোক হয়ে পড়েছি।

অসিত আস্তে আস্তে নীলার শুভ্র কপালটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, নীলা আমি আজ যেন একটা স্বপ্ন দেখছি।

নীলা মৃদু মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিসের স্বপ্ন?

অসিত বলিল, আমার বহুকালের স্বপ্ন, বহুদিনের সাধনা আজ যেন সত্য হতে চলেছে, নীলা! তোমাকে যে কোনদিন আমার এত কাছে পাবো, তা ত' আমি ভাবতেও পারতুম না। সত্যি নীলা, তুমি এত কাছে

আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছ, আমার মনে হচ্ছে, এ যেন সত্য নয়, স্বপ্ন!

নীলা উঠিবার চেষ্টা করিতে, অসিত মাথাটিকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না, উঠতে পাবে না।

নীলা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

অসিত বলিল, মুখে বলবার সুযোগ কোনও দিন হয় নি—হবার সম্ভাবনাও ছিল না—দৈব আজ আমার সহায়। আজ বলতে ইচ্ছে করছে, তোমায় জানাতে ইচ্ছে করছে নীলা, আজ কতকাল, কতকাল ধরে আমার মন তোমাকেই চেয়েছে। কোনদিন কোন সাড়া পায় নি, তবু আমার মন তোমাকেই চেয়েছে। তখন তোমার বিয়ে হয় নি, তোমাদের স্কুলের পথে দেখা হোত—মনে আছে?

—আছে।

—তারপর তোমার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি আমারই এক বন্ধুর ঘর আলো করতে গেলে। তুমি অন্যের স্ত্রী, আমার কেউ নও, কোনও সম্পর্ক নেই, সবই ত' জানতুম নীলা—তবু প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি আমার মন তোমাকে কামনা করতো।

নীলা জিজ্ঞাসিল, কত বাজলো?

অসিত হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, সাড়ে ন'টা। কিন্তু, তোমার কাছে এ সব কথা ব'লে কি অন্যায় করছি, নীলা? তা যদি হয়, আর বলবো না। তুমি বিরক্ত হলে, নীলা?

নীলার স্বর পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ, মধুর, বলিল—না, বিরক্ত হই নি ত'।

নীলার বিরক্তি-সম্ভাবনায় অসিতের ভাব-ধারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে কহিল—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব, নীলা?

—কি?—স্বর বড় উদাসীনতায় ভরা।

ক্ষুব্ধ অসিত নীলার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি কোনদিন বুঝতে পারতে না, নীলা?—নীলাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল, আমার মুখ কোনও দিন সে কথা বলতে সাহস পায় নি, কিন্তু আমার চোখ কি সে কথা বলে নি তোমাকে? আমার মনের ভাষা, আমার অন্তরের কথা কি কোনদিন তুমি বুঝতে পার নি, নীলা?—নীলা তথাপি কথা বলিল না; অসিত ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—বলবে না, নীলা? বল। বলবে না? বলবে না?—নীলার কোমল করপুট দু'টি টানিয়া লইয়া তাহার হাতের মধ্যে চাপিতে চাপিতে আবার বলিল—বলবে না, নীলা? বেশ, ব'লো না।

নীলা বলিল, কি বলবো?

—আমার ভালবাসা কি কোনদিন তোমার মনকে স্পর্শ করে নি, নীলা?

নীলা বলিল, আপনি কি সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি পারি নে কেন?

—জানি নে। কিন্তু, আমার কথার উত্তর কই?

—আমি উঠে বসি,—বলিয়া নীলা উঠিয়া বসিল।

অসিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। চাঁদ মাথার আরও উপরে উঠিয়াছে, দূরে অন্ধকার-শির পর্ব্বতমালা আকাশের প্রান্ত চুম্বন করিয়া আছে, গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে। উভয়েই নীরব। কিন্তু অসিত নীরবতার মধ্যে স্বস্তি পাইতেছিল না। আজ তাহাকে প্রলাপে পাইয়া বসিয়াছে। নীলার কোলের উপর হইতে তাহার একখানি হাত টানিয়া বলিল—নীলা, চিরদিনই কি আমায় তুমি বাইরে ফেলে রাখ্‌বে? মনের কোণে একটুখানি স্থানও কি তুমি আমায় দেবে না?

নীলা সাগ্রহে কহিল, বন্ধুর স্থান ত' মনের মধ্যেই।

অসিত বলিল, শুধুই বন্ধু?

নীলা ভাবগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিল, আমার বন্ধু বলতে একমাত্র আপনিই আছেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আলাপ পরিচয় অনেকের সঙ্গেই হয়েছে, বিয়ের পরও যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু বন্ধুর আসন চিরদিন আপনার। আর সে আজ নয়, বিয়ের অনেক আগে, বন্ধুর প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসা আমি মনে মনে আপনাকেই দিয়েছি।

—কিন্তু ঐ-টুকুমাত্র? আমি যে অনেক বেশী আশা করি, নীলা।

—তার বেশী যে আমার দেবার নেই, অসিতবাবু।—বলিয়া অসিতের মুঠার মধ্য হইতে হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া রুমাল দিয়া চোখ দু'টা, অথবা মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। মুখে মাথায় ধূলাবালির কি অন্ত ছিল!

অসিতের বুকখানায় কে যেন হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আকাশ-ভুবন, নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম তাহার নয়নে ও মনে যেন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সে যে আর কোনো দিন মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে, কোনো কালে কথা বলিতে পারিবে, এমন ভরসা তাহার রহিল না।

নীলা পথের ধারের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-করুণ দৃশ্যাবলীতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ রহিল, তারপরে আর যেন পারিল না, কণ্ঠস্বরে বিশ্বের মধু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া বলিল, দেবতার কাছে মানুষ যেমন তার সব উজাড় ক'রে দেয়, আমিও যে সেই ভাবে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে ফেলেছি, আমার বলতে যে আমার আর কিছু নেই!

অসিত বলিল—কিছুই দিতে পার না, নীলা?

নীলা নতমুখে, নতআননে নম্র-মধুর অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল, কিছু কি আর আছে আমার? কতই বা বয়স তখন? কি-বা জানতুম পৃথিবীর? তখন যতটুকু পেয়েছিলুম, তাইতেই বিভোর হ'য়ে গেছলুম। মনে হয়েছিল, তার বেশী পাওয়ার আর কি থাকতে পারে? তাই ভেবে, সবই না দিয়ে ফেলেছিলুম! সারা জীবন দিয়েই গেছি, বিনিময়ে কি পেয়েছি-না-পেয়েছি, কি পাব-না-পাব, সে ভাবনা কি কোনো দিন করেছিলুম। জানি, দিতে হয়; প্রাণ-মন বলত, দিতে হয়; সংস্কার ব'লে দিত, দিতে হয়; শিক্ষা দিত, দিতে হয়—দিয়েই চলেছি। নিজেকে নিঃস্ব, রিক্ত ক'রে দিয়েই চলেছি।

অসিতের স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইতেছিল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে নীলার মুখের পানে চাহিয়াছিল। নীলা কথা শেষ করিয়া, বুকফাটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যখন চুপ করিল, অসিত এই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল যে, কেন সে মরুভূমিতে তৃষ্ণা-নিবারণ করিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছিল? এক নিমেষে নিষ্ঠাবতী এই নারীর নিষ্ঠার তলে সে যে তৃণাদপি তুচ্ছ হইয়া গেল, ইহা মনে করিয়া তাহার কাছে সমস্তই বিস্বাদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অসিত নিজের মনে বলিল, আর না! যা হইবার হইয়াছে, তপস্বিনীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হঠাৎ নানারকম শব্দ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাওয়া ছাড়িয়া মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেল। অসিত ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইল না। চালক নামিয়া, বনেট খুলিয়া, নানাভাবে ইঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিল, সম্ভবতঃ পেট্রোল আসিতেছে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অনেক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী চালান গেল না। নীলা কোলের উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অসিত নিজে নামিতে পারিতেছে না। এমন বিড়ম্বনায় আর কেহ কোনো দিন পড়িয়াছে কি? যাহার ভালবাসাই তাহার কাম্য, সে ভালবাসে না জানিয়াও, তাহার সুষুপ্ত দেহখানির উপরে এত মায়া, এত মমতা, এত যত্ন, এত স্নেহও যে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিতে পারে, এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

নীলা হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, গয়া এসে গেছি বুঝি?

—না। গয়া এখনও প্রায় বাইশ মাইল দূর। রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে।

নীলা সভয়ে বলিল, উপায়?

অসিত কহিল, নিরুপায়! মনে হচ্ছে সকাল পর্য্যন্ত এই তেপান্তরের মাঠেই পড়ে থাকতে হবে।

নীলা সভয়কণ্ঠে কহিল, সে-কি ! এই মাঠের মধ্যে ? একলা একলা ? এই অন্ধকারে !—তখন চন্দ্র ডুবিয়া গিয়াছে, আকাশে যেন মেঘও জমিয়াছে।

—একলা কৈ ? চার চারটে প্রাণী রয়েছি, ভয় কি, নীলা ?

নীলা কোন কথা না বলিয়া মুখটি বিষণ্ণ করিয়া রহিল ; অসিত ম্লানকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমার আর কোন ভয় নেই, নীলা। সে অভয় তোমাকে আমি দিয়ে রাখছি।

নীলা হাসিয়া বলিল, আপনাকে ভয় ? বন্ধুকে ভয় ? আপনি বুঝি ভাবেন, ইংরিজি 'ফ্রেণ্ড' শব্দটার বাঙ্গলা তর্জ্জমা ক'রে 'বন্ধু' বলি আপনাকে ? তা কিন্তু নয় ; শ্মশানে, মশানে, রাজদ্বারে, সম্পদে, বিপদে যাকে বিশ্বাস করা যায়, সে-ই বন্ধু। আপনি আমার সেই বন্ধু।

অসিত আবার সংযম হারাইতে বসিল ; আবার নীলার একখানা হাত টানিয়া লইয়া, হাতের মধ্যে চাপিতে চাপিতে বলিল, ঐ-কি শেষ কথা, নীলা ? যা বলেছো, তার পরে আর কিছুই কি তুমি বলবে না ? একটি শব্দ, একটি কথা, তা কি বলবে না ?

নীলা কথা কহিল না। অসিত হৃদয়হীন নয়। যে ভালবাসিতে জানে, ভালবাসিতে পারে, সে কখনই হৃদয়হীন হয় না। নীলার অন্তরের দ্বন্দ্বের সুর যেন তাহার অন্তরেও ধ্বনিত হইতেছিল, তাই সে বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলিল, সে-কি একান্তই অসাধ্য, নীলা ?

নীলা কথা বলিল না, অন্ধকারেও দেখা গেল, মাথাটি নীচু করিয়া নীলা ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে শুধু জানাইল, অসম্ভব। নীলার শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস অসিতের হাতের উপরে ঝরিয়া পড়িল।

ড্রাইভার জানাইল, গাড়ীর ব্যাধি গুরুতর, রাত্রে সারাইবার সম্ভাবনা নাই। অসিত কাছে কোনো গ্রাম-ট্রাম আছে কি-না সন্ধান করিবার জন্য দারবান ও ড্রাইভারকে পাঠাইয়া দিল। নীলা নির্ব্বিকারচিত্তে অন্ধকার দেখিতেছে, অসিত বলিতে লাগিল, ফার্ষ্ট ইয়ারে পড় তখন, একদিন চৌরঙ্গীর মোড়ে কলেজের গাড়ী ভেঙ্গে গেছল, মনে আছে, নীলা ?

—তা আবার নেই ! আপনি সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাদের তিনজনকে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুলতা, নন্দিনী, আমি।

—তোমায় সকলের শেষে পৌঁছে দিই, না ?

নীলা উদাসীনের মত বলিল, তা হবে !

হতাশাক্ষুব্ধস্বরে অসিত বলিল, 'তা হবে !' তার মানে,— মনে নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, যে ক'টি কথা তুমি বলেছ, আমি মুখস্থ বলতে পারি। বোটানিক্সে তোমরা কলেজের মেয়েরা পিক্‌নিক্ করছিলে, সেই রাস্তাটায় কতবার আমার মোটর পাক্ খেয়েছিল, তা আমি আজও বলতে পারি, নীলা ! শেষকালে তুমি অকস্মাৎ চেয়ে দেখলে, আমি গাড়ী থামিয়ে নেমে প'ড়ে, তোমাদের তুলে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইলুম। তুমি আর একটি মেয়ে উঠ্‌লে।

—হ্যাঁ, সে মীনু।

—সেদিন কি বলেছিলে, বলব ? বলেছিলে, আপনার সঙ্গে বেড়াতে বড় ভাল লাগে।

—সে-কথা আজও বলতে পারি, সেটা সত্যি কথা। বিয়ের পরে হয় নি বটে, কিন্তু আগে ! কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, কত ছলে, কতদিন ত' বেড়িয়ে নিয়েছি।—হঠাৎ গম্ভীর হইয়া নীলা একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যে যা চায়, সে বোধ হয় তা পায় না। দেখুন না, আমার বোহিমিয়ান লাইফ ভাল লাগে, তাই আমি চাই, আমার অদৃষ্টে জুটল ঠিক তার উল্টো।

অসিত বলিতে লাগিল, আমি এককালে কবিতা লিখতুম, লোকে বলে, ভাল লিখতুম ···

—আমিও বলি। আপনার অনেক কবিতা আমি মুখস্থ বলতে পারি। একটা শুনবেন ?

অসিত সাগ্রহে কহিল, বল শুনি।

"নারী কহে, 'নর, তুমি বড়ই সুন্দর।'
" 'তুমিই সুন্দরী নারী' কহিতেছে নর।
" 'কেহই সুন্দর নহে' কহে প্রেম ধীরে,
" 'আমি যদি বাসা নাহি বাঁধি বক্ষঃনীড়ে।' "

অসিত বলিল, ও-কথা তুমি বিশ্বাস কর?

—কোন্ কথা?—স্বরে আগ্রহের একান্ত অভাব। সে-যে প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইতে চায়, তাহা বুঝিয়া অসিত বলিল, থাক্।

নীলাও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। আবার উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ-চাপ। অসিত বলিল, তোমার কত কষ্ট হচ্ছে, নীলা, না হ'ল খাওয়া, না পেলে একটু বিশ্রাম করতে! খাওয়া যা জুটবে সে ত' জানাই আছে, একটু ঘুমোবে?

—না, বলিয়া সে একসঙ্গে গোটা কত হাই তুলিল। অসিত বলিল, আমি ড্রাইভারের সীটে বসি গে, তুমি পা হু'টো ছড়িয়ে একটু শুয়ে পড়। বলিয়াই অসিত দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নীলা বলিল, আপনিও একটু শুন্ না।

—সে কি হয়? এই অজানা জায়গা, অন্ধকার রাত্রি, হু'জনে ঘুমোন ঠিক হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে ব'সে থাকি!

নীলা হাসিয়া বলিল, দেখবেন, পাগল হয়ে যাবেন না যেন! বিজ্ঞেরা বলেন, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে মানুষ চন্দ্রাহত বা পাগল হয়। আমার মুখ যেমনই হোক্, নারীর মুখের তুলনাই হচ্ছে চন্দ্র, কবি লোককে তা ত' আর বলতে হবে না। সেই জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি।—বলিয়া সে শুইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ অধরে দাহ অনুভব করিয়া নীলা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া চারদিকে চাহিতে লাগিল। অসিত পা-দানে বসিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। নীলা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, যা বলেছি ঠিক তাই হ'ল ত'? Moon struck?

অসিত নীলার কোলের উপরে মাথা গুঁজিয়া বলিতে লাগিল, জানি না, জানি না, জানি না। শুধু জানি, তোমাকে আমার চাই-ই চাই।

অসিতের চোখের পানে চাহিয়া নীলা মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও মুখে মৃদু হাসি আনিয়া বলিল, আপনি উঠে বসুন।—বলিয়া সে নিজে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া আবার বলিল, পায়ের কাছে বসতে নেই, উঠে আসুন।—নীলা অসিতের মাথাটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ছিঃ, উঠুন।

অসিত উঠিয়া বসিল। কিয়দ্দূর হইতে কতকগুলি লোকের কথা শুনা যাইতেছিল। নীলা বলিল, বোধ হয় ওরা ফিরছে।

অসিত কোনো কথা বলিল না।

নীলা জিজ্ঞাসা করিল, কত বাজল?

—হু'টো।

—মোটে?—তাহার স্বর অসীম নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

অসিত বলিল, তোমার বড় কষ্ট হল, না নীলা?

—না, কষ্ট আর এমন কি!

—তুমি আর একটু ঘুমুবে?

—ঘুম হয় কৈ?

—কেন, এতক্ষণ ত' হচ্ছিল।

—আমি বুঝি ঘুমিয়েছি? আমি ত' চুপ ক'রে মটকা মেরে পড়েছিলুম।—বলিয়া হাসিতে লাগিল। অসিত কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। ড্রাইভার, দ্বারবান গ্রামের দুইজন লোকের মাথায় মুড়ি, মুড়কী, লাড্ডু, জলের কলস প্রভৃতি চাপাইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাদ্যে রুচি কাহারও ছিল না, দুই-এক গ্লাস করিয়া জল খাইয়াই ইহারা নৈশ-ভোজন সমাধা করিয়া লইল। মাইল-খানেক দূরে পুলিশের দফাদারের কোঠাবাড়ীতে সাহেব ও মেমসাহেবের জন্য শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে জানা গেলেও আর নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা বা আগ্রহ তাহাদের হইল না। দুই ঘণ্টা রাত্রি বাকী আছে, এইখানেই কাটাইয়া দিতে পারা যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত

তাহাই নির্দ্ধারিত হইল। দ্বারবান ও ড্রাইভার দূরবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে মুরাঠা (পাগড়ী) মাথায় দিয়া শুইতে গেল।

নীলা অসিতকে বলিল, এইবার আপনি একটু শুয়ে পড়ুন।

অসিত বলিল, না।

নীলা বলিল, শরীর খারাপ হবে যে।

—হোক্। শরীর ত' কারণে অকারণে সকলেরই খারাপ হয়, না-হয় আমারও হবে। আজকের রাত্রি আমি শুয়ে নষ্ট করতে পারব না।

—তবে গল্প বলুন।

—তুমি বল, আমি শুনি।

—আমি! আমি কি বলব? কি-ই বা জানি, বলুন।

আমি বেতাল পঞ্চবিংশতিও শুনতে চাই নি, হোমারের ইলিয়াড শোনার ইচ্ছেও আমার নেই, তোমার নিজের গল্প বল।

নীলা হাসিয়া বলিল, আমার নিজের গল্প?

—হাঁা। বিয়ের পরের গল্প। বল!

নীলা বলিল, বিয়ের পরের গল্প। ক'বছর কলকাতায় ছিলুম, সে ত' আপনি জানেন। তারপর লক্ষ্ণৌ এলুম। সেইখানেই থাকি, ঘর-সংসার করি। খিদে পেলে খাই, ঘুম পেলে ঘুমুই। কথা কইবার লোক পেলে কথা কই, না-পেলেও, নিজের মনেই বক্-বক্ করি। তারপর, দাদার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা যাচ্ছিলুম—সে ত' দেখলেনই। আর ত' কিছু নেই, বলবার। তার চেয়ে আপনি বলুন, আপনার গিন্নীর কথা, ঘর-সংসারের কথা।—বলুন। আচ্ছা, আপনি আপনার স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন? তিনি যা চান্, তাই দেন, যেখানে যেতে চান্, নিয়ে যান্, না?

অসিত আস্তে আস্তে বলিল, হ্যাঁ।

নীলা জিজ্ঞাসিল, আর তিনি?

—তাঁর কথা তিনি জানেন, আমি জানি নে।

নীলা হাসিয়া বলিল, বুঝতে পারেন না বুঝি?

অসিত বলিল, চেষ্টা করি নি। বোঝবার সময় পাই নি।

নীলা সহাস্যে বলিল, দশ বছরের মধ্যে সময় পেলেন না?

—সময় চাই নি, তাই পাই নি। সময় চাইবারও সময় আমার ছিল না, নীলা। আমি এই দীর্ঘ সময় আর একজনের সুন্দর মুখখানি, স্বপ্নমাখা চোখ দু'টি, তুলিতে আঁকা ভ্রূ দু'খানি, মধুঢালা হাসিটি, পদ্মের পাতার মত পা দু'খানি ভেবেই কাটিয়েছি; আর ভেবেছি, আমার অগাধ ভালবাসার খবর সে জানে, জানে, বোঝে। কে সে লোক, জান, নীলা?

নীলা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ঘাড় নাড়িয়া মৃদু শব্দ করিল, উঁহু।

—সে তুমি। তুমি, তুমি, তুমি! নীলা, তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার ভালবাসা।

নীলা আকাশের পানে চাহিয়া, সচকিতে বলিয়া উঠিল, আজকের রাত কি আর শেষ হবে না?

অসিত অন্ধকারেও একবার অন্তরভেদী দৃষ্টি ফেলিয়া নীলাকে দেখিতে চেষ্টা করিল, তারপর মাথাটা নীচু করিয়া অতি ধীর সংযতকণ্ঠে কহিল, এই রাত্রি বিফলে যাবে, নীলা?

নীলা বলিল, কি করবো?

—একটি কথা বল, একটি কথা। এই রাত্রি মধুময়ী হবে নীলা, অন্ধকারে ঢাকা আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, একটি কথা, একটিবার, বল নীলা। বলবে না?

নীলা কথা কহিল না।

অসিত বলিতে লাগিল, যদি কখনও একবিন্দু ভালবেসে থাক, নীলা, একবিন্দু করুণা তোমার মনে থাকে, একটিবার বল।

—কি বলবো?

অসিত কাকুতিভরা কণ্ঠে কহিল, একটিবার বল, ভালবাসি। একটিবার, শুধু একটিবার।

নীলা বলিল, আমি ত' বলেছি আপনাকে, আমার দেবার কিছুই নেই। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কিছুই নেই।

অসিত বলিল, তবে কি আমার এতকালের ধারণা সবই ভুল? কোনদিন কি একটুও ভালবাস নি? আই-এ পাস্ ক'রে তুমি বন্ধু-বান্ধবদের নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছিলে, মনে আছে?

অতীতকালের স্মৃতি কতই মধুর! বিগত দিনের কথায় নীলার অন্তরদেশ সহসা মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল; বলিল, আছে বৈ কি! আমার কলেজের মেয়েরা আর আপনি!

অসিত বলিল, একখানি নীল রঙের সিল্কের রুমাল উপহার দিয়েছিলে, মনে আছে?

—আছে।

সে রুমাল আমার আজও আছে। তার কোণের 'ন' অক্ষরটি আজও স্পষ্ট আছে। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সেই রুমালখানির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু তাকে নষ্ট করতে পারে নি।

নীলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অসিত হঠাৎ নিজেকে সম্বৃত করিয়া কহিল, হয়ত আমারই ভুল। মিষ্ট ব্যবহার, স্নিগ্ধ হাস্য, সযত্ন আতিথেয়তা, কিন্তু সে সবও কি ভুল? সে সবও কি মিথ্যা?

নীলা সতেজে বলিল, না-না, সে কেন মিথ্যা হবে? নারী-জন্ম নিয়েই যখন জন্মেছি, মিষ্ট ব্যবহার ছাড়া নারীর আর কি আছে? হাসি? ও আমার রোগ। না হেসে আমি পারি নে। আতিথেয়তা? বাঙ্গালা দেশের কোন্ মেয়ে না অতিথিকে যত্ন করে, বলুন তো?

অসিত আপনার মনে বলিতে লাগিল, তাই কি! এ সবের মধ্যে হৃদয় ছিল না? কি জানি!

নীলা কথাগুলা শুনিয়াছিল, দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল, হৃদয় আপনারা কাকে বলেন জানি নে; হৃদয় কি শ্রদ্ধা করে না? হৃদয় কি ভক্তি করে না? হৃদয় কি যত্ন করতে চায় না? আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, বুঝি না। কিন্তু এটুকু বুঝি, নারী যাকে একবার শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে, কোনদিন তাকে অশ্রদ্ধা বা অভক্তি করতে পারে না। কিছুতেই না। ভালবাসার কথা আলাদা। ভাল, নারী একজনকে, আর একটিবারই, বাসতে পারে। ফিরে পাক্-না-পাক্, প্রতিদানের আশা থাক্-না-থাক্, একবারই, একজনকেই সে ভালবাসে।

পূর্ব্বাকাশে বর্ণ-বৈচিত্র্য-বিকাশ দেখা যাইতেছিল, অসিত সেই দিকে চাহিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল। হঠাৎ বীণাধ্বনি স্তব্ধ হইল, অসিতেরও যেন মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। নীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, নীলার শান্ত করুণ মুখের উপরে আকাশের বর্ণনাহীন বর্ণচ্ছটা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার করুণ নয়ন দু'টি আকাশ ভেদ করিয়া ঐ আলোকের উৎস দেখিতে গিয়াছে। আকাশ আরও পরিষ্কার, পৃথিবী আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অসিত বলিল, নীলা, কালরাত্রি প্রভাত হয়েছে, সুপ্রভাত বল্‌তে পারি কি?

—সুপ্রভাত ত' বটেই! বলিয়া সে যুগ্ম কর উচ্চ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, প্রভাতে বন্ধুর মুখ দর্শন, তাও যদি সুপ্রভাত না হয়, কবে হবে আর?

অসিত অপরাধীর মত বলিল, আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি?

নীলা হাসিয়া বলিল, আমি ত' রাগ করি নি যে ক্ষমা করতে হবে।

অসিত ভাবিয়া পাইল না, নারী-চরিত্রের রহস্য তাহার কাছে অজ্ঞাত থাকিয়াই গেল। এ ভালবাসে না, ভালবাসা লইতেও চায় না, অথচ তাহার নারীত্বের, সতীত্বের অবমাননাকারীর উপর ক্রোধও তাহার নাই!

প্রভাত হইবামাত্র গাড়ীও চলিল। জলের পাইপের ছিপিটি কোন্ ঝাঁকানিতে খুলিয়া গিয়া জল নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় গাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সহজেই দোষ ধরা পড়িয়া গেল।

বেলা হইলে পথের ধারে একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামাইয়া প্রাতঃরাশ খাওয়া হইল। বেহারের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পাহাড়, মাঠ, ঘাট, জল, পথ, ছাদ, মাটি, বালি সব তাতিয়া উঠিয়াছে। সারা রাত্রির অনিদ্রা, নীলা গাড়ীর ছাদের দেওয়ালে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মত বসিয়াছিল, অসিত জিজ্ঞাসিল, কি ভাবছ নীলা ?

—কৈ! কিছু ভাবি নি ত'!

—না, তুমি ভাবছ? কি ভাবছ, কাল রাত্রের কথা ?

—না, না,—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি প্রভাত বেলার সূর্য্যের রশ্মির মত উজ্জ্বল, মধুর, পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর মত স্নিগ্ধ শব্দবর্ষী।

পরমুহূর্ত্তে বলিল, দাদাকে দেখে ফিরতে ত' হবেই ক'দিন পরে, তখন কি আপনার সময় হবে আমায় লক্ষ্ণৌ পৌছে দেবার ?

অসিত তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, এর পরেও, তুমি আমার সঙ্গে একলা যেতে পারবে, নীলা ?

উচ্ছ্বসিত হাস্যে নীলা বলিল, বা রে! তা কেন পারবো না? বন্ধুর সঙ্গে যাবো, তাতে ভয়টা কিসের ?

অসিত কথা বলিল না। গাড়ী ছুটিতে লাগিল। ড্রাইভার এক সময়ে একটা মন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখাইয়া সহর্ষে কহিল, হুজুর বুধ-গয়া!

নীলা বলিল, এইবার হিসাব ক'রে দেখুন না, কখন্ কলকাতা পৌছোব ?

—দেখি।—বলিয়া অসিত টাইম-টেবল, খাতা-পেন্সিলের সন্ধান করিতে লাগিল।

নীলা বলিল, গয়া পৌছে আগে আপনি স্নান ক'রে নেবেন, বুঝলেন? মুখ-চোখ আপনার যা শুকিয়ে গেছে! সারারাত না-খাওয়া, না-শোওয়া, কম কষ্ট গেছে আপনার!

অসিত মুখ ফিরাইয়া কথাগুলা যে বলিতেছে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। সে মুখ অসীম স্নেহে, অপরিসীম আত্মীয়তার রসে সঞ্জীবিত, উদ্ভাসিত।
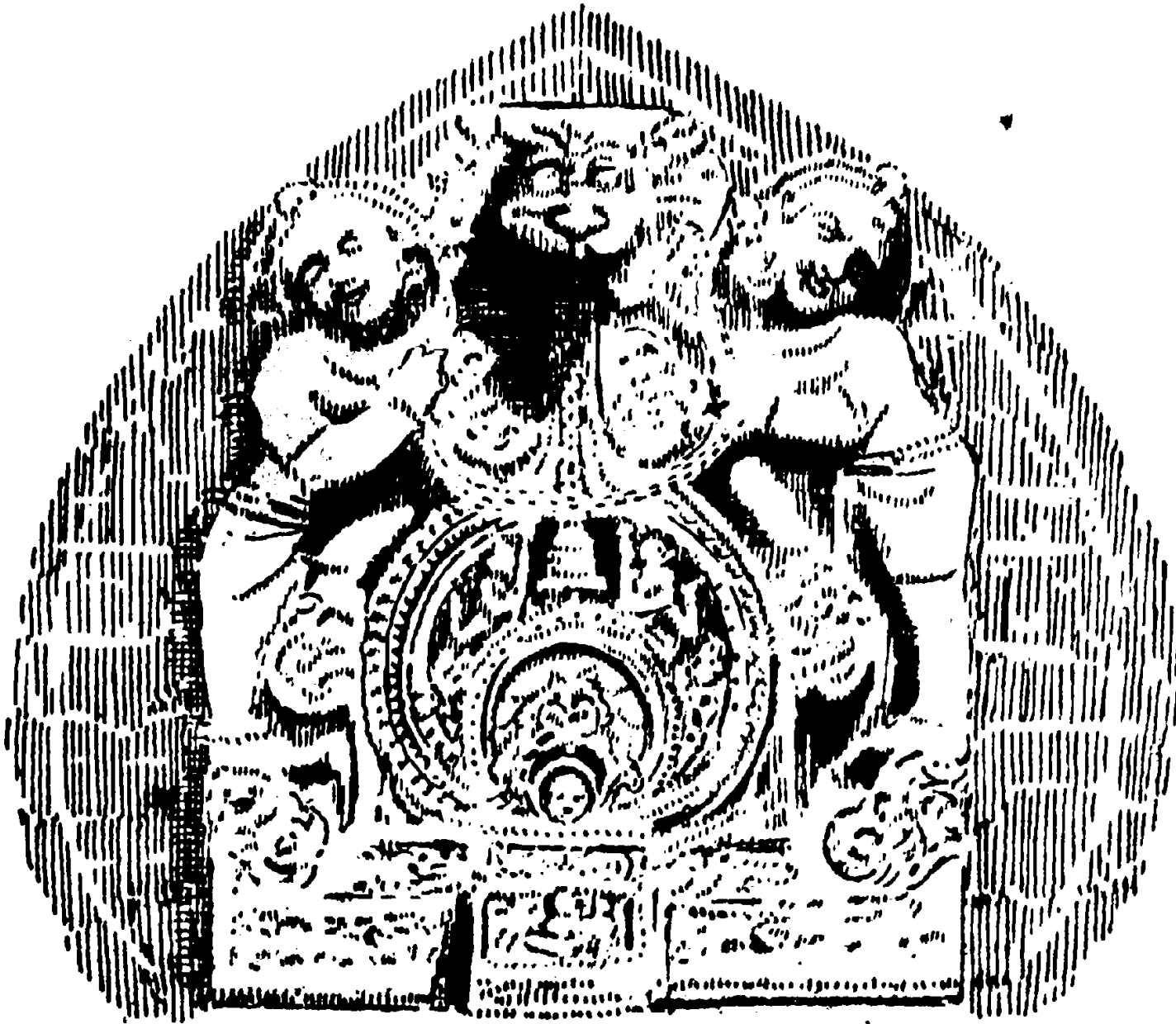
ভারতের রূপ-মূর্চ্ছিত কন্দর

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কাল্পনিক আখ্যানে যাদুকরের মায়া সুগুপ্ত গুহা-গহ্বরকে উন্মুক্ত ক'রে অগণিত ঐশ্বর্য্য দেখিয়েছে। কখনও বা কোন দুর্ভাগা তার ভিতর বন্দী হ'য়ে ঢুকে বেরিয়ে আসবার মায়ামন্ত্র ভুলে গেছে। ভূগর্ভের বিভীষিকা এমনি ক'রে মানুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন জড়িত হ'য়ে গেছে পিরামিডের অন্তরালের রচনাদি। সেই শ্রেণীর রূপ-সৃষ্টি মৃত্যুভয়ে জর্জ্জরিত মিশর নিজের ভীতি-রোমাঞ্চের চিহ্ন রেখে গেছে মাত্র—আনন্দ-স্বপ্নের নয়। আনন্দের মূর্চ্ছনা দেখতে হ'লে এ সব ক্ষেত্রে ভারতের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। ভারতের

এলিফেন্টা-গুহা — ত্রিমূর্ত্তি ও অর্দ্ধনারী

করেছে। খ্রীষ্টীয় সভ্যতাও মাটির ভিতর গুহা রচনা করেছে ভীরু অন্তরকে আক্রমণ হ'তে রক্ষা করতে। অন্তরের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নকে সুনির্ম্মিত গুহাভ্যন্তরে আনন্দের রূপ দেওয়া জগতে খুব কম সভ্যতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। মিশরীয় সভ্যতায় পরলোক-কল্পনার সহিত শিল্পী-মনের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি মর্ম্মর-রূপ ধারণ করেছে—ভারতের গুহা-স্থাপত্যে। এ শ্রেণীর রচনা জগতে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বস্তুতঃ ভারতের রচনাই এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় স্থান গ্রহণ করেছে। এলোরার কৈলাস-সম্বন্ধে কোন

ইউরোপীয় লেখক বলেন —"Kailash is probably the finest and grandest monolithic excavation in the world. No written description can adequately portray the stupendous work entailed in this temple."

Burgess সাহেবও স্বীকার করেছেন—"Kailash which is certainly the most magnificent rock-cut temple in India." বলা বাহুল্য 'India' কথাটির পরিবর্ত্তে 'World' শব্দটি প্রয়োগ করলে উক্তিটি আরও সুশোভন হ'ত।

বস্তুতঃ ইউরোপে রোমক বা গ্রীক্ মন্দির বা মধ্য-যুগের গির্জ্জাগুলি সমগ্র বা অংশের দিক্ থেকেও এ সমস্ত অস্তরাত্ম সৌধ-স্বপ্নের সাধনা ও সমাপ্তির ব্যাপক চেষ্টার সহিত তুলনীয় হ'তে পারে না। স্তম্ভের বৈচিত্র্য, মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য ও অবয়বের পারিপাট্য—সকল বিষয়েই নিভৃত কন্দরে নিহিত এ সমস্ত রূপ-স্বপ্ন অদ্বিতীয়।

পাথরের পাহাড় কেটে রূপের স্বপ্ন মূর্ত্ত করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়—মহামানবের পক্ষেই এ শ্রেণীর চেষ্টা সুফল প্রসব করতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত পশ্চিমের সমগ্র স্থাপত্য-কৌশলও এ রকমের একটা সৃষ্টিকে পাহাড় কেটে বের করতে সক্ষম হবে কি-না জানি না। আদ্যোপান্ত একটা পাথরের পাহাড়কে সুনিপুণ হাতে কেটে মোমের মত গ'ড়ে তুলতে হয়—তাতে মন্দিরের অসংখ্য অবয়ব গ'ড়ে তোলা ও মূর্ত্তির সীমাহীন ব্যঞ্জনা প্রতিফলিত করাও দরকার। এ যুগের বা কোন যুগের ভারতেতর সাধনা তা সম্ভব করতে পারে নি।

এলোরা গুহা — ইন্দ্রসভা

দু'-একটা মর্ম্মর-গর্ভ মন্দির রচনায় ভারতীয় সাধনা পর্য্যবসিত হয় নি। বিহারের লোমশঋষির গুহা, উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি, কাথিওয়ারের অনন্ত-গুহা, জুনাগড়, ধানক্, তলাজ গুহা, সুবিখ্যাত কার্‌লি গুহা, ভজের গুহা, বেদস-গুহা, জুনারের গুহা, নাসিকের গুহা প্রভৃতি অসংখ্য গুহাভ্যন্তরের কীর্ত্তি-সমূহ সকলের চিত্ত হরণ করে ও বিস্ময় জন্মায়। এ সমস্তের অলঙ্করণ, খিলান ও স্তম্ভাদি এমনি সুন্দর ও মৌলিক যে, একালে এ সব গ'ড়ে তোলার ধৈর্য্য বা সাধ্য কারও নেই। এর ভিতর সাধারণতঃ এলোরা, এলিফেন্টা, কার্‌লি ও অজান্তা জগদ্‌বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে।

সময়-বিচারের দিক্ থেকে আলোচনা করলেও বিস্মিত হ'তে হয়। রাজগীর ও বরাবরের গুহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ শতকের রচনা। জুনাগড় প্রভৃতির কাল তারই পরবর্ত্তী। বোম্বাইর পূর্ব্বাঞ্চলের ভাজ, বেদ্‌সা ও কার্‌লী গুহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। মহাকাল ও এলিফেন্টার সময়, এর কিছু পরে। বাগগুহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কাল হচ্ছে খ্রীষ্টাব্দ ৩০০। অজান্তার অনির্ব্বচনীয় সম্ভারের রচনাকাল হচ্ছে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিম্বা আরও কিছু বেশী। এলোরার সৃষ্টির সময় হচ্ছে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ শতক হ'তে খ্রীষ্টাব্দ ৮০০ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বছরের একটা অলৌকিক সৃষ্টিধারা ভারতবর্ষে চ'লে এসেছে এ সমস্তের নির্ম্মাণ-বিধিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। এমনি ক'রে সহস্র বর্ষের এ শ্রেণীর রূপমরীচিকা ভারতীয় রসবোধকে চরিতার্থ ক'রে এসেছে — এ গৌরব সামান্য নয়।

যে দেশে তপোবনের নিভৃত নিঃশব্দতা ও কোলাহলহীনতা ধ্যানের অনুকূল ব'লে বিবেচিত হ'ত— অরণ্যের নীরব অঙ্কে যে সাধনা গভীর তত্ত্বজ্ঞানকে জন্মদান করেছে — সে দেশে ধরিত্রী-বক্ষের নিভৃত অন্তরাল যে একটা মাদকতা সৃষ্টি করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শত্রুর আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য এ সব সৃষ্ট হয় নি। কাজেই কোন সুগুপ্ত বিভীষিকা হ'তে এ সমস্ত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি জন্মলাভ করে নি। পার্থিব বন্ধন ও লৌকিক আবেষ্টন হ'তে এ-সমস্ত সৃষ্টি সুদূরে রক্ষিত হয়েছে; অপার্থিব রূপ-সম্ভারেই এ-সমস্ত রচনা মণ্ডিত। এ-সমস্ত গুহায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এ-তিনটি প্রধান সাধনা নিজেদের অসীম উৎসাহ, অন্তহীন চেষ্টা ও সিদ্ধির পরিচয় রেখে গেছে।

কার্‌লীর গুহা বোম্বাই-পুনা রাজপথের দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। G. I. P. রেলওয়ের Malavli ষ্টেশন হ'চ্ছে সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী। এই চৈত্যটি কারও মতে হ'চ্ছে — "the largest and finest, as well as, the best preserved of its class"। এটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০ শতকের রচনা। কার্‌লি-গুহার অভ্যন্তর ভক্তদের নিবিড় শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। প্রথম গুহার চৈত্যটি সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও বিপুলতায় এক আশ্চর্য্য-সৃষ্টি। বাইর হ'তে আলো সঞ্চারের কায়দাও অতি মৌলিক। ছাদের শুধু একটা জায়গা দিয়ে আলো এসে সমস্ত ঘরকে প্লাবিত ক'রে দেয়—সারি সারি সুগঠিত স্তম্ভ ও ধনুকাকারে তৈরী শীর্ষভাগ, তাতে এক অপরূপ শ্রীতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে। চৈত্যটির ছাদের কাঠের পাঁজরা-গুলি অতি প্রাচীন। এতকাল পর্য্যন্ত এ-সব কি ক'রে সুরক্ষিত আছে তা বর্ত্তমানে হেঁয়ালি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনুবীক্ষণ ও রাসায়নিক যন্ত্রাদি-সাহায্যে পরীক্ষিত হয়েও এ-শ্রেণীর দুর্লভ কাঠের স্বরূপ ভালরকমে বোঝা যায় নি। প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের রাসায়নিক লিখেছেন—"I have examined the bits of wood under the microscope and have noticed that a black shining deposit fills the cavities between the grains. Moreover the wood appears to have been scorched by fire ...... The tarry matter has evidently became oxidized and therefore resists the action of solvents ... I might also mention

that wooden objects 5000 years old have also been found..." ।

ভারতের প্রাচীন যে কোন সৃষ্টির ভিতরই এমন এক-একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার পাওয়া যায় যা অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন কাঠের খবর কোন চৈত্যের অভ্যন্তরে পাওয়া একটা সামান্য ব্যাপার নয়।

বৈচিত্র্য দেখে ক্ষুব্ধ হয় না, তাদের মতে ত্রিমূর্ত্তি হচ্ছে—"a perfect specimen of art" । গৌরব, গাম্ভীর্য্য ও বিরাটত্বের এরূপ সংহত নমুনা জগতের কোথাও আছে কি-না সন্দেহ। অর্দ্ধনারী মূর্ত্তিও অতি সুগঠিত ও সুসম্পন্ন। ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব শুধু দেবী রচনায় যে শিল্পীদের উৎসাহিত করেছে তা নয়—যুগ্ম-রূপ রচনার নানা মৌলিক উপায়ও নির্দ্দেশ করেছে।
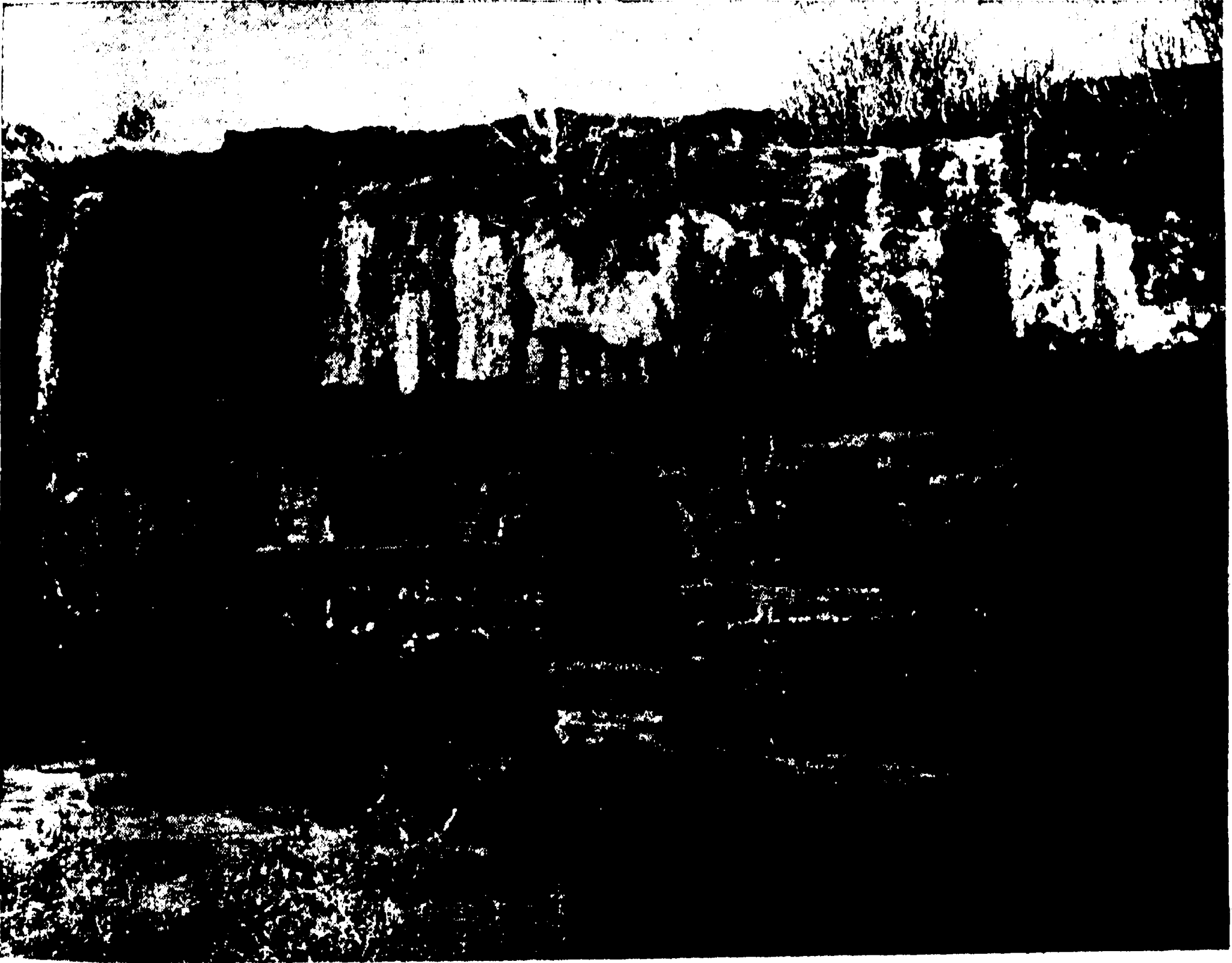
রামেশ্বরের মন্দির — এলোরা

বোম্বাই বন্দরের এলিফেণ্টা-গুহা মর্ম্মরগর্ভ মন্দিরের একটা সুপরিচিত নমুনা। ভারতবর্ষে প্রবেশের পথে অবস্থিত ব'লে এ-গুহার আলোচনা ইউরোপীয় দর্শকগণের বড়ই প্রীতিকর। এলিফেণ্টা গুহার 'ত্রিমূর্ত্তি' ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটা মুকুটমণি এবং তারই সংলগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি-সঙ্কুল সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। যারা ভারতীয় দেবতার বহু অঙ্গ-সংযোগের

শুধু অদ্বৈত মূর্ত্তি নয় বা দ্বৈত মূর্ত্তিও নয় — দ্বৈতাদ্বৈত মূর্ত্তি রচনার একটা চরম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শিল্প-লীলা এ-মূর্ত্তিটিতে হর-পার্ব্বতীর এমন এক অনির্ব্বচনীয় রস উদ্‌ঘাটিত করেছে তা জগতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বহুকাল পর্য্যন্ত স্থূলদৃষ্টি বৈদেশিকগণ এ-মূর্ত্তিকে amazon সংজ্ঞা দিয়ে তৃপ্তিলাভ করেছে ; বস্তুতঃ এরূপ

দুর্ব্ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ভারতীয় সৃষ্টিই পীড়িত। এলিফেণ্টা মন্দিরের স্তম্ভগুলি অতি নিপুণভাবে খোদিত। মন্দিরের তিনটি প্রবেশদ্বার আছে। ভিতরে ঢুকেই সেকালে ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ চমকিত হ'ত; সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হ'ত মন্দিরের অদ্ভুত দেবতা দু'টি। কারণ ইউরোপীয় ব্যবহার-বিধিতে এ-শ্রেণীর দু'টি দেবতাই জগতে অপরিজ্ঞাত এবং আশ্চর্য্য। তিনটি মস্তকযুক্ত দেবতা বা অর্দ্ধ-শরীর-যুক্ত দেবতা ইউরোপের মতে শরীর ও গণিত শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করেই রচিত হয়েছে। ওদের নিকট দু'টিই দুর্ব্বোধ্য ছিল। এ-যুগেও বহুশীর্ষ দেব-দেবীকে ইউরোপ অনুকূল চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু সমস্ত মন্দিরটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রকাণ্ড স্তম্ভগুলির বিচিত্র শ্রেণী প্রভৃতি সকলের চোখেই নিদাঘ রজনীর স্বপ্নের মতই মনে হ'ত। সন্ধ্যার পরে অনেকেই মশাল হাতে নিয়ে এ-গুহাটিতে উপস্থিত হ'ত—তাতে রক্তিম আলো প'ড়ে ত্রিমূর্ত্তির চারিদিকে একটা বিপুল মরীচিকার সৃষ্টি হ'ত। সুসভ্য বর্ত্তমান যুগে বোম্বাই বন্দরের অনতিদূরে এই মর্ম্মর-গর্ভ দেবমন্দির, গন্ধ-প্রাণ সমগ্র পাশ্চাত্য সৌধ-বিদ্যাকে পরিহাস ক'রে দণ্ডায়মান। রহস্য, স্বপ্ন ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত দেব-পরম্পরা কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এলিফেণ্টা-গুহা ভারতের প্রান্ত হ'তেই সংগ্রাম ঘোষণা করেছে যান্ত্রিক সভ্যতার ইতর-বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে। ফেরো-কন্‌ক্রিটের লঘু বাহবা ও লৌহপঞ্জরের অলীক আশ্রয় অন্তঃসারহীন এ-যুগের নগরকে এলিফেণ্টার অদূরেই রচনা করেছে। সব যখন মুছে যাবে, বোম্বাইর রথচক্রঘর্ঘর-কোলাহল যখন ধূলি-লুণ্ঠিত হবে তখনও এলিফেণ্টা হ'তে রূপলোকের বাণী ধ্বনিত হ'বে অস্তমিত আধুনিকতার শ্মশানের উপর। ভারতবর্ষ নেপথ্যে তাই সযত্নে রক্ষা করেছে কয়েকটা দীপশিখা নিজের মর্ম্ম-কন্দরে—সকল যুগের ও দেশের মূর্চ্ছিত সৌন্দর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে।

মর্ম্মর-মুখর এলোরা জগতের একটা বিস্ময়ের বস্তু। সমগ্রভাবে এই সমস্ত মর্ম্মর-কন্দরে কৃতিত্ব উদ্‌ঘাটন করা এ সামান্য পরিসরে সম্ভব নয়। অসাধারণ মনীষা, কালজয়ী নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অভগ্ন ধৈর্য্য—এই সাধন চতুষ্টয়ের সঙ্গমে শৈলগর্ভে এই ঐন্দ্রজালিকসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে কৈলাস মন্দিরকে ইউরোপীয়েরা জগতের "the finest and grandest monolithic excavation" ব'লে থাকে। এ-প্রশংসা সামান্য নয়। কোন ইউরোপীয় ভাবুক বলেন—

"All commentary grows pale before the magnificent ruins of the temples of Elura, which more than any other ruins confuse the human imagination. At the sight of these astounding edifices ..the development of the plastic arts and of public religious luxury amongst the Hindus, receives the most striking attestation in the magnificence of these temples in the infinite diversity of their details and the minute variety of the carvings."

মানবের কল্পনাশক্তিকেও বিমূঢ় করতে পারে এমন সৃষ্টির মূলে আছে এক অলৌকিক প্রেরণা, যা ভারতীয় সাধনাকে সার্থক ক'রে তোলে। এই শ্রেণীর সৃষ্টির ভিতর শুধু অজান্তাই একটা সমুচ্চ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু অজান্তাতে আছে শুধু বৌদ্ধ নিদর্শন—এলোরায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন—ভারতীয় সভ্যতার স্বচ্ছ স্ফটিকের এই তিনটি ফলকই উন্মুক্ত। হাজার বছরের ঐতিহাসিক সৃষ্টি যখন অজান্তায় পরিসমাপ্ত হয়, প্রায় সে সময়ই এলোরার মন্দির-সৃষ্টির ঝঙ্কার উঠে। এ-আন্দোলনে ভারতীয় চিত্তের সকল দিকে সাড়া পড়ে। হিন্দু-দেব-দেবীর বিচিত্র রূপলীলা, বৌদ্ধ-সাধনার মূর্ত্ত পরিণাম, জৈন-ধর্ম্মের মহত্তম আদর্শ মর্ম্মরিত হয়ে উঠল এলোরার রূপ-সাধনায়। এলোরা এল ভারতের আকাশে রূপসী অপ্সরীর মত—হাতে নিয়ে অলৌকিক রূপার্ঘ্য—ত্রিশ কোটি ভারতবাসী তা গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়ে গেল।

অজান্তা, বরভুধর, সাঁচি, ভারহুট ও নেপালে

বহুশীর্ষ নাগের যে প্রভা-তোরণ দেখতে পাওয়া যায়, এলোরার বৌদ্ধ-রচনায় তা নেই। অপরদিকে তন্ত্রোক্ত শক্তিদেবীদের এক নূতন প্রেরণা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। তান্ত্রিক যোগাচার্য্যদের প্রাধান্য এককালে ভারতে কিরূপ বলিষ্ঠভাবে বর্ত্তমান ছিল এলোরার ভাস্কর্য্য হ'তে তা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইদানীং শুধু নেপালেই এ-শ্রেণীর রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বলা প্রয়োজন হীনযানের বিশুদ্ধ তত্ত্ব উত্তর ভারতে ক্রমশঃ মহাযানবাদের সমন্বয়ী (Synthetic) আবর্ত্তে প'ড়ে লুপ্ত হয়ে যায়; তাতে ক'রে অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কল্পনা হয়। নব্য তন্ত্রবাদের প্ররোচনায় সৃষ্টি হয় অসংখ্য দেবদেবী; বোধিসত্ত্ব-কল্পনায় সে-সব
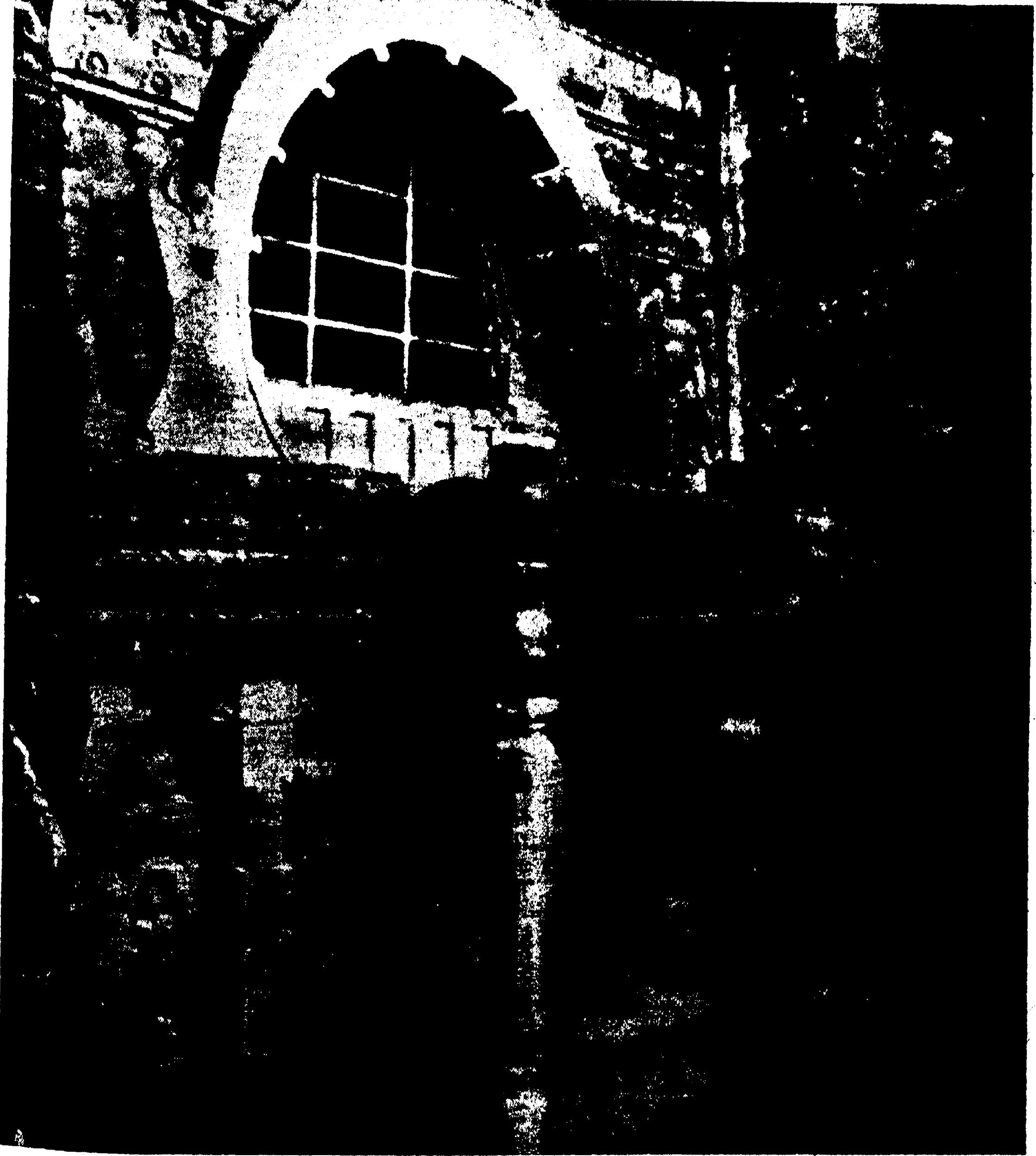
অজান্তা গুহা—ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শ্রী

দেবী অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। এরূপে রূপসৃষ্টির চক্রবাল ক্রমশঃই বিরাট হয়ে উঠে। ভারতবর্ষে এলোরাতেই এই ভাবচক্র অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যায়। এলোরা এ-তিনটি ধর্ম্মসাধনের সহায়ক হওয়াতে এখানে একটা বিশিষ্ট রূপচক্র-সৃষ্টির উত্তম ফলপ্রসূ হয়েছিল। ক্রমশঃ হিন্দু দেব-সংগ্রহের প্রাচুর্য্য, বৌদ্ধ দেব-জগতের বৈচিত্র্য ও জৈন তীর্থঙ্করদের দেশকালজয়ী রূপ-সম্পদ এলোরার মর্ম্মর-চিত্রশালায় ভারতীয় সভ্যতার প্রতিভূ রূপে ফলিত হয়ে উঠেছে।

এলোরা নিজামরাজ্যে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম —আরঙ্গাবাদ হ'তে চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত। এক সময় জায়গাটি তীর্থস্থান ছিল। এলোরা-গুহাগুলি এই গ্রাম হ'তে আধমাইল দূরে উত্তর হ'তে দক্ষিণে বিস্তৃত। গুহাগুলি প্রায় এক মাইলের অধিক দীর্ঘ জায়গাকে বেষ্টন করে আছে। উত্তরদিকের গুহাগুলি জৈনদের, দক্ষিণদিকের বৌদ্ধদের—এ-দু'টির মাঝখানে হিন্দু-গুহাগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে। বৌদ্ধগুহার সময় হচ্ছে খ্রীঃ ৪৫০ হতে খ্রীঃ ৭০০ পর্য্যন্ত। এর ভিতর বারোটি পৃথক অংশ আছে—তাদের নানা নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ-গুহাগুলির ভিতর বিশ্বকর্ম্মা গুহা, হিন্দু-গুহার মাঝে কৈলাস এবং জৈন-গুহার ভিতর ইন্দ্রসভার কিছু আলোচনা করলেই এলোরার অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত করা হবে।

বৌদ্ধ-সৃষ্টির ভিতর বিশ্বকর্ম্মাগুহাকে শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। ইহার ভিতরকার চৈত্যটির আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮৫ ফিট এবং ব্যাপ্তিতে প্রায় ৪৫ ফিট। অবলোকিতেশ্বরের একটি সুবৃহৎ মূর্ত্তির দু'দিকে আছে দু'টি সুগঠিত অপরূপ মূর্ত্তি।

হিন্দু গুহাগুলির ভিতর কৈলাস মন্দিরই সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। Burgess সাহেবের মতে—"It is by far the most extensive and elaborate rock-temple in India." মন্দিরের পশ্চাতে যে বারান্দা আছে তা প্রায় ১২০ ফিট দীর্ঘ; দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বাংশ ১১৪ ফিট দীর্ঘ—তাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে—যেমন দুর্গা, বিষ্ণু, বরাহ, ত্রিবিক্রম, নরসিংহ, শিব, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি। পূর্ব্ব দিকের বারান্দা ১৮৯ ফিট দীর্ঘ—তাতে শিবের নানা মূর্ত্তি আছে যেমন নটরাজ শিব, শিবধূর্জ্জটি, ভৈরব, বিষ্ণু, শিব-পার্ব্বতী প্রভৃতি—উত্তর দিকের বারান্দায় শিবের বহু মূর্ত্তি এ মন্দিরের কৈলাস নাম সার্থক করেছে। কৈলাস মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে জমাট পাথর কেটে রচনা করা হয়েছে। প্রাঙ্গণটি ২৭৬ ফিট দীর্ঘ ১৫৪ ফিট বিস্তৃত। কৈলাস মন্দির রচনায় শতাধিক বর্ষের প্রয়োজন হয়েছে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে মিউজিয়ামে মূর্ত্তি বা মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রাখবার ব্যবস্থা ছিল না—বস্তুতঃ এ রকম এক একটি মন্দিরই বিরাট চিত্র ও মূর্ত্তিশালা স্থানীয় হ'য়ে থাকত। হাজার হাজার দর্শক সমবেত হ'য়ে সৌন্দর্য্যের এই নন্দনরাজ্যে রসাস্বাদে চরিতার্থ হ'ত। অধ্যাত্ম-সাধনের শ্রেষ্ঠস্থানের সহিত সঙ্গম হ'ত সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার চরম ক্ষেত্র।

এলোরার জৈন-গুহার ভিতর ইন্দ্রসভার নাম সুপরিচিত। ইন্দ্রসভার বামভাগে খচিত হাতীগুলি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অতি চমৎকার নিদর্শন। কালের নিষ্ঠুর আক্রমণে গলিত ও ভগ্ন হলেও এখনও গুহাটির অপরূপ শ্রী চিত্তহরণ করে। প্রায় এক মাইল ব্যাপী এই বিস্তীর্ণ গুহাশ্রেণী ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সংহত রূপেতিহাস রেখে গেছে, যা নিঃশব্দে অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম ক'রে দর্শকগণ মনে করে—বাস্তবিকই একটা বিরাট তীর্থসঙ্গম হ'ল। আধুনিক কালে সমগ্র পৃথিবীর দর্শকগণ এসে ভারতের প্রাচীন সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস মন্দিরের বিরাট খোদিত মর্ম্মর-রচনায় পেলব কিংখাবের শ্রী আছে। অসাধারণ ভাস্কর্য্য পরিচয়ে কারও মনে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না যে, একাজ যারা করেছে তাদের ইচ্ছাশক্তি অটুট ও অটল ছিল এবং তারা সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও কালজয়ী সৌন্দর্য্যালোকের বার্ত্তা উদ্‌ঘাটিত করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। যে গুহা শুধু সাধকের একাকিত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে—সে গুহার

ভিতর জনতার বিরাট স্রোত সঞ্চারিত ক'রে সার্থক ও পূত করা হয়েছে ভাগবতী করুণার নিকট বহুমুখী মানবচিত্তের নিবেদন। পাষাণীও অহল্যারূপ ধারণ হয়েছিল তাতে ক'রে শতবর্ষের সাধনা মুহূর্তে সফল হ'য়ে জন্মদান করেছিল এই পাষাণী সুন্দরীকে— রুক্ষ স্তূপের আস্তরণ ভেদ ক'রে অলঙ্করণে শিঞ্জিত
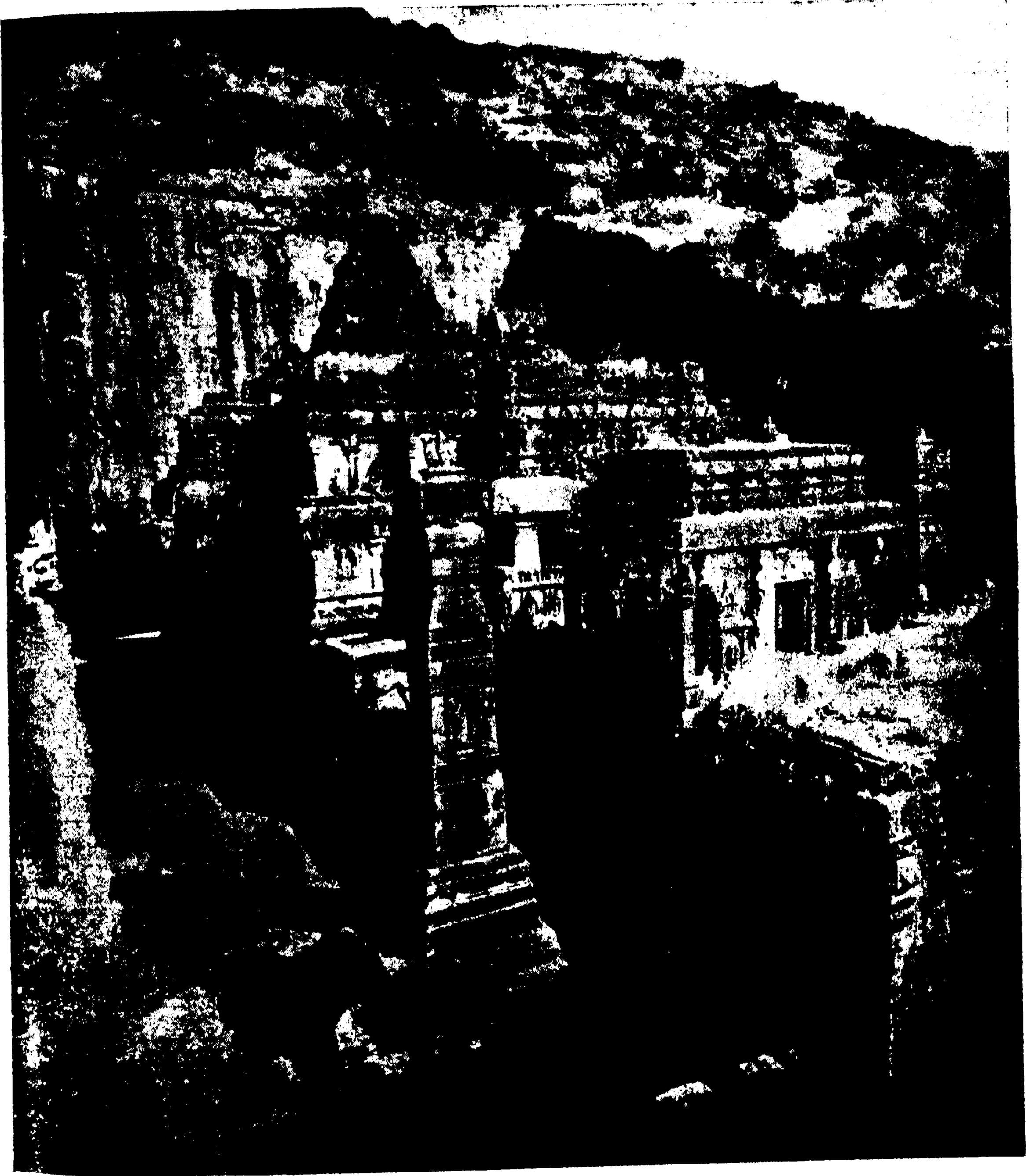
কৈলাস মন্দির — এলোরা

করেছিল ভগবানের পাদস্পর্শে। এলোরার ক্রোড়েও কোন মাহেন্দ্রক্ষণে নিঃশব্দে সে পাদস্পর্শের সঞ্চার দেহলতা ও কিরীট-কেয়ূরে মূর্চ্ছিত তারুণ্যের লোকজয়ী লালিত্য নিয়ে। ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসের

ক্রোড়ে এমনিভাবে নব নব সৌন্দর্য্য-সঙ্গমে চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। "যোগঃ ভোগায়তে মোক্ষায়তে চ সংসারঃ"—কুলার্ণব-তন্ত্রের এ উক্তি সার্থক হয়ে উঠে সৌন্দর্য্যের এই অপরূপ রূপ-তীর্থে। শুধু যোগীমাত্র নয় ভোগীও একান্ত সন্তর্পণে দেবলীলার অশ্রান্ত মর্ম্মর অভিনয় দেখে তৃপ্ত হয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যও এ শ্রেণীর মর্ম্মরগর্ভ সৃষ্টি হ'তে বঞ্চিত হয় নি। বাঘ-গুহা ইতিমধ্যেই সুদর্শন চিত্রাবলির জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। অজান্তা, বাঘ, শ্রীগৃহ প্রভৃতি জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-কলার নমুনা পর্য্যাপ্তভাবে পাওয়া গেছে। গোয়ালিয়র রাজ্য বহু ব্যয়ে বাঘ-গুহার চিত্রাবলি প্রকাশ ক'রে ভারতীয় সৌন্দর্য্য-রস-পিপাসুদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছে। গুহাটি Malwa হ'তে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে; বাঘ নদীর উপর শুধু এই পাহাড়টিই দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতায় পাহাড়টি ১৫০ ফিট—মোটরযানের সাহায্যে খুব কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি গোয়ালিয়র গবর্ণমেণ্ট এই গুহাটির সৌষ্ঠবের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন।

এ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উল্লেখ না করলে এ শ্রেণীর দেব ও দেবায়তনের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে। এ সমস্ত গুহা অতি প্রাচীন। অনন্ত-গুহা ভারহুতের সমসাময়িক বলে মনে হয়। হাতী-গুম্ফার সামনের উৎকীর্ণ লিপি ফার্গুসনের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ শতকের। এ প্রসঙ্গে ফার্গুসনের একটা উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি—

"The important lessons, we are taught by the peculiarities of the Hathi Gumpha, are the same that can be gathered from the examination of the caves in Bihar. It is that all the caves used by the Buddhists or held sacred by them anterior to the age of Asoka are mere natural caverns unimproved by art. With his reign the fashion of chiselling cells out of the living rock commenced and was continued with continually increasing magnificence and elaboration for nearly 1000 years after his time."

উদয়গিরির রাণী-প্রাসাদ (রাণী-কা-নুর), গণেশ-গুম্ফা ও হাতী-গুম্ফা সুপ্রসিদ্ধ। ভারতীয় শিল্পী যে চমৎকার ও স্বাভাবিক হাতী খোদাই ক'রতে পারে গণেশ-গুম্ফা তার দৃষ্টান্তস্থল। রাণী-প্রাসাদের সুদীর্ঘ মূর্ত্তিফলক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জয়বিজয়-গুহা ও স্বর্গপুর-গুহার উল্লেখ না করলে উদয়গিরির প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে।

ভারতে বহু বিচিত্র মর্ম্মর-গর্ভ মন্দির থাকলেও নানাকারণে অজান্তা যেরূপ সকলের মন হরণ করেছে এমন কোন সৃষ্টিই করতে পারে নি। অজান্তাও নিজামরাজ্যে অবস্থিত — হায়দ্রাবাদের অধিপতি এ-হিসেবে অতি ভাগ্যবান্। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির তিনিই প্রভু। অজান্তা, আরঙ্গাবাদ হ'তে ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং Bhusaval-এর ৩৫ মাইল দক্ষিণে।

প্রায় ২৫০ ফিট উঁচু অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘ মর্ম্মর-শৈলকে উৎকীর্ণ ক'রে অজান্তার স্বপ্ন-জগৎ রচিত হয়েছিল। ফরাসী রাষ্ট্রপতি Clemenceau অজান্তা দেখে অবাক্ হয়ে যান এবং অল্পকাল পূর্ব্বে নর্ত্তকী প্যাভলোভা অজান্তার রূপ-চাঞ্চল্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। গুহাগুলি প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত — চারিদিকের আবেষ্টনীর ভিতর এই বঙ্কিম মর্ম্মর-বিধান সমগ্র ভারতের ললাটে তিলক-স্থানীয় হ'য়ে আছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব সংহতিতে অজান্তার রূপ-বার্ত্তা জগতের নিকট অভূতপূর্ব্বভাবে প্রকট হয়েছে।

অজান্তা-গুহাগুলিকে নম্বর দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে—এ শ্রেণী প্রাচীনত্বের দিক্ হতে করা হয় নি। নবম ও দশম গুহাদ্বয় অতি প্রাচীন, ১০০ খ্রীষ্টাব্দ এ-দু'টির রচনাকাল—প্রথম ও দ্বিতীয় গুহা পরবর্ত্তী কালের (৬২১ খ্রীঃ—৬২৮খ্রীঃ) সৃষ্টি। এ দু'টি কালের ভিতরেই অজান্তার উনত্রিশটি গুহা রচিত।

নালন্দা প্রভৃতির ন্যায় অজান্তাও একটা শিক্ষা ও শিল্প-কেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ সেকালের অধ্যয়ন ও ধ্যান-গৌরব পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবেষ্টনের ভিতরই প্রদীপ্ত হ'ত।

অজান্তা-গুহার উনবিংশতি গুহার সম্মুখভাগ হ'তে অজান্তার মূর্তিকলা ও স্থাপত্য-প্রতিভার একটা ধারণা করা যায়। নবম ও দশম গুহার চিত্রাবলিই হ'চ্ছে প্রাচীনতম। ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যকে এতটা তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে এবং হচ্ছে যে, এ প্রসঙ্গে বিদেশী আলোচকের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলেই মনে হবে, কোন বিশিষ্ট রূপালোচক এ সমস্তের প্রতি পক্ষপাত দেখায় নি। অজান্তার নবম ও দশম গুহার প্রাচীনতম আলেখ্য সম্বন্ধেই একজন ইউরোপীয় সমজ্‌দারের উক্তি উদ্ধৃত করছি। বলা প্রয়োজন, ইউরোপের রিনেশাঁস যুগ তখনও কালের গর্ভে অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল এবং খ্রীষ্টীয় কলার প্রাথমিক যুগের উদ্ভট রচনার সবেমাত্র সূত্রপাতটুকু হয়েছিল। ইউরোপীয় রসিক বলেন —"Taken as a whole......the art, even at this early age, had reached an advanced state of development exhibiting perfected execution and draftsmanship. The oldest paintings of Ajanta represents an art of maturity not the first efforts of individuals groping in the darkness of in-experience but the finished work of a school of artists trained in a high art manifesting great and ancient tradition."

অন্ততঃ আর দু'চার শ' বছরের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিপক্ক অভিজ্ঞতা না থাকলে এ রকম চিত্রকলা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ নানাদিক হ'তে অজান্তার চিত্রাঙ্কন অপরাজেয়। চৈনিক, পারসিক ও অন্যান্য চিত্র-সম্পদ অজান্তার লীলা-তূলিকার ছন্দ-গৌরবে মলিন হয়ে যায়। শুধু দেব-দেবীর ছবি নয় সামাজিক জীবনের অসংখ্য প্রতিবিম্ব, শোভাযাত্রা, নৃত্য, দেবসেবা, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অসংখ্য রচনার দৃষ্টান্তে বিস্মিত হ'তে হয়। প্রত্যেকটি রচনার শ্রী ও শালীনতা সকলকে মুগ্ধ ক'রে দেয়।

অজান্তার রূপ-জালে বাস্তবতার ছায়াপাতও সকলকে আকর্ষণ করে। আর একটি অনুরক্ত মহিলার উক্তি (Lady Herringham) উদ্ধৃত করতে হয়। তিনি অজান্তার রূপেঙ্গিতকে চৈনিক ও জাপানী চেষ্টার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত বলে মনে করেন — "The outline is in its final state firm but modulated and realistic and not often like the calligraphic sweeping curves of the Chinese and Japanese. The drawing is on the whole like the medieval Italian drawing. The artists have a complete command of postures. Their knowledge of the types and positions, gestures and beauties of hands is amazing."

এ সব প্রশংসা সামান্য নয়। লেডি হেরিঙ্গাম ইউরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিতা, তিনি শুধু বাইরের দিক্ হ'তে বিচার ক'রে এতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ভিতরের দিক্ হ'তে অজান্তার চিত্রকলার বিচার অতি যৎসামান্যই হয়েছে। বস্তুতঃ অজান্তার চিত্রকলার রীতি অতি সুনিবদ্ধ ও সমন্বয়ী—চৈনিক চাতুর্য্য বা জাপানী লঘুতার মত কোন চেষ্টা দ্বারা এ বিরাট মহাকাব্য কোথাও আহত হয় নি। বর্ণ, রেখা ও বর্ত্তনার অসামান্য সংযোগে ভারতীয় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এক অপরূপ লাবণ্য লাভ করেছে। বস্তুতঃ আধুনিক চিত্রকরগণও যুক্তকরে অজান্তার রূপ-প্রপাত হ'তে প্রেরণা লাভ করতে উৎসাহিত হয়েছে।

এ সমস্ত মর্ম্মর-স্মৃতিতে লৌকিক রূপ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অলৌকিকেরও একটা সর্ব্বাভিভাবী ব্যঞ্জনা হয়েছিল, যা জগতের ইতিহাসে এখনও অপরাজেয় হ'য়ে আছে। অজান্তা-গুহার রূপমূর্চ্ছিত মন্দিরের এ আখ্যান বিবৃত না হ'লে ভারতীয় সংস্কৃতির ভূয়িষ্ঠদানের কথাই বলা হয় না। অজান্তার কারুণ্যে বিকশিত ভগবান্ তথাগত এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি—জগতের কোন চিত্রসৃষ্টিই রূপার্পিত এ বুদ্ধের সহিত তুলিত হ'তে পারে না। অজান্তার মা ও মেয়ের পেলব-সৌকুমার্য্য এ শ্রেণীর সকল চিত্র-চেষ্টাকে হতশ্রী ক'রে দেয়। মাতৃত্বের কমনীয়তার সহিত সঙ্গত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের

চরণতলে অযাচিত আত্মসমর্পণের মাধুর্য্য। এমনি ভাবে এই অমর গুহার রচনা একটা অনির্ব্বচনীয় মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে সকলের তৃপ্তিবিধান করেছে।

অজান্তার মুকুরহস্তে রাণীর প্রসাধন দৃশ্য, রাজকীয় শোভাযাত্রা প্রভৃতি এক একটা অসীম মানবেতিহাসের বাহন হ'য়ে একাল পর্য্যন্ত সত্যিকারের রসবিস্তার ক'রে সকলের চিত্তরঞ্জন করছে। তাই অজান্তার হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত বিশ্বের চিত্ত-বেপথু সহজেই সমতান হ'য়ে উঠে। বস্তুতঃ একটা ক্ষুদ্র গুহার পরিসরে মানব হৃদয়ের যে ব্যথা, অনুরাগ, ত্যাগ ও ভোগের দীপশিখাচয় প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে, তা কোন বিশিষ্ট স্থান ও কালের নয়—তা অগণিত জনতার অসীম জীবনযাত্রারই অঙ্গ-স্থানীয় এবং নিরবধি কালের হিল্লোলিত প্রগতিরই দ্যোতক।

অজান্তার ভাস্কর্য্য, সৌকুমার্য্য ও পারিপাট্য অনবদ্য মাধুর্য্যে মণ্ডিত। নাগরাজ ও মহিষীর সুরচিত দৃশ্যে যে দুর্লভ মুখশ্রী বিকশিত করা হয়েছে তা যে কোন মূর্ত্তি-কলার পক্ষে গৌরবস্থানীয়। অতি সহজ ও সরল অঙ্গ-ভঙ্গীকে এমনি নিপুণ কলা-কৌশলে উপস্থিত করা হয়েছে যে, অনেক সময় সত্যিকার ব্যাপার ব'লে ভুল হয়—অথচ সে সব পশ্চিমের মত model রেখে নকল করার উৎসাহ হ'তে রচিত হয় নি। অজান্তায় সাপের ফণা দিয়ে রচিত প্রভা-তোরণ সৌন্দর্য্যে রত্নখচিত প্রভা-তোরণকেও হার মানিয়ে দেয়।

এমনি ক'রে নিভৃত কন্দরে ভারতবর্ষ রেখে গেছে এক অদ্ভুত মর্ম্মরের আল্‌পনা—যার প্রতি রেখাবর্ত্তে আদিকালের ভারতের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা যেতে পারে। ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত এই সমস্ত মর্ম্মরগর্ভ-সৃষ্টি কোন ইতর দম্ভ বা বাহবার অপেক্ষা করে নি। একান্তভাবে মানুষের অন্তর-গুহায় ভাবাবেগে যে জগৎ উত্থিত হ'য়ে বার বার লীন হয়, যা সকল চক্ষুর দৃষ্টি হতে দূরে থেকে সুগুপ্তভাবে ক্রীড়া করে সে গুহারই প্রতিরূপক হয়েছে এ সমস্ত মর্ম্মর গুহা। ভারতের মর্ম্মর-বক্ষে উঠেছে এ সমস্ত ভাবের ঝড়—অন্তরের গভীরতর নীড়ে রচিত হয়েছে এ সমস্ত মর্ম্মকথা। লোকচক্ষুর অন্তরালেই ফুল ফোটে, সমুদ্রে প্লাবনবেগ উপস্থিত হয়—ভারতীয় সৃষ্টির বিচিত্র প্রেরণা ভারতীয় সভ্যতার অন্তরতম প্রকোষ্ঠেই প্রাণবান্ হয়ে উঠেছে। কাজেই এ সমস্ত মর্ম্মর মন্দির, মর্ম্মর দেবমূর্ত্তি এবং লীলায়িত বর্ণ-ব্যঞ্জনা অন্তরলোকের বার্ত্তাই বহন ক'রে এনেছে। ভারতবর্ষকে অধ্যয়ন করতে হ'লে এ সমস্ত মর্ম্মর-পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে হবে। পশ্চিমের হাতে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না।

বস্তুতঃ এ সমস্ত মর্ম্মর-রূপকে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস যা একাল পর্য্যন্ত আলেয়ার মত সকলের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে এসেছে। ভারতীয় কন্দর ভারতের অন্তর্মুখীন সভ্যতার চরম দান—এ দানকে বহির্মুখীন পশ্চিমের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে যাওয়া বৃথা—ভারতবর্ষের বিরাট সৌন্দর্য্য-সত্তার পরিক্রমার পদে পদে একথা মনে হয়।

বলা বাহুল্য, ভারতের রূপমূর্চ্ছিত-কন্দর-মন্দির দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়কের মত বার বার সমগ্র বিস্মৃতির অতল জলধিগর্ভে একটা নূতন অভিজ্ঞানের প্রতীক্ষায় আছে। সে অভিজ্ঞানে ভারতীয় তত্ত্ব ও সংস্কৃতি একটা নূতন রূপে প্রদীপ্ত হবে। ইউরোপের ক্ষণভঙ্গুর বহির্মুখীন রূপসঞ্চয় তখন ভারতীয় রূপান্বয়ী প্রতিভার সাহায্যে প্রাত্যহিক মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার পাবে। দিন দিন নূতনের সন্ধান ও প্রত্যাখ্যান—নেতি নেতি ব'লে প্রতি যুগের চিন্তাস্রোতকে বিসর্জ্জনের উৎসাহ তখন মন্দীভূত হ'য়ে আস্‌বে; এ সংস্পর্শে প্রাচীনই নবীন হয়ে উঠ্‌বে প্রতিমুহূর্ত্তে—নূতন ফ্যাসান ও হাবভাবের জন্য হা-হুতাশ করতে হবে না এবং অতীতের জন্য প্রাত্যহিক শ্মশান-সৃষ্টি করারও প্রয়োজন হবে না। সে শুভ-মুহূর্ত্তেই ভারতবর্ষের রূপলক্ষ্মী ভুবনেশ্বরীরূপে উদ্ভাসিত হবেন।

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে দুইটী নায়িকা সর্ব্বজন-পরিচিত, বাঙ্গালার যে দুইটী নায়িকার অপরূপ-চিত্র গাথায় ও গানে বাঙ্গালীর চিত্তপট অধিকার করিয়া আছে—তাহার একটী গৌরী, অন্যটী রাধা। উভয়েই রাজকন্যা, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে সুখের কোলে লালিতা, কিন্তু প্রেমের জন্য ইঁহাদের যে তপস্যা, যে ত্যাগ, যে দুঃখবরণ—সত্যই তাহা অতুলনীয়। পুরাণে, মঙ্গল-কাব্যে, গ্রাম্য-গীতি-গাথায় এই দুইটী নায়িকার মহনীয় চরিত্রের যে বর্ণন-বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন ধারার বিভিন্ন প্রবাহের যে সাবলীল ভঙ্গিমা, কালে কালে কবি-হৃদয়ের সেই কল্পনা-বিলাস, সেই মানসোল্লাসের রহস্য-বিকাশ আজিও আলোচিত হয় নাই। হয়তো ভাষায় ইহার অভিব্যক্তি হয় না, অন্ততঃ আমাদের তাহা সাধ্যাতীত। তথাপি এই যে প্রয়াস ইহা জিজ্ঞাসার সূচনা মাত্র, সিদ্ধান্ত-স্থাপনা নহে। চণ্ডীদাসকে চিনিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। রাধার কথা জানিতে হইলে গৌরীকে উপেক্ষা করা চলিবে না।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনায় পশ্চিম-বঙ্গের তথা রাঢ়ের দান উল্লেখ-যোগ্য। অতীতের রাঢ়ীয়-সাহিত্যই প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য। বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদিম-অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একদিকে চর্য্যা-পদ, অন্যদিকে শ্রীগীত-গোবিন্দ—এই দুইটী ধারায় ইহার যে সংস্কৃত রূপের পরিচয় পাই, তাহা হইতে বিশেষ কিছু অনুমান করা চলে না। চর্য্যা-পদ এবং শ্রীগীত-গোবিন্দের পরেই মঙ্গল-সাহিত্যের যুগ। এই মঙ্গল-সাহিত্যে গৌরী একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পুরাণের হরগৌরী কথাই শিবায়ন বা চণ্ডী-মঙ্গলের অন্যতম উপজীব্য।

গঙ্গাশ্লিষ্ট-সানু হিমাচলের উপকণ্ঠে সতীহারা শিব তপস্যার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। পর্ব্বতরাজ পার্ব্বত্য প্রথায় আতিথ্য দান-পূর্ব্বক তনয়া পার্ব্বতীকে তাঁহার পরিচর্য্যায় পাঠাইয়াছেন। কিশোরী গৌরী মনে মনে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া কায়মনো-বাক্যে অতিথির প্রসন্নতালাভে প্রয়াস পাইতেছেন। ভোলানাথ কিন্তু অটল অচল, উমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার সমাধি-ভঙ্গে সমর্থ হইল না। অপর্ণা আপনাকে ধিক্কার দিয়া তপশ্চরণে মনঃ সংযোগ করিলেন, রাজকন্যা যোগিনী সাজিলেন। যোগীরাজ তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া অবশেষে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ধরণী ধন্যা হইল, পুরুষ-প্রকৃতির শুভ-সম্মিলনে বিধাতার সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিল। পুরাণের হর-গৌরী-কথার ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র।

শ্মশান যাঁহার আবাসভূমি, ভস্ম যাঁহার অঙ্গ-ভূষণ, নর-করোটী কণ্ঠহার, পর্ব্বতরাজ-নন্দিনী সেই গরলাশন স্মরারিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। দাম্পত্য প্রেমের এই মহনীয়-মাধুর্য্যে মহাকবি কালিদাসও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কল্পলোক-বিজয়িনী কল্পনা যেন ইহার মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কবি যেন নিতান্ত অতৃপ্তির সঙ্গেই বলিতেছেন—

"এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্ম নঃ সেবনাদনুগৃহীত মন্মথঃ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া মাসমাত্র মবসদ্ বৃষধ্বজঃ॥"

কিন্তু কবির লেখনী কন্যাগতপ্রাণা, কন্যাসুখে সুখিনী জননী মেনকার আশ্বস্তচিত্তের একটী পরিতৃপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—

"নীলকণ্ঠ পরিভুক্ত যৌবনাং তাং বিলোক্য
জননী সমাশ্বসৎ।
ভর্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ॥"

কুমারসম্ভবে কুমার-জননীরও আলেখ্য আত্ম-সার্থকতায় সমুজ্জ্বল।

পুরাণকারগণ ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়াছেন।

উমার তপস্যা এবং ত্যাগের মহিমা তাঁহাদের নিকট এতই বিরাট-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে যে, তাহার তুলনায় মহাদেবের মহত্ব যেন একান্তই অকিঞ্চিৎকর। পৌরাণিক—শঙ্করীর জন্য স্বর্ণ-কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অম্বিকা সেখানে ত্রিলোক-পালিকা, অখিলের অন্নদাত্রী, অন্নপূর্ণা। বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বরীর সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি বিশ্বেশ্বরীর নিকট বিশ্বের জন্য অন্ন-ভিক্ষা করিতেছেন।

কালিদাসের রচনা এবং পুরাণের বর্ণনায় তুলনা চলে না। তথাপি সংক্ষেপতঃ এ-কথা বলা চলে যে, কবি যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে রূপ দিয়াছেন, পুরাণ-কার তাহাকেই জীবনে বরণ করিবার সাধনার সন্ধান দান করিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের কবি কিন্তু অন্যদিক্ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের হরগৌরী দেবতা হইয়াও মানব-মানবী অথবা সে-কালের বাঙ্গালার গৃহস্থ-দম্পতীর ছদ্মবেশধারী দেবতা। দরিদ্রের সংসার, সন্তান-সন্ততি লইয়া স্বামী-স্ত্রীর একরূপ স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া যায়। ভালবাসা আছে, কিন্তু ভাষা নাই। দশবার ভালবাসি বলিয়া প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও নাই। অসচ্ছলতা আছে, মাঝে মাঝে অসাচ্ছন্দ্যও দেখা দেয়, অনুযোগ-অভিযোগে দাঁড়ায়, মান হয় তো অভিমানের কঠোরতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু প্রভাতের মেঘ, অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। গর্জ্জন করে প্রচুর, সময়ে অসময়ে বর্ষণেও কার্পণ্য করে না, কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্বাহ্নের তরুণ-আলোকে সমস্ত সংসার ঝলমল করিয়া উঠে। সেই আলোকানুবিদ্ধ বৃষ্টিকণায়, হাস্যোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুতে একখানি মুখ বড় অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দেয়। আপন আইয়তীর চিহ্নস্বরূপ দুইগাছি শঙ্খের জন্য কত গৃহ-লক্ষ্মীর কত নিশীথে নৈশ উপাধান সিক্ত হইয়াছে, বিশ্বেশ্বরী আপনার বক্ষে অসংখ্য নারীর সেই পুঞ্জীভূত বেদনা বহন করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছেন। নারী যেখানে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আপনভোলা স্বামীকে লইয়া সে সংসারে তাহার দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দ, যে গৌরব, 'হরগৌরীর কোন্দলে', 'দুর্গার শাঁখা পরা' প্রভৃতি প্রাচীন গাথায় তাহারই একটী আভাস পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের দৃপ্ত-মর্য্যাদাবোধ যেদিন বিলাসকে ঘৃণা করিত, অভাবকে অগ্রাহ্য করিতে জানিত, ইহা সেইদিনেরই প্রতিচ্ছবি। স্বামী-গৌরবে গরবিণী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরণী যে-দিন রাজ-রাণীর গৌরব স্পর্দ্ধা করিত, ইহা সেইদিনেরই বিলুপ্ত-প্রায় চিত্র। কাব্য এবং জীবনের ইহাই হর-গৌরী মিলন।

একটা উদাহরণ দিই। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক গানে ও গাথায় মহাদেবকে আমরা কৃষকরূপে দেখিতে পাই। শূন্য-পুরাণে ইহার একটী অতীত চিত্রের লুপ্তাবশেষ রহিয়া গিয়াছে। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যগুলিতে শিবের চাষের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি-না জানি না, এবং মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার তেমন সামঞ্জস্যও দেখিতে পাই না। অথচ পল্লী-সাহিত্যে ইহা একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বহুদিন পূর্ব্বে রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ইহার একটী ব্যাখ্যা পড়িয়াছিলাম। রায়বাহাদুর না-কি কোন দুইজন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে শিবের চাষের অনুবাদ শুনাইয়াছিলেন। অনুবাদ শুনিয়া তাঁহারা প্রায় কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন। একজন এমনও বলিয়াছিলেন যে, "ভক্ত এখানে নিজের জন্য কিছু চাহিতেছেন না। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া আরাধ্যের সুখে দুঃখে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" যে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, যে দেশে দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগের নামই যজ্ঞ, সেই দেশের ভক্ত যদি নিজে খাটিয়া-খুটিয়া-উপার্জ্জন করিয়া আরাধ্যকে না খাওয়াইয়া জোয়ালে যুতিয়া দেয়, চাষ করিয়া খাইতে বলে, তবে তাহাতে হৃষ্ট-রোমা ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কি আছে, বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয় পুরাণের সঙ্গে পল্লীগাথার শিবের কৃষিকার্য্যের

একটী সঙ্গতি আছে। পুরাণের শিব অন্নপূর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা করিতেছেন। ভিক্ষা নিজের জন্য নহে, বিশ্বের জন্য। অন্নপূর্ণার হাত হইতে অন্ন লইয়া, সেই অন্ন বিশ্বে বিলাইবার ভার লইয়াছেন ভিক্ষুক শঙ্কর। দেবতা নিজ-হস্তে দুয়ারে দুয়ারে দান করিয়া ফিরিতেছেন, পুরাণে এমন কল্পনা কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতার যাহা দেয়, তিনি তাহা যজ্ঞের মধ্য দিয়াই দান করিয়া থাকেন। দেবতা-মানবে আদান-প্রদানের সেতুই হইল যজ্ঞ। এককালে কৃষিও যজ্ঞরূপে পরিগণিত ছিল। যে-কালে বাঙ্গালী যাভা, বালি, সুমাত্রায় বাণিজ্য-যাত্রা করিত, সে-কালেও পল্লীবাসী স্পর্দ্ধা করিয়া বলিত, 'লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা'। মঙ্গলকাব্যের কবি শিবের অন্ন বিলাইবার উপায়-স্বরূপ কৃষিকর্ম্মের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই পুরাণের শিব মঙ্গলকাব্যের শাশ্বত কৃষক। মঙ্গলকাব্যের শিব কৃষিকর্ম্ম করিয়াছেন, বাঙ্গালায় কৃষির প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশ্বেশ্বর এইরূপেই বিশ্বে অন্ন বিলাইয়া বিশ্বের কৃষক-কুলকে ধন্য করিয়াছেন। পুরাণে এবং মঙ্গল-কাব্যে এই যে পার্থক্য, ইহাই মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্যের দুইটী ধারা। একটী ধারায় দেবতা আপনার বিরুদ্ধ-ভক্তকে নানা উপায়ে বশীভূত করিয়াছেন, যেমন চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর, মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর। অপর ধারায় দেবতা বিরুদ্ধ-ভক্তের বিনাশ-সাধন করিয়া স্বীয় ভক্তকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, যেমন ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ। শিবায়নের তৃতীয়-পন্থা। শিব গৌরীর পরামর্শে চাষ করিয়াছেন, গৌরী শাঁখা পরিতে চাহিলে শাঁখারীর ছদ্মবেশে ছলনা করিয়াছেন। গৌরী তাঁহাকে বাগ্‌দিনী বেশে ছলনা করিলে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, পরন্তু বাগ্‌দিনীর সৌন্দর্য্যে ও বাক্‌ বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় হস্তের অঙ্গুরী দান করিয়াছেন। ইহা হর-গৌরীর দাম্পত্য লীলারই একতর চিত্র। মাঝখানে বাগ্‌দিনীকে লইয়া একটু পরকীয়া প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে।

শিবায়নে এবং গ্রাম্য-গাথার মেনকার চিত্রও ভিন্ন রূপ। ভিখারীর করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মেনকার উদ্বেগের অবধি নাই। তিনি উমাকে আনিবার জন্য হিমাচলের নিকট নিত্য অনুযোগ করেন। বাঙ্গালায় 'পূজা' বলিতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালীর সেই সার্ব্বজনীন উৎসব—'দুর্গোৎসব' উমার পিত্রালয়ে আগমন। 'আগমনী' গান বাঙ্গালী কবিরই সৃষ্টি, তাহার কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিতে কবির আসরে ইহার সূচনা, কবিওয়ালাগণ ইহার রচয়িতা। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হরগৌরী কথার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথারও কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন ধারা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-কথার সর্ব্বপ্রধান আধার হইলেও তাহাতে রাধার নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের মত বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি প্রধানা গোপিকা—যাঁহার নাম গান্ধর্ব্বিকা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্ম-পুরাণে তিনিই শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী, তাঁহার প্রতিপক্ষা নায়িকার নাম বিরজা। পদ্ম-পুরাণে রাধা এবং চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকা, দুই প্রধানা যূথেশ্বরী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শারদ-রাসের কোন প্রসঙ্গ নাই, হেমন্তে কাত্যায়নী পূজার পর বাসন্ত-রাসের উল্লেখ আছে। পদ্ম-পুরাণ শরত ও বসন্ত দুই কালেই রাসের বর্ণনা করিয়াছেন এবং বাসন্ত-রাসের কারণ ও বৎসরের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দুইটি পৃথক ধারার সন্ধান পাইতেছি এবং পদ্ম-পুরাণে এই দুই ধারার সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখিতেছি।

তন্ত্রেও রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। রাধা-তন্ত্রে বাসুদেবের ত্রিপুরাসুন্দরী সাধনের কথা পাওয়া যায়। গোপী-লীলার প্রধানা সাহায্যকারিণী রূপে পদ্ম-পুরাণ, এই ত্রিপুরাসুন্দরীর বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা করিতেন। শ্রীখণ্ডের কবি কবিরঞ্জনের একটি পদে

এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায় — "ত্রিপুরা চরণ কমল-মধুপান, সরস-সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥" রাধা-তন্ত্রে পরস্পর প্রতিপক্ষারূপে রাধা ও চন্দ্রাবলীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে জটীলা, কুটীলা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। রাধা-তন্ত্রে বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহামায়ার অংশ স্বরূপিণী পদ্মিনী রাধিকার সাহচর্য্যে মহাবিদ্যা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

কবি জয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বিশেষ ঐক্য লক্ষিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যে বাসন্ত-রাসের কথা পাই, শ্রীগীত-গোবিন্দের তাহাই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অনেকে শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রথম-শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ছায়া দেখিতে পান। কিন্তু আর একটী দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হয় পদ্ম-পুরাণ বা রাধাতন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির সঙ্গেও শ্রীগীত-গোবিন্দের একটা সম্বন্ধ আছে। জয়দেব বলিতেছেন— "* * * শ্রীবাসুদেব রতি-কেলি কথা সমেতমেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্॥" কাব্যে তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলা কথা বর্ণন করিতেছেন, কিন্তু মুখ-বন্ধে বলিতেছেন —"শ্রীবাসুদেব রতি-কেলি"। যাহা হউক শ্রীগীত-গোবিন্দে আমরা রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে ধারার সন্ধান পাই, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাহারই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের সময় আজিও নির্ণীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার মতানুসারে অপর কেহ কেহ চণ্ডীদাসকে রাজা গণেশের সম-সাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কবি কৃত্তিবাসকে লইয়া গণেশের রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয়ের অনুকূলে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরও কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় পিছাইয়া দিয়াছেন। মাঘ মাস পুণ্য কি পূর্ণ জানি না, কিন্তু কৃত্তিবাসকে গণেশের সভায় আসন দিলে চণ্ডীদাসকে লইয়া একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে যদি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে ধ্রুবানন্দের কারিকায় বোধ হয় তাঁহার স্থান হইবে না, কিন্তু কারিকায় তিনি ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমরা এখন কোন্‌টী সত্য ধরিব? পূর্ণ মাঘ মাস, না ধ্রুবানন্দ? বড়ু চণ্ডীদাসকে কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ একই সময়ে একদেশে সেকালের দিনে রামায়ণ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত হওয়া অসম্ভব ছিল। কেন তাহা বলিতেছি।

সে সময় দেশে মঙ্গলকাব্যের যুগ চলিতেছিল। ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং শিবায়ন রচিত হইয়া গিয়াছে, দেশের কবিগণ পরের পর গতানুগতিক ভাবে একই ধারা অনুসরণের চেষ্টা করিতেছেন। পল্লীতে পল্লীতে সেই সমস্ত মঙ্গলগীতি গীত হইতেছে, এমনই দিনে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। তখনও পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা লইয়া কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নাই। সে সময় মঙ্গল-গানের মত লোকগীতিরূপে আর এক ধরণের গান বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, ঝুমুর গান। চণ্ডীদাস এই ঝুমুরের ধারায় মঙ্গল কাব্যের অনুসরণে এক অভিনব কৃষ্ণ-মঙ্গল রচনা করিলেন— (সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তিনি শ্রীরাধার প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল। শ্রীরাধার মানুষী লীলা, রাধা জানেন না যে, তিনি কৃষ্ণের চিরন্তনী প্রিয়া, যেন মঙ্গলকাব্যের বিদ্রোহী ভক্ত। কিন্তু কৃষ্ণের তাঁহাকে না হইলে চলিবে না, তাই তিনি তাঁহার মনোহরণের জন্য, তাঁহার ভালবাসার জন্য লালায়িত। শিবায়নের শিব দেবতা, পার্ব্বতী দেবী, তাঁহারা লীলার জন্য মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছেন। শিব বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশে পার্ব্বতীকে চিনিতে পারেন নাই, বাগ্‌দিনী কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-কৃষ্ণ ছদ্মবেশধারী নহেন, তাঁহারা মানুষ হইয়া মানুষের মধ্যেই জন্মিয়াছেন এবং কৃষ্ণ তাহা জানেন, রাধিকা

ভুলিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন এবং অন্যদিকে ঝুমুর গানের সম্পর্ক পাতাইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ, উত্তর-প্রতিউত্তর। সম-সাময়িক সমগ্র ভাবধারা এবং রচনাভঙ্গী আয়ত্তে আনিয়া এই যে রাধা-কৃষ্ণ লীলার অভিনব সৃষ্টি, এই যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড প্রভৃতি ইহাই চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য, আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই চণ্ডীদাস মহাকবি। দানখণ্ড হইতে রাধা-বিরহ পর্য্যন্ত এই যে লীলাবিলাসের ক্রম-পারম্পর্য্য, এই যে সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতি, এই যে বিপ্রলম্ভ রসের পূর্ব্বরাগ, মান, করুণ ও প্রবাসের লীলা-বৈচিত্র্য, সেকালের সাহিত্যে বাস্তবিকই ইহা অনন্য-সাধারণ, অপূর্ব্ব, অনিন্দ্যসুন্দর।

কৃত্তিবাসের মৌলিক রচনার শক্তি ছিল না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত না হইলে তাঁহার পক্ষে রাম-মঙ্গলের ধারণা করা কঠিন হইত। তিনি বাল্মীকির অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু রামকে মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালিয়াছেন, ভক্তের ভগবানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মাঝে মাঝে নিজের কল্পনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য দুই-একটী উপাখ্যান রচিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। তথাপি একথা সত্য যে গতানুগতিক হইলেও কৃত্তিবাস সে কালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য দানী সাজিয়াছেন, নাবিকের কার্য্য করিয়াছেন, অবশেষে মথুরার হাটের পথে দধি-দুগ্ধের ভার বহিয়াছেন। শিব কৃষক, তাই কবি তাঁহাকে দিয়া বাগ্‌দিনীর আদেশে জল সেচন করাইয়াছেন। ভারখণ্ড লীলা তাহা অপেক্ষাও মধুরতর। দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"আপন অঙ্গের লখিমী হইয়া তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী।" ভারখণ্ডে বলিতেছেন—"তিন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী। বাছিয়া সে পালি রাধা আহ্মাকে ভারী॥ * * * * কংস বধিবারে মোএ কৈলো অবতার। এবে কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার॥" কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ভার কান্ধে করিতে হইয়াছে।

"লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে লয়া ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে লো
ভাবে মজিলা দেবরাজে॥"

শ্রীকৃষ্ণ জানেন তিনি কে, দেবগণ জানেন তাঁহার স্বরূপ কি, তথাপি তিনি প্রেমের দায়ে ভক্তের জন্য ভার বহিয়াছেন। এইরূপ মানুষী লীলার রচনা-মাধুর্য্যেই চণ্ডীদাস মহাপ্রভুকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা॥"

দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের কথা সনাতন গোস্বামীর বৃহত্তোষণী টীকায় পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কৃষ্ণ-মঙ্গল প্রণেতৃগণ এবং বৈষ্ণব-কবিগণ দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের পালা রচনা করিয়াছেন। 'প্রেমামৃত' নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী অথবা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে 'বসনচৌর্য্য', 'ভারকাণ্ড', 'নৌকাকাণ্ড', ও 'দানখণ্ড' লীলার উল্লেখ পাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলার ভারকাণ্ড বা ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড লীলা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। 'প্রেমামৃত' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পরবর্ত্তীকালে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া যায় না। দুই-একটী ভণিতাহীন পদেও ভারখণ্ড লীলার উল্লেখ পাইয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৫নং পুঁথির ১০ (খ) পৃষ্ঠায় এই ভণিতাহীন পদটী পাওয়া গিয়াছে—

"রাধার পিরীতে মন মজাইতে নিজ কান্ধে লয়া ভার।
মথুরা যাইতে দুস্তর তরীতে নায়্যা হয়্যা করি পার॥
এত লঘু কাজ করি ব্রজমাঝ কিছুই না ভাবি দুখ।
মোরে রসবতী ভালবাস অতি এই মনে বড় সুখ॥"

মাধবাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস প্রণীত একখানি 'কৃষ্ণমঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণদাস সুস্পষ্টরূপে ভারখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

এত বিড়ম্বন তুমি কৈলে গোপীকার।
অখন চলহ বিকে কান্ধে করি ভার॥
গোপীর বচনে কৃষ্ণ ভার কান্ধে করি।
বাহু নাড়া দিঞা যত চলিল সুন্দরী॥
বিচিত্র বাহুক তাহে রঙ্গিলের শিখা।
কৃষ্ণ কান্ধে দিঞা ভার চলিলা রাধিকা॥

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন কৃষ্ণমঙ্গলের আলোচনা পারম্পর্য্যে চণ্ডীদাসের পরই 'গুণরাজ খানের' শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নাম করিতে হয়। তাহার পর মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। মাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃব্য-পুত্র। তাঁহার 'কবি-বল্লভ' উপাধি ছিল, শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোস্বামী-পাদ-গণের নিকট হইতেই তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতকাল যাহা বিদ্যাপতির নামে চলিয়া আসিতেছে সেই সুপ্রসিদ্ধ—"সই কি পুছসি অনুভব মোয়, সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥" পদটী মাধবাচার্য্যের রচিত। কৃষ্ণমঙ্গলে 'মাধবাচার্য্য' ভণিতা আছে, কিন্তু এই পদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে কবিবল্লভ উপাধি পাওয়ার পরে লেখা। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবগত ঐক্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ঐক্য আরো সুস্পষ্ট। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থলে রাধা নিজেকে 'এগার বরিষের বালী' বলিয়াছেন। আট-চারি বরষের কথাও আছে। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের দানখণ্ডে রাধা বলিতেছেন—

দ্বাদশ বৎসর বয় এই মোর হয় নয়
বারো বৎসরের চাহ দান।
কি আর করহ হঠ কুবোল বলিলে শঠ
সভা মাঝে পাবে অপমান॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা কৃষ্ণকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'হরিবংশ' রচয়িতা 'ভবানন্দ' ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণব কবি দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের পদে বা অন্যত্র এই সম্বন্ধ গ্রহণ করেন নাই। মাধবাচার্য্যের রাধা বলিতেছেন—

আপনার অপযশ করহ আপনি।
তুমি যশোদার পুত্র আমি মাতুলানী॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

নৌকাখণ্ডে মাধবাচার্য্য মাঝ-যমুনায় বিহার বর্ণনা করিয়াছেন, রাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীও আছেন, অবশ্য সেখানে দুইজন পৃথক যুথেশ্বরী।

মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলে রাসের পূর্ব্বে—

এই সব রূপে হরি লইয়া গোপীগণ।
দেখায়ে দেখায়ে ভ্রমে সব বৃন্দাবন॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবন খণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাধব চিরকুমার ছিলেন। কিন্তু তৎপ্রণীত রাসে গোপীগণের কাকুতি, নবোঢ়ার সঙ্কোচ এবং বিহার, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে তুল্যরূপ। মাধবের রাধা গোপীগণ সঙ্গে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আমলকী আদি কিনিয়া আনিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই গ্রন্থখানি অনুমোদন করিয়াছিলেন, মাধব পুরীধামে গিয়া এই গ্রন্থ মহাপ্রভুকে অর্পণ করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ সনাতনাদির যে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভাণিকা দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থে দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের কথা নাই। সে গ্রন্থে ভাগুরী মুনির যজ্ঞে কৃষ্ণ-বলরামের মঙ্গল কামনায় মুনিগণের ঘোষণামত ঘৃত দেওয়া হইয়াছিল মাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই অবসরেই দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রূপানুগ গোস্বামীগণ—যেমন রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের কথা অনভিজ্ঞের উক্তি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

রাধাতন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। এই সংস্কৃত গ্রন্থে নৌকাবিলাস লীলায় চন্দ্রাবলী, বিশেষ করিয়া রাধা যে ভাষায় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা তাহা হইতে এতটুকু আপত্তিজনক

নহে। কৌতূহলী পাঠক রাধাতন্ত্রের ২৪।২৫।২৬ পটল পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ক্রয়ে বিক্রয়ণে চৈব গমনাগমনে তথা।
যমুনা জল পানেচ পারে বা রোহণে তথা॥
অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে॥

যমুনা জলপানে দান গ্রহণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যমুনা-খণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে কাশীমিশ্র ভবনে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় এই দুইজন অন্তরঙ্গ-ভক্তের সঙ্গে দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন। খেতরীতে ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উৎসবে খ্রীষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে বাঙ্গালার প্রথম-বৈষ্ণব-সম্মিলনে চণ্ডীদাসের পদাবলী গীত হইয়াছিল। তাহার পরও খেতরীতে বিগ্রহের সম্মুখে—

বৎসর ভরি সংকীর্ত্তন হয় অনিবার।
দেখিয়া পাষণ্ডীর মনে লাগে চমৎকার॥
(প্রেমবিলাস, ১৯ বিলাস)

প্রেম-বিলাস রচয়িতা স্বচক্ষে সেই উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্য সময়েও খেতরী গিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কাহার কাহার রচিত গ্রন্থ বা পদ গীত হইত, প্রেমবিলাসে তাহার বর্ণনা আছে। নিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন—

সঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত।
শুনিয়া পাষণ্ডীগণের দ্রবি গেল চিত॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্য মঙ্গল।
তার পর হয় গান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥
পরে হয় গোবিন্দের গৌর কৃষ্ণ লীলা গান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় পরাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাস রচিত এবং কৃষ্ণমঙ্গল মাধবাচার্য্য প্রণীত। ইহা হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকেও চণ্ডীদাসের গান বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত শ্রীখণ্ডের কবি গোপাল দাসের রসকল্পবল্লীর অধুনা প্রচলিত সকল হস্ত-লিখিত পুঁথিতে কিন্তু চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম ও পদ আছে। কিন্তু ঢাকার যাদুঘরের পুঁথিতে ও শ্রীখণ্ডের পুঁথিতে (চণ্ডীদাসের (?) ভণিতাহীন পদ আছে,—) নাম নাই। তাহার পরে সঙ্কলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ বা নাম পাওয়া যায় না। পদামৃত-সমুদ্রে চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যা সাতটী, অথচ বৈষ্ণবদাসের পদ-কল্প-তরুতে এই পদের সংখ্যা প্রায় তিনশত, আজিও এসব সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বাঙ্গালার দুইটী বিশ্ব-বিদ্যালয়, এবং সাহিত্য-পরিষদ ও তাহার শাখাসমূহ আরো অধিক পুঁথি সংগ্রহের দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন। তরুণ সাহিত্যিকগণও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সমবেত অনুসন্ধানে ইহার কোন কিনারা করিতে পারেন।

চণ্ডীদাস যে দুইজন ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, বুঝিবা আরও একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কতকগুলি পদ যে অন্যের রচিত, সেগুলি গোলমালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের মনে হয়, অন্য কবিও কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াই চণ্ডীদাস নাম দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনজন চণ্ডীদাস থাকিলে, অপর দুইজনের মত তাঁহারও কোন সন্ধান পাওয়া যাইত। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে দুইজনেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তিন রকমের তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহার এতটুকু রসবোধ আছে তিনিই বলিবেন যে, ইহা কখনই একজনের রচনা হইতে পারে না। তিনটী পদে তিনজন কবির রচনা সুস্পষ্ট। সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বড়াই গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বলি ঝাঁপ দিল সে মোর শুকাইল লো
মুই নারী বড় অভাগিনী॥
বড়ু চণ্ডীদাস, কৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহ, ৩৪৪ পৃঃ

(১) প্রচলিত পদাবলীর পদ, ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস নাম নাই, কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—বিরহ॥

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এহি সে লিখিল।
সুধার সায়র মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি অনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরু-লতা-বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিএ যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান॥
পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ॥

(সাহিত্য পরিষদের নূতন সংস্করণের পাঠ)

(২) দীন চণ্ডীদাসের পদ, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা আছে—বিরহ।

হায় রে দারুণ বিধি। ছাড়াইলে গুণনিধি॥
যে এত দিল তাপ। তারে ধরু বহু পাপ॥
এত কি সহিতে পারি। বিরহে এ তনু মরি॥
তিলেক দিবার সাধ। এ-সুখে দিলে কি বাদ॥
কবে পাপ তার মেলি। পুন সে করব রস কেলি॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র। ভাঙ্গব সকল দ্বন্দ্ব॥
পুন হরি মিলব মোর। পিয়ারে করব নিজ কোড়॥
পুন কি করব রাস কেলি। নব নব গোপী হব মেলি॥
বাঁশী কি শুনব কানে। যাব বৃন্দাবন পানে॥
ঘষিয়া চন্দন মালা। কারে দিব আর গলা॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়। তিলেক না কর ভয়॥

(বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত জীবনী ও প্রতিভা বিশ্লেষণী-সহ সমগ্র সটীক পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মহাকবি চণ্ডীদাস পদাবলী।)

বসুমতী সংস্করণে এই পদটী আসল চণ্ডীদাসের বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। আশা করি পাঠক পদটীর ভাষা, ভাব, ছন্দ একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবেন।

(৩) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত—কিন্তু ভাবে, ভাষায় কোনোরূপ মিল নাই। এই পদে বিশেষ দ্রষ্টব্য 'কপোত নামেতে পাখী'। যদুনাথ দাসের 'সংগ্রহ-তোষণী' গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবনের কেলী-কুঞ্জের কপোতের কথা আছে। এই কপোত একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তারূপে জন্মিয়াছিলেন। 'সংগ্রহ-তোষণী'তে তাহার সাধন-সঙ্গিনীর কথাও পাওয়া যায়। এটীও মাথুর বিরহের পদ।

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিয়া হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়ে॥
বৃন্দাবন আছে সাখী।
যদি মনে লয় আর এক আছে
কপোত নামেতে পাখী॥
বোল নিঠুরের আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ কাহারে লাগে॥
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়া যে জনা কাঁদয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥

(সাহিত্য পরিষদের নব প্রকাশিত সংস্করণ)

বলিতে ভুলিয়াছি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও চন্দ্রাবলী রাধারই অপর নাম। শ্রীগীত-গোবিন্দের তো কয়েকটী পদের অনুবাদই রহিয়াছে।

কঠোর

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

১

সন্ধ্যা হইতেই উমার আবার জ্বর আসিল।

তাড়াতাড়ি হাতের দু'-একটা কাজ সারিয়া আসিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া পড়িয়া গায়ে বেশ নিবিড় করিয়া কাঁথাটা টানিয়া দিল। তবুও শীত ভাঙ্গিতে চায় না!... পুরান ম্যালেরিয়া জ্বর—আবার যখন চাপিয়া ধরিয়াছে, সহজে ছাড়িবে বলিয়া তো মনে হয় না।... কাঁপুনীও কম নয়! পা-দু'খানি বুকের কাছে গুটাইয়া নিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। জ্বরের ঝোঁকে দুই চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

হরিহর বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিবার পর দরজাটা ঠেলিতেই হঠাৎ খুলিয়া গেল দেখিয়া একটু চটিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ রে, উমি! ভর সন্ধ্যে বেলা দরজা খুলে রেখে দিয়েচিস্? হতভাগীর যদি কোন আক্কেল আছে! যাক্, নিয়ে যাক্—যা দু'-একটা ঘটি-বাটি আছে!

কিন্তু চেঁচামেচির পরেও যখন উমার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন হরিহর একটু বিস্মিত হইল।

পা ধুইয়া দাওয়ায় উঠিয়া পড়িয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল উমা বিছানায় জ্বরে কাতরাইতেছে। একবার তাহার মাথায় হাত দিয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আপনমনে সে একবার বলিল—মেয়েটার আবার জ্বর হোলো!

তখনই টিনের চালাটার উপর ছড়্-ছড়্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। হরিহর এটাকে কিন্তু ভালভাবে লইল না। অপ্রসন্ন মুখে সে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল—আশ্বিন মাস শেষ হ'তে গেল, এখনো খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি! দূর হ'!...

তার পর হঠাৎ সে চুপ করিয়া গেল। পুরান স্মৃতি আবার মনে পড়িল বুঝি! তাহার মনে পড়িল সেই রাত্রের কথা—হ্যাঁ, সে বছরটাও ঠিক এমনি বর্ষা! আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি তাহার স্ত্রী কমলা, তখন কোলের দু'টী মেয়ে শশী আর উমাকে রাখিয়া মারা গেল। বাড়ীতে অন্য কেহ ছিল না। চাকরের কাছে ছোট মেয়ে দু'টীকে রাখিয়া সে আর তাহার বড় ছেলে বিপিন দুই ক্রোশ দূরে পোড়া-দহের শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। মাত্র দু'জন লোক তাহারা — অত বড় একটী প্রাপ্ত-বয়স্কা নারীর মৃতদেহ কি দু'জনে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? পথে যে কতবার শবাধার নামাইয়া জিরাইয়া লইতে হইয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই! অনেক কষ্টে যদিও তাহারা শ্মশানঘাটে পৌঁছাইয়াছিল কিন্তু শবদেহ চিতায় চড়াইয়া দিবার পর এমনিতর অকস্মাৎ বৃষ্টি আসিয়াছিল। তাহারা বাপ বেটায় চিতা হইতে জল ছেঁচিয়া ছেঁচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে বৃষ্টি থামিলে পরের দিন দ্বিপ্রহরে তাহারা শব দাহ করিয়া ফিরিয়াছিল।

...আজিকার বর্ষার সহিত এই কাহিনীটী আবার তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিল—কিন্তু বিপিন এখন কোথায়?

হরিহর মাথাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। পুরানো কথা ভাবিয়া আর সে নিজেকে দুর্ব্বল করিবে না।

ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—হ্যাঁ রে, উমি, একটু

সাবু তৈরী করে আনবো? সাবু ঘরে আছে তো?

উমা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—না, বাবা! কিছু খাব না। তুমি আর একখানা কাঁথা আমার গায়ে দিয়ে চেপে ধরো না। বড্ড শীত! উ-হু...

হরিহর তাহার গায়ে কাঁথাখানি বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।...

২

কয়েকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু তবুও উমার জ্বর ছাড়িল না। ছাড়িবে না যে, তাহা হরিহর জানিত। এমনি ভাবের পোড়া জ্বরে তো ওর মাও একদিন গিয়াছে, হয়তো ওকেও যাইতে হইবে!...

দুপুর বেলা হরিহর রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাত রাঁধিতেছিল। সে আজ নিজের হাতে যে কাজ করিতেছে, পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যদি সে তাহা স্বপ্নে দেখিত, তাহা হইলেও বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু সমস্তই ভাগ্যের বিপর্য্যয়! একদিন যখন একটী একটী করিয়া তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সবাই মারা গেল তখন সে চাকরি-বাকরি ছাড়িয়া এই উমাকে বুকে চাপিয়াই সেই মর্ম্মান্তিক শোক ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। উমার উপরে হরিহরের আর একটী মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল শশী। তাহার অপঘাত মৃত্যুর কথা এখনও মনে পড়িলে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মেয়েটীর বয়স ছিল তখন বছর সাত-আষ্টেক। বেশ মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটী। দিঘীর জলে স্নান করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া গিয়া বাঁধানো ঘাটটীর শেষ-ধাপটীর তলায় গিয়া পড়িল। জলে ডুবিতে ডুবিতে মেয়েটী চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—"বাবা! বাবা গো! ডুবে গেলুম!" হরিহর ঘাটের পাশে ঝোপটীতে বসিয়া বাঁশ চাঁচিয়া চাঁচাড়ি তৈয়ারী করিতেছিল। হঠাৎ তাহার চিৎকার শুনিয়া যখনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে তুলিতে যাইবে, ঠিক তখনি ঘাটের উপর ধড়াস্ করিয়া সে নিজে পড়িয়া গেল। পড়িয়াছিল ভীষণভাবে। তাহার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া উঠিতে উঠিতে মেয়েটী জলে ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এ-ধার ও-ধার খুঁজিল — কিন্তু তাহাকে আর পাইল না। শেষে জাল ফেলিয়া যখন তাহাকে তুলিল, তখন তাহার আর সাড়া ছিল না!

রাঁধিতে রাঁধিতে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হয়তো এই সমস্ত কথা হরিহরের মনে পড়িয়া তাহার দুপুরটা মাটি হইয়া যাইত। কিন্তু যাক, সে বাঁচিয়া গেল! তাহার ভাগিনেয় আশু উঠানে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ গা, মামা, উমার না-কি আবার অসুখ?

হরিহর বলিল—হ্যাঁ, তুই জানলি কি ক'রে? তা এত বেলায় এলি! খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়? দাঁড়া তোর জন্যেও আরও দুমুঠো ফুটিয়ে নিই।

হরিহর আর দু'টী চাল ধুইয়া হাঁড়িতে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—তাই তো রে, মামার বাড়ী এলি, শুধু ভাত খেয়ে যাবি! দাঁড়া আর একটা তরকারি করি।

এই কথা বলিয়া সে রান্না-ঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া উঠানের মাচাটী হইতে একটী লাউ পাড়িয়া আনিতে গেল। কিন্তু লাউ পাড়িতে গিয়া হঠাৎ আবার কোমরের পুরাতন বেদনাটা বুঝি কেমন খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল। হরিহর বলিল—ও রে, আশু, দে বাবা দে, লাউটা পেড়ে দে! আবার কোমরের বেদনাটা এল বুঝি। এটা কবে প্রথম হয় জানিস্? তোদের মনে নেই সেই যেবার শশী জলে ডুবে গেল—সেবার সেই ঘাটে প'ড়ে গিয়ে ...

লাউ পাড়িয়া আনিতে আনিতে পাড়ার আরও দু'টী ছেলে আসিয়া উঠানের ভিতরে দাঁড়াইল। ইহারা প্রায়ই দুপুরে আসিয়া হরিহরের সহিত গল্প করিয়া যায়। সে তাহাদের তাহার নিজের গত জীবনের কত কাহিনী শুনায়। তাহারা এই লোকটীর জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা মুগ্ধ-বিস্ময়ে শুনিয়া যায়। মনে মনে তাহারা ভাবিতে থাকে এই লোকটীর জীবন

...তখানি বিয়োগান্ত হইয়াও তাহার গতি-পথে বিবাগী-স্রোতধারার বন্যা আসিল না কেন? সে কি বাঁধের ...লের মত আপনার কুহকে পড়িয়া আপনিই আবদ্ধ ...হিয়াছে!

...লাউ কুটিতে কুটিতে এই রকমেরই একটা কথা ...ঠিতে হরিহর বলিল—শুধু ঐ মেয়েটার জন্যেই ...'বাড়ীতে থাকা। তা নইলে এতদিন কবে বেরিয়ে ...ড়তুম।

তারপর বুকের উপর হাত চাপ্ড়াইয়া বলিল—জানলি আমার এখানটা কতো শক্ত! শোন ...বে—যেবার বিপিন মোলো—তাও কোথায় গিয়ে মালো শোন, ফরাসডাঙ্গায়—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে। ...তভাগা ছেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী প'ড়েছিলো। হঠাৎ একদিন রাত্রে হার্টফেল ক'রে মরেচে খবর পেলুম। আপনি গিয়ে সৎকার ক'রে এলুম। কিন্তু যাক্, তারপর আবার কি হোলো শোন। দু'-চার দিন যেতে-না-যেতেই একদিন দেখি আমার অনেকদিনের পোষা কুকুরটাকে সাপে কামড়েচে। বিষে তার গা একেবারে নীলবর্ণ হ'য়ে উঠেচে! আমি কি করলুম জানিস? আর কোনো কথাবার্ত্তা না ব'লে পা-র খড়মটা না তুলে খটাখট্ তার মাথায় মারতে লাগলুম। ঘা দু'-তিন দেবার পর কুকুরটা এমন কেঁউ কেঁউ ক'রে মুখখানা করলে যে, আর মারতে মায়া লাগ্‌ছিল। কিন্তু আর দু'ঘণ্টা বাঁচলেই তো কুকুরটারই যন্ত্রণা! তাই একেবারে চোখ বুজিয়ে ফেলে খটাখট্ খড়ম চালাতে লাগলুম। কেঁউ কেঁউ কর্‌তে কর্‌তে অত দিনের পোষা প্রভু-ভক্ত কুকুরটা আমারই হাতে মারা গেল। তোরা এ-কাজ পারতিস্? হেঁ-হেঁ, হেঁ-হেঁ......

কথাটা বলিয়া হরিহর অসভ্যের মত হাসিতে লাগিল। কিন্তু এ-হাসি তীরের ফলার তীক্ষ্ণতা লইয়া ঐ ছেলেগুলির বুকে বিঁধিতে লাগিল।

আশ্চর্য্য লোকটার বুকের বাঁধন!

৩

উমার বিবাহ হইয়াছিল নয় বছরে এবং বিধবা হইয়াছিল বারো বছরে। তারপর আজ ছয় বৎসর সে পিতার নিকট আছে।

হরিহর তারপর উমাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠায় নাই।

সে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত—ছোটলোক! শালারা ছোটলোক! তা নইলে ছেলেটার অমন ভেতরে ভেতরে ব্যামো আমাদের কাছে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল! আমরা ভাল মানুষের মত মেয়ে দিলুম। আর তিনটী বছর যেতে-না-যেতেই বিধবা হোলো!

তা হইবে। উমার শ্বশুররা ছোটলোক হইবে হয়তো। কিন্তু হরিহর অতখানি ভদ্রলোক হইয়াও মেয়েটীকে কেন ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেছে না—সেই কথাই সবাই পরিতাপের সহিত গল্প করিয়া থাকে।

* * * *

উমার অসুখটা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। পেটটি প্লীহায় ভরিয়া গিয়াছিল। জ্বর ছাড়িবার নাম নাই।

উমা সেদিন হরিহরকে বলিল—হ্যাঁ, বাবা, ওষুধটা যে অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে। আর একটা আনো না!

হরিহর বলিল—হ্যাঁ, কি, ঐ কুইনিনটা? ওতে জ্বর আর সারলো না যখন, তখন আর কিনে কি হ'বে?

সে বলিল—না সারুক, দু'একদিনের জন্যে জ্বরটা একবার ছেড়ে গিয়েছিলো তো?

হরিহর বলিল—গিয়েছিলো? তা এবারও যে সেরে যাবে তার কি মানে আছে? তার চেয়ে তুই এক কাজ কর, তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে খা। আমাদের দেশী ওষুধ। এর থেকে ভাল ওষুধ আর নেই। সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি।

এই কথা বলিয়া হরিহর হঠাৎ তুলসী পাতার খোঁজেই হয়তো বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে পাড়ার অনেকের সহিত তাহার দেখা হয়। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে — হ্যাঁ, খুড়ো, উমা কেমন আছে?

উমার অবস্থার কথা সে সবিস্তারে বলিয়া শেষে বলিল—অসহ্য যন্ত্রণা! তোরা তা চোখে দেখতে পার্‌বি নে। আমি বলি, নারায়ণ যদি ওকে এই বেলা কোলে তুলে নেন তো ও বেঁচে যায়!

কথাটা বলিয়া সে একটু হাসিয়া মনকে হাল্কা করিতে চায়। কিন্তু হাসিতে গিয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল —কিন্তু আমার কি হবে বলতো? ও তো ড্যাং-ড্যাং ক'রে চলে যাবে—আমি কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাক্‌বো?

তারপর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হন হন করিয়া সে আপনার পথে চলিয়া যায়।

সেদিন আশু দেখিল তাহার মামা কোথা হইতে দুই-তিনটী বাঁশ আনিয়া উঠানের একধারে রাখিয়া দিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হরিহর তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল — চুপ্‌ চুপ্‌, জানিস্‌ না বুঝি? উমার যে কাল থেকে হাত পর্য্যন্ত ফুলেচে। হাত ফুললে আর বাঁচে না, বুঝ্‌তে পারচিস্‌? রাত-বিরেতে কখন দরকার পড়বে — তখন তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে কষ্ট হ'বে। ও-রি ওপর চ্যাটাই বিছিয়ে দু'জন কি চারজনে কাঁধে নিয়ে যাবার মত ক'রে নেবো 'খন। জানিস্‌ তো রাত্তির বেলা যদি কেউ আসতে না চায়? তুই আর আমি ছাড়া আর ত' কেউ নেই!

আশু তাহার মামার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

৪

হরিহর ঠিকই বলিয়াছিল। ইহারই চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সন্ধ্যায়······যে অপরিহার্য্য মুহূর্ত্তের জন্য অত তোড়জোড়, অতখানি উদ্বেগ, সেই মুহূর্ত্তই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাশিতে কাশিতে উমা চোখ কপালে তুলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিল।

শোকে বিহ্বলভাবে হরিহর বসিয়া রহিল। আশু গিয়া পাড়া হইতে তিন-চারজন ছেলে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আসিয়া বাঁশ বাঁধিয়া চ্যাটাই বিছাইয়া বেশ একটী শবাধার তৈয়ারী করিয়া লইল। তাহার পর বিছানা-সুদ্ধ শবদেহ আনিয়া তাহার উপর শোয়াইয়া দিল।

মুহ্যমান শোকে, ব্যাকুল কণ্ঠে হরিহর বলিল— দাঁড়া বাবা! দাঁড়া, তোরা একটু। আমিও কাঁধ দেব। সবাইকে কাঁধে করে দিয়ে এসেচি, আমার মাকেও কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব ···

এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল। কিন্তু তখনই 'উঃ' করিয়া বসিয়া পড়িল, আবার কোমরের পুরাতন বেদনাটা বুঝি চাপিয়া ধরিল। সে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিল না। অশেষ চেষ্টার পর সে মাটিতে বসিয়াই বলিল— নিয়ে যা, বাবা! আমার মাকে তোরাই নিয়ে যা, আমার আর যাওয়া হোল না···

ছেলেরা সবাই শবদেহ কাঁধে করিয়া 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

হরিহর ঠায় মাটিতে বসিয়া রহিল। শেষকালে তাহার এ কি দুর্ব্বলতা আসিল? কিন্তু দূরে নিস্তব্ধ রাত্রে যতই 'হরিবোল'-ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল, ততই তাহার কোমরের ব্যথাটা বুঝি বুকে আসিয়া তাহার পাঁজরাগুলিকে মোচড়াইয়া ধরিতে লাগিল। সে মূঢ়ের মত তার বেদনা-বিহ্বল বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই খানেই মাটির উপর ঢলিয়া পড়িল!

"জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ"

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্

আজ এই সভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা স্নেহান্ধ হইয়া আমাকে আজ আহ্বান করিয়া অযোগ্যকে যোগ্যতার মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন—ইহাতে আর কিছু না হউক, একথা সপ্রমাণ হইল যে, স্নেহের অসাধ্য কিছুই নাই।

বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের যোগ-সিদ্ধ পুরুষ শরৎচন্দ্র যে সংবর্দ্ধনার কর্ণধার, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের সব্যসাচী রায়বাহাদুর জলধর সেন যে সংবর্দ্ধনার পাত্র, সেই সংবর্দ্ধনা শুধু আজ এখানে সমবেত আমাদের নহে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সংবর্দ্ধনা।

চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা শুধু সেবার আনন্দের জন্যই বঙ্গ-ভারতীর সেবা করেন, প্রফুল্ল-হৃদয়ে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করিয়া লয়েন, তাঁহারা যে বাঙ্গালীর কত আদরের পাত্র, কত শ্রদ্ধার পাত্র, কত গৌরবের পাত্র, তাহা ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নাই। রায়বাহাদুর জলধর সেন আমাদের সেই আদরের, সেই গৌরবের বস্তু—তাঁহাকে আমি অন্তরের অভিবাদন জানাইতেছি।

তাঁহার অর্দ্ধ শত বৎসরের সাধনা বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় সুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। 'সোমপ্রকাশ', 'গ্রামবার্ত্তা', তথা 'হিতবাদী', 'বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার প্রথম যৌবন ও পরিণত বয়সের অক্লান্ত সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন চিরদিন ধারণ করিয়া রহিবে। তাঁহার সরস সুখ-পাঠ্য উপন্যাসগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার 'হিমালয়-ভ্রমণ' — সহজ ও প্রাণস্পর্শী রচনা-শক্তির পরিচয় বহন করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চির আদৃত থাকিবে। তাঁহার ভাবা, তাঁহার বর্ণনার প্রাঞ্জলতা, বিশেষতঃ তাঁহার লিখিবার নিজস্ব ভঙ্গি — বাঙ্গালার নরনারী-সমাজে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আজ এই আনন্দ-যজ্ঞে আপনাদের উপস্থিতিতে সত্যই আমি আনন্দে অভিভূত ও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে—কিন্তু আশার সীমা নাই; আশা চায় বিশ্বকে গ্রাস করিতে, জগৎকে করতলগত করিতে। আমিও সেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমার আনন্দ—আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একদিন বিশ্ব জয় করিবে—করিবেই করিবে। কেন এমন আশা, তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমার পিতৃদেবের জীবন-ব্যাপী আশা ও চেষ্টা এত দিনে সফল হইতে চলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে—আমাদের বাঙ্গালার বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের আর অনুবাদ করিয়া মাকে ডাকিতে হইবে না, মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে স্বীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে কিন্তু ইহাতে আনন্দ যতটা, চিন্তা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক। শুধু ম্যাট্রিকুলেশনে ইহার পরিসমাপ্তি নয়, হওয়া উচিতও নহে। এমন দিন আসিবে—আমাদের জীবদ্দশাতেই আসিবে—যখন ক্রমে অন্যান্য উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষা-পদ্ধতিতেও বঙ্গভাষাকে আপন সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব। কিন্তু, বন্ধুগণ, কোথায় সে রাজ-সিংহাসন? কোথায় সেই সিংহাসনের বিশ্বকর্ম্মার দল? এক জনের কাজ নহে, অসংখ্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন। সে রাজ-সিংহাসন গঠনে বহু শিল্পীর আবশ্যক। আমি আজ তাঁহাদের সাদরে ও সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এখন গ্রন্থের প্রয়োজন। মনস্বী সাহিত্য-সেবীদিগকে এখন অন্যদিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। শুধু পরীক্ষার নিমিত্ত নহে, বিশ্বের শিক্ষনীয় সকল

বিষয়েই নানাবিধ পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে. হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থের অভাব আমরা বোধ করি। সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ-যোগ্য নানা বিষয়-সম্ভারে বঙ্গভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক না থাকিলে শুধু শিক্ষার নিয়ম-পুস্তকে বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিয়া রাখিলে ভাষার উন্নতি-সাধন হইবে না।

ইউরোপীয় ভাষায় যেমন আছে—ইংরাজিতে যেমন Every Man's Library Series অথবা Benn's Series আছে—সেইরূপ বঙ্গভাষাতেও নানারূপ সুলভ 'সিরিজ' পুস্তক-প্রণয়নের সময় আসিয়াছে। যাঁহার যতটা ক্ষুধা, তাঁহাকে তদনুসারে খাদ্য জোগাইতে হইবে। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে মাতৃ-মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বের দরবারে শুধু কবিতার বা প্রণয়-গীতিকার অথবা উপন্যাস ও গল্পলহরীর অলঙ্কারে মাকে সাজাইলে চলিবে না। জননী ভারতীর একটি বিশেষণ ঋষিরা দিয়াছিলেন, 'সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা' — একথা ভুলিলে চলিবে কেন? সর্ব্ববিধ আভরণে—ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্যের অলঙ্কারে মাকে সাজাইতে হইবে। সাজাইয়া তুলিবার দৃঢ়-সঙ্কল্পে হৃদয়-মনকে বলিষ্ঠ করিয়া একাগ্রমনে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার পিতৃদেব বলিতেন—"সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না—মানুষ ত' কোন্ ছার।" সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পুনর্গঠন-কার্য্য দুষ্কর বা অসাধ্য ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর নিকট দুষ্কর বা অসাধ্য বলিয়া কোন কাজ কোন দিন পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—বঙ্গের সাহিত্যিকবৃন্দ, বাঙ্গালার তরুণ-প্রবীণ লেখকবৃন্দ, কিছু দিনের জন্য বঙ্গের সারস্বত-সৌধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হউন। শুধু সুকোমল কুসুমাস্তৃত নিষ্কণ্টক পথ ধরিলে চলিবে না, এখন আমাদিগকে কিছু কাল মায়ের সেবার জন্য কঠিন, বন্ধুর, দুর্গম পথে বিচরণ করিতে হইবে। শুধু ভিত্তি, শুধু ছাদ বা শুধু সোপানে সৌধ হয় না—এই সকলের সমবায়ে সৌধ নির্ম্মিত হয়। সেইরূপ শুধু কবিতা, শুধু গল্প, আপাত-মধুর রসাল বিষয়ের বর্ণন বা উপন্যাসেই একটি সুসম্পন্ন সাহিত্যের সৌধ গঠিত হয় না। সর্ব্ব-বিষয়ের সমবায় আবশ্যক। আপনাদিগকে সেই দিকে অবহিত হইতে প্রার্থনা করি। আসুন, আমরা সকলে সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা করি —

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে —
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

'জলধর-সম্বর্দ্ধনা'য় পঠিত।
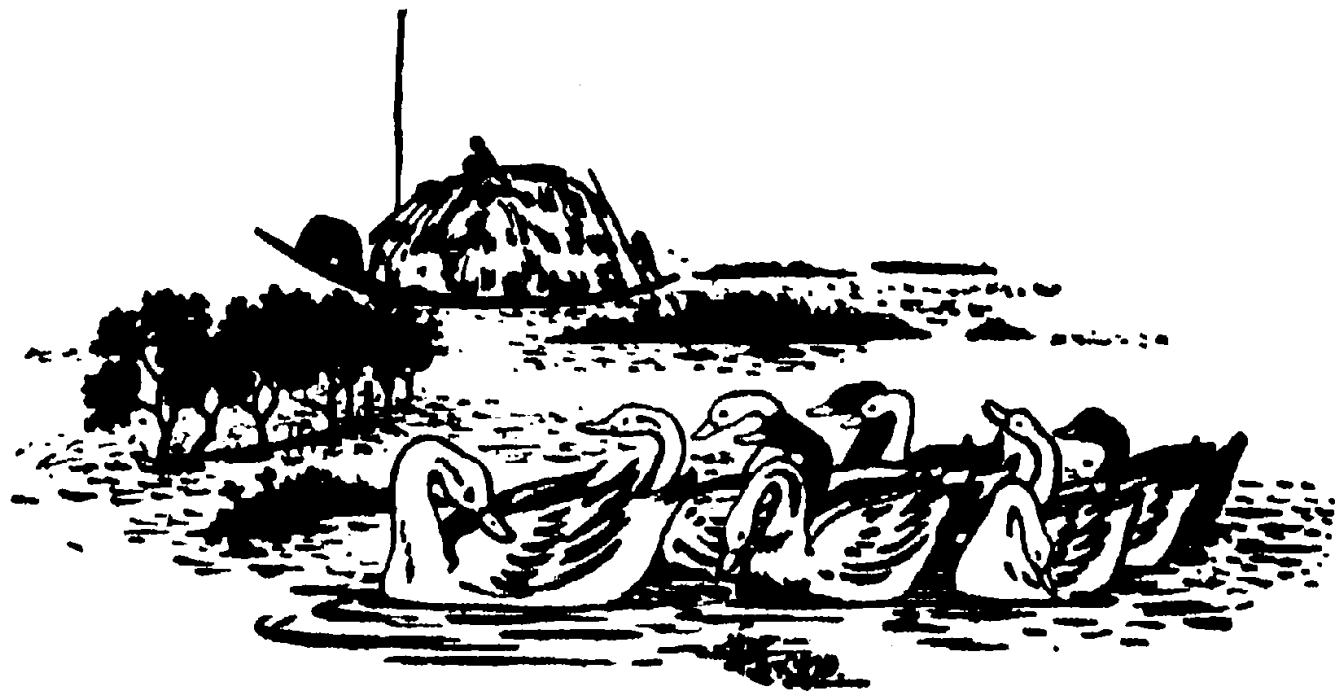
মাণিকমালা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বলার ছিল অনেক কথা, হ'ল না কিছু বলা,
খুঁজিতে পথ হারানু দিশা, বন্ধ হ'ল চলা।
আকাশ হ'তে আলোরে বৃথা' রাখিতে চাই ঘরে,
বনের মৃগ লুকায় বনে, কেমনে রাখি ধ'রে?
নয়ন-মন রঙীন করে' ইন্দ্রধনু ওঠে—
দখিনা বায় কখন হায় কনক-চাঁপা ফোটে,
কখন আসে, কখন যায়—না পাই কোনো দিশা,
শাওন-ঘন গগন-তলে জাগিয়া থাকে তৃষা।
পথের ধারে বসিয়া থাকি, আঁচল ভরা ফুল
সন্ধ্যাতারা খসিয়া পড়ে—বুঝিতে পারি ভুল!

সে দিন কথা বিনায়ে মালা গাঁথিব আশা করি'
প্রভাত হ'তে নাহি হ'তে চলিনু পথ ধরি'—
কোথায় ফোটে কুঞ্জবনে মনের কথাগুলি
স্নিগ্ধ বায় কোথায় হায় উঠিছে শাখা দুলি',
হলদে পাখী কোথায় না-কি বেঁধেছে তার বাসা,
দুপুর হ'লে—খেলার ছলে শুনিব তারই ভাষা।
তুলিতে ফুল করিব ভুল, ফুটিবে হাতে কাঁটা
চোখের জলে মিলন হ'লে ভুলিব বেদনাটা।
চয়ন-দুখ ভাগ্য-লেখা, নয়ন-সুখ ভালো,
ফুলের রঙ দেখিতে চাও, হৃদয়-ঝারি ঢালো।
পূর্ণ চাঁদ পাতুক ফাঁদ মেঘের অবসরে
লীলা-কমল উঠুক ফুটে মানস-সরোবরে।

গোপনে বীজ বপন করি' যতনে আঙিনায়
কুসুম-শোভা দেখিব ব'লে যে-জন থাকে হায়,
হয়ত কভু মনের আশা সফল করি' তার
একটি দু'টি কুসুম ফোটে—নয়ত বারেবার।

সকাল-সাঁঝে আমি যে চাহি নানান ফুলের মেলা,
ফুলের পানে চাহিয়া থাকি পড়িয়া আসে বেলা।
সন্ধ্যা হ'লে সন্ধ্যামণি, রাতের সখী হেনা
বাসর-ঘরে আমারে কভু ডাকিতে ভুলিবে না;
আমার সাথে আসিবে কেবা কথা-বলার সাথী
তেপান্তরের মাঠ পেরোতে পোহায়ে যাবে রাতি।
পথের শেষে ঘুমতী নদী, বহিয়া গেছে বামে,
সাত-মহলা রঙমহলের সোপান সেথা নামে।
রাজ-কন্যা নাইতে নামেন—সঙ্গে অনেক সখী,
তেপান্তরে ডাকছে চখা—ঘুমতী তীরে চখী।
কুচ-বরণ রাজকন্যার মেঘ-বরণ কেশ
ঝিঁঝির সুরে সাপ-খেলান বাঁশীর সুরাবেশ।
মেঘ-ডমুরী শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ে ভুঁয়ে
কমল ফোটে কঠিন শিলায় কোমল চরণ ছুঁয়ে।
তরুলতায় রঙ ধ'রে যায় ডাইনে বামে তার
ততক্ষণে ঘুমতী নদী একলা হ'লাম পার।

রাজকন্যা অবাক হ'য়ে মুখ চেয়ে কি ভাবে
মিষ্টি হেসে শুধায়—"হ্যাঁ গা, কোথায় তুমি যাবে?"
আমি বলি,—"অ—নে—ক দূরে;—আসল কথা বলি'
মনের কথায় ফুল ফোটাতে একলা পথে চলি।
কুঁড়ির মাঝে মৌন রহে—কত গোপন কথা,
হাওয়ায় চলে কানাকানি, সেই ত' ফুলের ব্যথা।
গন্ধ-মধুর কদর রেখে, আদর করে' ফুলে
হে রাজবালা, গাঁথ্‌বে মালা, আপন হাতে তুলে?"
রাজবালা কয়—"কথার মত কইতে পারে কথা—
মানুষ হয়ে বুঝতে পারে ফুলের ব্যাকুলতা,
জানে কুঁড়ির চঞ্চলতা, বোঝে ফুলের হাসি
এমন যে-জন তার দরশন নিত্য অভিলাষী।"

রাজ-কন্যা শিলাসনে, কমলাফুলের দল
অন্যমনে কাটেন নখে, নয়ন ছলছল,
কি যেন তার হারিয়েছিল—সাবেক কালের কথা,
আজকে হঠাৎ পড়ল মনে, কোথায় কিসের ব্যথা!
কি যেন সে কুড়িয়ে পেল' তেপান্তরের মাঠে
খেলতে এসে হারিয়ে গেল—ঘুমতী নদীর ঘাটে।
হঠাৎ শুনে আমার কথা, চমক ভেঙ্গে চায়,
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয়-রতন কুড়িয়ে বুঝি পায়!

রাজার বালা মাণিকমালা, হাতের রতনচুর
কণ্ঠশোভা রত্নমালা করলে না-মঞ্জুর।
সখীর হাতের ফুল-গহনায় সাজিয়ে দেহলতা,
সঞ্চারিণী পল্লবিণী, কইলে আবার কথা,—

"আমি রাজার ফুলগরবী, ফুলসোহাগী মেয়ে—
কুঞ্জবনে আপন মনে বেড়াই নেচে গেয়ে।"

ফুলের ব্যথা গোপন ছিল কুঁড়ির মাঝে কবে,
ভেবেই আকুল সুগন্ধ ধন কে-ই বা তাহার ল'বে,
কখন বা তা'র দল ঝ'রে যায় তাইত ফোটাফুল
গোপন সুখে রঙীন হয়েও শঙ্কা-সমাকুল।
ফোটার সময় কখন আসে, কখন চ'লে যায়,
স্বপন দেখে মাণিকমালা ফুলের বেদনায়।
রাজার বালা ফুল বাগিচায় ফুলের ফসল তোলে
জানে না সে দখিন হাওয়া কখন কুঁড়ি খোলে,
মাণিকমালার গলায় দোলে তাজা ফুলের মালা
স্বপন কখন সত্য হ'ল জানে না রাজবালা।

উড-কাট] পুষ্প [শিল্পী — শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায়

নারীর মন
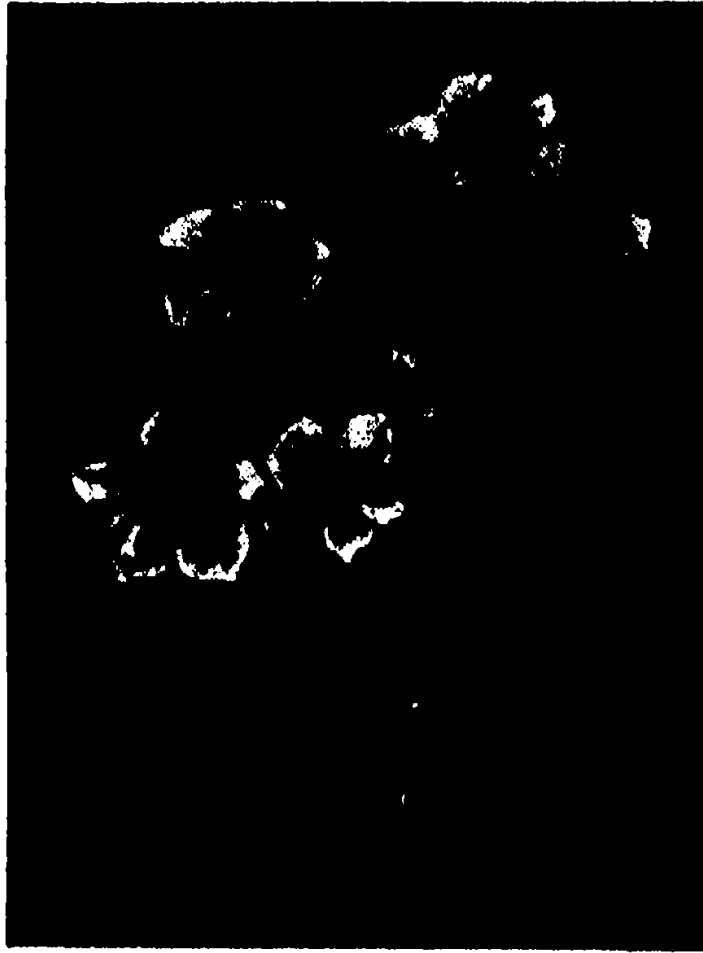
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক একটি প্রয়োজনীয় মোকর্দ্দমার কারণে হরিশকে সহরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, প্রতিভা আসিয়াছে।

বিবাহের সময় ক্ষণিকের ত্রস্ত-দৃষ্টিটায় সে একটুখানি যাহা পাইয়াছিল তাহা স্বপ্নের মত, এখন চাহিয়া দেখিল প্রতিভার দেহের উপর দিয়া যেন রূপের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। ডাগর চক্ষুদু'টি যখন ভাবাবেশে মুদিত থাকে তখন উৎকণ্ঠার আর সীমা থাকে না। যখন খুলিয়া যায়, মনে হয় সকলই মিলিল। মিলিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। এ ছাড়া পিতার পরিচর্য্যার স্থলে প্রতিভার কর্ম্মকুশল হাত-দু'খানি যেন মধুর ছন্দে লীলা করিয়া চলিয়াছে। হরিশ শ্রদ্ধার চক্ষে এই সকল লক্ষ্য করিতেছিল আর সঙ্গ-লাভের লালসায় জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছিল।

কমলকৃষ্ণ নিজে জানিতেন, ডাক্তারও বলিয়া গেল, ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষার গুণেই তাঁহার দেহের পীড়া সহসা তাড়ান সম্ভব হইল। আজ তিন দিন তাঁহার বেশ ভালই যাইতেছে। জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গও দেখা যায় না। প্রতিভার এখন আর সে ঘরে বসিয়া বসিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার প্রয়োজন নাই। বিমলাকে দিয়া নিস্তারিণী হরিশের ঘরে পুত্রবধূর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রতিভা আহত হইল। এই সেবার কার্য্যে সে বেশ আনন্দ পাইতেছিল। মনে করিল, হয়ত রাত্রির বেলা সময়মত ঔষধ পড়িবে না। হয়ত যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হইবে শাশুড়ী তখন ঘুমাইয়া পড়িবেন। কিন্তু সে নূতন মানুষ, লজ্জায় কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

মাতার অনুমতিক্রমে বিমলা ইহাদের ঘরটি সাজাইয়া-গুছাইয়া শয্যা-রচনা করিয়া রাখিয়া আসিল।

আজ আবার অনেকদিন পরে যুগ্ম-শয্যার উপর যাইয়া উঠিয়া বসিতে হরিশের সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী লতিকার ছড়িয়ে-পড়া এলোচুলগুলির কথা মনে পড়িল। হরিশ তুলনা করিয়া দেখিত, জুড়ী মিলিত না। আজ আবার সে সকল কথাই ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রতিভার খাওয়া শেষ হইলে বিমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। এ ঘরে সে এই প্রথম পা দিল। শ্বশুরের রোগের জন্যে সময় এত অল্প ছিল যে, সকল ঘরগুলির সহিত তখনও পর্য্যন্ত সে পরিচয় করিয়া লইতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, টেবিলের উপর আলোটি প্রদীপ্তভাবে জ্বলিতেছে। স্বামী শুইয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রা যান নাই। দ্বারের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া এক একবার চমকাইয়া উঠিতেছেন। শয্যার দিকে আগাইয়া যাইতে তাহার লজ্জা হইল।

দেওয়ালে অনেকগুলি সুবৃহৎ তৈল-চিত্র টাঙান ছিল। সে কৌতূহলবশে পায়-পায় সরিয়া একে একে সেইগুলি দেখিতে লাগিল। নিস্তারিণীর চিত্রটির কাছে আসিয়া থামিয়া যাইতে, হরিশ শয্যা হইতে নামিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এঁদের সকলকে চিনতে পারছ প্রতিভা?"

প্রতিভা সলজ্জমুখে নিম্নস্বরে কহিল, "এখানা চিনেছি, মায়ের চেহারা। এ চেহারা এখন আর নাই। স্বাস্থ্য অনেক খারাপ হয়ে পড়েছে।"

তারপর আর একটু সরিয়া গিয়া আর একখানা চিত্রের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এখানাও চিনেছি—কিন্তু চিনতে পারা যায় না। আহা! রোগে প'ড়ে বাবার কি শরীরই হয়েছে!"

হরিশ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। বলিল, "আমার বিয়ের সময় সেই যে টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে এলাম, মনে পড়ে? সেই রোগেই ওঁকে জখম করেছে। এখন আর দু'টি দিন ভাল যায় না।"

প্রতিভা কহিল, "কিন্তু দেহে তেজের উচ্ছ্বাস বেশ আছে। বিশ্রাম আর খাওয়া-দাওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে পারলেই ওঁর স্বাস্থ্য আবার ফিরে আস্‌বে।"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এবার গজ-কাঠির মাপে প'ড়ে গেছেন — কিছু কমতিও নেই, বাড়তিও নেই — এবার যদি সেরে উঠ্‌তে পারেন।"

প্রতিভা লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

তারপর ঘুরিয়া গিয়া অন্য দেওয়ালে বিমলার ছবিখানাও চিনিল। বিমলার স্বামীর খানা এবং আরও কয়েকখানা চিনাইয়া লইল। পরিশেষে একখানা যুক্ত-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চক্ষু দু'টি অপলক হইয়া গেল। ইহার একটি হরিশের— অপরটি এক অপরিচিতার। হরিশ দাঁড়াইয়া — আর তাহার পদপ্রান্তে এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নারী হাঁটু গাড়িয়া যুক্ত করে বসিয়া—রূপে, রেখায়, ছন্দে দু'টি হৃদয় যেন এক করিতেছে। সে শঙ্কিতভাবে আঙুল উচাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব এ-খানা। উভয়ের মধ্যে আজ পারাপারের ব্যবধান। পরিবর্ত্তন অনেকই ঘটিয়াছে। কিন্তু সে-দিনের সেই বসিবার ভঙ্গীটি — প্রীতি-শ্রদ্ধা ঢালিবার হেলিয়া-পড়া মনটি— প্রাণে প্রাণে নিঃশ্বসিত হইবার অন্তরতম প্রার্থনাটি— প্রতিবিম্বে ঠিকমতই বিধৃত হইয়া আছে। তাহার আর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন আবার অপর এক অনুসন্ধিৎসু নারীর সম্মুখেও সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়া ঠিক সে সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াই রহিল। চোখে, মুখে অন্তরের ঠিক সেই উদ্বেলিত আবেদনই জাগ্রত করিয়া রাখিল—

"তুমি আমি এক দোঁহে
নিখিল বিশ্বেতে আজ
মিথ্যা আর সবি।"

জীবন উৎসর্গ করিবার ইহার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপটি প্রতিভার বেশ ভাল লাগিল। সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কে ইনি, বললে না ত'?"

হরিশ এবার কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "উনি সম্পর্কে তোমার দিদি হ'ন।"

"বয়স ত' খুবই কম। দিব্য শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষটি। চেহারা দেখেই বুঝেছি, অন্তরে কোন গুণেরই অভাব নেই—সৌভাগ্যেরও সীমা নেই ওঁর।"

বাস্তবিকই চিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে সে এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, আলেখ্যখানা যে আত্ম-নিবেদনের ছবি, সে বিস্মৃত হইল। বলিল, "মুখখানা দেখলে মনে হয় অত্যন্ত সহজ মানুষ, মনে কোন খুঁৎই নেই। স্বামীর কাছে থাকেন বুঝি?"

হরিশ কথা বলিল না।

প্রতিভা বলিল, "এ যাত্রা আমার বেশী দিন থাকা হবে না। অম্বলের অসুখের জন্য বাবা সেই যে এক সাধুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গেলেন, এ পর্য্যন্ত কোন খবরই দিলেন না। এবার শুনা যাচ্ছে হিমালয়ের সন্নিকটে না-কি সাধুর সেই আশ্রম। দাদাকে ত' ব'লে এসেছি, নিজেই চলে যেতে। আমি না গেলে কি তাঁর উব্‌যুগ হবে?"

হরিশ এ সংবাদ জানিত। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রতিভা বলিয়া চলিল, "বাবার জন্যে মনে আদৌ শান্তি পাই না। মায়ের অভাব তিনি কোনদিন আমাদের জানতে দেন নি। তারপর বিয়ে না হ'তে

মের কপালটি গেল পুড়ে, এখন বাড়ীতে থাকাই য়!" তারপর তৈল-চিত্রটির দিকে দৃষ্টি দিয়া সে হিল, "এখানে থাকৃতে থাকৃতে একবার আনাও না কে। কি শান্ত আর সরল চক্ষু দু'টি! আমার খ্তে ভারি ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

মিনিট দু'য়েক বিষণ্ণমুখে হরিশ যেন তন্দ্রামগ্ন হইয়া হল। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "উনি এখন আনা-নেওয়ার বাহিরে। শুধু পটখানায় আমাদের কাছে সর্ব্বস্ব হয়ে আছেন।"

এ বন্ধন-মুক্তির সংবাদে প্রতিভা কেমন হতাশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে মাটির উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বারম্বার মাথা নোওয়াইয়া এই ধ্যান-মগ্না কিশোরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিশ তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিতে গেল।

ঊর্দ্ধস্থ ছবিখানার দিকে আর একবার মুখ তুলিয়া চাহিতে, এবার কিন্তু প্রতিভার দৃষ্টি হরিশের দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটির দিকে সহসা খুলিয়া গেল। বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে সে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। বলিল, "তোমারই ওঁ পায়ের নীচে ব'সে—" আর কিছু মুখের বাহির হইল না। ওষ্ঠ দু'খানা নড়িয়া উঠিল মাত্র।

হরিশ বলিল, "পায়ের নীচে এ ভাবে আর কে ব'সে থাকতে পারে, প্রতিভা? তুমি কি এখানে এসেও কিছু শোন নি?"

প্রতিভা এবার বেশ সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন টলমল করিয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

হরিশ হতবুদ্ধি হইয়া ব্যস্তভাবে তাহার কম্পিত দেহ বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া ফেলিল। ক্ষণিকের মধ্যে মনে কত প্রশ্নই জাগিল। মুখে শুধু বলিল — "এত কাঁপছ কেন, প্রতিভা?"

"জগতে দুঃখ আছে — দ্বন্দ্ব আছে; গ্রহ-নক্ষত্রের খেলাও আছে—কিন্তু তাহা যে এমন আকস্মিক আর এমন অচিন্তিত, প্রতিভার জানা ছিল না। আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সে বিরক্তির স্বরে কহিল, "আমাকে ছুঁয়ো না তুমি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যে ঘটিয়া গেল, হরিশ বিস্মিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রতিভা এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আর এমন শিষ্ট-শান্ত বিবেচক মেয়েটি কেন যে এমন করিতেছে, ইহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হরিশের প্রাণ উড়িয়া গেল।

প্রতিভা দেখিল, যেখানকার ভূমি আশ্রয় করিয়া ধরিতে তাহার ভ্রাতা রমেশ বেশ গুছাইয়া পাঠাইয়া দিল, সে স্থানে অপর এক নারীর অধিকার বিস্তীর্ণ। যে দাবী লইয়া সে উপস্থিত হইল, তাহা ধ্রুব নয়—সত্য নয়। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মাথা উন্নত করিয়া আর একবার ছবিখানার দিকে সে চাহিল। দেখিল, চক্ষু দু'টি তেমনই স্নিগ্ধ—অন্তরটি তেমনই প্রার্থনারত। যুগ যুগ ধরিয়া এই মহা খেলা-ঘরে অভেদাত্মরূপে খেলিয়া যাইবারই প্রার্থনা। ইহাকে নিরাশ করিবার দাবী উঠাইতে গেলে সমস্ত যুক্তিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

কিন্তু একটু আগে সে যেন শুনিয়াছে, ইনি এখন অদৃশ্য কোন্ জগতের। তা তিনি যে জগতেরই হউন না কেন, ছবিটি দেখিলে কে বলিবে ইহা শরীরী নয়? কে বলিবে ইহার প্রতি শিরাটিতে রক্তের স্রোত প্রবহমান নাই? এত রঙ, এত রূপ, এত রস যাহাকে আশ্রয় করিয়া ধরিয়া আছে, তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, কে ভাবিতে পারে? ঘৃণাভরে হরিশের দিকে ঘাড় ফিরাইতে তাহার বেদনাতুর চক্ষু দু'টি সম্মুখবর্ত্তী খাটের উপর গিয়া পড়িল। দেখিল, পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর দুই প্রস্থ বালিস। ফুলদানীতে দুই পার্শ্বে দু'টি ফুলের তোড়া। আতর-গোলাপের মৃদু গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। সম্মুখের ওই প্রার্থনারত পতিপ্রাণা নারীর কেশের কত সুগন্ধি—চোখের কত

প্রেমাশ্রু— মান-অভিমানের কত কি নিদর্শন শয্যার প্রতি অঙ্গে বোধ করি এ পর্য্যন্ত জড়াইয়া আছে। সেই শয্যার উপরে আর ওই দুই উৎকণ্ঠিত চক্ষুর সম্মুখে নির্দ্দয় পুরুষটি অপর এক নারীর সঙ্গে আজ আবার না-জানি কত কি বিচিত্র অভিনয়ই করিবে! বোধকরি এমন একদিন গিয়াছে যেদিন সত্যই এই মানুষটি এই শয্যারই উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা তুলিয়া অবাধে জানাইয়া দিয়াছিল যে, এ প্রেম অপর কাহাকেও দিবার নয়, এ প্রণয় শিথিল হইবার নয়— আর ইহার কিশোর-চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ আবার অপর এক নারীর সঙ্গে সেই অভিনয়ই চলিবে। বিমলা যে তাহাকে পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিল, কানে চুণীর দু'টি দুল পরাইয়া দিল, এই বেশ আর এই মন লইয়া ঘরে ঢুকিবার প্রাক্কালে জল-স্থল, অন্তরীক্ষ কেন কাঁপিয়া উঠিল না? পৃথিবী কেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল না? আর যিনি পটখানায় যে লোকটির নিকট সর্ব্বস্ব হইয়া আছেন, এ দৃশ্যে তাঁহারও বা কেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল না? চারিদিককার এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে কেন বা তিনি এমন রসের ডুবারিরূপে আত্মস্থ হইয়া রহিলেন? কণ্ঠাগত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে হঠাৎ সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, ইহার ঋজু গতির দিকে তাকাইয়া এবং যখন আর দেখা গেল না, সেই বিরাট শূন্যতার দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া হরিশ অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্বশুরের দ্বারের নিকট যাইয়া সে দেখিল, ভিতর হইতে কবাট বন্ধ। অপর ঘরগুলিও তাই। সকলে যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। পুরী নিঃশব্দ— মৃত। শুধু সুদূরব্যাপী গাঢ় অন্ধকার জীবন পাইয়া নির্লিপ্ত বৈরাগীর মত ধ্যানস্থ। তখন পা টলিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। বুকের মধ্যে সংঘাত বাজিয়া রক্ত যেন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। দেহ রক্ষা করিবার মত একটু স্থান অবিলম্বে না মিলিলে হয়ত সে ঢলিয়া পড়িবে। অথবা গভীর সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরে কেহ যদি তাহার দিকে ছুটিয়া না আসে, হয়ত সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। সে রেলিং আশ্রয় করিয়া দূর আকাশে নক্ষত্রালোকের দিকে শুষ্ক চক্ষু দু'টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। কিন্তু এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে হাত দু'টি যুক্ত করিতে আগ্রহ হইল না। লজ্জা ও খর্ব্বতায় মাথা কেমন হেঁট হইয়া পড়িল। পরের দেওয়া দুর্গতি ও অপমানের জ্বালা এমন তীব্র যেন পঞ্জর চিরিয়া বসিতেছিল।

হরিশ যখন বাহিরে আসিল, পূর্ব্বদিকে শুকতারা জ্বলিতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিল প্রতিভা ভূতাবিষ্টের ন্যায় বারাণ্ডার রেলিং-এ ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। তাহার গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চতুর্দ্দিকের ঘন-অন্ধকারও যেন ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দু'টি মহাসমুদ্রের মত অস্থির, উদ্বেল। রক্ত-ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। সামান্য একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া এতদিনের সাগ্রহ প্রতীক্ষাকে এমন ধূলির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিতেছে, তাহার মতো শিক্ষিতা মেয়ের মনের এ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া হরিশের দুঃখ হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া মৃদুস্বরে আহ্বান করিল, "ঘরে এস, প্রতিভা! কোন্ দিক দিয়ে কে দেখে ফেলবেন, আমাকে আর লজ্জা দিও না।"

সে কথা বলিল না। ফিরিয়াও চাহিল না। সজল দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠে নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হরিশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছু রক্তমাংসের দেহ নয়, দেওয়ালের একখানা পট, তাহার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? কাগজের উপর তুলির আঁচড় সহিতে পারিতেছে না, এ কেমন মেয়ে? বাহিরের ভঙ্গীটি ত' বেশ! যেন জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম-পিপাসা ইহার বুকে! অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম-ভক্তি বণ্টন করিয়া যাওয়া ইহার

নিত্যকালের ধর্ম্ম ! ক্রোধ চাপিয়া সে আরও বারকয়েক সাধ্যসাধনা করিল। অবশেষে অপারগ হইয়া নিজের ঘরে সে ফিরিয়া চলিয়া গেল এবং দরজা খোলা রাখিয়া বালিস বুকে চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

প্রতিভার গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। কেমন অসহ্য বেদনাও বোধ হইতেছিল, কে যেন হৃদপিণ্ডটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়াছে, ছাড়িতে চাহিতেছে না। এমন একটি ব্যাপার নিরুপদ্রবে দুই পক্ষের যোগ-সংযোগে বেশ হাসিমুখেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে! পিতার প্রতি তাহার অভিমান হইল। তিনি গৃহে থাকিলে এমন হইতে পারিত না। ভ্রাতার উপর ক্রোধ জন্মিল। আর যে লোকটি ছাদনাতলায় আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মিলনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া লইবার অধিকারে রাত্রির এই ঘনান্ধকারে নিজের ঘরে আহ্বান করিয়া গেল, তাহার উপর সমস্ত চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

পিতার কাছে শিশুকাল হইতে সত্যকে সে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। কর্ণে মন্ত্র পাইয়া আসিয়াছে—স্বামী শুধু ইহকালের নয় — পরকালেরও সেই একমাত্র দেবতা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ-বন্ধন ছিন্ন হয় না। একই পতি কালে কালে তাহারা পাইয়া থাকে। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী — পবিত্র সংযোগের যে যুগ্ম-চিত্র এইমাত্র সে টাঙান দেখিয়া আসিল, সে কি তাহাতে যোগ দিয়া ইহাকে দশমিকে আকার দিবে? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সেই মুহূর্ত্তে পিতার নিকট ছুটিয়া যায়। যাইয়া জিজ্ঞাসা করে—এ-সকল মিথ্যা-সংস্কার রক্তের মধ্যে কেন গাঁথিয়া দিয়াছিলে? তুমি দেবতা — বল, আমাকে বাঁচাও।

সংসারের এ অত্যাচার, এ অভিনয়, কিছু নূতন নয় —নিত্যই চোখে পড়িতেছে, বেদনাও দিতেছে। কিন্তু নিজের জীবনে আজি তাহার এই বেদনা অতি আশ্চর্য্যরূপে সচেতন হইয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি বারাণ্ডায় বসিয়া কাটাইবার পর উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া পা টলিতে লাগিল। দেহে যেন রক্তের কণিকামাত্র নাই। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া স্খলিত দেহে সম্মার্জ্জনী লইয়া বাহিরের বারাণ্ডা-গুলি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে সে লাগিয়া পড়িল। রাত্রের ঘোর তখনও কাটে নাই।

সর্ব্বপ্রথমে নিস্তারিণী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। এই অবসরে সে তাড়াতাড়ি শ্বশুরের ঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। কমলকৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেহ সুস্থ হইলে তিনি এতক্ষণ উঠিয়া পড়িতেন। সে করিল, "রাত্রে বেশ ঘুমুতে পেরেছেন, বাবা?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, মা! বেশ ঘুম হয়েছে, কোন কষ্টই হয় নি।"

সে-ঘরটিও সে ধুইয়া মুছিয়া জিনিষপত্র গোছাল করিয়া চারিদিকে বেশ চেতনা সঞ্চার করিয়া দিল। শ্বশুরের শয্যাটি পাল্‌টাইয়া দিয়া বাসি বিছানার কতক বা কাচিয়া কতক এমনই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। তারপর তেল মাথায় দিয়া স্নান করিতে গেল।

বিমলার উঠিতে বেলা হইয়াছিল। ছেলেটির খেজমত খাটিয়া এতক্ষণে সে একবার পিতার নিকটে আসিল এবং মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া ছেলেকে লইয়া আদর করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রতিভা রান্নাঘর হইতে জল গরম করিয়া লইয়া উপরে আসিল। ঘোমটা অল্প টানা, বস্ত্রের আড়াল হইতে ভিজা চুলের আগার দিক্‌টা দেখা যাইতেছিল। হাতে জলের বাল্‌তি, বামহস্তের বাহুর উপর একখানা তোয়ালে। বিমলা তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া গেল। দেখিল, ইহার জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখে জটিল বেদনার চিহ্ন। মুখের সে নিত্যকার হাসি ফুটি ফুটি করিয়া যেন মধ্যপথে হারাইয়া যাইতেছে। সে বলিল, "এ কি বৌ! এক রাত্তিরে শরীর অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে, চোখের পাতায় কালি পড়েছে, এ কি চেহারা ক'রেছ?"

কমলকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন। সত্যই ত' দেহখানা অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছে! সবেমাত্র স্নান

সারিয়া আসিলেও চক্ষু দু'টি দিয়া যে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে এমন একটা স্থির বেদনার লক্ষণ ধরা পড়ে।

এ বাড়ীর সকলেই জানে গতরাত্রি স্বামীর সঙ্গে তাহার এক বিছানায় কাটিয়াছে। হয়ত জাগিয়াই কাটিয়াছে — বিমলার কথায় লজ্জায় সে মাথা হেঁট করিল।

কমলকৃষ্ণ এ সঙ্কোচ-ভাব লক্ষ্য করিলেন। আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "শরীরের আর অপরাধ কি? এসে অবধি মায়ের ত' হাত, পা, চোখের — কোনটিরই বিশ্রাম নেই।"

খাটের রেলিং-এর গায়ে একটি বালিস উঁচু করিয়া দিয়া প্রতিভা বলিল—"জল জুড়িয়ে গেল, বালিসটায় একটু ঠেস দিয়ে বসতে পারবেন, বাবা? গা'টা পুঁছে দিতাম।"

কিন্তু ইহার মুখখানা গতকালও ত' এমন শুষ্ক, এমন ব্যথায় ভরা ছিল না। তাঁহার এই শুশ্রূষা ছাড়া কি অপর আরও একটি ক্লান্তির দিক্ আছে, যে পথে দেহের রক্ত-মাংস অতি শীঘ্র এবং গোপনে এমন জল হইয়া চলিতেছে? সংশয়ে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বালিস ঠেস দিয়া বসিলেন। গরম জলে তোয়ালে ডুবাইয়া নিঙড়াইয়া প্রতিভা তাঁহার গা-হাত-পা, বেশ করিয়া মুছাইয়া দিল এবং বস্ত্র ত্যাগ করিতে একখানা কাপড় কোঁচাইয়া হাতের কাছে ধরিয়া দিল। কমলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সেবার ব্যবস্থা কি করেছ, সাবু?"

প্রতিভা অল্প হাসিয়া কহিল, "ডাক্তার এখনি আসবেন। দেখা যাক্, কি বলেন।"

ডাক্তার আসিয়া দুধ-পাঁউরুটির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রতিভা অধিকন্তু তাহাতে কিস্‌মিস্ ছড়াইয়া দিয়া পথ্য করাইল। উচ্ছিষ্ট থালা-বাটি লইয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, হরিশ জামা-জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল। বাসন ক'খানা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিয়া এই অবসরে সে একবার তাহার ঘরে ঢুকিল এবং সেই চিত্রটির সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কিছুই বদ্‌লায় নাই। বসিবার সেই সে ভঙ্গী—অপরের পাদমূলে বাঁচিয়া থাকিবার সেই সে প্রার্থনা! কি সংশয়হীন নির্ভরতা! বলিল, ধন্য তুমি দিদি! প্রার্থনা করি তোমার এ সাধনা সার্থক হউক! কিন্তু নিজের দেহ-মন, বিবেক-বুদ্ধি, জন্ম-জন্মান্তরের স্থিতিতে অপরের সঙ্গে একীভূত করিয়া দিবার যে একমাত্র সত্যকথা—প্রত্যেক নারীই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া শেষ-বিদায় লইতেছে, তাহা কি সামান্য? যদি সামান্যই হয়, যেরূপ দূরে তুমি সরিয়া গিয়াছ মন-প্রাণও সেইরূপ সরাইয়া লও। কি লুব্ধ আশ্বাসে আর পায়ের তলায় বসিয়া কাটাইবে? হাত খুলিয়া লও, তোমার শান্তি আসুক! ইহকাল-পরকাল জড়াইয়া এই রহস্যময় মায়ার অনন্ত কৌতুকে ধ্যানস্থ ইন্দ্রিয়সকল একাগ্র করিয়া রাখিয়াছ, তাই শুনিতে পাও নাই বিসর্জ্জনের করুণ-রাগিনী কোন্ সময় কানের কাছে বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যদি তুমি এমনি যুক্ত-করে ইঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া অমূল্য সময় অযথা কাটাইয়া দাও, তোমার অমর্য্যাদা হইবে।

সে ভূমিতলে মাথা নত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল—আমার অপরাধ নিও না, ভাই! নিজের স্বার্থের জন্য এ কথা বলি নাই। সংসারে নারীর যাহা অমূল্য সম্পদ — সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিত্ত তোমার কাড়িয়া লইব না। নারী আমি—নারীর মনের খবর আমি ত' বুঝি? অন্তর্য্যামীর উপরে যাঁহাকে আসন দিয়াছ—যাঁহার প্রাণের যোগ লইয়া চোখের পলক হারাইয়াছ — সেই সত্য যিনি এড়াইয়া চলিলেন, তোমার পবিত্র মূর্ত্তি দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়া অপমান করিবার কি অধিকার তাঁহার আছে! দিদি! ভগবান তোমাকে নিরাপদ করুন—নির্বিঘ্ন করুন। তোমার পবিত্র শয্যাটির উপর আমি জানিয়া-শুনিয়া লোভ করি নাই—তোমার নির্জ্জন আলয়ে আমি জানিয়া-শুনিয়া প্রবেশ করি নাই। আমাকে ক্ষমা কর।

সে পুনর্ব্বার ইহার পদ-প্রান্তে মাথা নত করিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া বিমলা কিন্তু একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া এ সকল দেখিতেছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "অত মাথা কুট্‌ছ কার পায়ে? আমাদের রাধা-গোবিন্দের পায়েও ত' অমন ক'রে মাথা ঠুক্‌তে কাকেও দেখি না! তুলির আঁচড় দেখেই ভুলে গেলে? আচ্ছা সতীন-ভক্ত মেয়ে ত' তুমি?"

প্রতিভা লজ্জায় ঘাড় নত করিল। বলিল, "সত্যি দিদি! ওঁর পায়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া ওঁর কাছে একটা গুরুতর অপরাধও আমার আছে।"

শেষের কথাটি বলিয়া ফেলিয়া সে কিছু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং কি দিয়া ইহাকে আড়াল করিবে, ভাবিতে লাগিল।

বিমলার কিন্তু সুর বদলাইয়া গেল। সে বলিল, "আমি সকালবেলা তু'জনার চোখ-মুখের কালি দেখে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। সকল ছেড়ে সুদূর স্বর্গে যে চ'লে গেল, তার সম্বন্ধে আর কথা কি! সতীন এমনি জিনিষ বটে! কিন্তু ওই মানুষটিকে যদি জীবন্ত কাছে পেতে, পাশাপাশি কাজ-কর্ম্ম ক'রে যেতেও আটকাত না। কি বৌ যে গেছে আমাদের, সাতখানা গাঁ খুজলেও অমনটি আর মিলবে না। এত শীঘ্র চলে যাবে জানতে পেরেই বোধ করি সমস্ত বাড়ীটায় সে আপনাকে এমন ক'রে ছড়িয়ে রেখে গেছে।"

এই বলিয়া সে হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া মৃতা বধূটির হাতের নিদর্শন ঘরে ঘরে দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙান কার্পেটের উপর কত রকমের লেখা। একটির উপর প্রতিভার মন আকৃষ্ট হইল। লেখা ছিল—

"ত্বং জীবিতং, ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

প্রতিভা ভাবিল—ইহাই তাঁহার অন্তরের কথা। সমস্ত নারী-জাতির মনের কথাই এই।

বিমলা তারপর দেখাইল, কার্পেটের উপর অঙ্কিত কত রকমের পাখী, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। তারপর দেখাইল, পুঁতির ঝাঁপি, পুঁতির বাক্স, পুঁতির কলম-দানি, কড়ির খেলনা। ভেলভেটের বরাসন, ভেলভেটের তাকিয়া—কত কারুকার্য্য তাতে খচিত রয়েছে। মাটির ছাঁচ, বাক্সের ঘেরাটোব, বালিসের ওয়াড়, ঝালর, আরও কত কি—যাহা চোখে পড়িতেছিল, দেখাইয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল দেখান শেষ হইলে তাহারা আবার পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল। বিমলা বলিল, "হতভাগী চ'লে গেল! বেঁচে থাক্‌লে হয়ত তোমার আসার কোন প্রয়োজনই হ'ত না। যদি বা আসতে—চোখের কোণে এমন কালি পড়্‌ত না।"

প্রতিভার বুকে স্বভাবতঃ একটা আঘাত লাগিতে পারিত। কিন্তু তাহার এই অভিশপ্ত বিফল জীবনটি অতঃপর যে কতজনের চক্ষে, কত রকমে দেখা দিবে তাহার বোধকরি সীমা-পরিসীমা নাই। তাই সে উপেক্ষা করিয়া গেল। বিমলার ছেলে পঙ্কু দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, খোকনকে জিজ্ঞাসা করি, ওর মনেত কোনও পাপ নেই। বলত খোকনমণি! এক দিনের ঈর্ষ্যায় কি চোখের পাতায় কালি পড়ে?"

পঙ্কু বলিল, "মা আমাকে কাজল পরিয়ে দেয় নি।"

"তা দেবেন কেন? ছেলের আদর-যত্ন করতে তোমার মা কতই জানেন! চল, আমি তোমাকে কাজল পরিয়ে দোব।"

পঙ্কুকে ক্রোড়ে লইয়া সে বিমলার ঘরে চলিয়া গেল এবং গামছা দিয়া হাত-পা মুছাইয়া কাজল পরাইতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

জর্জ্জ বার্ণাড শ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একদা একটি অভিনয়ের আসরে বার্ণাড শ-কে বক্তৃতা দিতে বলা হয়। অনুরোধ অনুসারে যবনিকার পরদা সরিয়ে তিনি দর্শকদের সুমুখে উপস্থিত হ'তেই সমগ্র জনতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো। কয়েক মিনিট পরে কলরোল শেষ হ'লে সহসা শোনা গেল পিছনের গ্যালারি থেকে একটি দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে, মুখের অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে, বার্ণাড শ-কে বিদ্রূপ করছে!

জনতা ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু বার্ণাড শ নির্ব্বিকার। মৃদু হেসে তাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন— My friend! I quite agree with you; but what are we two against so many?

এমনি ধরণের সরস ও সপ্রতিভ উক্তির জন্য বার্ণাড শ পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। শুধু সরস উক্তিই নয়, মাঝে মাঝে তিনি আচম্বিতে এমন কঠিন কথা বলেন, যা নিয়ে সারা জগতে রীতিমতো আন্দোলন প'ড়ে যায় — Every man above forty is a scoundrel —তাঁর এই কথাটি নিয়ে বহুদিন পৃথিবীময় তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। এমনি ধরণের আরও অনেক বচনই তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছে।

একবার এক সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা নটী তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"যদি আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'ত, তা'হলে আমার দেহ-সৌষ্ঠব এবং আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে যে ছেলে জন্মাতো সে হ'ত পৃথিবীর আদর্শ।"

উত্তরে বার্ণাড শ লিখেছিলেন—"কিন্তু তা তো না-ও হ'তে পারতো! সে-ছেলে যদি আমার দৈহিক সৌষ্ঠব এবং তোমার মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাতো, তা'হলে সে কি হ'ত?

রূঢ় সত্যভাষণে এবং প্রচলিত সমাজ-বিধির ক্ষমাহীন সমালোচনায় জর্জ্জ বার্ণাড শ-র লেখনী বা জিহ্বা কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি।

অনেকের ধারণা বার্ণাড শ পুরোপুরি আইরীশ, তা নয়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ স্কট্‌ল্যাণ্ডে বাস করতেন। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে তাঁরা আয়ারল্যাণ্ডে গমন করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ জুলাই ডাব্‌লিন শহরে বার্ণাড শ ভূমিষ্ঠ হ'ন।

তিনি তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যারপরনাই অলস ও অপদার্থ (তাঁর নিজের কথা)। পনেরো বছর বয়সে তাঁকে এক অফিসে কেরাণীর কাজে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়; কিন্তু সে কাজে তিনি মোটেই মনোযোগ অর্পণ করতেন না। তাঁর দিনমানের বেশীর ভাগ সময় তখন ডাব্‌লিন্ জাতীয় চিত্রাগার কিম্বা সাধারণ গ্রন্থালয়ে অতিবাহিত হ'ত। তখন তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—"কেমন ক'রে আমি মিকালেঞ্জেলোর মতো ছবি আঁকতে পারবো।"

পাঁচ বছর পরে তিনি লণ্ডনে তাঁর মায়ের কাছে চ'লে আসেন। শিল্পে ও সঙ্গীতে তাঁর মা ছিলেন একজন মনস্বিনী মহিলা; বার্ণাড শ বলেন যে, তাঁর মায়ের কাছ থেকেই তিনি শিল্প-জ্ঞান এবং মানসিক শক্তি লাভ করেছেন।

লণ্ডনে এসে তিনি লিখতে সুরু করলেন। কুড়ি বছর মাত্র বয়স, মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে (তখন থেকেই তিনি স্থির করেছিলেন যে, গণ্ডদেশে তিনি কখনো ক্ষুর চালনা করবেন না), অপরিচিত, অনভিজ্ঞ এবং জীবন-সম্বন্ধে নিরতিশয় কৌতূহলী

লেখক তখন থেকেই প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, প্রায় সকল বিষয়েই চলিত মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই; কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হলেন না, সদম্ভে বিশ্বাস করলেন, তাঁর মতই সত্য, অন্য সকলে ভ্রান্ত।

এতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বোধ করি আর কোন সাহিত্যিকই তাঁর লেখক-জীবন আরম্ভ করেন নি। বার্ণাড শ-র বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর মধ্যে প্রতিভার দীপ্তি আছে, সাধারণের অনেক উর্দ্ধে তিনি, এবং সে-কথা, আজ না হোক, দু'দিন পরে পৃথিবীর লোক নিশ্চয় উপলব্ধি করবে।

নাট্যকার বার্ণাড শ-কে জানতে হ'লে তার আগে সংস্কারক বার্ণাড শ-কে জানা দরকার; কারণ, সংস্কারকের ভিতর দিয়েই নাট্যকার বিকাশ লাভ করেছে। অনেকের মতে, বার্ণাড শ প্রথমে প্রচারক, পরে নাট্যকার,—কথাটি ভিত্তিহীন নয়।

ইতিমধ্যে কয়েক বছরে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছিলেন কিন্তু কোন প্রকাশকই তাদের প্রকাশ করতে রাজী হয় নি। ন-বছর ধ'রে লেখকের কাজ ক'রে তিনি উপার্জ্জন করেছিলেন—নব্বই টাকা! অনেকে তাঁকে লেখা-সম্বন্ধে নানা রকম অমূল্য উপদেশ দিলে, কিন্তু সে-সব কথায় কর্ণপাত না ক'রে তিনি একভাবেই তাঁর কলম চালিয়ে চললেন।

এই সময় তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এলো। 'কারিংটন ষ্ট্রীট মেমোরিয়াল হল্'-এ আমেরিকান প্রচারক হেন্‌রি জর্জ্জ বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"প্রগতি ও দারিদ্র্য"। বার্ণাড শ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটিই বোধ করি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ব-বিশিষ্ট ঘটনা; সেই দিনই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর এতদিনের ঘুমন্ত "সামাজিক চেতনা" সেদিন পরিপূর্ণ-রূপে জাগ্রত হয়েছে; এতদিন তিনি শুধু নিজের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সেদিন দেখতে পেলেন মানব-সমাজের অখণ্ড রূপটি, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম প্রতিভাত হ'ল—সেই সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটি, অগণিত অনৌচিত্য।

তিনি তখন নিজে সংস্কারক ও প্রচারক হবার সঙ্কল্প করলেন; আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর অদৃষ্টে মহানগরী লণ্ডনকে শিক্ষিত করবার ভার পড়েছে; (তাঁর নিজের কথা); সুতরাং, সেই দিন থেকে তিনি প্রত্যেক সভায় যোগদান করতে লাগলেন এবং মনের ভীরু লাজুকতা সত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁর তীব্র মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

সময় সময় বক্তৃতা দিতে উঠে তাঁর পা টলতে থাকতো, বুক কাঁপতো—মনে হ'ত যেন এখুনি প'ড়ে যাবেন; বক্তৃতার কথা যেতেন ভুলে, প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুতেই মনে আসতো না। কিন্তু সে-সব সত্বেও তিনি যা বলতেন শ্রোতারা সে গুলি বিশেষ উপভোগ করত। কিছুদিনের মধ্যে, শুধু জনসভায় নয়, পথ-প্রান্তে এবং পার্কগুলির ভিতরেও তিনি শ্রোতৃবর্গের কাছে একজন পরিচিত শক্তিমান্ বক্তারূপে সমাদৃত হ'তে লাগলেন।

বক্তৃতার দ্বারা প্রচার-কার্য্যের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। একদা এক বর্ষণ-সিক্ত রবিবারের অপরাহ্ণে তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য 'হাইড পার্কে' উপস্থিত হলেন। কেউ তার বক্তৃতা শোনবার জন্য সমবেত হ'ল না, শুধু দু'জন পাহারাওয়ালা তাঁর আশে-পাশে ঘুরতে লাগলো, —তাদের প্রতি এই হুকুম ছিল যে, যদি সেই কুখ্যাত বক্তা আইনের গণ্ডি পেরিয়ে কোন কথা বলে, তা'হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ভীত বা দমিত না হ'য়ে বার্ণাড শ তাদের কাছেই বক্তৃতা সুরু ক'রে তাদের সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

এই সব বক্তৃতা তিনি দিতেন — জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে; তাঁর মতের সঙ্গে তাদের

মতের মিল না হোক, কিন্তু তারা সেই সকল মতামত নিয়ে আলোচনা করুক, তারা ভাবতে শিখুক, তাদের চৈতন্য জাগ্রত হোক্—এই ছিল বার্ণাড শ-র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যে তিনি অনেক পরিমাণে সফলকাম হয়েছিলেন।

১৮৮৪ সালে বার্ণাড শ ফেবিয়ান সমিতিতে যোগদান করেন; কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র ও চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি এই সঙ্ঘটি গঠন করেছিলেন। বার্ণাড শ এই সমিতিতে প্রবেশ ক'রে অতি শীঘ্রই তাকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। এই সমিতি থেকে প্রকাশিত বক্তৃতাবলী ও পুস্তিকাগুলি দেশের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এঁদের দ্বারা প্রচারিত কয়েকটি সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আইনের দ্বারা বলবৎ করা হয়েছিল।

জন-সাধারণের এবং সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করবার পর বার্ণাড শ উপন্যাস রচনা পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সাহিত্য-চর্চা ব্যাহত হল না,—সাংবাদিক ও সমালোচক হিসাবে তাঁর নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই সময়, তাঁর নামের প্রসার দেখে যে প্রকাশকেরা একদিন তাঁর রচনা অমনোনীত করেছিল, তারাই এসে সেগুলির জন্যে তাঁর দরজায় ধর্ণা দিতে লাগলো।

রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্ তখন খ্যাতির চরম শিখরে; তিনি বার্ণাড শ-র উপন্যাস "Cashel Byron's Profession" সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুকাবহ মত প্রকাশ করেছিলেন; অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল—

"A combination of struggling, overlaid, original talent and blooming gaseous folly ..."

পরে ষ্টিভেন্‌সন্ রীতিমতো বার্ণাড শ-র ভক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বার্ণাড শ-র সমালোচক-জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সময় হচ্ছে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ; সেই সময় Saturday Review-র পাতায় তিনি নিয়মিতভাবে তদানিন্তন-কালের কৃত্রিম, প্রাণহীন এবং অপদার্থ নাটকগুলির উপরে তাঁর বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। প্রচার করতে লাগলেন যে, ঐ-সকল হাস্যকর উদ্ভট ও অস্বাভাবিক নাটক নিয়ে আনন্দে নেচে ওঠা ইংরাজ দর্শকের পক্ষে নিরতিশয় লজ্জাকর অজ্ঞানতা; নাটকের মধ্যে ইবসেন যে বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাকে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে, এবং সেই সঙ্গে এসেছে দোষে গুণে তৈরী মানুষকে সমবেদনা-সহকারে বোঝবার দিন।

বার্ণাড শ তাঁর প্রথম নাটক রচনা করেন একা ও স্বাধীনভাবে নয় — আর একজনের সহযোগিতায়। তাঁর নাম উইলিয়াম আর্চার—তখনকারদিনের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সমালোচক।

কথা ছিল আর্চার সরবরাহ করবেন গল্পাংশ এবং শ রচনা করবেন সংলাপ। প্রথমে কাজ বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়েছিল এবং শ নাটকের দুই তিন অঙ্ক সমাপন করেছিলেন; পরে, কি কারণে জানা নেই, আর্চার আর গল্পাংশ দিয়ে শ-কে সাহায্য করতে রাজী হলেন না এবং শ-ও তাঁর অসমাপ্ত নাটক বাক্স-বন্দী ক'রে রাখলেন।

উক্ত ঘটনার সাত বছর পরে ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী বার্ণাড শ-কে একটি নূতন ধরণের নাটক লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন — ঐ থিয়েটারে, প্রচলিত সাধারণ শ্রেণীর নাটকের চেয়ে অপ্রচলিত ও অসাধারণ শ্রেণীর নাটকের চাহিদা ছিল বেশী। কাজেই বার্ণাড শ-কে তাঁরা নাট্যকার হিসাবে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করলেন এবং বার্ণাড শ-ও তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। নাটক সৃষ্টি হ'ল—Widowers' Houses!

যথাসময়ে নাটকখানি পাদ-প্রদীপের শুভ-দৃষ্টি লাভ করলে। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল সমালোচনার রোল উঠ্‌লো, বেশীর ভাগই বিরুদ্ধ সমালোচনা। অনেকেই নাটকখানি দেখে ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত হ'ল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হলেন আর্চার; তিনি দেখলেন যে, বার্ণাড শ-কে তিনি যে সুখান্তক প্রণয়-কাহিনীর গল্পাংশ যুগিয়েছিলেন সেই গল্পাংশটিই এই নাটকে বিকৃত ও বীভৎস রূপে দেখা দিয়েছে; তার মধ্যে তাঁর কল্পিত সেই সুচারু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির লেশমাত্র নেই, আছে নাগরিক-সভ্যতার আবরণহীন তীক্ষ্ণ সমালোচনা, আছে বাড়ীওয়ালীদের প্রতি কটাক্ষ—আছে বাস্তবতার তিক্ত-রুক্ষ রসে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার এক নীরস চিত্র!

সেই নাটকের পর সমালোচক ও সংস্কারক বার্ণাড শ-র লেখনী বাধা-বন্ধহীন উন্মত্ত-আবেগে ছুটে চ'লল; তাঁর কলমের সেই তীব্র হলাহল সাধারণ দর্শকরা গলাধঃকরণ করতে সক্ষম হ'ল না। কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই; আরও দু'খানি "unpleasant plays" রচিত হ'ল—The Philanderer (১৮৯৩) এবং Mrs. Warren's Profession (১৮৯৩)! শেষোক্ত নাটকখানিকে শুধু জনসাধারণ নয়, সরকার পর্য্যন্ত বরদাস্ত করলে না; সেন্‌সর কর্ত্তৃক তার অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। নিউ ইয়র্কে একদল অভিনেতৃ-সঙ্ঘ ঐ নাটকখানি অভিনয় করেছিল ব'লে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়েছিল। ১৯২৪ সালে নাটকখানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রয়েল কোর্ট থিয়েটারে Man and Superman প্রথম অভিনীত হয়; নাটকখানি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—"the most ambitious effort of Shaw during that period!" এই নাটকের প্রাণ-চঞ্চল গতি, রসাল ব্যঙ্গোক্তি এবং সর্ব্বোপরি মানব-সমাজের প্রতি নাট্যকারের সুগভীর ও সুতীব্র মতামতগুলি জনসাধারণের কাছে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। Man and Superman কিছুদিন পর্য্যন্ত সারা সভ্য-জগতে বিপুল চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল। ঐ নাটকখানিকে এখনো পর্য্যন্ত বার্ণাড শ-র "the most characteristic of his many dramas" ব'লে অভিহিত করা হয়।

একমাত্র কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবদ্দশায় কোন সাহিত্যিকই এতখানি যশ ও সম্মান লাভ করতে পারেন নি এবং জীবিতাবস্থায় অন্য কোন লেখকই বোধকরি এতখানি সমালোচনা ও আলোচনার পাত্র হ'য়ে ওঠেন নি।

প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে জগতের লোক বার্ণাড শ-র কাছ থেকে বহু প্রকারের উদ্দীপনশীল উক্তি শুনে তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরণের মতামত প্রচার করেছে। জগতের কাছে তিনি এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ ব'লে পরিচিত। তাঁর মানসিক বিশেষত্বের কথা আমরা তাঁর লেখার মধ্যে পাই; ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি নিরামিষাশী, ধূমপান-বিরোধী, মাদকদ্রব্য-স্পর্শ-দ্রোহী এবং তিনি অনেক সময়ে ট্রেণে বা বাসে ভ্রমণকালে তাঁর নাটক লিখে থাকেন। হার্ট-ফোর্ডশায়ারে তাঁর "দেশের বাড়ী"; সহরের বাস-ভবনের ঠিকানা হচ্ছে Adelphi Terrace, London। বার্ণাড শ বিবাহিত; তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি নিঃসন্তান।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বার্ণাড শ-র মতো এত বয়স পর্য্যন্ত এতখানি মানসিক সক্রিয়তা সচরাচর দেখা যায় না। আজো তাঁর লেখনী অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে, আজো নব নব ভাব এবং রস-সৃষ্টির ক্ষমতায় তাঁর শক্তি অব্যাহত ও অতুলনীয়।

বার্ণাড শ-র রচনা সম্বন্ধে একটি সমালোচনা কিছুদিন পর্য্যন্ত শোনা গিয়েছিল—মানুষকে তিনি না-কি প্রীতির চোখে দেখেন না; মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা নেই, নেই সহানুভূতির স্পর্শ। কিন্তু তাঁর Saint Joan নাটকখানি সেই সমালোচনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। "সেণ্ট জোয়ান"-এর মধ্যে তিনি যে সত্য প্রচার করেছেন, সে সত্য সীমা ও কালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়—সে সত্য শাশ্বত। মানুষের প্রতি

অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসার দীপ্তিতে "সেণ্ট জোয়ানে"র প্রতিটি ছত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

তাঁর মতের সঙ্গে অনেকেরই মিল হয় না বটে, কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভান্বিত ব্যক্তি, এ-কথা বোধ করি কেউই অমান্য করতে পারে না। তাঁর দুর্লভ রচনা-শক্তি এবং অলোকসামান্য প্রতিভা স্পর্দ্ধিত মহিমার সঙ্গেই যেন সারা বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জ্জন করেছে।

সমাজ-সাম্যবাদের অগ্র-নায়ক রূপে বার্ণাড শ তাঁর লেখনীর সাহায্যে সারা জগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলেন তিনি হচ্ছেন—Propagandist first; dramatist afterwards!

বর্ত্তমান সমাজ-সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য তীব্র এবং চিন্তা-গভীর বাণী প্রচার করেছেন এবং যে নাটকখানির মধ্যে তাঁর লেখনীর এই দিক্‌টি স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সব চেয়ে তীব্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে, সে নাটকখানির নাম—Man and Superman।

বার্ণাড শ-কে যাঁরা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে এ নাটকখানি অপরিহার্য্য।

এই নাটকখানির মধ্যে নাট্যকার এক অসাধারণ সমাজ-বিদ্রোহীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তেজের দীপ্তিতে, ভাবের অভিনবত্বে এবং বাচনের ওজস্বিতায় সে সৃষ্টি যেমন দুর্দমনীয়, তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর নাম জন ট্যানার। সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন মানে না। সে বলে, "The first duty of manhood and womanhood is a Declaration of Independence; the man, who pleads his father's authority, is no man; the woman, who pleads her mother's authority, is unfit to bear citizens to a free people..."।

জন ট্যানার বিদ্রোহী; তার লক্ষ্য ধ্বংস; "I shatter creeds and demolish idols"; তার মত হচ্ছে, "Construction cumbers the ground with institutions made by busy bodies: Destruction clears it and gives us breathing space and liberty!" কিন্তু তাই ব'লে নির্ম্মাণ এবং ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি এবং হত্যাকে যেন এক করা না হয়; জন ট্যানার সৃষ্টিকে সম্মান করে; হত্যাকে করে ঘৃণা। জন ট্যানার-কে ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে, The Revolutionist's Hand-Book and Pocket Companion নামে সে যে বইখানি লিখেছে এবং যেখানি নাটকের শেষে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেখানি পড়া দরকার। তার মধ্যে Maxims for Revolutionists ব'লে একটি অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায় থেকে কয়েকটি মতবাদ তুলে দিলাম। এদের দ্বারা ট্যানারকে কতকটা বুঝতে পারা যাবে—

The Art of Government is the Organisation of Idolatry.

A fool's brain digests philosophy into folly, science into superstition and art into pedantry. Hence University education.

The vilest abortionist is he who attempts to mould a child's character.

He who can, does. He who cannot, teaches.

Marriage is popular because it combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity.

When a man wants to murder a tiger, he calls it sport; when the tiger wants to murder him, he calls it ferocity. The distinction between Crime and Justice is no greater.

Property, said Proudhon, is theft. This is the only perfect truism that has been uttered on the subject.

Beware of the man whose God is in the skies.

কিন্তু এই বিদ্রোহী-বীর শেষ-পর্য্যন্ত রমণীর জীবনী-শক্তি এবং নারীত্বকে উপেক্ষা করতে পারলে না; শেষ পর্য্যন্ত নারীর দুর্নিবার্য্য আকর্ষণের কাছে তাকে ধরা দিতে হ'ল। বিবাহ যার কাছে ছিল "apostasy, profanation of the sanctuary of my soul, violation of my manhood, sale of my birthright, shameful surrender,......" — সেই

বিদ্রোহীকে শেষ পর্য্যন্ত নারী জয় করলে! সমস্ত নাটকখানির মধ্যে নর-নারীর অন্তর্লোকের এই চিরন্তন সংগ্রামের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

যে মেয়েটি মনে মনে ট্যানারকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প করেছিল, তার নাম য়্যান্। অক্টেভিয়াস্ নামে একটি যুবক য়্যানকে পূজা করত, কিন্তু য়্যান তাতে তৃপ্তি পেতো না—তার মন ছিল ট্যানারের দিকে। ট্যানার য়্যানের মনোভাবকে প্রশ্রয় তো দিতই না, বরং সময়-অসময়ে কটু-কথার দ্বারা তাকে আহত করত এবং শেষে একদিন তার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দেশান্তরে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত য়্যানই জয়লাভ করল; ট্যানার সখেদে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো —The Life Force. I am in the grip of the Life Force!

তারপর ট্যানার শেষবারের মতো চেষ্টা ক'রে ব'ললে—য়্যান, তুমি কেন অক্টেভিয়াসকে বিবাহ কর না! সে তো তোমায় ভালোবাসে!

য়্যান বল্লে—অক্টেভিয়াস বিবাহ করবে না। Man like that never marries! তারা যোগ্যও নয়।

অবশেষে ট্যানার আর নিজেকে নিরুদ্ধ ক'রে রাখতে পারলে না; য়্যানের দু'হাত ধরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে ব'ললে—What have you grasped in me? Is there a father's heart as well as a mother's?

য়্যান সে উত্তেজনা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলে না; সে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ল। অন্যান্য লোকজন এসে পড়বার পর তার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'লে সে ব'ললে—I have promised to marry Jack!

সকলে তখন ট্যানারকে অভিনন্দন জানাতে লাগ্‌লো; ট্যানার দু'-একবার ব'ললে বটে, সে এর জন্য মোটেই দায়ী নয়, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে; কিন্তু তার অন্যান্য প্রলাপের মতো এ-কথাতেও কেউ কর্ণপাত করলে না। সে সুখী হয়েছে বলে সবাই আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন ট্যানার য়্যানের হাত ধ'রে গম্ভীর ভাবে ব'ললে—"আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, আমি সুখী হই নি। য়্যানকে সুখী দেখাচ্ছে, কারণ সে জয়লাভ করেছে। এ তার জয়ের আনন্দ। কিন্তু আসলে আজ অপরাহ্নে আমরা যে কাজ করেছি তার দ্বারা আমরা সুখকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, মুক্তিকে বিসর্জন দিয়েছি, জীবনের শান্তিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি এবং সর্ব্বোপরি বিসর্জ্জন দিয়েছি অজ্ঞাত ভবিষ্যতের স্বপ্নময় সম্ভাবনা! আমি ইচ্ছে করি না যে, এই সুযোগে আমার খরচে মদ্যপান ক'রে আমার 'বন্ধুরা' অসংলগ্ন এবং অসার কথার দ্বারা আনন্দ জ্ঞাপন করতে থাকুক।"

এই বলে সে কেমন ক'রে তাদের বিবাহিত জীবন যাপন করবে, কি ভাবে তাদের বাড়ী-ঘর সাজাবে, বন্ধুদের উপহারগুলি বিক্রি ক'রে তার অর্থ দিয়ে কি পদ্ধতিতে তার পুস্তক প্রচার করবে, বিবাহ-সভায় কে কে উপস্থিত থাকবে এবং তখন 'বরের-সাজ' না পরিধান ক'রে সে কি রকম সাধারণ পোষাক পরিধান করবে—এই সকল বিষয়ের সুদীর্ঘ বিবরণ দিতে লাগ্‌লো।

বলা বাহুল্য, তার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে হেসে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল।

প্রতিযোগিতার গল্প

[তৃতীয় পুরস্কার]

বুদ্বুদ

শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে বসিয়া ঘরের বধূটী সেলাই করে। অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দু'জনের সংসার—সামান্য কাজ, সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর তার প্রচুর অবসর। স্বামী কোথায় গিয়াছে, ঠিকানা নাই। বাড়ীতে আর কোন লোক নাই। সহরতলীর এই অংশ এখন নির্জ্জন হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পাশের বাড়ীর পাতানো-দিদির সু-উচ্চ হাসি মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসে।

জানালার কাছে ডালিম গাছটায় অসংখ্য লাল ফুল ফুটিয়াছে। বাহিরেও জ্যোৎস্নার আর অন্ত নাই। কেবল গৃহের মধ্যে এই কেরোসিনের আলোটা প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিয়া অপ্রচুর আলো বিকীর্ণ করিতেছে।

তারপর রাত্রি আরও গভীর হইবে......স্বামী আসিবে। নিঃশব্দে উঠিয়া সে তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিবে। আহারান্তে তামাক দিয়া হয়ত তাহারই শয্যার একান্তে বসিয়া চাহিয়া থাকিবে। কেহই তাহার সহিত কথা কহিবে না। স্বামীর সে অবসর নাই, যাত্রার 'প্রোগ্রাম' চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে, না-হয় ক্লাবে চলিয়া যাইবে।·· মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া বধূ শয়ন করিবে, দেখিবে, জ্যোৎস্না কমিয়া আসিতেছে আর ডালিম গাছের ফুলগুলি সেই স্বল্পালোকে স্বপ্ন-পুরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরী-কন্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

পাশের বাড়ীর দিদি ডাকে, "চারু!"

"যাই দিদি।"

দোর খুলিয়া সে আসিয়া দাঁড়ায়, "কি দিদি?"

"এখনও ফিরে আসে নি?"

চারু বুঝিতে পারে না, বলে—"কে?"

"কে আবার, নেকী! তোর স্বামী, নগেন!"

চারু বলে, "না।"

এ ত' তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! রান্না-বান্না শেষ করিয়া দীপ জ্বালিয়া স্বামীর অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকা, সে ত' অনেক দিন হয় আরম্ভ হইয়াছে।

দিদি বলে, "তোদের কাণ্ডই ঐ!···মায়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। আমাদের বাপু সে হবার উপায় নেই, আপিসের ছুটী হ'ল কি সটান বাড়ী চ'লে এলেন।"

চারু নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে। কি-ই বা বলিবার আছে? দিনের পর দিন অবহেলা-অবজ্ঞা কুড়াইয়া কুড়াইয়া সে যে তাহারই ভারে পীড়িত হইয়া পড়িল। আর তাহারই পাশে দিদির প্রেম-পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ-জীবন, সে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে।

দিদি বলে, "যা, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাক্ গে, চারু! কোথায় কোন্ আড্ডায় গাঁজা-গুলি খেয়ে প'ড়ে আছে, না-হয় যাত্রা ক'রতে গেছে, হয়ত আসবেই না!"

ইহাও সত্য। কতদিন সে সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অবশেষে রাত্রি যখন প্রভাত-প্রায়, সে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্বামী আসে নাই।···

চারু চলিয়া আসে। সে ভাবিয়া পায় না, কেন এমন হয়। একজন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, আর একজন···

অথচ একদিন ছিল··· প্রথম যখন বিবাহ হয়। চারু ত' তখন ছোট বধূটী। শয্যায় আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িত। নগেন কত গল্প করিত—সম্ভব-অসম্ভব দেশ-বিদেশের কত গল্প! শুনিতে শুনিতে চারুর ঘুম চলিয়া যাইত—রাত্রি গভীর হইত।···বালিকা স্বামীর কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া দুই-একটা অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া বসিত। নগেন হাসিত, চারু হাসিত—আর ঘরের আলোটাও যেন আনন্দে হাসিয়া উঠিত।···

আজও সেই আলো আছে, সেই ঘর আছে, চারুও ত' তেমনি আছে, শুধু নগেনই এখন আর তেমন নাই।

হায়, মানুষের কেন পরিবর্ত্তন হয়? পরিবর্ত্তন হয় ত', এত সহজে কেন? এত সহসা কেন?

চারু তার জবাব খুঁজিয়া পায় না।

সেলাইটা পড়িয়া থাকে।

ওই যে ডালিম গাছটা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, উহার উপর আসিয়া দু'টী পাখী বসিত। রোজ ছোট্ট দু'টী টুনী পাখী উহার ডালে টিন্-টিন্ করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। চারু রাঁধিতে রাঁধিতে দেখিত, আর ভাবিত, ওরা যেন আর টুনী পাখী নয়, একটী পাখী চারু আর একটী নগেন—সংসার-ডালে অমনি আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আনন্দ যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যাবেলা চারু নগেনকে টুনী পাখীর ইতিহাস বলিয়া দিয়াছিল।

নগেন হাসিয়া আর কূল পায় নাই, বলে, "পাগলী!"

চারু কথা বলে না, কিন্তু খুশী হয়।

পরদিন এক সময় সে দেখে, নগেনও নিবিষ্টমনে সেই পাখী-দুইটার দিকে চাহিয়া আছে। চারু হাসিয়া ওঠে, নগেনও হাসে।

চারুর মনে পড়ে, অতঃপর রোজ পাখী দু'টী আসিত, রোজ তাহারা দু'জনে খাবার দিত আর ঝগড়া করিত।

চারু বলিত, "ওইটা তুমি!"

নগেন সেই পাখীটাই দেখাইয়া বলিত, "উহুঁ! ওটা তুমি!"

"ইস্! ওটা তুমি-ই! দেখছ না, কেমন দুষ্টু!"

নগেন কৃত্রিম ক্রোধে বলিত, "কি, আমি দুষ্টু? আচ্ছা, নাম যখন কিনলামই, তখন······" সে দুই হাতে চারুকে আলিঙ্গন করে।

এম্‌নি রোজ।···নগেন ইচ্ছা করিয়া পাখী চিনিতে ভুল করিত, আর ঝগড়া করিত।

তারপর একদিন দুইটা পাখী না আসিয়া একটা আসিল। চারু কাঁদিয়া বলিল, "ও গো, চারু বেঁচে নেই······!"

নগেন চমকিয়া ওঠে—বলে, "বালাই!"

"না গো না, সত্যি, দেখে যাও তুমি—" সে ডালিম গাছটা দেখাইয়া দেয়।

সত্যই একটা পাখী নাই।···

চারু বালিকার মত কাঁদিয়া বলে, "চারু নেই, চারু নেই, মরে গেছে।"

নগেন তাহাকে বুকে টানিয়া লয়; তাহার শির চুম্বন করিয়া বলে, "এই যে চারু—"

কিন্তু চারু সেদিন সারাদিন কাঁদিয়াছে। সেদিন সে রাঁধে নাই, খায় নাই, নগেন নিজে রাঁধিয়াছে, চারুকে সাধিয়াছে। সারা সময় তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, "চারু, টুনু···"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। ঘুমে চারুর চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। পাশের বাড়ীর দিদির কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইয়াছে।

মেঝেতে আঁচল পাতিয়া চারু ঘুমাইয়া পড়ে।

ভোর রাত্রে নগেন ফিরিয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, সারারাত্রি যাত্রা করিয়া এক্ষণে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিদ্রিত পত্নীকে পা দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বলে—"ওঠ্, হারামজাদী ভাত দে···"

চারু ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসে। চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ভাত বাড়িয়া স্বামীর সামনে রাখিয়া দেয়।

নগেন ভাতে হাত দিয়াই চেঁচাইয়া ওঠে, "এঃ, একেবারে ঠাণ্ডা!"

চারু বলে, "রাত ত' কম হয় নি!"

"কি? মুখে মুখে তর্ক? হারামজাদী! চাই আমি গরম ভাত এক্ষুণি!"

চারুও রাগিয়া ওঠে, বলে, "ইস্, মাইনে করা বাঁদী কি-না, রাত তিনটেয় গরম ভাত রাঁধো!"

ক্রোধে নগেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। ডালের বাটিটা সজোরে ছুঁড়িয়া মারিয়া ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া যায়।

চারুর কপালটা কাটিয়া গিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়ে, ভাবে, টুনী পাখীটা যেদিন মরিয়া গিয়াছিল, সেদিন সে রাঁধে নাই, খায় নাই, নগেন নিজে রাঁধিয়াছে, তাহাকে সাধিয়াছে, সারাক্ষণ তাহার কাছে কাছে থাকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, "কেঁদ না চারু, কেদ না টুনু..."

আর একদিন।

দিদি ডাকে, "চারু!"

"কি দিদি?"

"আজ থিয়েটারে যাব, বাবু পাশ এনেছেন, যাবি চারু?"

চারু কোনোদিন থিয়েটার দেখে নাই। আনন্দে হাসিয়া ফেলে, বলে, "যাব দিদি।"

"আচ্ছা যা, কাজ-কর্ম্ম শীগ্‌গির সেরে নে!"

চারু চলিয়া আসে। চট করিয়া উনুনে আগুন দেয়। বাসন-পত্র মাজিয়া আনে। আজ আর সে নিজের জন্য রাঁধিবে না। তাহা হইলে দেরী হইয়া যাইবে। শুধু নগেনের উপযুক্ত ভাত রাঁধিয়া ঢাকা দিয়া চলিয়া যাইবে।

দিদি সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া ডাকে, "কি রে চারু, হোল তোর?"

"এই যাই দিদি।"

চারু হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দিদির দি[illegible] চাহিয়া থাকে, বলে, "মুখে কি মেখেছ দিদি?"

"পাউডার।"

"কোথায় পেলে দিদি?"

তাহার অজ্ঞতায় দিদি হাসিয়া ফেলে, বলে, "পাব আবার কোথায়, নেকী? বাবু এনে দিয়েছেন।"

"আর চোখে?"

"অঞ্জন। বাবু এনেছেন।"

"আর রুমালে?"

"এসেন্স। ও রে বোকা, তাও বাবু এনেছেন, রোজই আনেন, প্রেম-উপহার..." দিদি মুচকিয়া হাসে।

"তোমায় খুব ভালবাসেন তিনি, না দিদি?"

"খু—ব!"

"তবে আবার পাউডার মাখো কেন?"

"সুন্দর দেখায়।"

"তাতে কি হয় দিদি?"

"তাতে আরও ভালবাসেন...এখন যাবি ত' চল।"

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলে, "না দিদি, আমি যাব না, তুমি যাও।"

দিদিরা চলিয়া গিয়াছে। চারু আসিয়া তাহার তোরঙ্গ খোলে। প্রথম জীবনের, প্রথম যৌবনের কোনো প্রেম-উপহারও কি তাহার বাক্সে নাই?

কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে খান-দুই চিঠি পাওয়া যায়। নগেন লিখিয়াছিল; চারু পড়ে, "প্রাণের টুনু..." আবার সেই টুনী-পাখীটার কথা।...

সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার চোখের সামনে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বিগতদিনের সুখ-স্মৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া নাচিতে থাকে। সারারাত্রি গল্প করিয়া তাহারা ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িত, সকালে যখন ঘুম ভাঙিত, চারু চুপি চুপি পলাইয়া যাইত, নগেন টেরও পাইত না। তারপর একদিন যখন ঘুম ভাঙিল, সে উঠিতেই চুলে টান পড়িল। নগেন জাগিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, আজ আর চারু ঠকাইতে পারে

াই। সে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নগেন তাহার খোপা ুলিয়া সেই চুলের গোছা নিজের গলায় জড়াইয়া াখিয়াছে। সুতরাং ভোরে চারু উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহারও গলায় টান লাগিয়াছে, চারু লাইতে পারে নাই।

তোরঙ্গের মধ্যে একটা সেমিজ পাওয়া গিয়াছে। নগেনেরই দেওয়া উপহার। তাহার বর্ডারে লেখা আছে, 'এন-সি'—নগেন আর চারু।

একদিন নগেনও চারুকে উপহার দিয়াছে।

আবার তাহার চোখের সামনে স্মৃতি দুলিতে থাকে, সেই প্রথম যৌবন…অগাধ প্রেম…নগেন আর চারু… চারু আর নগেন…গ্রীষ্মের গল্প-মুখর বিনিদ্র রজনী… চৈতি হাওয়া…ফুলের গন্ধ…পাখীর ডাক…ঝাউ গাছের শন শন শব্দ…বটগাছের ঝর-ঝরানি গান…সকাল-সন্ধ্যা অবিরাম আনন্দ… উদ্দাম প্রেম…পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না…আর থাকিয়া থাকিয়া বিরহী পাখীর মিনতিপূর্ণ ক্রন্দন…'বউ কথা কও'…'বউ কথা কও'…

তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ে। নগেন আসিয়াছে, বলে, "চারু, যাত্রা শুনতে যাবি?"

চারু মাথা নাড়িয়া বলে, "না।"

"চল্ না চারু, আমার পাঠ আছে, পবন-কুমারের পাঠ দেখবি 'খন।"

চারু তবু বলে, "না।"

নগেন ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "চারু, একটা টাকা দিবি?"

টাকা, গহনা চাহিবারই ছল মাত্র। চারু তাহা জানে। আজও তাহার গায়ে প্রহারের দাগ খুঁজিলে পাওয়া যায়। যে দুই-একখানা গহনা ছিল, স্বামী তাহা দিয়া ক্লাবে নাম কিনিয়াছে। আজও আবার প্রয়োজন পড়িয়াছে।

আজ সামান্য গহনা লইয়া ঝগড়া করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না, ঘৃণা বোধ হইল। নিঃশব্দে হাতের একখানি চুড়ি খুলিয়া ফেলিয়া দিল।

নগেন চলিয়া গিয়াছে।

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই—একটু হাসি, একটুখানি খুশী, সামান্য একবিন্দু করুণা, কৃতজ্ঞতা—কিছু না। প্রয়োজন শেষে সে চলিয়া গিয়াছে।

শূন্য উঠানটা খাঁ-খাঁ করে।

অনেক রাত্রে চারু টের পাইল, দিদি স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিয়াছে তারপর আরও ঘণ্টা খানেক সে তাহাদের গল্প-গুজবের শব্দ শুনিল। অবশেষে সব নিঝুম, নিস্তব্ধ…

হয়ত নগেন এখন পবন-কুমারের পাঠ বলিতেছে। রাবণ-বধ … দুর্ভাগিনী মন্দোদরী ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে…সীতার উদ্ধার হইয়াছে…অদূরে চিতার ধোঁয়ায় শত শত রাক্ষস বধূ সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।…

এমনি করিয়া দিন যায়।

সকাল হইতে সন্ধ্যা সুনির্দ্দিষ্ট কাজ। রাঁধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাঁধা। আর কোনও কাজ নাই। জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই। স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই—কিছু নাই।

জীবনটা একটা ফাঁকি?

স্বামী আসে কিংবা আসে না, তাহাতে কিছু যায় আসে না। যদি-বা কচিৎ আসে, দু'টা ভাত পাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়।

তারপর সারাদিনই চারুর অবসর।

যখন দশটা বাজে, চারু দোরের আড়ালে যাইয়া চুপি চুপি দাঁড়াইয়া থাকে। দিদির স্বামী এখন আপিসে যাইবে। দিদি সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসে। তাহার হাতে পানের খিলি, স্বামীর মুখে পুরিয়া দেয়, অতঃপর স্বামী যখন চলিয়া যায়, দিদি শূন্যমনে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চারু নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

তারপর যখন ছ'টা বাজে, আবার দিদি দোর

গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মুখে পাউডার, চোখে কাজল, ঠোটে পান, পায়ে আলতা।

স্বামীর সহিত চোখা-চোখী হইতেই সে হাসিয়া ওঠে।

চারু শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার স্বামীও একদিন তাহাকে ভালবাসিত, তাহার পায়ে কাঁটাটী বিঁধিলে, সে ব্যথা স্বামীও অনুভব করিত। সে-ও যাবার কালে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিদায় দিত, আবার যখন ফিরিয়া আসিত, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইত।

কিন্তু তাহার অমন সাজ-সজ্জা ছিল না, মুখে পাউডার ছিল না, কাপড়ে আতর ছিল না, আলতা পরিত কি-না, তাহাও আর স্মরণ নাই···

চারু একদিন কাপড়-সেমিজ ভাল করিয়া কাচাইয়া তোরঙ্গে তুলিয়া রাখিল। সে মনে মনে এক সঙ্কল্প আঁটিয়াছে।

চারুর দিদি আজ স্বামীর সহিত বায়স্কোপে গিয়াছে। তাহাদের বাড়ী খালি, চারুর কাছে চাবি রাখিয়া গিয়াছে।

বাক্স হইতে বাহির করিয়া চারু ধোপা-বাড়ীর সেমিজ-কাপড় পরিল। তারপরে দিদির স্বামী যে ঘরে থাকে, চাবি দিয়া সেই ঘর খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সে একবার নিজের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

যাক্, আজ সে একটিবার দেখিবে, আজ পাউডার মাখিবে, আতর ছিটাইবে, আলতা পরিবে। তারপর যখন সাজিয়া-গুজিয়া দাঁড়াইবে, নগেন কি একবারও ফিরিয়া দাঁড়াইবে না? একবারও ফিরিয়া কি তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিবে না? সে দেখা যত ক্ষণিকের হউক, সে দৃষ্টি যতটুকু মৌন প্রশংসার হউক, তবু···তবু...

সে পাউডার মাখিতে থাকে। চুলটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া আতরের শিশি হাতে নিতেই আয়নার দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, শিশিটা হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

দিদির স্বামী বিলাসবাবু আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছে। বিলাসবাবু হাসিয়া বলে, "বাঃ···ফাইন··"

চারু সরিয়া যায়, সে চক্ষু বুজিয়া এই প্রকাণ্ড লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বিলাসবাবু আবার বলেন, "সুন্দর···"

সে চারুর হাত ধরিয়া ফেলে।

চারু আহত হইয়া সবলে হাত ছিনাইয়া লয়, বলে, "ছিঃ!"

"ভয় কি চারু? কেউ নেই, তোমার দিদি বাথরুমে কাপড় ছাড়ছে···"

চারু সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে নিজ মনে বারম্বার শিহরিয়া বলে, "ছিঃ, ছিঃ···"

নিজের ঘরে আসিয়া সে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। সৃষ্টিটা আবার দুলিতে থাকে, সব গুলাইয়া যায়, দিদির কথা মনে হয়, নিজের কথা মনে হয়, স্বামীর কথা মনে হয়।

সে স্থির করিল, আজ সে মরিবে। অদূরে ঐ-বর্ষার নদী কূলে-কূলে ভরিয়া গিয়াছে, উহারই তলদেশের সুনিবিড় অন্ধকারে সে তাহার স্বামী-প্রেম-বঞ্চিত জীবনটার অশেষ দৈন্য, অশেষ লজ্জা লুক্কায়িত করিবে।

কেবল যাইবার আগে সে একবার দেখিয়া যাইবে, বলিবে, "এই দেহটায় তোমারই অধিকার ছিল, তুমি ফিরিয়াও চাহিলে না, পর-পুরুষে তাহা কামনা করিল।" জিজ্ঞাসা করিবে, "একদিন তুমি ভালবাসিয়াছিলে আজ সে প্রেম কোথায় গেল, কাহাকে দান করিলে?" বলিবে, "আজ যাবার কালে কি তোমার কিছুই দিবার নাই, একটু প্রেম, একটু স্নেহ, কিছুই কি আর অবশিষ্ট নাই?" দেখিবে, মরণকালেও সে একবার আগের মত স্নেহভরে প্রেম-পরিপূর্ণকণ্ঠে ডাকে কি-না, "চারু! টুনু!" শুধু একবার, একটিবার। তারপর এই অসার জীবনের

বিসর্জ্জন দিবে, নদীর ওই ঘোলা-জল—উহারই অতল-গর্ভে সে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল চারু উঠিল না, তেমনি বসিয়া রহিল। আজ আর সে রাঁধিবে না। নগেন আসিয়া তাহাকে বকিবে, হয়ত মারিবে, মারুক! তাই বা মন্দ কি? যে হাতে একদিন সে আলিঙ্গন করিয়াছে, আজ সেই হাতেই সে নির্ম্মমভাবেই প্রহার করুক, যে খোঁপায় একদিন সে স্বহস্তে ফুল পরাইয়া দিয়াছে, তাহা খুলিয়াই সে আজ অশেষ নির্য্যাতন করুক, যে-মুখে সে একদা প্রেম-গুঞ্জন শুনিয়াছে, তাহাতেই সে আজ তিরস্কার-বাণী শুনিয়া যাক্…

তারপরে যখন সে মরিবে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না। মা ধরিত্রী এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। শুধু নদীর জল বারেকের জন্য শিহরিয়া উঠিবে, তারপরে সংসার তেমনি চলিতে থাকিবে।

হয়ত আবার একদিন আর একটি নববধূ এই ঘরে এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেই উদ্দাম প্রেম, সেই অফুরন্ত স্নেহ, সেই সুনিবিড় অনুরাগ, সেই মোহ, সেই সব …..

আলো আর জ্যোৎস্নায় সামনের নদীর জল চিক্‌মিক করিবে, অশ্বত্থগাছে পাখীর কোলাহল থামিয়া যাইবে, রাত্রি গভীর হইবে, ঘুমে বধূর চোখ জড়াইয়া আসিবে, এমনি সময় হঠাৎ ভুতুমপাখী কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিবে, বধূর ঘুম টুটিবে, ভয়ে ভয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইবে।

ঝাউয়ের বনে শিস্ উঠিবে, ডালিম গাছে ফুল ফুটিবে, হয়ত আবার দুইটা টুনী পাখীও আসিবে, বসিবে, নাচিবে।

তারপর? তারপর আর সে ভাবিতে পারে না, পরের জীবন তাহার বড় দুঃখের, বড় দৈন্যের। সে অগাধ প্রেম কোথায় মিলাইল, সে স্বচ্ছন্দ জীবন কোথায় লুকাইল? স্বামীর পরিবর্ত্তনের সে কাহিনী যেমন দ্রুত, তেমনি সংক্ষিপ্ত, তাহাকে 'না' করিবার আর কোনো উপায় নাই।…

ভাবিতে ভাবিতে সে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। অবিশ্রান্ত অশ্রুজল ভেদ করিয়া দৃষ্টি তাঁহার ভবিষ্যতের অন্ধকারেও ডানা মেলে, সে দেখিতে পায়, নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের জীবন আড়ম্বরপূর্ণ, কোলাহলময়, তাহার মত শূন্য নয়, ব্যর্থ নয়, রিক্ত নয়। তাহাতে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে, স্নেহ আছে, পরস্পরকে পাইবার মধ্যে আনন্দ আছে। সে মাটিতে বার বার কপাল ঠুকিয়া বলে, "হে ঈশ্বর! তাই হোক্, তাই হোক্, যে আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিবে, সে যেন আমার মত দুঃখ না পায়, সে যেন আমার মত স্বামী-প্রেমে বঞ্চিত না হয়,' তাহার জীবন ভরিয়া দাও, দু'হাত দিয়া ভরিয়া দাও, দিদির মত স্বামী-প্রেম নহে, আমি যেমন পাইয়াছিলাম, যেমন হারাইলাম, তাকে দাও! তাকে দাও!……"

শতাব্দী পর

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কে-টি, সি-আই-ই

'অদ্য—অব্দ শতান্তেবা'—হইবেই হইবে। আজ না হয় কাল, না হয় পরশু, না হয় শতবর্ষ পরে। আজ যেমন আসিয়াছে, কাল তেমনি আসিবে, পরশু আসিবে। এইরূপে আজ, কাল, পরশু করিয়া অব্দ অতীত হইবে। তারপর আসিবে অব্দ, আবার অব্দ। এইরূপে একের পর এক করিয়া শতাব্দও আসিবে।

'জন্মনা জায়তে মৃত্যুঃ' শুধু এই কথার সঙ্গেই 'অদ্য, অব্দ শতান্তেবা' কথার প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু তাহা নয়—অন্য প্রসঙ্গেও একথা বলা যায়। অব্দের পর অব্দ আসে, আসিবে—যাহারা থাকিবে তাহারা এই চক্র-বিবর্ত্তন দেখিবে, হয়ত, ঘটনা পরম্পরা শতাব্দও দেখিবে।

শুধু আজ-কাল নয় বহুদিন, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানব এই অব্দ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় ঘটনার পরিমাণ অব্দ ধরিয়া হওয়া অসুবিধা, শতাব্দী ধরিয়াই হয়। ছোট-খাট কথা, খুঁটি-নাটির কথা পরিমাণের জন্য শতাব্দ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হয় না—'আখবরী' গজ-কাটীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলেই বা তাহা মানে কে, গণে কে? যার যত মনের পরিমাণ সেই পরিমাণই তার পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তুর পরিমাণ; আজকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব-ঝঞ্ঝাবাত সদৃশ যে ভীষণ নর্ত্তনের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মাপ-কাটী প্রাচীনের হাতে ত' নাই-ই, আধুনিকের হস্তে তাহা ধৃত হওয়াও সম্ভব নয়। (Sir James Jean) স্যর জেমস্ জীন এবার্ডীন নগরে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় যে প্রাকৃতিক লোম-হর্ষণ ব্যাপারের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহার পরিমাণে অব্দ শতাব্দ কেন শত মুহূর্ত্তই যথেষ্ট হইবে। সাধারণ সভায় প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় সে বিবৃতি দূরে যাক, ধারণাই অসম্ভব। সাধারণ গজ-কাটীর পরিমাণে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা করেন এবং করিবেন—কবি রবীন্দ্রের পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উৎসব, তাঁহার জয়ন্তী উৎসব, তাই দেখাদেখি নলিনী পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ বর্ষ প্রবেশের উৎসব, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের, প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসুর, রায়-বাহাদুর জলধর সেনের, বরোদার গায়কোয়াড়ের ষাট বৎসর রাজ্যাভিষেকের উৎসব, মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর নাটি-সেন সাহেবের অধিকতর বয়ঃপ্রাপ্তির উপলক্ষে জয়-জয়ন্তী পর্য্যায় যথেষ্ট চলিতেছে, আরও চলিবে — বন্যা ছুটিলে সহজে থামে না।

অন্য প্রকারের এবং প্রকরণের জয়ন্তীর অভাব নাই। রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক তিরোধান-তিথি-পূজা হইয়াছে—তদুপলক্ষে নির্ম্মম প্রত্ন-তাত্ত্বিক-হস্তে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শত-বার্ষিকী জন্মতিথির পূজাও হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের উচ্চশিক্ষার পথ-প্রদর্শয়িতা 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' বিদ্যালয়ের শত বার্ষিক জন্মোৎসব তদানীন্তন বাঙ্গলার লাট স্যর ষ্ট্যানলি জ্যাক্‌সন মহোদয়ের শাসন-কালে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সেই কথা স্মরণ করিয়া পুণ্য জন্মাষ্টমীর দিনে সেমিনারীর সভাপতিরূপে সেমিনারীর চিহ্ন — নিদর্শন (symbol)-স্বরূপ অক্ষয় বট রোপণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এবার বড় আকারের জয়ন্তী-পূজা হইবে—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া। বাঙ্গলা দেশের লোক-শিক্ষা এবং লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান-স্থাপন-ক্ষেত্রে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শত-বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। সে স্মৃতি-পূজার হোতা,

ঋত্বিক, উদ্গাতা এবং পুরোহিতবর্গ আহুত হইয়াছেন, কর্ম্মের জন্য বৃত হইয়াছেন, সমবেত হইয়াছেন। ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শ-সভা স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে এই স্মরণ-যোগ্য দিনের স্মরণ স্মরণ-যোগ্য ভাবে হয় তৎসম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না এবং হইতে পারিবে না, রাজা-প্রজা মিলিয়া, ধনী-নির্ধন মিলিয়া লোকহিত-কামী মাত্রেই উৎসব সাফল্যের উপকরণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত। এই সাধু ও বরেণ্য চেষ্টা ভগবৎ-কৃপায় জয়যুক্ত হউক এবং এই উৎসব-যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া বৃহত্তর লোকহিত চেষ্টার মহীরুহের বীজ রোপিত হউক। আর্ত্তত্রাণ-চেষ্টা এদেশে নূতন নয়, বহু প্রাচীন। যে অপূর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ভারতের সাধনার অন্যতর শ্রেষ্ঠ উপকরণ ও উপাদান তাহারই মূলসূত্রগুলি আরব-সাম্রাজ্যের পথে গ্রীস ও রোমের মারফৎ তমসাচ্ছন্ন য়ুরোপের মধ্য-যুগ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। এখন সেই বিকীর্ণ জ্যোতিঃ ভারতে আবার ফিরিয়া ভারতীয় নিদান ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে ধিক্কার দিবার চেষ্টাও করিতেছে। সর্ব্ব বিষয়েই এখন যুগ-পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মানুসারে 'চক্রপরিবর্ত্তন' অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখ না করিয়া, অতীতের জন্য বৃথা না কাঁদিয়া, ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করিবার কামনায় ভারতবর্ষে ইংরাজী প্রণালীতে এলো-প্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রচলনের ইতিহাসের আলো-চনা অসাময়িক ও অপ্রয়োজনীয় হইবে না।

যে সংস্কৃত শিক্ষা ও শিক্ষালয় এখন অনাদরের না হউক উপেক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই কেন্দ্র এবং উপলক্ষ্য করিয়া এদেশের নব-প্রচলিত এলো-প্যাথিক মতে চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। তারপর মাদ্রাসা বিদ্যালয়েও ইহা আংশিক প্রচলন হয়, প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রয়োজন অল্পবিস্তর পরিমাণে সেই সময় অনুভূত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার সাহায্যেই সেই প্রয়োজন সাধিত হইত। সভ্য সমাজের আদিম যুগের উপযোগী প্রায়োগিক চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল না। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের আলোচনার সেই দেশীয় ভাষার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্বেরও অল্পবিস্তর আলোচনা হইত। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লামেণ্টের এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য সমগ্র বৃটিশ অধিকারভুক্ত ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে? এখানে একটু রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক্। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের পথ বন্ধ হয়। সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষা-সাহায্যে যেখানে শুধু আয়ুর্ব্বেদীয় নয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও শিক্ষার আয়োজন হইত, শত বর্ষ ধরিয়া সেখানে চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য হয় নাই। এই শতবর্ষে এলোপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষা চরম না হউক পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই শতবর্ষে মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের পর ধীরে ধীরে আরও কত চিকিৎসায়তন ও আরোগ্য-নিকেতন উদ্ভূত হইয়াছে। নানা শাখা-সম্বলিত মেয়ো হাসপাতাল জন্মিয়াছে, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল জন্মিয়াছে, দুইটী মাড়োয়ারী হাসপাতাল জন্মিয়াছে, কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল জন্মিয়াছে, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল, ন্যাশান্যাল স্কুল হাসপাতাল জন্মিয়াছে, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, হাওড়া হাসপাতাল জন্মিয়াছে, সহরের ও সহরতলীতে এবং মফঃস্বলে ছোট-বড় অনেক স্কুল ও হাসপাতাল জন্মিয়াছে, State Faculty of Medicine জন্মিয়াছে — যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছে হাকিমী এবং ইয়ুনানী বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল; জন্মিয়াছে একাধিক এবং সুপরিচালিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় এবং জন্মিয়াছে কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল।

কিন্তু যে সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র এবং উপলক্ষ্য করিয়া ১৮২২ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশীয় এবং বিদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোচনা এবং শিক্ষা হইত এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৬টী রোগীর শয্যার (bed)

ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ছিলেন অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপ্যাল। সেই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে অধ্যক্ষ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার যেন প্রচলন হয়। স্বর্গীয় বরেণ্য কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় ছিলেন জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতৃদেবের বহু স্নেহাস্পদ বন্ধু, তাঁহার উৎসাহ এবং উত্তেজনা ছিল এই চেষ্টার মূলে। আমার সতীর্থ বিহারীলাল সেনগুপ্ত (পরে কবিরাজ) এবং অন্যান্য বৈদ্য ও অবৈদ্য-ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যয়নের প্রার্থী ছিলেন। সে চেষ্টা কিন্তু বিফল হয়। বহুকাল পরে যখন সরকার বাহাদুরের আমন্ত্রণে আমার সংস্কৃত-শিক্ষা-সংস্করণ সভার সভাপতিত্বের গৌরব এবং সৌভাগ্য ঘটে তখনও এই চেষ্টার সুচনা পুনরায় হয় এবং সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন হয়। রহস্যের এবং আশার বিষয় এই যে, আগামী বৎসরে (১৯৩৫) মেডিকেল কলেজ স্থাপনের শত-বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইবে, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতালের প্রসারণের আয়োজন হইবে। সেই ১৯৩৫ সালে হইবে সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পঠন-পাঠনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এই রহস্যের মধ্যে ভগবানের গুহ্য ইঙ্গিত উপলব্ধি না করিয়া থাকা যায় না। কেবল শাস্ত্র-পাঠ হইবে না প্রায়োগিক শিক্ষার ভিত্তিতে এই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থারও আয়োজন হইবে। এই বৎসরই রাজ-রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনাধিরোহণের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব অর্থাৎ এই রজত জুবিলী এবং শত-বার্ষিকী উৎসব দেশের এবং সমাজের মঙ্গল নিদান হউক। এই উৎসব উপলক্ষে মনে রাখিতে হইবে যে, রোগ-চিকিৎসা ও আর্ত্ত-সেবার ব্যবস্থা দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত অপ্রচুর। আজ অমর কবির অমর গাথায় উল্লিখিত সপ্ত-কোটী-কণ্ঠ বাঙ্গলায় নাই সত্য। দৈবদুর্ব্বিপাকে বিধাতার অভিশম্পাতে সেই সপ্ত-কোটী আজ পঞ্চ-কোটীতে পরিণত। সরকারী নিয়মানুসারে যে চিকিৎসা-প্রণালীর সমাদর এবং আইন-সঙ্গত প্রচলন সেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার চরম ছাড়-পত্রধারী মেডিকেল গ্রাজুয়েট এ পর্য্যন্ত হইয়াছে মাত্র চার হাজার। ইঁহার মধ্যে কতজন বাঁচিয়া আছেন, কতজন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং দেশ-দেশান্তরে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার সংখ্যা-পরিমাণ নাই। নিম্নতর ছাড়-পত্রধারী আরও কয়েক হাজার হইয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ মোট আট হাজারের অধিক নয়। পাঁচ-কোটী নরনারী ও শিশুর নানাবিধ এবং ক্রম-বর্দ্ধমান জটিল রোগের চিকিৎসার ভার আইন-সঙ্গত নিয়মের আট হাজার চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত। যাঁহারা কবিরাজি হাকিমি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে চিকিৎসা বলিয়াই মানেন না, হাতুড়েগিরি বলিয়া উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা এবং নির্য্যাতন সমর্থন করেন তাঁহারা এই অনুপাত পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিত এবং চিন্তিত হইবেন। এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া দরিদ্র-দেশে লোকহিতকর এবং লোকের অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা প্রণালীর প্রসার ও চিকিৎসক সংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে এই উৎসবের সাফল্য ও সার্থকতা হইবে।

আর্ত্তত্রাণ আশ্রম এবং হাসপাতালের সংখ্যা-সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। নানা চিকিৎসা প্রণালী-অনুমত যে হাসপাতালের কথা উপরে উল্লিখিত হইল তাহাও প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নিতান্ত অপ্রচুর এবং উপস্থিত হাসপাতালগুলিতে যে আয়োজন এবং ব্যবস্থা আছে তাহাও নিতান্ত অপ্রচুর। বহুদিন কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল, ভগবান দাস বগলার মাড়োয়ারী হাসপাতাল, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাসপাতাল, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ হাসপাতাল এবং রেফিউজ হাসপাতালের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বলে আমি উচ্চকণ্ঠে এবং অকুতোভয়ে এই কথাই বলিতেছি। পূর্ব্বে লোকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে

যাইবার বিরুদ্ধে যে দৃঢ়-সংস্কার ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়েরই ধনী, নির্ধন, অভিজাত এবং অন্ত্যজ—স্ত্রী-পুরুষ কাহারও এখন হাসপাতালে যাইতে দ্বিধা নাই বরং হাসপাতালে প্রবেশাধিকারের জন্য মারামারি পড়িয়া যায়। লোকে টাকা-পয়সা দিতে স্বীকার করিয়াও সে অধিকার খোঁজে, কারণ লোকের অর্থবল কমিয়া আসিতেছে। গৃহে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা অতি অল্প লোকেই করিতে পারে এবং লোকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, হাসপাতালে মরিতে যাইতে হয় না — বরং শাস্ত্রীয় মতে যতদূর সম্ভব সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বেকার মেডিকেল কলেজ এবং বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজে আশ্‌মান জমিনের তফাৎ। মেডিকেল কলেজে পিতৃ-প্রদর্শিত পথে পাঠের ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণ ছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শব-ব্যবচ্ছেদ ও মিউজিয়ামের আকার প্রকার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হয়। ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া ঘড়িওয়ালা প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বারে একনিঃশ্বাসে পৌছিলাম। ভ্রাতা সুরেশপ্রসাদ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাহা আমি পারিলাম না, তিনি জোর করিয়া বরণ করিলেন, এবং ফলে হইলেন ভারত-বরেণ্য অস্ত্র-চিকিৎসক লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এবং এম্-ডি। বেঙ্গল এম্বুলেন্স-এর, বেঙ্গল ডবল কোম্পানী, বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কোর প্রভৃতি বাঙ্গলার সামরিক কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ হইলেন ও আরও হইলেন সহযোগিগণ-সাহায্যে বেলগাছিয়া কারমাইকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বাধিকারী বংশের সুরেশপ্রসাদ তৃতীয় পুরুষের ছাত্র। তাহার পূর্ব্বে কৃতী ছাত্র ছিলেন বৃগেড সার্জ্জেন এবং নেভেল সার্জ্জেন পূজ্যপাদ পিতৃদেব রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, তাঁহার খুল্লতাত মেডিকেল কলেজের পুরাতন ভার্ণাকুলার ডিপার্টমেণ্টের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পৌত্র নিখিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মেডিকেল কলেজের সর্ব্বাধিকারী বংশের চতুর্থ পুরুষের ছাত্র। সুরেশপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্যপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ সহোদর সুশীলপ্রসাদ এবং খুল্লতাত নরেন্দ্রকুমার বহুকাল মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন — খুল্লতাত-পুত্র শচীন্দ্রপ্রসাদ ও তৎপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র তথাকার কৃতী ছাত্র। দৈবঘটনায় সুরেশের পুত্র কনকচন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিমানচন্দ্র মেডিকেল কলেজে প্রবেশ না করিয়া কারমাইকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। উভয় কলেজের সঙ্গেই বংশের বন্ধন অচ্ছেদ্য, চারি পুরুষ ধারাবাহিকভাবে যে বংশের বংশধরগণ ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃতী ছাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সহিত যাহাকে 'রক্তের টান' বলে তাহা জন্মিয়াছে। অতএব এই শত বার্ষিকী উৎসবের সার্থকতা তাহাদের নিতান্ত কাম্য। এই অনুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া এই উৎসবের সাফল্যের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা আমার স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।

সরকারী ব্যবস্থায় এবং কলিকাতার জন-সাধারণ-সভায় স্থিরীকৃত মন্তব্য অনুসারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পে প্রায় তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিতে হইবে। কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, আর এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ হওয়া বিশেষ কষ্টকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইচ্ছা করিলে দেশ বিদেশে ছড়ান মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রগণই এই টাকা অল্প দিনের মধ্যেই তুলিয়া দিতে পারেন। চারহাজার ছাত্র গড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেই এই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। এ দাবী অন্যায় নয়, কোনও কৃতী ছাত্রই এ দাবী অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং করিবেন না। সে-দিন বঙ্গবাসী কলেজের একজন পূর্ব্বতন ছাত্র তাঁহার নিজের পদোন্নতির উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর নিকট এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া মাতৃ-ঋণ পরিশোধের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ দেশের

স্কুল কলেজের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের হল-নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্বতন তিনজন ছাত্র লর্ড কারমাইকেলের শাসন সময়ে তিন হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর সাতানব্বই হাজার টাকার ব্যবস্থা না হওয়াতে প্রেসিডেন্সি কলেজের হল এখনও অনির্ম্মিত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নানা বিভাগে নানা উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং সে বিষয়ে জনসাধারণ যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

অপূর্ণ কার্য্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য বহু ব্যয়ে অনেক জমিও ক্রয় করা হইয়াছে। এই শতবার্ষিকী উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে নব-গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে তাহা নির্ম্মিত হইলে সরকারী তহবিল অর্থাৎ সাধারণ প্রজার তহবিল হইতে বার্ষিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। অতএব প্রয়োজনীয় বাকী এক লক্ষ টাকার সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইলে হাসপাতালের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতিকারের জন্য এবং বাহিরের রোগী চিকিৎসার জন্য (Casualty Ward and Out-door Department) সুব্যবস্থার দারুণ অভাব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। সেই অভাব মোচন প্রয়াসে শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে এই প্রশংসিত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র চিকিৎসক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের সাহায্য সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা করা হইতেছে।

ইহাতে শুধু উৎসবের সার্থকতা হইবে তাহাই নহে, সর্ব্বসাধারণের প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা বলিয়া তাহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এইটুকু করিলেই এ বিষয়ে সাধারণের কর্ত্তব্য পালন শেষ হইবে না। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ভাবুক মাত্রেরই প্রতীতি হইবে যে, দেশে আর্ত্ত-ত্রাণ ও আর্ত্ত-সেবার ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রচুর। আরও প্রতীতি হইবে যে, এই সেবার সম্যক্ অনুষ্ঠানের জন্য শুধু এলোপ্যাথিক প্রণালী নয়, কবিরাজী, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর পরিপুষ্টি ও পোষকতা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাপক্ষকে বদ্ধপরিকর হইয়া সে কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ উৎসবেরই উদ্দেশ্য যে, উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ উন্নতির চেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য নিতান্ত পরিস্ফুট, শুধু প্রস্তাবিত গৃহ-নির্ম্মাণ করিলেই সমগ্র সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। পারিপার্শ্বিক উন্নতিরও প্রয়োজন এবং নানা বিষয়ে পুষ্টি ও প্রসারেরও সম্যক্ প্রয়োজন।

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৬

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান রাত্রি; মনে হইতেছিল সমস্ত নৈশ প্রকৃতির গায়ের উপর কে যেন একখানা মোটা চাদর ঢাকিয়া দিয়াছে। আকাশে হয়ত একটু জ্যোৎস্না আছে, নক্ষত্রেও চিরদিনের মত দীপ্তির অভাব নাই, কিন্তু অল্প অল্প মেঘের সমাবেশে সেখানেও পৃথিবীর মতই আচ্ছন্ন অবস্থা, যেন সব থাকিয়াও কিছু নাই—ম্লান, শ্রীহীন, ছায়াচ্ছন্ন।

সর্ব্বাণী সারারাত ঘুমাইতে পারিল না। যতই ভাবিবে না বলিয়া স্থির করে, ততই যেন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আজকের পাওয়া সেই চিঠি দু'খানার কথাই তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খায়—"ইঁহার কাছে আমার যেন একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়াই আমি অনুভব করি।"—এই কথাগুলা তার কানের তারের মধ্যে যেন মৃদু রবে বাজিয়া উঠিতে থাকে। সত্যই কি তাই আছে? দায়িত্ব যদি তার কাছে উঁহার সত্যই থাকে, তবে সর্ব্বাণীরও কি তাঁহার কাছে কোন দায়িত্বই নাই? সর্ব্বাণী মনে মনে হঠাৎ এক সময় যেন কতকটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সত্যই কি তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা দায়িত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল? সত্যই কি এ কথা ঠিক? সর্ব্বাণী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, শুইয়া শুইয়া আর যেন ভাবা যায় না। কে যেন তার বুকটাকে চাপিয়া ধরিতেছে। তার বুকটা যেন ভারি হইয়া উঠিল। হয়ত এ কথাটা নিছক মিথ্যা নয়, হয়ত এর ভিতর খানিকটা সত্যও আছে। অন্ততঃ দেশাচার ও শাস্ত্রাচার এই কথাটাই বলিবে। এ দেশে এক সময় বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহিতা হিসাবেই ধরা হইত। কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বাগদত্তা কন্যার বাগদত্ত-পতি-বিয়োগে তাহাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, তবে সাধারণভাবে বাগদত্তারা পঞ্চ-আপদ ঘটিলে অন্যত্র পরিণীতা হইতে পারিতেন। সর্ব্বাণী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার ব্যাপারটা কিন্তু সেদিক দিয়াই যায় নাই, তার বাগদত্ত-পতি, নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত ইত্যাদি কিছুই নহেন—এ অবস্থায় তাদের মধ্যে হয়ত একটা দায়িত্ব থাকিয়াই গিয়াছে। অবশ্য এটা সর্ব্বাণীর দিক দিয়াই, কারণ এই বিবাহের বাধা সে-ই সৃষ্টি করিয়াছিল। তার বাগদত্ত-বেচারীর ইহাতে কোনই অপরাধ ছিল না, সেই হেতু দায়িত্ব তার দিক্ হইতে না থাকারই কথা, তথাপি যে তিনি এখনও নিজেকে তার কাছে এমন করিয়া আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, এর ভিতরে সত্যই একটা অস্বাভাবিক ও অনন্যসাধারণ চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন তো কই সে আর কখন শোনে নাই?

সর্ব্বাণী তার গায়ে-জড়ানো র‍্যাগ্‌খানা খুলিয়া ফেলিয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। তবে কি, সে ইহারই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া লইবে? তবে কি—

গভীর সংশয়াকুলচিত্তে সে নিজের অন্তরের অভ্যন্তরে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। না, আর হয় না। সেই অজানা, অদেখা বাগদত্তের জন্য কোনই সঞ্চয় তো কই তার অন্তরের অন্তস্তলেও উঁকি দিয়া দেখিতে

পাইল না? বরঞ্চ এত বড় লজ্জার ও গ্লানির কথা মুখে তো নহেই, মনের ভিতরও যেন তার স্থান না পায়। ভগবান তার মনটাকে এই দুর্ব্বলতার পাপ হইতে মুক্ত করুন। এ কি তার এতদিনকার গর্ব্বের প্রতিশোধ? নাঃ, এটাকে সে দুঃস্বপ্নের মতই ভুলিয়া যাইবে।

সে আর্ত্তভাবে চোখ বুজিল। এ কি, এত দিনের এই চির-শূন্য-চিত্ত-শতদলে আজ সহসা এই অতর্কিত ভাবে এ কার মূর্ত্তি এমন অনধিকারে ফুটিয়া উঠিতে চায়? ধিক্! ধিক্ সর্ব্বাণীর এমন দুর্ব্বল মনকে! না না, এ কখন হইতেই পারে না। জোর করিয়া সর্ব্বাণী তার এ অনধিকার প্রবেশকে বাধা দিয়া ফিরাইবে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী তার ভগ্নিপতি, ডালির বর, ব্যস্—এই পর্য্যন্ত! তার নিস্পৃহ ভোগ-লালসা-শূন্য সংযত-জীবনে সে কোন দিনই বাহিরের দুর্দ্দৈব ডাকিয়া আনিবে না, বরং তার চেয়ে সেই প্রত্যাখ্যাত বাগদত্তকেই মনে মনে স্বামীর আসনে বসাইয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় বহির্সংসারের অন্য সমস্ত আকর্ষণকে দূরে সরাইয়া দিয়া আদর্শ সতীর মতই জীবনের দিনগুলা কাটাইয়া দিবে। ডালির হাসিমুখে যেন এতটুকু ছায়াপাত না হয়। কিন্তু হায়, কাহাকে সে স্মরণ করিবে? সে তো তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখে নাই। তা হোক, নাই বা দেখিল! ঠাকুর-দেবতাদের কি দেখা যায়? সেই রকম একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া লইলেই চলিবে।

অবসাদ-ক্লান্ত দেহ বিছানায় লুটাইয়া দিয়া সে গায়ের উপর গরম চাদরটা টানিয়া দিল, তার পর নীরব-স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে কোন্ সময় অদূরাগত কেনালের অশ্রান্ত জল-কল্লোলের সমতান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

১৭

শীত খুব জোর করিয়াছে। মেঘ ও বৃষ্টি যেন সৃষ্টিটাকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত। চারি-দিক ঘেরিয়া কুয়াশার জাল, আকাশে চাঁদ ওঠে কি-না ভাল করিয়া জানাও যায় না, তারার মালার তো দেখাও নাই, আর সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেখার লোকই বা কই? ঘরে ঘরে দোর-জানালা বন্ধ; পর্দ্দা টানা; অনেকেরই ঘরের মধ্যের চিমনিতে, যাদের তেমন ব্যবস্থা নাই তাদের মাটির 'বর্সিতে' আগুন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

সুরঞ্জনের দুর্ব্বল স্বাস্থ্য এতটা শীতের প্রতাপ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এত যত্ন, এত সাবধান, অথচ কোন্ সময় একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া যায়, সর্দ্দি করে, কাশি ও হাঁচি হয়, সর্ব্বাণী ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে। তার মনের ভিতরটায় কে জানে কেনই সর্ব্বদা একটা 'হারাই-হারাই'-ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। বাপকে ছাড়িয়া সে আজ-কাল আর বেশিক্ষণ নীচেও নামে না, পিসির ও বাপের পীড়া-পীড়িতে যদিও বা নামে, একটুক্ষণ না যাইতেই উপরে উঠিয়া যায়, ছলে ছুতায় বাপের কাছে কাছেই ঘোরে ফেরে। কে যেন তার ভয়ার্ত্ত মনের ভিতর উঁকি দিয়া দিয়া বলিয়া যায়, আর খুব বেশিদিন নয়! অসম্বরণীয় মর্ম্মন্তুদ্ আবেগে তার বুকের মধ্যের রুদ্ধ রোদন গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, অসহ্য ব্যথায় তার বুকটা যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। এই বাবা যদি তার না থাকেন, তবে এত বড় একটা বিশাল বিশ্বের বুকে সে একা একা থাকিবে কি লইয়া? এ-কথা তার ভাবিতেও প্রবৃত্তি হয় না, আবার না ভাবিয়াও যেন উপায় নাই, কে যেন তাকে জোর করিয়াই ভাবায়। ভাবিতে গেলে তার মাথা ঘুরিয়া যায়, চোখে সে চারি দিক অন্ধকার দেখে, আবার জোর করিয়াই নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিয়া মনকে শক্ত করিয়া লয়, ভাঙ্গিয়া-পড়া চিত্তকে আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়া বুঝাইয়া বলে—এমন কি কখন হয়? আমার মা, ভাই, বোন—কেউ নাই। বাবা কি কখন এত শীঘ্র যেতে পারেন? কক্ষণো না! গভীর আশ্বাসে ও অপরিসীম সান্ত্বনার সুখে মন-প্রাণ ভরিয়া

উঠে। সর্ব্বাণীর অনেক সময় মনে হইত, বাপকে লইয়া সে না হয় দেশে ফিরিয়া যাইবে, সেখানে এতটা শীত তো নাই; কিন্তু সুরঞ্জনের সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি হয়তো মনে মনে কি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, মুখে কিছুই অবশ্য বলেন নাই; কিন্তু ভাবে জানা যাইত যে, এখানেই তিনি এখনো থাকিতে চান। হয়তো নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়াই একমাত্র অসহায়া কন্যাকে তার পৃথিবীর এই অবশিষ্ট আত্মীয়ার নিকট হইতে অপসৃত করিতে তাঁর মায়া সরিতেছিল না। মেয়ে ব্যাকুল হইয়া যখনই অনুযোগ তুলিত যে, এখানকার শীত সইছে না, দেশে যাওয়া যাক। তখনই স্নিগ্ধহাস্যে তাহাকে শান্ত করিতে চাহিয়া স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠেই উত্তর দিতেন, "এ তোমার ভ্রম! হয়তো দেশে গেলে আরও বেশী ভেঙ্গে পড়বো, কেন ভয় করচ? এখানে তো বেশ আছি।"

সর্ব্বাণী বুঝিত পিসিমার সঙ্গ ছাড়িয়া আবার নিজেদের সেই নিরালা নির্জ্জনবাসে ফিরিয়া যাইতে বাবা তার ভয় পাইতেছেন। তা সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তারও কি দেরাদুনের এই আনন্দপূর্ণ সংসারটী ছাড়িয়া নিজেদের সেই ভুতাহত প'ড়ো বাড়ীটার নিরানন্দ জীবনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেই কোন আগ্রহ ছিল? কিন্তু তার নিজের কোনো ব্যক্তিত্বকেই তো সে কোনোক্রমে প্রশ্রয় দিতে চাহে না, তার বাপ যেমন করিয়াই হোক, ভাল থাকিলেই হইল।

এখনই 'টাল-মাটালে'র মধ্যে শীত কাটিয়া বসন্তকাল আসিয়া গেল। গোলাপ-লতার আপ্রান্ত কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিল, লুকট্ গাছে কমলা রংয়ের ফলের থোলোগুলি পথচারীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 'ইউক্যালিপ্টাসে'র সরলোন্নত দেহ পুরাতন ত্বক্‌গুলাকে জীর্ণবস্ত্রের মতই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বকে দেহ শোভাবর্দ্ধিত করিয়া তুলিল, চারিদিক হইতে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল।

এ-দিকে উৎসবের সাড়া শুধু বাহিরেই নয় গোলাপসুন্দরীর বাড়ীতেও তাহারই একটা অনুকৃতি চলিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী ডালিকে বিবাহ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। যদিও কাজের জন্য তিনি এ তিন মাস ধরিয়াই দেরাদুনে অনুপস্থিত, কিন্তু তার জন্য এ-বাড়ীতে আসন্ন প্রায় বিবাহোৎসবের আয়োজন কিছু কম পড়িতেছিল না। বিবাহ এখান হইতেই হইবে। বরের বাপ একলাই দেশ হইতে বিবাহের সময় আসিবেন এবং বিবাহান্তে বর-কনেকে দেশে লইয়া গিয়া বৌ-ভাত সমাধা করিবেন। বিবাহের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে গিয়া সুকুমার মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে ভীষণ তাড়া খাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বর-কনের জোড়-শাড়ী এবং কনের দু'গাছি শাঁখা ভিন্ন আর যদি কোন কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি বিবাহ সভা হইতে উঠিয়া যাইবেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া সুকুমার স্বীকৃতি দিয়াছে যে, সে ইহার একটুও ব্যতিক্রম কোন মতেই ঘটিতে দিবে না। অবশ্য মেয়ের বিবাহে খরচ না করিতে পারিলে মেয়ের পক্ষ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়িও কিন্তু পছন্দ করা যায় না। সাধ্যমত নিজের মেয়েটীকে সকলেই ধন-রত্ন-সমন্বিতা করিয়াই সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক থাকে, সাধ্যাতীত পীড়নটাকেই এড়াইতে চায়। গোলাপসুন্দরীর এই এক মেয়ে, তিনি দুঃখিত হইলেন, নিজেই একদিন ছেলেটীকে ডাকাইয়া কথাটা তুলিলেন। বলিলেন, তুমি তো চাইছ না আমার যদি সাধ্য থাকে আমি কেন দোব না? বিশেষ দেশে তো তোমার পাঁচজন আছে, তাঁরাই বা কি বলবেন?

ভবিষ্যৎ জামাতা দৃঢ় করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, উত্তর করিলেন, "আমি সুকুমারকে যা বলবার ছিল বলেছি।"

বিরক্ত হইলেও গোলাপসুন্দরী আর কোন আপত্তি তুলিতে ভরসা করিলেন না। বেশী নিংড়াইলে লেবু

তিক্ত হইয়া যায়, সেই প্রবাদ কথাটাই হয়ত তাঁর মনে পড়িয়া গেল।

তারপর সুকুমার সর্ব্বাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই প্রকার বন্দোবস্ত করিল, বিবাহের দিন ডালি শাড়ী ও শাঁখা পরিয়াই ক'নে সাজিবে, তারপর বিবাহ হইয়া গেলে বৌ-ভাতের জন্য যখন সে শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, সুকুমারকে তো সঙ্গে যাইতেই হইবে, সে গহনাপত্র লইয়া গিয়া বৌ-ভাতের দিনে 'বৌ-দেখানি' বলিয়া বোনকে পরাইয়া দিলে জামাই-এর তো আর ফেরৎ দেওয়ার হাত থাকিবে না!

অনেক খুঁৎ খুঁৎ করিয়া অবশেষে গোলাপসুন্দরী নিরুপায়ে ইহাতেই সম্মত হইলেন। তবে এ দিকে খরচ কম হইবে বলিয়া বিবাহের দিন লোক খাওয়ানোর ও অন্যান্য আয়োজনের একটু বিশেষ-ভাবেই ব্যবস্থা সুকুমার করিতে ইচ্ছুক হইল। তাই এক দিকে শীতের জড়তা কাটিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে বিবাহোৎসবের সূচনা দেখা দিয়া সকলকেই একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এমন কি, সুরঞ্জনের নিরানন্দ চিত্তেও যেন এই শুভ-কার্য্যের আনন্দোচ্ছলতার একটুখানি উচ্ছ্বাসও লাগিয়া গেল। স্বভাবতঃ মৃদুভাষী ও সর্ব্ব-নির্লিপ্ত মাতুল প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে ডালিকে কাছে ডাকিয়া সুগভীর স্নেহভরে তার মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বাণী বলিয়া উঠিল, "ওকে তো আইবড়-ভাত দেবার উপায় নেই, বৌ-ভাতেই না হয় হোল,—আমরা কিন্তু একস্যুট মুক্তোর গহনা আর খুব ভাল একটা বেনারসী সাড়ী দোব, কেমন বাবা?"

মৃদু-স্মিত হাস্যে সুরঞ্জন উত্তর দিলেন, "বেশ তো মা, তাই দিও।"

তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসকে তিনি ভিতরে ভিতরে দমন করিয়া লইলেন। হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল, ক'খানা সামান্য গহনার জন্যই আজ তাঁর মেয়ের এই দুরবস্থা!

১৮

দুরন্ত শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় হাড়-কাঁপানো, কুয়াশা-ভরা কঠিন দিনগুলা কাটিয়া চৈত্র-শেষের বাসন্তী দিন দেখা দিয়াছে। পুঞ্জীকৃত অশ্রু-বাষ্পের মত সমুদয় কুয়াশার জাল ছাড়াইয়া দীপ্ত সুবর্ণচ্ছটায় চারিদিক সুপ্রসন্ন ও স্মিত হইয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ মন্দ-মধুর হাওয়া অজস্র প্রস্ফুট গোলাপের সৌরভে গভীর ভারাক্রান্ত। গাঢ় ঘন কমলা রংয়ের লুকট্ ফল গুচ্ছে গুচ্ছে গাছগুলাকে যেন আলোক-স্তম্ভের মতই সর্ব্বলোকলোচনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ প্রতি সন্ধ্যায় ছায়া-মধুর পুষ্পগন্ধামোদিত প্রশস্ত রাজপথে ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, আমোদ-আলাপের গুঞ্জনে, তরল কলহাস্যে পথিপার্শ্বস্থ গৃহবাসিগণ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

বিবাহের দিন নিকটতর হইয়া আসিতেছিল, সকলেই আনন্দে মগ্ন; কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বাণীর ভিতর ভিতর কি যেন একটা পরিবর্তন ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে যতই সে অগ্রাহ্য করিতে যায়, ততই যেন সে তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়া তাহার 'পরে নিজের অধিকার বিস্তৃত করিয়া তুলিতে থাকে। তার এই বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল অদ্ভুত জটিল জীবনেরই কয়েকটা বৎসর ধরিয়া যেখানটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর আর যে সেখানকার দলবাঁধা জলস্রোতকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তার এই জীবন-তরী উজান বাহিয়া কোন্ নির্দ্দিষ্ট নদীপথে বাহির হইয়া পড়িবে—এ যেন সে কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। এই সেদিন পর্য্যন্ত সে জানিত, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে মন তার নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছে—এমন কি সে পুরাণেরই একটা পুরাতন শ্লোককে মনে মনে আওড়াইয়া এ বিষয়ে নিজের মনকে বেশ একটা শক্ত নজির দিয়া রাখিয়াছিল—"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপিদাতা" ইত্যাদি—

কিন্তু কেন ইদানীং একটা এই মন-পড়া অযাচিত

দুঃখের নেশা মনকে পাইয়া বসিতেছে, তা সে জানে না। কিসের জন্য এই দুঃখ-বোধ তার মধ্যে দেখা দিল? নিজের উপর তার এই দুঃখ-ক্লান্ত মনটা যেন নিদারুণ বিতৃষ্ণায় বিরূপ হইয়া উঠিল। না, ছিঃ, কিসের এ দুর্ব্বলতা! যে বাপের মুখ চাহিয়া তাঁর সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই, আজ কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজের সুখ খুঁজিতে বসিল। মরুময় জীবনের একপ্রান্তে স্বপ্নজাল-মণ্ডিত স্বর্গোদ্যানের মতই অপুষ্ট লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্প সমাচ্ছন্ন হরিৎ শ্রী-র যে সমাবেশ দেখা দিয়াছিল নির্ম্মম রুক্ষনেত্রের জ্বলন্ত ভ্রূকুটি দিয়া সে তাদের ভাল করিতে চাহিল, একান্ত বিতৃষ্ণ অবহেলায় ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইল। না — ডালির বর তার ছোট ভগ্নিপতি মাত্র, তার 'পরে এই যে মনোভাব, এ শুধু স্নেহ কখনও প্রেম নয়। তার মন কি এতই দুর্ব্বল, নিশ্চয়ই না। এমন সময় ডালি কোথা হইতে দুর্দ্দান্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া তার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, আবদার-ভরা, আদর-গলানো অভিমানের সুরে কহিল —

"বাবা রে বাবা! যে দিকে যাবো কেবলই শিল্প-চর্চ্চা হচ্ছে! আমি যে এর ভিতর কোথায় যাই, ভেবেই পাই না!"

বাস্তবিকই ডালির বিবাহের জন্য বরের জুতা-আসন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় শিল্প-জাত দ্রব্য লইয়া সর্ব্বাণীরা পিসি-ভাইঝিতে লাগিয়া রহিয়াছে, এখনও তাদের বসিবার ঘরের একটা কৌচের উপর ডুবিয়া বসিয়া সর্ব্বাণী একটা কার্পেটের আসনের ঘর কালো পশম দিয়া ভরাইতেছিল, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল — "তুমিও এর ভেতর ঢুকে পড়ো বাইরে থাক্‌চো বলেই না মুস্কিল!"

ডালি ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "ইস্, আমার বয়ে গেছে, আমার ভারি গরজ কি-না!"

সর্ব্বাণীর সূচের পশম ফুরাইয়াছিল, নূতন পশম পরাইতে পরাইতে ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর করিল, "তোর না তো গরজটা কার, শুনি? আমরা যে দয়া ক'রে দিচ্ছি ব'লেই না, না হ'লে হাতে সুতো বেঁধেই না তোকে এইসব তৈরী করতে লেগে যেতে হতো, না?"

ডালি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "আহা গো! তা আর নয়! কেন এইসব বরকে না পরালে বুঝি বিয়ে আইন-সিদ্ধ হয় না? না, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? হ্যাঁ সবুদি! তুমি বুঝি তোমার বরের জন্যে নিজেই সব ক'রেছিলে? নিশ্চয় ক'রেছিলে, না হ'লে আমায় বলছো কেন?"

সর্ব্বাণীর সূচে সুতা পরানো হইয়া গিয়াছিল, সে অর্দ্ধসমাপ্ত আসনখানার উপর পশমের টোপ তুলিতে তুলিতে হাসিয়া কহিল, "দূর! আমার আবার বর কে?"

ডালিও হাসিয়া কহিল, "কেন, সেই আধখানা বর, যার জন্যে আজও উদাসিনী হ'য়ে রয়েছ, সেই! আবার কে?"

সর্ব্বাণী এবার হাসিল না, বরং দেখিতে দেখিতে তার প্রফুল্ল-স্মিত-মুখ ঈষৎ ম্লান হইয়া আসিল, চাঁদের উপর একখণ্ড হাল্কা পাতলা মেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন দেখায়, তার সহাস্য সুন্দর মুখখানাকে তেমনই দেখাইল।

কি একটা অজ্ঞাত গোপন মনোবৃত্তির আবেগে বুকটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের ভারে ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই আকস্মিক জাগিয়া-ওঠা মানসিক দুর্ব্বলতাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখের উপর একটা সচেষ্ট হাসির আভাস টানিয়া আনিয়া সে সহজভাবেই উত্তর দিল, "তবেই দেখ, আমি ও-সব করি নি ব'লেই না, আধখানা বরের কনে হয়ে র'য়ে গেলাম। মহাভারত অশুদ্ধ হয়-না-হয় দেখচো তো?"

ফস্ করিয়া সর্ব্বাণীর হাত হইতে কার্পেটের টুকরাটা টানিয়া লইয়া ডালি ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিয়া ফেলিল, "না, বাপু! তা হ'লে আমি এক্ষুণি দু'চার ফোঁড়ও অন্ততঃ বুনে দিচ্ছি, তোমার মতন আধখানা-বরে আমার চলবে না, আমার পুরোপুরি সবটাই চাই।"

আবারও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সর্ব্বাণীর বুক ঠেলিয়া

গলার গোড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিল। একান্ত বিমনা-ভাবেই সে যেন কলের মতই উচ্চারণ করিয়া গেল, "সবটাই তোকে দিলুম।"

ডালি কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নিজের লজ্জায় নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সর্ব্বাণীর কথার এই অসঙ্গতি তার কানে ঠেকিল না, ঠেকিলে নিশ্চয়ই সে হাসিয়া উঠিয়া কোনো-না-কোনো একটা বেফাঁস প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহাতে সংশয় নাই। হয়তো বলিয়া বসিত, "এটাও কি তোমার দখলে এসে গেছিল না-কি?

(ক্রমশঃ)

জীবনের তাঁত

শ্রীসুকোমল বসু

জীবনের তাঁত বুনে চলিয়াছে ময়ূরপঙ্খী সাড়ী
আধেক উজল—আধেক আঁধার ভারী।
সুখ-দুঃখের টানা-পড়েনেতে ভাই
আটকিয়ে গেছে আমাদের পরমাই!
আশার লম্বা মোটা সুতোগুলি পাক্ খেয়ে খেয়ে এসে
ছিঁড়ে সরু হ'য়ে মাকুর বুকেতে মেশে।
আকাঙ্ক্ষা যত জট্ বেঁধে যায়—ছিঁড়ে দিতে হয় তাই
নাগাল পাওয়া ও পরিমিত সুতো—তার বেশী কাজ নাই!
জন্ম-মৃত্যু দু'ধারে আঁচল—তারই বুকে চলে খেলা
প্রাণ ধারণের মেলা!

জীবনের তাঁত আমাদেরই হাতে চলিছে ভীষণ জোরে
মাকুর লাট্টু বন্ বন্ ক'রে ঘোরে।
খোল্‌তাই রং ভাঁজে ভাঁজে যবে চক্ মক্ ক'রে ওঠে
আমাদের হৃদি-সরোবরে ফুল ফোটে
মরা কালো রং যবে দেয় ফের উঁকি—
নিরাশায় ভাই আমরাই পড়ি ঝুঁকি'!
ময়ূরপঙ্খী সাড়ীর আঁচলে টানা-পড়েনের মত
আঁধারে হৃদয় ম'রে যায় ফের আলোতে সমুন্নত!
মেকী ধারণা যা ছোট হ'য়ে যায় ঠাসা-বুনানীর চাপে
লম্বা-আশার সুতো ছিঁড়ে যায় সম্ভাবনার মাপে।
ময়ূরপঙ্খী সাড়ীর মতই আলো-আঁধারের খেলা
জীবনের হাটে—এই নিয়ে চলে মেলা!
সুখ-দুঃখের টানা-পড়েনেতে ভাই
আট্‌কিয়ে গেছে আমাদের পরমাই!

কালিম্পঙ ও সিক্কিমে কয়েক দিন

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তিস্তা-ব্রিজ হইতে কালিম্পঙের রাস্তায় অর্দ্ধমাইল আন্দাজ গিয়া বাঁ দিকে গ্যাঙ্‌টকের রাস্তা। 'অটোমোবাইল এসোসিয়েসনে'র সৌজন্যে রাস্তা ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই—ঠিক মোড়ের উপরেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বিপজ্জনক রাস্তায় সতর্ক করিবার সাইন-বোর্ডও দেওয়া আছে। যাইতে বহুদূর পর্য্যন্ত 'ত্রিশূল মার্কা' পোষ্ট দেখিলাম—গ্যাঙ্‌টকের ১০।১৫ মাইল আগে হইতে আর দেখিলাম না—বোধ হয় এসোসিয়েসনের লোক গ্যাঙ্‌টক্ পর্য্যন্ত পৌছায় নাই। রাস্তা অপরিসর, মাত্র একখানি মোটর যাইতে পারে — ৫০০।৭০০ গজ দূরে দূরে রাস্তা একটু চওড়া করিয়া দুইখানি গাড়ি একত্রে যাওয়ার স্থান রাখা হইয়াছে। 'ষ্টিয়ারিং'-এ বসিলে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দেখা আর চলে না। রাস্তা বরাবর সিঙ্‌টাম্ (সিক্কিম্‌রাজ্য) পর্য্যন্ত তিস্তার ধারে ধারে গিয়াছে। উপরে রাস্তা — ৫০০।৭০০ ফুট নীচে তিস্তার ভীষণ গর্জ্জন, গাড়ীর চাকা ২।১ ফুট স্থানচ্যুত হইলেই একেবারে নদীগর্ভে! প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ভাগ্য 'ড্রাইভারে'র হয় না। তবে ৪।৫ মাইল পরে পরেই গাড়ী দাঁড় করাইয়া, হয় ইঞ্জিনের জল ঠাণ্ডা করা, নয় ব্রেকব্যাণ্ডে জল ঢালার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং তাহার ফাঁকে ফাঁকেও প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভা দেখিবারও সুযোগ ঘটিতেছিল। রাস্তার ধারে শালবন দেখিয়া মনে হয় শিকারের স্থান। কয়েক মাইল দূরেই তারখোলা ফরেষ্ট বাংলো। সেখানে খবর পাইলাম, দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনর ও কালিম্পঙের সবডিভিসনাল অফিসার প্রমুখাৎ সাহেব-সুবারা এখানে মাঝে মাঝে শিকারের তল্লাসে আসিয়া থাকেন।

রংপো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। সেখানে রংনি নদী উত্তর-পূর্ব্ব হইতে আসিয়া তিস্তার সহিত মিশিয়াছে, নদীটি দুই রাজ্যের সীমানায় প্রবাহিত। রংনি নদীর উপর রোপ-ব্রিজ, গাড়ী চলিলে ব্রিজটি দুলিতে থাকে। নদীর ধারেই ব্রিটিশ থানা। গুর্খা দারোগা
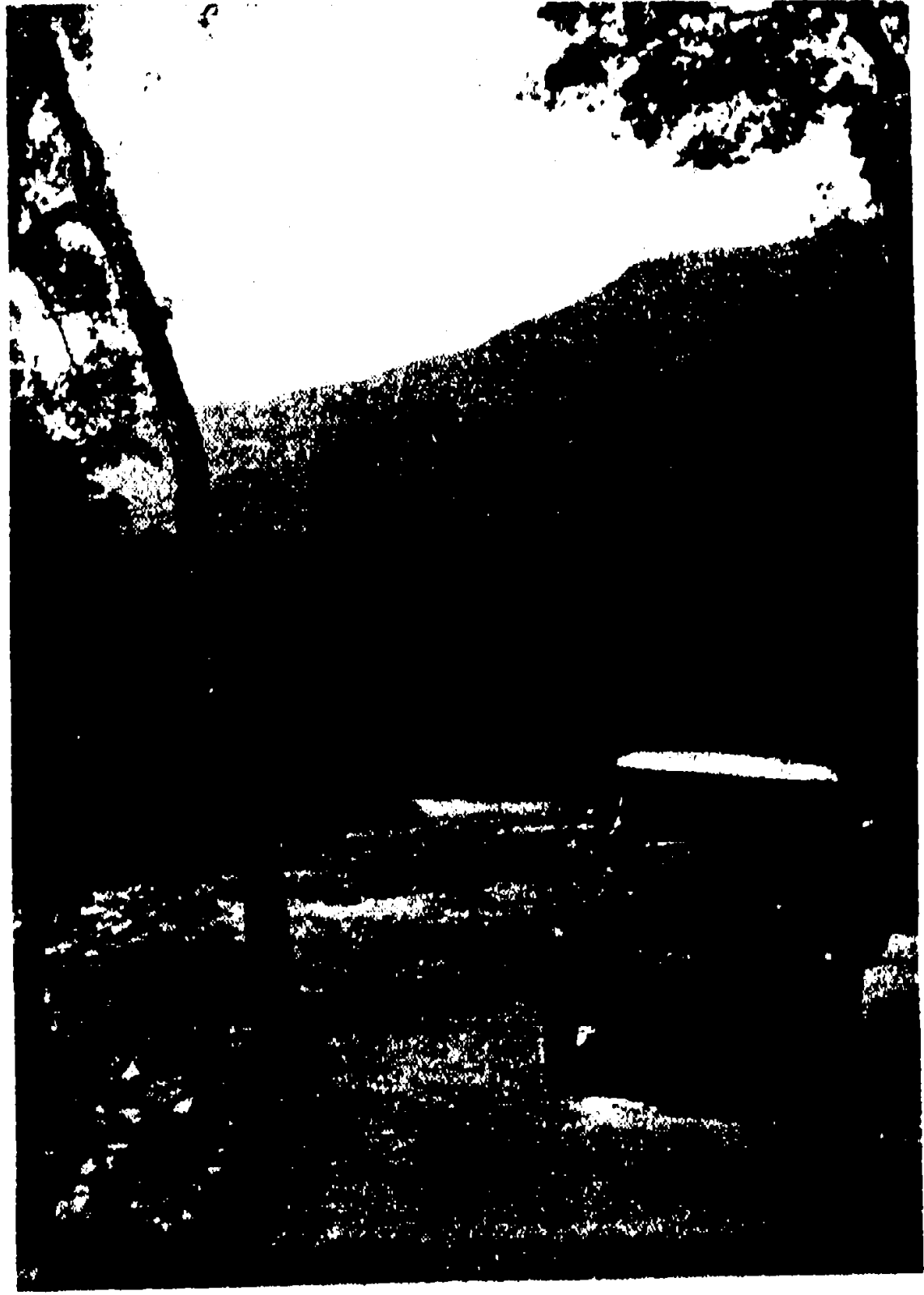
তিস্তা নদীর ধারে রাস্তা

ও গুর্খা সিপাহীরা আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রফুল্ল মজুমদার বন্দুকটি এইখানে 'ডিপজিট' রাখিয়া একখানি রসিদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ সিক্কিম্ রাজ্যে বন্দুক লইয়া যাইবার পাশ আমাদের ছিল না। বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গদের সিক্কিম্ রাজ্যে যাইতে হইলে পাশ থাকা দরকার।

ভারতীয় 'কালা-আদমির' পক্ষে সে নিয়ম নাই শুনিয়া মনে একটু আনন্দ হইল। দেখিলাম কয়েক জন রংনি নদীতে মাছ ধরিতেছে—খবর পাইলাম যে এ-স্থানে মহাশোল মাছ ধরিবার জন্য অনেকের শুভাগমন হয়।

ব্রিজ পার হইয়া সিক্কিম-রাজ্যে পৌছিলাম। শুনিয়াছিলাম এখানে না-কি সিক্কিম্-পুলিস গাড়ী এবং জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করে—উদ্দেশ্য 'চুঙ্গি' আদায় করা। সিক্কিম্ রাজ্যের প্রথা একটু নূতন রকমের। ব্যবসায় করিবার অধিকার নিলামে ডাকিয়া এক একজনকে দেওয়া হয়। একজন সিগারেট বিক্রয়ের

মহারাজার উদ্যানে বসিবার স্থান — সিক্কিম্

অধিকার নিলামে ডাকিয়া লইয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ সিক্কিম্ রাজ্যে সিগারেট আমদানী করিতে পারিবেন না। অবশ্য বিক্রয় করিবার দাম রাজার তরফ্ হইতে ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। কাপড়, জামা, জুতা, টোটা-বারুদ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষের জন্য এই প্রথা। সীতারামবাবুর ট্যাক্সি গাড়ীতে একজন খাঁ-সাহেব ছিলেন। আলাপে জানিলাম, তিনি সিক্কিমের যাবতীয় চামড়ার ঠিকা লইয়াছেন এবং তাহারই তদারকে গ্যাঙ্‌টক্ যাইতেছেন। যে কোন কারণেই হউক আমাদের গাড়ীতে পুলিস আসিল না, খানাতল্লাসীও করিল না। রংপো পোষ্ট অফিসে, বাঙ্গালী মাষ্টারবাবু ও বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। রংপোতে বহু বেহারী আস্তানা গাড়িয়াছেন, আমরা ডোমিসাইলড্, স্বনাম-ধন্য কেদারবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে 'ধেমো-শালিক'। তাঁহারা সকলেই সুখে আছেন। একখানি নূতন ডজ্ গাড়ী তাল-তোবড়া অবস্থায় দেখিয়া মনে আতঙ্ক হইল, শুনিলাম ড্রাইভারের একটু পান দোষ ছিল। কমলালেবুর প্রচুর আমদানী দেখিলাম, পাইকারও অনেক—সবই চালান হইয়া যায়। রাস্তায় যাইবার সময় কমলালেবুর বাগান এবং ২।১টা গাছে লেবু ফলিয়া থাকিতেও দেখিলাম। বহু কুলি দলে দলে কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া নীচে নামিতেছে। বহু চেষ্টাতেও কমলালেবু কিনিতে পারিলাম না। রংপো হইতে রাস্তা বরাবর চড়াই, সময়ে সময়ে সেকেণ্ড-গিয়ারও ফেল করে। তিস্তার ধারে ধারে 'সাঁকো খোলা' পার হইয়া সিংটাম পৌছিলাম।

সিংটাম একটি ছোট ব্যবসায়ের স্থান। এখানেও কয়েকটি বেহারীর দোকান দেখিলাম। জল হাওয়া এখানকার বড় খারাপ। মশার উৎপাতও না-কি খুব বেশী। এখান হইতে দার্জ্জিলিং পদব্রজে যাওয়ার একটি রাস্তা আছে। পাছে মশা কামড়ায়, এই ভয়ে সেখান হইতে শীঘ্রই রওনা হওয়া গেল। এবার তিস্তা ছাড়িয়া অন্য নদীর ধারে ধারে চলিলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ নদীটিকেও না-কি রংনি বলে। খামডঙ্ পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে রাস্তা, পথে ছোট একটি টানেল (Tunnel)—দেখিয়া কালকা-সিমলার রাস্তা মনে পড়িল। খামডঙ্ হইতে গ্যাঙ্‌টক্ রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও পরিসর, রাস্তার উন্নতি-কল্পে চেষ্টারও ব্যবস্থা দেখিলাম।

সিকিম্ রাজ্যের ভিতরের রাস্তা হইলেও ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। কারণ এই রাস্তাটি একেবারে তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। গ্যাঙ্টক্ পৌছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল বাজারের উপর পৌছিতেই অনেক লোক গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বুঝিলাম বাঙ্গালীদের আগমন কদাচ কখনও হয়। ডাকবাংলা আগেই অন্য কোন ভদ্রলোক রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাজারের সকলে মিলিয়া আমাদের বাসোপযোগী একটি বাড়ী দেখিতে ব্যস্ত হইলেন। ২'টি বাঙ্গালী মুসলমান দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিয়া আনন্দ পাইলাম। তাঁহাদের নিকট খবর পাইলাম যে, বাজারের নীচেই স্কুল মাষ্টার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসা — সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হইল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, বাহ্যিক শক্ত আবরণের ভিতরে মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ আছে এবং তাহার সাড়াও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

গ্যাঙ্টক্—সুন্দর পরিপাটি সহর, রাস্তাগুলি পরিষ্কার, একটা পরিচ্ছন্নতার আভাষ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিকিম্ রাজ্য আয়তন বা রাজস্বে ছোট হইলেও রাজনৈতিক হিসাবে বেশ important। ৬।৭ লক্ষ টাকা রাজ্যের আয়—সমস্ত টাউনটিতে ইলেক্‌ট্রিক আলো, স্থানীয় পাহাড়ী লোক ছাড়া অন্য কাহারও নিজস্ব বাড়ী নাই। যে কয়খানি ভাল বা বাসোপযোগী বাড়ী আছে সমস্তই রাজার। প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে ছোট বাজার এবং সেই রাস্তার উপর সপ্তাহে ২ দিন করিয়া হাট বসে। সকালে চা খাওয়ার পর সহর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। মহারাজার নাম স্যর্ টাসি নাম গয়াল—মহারাজার প্রাসাদে আসিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট আমাদের 'কার্ড' দিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি রেণক্ কাজি — সমাদরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন, শুনিলাম পালি-ভাষার বহু পুরাতন গ্রন্থ এখানে বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিতে রক্ষিত আছে এবং সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে অনেক শিক্ষিত লোক এখানে শুভাগমন করিয়া থাকেন। প্রাইভেট সেক্রেটারি, মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা সেখান হইতে চিফ্ জজ রূপনারায়ণবাবুর বাড়ী আসিলাম। এককালে তিনি আমাদের সতীর্থ ছিলেন—ডেরাইসমাইল খাঁ সহরে ওকালতি করিতেন। তাঁহার নিকট আচার-ব্যবহার, আইন-সম্বন্ধীয় ব্যাপার জ্ঞাত হইলাম। সেখানে কোন পাণ্ডুলিপি আইন নাই। রাজ্যটি ৬৮টি এলাকায় বিভক্ত।

গ্যাঙ্টকের পথে 'টানেল্'

প্রত্যেক এলাকা ১ জনের সহিত নির্দ্ধারিত ক'রে ১৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া আছে। ইজারাদারগণ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে জজের কাজ করেন। তাঁহাদের আপিল চিফ্ জজের নিকট হয় — চূড়ান্ত আপিল মহারাজার নিকট হইয়া থাকে। এলাকাদার জজগণ ৪ ভাগে বিভক্ত। ফাষ্ট ক্লাস জজদের ১ মাস পর্য্যন্ত কয়েদ দিবার অধিকার আছে, বাকীগুলির কেবল

জরিমানা করিবার ক্ষমতা আছে। জরিমানার টাকা অর্দ্ধেক রাজার খাজনা-খানায় আসে, বাকী অর্দ্ধেক এলাকাদারদের প্রাপ্য। এই অদূরদর্শী প্রথার বিরুদ্ধে আমরা সকলেই মত প্রকাশ করিলাম—চিফ্ জজও ইহার পক্ষপাতী নন জানাইলেন। রাজ্যের ব্যাঙ্কার (Banker) একটি মাড়োয়ারী 'ফার্ম' সরকারী রাজস্ব ঐ ব্যাঙ্কের মারফতে আদায় হয় ও খরচ-পত্রও ব্যাঙ্ক হইতে হইয়া থাকে। রাজকীয় কার্য্যের জন্য সেক্রেটারিয়েট আছে। Mr. C. E. Dudley স্থানীয় 'টাসি নাম গয়াল' হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মাষ্টার এবং মহারাজার জেনারেল সেক্রেটারি। মহারাজার আরও দুইটি সেক্রেটারি আছেন, একটি রায় সাহেব রেণক্ কাজি অপরটি গ্যালসন্ কাজি, রাজ্য-সম্বন্ধীয় কাজ-কর্ম্ম এই সেক্রেটারি ত্রয় মহারাজার নির্দ্দেশ অনুসারে করিয়া থাকেন। বিচার-কার্য্য চিফ্ জজের

মহারাজার প্রাসাদ ও ডাক্ বাংলো যাইবার পথ

এলাকা, তাঁহার ফাঁসি পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা আছে, তবে তাঁহার capital punishment-এ আস্থা নাই। চল্লিশ জন কয়েদী রাখিবার মত জেল আছে। Warder এবং জেলের অফিসাররা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আমরা যেদিন গ্যাঙ্‌টক্ পৌছিলাম, সেদিন চারিটি কয়েদি জেল হইতে পলাইয়াছিল। স্কুলের Boy Scouts তিনটিকে গ্রেপ্তার করে। চতুর্থটির সন্ধান তখনো মিলে নাই। Jailor আনন্দ সহকারে জেলের ভিতর-বাহির আমাদিগকে দেখাইলেন। ব্যবস্থা ভালই দেখিলাম, কয়েদীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর আছে। পূর্ণিয়া জেলে নন্-অফিসিয়াল ভিজিটরের কাজ বহুদিন করিয়াছি। কয়েদীদের প্রতি জেলার এবং ওয়ার্ডারদের সহৃদয়তা দেখিয়া বেশ আনন্দ হইল।

বৈকালে রেণক্ কাজি স্বয়ং আসিয়া খবর দিয়া গেলেন যে, মহারাজার সহিত পরদিন সকাল আটটার সময় সাক্ষাৎ হইবে। ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী বেশে মহারাজার নিকট যাই। কিন্তু রমেশবাবুর ইচ্ছানুসারে ইংরাজী পোষাক পরিয়াই যাইতে হইল। মহারাজার সম্মানের জন্য 'খাদা' (Scarf) উপঢৌকন দিবার প্রথা শুনিলাম। পাঁচ টাকা মূল্যে দুইখানি 'খাদা' লইয়া রাজ-দর্শনে গেলাম। যাইয়া শুনিলাম মহারাণী 'গুম্বা' (Monastery)-র কাজে ব্যস্ত। আমাদেরই ভুল হইয়াছিল, পূর্ব্বে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলি নাই যে, আমরা মহারাণীর সহিতও সাক্ষাৎ-অভিলাষী। মহারাজাকে একখানি 'খাদা' উপহার দিলাম। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভূমিকম্পে আমাদের দেশে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শুনিয়া মহারাজা বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সিকিম রাজ্যেরও বহু 'গুম্বা' (Monastery) ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ কথাও জানাইলেন। প্রাসাদটি ছোট, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। ফুল বাগানটি সুশোভন এবং সুরক্ষিত। প্রাসাদের পশ্চাতেই 'গুম্বা'। মহারাণী সেইখানেই কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন — ভূমিকম্পে 'গুম্বা'টি নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি 'গুম্বা'র প্রত্যেক অংশ যত্নসহকারে দেখাইলেন। নীচেই সেক্রেটারিয়েট এবং দরবার-হল। মহারাজা এখানে এলাকাদারদের লইয়া দরবার করিয়া থাকেন। প্রাসাদের সামনে চওড়া রাস্তা — ডাকবাংলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ডাকবাংলার পাশেই 'হোয়াইট্‌ হল' ক্লাব। ক্লাবে টেনিস্‌, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা আছে। সরকার মহাশয় ও তরফদার মহাশয় (স্কুল মাষ্টার) ক্লাবের মেম্বর—রমেশবাবুর সে বালাই নাই। তাঁহাদের ও চিফ্‌ জজের আগ্রহে রোজই বৈকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাবে সময়টা মন্দ কাটিত না। মনে গর্ব্ব ছিল যে, পূর্ণিয়া ষ্টেশন ক্লাব (লেখকই তাহার সেক্রেটারি) মফঃস্বলের ক্লাবের মধ্যে অদ্বিতীয়। পাহাড়ীদের ক্লাব দেখিয়া গর্ব্বে একটু আঘাত লাগিল। ভূতপূর্ব্ব Political Agent 'হোয়াইট্‌' সাহেবের স্মৃতি-কল্পে চাঁদা করিয়া ক্লাব-ঘরটি তৈয়ারী হইয়াছে। এখানকার পাহাড়ীরা দুই ভাগে বিভক্ত—তিব্বতী এবং ভুটিয়া। মহারাজা তিব্বতী আভিজাত্য গৌরব কড়ায়-গণ্ডায় বজায় রাখিয়া থাকেন। ভুটিয়ারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এক-কালীন একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে। এক সংসারের ৪।৫ ভাই মিলিয়া একটি স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিবাহের কোন নিয়ম বা প্রথা নাই। চিফ্‌ জজের নিকট শুনিলাম যে, অনেক সময় বিবাহিতা স্ত্রী কি-না নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে এবং ইদানীন্তন এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে স্ত্রীলোকটির নিকট বাড়ী, ঘর, বাক্স, পেট্‌রা ইত্যাদির চাবি আছে কি-না খোঁজ লইয়া থাকেন এবং যদি থাকে তবে তাহা বিবাহের স্বপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। আইন-ব্যবসায়ী হইয়া আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা চলে না, তবে যদি কেহ বলেন যে, বহু আইনের দেশে বাস করিয়া নাগ-পাশের বন্ধন অনুভব করিতে হয়, তাঁহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। দশ আজ্ঞার (Ten Commandments) পরিবর্ত্তে ১০।২০ হাজার আইনও (Acts) আমাদের দেশে শান্তি আনিতে সক্ষম হইতেছে না।

এখানেও Tuberculosis-এর হাঙ্গামা দেখিলাম। সাধারণ দরিদ্র লোক ভাল খাদ্য পায় না, কিন্তু চা এবং সিগারেটের চলন খুব বেশী। Scottish Mission-এর মেম সাহেব তাঁহার কার্য্য সে দেশেও করিতেছেন, একটি মেয়েদের স্কুলও স্থাপন করিয়াছেন। শব-সৎকারের প্রথা অদ্ভুত। শব-বাহকেরা সৎকারের পর ধরাশায়ী না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। নেপাল, ভুটান, তিব্বত এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে থাকার জন্য সিকিমের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। Mr. Williamson, I. C. S. এখানকার Political Agent। তাঁহার বাড়ী এবং চতুর্দ্দিকের সীমানা একটি পাহাড়-চূড়ার সমস্ত অংশ লইয়া। তাহার চারিদিকে কাঁটা তার দিয়া ঘেরা। মাঝে মাঝে "Trespassers will be prosecuted" সাইন বোর্ড দেওয়া আছে। মহারাজার প্রাসাদে এসব কিছুরই হাঙ্গামা নাই।

এখান হইতে তিব্বত সীমানা পর্য্যন্ত যাওয়ার বেশ সুবিধা আছে। গ্যাঙ্‌টক্‌ হইতে 'কার্পুনাঙ্‌' ১০মাইল। সেখানে ডাকবাংলা আছে আবার ১০মাইল পরে 'চাঙ্গু'তেও ডাকবাংলা আছে। 'চাঙ্গু' হইতে তিব্বতের সমতলভূমি (Tibetan Plateau) দেখিতে পাওয়া যায়। পদব্রজে কিম্বা ঘোড়া ভিন্ন 'চাঙ্গু' যাওয়ার আর কোন উপায় নাই। 'চাঙ্গুর' নিকটে 'নাথুলা' পাস পার হইয়া তিব্বত যাইতে হয়।

ডানপিটে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

যে সময়ে আমাদের গল্পের সুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লাচ্চাদার রাব্ড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, সহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল সহরের অবস্থা, গাড়ী-ঘোড়া ছিল কম। বুড়ুয়া মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নতুন ধরণের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। এক্কা ও স্প্রিং-বিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, সহরের বাহিরে উটের গাড়ী চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খুব নাম ও প্রসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়ীটা ছিল একটা হোটেল-খানা। চাকুরি-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়-স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়ীতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ী ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হয়তো সহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া, ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ী ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরোদিন এই রকম চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভ্যাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সঁদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ়তা, বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদ্‌মায়সি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন সখের থিয়েটারের ধূম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণ-স্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই ষ্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা-মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় সুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবনবাবুও গবর্ণমেণ্ট পেন্‌সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে

কম্পাউণ্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল, যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্রাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জ্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ্ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এ সবগুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ী নদীয়া জেলা মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা সহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল যে, মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে — দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে, বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ী করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্রাক্‌টিস্ করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না?

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়াই গেল নেপালে। গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটী লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখানে টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটী ফুরাইলে আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ সে দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজ-কালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্ত্তী নরহরিহরপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাক্‌রা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টিফিকেট্ আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস্ জমাইয়া ফেলিল। সে

উপরোক্ত হাতুড়েদলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়ী আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ীর একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্পেন্সারিও ছিল না — রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ীর সামনে বটতলায়, তাহাদের বসিবার স্থানের পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ীর সামনে বট-তলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনে-রাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়ীতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ হাঁফাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়ীতে গড়ে তিন-চারটা সার্জ্জিক্যাল্ কেস্ লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যাদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিষ-পত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল। কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকান ঘরের সন্ধান করিতে লাগিল। যাদু স্যাক্রার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র।

২

সতীশের দু'টি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল। নিজের বাড়ীতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাক্রাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্নমুখে বলিল, ভাই তো মুখুয্যে ম'শায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কি-না?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না। তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল — আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ। নয় তো অন্য সবদিকে কোনো অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম, স্বামী পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্টিস্ বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ব্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে, এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামনগরের হাইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল।

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমন ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটীর নাম বিনয়, সে আই-এস্-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যেই নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এসব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো

ষোল বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোল বৎসরের জীবন নিতান্ত একঘেয়ে — রোগী-দেখা, খাওয়া, ঘুমানো — ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব, সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে, এক রকম জীবন-ধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই, নতুনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবার সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়ীতে আরামে সে ভিন্‌-গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে। মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিম্বা বিলের গভীর জলে বাগ্‌দী ছেলেকে ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে — সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে···রাম রাম সাহু হালুইকরের দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটী থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে···একবার সে, রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু — তিনজনে জঙ্গম বাড়ীর বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল!···

নেপালে একবার কর্ণেল খড়গ সম্‌সের জঙ্ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি—আর একটা মোড়কে পাঁচটী টাকা। সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চট্‌তে পারেন।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চ'টে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তাফা দিতে রাজি আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি তো যাওয়া দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।···

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকেদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে — কিন্তু সে শুধু বাহাদুরী লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জারি করিবার জন্য। এবার কিন্তু সে সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চির-কালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া এ গ্রামে যে কয়টী সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয় স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ায় অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী —ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—এঁরা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাক্‌রার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া

পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়েস, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরামও নিজে সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধূলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দুই-দুইটা ছেলে মারা গেল—ওই টুকু বংশের মধ্যে শিব-রাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্ত্তি ক'রে নেবেন আপনার ডাক্তার-খানায়—বছর তিনেক দেখে-শুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা-গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ক্রটী করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহারও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ছোটছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল না-কি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কতদিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর—বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্‌-বি পাশ করা ডাক্তার ক'টা আছে? কখনো যে সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ীর চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো-টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

৩

বিনয় এম্‌-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্‌-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইয়া সুদূর মেসোপোটেমিয়ায় গিয়াছে। সেদিন না-কি ছোটখাটো একটা খণ্ড যুদ্ধে আরবদের গুলী বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এম্‌নি হয়? বিনয় পত্রে এ ঘটনাটী বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরানো আড্ডাটী আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মরিয়া গিয়াছে—তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্ব্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম মিনিষ্টারের বাড়ীর সাম্‌নের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেছি। মেসিন্‌ গান? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল···আমাদের কাছে ও সব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'-চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া

সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ী নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রী লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরণের বে-মেরামতী পুরানো বাড়ীতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ীর পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটি হইবে ছেলের বসিবার ঘর, এইটি নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপোটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আশা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশ দিন করিয়া মাসখানেক কোনো খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্র-বধূকে নানা মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে।

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্ব্বল কথা শুনিল না — চোখে জল দেখা তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম। মুখুয্যে বাড়ীর তেঁতুল-তলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ীর উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে — এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সাহেবী-পোষাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।...বিনয়!...

মুখুয্যে গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজা করিতে বসিয়া-ছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুণ যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়-দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্ব্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ীর উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরিল্লুট দিল।

৪

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল — তারপরে সে মহকুমায় গিয়া বসিয়াছে। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তারের কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্ব-গ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্ব্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেচেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা —

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে। গণেশ-মহল্লায় সে ডান্‌পিটে সতীশ — ঠাসা বন্দুকের এক আওড়ে অসিঘাটের ও-পারের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল, মনে আছে, বুড়ুয়া মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়া ডুব সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা —

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্ত্তা' বলিতে সুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল; বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এতদিন বাড়ীতেই বসিয়াছিল —এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে — পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয় করিত, লোক-লজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্র-বধূরা গ্রামের বাড়ীতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়ীতে রাখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন সর্ব্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। একমাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল পথ আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকেও যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না। প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটী দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের বিশেষ কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।…

—কে?

—আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আয়, পটল! আয় আয়, —

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাক নাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চোদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন কেমন করে সর্ব্বদা — কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না। অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে আসিতে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কি রে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল— সেই একই রকম, দাদা। বরং আরও বেড়েচে।

পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কসিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, এক ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, কাজকর্ম্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাকটিস্ সুরু করি। কিন্তু এখন আর কেউ আমায় ডাকবে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে, শ্যামবাবু — সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাকবে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ

ক'রে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস্, পটল। কতকাল দেখিনি—এই শুনবি তবে, আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুর দাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুসি করিবার জন্য বলিল — বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া চন্দ্রগিরি, রত্নগিরি, রক্সৌলের যে পশুপতিনাথ-মেলার দৃশ্য—এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখায় ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই খ্যাখ্, একেবারে নেই—স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুণ, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েচে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুলবে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম্ম একেবারেই নাই—এ ধরণের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো—আপন মনে বসিলেই সেই সব কথাই মনে আসে।

গাঙুলি বাড়ীর আন্নাকালী দুটী কচি শশা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল — গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা ব'ললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়োয় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ উজ্জ্বল চোখে আন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটর-ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, অমন উপার্জ্জন-ক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই — তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়ীতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

আন্নাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটী কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যাটীর ওই নাম রাখিয়াছিল, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুলবো না জ্যাঠাবাবু। মেয়েমানুষে অমন রাঁধ্তে পারে না।

সতীশ খুসি হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আন্না?

আন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে আরান্ধর দিনে? তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্তে তো কোথায় যেতে পারি নে আন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু-বান্ধব—তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখ্বে শুন্বে কে, সেই জন্তেই তো আছি আটকে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই শুন্বি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে

হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দু'জনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল — জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে !—

—ধর্, ধর্, মা, ধর্—নিয়ে আয়। নাঃ, জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল — এসো জ্যাঠাইমা, কোথায় যাচ্ছ, এসো—

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ; তা ইয়ে আন্না, কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস্ এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন এক মহকুমার টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া যে অবহেলা করে তা' নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ীর মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্য্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে!

বিনয় বলিল — থাক্ বাবা, থাক্, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তস্বরে বলিল — উঃ, ঘেমে একেবারে — দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ী কোথায়?

— গাড়ী আছে, ইঞ্জিন্ খারাপ হয়ে গেছে, মেরামতের জন্য একমুঠা টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ী গ্যারেজে পড়ে।

— পটল কোথায়?

— কল্‌কাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিন মাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দু'মাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জায়গায় খরচ বিনয় তো আর চালাইতে পারে না। দেশের বাড়ী, টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়!

বিশেষ কিছুরই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দু'টী টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দু'টী প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবারে দত্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল, কিছু পেয়েচি। তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগ্‌বে আবার?

গ্রামের একটী ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটী লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—জানো

উমাপদ, ভাবচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়ীতে রেখে আমি কাশী চ'লে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চলবে। নইলে এদিকে সবই তো শুনলে—বিনয় বড় মুস্কিলে পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই—এই বাজারে দু'টো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চ'লে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়,...তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্ত্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এ সব গল্পের সঙ্গে পরিচিত, সে বলিল—পাগল হয়েচেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে—হেঁ-হেঁ হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী ষ্টেশনে দুপুর বেলা নামিল। স্ত্রীকে মেহেরপুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ীর চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা?

কাশীতে নামিয়া সতীশ মনে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এত দিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়া-গাঁয়ে জীবনের ত্রিশটা বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগেকার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল? এ কাশীকে তো সে চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজোছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটীতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি — মানে, অম্বলের অসুখে আমার — এতদিন ছিলে কোথায়?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে — তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুর-বাড়ী বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখের হাসিমাখা, কত অজানা তরুণমুখ—গান...আনন্দের উচ্ছ্বাস...দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল — দাদা, আমি চাকুরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যাবেলা যেন প্রত্যেক

বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চাশ বছর আগেকার নিজে?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কতরাত পর্য্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কাশীর কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুসি হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, দি দাম পাঠাইবে। ভাল পট…বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল-তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমা এখানে আর ক'দিন থাক্‌বো? তুমি একটা বাঙা সরকারি গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায় অভাবে রাঁধুনি গিরিতেও রাজি আছি। খুব ভা রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দু কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধ দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

আজও আমার হয় নি সারা
তোমার পূজা মোর দেউলে।

হেলায় হেলায় গেল বেলা
নিঠুর তুমি রইলে ভুলে।
আকাশ ধরা আলোক হারা,
তিমির ঘন স্বপন ভরা,
গন্ধহারা বরণ-মালা
সন্ধ্যা বেলায় শুক্‌নো ফুলে।

মনোহরণ বেশে,
দাঁড়াও যদি বন্ধু আমার
কভু পথের শেষে—

বন্দনা গান হবে গাওয়া
পূর্ণ হবে চাওয়া পাওয়া
দিনের শেষে শেষ আরত্রির
প্রদীপ খানি ধরব তুলে।
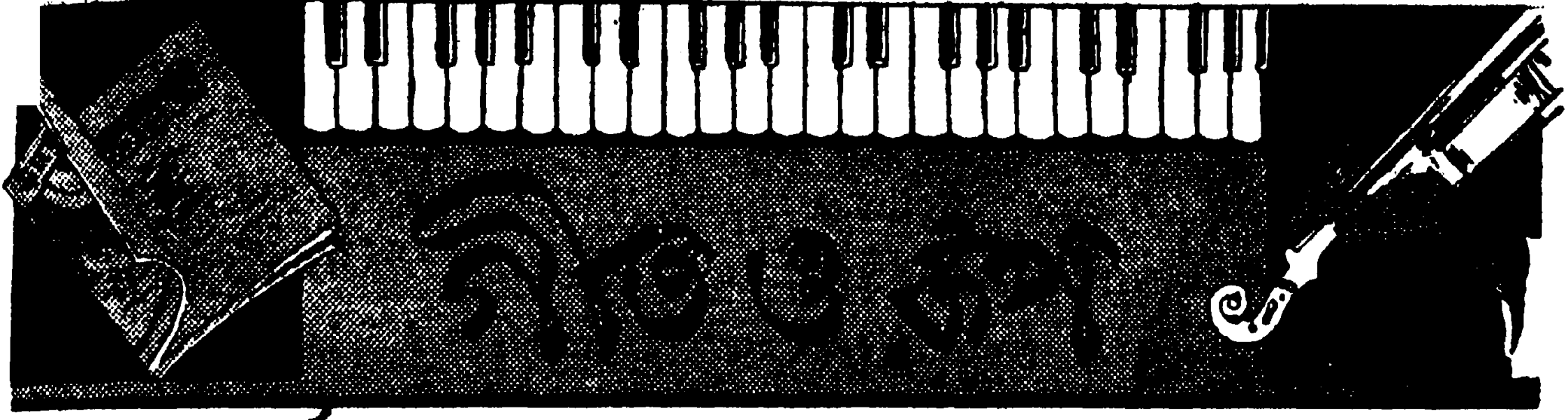
কাফীতোড়ী—দাদ্‌রা

রাঙ্গা পদে কে দিল মা এত জবা ফুল,
রাঙ্গা জবা হার মেনেছে, তোমার চরণ দু'টি সকল রঙ্গের মূল।
তোমার অরূপ রাশি, প্রকাশিছে অমর জ্যোতিঃ,
ত্রিভুবন জন তব গুণ গানে, হয়েছে আকুল॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর-সরস্বতী

{ রা | মা পা দা | পা র্সা ণা | দা পা দা | মপা মজ্ঞা রা | জ্ঞা মা মা | পা -া } { ণা |
{ রা | ঙ্গা প দে | কে ০ দি | ল মা ০ | এ ত ০ ০ | ০ জ বা | ফু ল্ } { রা |

ণা ধা মা | পা দা র্সণা | দা পা -া | া া } া | া পা দা | মপা মা -া |
ঙ্গা জ বা | হা র্ মে | নে ছে ০ | ০ ০ } ০ | ০ তো মার্ | চ র ণ্ |

জ্ঞা রা -া | সা রা মজ্ঞা | া মা মা | পা -া ||
দু টি ০ | স ক ০ | ল্ র ঙ্গের্ | মূ ল্ ||

{ মা | পা ণদা ণা | র্সা র্সা নর্সা | র্সা র্সা -া | া া পা | দা ণা র্সা |
{ তো | মা র অ | রূ প ০০ | রা শি ০ | ০ ০ প্র | কা শি ছে |

র্সা র্রা ণা | দা পা -া | (া া) } পা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সা র্রা | ণা র্সা ণা |
অ ম র | জ্যো তি ০ | ০ ০ } ত্রি ভু ব | ন জ ন | ত ব গু |

দা পা পা | া া মজ্ঞা | মা পা পা | পদা ণর্সা র্সণা | দপা মজ্ঞা রসা | ণ্সা -া ||
ণ গা নে | ০ ০ হ | য়ে ছে আ | কু০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ল ||

তান

১´ ০ ১´ ০

১। ণ্সা রমা পদা | ণর্সা র্জ্ঞা র্সা | ণদা পমা পদা | ণর্সা ণদা পমা |
অ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

১´
জ্ঞরা সা |
০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০

২। র্জ্ঞা র্সা র্সা | ণর্সা ণদা পমা | পদা ণর্সা র্জ্ঞা | র্সা ণদা পমা |

১´
জ্ঞরা সা |
০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০

৩। ণ্সা রমা পণা | দা পা -া | া া মপদা | মপা মজ্ঞা -া |
অ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |

১´ ৩ ১´ ০
সরা -া -া জ্ঞা ঋা -া | ণ্সা রমা পণা | মা -া -া |
০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |

১´ ০ ১´
পা ধা ণা | র্সা র্সণা দপা | মজ্ঞা রসা |
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

অন্তরার তান

০ ১´ ০ ১´

৪। মা | পা ণদা ণা | র্সা র্সা নর্সা | র্সা র্সা -া | ণদা পদা ণর্সা |
তো | মা র অ | রূ প ০ ০ | রা শি ০ | ই ০ ০ ০ ০ ০ |

০ ১´ ০ ১´
া া া | পদা ণর্সা র্জ্ঞা | জ্ঞর্রা র্সণা দপা | দা মা মা |
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ তো |

০ ১ ০
পা ণদা ণা | র্সা র্সা নর্সা | র্সা র্সা -া | ইত্যাদি সমস্তটি
মা র অ | রূ প ০ ০ | রা শি ০ | গাইতে হইবে।

নূতন বই

['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

বিশ্বকোষ—(২য় সংস্করণ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৯নং বিশ্বকোষ লেন হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা মূল্য—॥০ আনা।

'বিশ্বকোষ' দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ছাপা, ছবি, কাগজ উৎকৃষ্ট। অতি কঠিন বিষয়ও লেখার গুণে সহজ বোধ হইয়াছে। জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, নগেন্দ্রনাথের কৃতী পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথের তত্ত্বাবধানেই বিশ্বকোষের প্রকাশ-কার্য্য এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে ও সমস্ত বিষয় এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে। সঙ্কলন-সৌষ্ঠবও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা বিশ্বকোষের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। ভরসা করি বড়দিনের পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ দেখিতে পাইব। এই সুন্দর বিরাট অভিধানখানি বাঙ্গালার তথা আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের বস্তু। সুতরাং ইহার কোন এক খণ্ড পাইতে বিলম্ব হইলে অধীর হইয়া উঠি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বকোষের সাফল্য কামনা করিতেছি।

সোনার কাঠি—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণীন্দ্রলাল শব্দ-শিল্পী। শব্দ চয়নে ও সুন্দর সুসম্বদ্ধ বাক্য গঠনে তাঁর মত সুনিপুণ শিল্পী আধুনিক লেখকদের মধ্যে বেশী নেই। এ বইখানিতে ছেলেদের জন্য লেখা দশটী গল্প আছে—প্রথম গল্প 'সন্দেশের দেশে' অনেকদিন আগে 'প্রবাসী'তে বার হ'য়েছিল। মণীন্দ্রলালের মিষ্টি হাতের ও কল্পনার পরিচয় এ গল্পটীর ছত্রে ছত্রে। কয়েকটী গল্প হ্যান্স্ এণ্ডারসনের গল্পের ভাব অবলম্বনে লেখা। বইখানির কাগজ ও ছাপা ভাল। যাদের জন্যে এ বই লেখা—তারা প'ড়ে অত্যন্ত খুসি হবে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপটখানি সুদৃশ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাউন দিল্লী এক্স্প্রেস্—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশাস্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল বুক সোসাইটি—১৮৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—চারি আনা।

একটি ছোট গল্প—৫৬, পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজপুতানা হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে 8-Down Express-এ নায়ক শ্যামলকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর প্রেম-চর্চ্চা। গল্পাংশের মধ্যে সম্ভাব্যতা এত অল্প যে, গল্প পড়িবার spell সহজেই ভাঙিয়া যায়।

লেখক খুব তাড়াতাড়ি গল্পটি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—তাই ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। যথা, 'মুখটাকে মানুষের করবার জন্তে'—অর্থবোধ হয় না। 'মুখটাকে মানুষের মুখের মত করবার জন্তে'—বলা লেখকের উদ্দেশ্য। 'দুয়েকটি বিদেশী মেয়েই বা না-কোন্ সে দেখেছে' (২৩ পৃঃ)—আমরা বলি না। বলি, 'দু-একটি বিদেশী মেয়েই বা কোন্ না সে দেখেছে।' 'ভাজায়-ডালনায়, মাছে-মাংসে একেবারে একটা পর্ব্বত প্রমাণ' (২৪ পৃঃ)

বলি না—বলি, 'ভাজায়-ডাল্‌নায়, মাছে-মাংসে একেবারে পর্ব্বত প্রমাণ।' 'আগুন গেছে সর্ব্বাঙ্গীণ নিভে' (৩১ পৃঃ)—over smart ভাষা—'সর্ব্বাঙ্গের আগুন নিভে গেছে' বলিলেই সুষ্ঠু হয়।

কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না—কথাগুলি হয়ত পূর্ব্ববঙ্গে চলিত আছে। যথা—কাম্নিক মেরে, (২২ পৃঃ), ধারে-পারে, (২৬ পৃঃ) সিজিল-মিছিল (৩৬ পৃঃ), বেমোড়ে (৫০ পৃঃ)।

মুদ্রাকর প্রমাদ বহু—দুই একটি হাস্যকর। 'নাসা-রন্ধ্রে'র বদলে 'নামারন্ত্র' এবং 'নাসারন্ধ' (১৬ পৃঃ), 'খুরজা' (Khurja Junction) স্থলে 'খুজরা'! (২২ পৃঃ)।

Mail হইল 'মেইল্‌', কিন্তু Train কেন 'ট্রেইণ্‌' নয়? (৩ পৃঃ) wait হইল 'ওয়েইট' (৪৮ পৃঃ) কিন্তু Suitcase 'স্যুটকেইস্‌' কেন? (৫০ পৃঃ)।

লেখক সুপরিচিত সাহিত্যকার। তজ্জন্যই এত কথা বলিতে হইল।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মাটির মেয়ে—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। প্রকাশক—সিটি লাইব্রেরী, ৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানিতে লেখক নায়ক-নায়িকার পথ বড় চমৎকারভাবে খোলসা ক'রে দিয়েছেন। দেবেন মুদীর দোকান করে এবং অনিলের বাড়ীতে থাকে। সকাল থেকে প্রায় সমস্ত দিনই থাকে মুদীর দোকানে এবং দেবেনের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী মনোরমা ওরফে পটল থাকে বাসাতে—যে বাসাতে মেডিকেল কলেজের তরুণ সুশ্রী ছাত্র অনিল থাকে একা, এবং যার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন নেই,—একটা বুড়ী পিসী, মাসীও নেই। এই হোল data—এখন আরম্ভ করুন। এই data থেকে আরম্ভ করলে কোথায় না পৌছুনো যেতে পারে! অলমতি বিস্তরেণ। পটলের চরিত্র বেশ কৌতূহল জাগায় পাঠকের মনে। অত্যন্ত খেলো ও সস্তা-ধরণের রস সকলেই গ্রহণ করতে পারে। এও তেমনি। এ ধরণের উপন্যাস রচনার সার্থকতা কি বোঝা যায় না। গ্রন্থকারের ভাষাটী বেশ ঝরঝরে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাকী ও সুরা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীবরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক পূরবী সাহিত্য-পরিষদ, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। দাম—ছয় আনা।

কবিতার বই। ভোগের, যৌবনের আর উন্মাদনার কবিতা—অতি আধুনিকতার সুরে ভরা। যাঁহারা অতি আধুনিকতার ভাবধারাকে পছন্দ করেন, এ বই তাঁহাদের ভালো লাগিবে, যাঁহারা বিপরীত-পন্থী, রুচি আহত হইবার দরুণ তাঁহাদের একেবারেই ভালো লাগিবে না। অক্ষর গণিয়া যে ছন্দ রচনা, সে নীতি এ বইয়ে সব জায়গায় অনুসৃত হয় নাই এবং অনেক কবিতায় প্রাদেশিকতাও আছে যথেষ্ট পরিমাণ। এ সকল ছাড়িয়া দিলে অনেক জায়গায় কাব্য ও ভাবুকতার খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় অতি-আধুনিকতার মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই নবীন অতিথির দ্বারা স্থায়ী কিছু হইতে পারে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র প্রণীত দাম—আট আনা। প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতার বই—আটাশটি সনেটের প্রায় সব ক'টিই ছন্দে, রসে, ভাষায় চমৎকার হয়েছে। সব ক'টিই নতুন সুরে গাঁথা প্রেমের কবিতা, 'তুমি আর আমি'র একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। সনেট্‌গুলি সব কবি-প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। তিনি সত্যিকারের নারী

—রক্ত-মাংসে গড়া নারী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু অতনুও হ'তে পারেন, কারণ কবির কথায় তিনি—"কবির অন্তরলক্ষ্মী তুমি সে ছলনা।"

কিন্তু অতনু তিনি ন'ন, কবির সঙ্গে তার মিলন হয়েছে বহু বার এবং বিচ্ছেদও হয়েছে প্রতি বার। তাই তিনি না-পাওয়া, অথচ সেই ক্ষণিকের মিলনকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে লিখেছেন—"তুমি আর আমি"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অঞ্জলি—শচীন সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

অঞ্জলি উপন্যাস এবং অতি-আধুনিক যুগের যে সাহিত্য সেই সাহিত্যের উপন্যাস, অর্থাৎ এ গ্রন্থের নর-নারী সকলেই শিক্ষিত, তারা পরস্পরের সহিত মেলামেশায় বাছ-বিচার রাখে না, তারা ভালোবাসে একজনকে এবং বিয়ে করে আর একজনকে। তা ছাড়া তাদের দেহ তাদের মনকে চালায়, না তাদের মন চালায় তাদের দেহকে সে কথাটাও জোর ক'রে বলা কঠিন।

কিন্তু তা হোক্, তবু উপন্যাসখানি নানাদিক দিয়েই উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। গ্রন্থের ভাষার ভিতর আছে একটা অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা এবং চরিত্রগুলির ভিতরে আছে মানসিক দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত। এই স্বচ্ছতা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়ই এনে দিয়েছে গ্রন্থখানিতে একটি চমৎকার রস-মাধুর্য্য। পাত্র-পাত্রীগুলির ভিতর এই যে ঘাত-প্রতিঘাত—এ ঘাত-প্রতিঘাত emotion ও intellect-এর। এদের মনে আছে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি, কিন্তু দেহ নুয়ে পড়েছে emotion-এর উদ্দামতার কাছে। সুতরাং সংঘর্ষ অপরিহার্য্য। এই সংঘর্ষে যে সব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে তা যে পাঠকের মন স্পর্শ করবে তাতে আর বিচিত্র কি?

অতি আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, উপন্যাসেও তাঁরা পরিবেশন করতে চান নিছক intellectualism-এর বুকনি, অর্থাৎ এমন কতকগুলি ধার করা জিনিষ, যা তাঁরা নিজেরাও হয়তো হজম করতে পারেন নি। আর তারই ফলে তাঁদের উপন্যাসও হ'য়ে ওঠে কতকগুলো শুষ্ক তর্কের বোঝা মাত্র। তর্কের দ্বারা 'হাঁ'-কে 'না' করার ভিতরে বুদ্ধির খেলা আছে এবং হয়তো খানিকটে তৃপ্তিও আছে। কিন্তু সে তৃপ্তি কতকটা জ্যামিতির জটিল সমস্যা (problem) নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো ব্যাপার। তাতে বুদ্ধির তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। হৃদয়ের খুশী অন্য রকমের জিনিস। কাব্যের রস ও জ্যামিতির জট খোলার রস—এক রকমের জিনিস নয়।

অঞ্জলির গ্রন্থকার উপন্যাসের এই গোড়াকার কথাটা ভোলেন নি ব'লেই তাঁর এই গ্রন্থখানিতে intellectual নর-নারীর ভিতরেও emotion-কেই তিনি দিয়েছেন প্রাধান্য। তা না হ'লে অঞ্জলির মরবার জন্য কৃচ্ছ-সাধনা করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, বিজয়ের বিলাতে পালাবার কোনো হেতু ছিল না এবং সুবীর যার emotion-এর ধার সবচেয়ে কম ধারবার কথা, তারও কারাবরণ করবার কারণ ছিল না। তাঁর এই গ্রন্থে আঁকা intellectual type শুধু রাবেয়া। কিন্তু তাকে intellectual type না বলে criminal type বলাই ঠিক। আর সেই জন্যই তার চরিত্রেও একটা আকর্ষণ এসে গেছে, হয়তো গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারেই।

এখানে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার আর একটামাত্র কথা শুধু বলবার আছে এবং সে কথাটা অবান্তর কথা। যতটা মনে পড়ে, সম্ভবত শচীন বাবু তাঁর প্রবাসের পত্রেই বলেছিলেন—বাংলাদেশের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তার সমাজ-ব্যবস্থায় নর-নারী বন্ধুভাবে মিশ্‌বার সুযোগ পায় না—মিশ্‌লেই সেটা ধ'রে নেয় লোকে যৌন-সম্বন্ধের ব্যাপার।

এটা যে দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের হাত শচীন বাবুও এড়াতে পারে নি তাঁর এই গ্রন্থে। অনেকগুলো নর-নারীকে তিনি টেনে

এনেছিলেন বন্ধুত্বের একটা গণ্ডির ভিতরে। কিন্তু তাদের সকলের সম্বন্ধই শেষের দিকে বন্ধুত্বের কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটা যে তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার তা নয়। যে complex নর-নারীর সম্বন্ধের ভিতর এই জটিলতা এনে দিয়েছে, তাঁর মনও নিজের অজ্ঞাতসারেই জের টেনে চলেছে সেই complex-এর। সুতরাং ব্যাপারটা শুধু সামাজিক দুর্ভাগ্য নয়, তার চেয়েও ঢের জটিল জিনিস—একথা মনে করবারও হয়তো কারণ আছে।

কিন্তু আগেই বলেছি গ্রন্থের সঙ্গে সে কথার কোনো সম্বন্ধ নেই। শুধু সম্বন্ধ যে নেই তা নয়, এই complexই এ যুগের উপন্যাসের বনিয়াদ, সুতরাং জোর করে যদি এর হাত থেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করতেন তবে তাই হ'তো অস্বাভাবিক, তা তাঁর গ্রন্থের সৌন্দর্য্যেরও হানি করত।

উপন্যাস বলতে যে একটা ঘটনা-বহুল বিচিত্র কাহিনীর ছবি আমাদের মনে হয়, সে রকমের কোনো কাহিনী নেই এ গ্রন্থে, কিন্তু যে কাহিনী হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের ধারা ঝরিয়ে যায়, সে কাহিনীর আমেজ পাওয়া যায় এর অনেক জায়গায়। অর্থাৎ গল্পের দিক দিয়ে নয়, রসের দিক দিয়ে এখানি যে একখানি ভালো উপন্যাস হ'য়ে উঠেছে তাতে ভুল নেই।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ফরাসী-বিপ্লব — শ্রীযুক্ত রেজাউল করিম, বি-এ প্রণীত। কলিকাতা 'বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস' হইতে প্রকাশিত। 'মহামায়া প্রেসে' মুদ্রিত। মূল্য—এক টাকা।

সভ্যতার সংঘর্ষে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পুরাতন ভাব-ধারায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ফল ব্যর্থ রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমাজে প্রকাশ পায় 'রিনেসঁ', 'রিফরমেশন' ও 'ফরাসী বিপ্লবে'! বিশ্ব-নিখিলে সাম্য, মৈত্রী ও ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মানুষকে সকল বশ্যতা কাটাইয়া তার জন্মগত অধিকার দিবার প্রয়াস প্রথম প্রকাশ পায় এই ফরাসী-বিপ্লবের ব্যাপারে। এ বিপ্লব একদিনের ষড়যন্ত্রের ফলে ঘটে নাই—মানুষের উপর মানুষের উৎপীড়ন বহুশতাধিক বৎসরে যে নির্দ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—যে উৎপীড়নে মানুষের ম desperate হইয়া পড়ে—অভিজাত-তন্ত্রের স্বার্থ-বিলাসে দৌরাত্ম্যে সাধারণ-সমাজ বিলোপের পথে চলিয়াছিল— চারিদিককার সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল নৈসর্গিক ক্ষেত্রে এমনি বিরোধ-সামঞ্জস্যে ভূগ যে দারুণ চাঞ্চল্য পুঞ্জিত হয় এবং যে চাঞ্চল্যের ফ ভূকম্প ঘটে — তেমনিভাবেই এ বিরোধ ফরাসী সাধারণ-জনের চিত্তে পুঞ্জিত হইয়া বিপ্লবে আত্মপ্রকা করে। এই বিপ্লবে কতখানি পীড়ন, কতখানি মুক্তি সাধনা, একদিকে কতখানি স্বার্থ অপরদিকে কতখা মনুষ্যত্ব—রেজাউল করিম সাহেবের রচিত গ্রন্থখা পড়িলে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। এ গ্র ঐতিহাসিক তথ্যের নিপুণ সমাবেশ—এবং সে তথ্য সরল প্রাঞ্জল বর্ণনা সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে বইখানির ছাপা-কাগজ পরিষ্কার, বহিরবয়ব মনোরম

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তাইত!—(ছোটদের গল্পের বই)—শ্রীহেমদাকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৪-৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাত হইতে শ্রীবসুদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃ প্রকাশিত। মূল্য—চার আনা।

শিশুদের নিকট গল্প বলিবার ভঙ্গি গ্রন্থকারে আছে—তার পরিচয় এই বইখানির মধ্যে পাওয়া যায় শিশুরা যে এই বইয়ের গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দ ও তৃপ্তি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গল্পের চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। একখানি দ্বি-বর্ণ চিত্র বইখানি সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে।

বইখানির প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন গ্রন্থকার নিজে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। বইখানি ভিতর-বাহিরের সৌন্দর্য্যের তুলনায়, ইহার মূল্য অল্প বলিতে হইবে।

শ্রীবিনয় দত্ত।

ঘরে-বাইরে

বন্যার রুদ্র লীলা

বন্যার রুদ্র লীলা এবার ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা দিয়েছে। এত বেশী স্থান নিয়ে এত ভয়ঙ্কর রকমের বন্যা ভারতবর্ষে আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ। বাংলা, বিহার, আসাম—তিনটি প্রদেশই এবার বন্যার প্রকোপে বিপন্ন। বাংলায় রাজসাহী, নদীয়া, মুরসিদাবাদ ও মালদহের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। বহু গ্রাম জলমগ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দাঁড়ানোর স্থান নেই, শতশত নর-নারী অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণ্‌ছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য অর্থ, আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র—সমস্ত জিনিষেরই এখন অজস্র প্রয়োজন। প্রত্যেক-বারেই এ-গুলো এসেছেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু এ বারের বিপদ হ'য়েছে এই যে, সাহায্য তেমন পাওয়া যাচ্ছে না কোনোস্থান থেকেই। সেবা-সমিতি অনেক স্থানেই গড়ে' উঠেছে, সাহায্যও চাচ্ছেন তাঁরা সকলের কাছেই। কিন্তু জন-সাধারণের ভিতরে বিশেষ জাগছে না সাহায্য করবার সাড়া।

এ সাড়া না জাগবার কারণ হয়ত দেশের অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা। তা ছাড়া উপর্য্যুপরি কতকগুলো দুর্ঘটনার চাপেও হয়ত মানুষের মন খানিকটে এ-সব সম্পর্কে নিঃসাড় হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা হ'লেও বিপদ এত বড় যে, সমস্ত আর্থিক দুরবস্থা ও নিঃসাড়তাকে অতিক্রম করেই সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হবার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। দেশের এতগুলো লোককে মৃত্যুর মুখ হ'তে বাঁচাবার জন্যই আজ আবশ্যক হ'য়েছে যার যা সাধ্য তার সেই রকমের দান করবার। আমরা সকলের দৃষ্টি এই মহাবিপদের দিকে আকর্ষণ করছি। এত বড় বিপদের সময়েও যদি দেশের লোক দেশের লোকের সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে থাকে, তবে তার মত দুর্ভাগ্য আর হ'তেই পারে না।

পরলোকে অতুলপ্রসাদ

গত ২৬শে আগষ্ট অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌ সহরে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৬৩ বৎসর। অতুলপ্রসাদের নাম ছোট-বড়, নর-নারী নির্ব্বিশেষে প্রায় সব বাঙ্গালীর কাছেই পরিচিত। বাংলা গানে তিনি এমন কতকগুলি সুর সংযোগ করেছিলেন—যা যেমন নতুন তেমনি মধুর। এই গানের ভিতর দিয়েই তিনি পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলেন সব বাঙালীর কাছে। কিন্তু সঙ্গীতের এই অসাধারণ পারদর্শিতাই তাঁর প্রতিভার একমাত্র বিকাশ ক্ষেত্র ছিল না। শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, আইন—নানা দিক দিয়ে অতুলপ্রসাদের প্রতিভা অনন্যসাধারণতার কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি লাক্ষ্ণৌ 'বারের' একজন বড় আইনজীবী ছিলেন। আইনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাও ছিল প্রচুর। আর সেই জন্যই বাঙালী হ'য়েও তিনিই ছিলেন 'আউধ-বার এসোসিয়েসনের' প্রেসিডেণ্ট। শিক্ষার দিক দিয়েও তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি লক্ষ্ণৌ সহরে সামান্য ছিল না। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণের জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু নানা কারণে

তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে অতুল-প্রসাদ ছিলেন উদার-পন্থী। 'ন্যাসন্যাল লিবারেল ফেডারেশনের' সভাপতির পদেও একবার তাঁকে বরণ করা হয়।

প্রভৃতি তাঁর কতকগুলি গান চিরদিনই বাংলা ভাষার অলঙ্কার হয়ে থাকবে। উত্তর ভারতের মাসিক পত্র 'উত্তরা' তাঁরই আগ্রহে এবং সম্পাদনায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন

সাহিত্যের দিক দিয়েও অতুলপ্রসাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

"উঠগো ভারত-লক্ষ্মী উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা"

মূলেও রয়েছে তাঁরই চেষ্টা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার যে একটা বড় ক্ষতি হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলার বাইরে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা আজ নেই বল্‌লেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। প্রায় সব প্রদেশ হ'তেই বাঙালীকে উচ্ছেদ কর্‌বার চেষ্টা চলেছে। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাঁরা বাংলার বাইরেও বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলেন—অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সুতরাং অতুলপ্রসাদের বিয়োগে বাংলার সাহিত্যেরই শুধু ক্ষতি হ'লো না, তাঁর মৃত্যুতে বিদেশে বাংলার প্রতিষ্ঠারও হানি হ'লো এবং সে হানিও উপেক্ষার যোগ্য নয়।

অতুলপ্রসাদকে গত বৎসর আমরা শেষবার যখন দেখি তখনও জরার প্রভাব আমরা তাঁর ভিতরে দেখতে পাইনি। হাস্যময়, স্ফূর্ত্তিময় চেহারা—যে চেহারা যৌবনের সঙ্গেও বেমানান হয় না। মৃত্যু অপরিহার্য্য, তা সকলের কাছেই আসবে, কিন্তু অতুলপ্রসাদের কাছে সে এসেছে অত্যন্ত অসময়ে—একান্ত আকস্মিক ভাবেই। এই আকস্মিকতার দুঃখই এই চিরবিদায়ের ব্যথাকে এত বেশী তীব্র করে তুলেছে বাঙালীর কাছে। আমরা অতুলপ্রসাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

নারী-ধর্ষণ

নারী-ধর্ষণের সংখ্যা বাংলায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির কথা নিয়ে এবং এ-ব্যাপারে আমাদের ও কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার কথা নিয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার আলোচনা করেছি। সম্প্রতি ঢাকায় বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যর জন উড্‌হেড পুলিসদের পুরস্কার-বিতরণ সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার ভিতর দিয়েও এর গুরুত্বটা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—"যে বিশেষ অপরাধের কথাটা গতবৎসর স্যর জন এণ্ডারসন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন তা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ। বিষয়টা এখনও উদ্বেগের কারণ হ'য়ে আছে। আমি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে ১৯৩৩ সালেও এই অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে।...পুলিশ এমন অনেক কিছুই করতে পারেন যাতে এই ঘৃণিত দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হ'তে পারে। আমার সন্দেহ নেই যে আপনারা এ-সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু তা' হ'লেও এ সম্পর্কে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে এখনও ঢের উন্নতির অবকাশ রয়েছে। এ-ব্যাপার বাংলার গুরুতর কলঙ্কে পরিণত হ'তে চলেছে। সুতরাং আমি আশা করি যে সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারীই এ কলঙ্ক দূর কর্‌বার জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা কর্‌বেন।"

নারী-ধর্ষণের এই ব্যাপারটি নিয়ে আন্দোলন ও আলোচনা যে কম হচ্ছে তা নয়। কেবল আন্দোলন ও আলোচনায় এ কলঙ্ক দূর করা যদি সম্ভব হ'ত তবে এতদিন তা নিঃশেষে দূর হ'য়ে যেত। তা যখন হয়নি তখন এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন আরো কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনের। সে ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌তে পারে একমাত্র পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরাই। পুলিশ যদি তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘটনার তদন্ত করেন, কেবল অপরাধীকে নয়, অপরাধীকে যারা সাহায্য করে তাদের সকলকেও আইনের হাতে সমর্পণ করবার ব্যবস্থা করেন এবং অপরাধীর দণ্ড যদি এ রকমের হয় যে, তাতে অপরাধটা সম্বন্ধেই একটা ভীতির সৃষ্টি হয়, তবে অপরাধের বহর যে স্বাভাবিক নিয়মেই ক'মে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

এই ধরণের অপরাধে যারা অপরাধী তাদের বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে কিনা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের ভিতর তাই নিয়ে চল্‌ছে আলোচনা। বেত্র দণ্ডের ভিতর খানিকটা বর্ব্বরতা আছে, সুতরাং সবক্ষেত্রে তার সমর্থন করা চলে না। কিন্তু এসব অপরাধ যেরূপ বর্ব্বর তাতে তার প্রতিকারের জন্য যদি খানিকটা বর্ব্বরতার আশ্রয় নেওয়া হয়, তবে তাও সমর্থনের অযোগ্য হবে বলে আমাদের মনে হয় না। তা ছাড়া লোকের মনে এ অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলার উপাদান আছে শুধু এই বেত্রদণ্ডের ভিতরেই যা কারাদণ্ডে নেই। চোখের উপরে যদি অপরাধীকে

বেত্রদণ্ডে জর্জ্জরিত হ'তে দেখে, তবে যারা এ ধরণের অপরাধ করতে চায়, অপরাধ করবার আগে বার কয়েক দণ্ডের গুরুত্বের কথাও তারা ভেবে নেবে। অনেক দুর্দ্দান্ত পশুকেও সায়েস্তা করা হয়েছে বেত্রাঘাতের দ্বারা—এ উদাহরণ পশু নিয়ে যারা নাড়া চাড়া করেন তাঁরা জানেন।

কিন্তু এ সম্বন্ধে দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেন্টেরই যে আছে তা নয়, আমাদের নিজেদের দায়িত্বও কম নয়। আমরা নিজেরা যদি সমাজের এই গ্লানির সম্বন্ধে সচেতন ও অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠি তবে পুলিশের কাছ থেকেও তা আশা করতে পারিনে। সমাজ যে এ-সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতনতার পরিচয় দেয় নি, তা বলাই বাহুল্য।

শব্দ-বিজ্ঞান সম্মিলনে বাঙালী অধ্যাপক

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক 'ফনেটিক' সম্মিলনের অধিবেশন হবে। এই সম্মিলনে যোগদানের জন্য ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনীত হ'য়েছেন। ভাষা-বিজ্ঞানে ডক্টর সুনীতিকুমার প্রগাঢ় পণ্ডিত। আমাদের ভরসা আছে 'ফনেটিক' কন্‌ফারেন্সে তিনি যে জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবেন তা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

পরলোকে স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

গত ২৪শে ভাদ্র স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ পরলোকে গমন করেছেন। চারুচন্দ্র বাংলার কৃতী সন্তানদের অন্যতম। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, কয়েকবার অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিচারে নিরপেক্ষতা এবং দূর-দর্শিতা তাঁর জজিয়তির সময়টাকে গৌরবময় করেছে। দেশের প্রতি তাঁর একটা গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। দেশের সেবা তিনি অনেক রকমে ক'রে গেছেন। তবে সে সেবার ভিতরে অযথা উচ্ছ্বাস ছিল না। বাইরে তা প্রকাশ করবার লোভও তিনি সম্বরণ ক'রে গেছেন আশ্চর্য্য রকমের সংযমের দ্বারা। স্যর চারুচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের জজিয়তি ত্যাগের পর তাঁকে শাসন-পরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় তিনি সে পদ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ৬০ বৎসর হয়েছিল। রাজকার্য্য হ'তে অবসর নেওয়ার পর দেশের নানা

স্বর্গীয় স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

রকমের কল্যাণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন—দেশ তাঁর কাছ থেকে এই জিনিসটাই আশা করছিল। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সেই আশাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। পরিণত বুদ্ধি ও গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন কাজ করবার সময়, তখনই বাংলার জ্যোতিষ্ক যাঁরা তাঁরা খসে পড়েন। এ দুর্ভাগ্য বাংলার সহজ দুর্ভাগ্য নয়। আমরা চারুচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করি। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের

এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনাও জ্ঞাপন কর্‌ছি।

জাপানের হরিজন-প্রীতি

ইয়োকোহামার ব্যবসায়ীরা ৩৮৯২ টাকা সংগ্রহ ক'রে মহাত্মাজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন হরিজনের কাজে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে ব্যয় কর্‌বার অনুরোধ জানিয়ে। অর্থের দিক দিয়ে অঙ্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু এই দানের ভিতরে হরিজনদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার যে পরিচয় আছে তার দাম ঢের—তা উপেক্ষার যোগ্য নয়।

সর্প-দংশনের চিকিৎসার পুরস্কার

সর্প-দংশনের ভাল ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ইউরোপে, আমেরিকায় তবু সর্প-দংশনের ঔষধ তৈয়ারীর চেষ্টা চলেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ঔষধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ ওঝার মন্ত্র। অনেক সময় তাতে আশ্চর্য্য রকমের সুফল দেখা যায় বটে, কিন্তু তার উপরে বিশ্বাস ও নির্ভর করা কঠিন। কারণ বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বোম্বাই-এর হাফ্‌কিন ইন্‌ষ্টিটিউট সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরীর চেষ্টা কর্‌ছেন বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে। তাঁরা এই সব মন্ত্র-তন্ত্রের উপরে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন —ও শুধু বুজরুকি। কেবল তাই নয় তাঁরা ওঝাদের রীতিমত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেছেন ১০ হাজার টাকার একটা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে। বানরকে সর্প-দষ্ট ক'রে তাঁরা ওঝাদের দেবেন আরোগ্য করতে। মন্ত্রের দ্বারা যদি কোনো ওঝা তাকে আরোগ্য কর্‌তে পারে, তবে তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যে শক্তি খাঁটি বলে প্রমাণ না হ'বে এ যুগের লোক তার উপরে কখনো আস্থা স্থাপন কর্‌তে পার্‌বে না। সম্প্রতি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিতে ডাঃ গৌরিশঙ্কর নামে একজন ওঝা মন্ত্র-শক্তির দ্বারা সর্পাঘাতের চিকিৎসার জন্য চাকুরী প্রার্থী হয়েছিলেন। মাহিয়ানা চেয়েছিলেন মাসিক ৪০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি রাজি হ'ন নি। ডাক্তার গৌরীশঙ্কর বা তাঁর মত যাঁরা সর্প-মন্ত্র-বিশারদ তাঁরা হাফ্‌কিন ইন্‌ষ্টিটিউটের এই ১০ হাজার টাকা পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় নাম্‌তে পারেন। জয়ী হ'তে পার্‌লে অর্থের দিক দিয়ে তাঁদের লাভ ত আছেই, তা' ছাড়া একটা প্রাচীন পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে ফেলে যাচাই ক'রে নেবার সুবিধেও হবে তাতে। বৎসরে ২০৷৩০ হাজার লোক ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে মারা যায়। সুতরাং এর একটা বিজ্ঞান-সম্মত প্রতিকার-পদ্ধতির আবিষ্কার যে আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষার্থিনী ভারত-মহিলার বিলাত-গমন

কুমারী সরলা দেশাই বি-এ, কুমারী বিদ্যা নেহেরু বি-এ, শ্রীমতী মন্দাকিনী ত্রিলোকেকর এম্-এ, প্রমুখ কয়েকটি মহিলা উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাচ্ছেন। এঁরা সকলেই কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এঁদের কারো উদ্দেশ্য সংবাদপত্র সেবা সম্পর্কে ডিপ্লোমা লাভ করা, কারো বা উদ্দেশ্য শিক্ষা-সম্পর্কে ডিপ্লোমা লাভ। আমরা এঁদের সকলেরই পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি। বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে এনে, ভারতের উপযোগী ক'রে যদি তাঁরা তা' দেশের ভিতর পরিবেশন করতে পারেন, তবে তাতে দেশেরও উপকার হবে, তাঁদের শিক্ষাও সার্থক হবে।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী

১৮৩৫ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১৯৩৫ সালে তার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শতবার্ষিকীটি বিশেষ ভাবে পালন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একটি সভা হ'য়ে গেছে। স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকীর সত্যিকারের উৎসব হচ্ছে—মেডিক্যাল কলেজের এমন কোনো একটা উন্নতি করা, যা দেশের লোকের চিকিৎসা-সম্পর্কে বড় রকমের কোনো সমস্যার সমাধান করবে। সেই ধরণেরই একটা প্রস্তাবও করা হ'য়েছে। প্রস্তাব হয়েছে—এই উপলক্ষ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য একান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম-যুক্ত একটি ওয়ার্ড বা বিভাগ গ'ড়ে তোলা হবে। তা'তে ৪০টি রোগীর স্থান থাকবে। প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু এ-প্রস্তাবকে বাস্তবরূপ দান করতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন। চিকিৎসাগারটি গ'ড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে ২,৬৭,০০০৲ টাকার, এবং এর খরচ চালাতে দরকার হবে বৎসরে ২৫,০০০৲ টাকার। গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক খরচের এই ২৫,০০০৲ টাকা দিতে রাজি আছেন যদি সৌধ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি বাবদ যে ২,৬৭,০০০৲ টাকার আবশ্যক হবে তা জন-সাধারণের চাঁদার টাকা হ'তে সংগ্রহ করা যায়।

মেডিক্যাল কলেজের অতীত ইতিহাসের দিকে যদি তাকানো যায় তবে এই টাকা সংগ্রহ খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। মেডিক্যাল কলেজের বহু অংশই সাধারণের দানের অর্থে তৈরী হয়েছে। যে জমির উপর মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সৌধটি অবস্থিত সে জমি দান করেছিলেন ৺মতিলাল শীল। ৺চুণীলাল শীল, শ্যামাচরণ লাহা প্রমুখ দানবীরদের দানের অর্থে গড়ে উঠেছে চুণীলাল শীল ডিস্পেন্সারী, ইডেন হাসপাতাল, শ্যামাচরণ লাহা চক্ষু-চিকিৎসালয়। একটি ছাত্রী-নিবাস গ'ড়ে তোলার জন্য কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দান করেছিলেন দেড় লক্ষ টাকা। দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিংহ হাসপাতালের উন্নতির জন্য একবার ৯০ হাজার টাকা দান করেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মিসেস মোজেল এজরা, শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, বলদেব দাস বিরলা, রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ অনেকের দানের অর্থেই মেডিক্যাল কলেজের এই এত বড় দেহটা গ'ড়ে উঠেছে। সুতরাং চেষ্টা করলে এই ২,৬৭,০০০৲ টাকা তুলতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে ব'লেও আমাদের মনে হয় না। বস্তুতঃ আমাদের এ ধারণার ভিতর যে ভুল নেই গোড়াতেই তার নিশানাও দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। কাশিম বাজারের কুমার কমলারঞ্জন রায় ৫০ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর মুন্টুলাল তাপুরিয়া ২০ হাজার টাকা, স্যর হরিশঙ্কর পাল এবং তাঁর ভ্রাতা মিঃ হরিমোহন পাল ২০ হাজার টাকা, মিঃ জওলা প্রসাদ ভর্ত্তিয়া ১৫ হাজার টাকা, কর্ণেল ডব্লিউ, এম, ক্রাডক ১ হাজার টাকা, ডক্টর বিমলা চরণ লাহা ১ হাজার টাকা এবং মিঃ জে, সি, শীল ১ শত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাদ বাকি টাকাও পেতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।

যে ওয়ার্ডটি গ'ড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রয়োজন যে খুবই তাতে সন্দেহ নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজের যে ঘরগুলো ব্যবহৃত হয় তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির কোনো ছাপই নেই। কোনো রকমে তাতে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়—এই মাত্র। কিন্তু কলিকাতার মত এত বড় সহরের Emergency Ward যে ঢের বেশী উন্নত ধরণের হওয়া সঙ্গত তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমরা আশা করি, দান-বীরদের দানের দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সহজেই সংগৃহীত হবে এবং মেডিক্যাল কলেজের শত বার্ষিকী উৎসব এই প্রস্তাবিত ওয়ার্ডটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়েই নিষ্পন্ন হবে।

শারদীয় সংখ্যা সচিত্র

পাক্ষিক পত্রিকা

প্রচারক

সূচী

শারদীয় সংখ্যা সচিত্র প্রচারক .... সূচি

অপরাজেয় কথাশিল্পী

—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

=কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পত্র=

শ্রীঅতুলানন্দ রায়—

সম্পাদক,—প্রচারক।

কল্যাণীয়েষু,

শ্রাবণের 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান দিলীপ কুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চারপাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে বয়েস ত অনেক হলো ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ্ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক সুন্দরও নয়, শ্রুতি সুখকরও নয়। শ্লেষ-বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও যায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা-বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয় গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ী এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি আর অন্য প্রবন্ধই বা কি এ কথা অস্বীকার করিনে যে কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী, ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায়, নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে। শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা' যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতি বাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে যে-হেতু অতি নিকৃষ্ট জীব বেরালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেরাল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চক্‌চক্ করে কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে তাদের সুখ-দুঃখের কারণ-গুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে তা' সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না, তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায় তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে 'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে সুতরাং, রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আমাদের আর মন ভরবে না, তাহলে জবাবটা

যে তাদের দুর্বিনীত হবে এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে গল্পে চিন্তা-শক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্পলেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন 'বুলির' খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না কারণ, ও দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইনটালেক্ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের! এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার-সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম এক জাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিলো এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টগ্ অফ ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দিলে একমুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস্ করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায়নি কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে কিন্তু তবু এটাও অনুমান প্রমাণ নয়। পরে এমনও হতে পারে ইবসেনের পুরনো আদর আবার একদিন ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী—

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫শে ভাদ্র ১৩৪০

প্রেম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অনাদৃত দীর্ঘ নাম—তারেই সংক্ষিপ্ত মিষ্ট করে'
ডাকিত যে সুধাকণ্ঠে দরদের একান্ত আদরে,
সে আজি নির্ব্বাক মৌন—মরণের কঠোর শাসনে ;
মধুর আহ্বানটুকু—এ শ্রবণ তাও নাহি শোনে !
দেহে মনে অন্ধ আমি ! মনে হ'ত তবু ঐ ডাকে
আমার অন্তরবাসী প্রাণ-বধূ কান পেতে থাকে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি শুনিতে সে আত্ম-পরিচয় ;
অন্ধ আঁখি মর্ম্মমাঝে সংগোপনে মানিয়া বিস্ময়
ফুটিয়া উঠিত তা'র মধুক্ষরা মুখপদ্মপানে—
করুণার গন্ধে ভরা—সত্য-মিথ্যা কেবা তার জানে !
অবজ্ঞার পঙ্কে বাস, অশ্রদ্ধায় কাটে বারমাস ;
তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে লভিতাম আত্মার আভাস।
এই কি তোদের প্রেম ? অন্ধেরে যা' করে চক্ষুষ্মান,—
প্রাণে যা অমৃত বর্ষে,—নন্দনের আনে যা' সন্ধান !

হাফেজ

অনুবাদক—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমায় ভালবাসি বন্ধু—

এ ভালবাসার বিনাশ নাই।

অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে যাকে ধরে' রেখেছি, সযত্নে গোপনে যাকে লালন করেছি,—তার আর পালাবার পথ কোথায়?

আমার এই দেহের প্রতিটি রক্তকণা তোমায় চায়,—তোমার স্পর্শ চায়, তোমার আলিঙ্গন চায়! অগ্নিবর্ণ তোমার রূপের রশ্মিতে অন্তরের জ্যোতির্মঞ্চ আমার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

তোমারই আগমন প্রতীক্ষায় প্রাণ যে আমার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে প্রিয়তম,—একে মত্ততা বল আর যাই বল, তুমি এসো, তুমি এসো!

সর্বনাশা এ ভালবাসার মৃত্যু নেই, নইলে হয়ত শান্তি পেতাম।

ভালবাসার তীব্র বহ্নি হয়ত আমার মাতৃস্তন্যে ছিল,—জীবনের প্রথম উষায় হয়ত তাই পান করেছি বন্ধু! আশা নেই,—এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হবার আশা আর নেই।

হতে পারে,—নির্ব্বাপিত হবে হয়ত জীবনের সেই শেষ-সন্ধ্যায়।

কিন্তু অনাদিকাল থেকে তোমার জন্যে এই যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা আমার,—এরও কি শেষ নেই বন্ধু?

বিরহের এ বিষ-যন্ত্রণার কি চিকিৎসা হয় না নাকি?

চিকিৎসায় যত বেশি যত্নবান হই যন্ত্রণা যেন তত বেশি বাড়ে।

এ শহরে আমি বুঝি প্রথম!

বিরহ-যন্ত্রণার যে সকরুণ আর্ত্তনাদ সর্ব্বপ্রথম গগন স্পর্শ করেছিল সে কার কণ্ঠনিঃসৃত জানো?

—আমার।

আমারই এই ব্যথিত বঞ্চিত হৃদয় মন্থন করে' প্রিয়ার উদ্দেশে সকাতর একটি বাণী ফুটেছিল।—'এসো প্রিয় আমার, এসো বন্ধু এসো!'

আজও সে আহ্বানের প্রতিধ্বনি জাগে—

জাগে প্রতি রজনীর নিদ্রাহারা নীরব নিশীথে, বায়ু-হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে ধূমল আকাশের খিলানে ঘুরে বেড়ায়।

আমি কেঁদেছি। জিন্দানদীর তীরে বসে' আমি কেঁদেছি তোমার উদ্দেশ্যে! জিন্দার প্রবহমান স্রোতে আমার লবণাক্ত অশ্রুজল মিশে আছে,—ইরাক্-প্রদেশের কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর হবে।

দেখেছি প্রিয়তম, ইরাকের তীরে বসে' তোমাকে আমি দেখেছি।

অশ্রুসিক্ত আমার এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তোমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আমি যেন চুরি করে' দেখেছি বলে মনে হয়।

চাঁদের মতন মুখ গো সখী, চাঁদের মতন মুখ আর মেঘের বরণ চুল!

এসো বন্ধু, এসো!

হয়ত আসবে না···হয়ত এলো না। জীবন আমার বৃথাই কাটলো বন্ধু!

তবু চাই—চাই—আমি চাই!

মরণের পরও যদি এসো প্রিয়তম,—হাফেজের সমাধি-মৃত্তিকায় তোমার চরণ-চিহ্ন যদি পড়ে কোনদিন, তোমার ওই অতীব নিষ্ঠুর দুটি চরণ চুম্বনের আশায় সমাধি-গর্ত্ত হ'তে হাফেজের মৃত আত্মা মাথা তুলে উঠবে।

অবিনশ্বর প্রেম যে আমার মৃত্যুঞ্জয়ী!

টুনটুনুর প্রেম!
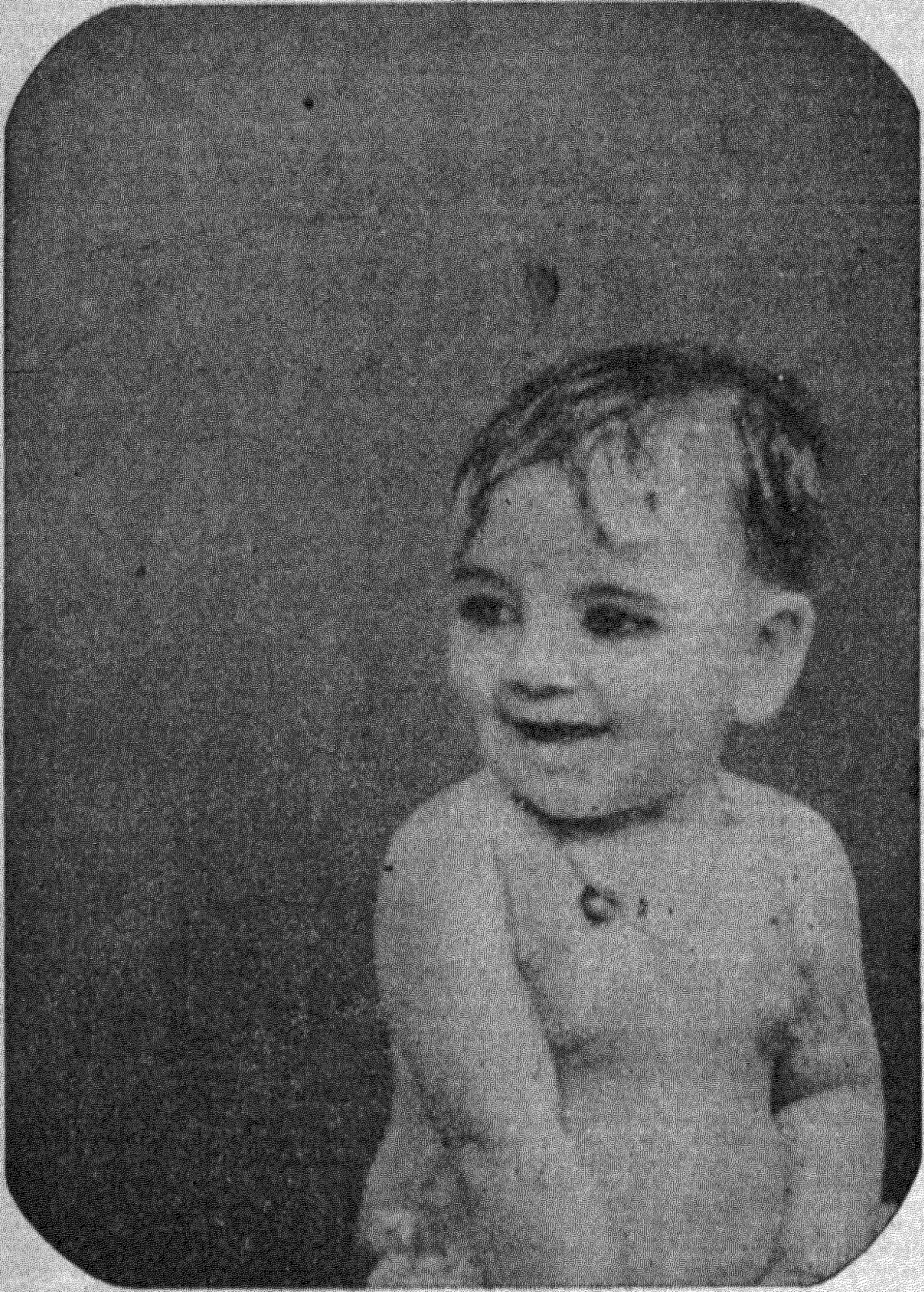
ঠাকুমা কি সুন্দর!
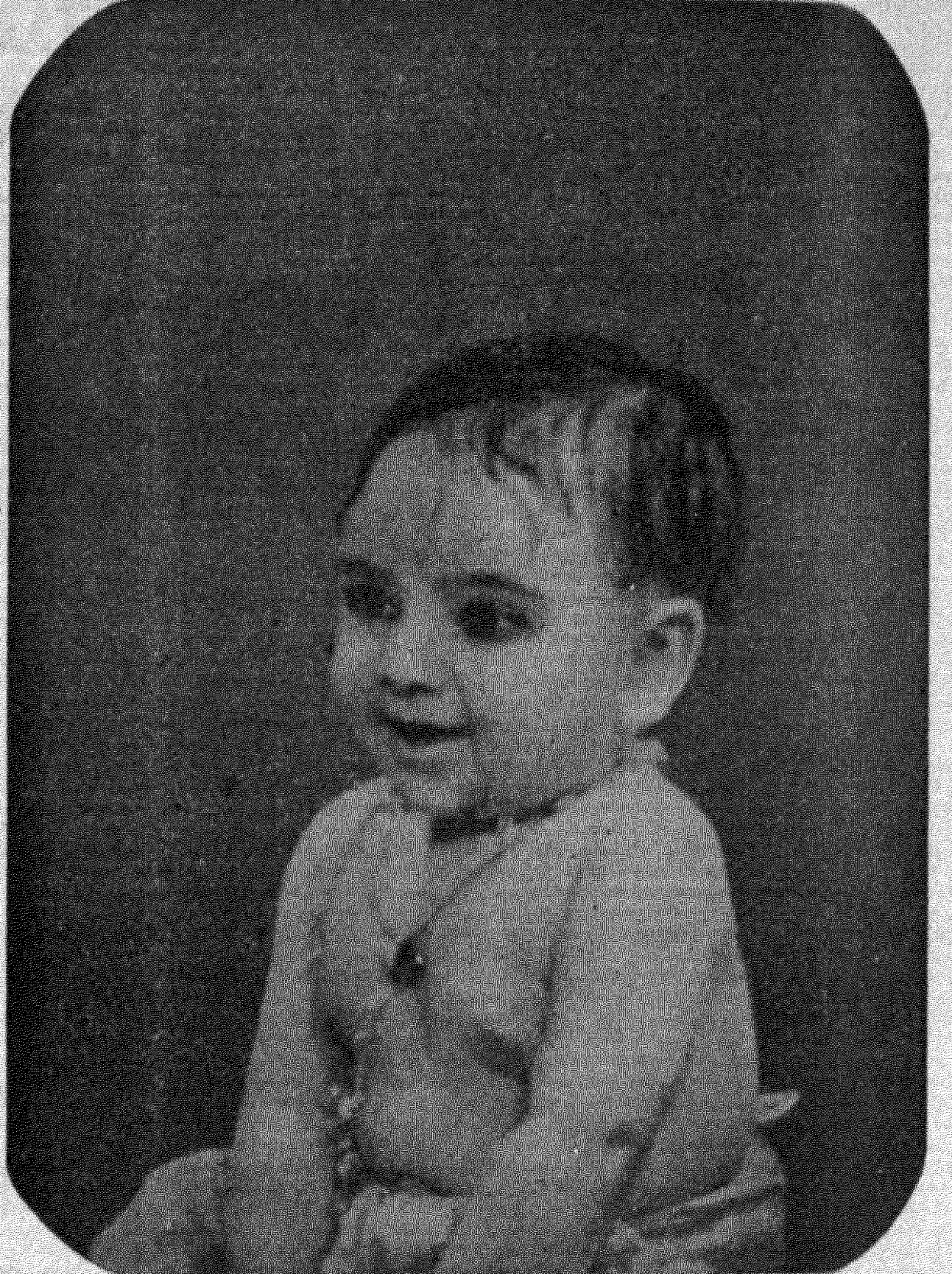
"ঠাকুমা, বিয়ে করবি?"
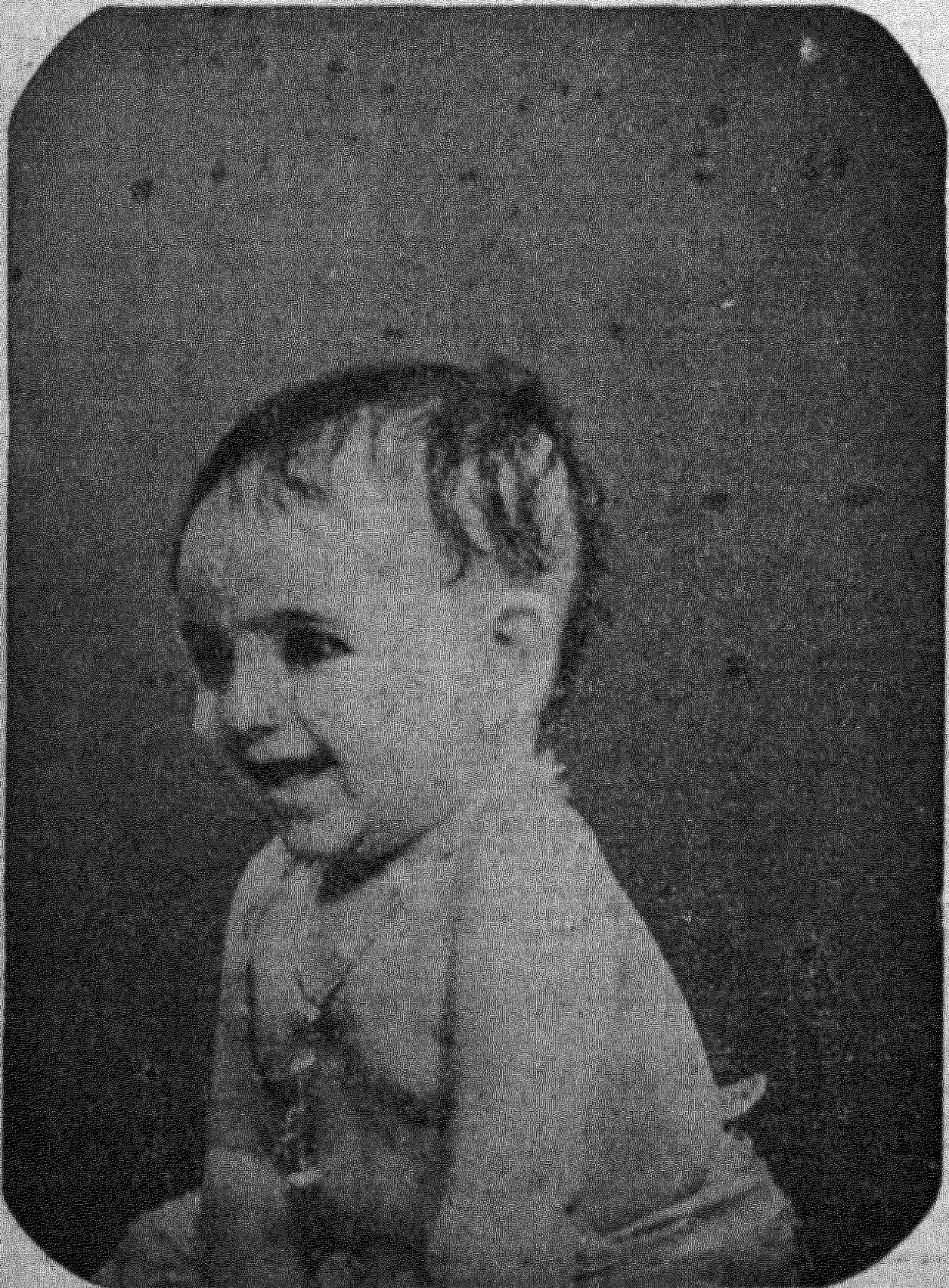
করবি! রাজী? কি মজা!

পুরুত ডাকি?

বর !!!
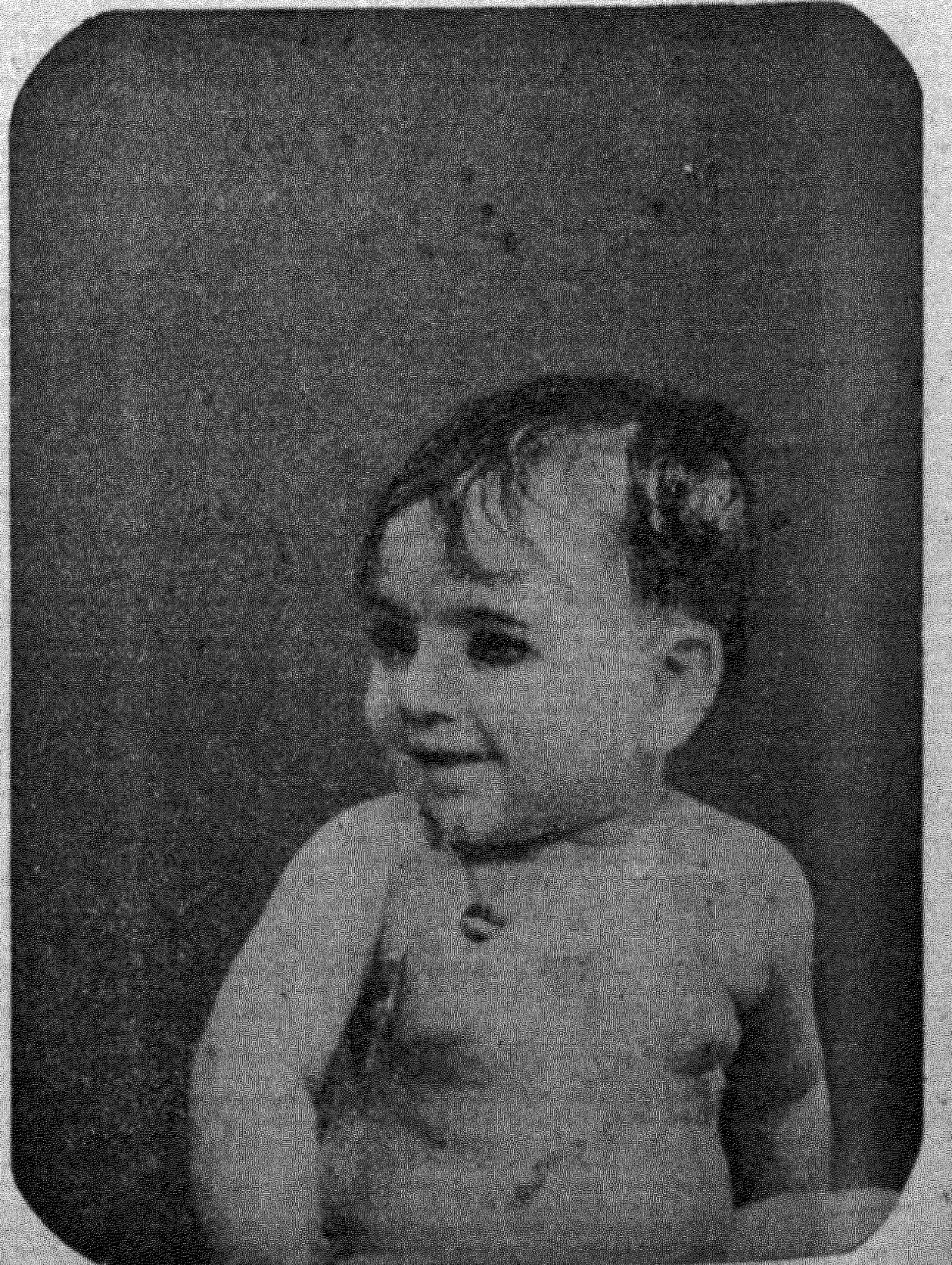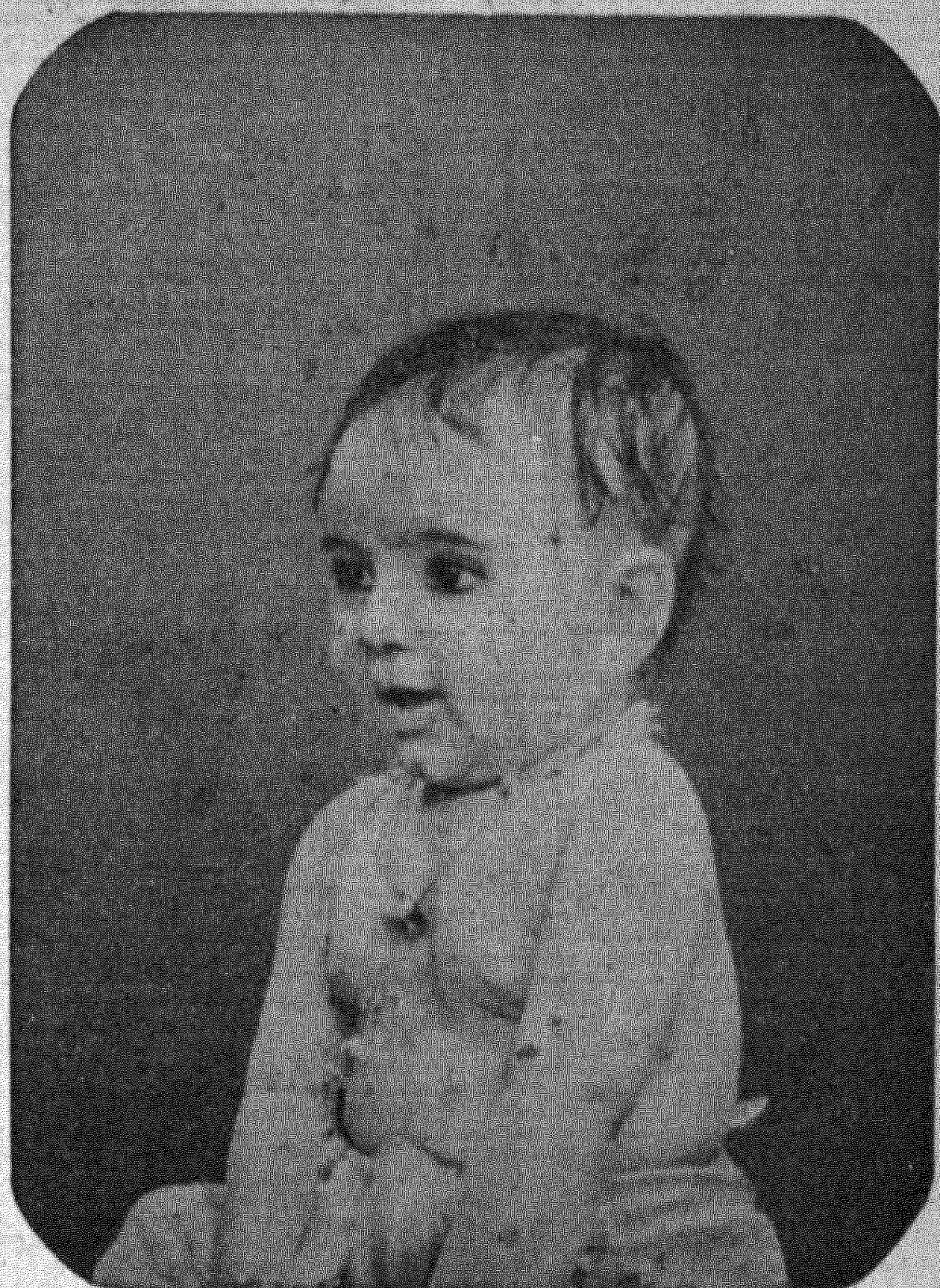
"মার দিয়া কেল্লা, হুয়ো দাদা !"

মান—"ছেড়ে দাও—শেষে ঠাকুমা কিনা—হ্যাঃ"

হতাশ প্রেমিক সন্ন্যাসী !

আলোক-চিত্রশিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য]

[বসুমতীর সৌজন্যে।
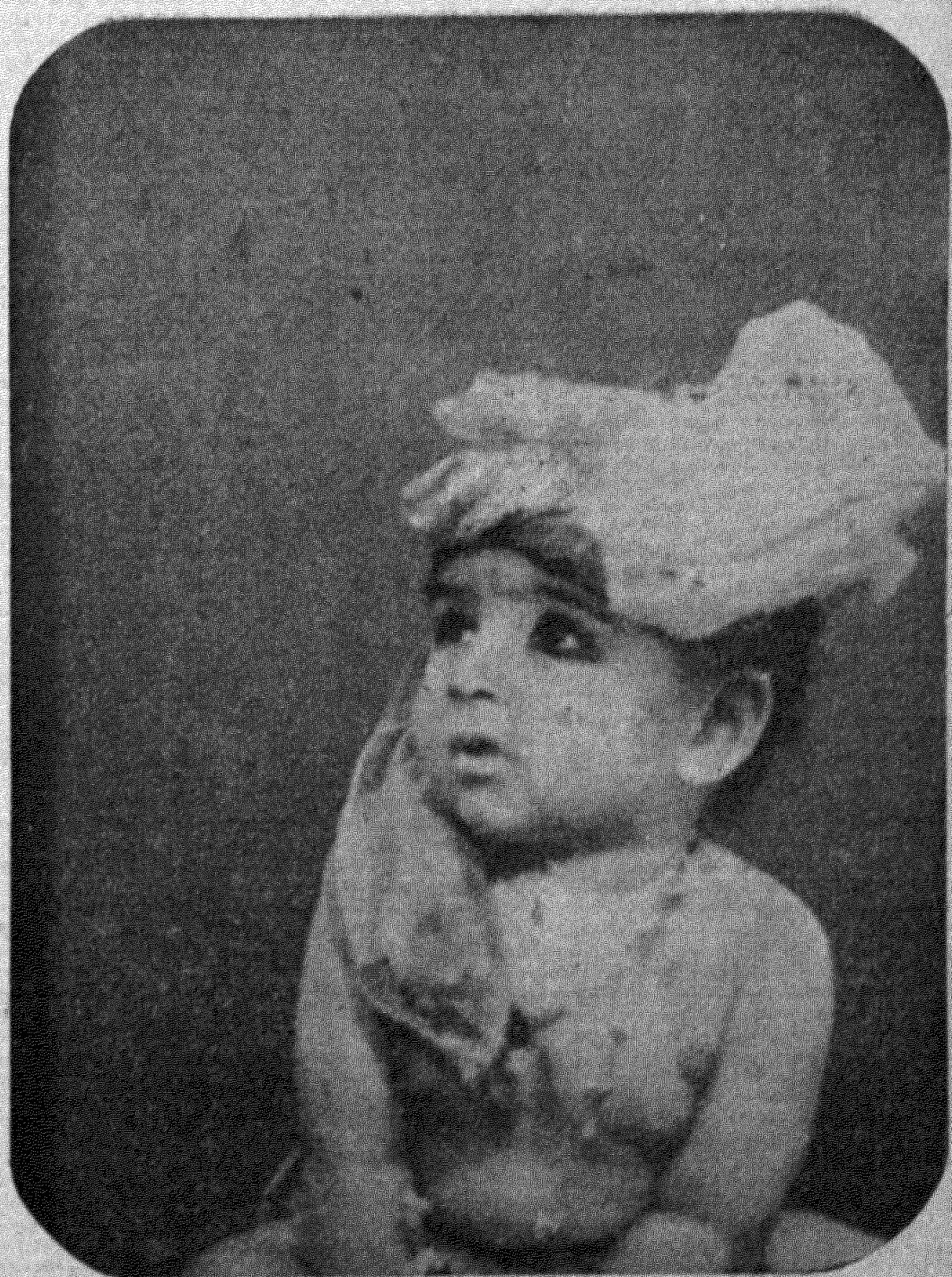
চিরগোপন

(উর্দ্দু গজল হইতে)

= শ্রীদিলীপকুমার রায় =

অন্তরে মোর রয় সে-প্রিয়—
তায় তবু হায়
মিল্‌ল কই ?
নয়ন তারায় রাজে—নয়ন
দেখ্‌তে সে-তায়
শিখ্‌ল কই ?

ঢুঁড়নু দিবস রাতি সারা
বিশ্বে চির-সাথী-হারা ;—
সব দেউলে তার প্রতিমা—
প্রাণ প্রতিমায়
দীপ্‌ল কই ?

লুকিয়ে প্রেমের দীপ্ত ঝুরি
ঝরিয়ে করে চিত্ত চুরি ;—
গহন হিয়ায় রয় মনচোর—
মন তবু তায়
চিন্‌ল কই ?

ভোর কি আমার হবে নিশা ?
রইবে কি নীরবে দিশা ?
নিখিল ঘেরি' রয় সে-প্রিয়—
তায় তবু হায়
মিল্‌ল কই ?

শরৎচন্দ্র

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

শিরোনাম দেখে পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করবেন না য, আমি এই শরদাগমে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও অতুলনীয় শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে কবিত্ব প্রকাশ করতে বসেছি। না নয় বন্ধু, তা নয়। কবিত্বের 'ক' অক্ষরও কোন দিন আমার এই অতি কঠোর নীরস গদ্য হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি—যৌবনকালেও নয়, আর এ বৃদ্ধ বয়সে ত নয়-ই। আমি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে বলতে পারি, আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন এক লাইনও কবিতা লিখতে পারিনি। প্রথম যৌবনে, আর সকলের যেমন হ'য়ে থাকে, আমারও একবার কবিতা লিখবার সাধ হয়েছিল। কিন্তু, কাগজ কলম নিয়ে ব'সে দেখলাম, এ আমার কর্ম্ম নয়। তখন 'Poets are born, not made' এই মহাবাক্যের মহাসত্য সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে সেই যে ও-পথ ত্যাগ করেছিলাম, ভ্রমক্রমেও আর সে পথে পদার্পণ করিনি। সুতরাং মাভৈঃ, প্রচারকের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আমি 'চন্দ্রাহত' (Moon-Struck) হইনি—শরৎকাল, শারদীয়া পূজার সম্বন্ধে একটী কথাও বলব না; আমি যে শরৎচন্দ্রের কথা বলব, তিনি সুস্থ শরীরে, খোসমেজাজে, বহাল তবিয়তে বর্ত্তমান; ক্ষুধার্ত্ত সম্পাদকগণের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে তিনি, এমন যে শিবপুর, তা ছেড়ে দুর্দ্দান্ত রূপনারায়ণের তীরে এক জঙ্গলের মধ্যে কুটীর বেঁধে বাস করছেন। তবে শুনেছি এবং দুই-চারবার দেখেছিও, সেখানেও প্রাণীর দল ধাওয়া করতে ছাড়েন না—কম্বল নেহি ছোড়তা! আমিও তাঁদের মধ্যেরই এক-জন, এ কথা গোপন করব না!

শ্রীজলধর সেন

আমি সেই শরৎচন্দ্রের—শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাই বলব। কি বলব, তার একটু আভাসও এখনই দিয়ে রাখছি। কেহ হয়ত মনে করছেন, আমি এতকাল পরে বুঝি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব, নির্ম্মম কশাইয়ের শাণিত ছুরী হাতে নিয়ে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারীদিগের অস্থি-চর্ম্ম-মেদ-মাংস ছাড়িয়ে, যাকে সাধুভাষায় বিশ্লেষণ বা সমালোচনা বলে, তাই করব। তা নয় বন্ধু, তা নয়—কশাইগিরি আমার ব্যবসায় নয়। আমি বৈষ্ণবের ছেলে, ও-সব কাটাকাটি, বলিদান আমি কোনদিন দেখতেই পারিনে—নিজ হাতে করা ত দূরের কথা। সে সব কিছুই আমি বলব না;—আমি কি বলব জানেন? শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেইদিনের কথা,—সেই স্মরণীয় ঘটনা। অতএব আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমার অনুসরণ করতে পারেন।

সালও মনে নাই, মাসও মনে নাই, বারও মনে নাই—অত সব মনে ক'রে যদি রাখতে পারতাম তা'হ'লে ইতিহাসের অধ্যাপকই হ'তে পারতাম। থাক, সে কথা। তবে, সে যে আঠারো বৎসর আগের কথা, তা বেশ মনে আছে।

একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময় 'ভারতবর্ষ' আফিসে ব'সে কাজ করছি, এমন সময় একটী বন্ধু এসে বললেন "দা'দা, শরৎবাবু দুই মা'সের ছুটী নিয়ে রেঙ্গুন থেকে

কলিকাতায় এসেছেন।" এ সংবাদটা আমি জানতাম না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "তিনি কবে এসেছেন? কোথায় আছেন? তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে।"

বন্ধু বললেন "সেই খবরইত আপনাকে দিতে এসেছি। আমি এইমাত্র দেখে এলাম তিনি 'যমুনা' আফিসে ব'সে আছেন। এখন যদি যান, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।"

'যমুনা' আফিস তখন আমাদের আফিসের খুব নিকটে ছিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীমানী বাজারের সম্মুখের ফুট-পাথের উপর এখনও একটী ছোট দোতলা বাড়ী আছে। সেই বাড়ীর দোতলার একটী ঘরে 'যমুনা' আফিস ছিল। আমি তখনই বন্ধুকে বল্লাম 'ভাই, তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর। আমি কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে এখনই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" শরৎচন্দ্রকে দেখ্বার জন্য তখন আমার এমনই আগ্রহ হয়েছিল।

একটু পরেই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে 'যমুনা' আফিসে গেলাম। দেখি 'যমুনা' সম্পাদক শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ পাল এবং আরও দুই একজন ব'সে আছেন; আর ব'সে আছেন সামান্য কাপড়-চোপড়-পরা কৃশকায় একটী যুবক। আমার বুঝ্তে দেরী হোলো না যে এই যুবকই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—এখন যাঁকে আদর করে 'শরৎ' ব'লে ডাকি, তুমি বলে সম্বোধন করি।

আমরা ঘরের মধ্যে অগ্রসর হ'লেই শ্রীমান্ ফণীবাবু উঠে বল্লেন "এই যে দাদা এসেছেন।"

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্রও চেয়ার থেকে উঠে বল্লেন "দাদার সঙ্গে আমার নূতন করে পরিচয় করাতে হবে না, আমি ওঁর বহু দিনের পরিচিত।" এই ব'লে আমাকে তাঁর পাশের একখানি চেয়ারে নিয়ে বসালেন।

আমি ত অবাক্! 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে'র লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে আমাকে এভাবে অভ্যর্থনা করবেন, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কোন দিন দেখা নেই, অথচ প্রথম সাক্ষাতেই কত দিনের পরিচিতের মত কথা একেবারে 'দাদা ব'লে সম্বোধন! আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিনি বল্লেন তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়! আমি ত কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করতে না পেরে, কি যে বলব, ঠিক করতে পারলাম না।

আমার এ বিব্রত ভাব শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। তিনি বল্লেন "দাদা, পরিচয়ের কথাটা তা হ'লে খুলে বলি। আপনি তার কিছুই জানেন না; তাই আশ্চর্য্য বোধ করছেন। আচ্ছা, আপনার বোধ হয় মনে আছে যে, কয়েক বৎসর আগে আপনি একবার কুন্তলীন পুরস্কারের রচনার পরীক্ষক হয়েছিলেন।"

আমি বল্লাম "হ্যাঁ, আমি পরীক্ষক হয়েছিলাম।"

শরৎচন্দ্র বল্লেন "আপনি সেবার 'মন্দির' নামে একটা গল্পকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন।"

আমি বল্লাম "প্রায় দেড়-শ গল্প এসেছিল, তার মধ্যে 'মন্দির' গল্পটা আমার সব চাইতে ভাল লেগেছিল। তাই সেটীকে আমি প্রথম পুরস্কারের উপযুক্ত ব'লে মত প্রকাশ করেছিলাম। আরও মনে পড়ে, সেই লেখাটার উপর ছোট একটু মন্তব্য লিখেছিলাম, এই লেখক যদি চর্চ্চা রাখেন, তা হ'লে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন। কিন্তু, আমার বেশ মনে আছে, সে গল্পের লেখক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগলপুর।"

শরৎচন্দ্র হেসে বল্লেন "সে গল্পটী আমিই লিখে আমার মামা সুরেনের নাম দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং আপনার সঙ্গে যে আমার অনেক দিনের পরিচয়, সে কথা কি ঠিক নয়।"

আমি বল্লাম "অতি ঠিক কথা। এর চাইতে বড় পরিচয় আর হ'তে পারে না।"

আমার তখন ভারি মুস্কিল হলো। প্রথম দর্শনেই ত শরৎ আমাকে 'দাদার' পদে প্রমোসন দিলেন। আমি তখন কি করি, তাঁর সঙ্গে 'আপনি' ব'লেই কথা বলব, না 'তুমি' বলব, ঠিক করতে পারছিলাম না। 'আপনি' 'তুমি' এড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলা যায়। তীক্ষ্ণধী শরৎচন্দ্র সে কথা বুঝতে

পেরে সহাস্য মুখে বল্‌লেন 'দাদা সঙ্কোচ করবেন না। আমি আপনার ছোট ভাই। আমার সঙ্গে 'তুমি' বলেই কথা বলুন।"

সেই দিন দশ পনর মিনিটের মধ্যে শরৎচন্দ্র আমাকে তাঁর পরমাত্মীয় ক'রে নিলেন—আমি হ'লাম তাঁর 'দাদা' আর তিনি হ'লেন আমার কাছে "শরৎ"!

এমনই করে পরকে আপন করতে জানেন ব'লেই শরৎচন্দ্র আজ দেশমান্য কথা-শিল্পী—কথা-সাহিত্যের সম্রাট! এরই জন্যই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

আজ এই দুর্গোৎসবের সময়, বিশেষ অসুস্থ শরীরে এই কয়টা কথা বলেই আমি শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার গভীর স্নেহ, অপরিমেয় শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

শারদ প্রভাতে

শ্রীকালিদাস রায়

আজ শরতের পূব গগনের দুয়ার খুলে
সাদা মেঘের পরে ঊষা দাঁড়িয়েছিল ঘোমটা তুলে।
পাখীর গলায় কি কাকুতি!
কুঞ্জসভায় কি আকুতি!
আমন্ত্রণী বহি পবন দোলা দিল হিরণ চুলে,
হায়—গগন ছেড়ে ধরায় ধূলায় নাম্‌ল ঊষা ক্ষণিক ভুলে।
ধরায় নেমে কোথায় গেল ঊষারাণী?
কোথায় গেল কুঞ্জ শোভা কোথায় পাখীর ব্যাকুল বাণী?
মিলাইল স্বপন কোথায়
দিবাদাহের তপ্ত ব্যথায়?
দাগ রেখেছে পাতায় পাতায় কারা ব্যথার অশ্রু হানি?
শুধু—তড়াগ বুকে চিহ্ন রেখে গেছে ঊষার পাদুখানি।

গান
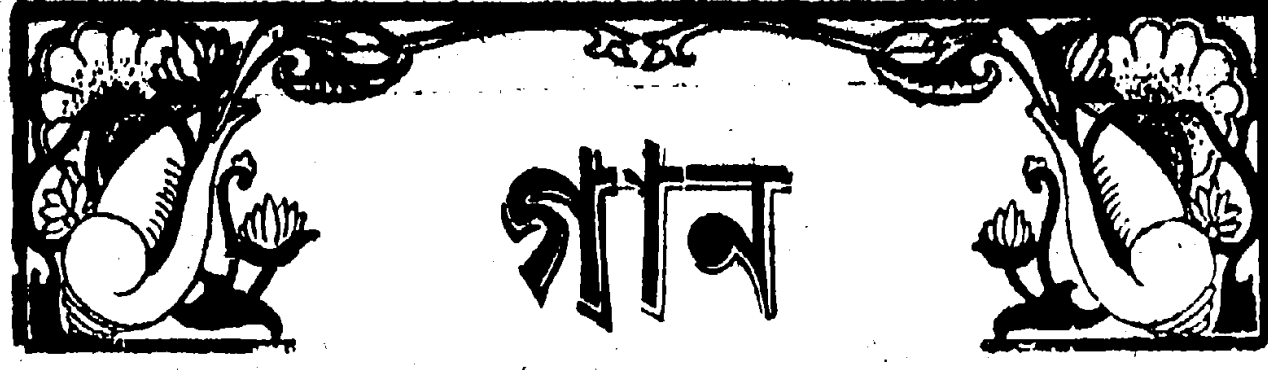
—নজরুল্ ইস্‌লাম্—

ভৈরবী—দাদ্‌রা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো
ফুল ঝরা প্রভাতে॥

তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর,
তুমি ফোটার আগের ঝরা মুকুল
বৈশাখী হাওয়াতে॥

তুমি কাশের ফুলের করুন হাসি মরা নদীর চরে,
তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী উৎসব-বাসরে।
তুমি মরুর বুকে পথ-হারা
গোপন ব্যথার ফল্গুধারা
তুমি নীরব বীণা বাণীহীনা
সঙ্গীত সভাতে॥

জীবন ও মৃত্যু

≡ বুদ্ধ দেব ও অম্বাপালি ≡

পূর্ণকাম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমার পরম প্রেমে পূর্ণ আজি অন্তর আমার
হে মোর অন্তরলক্ষ্মী ! অনন্ত আনন্দ পারাবার—
উদ্বেলিত চিত্ততটে ; অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ হিল্লোল
এ জীবন তরণীরে আন্দোলিয়া দেয় ঘন দোল !

তোমার অঞ্চলবায়ে সমীরণ উল্লাস চঞ্চল—
কেশর কুন্তল গন্ধে সুরভিত কুঞ্জে পুষ্পদল ;
নয়নে কল্যাণ দৃষ্টি সৃষ্টি করে নব দিব্যালোক
অধরে অমৃত-হাস্য মুছে দেয় সর্ব্ব দুঃখ শোক ;
কমল চরণ স্পর্শে হর্ষে কাঁপে রোমাঞ্চিত ধরা
অন্তঃহীন নভোশীর্ষে উচ্ছ্বসিত জ্যোতির পসরা !

মর্ম্মের মানসী যার মূর্ত্তি ধরি দেখা দেয় এসে ;
পূর্ণ করে প্রণয়ীরে পরিপূর্ণ প্রাণে ভালোবেসে—
যৌবনের স্বপ্নমায়া আঁকে চোখে কল্পনা-অঞ্জন,
নিখিলের রূপরাগে জাগে নিত্য সৌন্দর্য্য নূতন !
সেদিন মিলন-মুগ্ধ হৃত-গর্ব্ব বিধাতা আপনি
মানব দুয়ারে মাগে দেবতা-দুর্লভ প্রেমমণি !

দেবালয়, লিলুয়া

১৫-৫-৪০

উজ্জীবন

শ্রীরাধারাণী দেবী

তপ্ত মরু সম তার শুষ্ক রুদ্ধ প্রাণ নির্ঝরিণী
ভরা ভাদ্র নদী হেন হ'ল আজি পূর্ণ পয়ঃস্বিণী।
প্লাবিয়া দু'কূল বহে উচ্ছ্বসিত সঞ্জীবনী নীর
আনন্দ সিন্ধুর পানে।—ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী পৃথিবীর
সমস্ত সম্পদ আজি পুঞ্জীভূত হল ধীরে ধীরে
নব সঞ্জীবিত তার প্রাণ-সুধা তরঙ্গিণী তীরে !
রূপ রস গন্ধ গীত স্পর্শ শুধু ভরে নাই সাজি,
অন্তরের রসলোকে নব নব অনুভূতি রাজি
নিত্য তার চিত্তখানি অভিভূত করে ক্ষণে ক্ষণে !
উথলিয়া ওঠে সুধা অফুরন্ত সারা দেহে মনে।
ভরিয়া অমৃত পাত্র অহোরাত্র আনন্দের ধারা
ঝরে তার মর্ম্মরন্ধ্রে। নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা
নৃত্য করে ষড়ঋতু, নিত্য নব উল্লাস লীলায়।
জীবনের অন্ধ অমা পূর্ণিমায় আপনি মিলায় ॥

গল্প না কবিতা ?

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি, এ

প্রকাশ বিছানার উপর হইতে চেয়ারের দিকে হাত বাড়াইয়া একটা খাতা আমার হাতে দিয়া বলিল…এইটে পড়ে দেখবেন, ডাক্তার বাবু।

আমি তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করিলে সে বলিল… ওটা একটা গল্প।

"তুমি গল্প লেখ না কি ?"

"না এইই আমার প্রথম গল্প আর এইই শেষ।"

আমি বলিলাম…পাগল না কি ? সুস্থ হ'য়ে ওঠ আরও অনেক লিখতে পারবে।

প্রকাশ অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। বিদ্রূপ-মিশানো এ হাসি ডাক্তারদের পরিচিত, চিকিৎসকের উপর, চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হারাইয়াই মানুষ শুধু এমন করিয়া হাসিতে পারে।

তাকে অনেক প্রবোধ দিলাম, টেম্পারেচার কমিয়াছে, কাসি নাই, হজমশক্তি দুর্ব্বল বটে কিন্তু ঔষধে কাজ হইয়াছে।

আর কথা শেষ হবার আগেই রোগী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

গাড়ীতে কাগজ না পড়িয়া গল্পটা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ছোট গল্প, বড় বড় হাতের লেখার পৃষ্ঠা দশেক মাত্র। একটা সাধারণ প্রেমের কাহিনী, নায়ক রঞ্জন এম, এ পরীক্ষা দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট টাউনে ফিরিয়াছে। তার বাবা সেখানে মাঝারি রকমের উকীল।

রঞ্জন প্রাতে তাস খেলে, এগারটা আন্দাজ ঘণ্টা খানেক সাঁতার কাটে, আহারের পর নিদ্রা দেয়, তারপর বাহির হয় বেড়াইতে। কোনদিন যায় মাঠে, কোনওদিন যায় সাহিত্য সেবকদের আখড়ায়, কিন্তু সময় কিছুতেই কাটে না। অলস দিনগুলি একটার পর একটা আসে, নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন, একেবারে রোমান্স-বিবর্জ্জিত।

এই সময় একদিন তার বাবা বলিলেন…এডিশনাল জজ মিষ্টার সেন ধরেছেন তাঁর মেয়ের ইংরেজীটা তোমায় একটু দেখে দিতে হবে। সে আসচে বার বি, এ, দেবে।

টিউশনি করার ইচ্ছা কোনদিনই রঞ্জনের ছিল না, কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের মেয়ে পড়ানোর একটা লাক্‌সারি (Luxury) আছে তাই সহজেই স্বীকৃত হইল।

রঞ্জনের ছাত্রী মায়া নিখুঁত সুন্দরী নয়, কিন্তু যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্য ও বুদ্ধি শ্রীমণ্ডিত তার চেহারা, গড়ন ভাল, রং উজ্জ্বল শ্যাম।

তারপর উপন্যাসে যাহা হয়, উপন্যাসের চেয়েও বেশী করিয়া জীবনে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল।

রঞ্জনের মনে হইল মায়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। অবশ্য এ ঘটনার পূর্ব্বে রঞ্জন জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস করিত না।

রঞ্জন মনে করে মায়ার প্রতি তার এই আকর্ষণের একটা রহস্য আছে হয়ত' শত শত বছর আগে তারা কোনও পল্লীভূমির স্নিগ্ধনদী-তটে খেলিয়া বেড়াইত। সে ছিল রূপকথার রাজকুমার, মায়া ছিল স্বপ্নরাজ্যের পরী !

এম, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। রঞ্জন ফার্ষ্ট ক্লাস পাইয়াছে তবে পজিসনটা ভাল হয় নাই।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল…কি কর্ব্বেন এখন ?

'ভাবছি বি, সি, এস্ দেব।'

'আই, সি, এস্ নয় কেন ? বি, সি, এস্ এর পক্ষে খরচা চালানোই ত মুস্কিল।

পাকা একজন বি, সি, এস'-এর মেয়ের মুখে কথাটা শুনিয়া রঞ্জন মুগ্ধ হইল। এই হাই-আইডিয়াল তার প্রেমিকারই উপযুক্ত।

তবে দুঃখের বিষয় আই, সি, এস্ এর বয়স রঞ্জনের ছিল না।

বি, এ পরীক্ষার পরের কথা। চারদিক হইতে মায়ার ন্ধ আসিতেছে। এডিসনাল জজের একমাত্র সন্তান সে, দের হাতে পয়সা আছে, পাত্র কোনটী ব্যারিষ্টার, কোনটী লাত ফেরত ডাক্তার, কেহবা জমিদার তনয়। এদের লনায় রঞ্জন ভাল পড়ুয়া মাত্র, গেরস্ত ঘরের ছেলে। দের সঙ্গে নিজকে তুলনা করিয়া সে একটু দমিয়া গেল।

মায়া ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে একটু হাসিয়া বলিল··· মি ত' আর Chattel নই, লেখাপড়া করেছি। বে' তে মারও সম্মতির দরকার।

এর পর আর রঞ্জনকে পায় কে? সে পড়িতে লাগিল গুণ উৎসাহের সহিত।

এই সময় বি, এর ফল বাহির হইল। ডিস্‌টিংসন না ওয়ায় মায়া একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

রঞ্জন বলিল···এম,-এতে ওটা পুষিয়ে নেবে। আমি মাকে···

মায়া হাসিয়া বলিল···ফাষ্ট ক্লাস পাইয়ে দেবে? তা ! এদিকে বাবার বদলীর হুকুম এসেছে জান? কবারে সিলেটে ডিষ্ট্রিক্টের চার্জ্জ নিয়ে।

পিতার পদোন্নতিতে মায়া খুবই উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু লীর খবরটা রঞ্জনের ভাল লাগে নাই। তবু সে বলিল লই হল। এবার হাইকোর্টে অফিশিয়েটিং এর চান্স্ ন। ওঁর ত' রিটায়ার হওয়ার অনেক দেরী।

ভাবী শ্বশুরের ভবিষ্যতে হাইকোর্টে জজিয়তী করার ায় তরুণ মনের আনন্দ যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশী খর সেই ভাবী জজের কন্যার সঙ্গে আশু নিশ্চিত বিরহ। ন এই বিরহের আশঙ্কায় মুষড়িয়া পড়িল।

মায়া ইহা লক্ষ্য করিয়া কয়দিন একটু বিদ্রূপ করিল, কিন্তু বার দিন বলিয়া গেল সে রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করিবে, সি, এস এর ফল বাহির হইলে মায়া নিজেই কথাটা াপন করিবে তার পিতার নিকট। মিঃ সেন না বেন না।

কয়েকমাস পরের কথা। বি, সি, এস এর তখনও কিছু বাকী। রঞ্জনের পিতার নামে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিল ায়ার বিবাহ, পাত্রের নাম তপন চাকলাদার।

নামটা রঞ্জনের পরিচিত, চাকলাদার, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তপন চাকলাদারই বটে—রঞ্জনদের বছর পাঁচেকের সিনিয়র, রেলের একজন এ, টি, এস। এসিস্‌টান্ট ট্র্যাফিক সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের মাইনেটা মোটা, ভবিষ্যত ভাল, একটা ইম্পিরিয়ল সার্ভিস। যাহা হৌক মায়ার ইম্পিরিয়ল সার্ভেণ্টের পত্নী হওয়ার আশাটা তবু মিটিয়াছে। তবে আই, সি, এস—তবু যা'হক দুধের সাধ ঘোলে মিটিবে।

সেই ডাকেই আরও একখানা চিঠি আসিয়াছে মায়ার বিবাহের চিঠি আসায় সেখানা এতক্ষণ চোখে পড়ে নাই।

কিন্তু এ যে মায়ারই চিঠি, সেই পরিচিত হস্তাক্ষর।

রঞ্জন আগ্রহের সহিত চিঠিখানা পড়িল। মায়া লিখিয়াছে সে যেন কিছু মনে না করে। বাধ্য হইয়াই সে এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। তার বেশী প্রকাশ করিতে সে অক্ষম।

রঞ্জনের মনে হইল কী নির্লজ্জ ধৃষ্টতা। কি প্রয়োজন ছিল তার এই চিঠি লিখিবার? এ যেন Adding insult to injury.

বাধ্য হইয়াছে সে এই বিবাহে সম্মতি দিতে···বাঃ বেশ···হাসিতে হাসিতে রঞ্জন চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

রঞ্জনের আর বি, সি, এস দেওয়া হয় নাই। পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আজ প্রায় এক বৎসর সে অসুখে ভুগিতেছে, জ্বর, কাশি, রক্তবমন।

জ্বর যখন তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন বেদনাহত বুক চাপিয়া ধরিয়া সে ভাবে মায়ার কথা। সে জানে, বোঝে যে এটা Silly—এরকম Platonic প্রেমের কোন মানে হয় না—তবুও তাকে ভাবিতে হয়।

প্রকাশ গল্প শেষ করিয়াছে এই বলিয়া···

বসে আছি, ওগো মানসী প্রিয়া তোমারই স্মৃতি নিয়ে সেই দিনটীর প্রতীক্ষায়···

আমার নীরব বেলা
সেই তোমার সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো
উঠ্‌বে পুরে

আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে…"

গল্প শেষ করিলাম এতদিন প্রকাশকে প্রবোধ দিয়াছি যে রোগ তার যক্ষ্মা নয়, সে সারিয়া উঠিবে। মুখে সে কোনও প্রতিবাদ করে নাই, দু'একদিন হাসিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন গুছাইয়া, সুন্দর করিয়া খুব কম রোগীই ডাক্তারকে জানাইয়াছে যে মিথ্যা আশ্বাসে সে ভোলে নাই।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল মায়ার কথা। এরূপ কত মায়া যে কত মানুষকে ব্যথা দিয়াছে তাদের লঘু চপলতা দিয়া তার ত' সীমা সংখ্যা নাই। কত রোগ শয্যার পিছনে যে এরূপ ইতিহাস আছে কে তার খবর রাখে? অথচ প্রেমের এই খেলা নারী জীবনের একটা আনন্দ।

সমস্ত দিনটা মন খারাপ হইয়া রইল—শুধু মনে পড়িতেছিল প্রকাশ, তার রোগ, তার প্রেম, মায়া—এই সব কথা।

পরদিন প্রকাশ প্রশ্ন করিল,

'গল্পটা পড়েছেন?'

'হ্যা'

'কেমন লাগ্‌ল?'

'ভাল।'

খানিকক্ষণ পরে সে কহিল—'অনেক সম্পাদকের সঙ্গেই ত' আপনার পরিচয় আছে। লেখাটা যদি একটা কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন।'

'আচ্ছা দেখ্‌ব।'

প্রকাশ বলিল…গল্পটা ট্র্যাস হয়েছে তা' জানি, নিতান্ত বাজে। তবু একবার…আরও কি যেন ওর বলিবার ছিল। একটু থামিয়া কথাটা ঘুরাইয়া বলিল…দেখবেন যেন ছাপাটা দেখে যেতে পারি…

আমি বলিলাম…কি যে বাজে বল। আচ্ছা, এতে কি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টচ্…

প্রকাশের দাদা আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্। কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতান্তই সঙ্কুচিত হইলাম।

কথাটার সে কোন জবাব দিল না একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল মাত্র।

তিনমাস পরে গল্পটা দক্ষিণায় বাহির হয়, প্রকাশের তখন অন্তিম অবস্থা। পড়িবার তখন সামর্থ্য ছিল না, দু'লাইন পড়িলেই অন্ধকার হইয়া আসে।

সে বলিল…একটা ঠিকানায় একখানা কাগজ প[াঠাতে] দিতে পারেন? তার পর আঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে ক্ষী[ণ স্বরে] কহিল…নাম প্রতিমা দেবী, ঠিকানা, হ্যা তাই ত…নি[উ] আলিপুর না, না নিউ রোড পি-চার ডব্লিউ।

তার পর আর প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয় নাই। আ[মি] পিলজঙ্গে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম প্রকাশে[র] মৃত্যু হইয়াছে।

কাগজখানাও ফেরৎ আসিয়াছিল, কভারের উপরে লে[খা] মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। যাহা হৌক প্রকাশে[র] এই গল্পটা আমার নিকট চিরদিনই প্রহেলিকার মত র[হিয়া] গিয়াছে। খবর নিয়া জানিয়াছি টিউসনি সে কখন ক[রে] নাই। নিউ রোডেও কোন প্রতিমা দেবীর সন্ধান মি[লে] নাই তবে গল্পটা যে প্রকাশের একান্ত অনুভূতি দিয়া[ই] লেখা সে সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম।

মাস কয়েক পরে, প্রকাশের কথা যখন আর একটা বড় মনে পড়ে না সেই সময় তার বাবার একখানা চি[ঠি] পাইলাম, সঙ্গে একটা কবিতা। প্রকাশের বাবা অনুরোধ করিয়াছেন কবিতাটী কোনও কাগজে ছাপাইয়া দিতে। কবিতাটীর নীচে তাঁর নিজের হাতে লেখা…মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে রচিত।

কবিতায় প্রকাশ তার বৈচিত্র্যহীন জীবনের জন্য আক্ষেপ করিয়াছে। সেই গতানুগতিক কলেজ যাওয়া মেস জীবন বায়স্কোপ দেখা এ ছাড়া কিছুই সে করে নাই।

জীবনে প্রেম সে করে নাই। নারী তার জীবন পথে আসিয়াছে মাতৃরূপে, ভগ্নীরূপে। আর সেইটাই বোধ হয় তাদের সত্যকার রূপ।

প্রেমিকারূপে তার জীবনপথে কেহ আসে নাই, না আসিয়া ভালই হইয়াছে…কারণ ঐরূপটাই নারী জীবনের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী দিক। এইরূপ আরও অনেক 'কিছু'।

আজও মনে পড়ে প্রকাশের রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। গল্পটা তার নিজের জীবনের ইতিহাস কিনা আমার প্রশ্নের উত্তরে তার স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি।

ক্ষয়রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া জীবনে নারীর অভাবকে সে তার গল্পে একটা মূর্ত্তি দিয়াছিল মাত্র?

কোন্‌টা সত্য প্রকাশের গল্প না কবিতা?

হিসাব-নিকাশ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

হিসাব-নিকাশ করতে বসে অবাক হলেম হায়
জমার চেয়ে খরচ বেশী, দেনা বেড়েই যায়।
হায় কি লজ্জা ছি ছি, একি! জমার খাতায় শূন্য দেখি,
খরচ খাতার সবটা ভরা, কি যে এর উপায়।
সন্ধ্যা নামে আঁধার কালো, জ্বালতে এখন হবেই আলো,
শুধু-হাতে অসময়ে ধার কি পাওয়া যায়?
হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে ঠেকে গেলাম দায়।

গান

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ওগো কেঁদনা গো সখি কেঁদনা!
বৃথা বাহুপাশে বেঁধনা!
দুইটী জীবন
লভিল মিলন,
ক্ষণিক মিলন যদিও—
তবে কেন মিছে বেদনা!
মোরা যৌবন শিখা জ্বালায়ে
বাসনা নিয়েছি গালায়ে!
আসে যদি ঘুম্
অমৃত চুম্
রবে জাগি চির স্বপনে—
অমর ক্ষণিক-সাধনা!

প্রচার

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি এ,

শরৎ-আকাশ সুনীল প্রসার
সোনার আলোক ধারা,
নভোমণি আজ কি করে প্রচার
কি বলে আপন হারা?
দুঃখ শোক থাক, সে যেমন আছে
তবুও হাসিছে ধরা—
সেফালি ফুলের, কুন্দের কাছে
পরিমলের পসরা।
বসুন্ধরা সার্থক নিজ নাম
করি চলে চিরদিন।
মুখের হাসি যে রাজে অবিরাম,
অন্তর বেদনা—দীন॥

অসময়ে

শ্রীহাসিরাণী দেবী

ওগো অভিমানি !
এতদিনে সরাইয়া যবনিকাখানি
দেখাইলে ছিন্ন বীণা তার
গীতিসভা না ভাঙ্গিতে লভিয়াছে ধূলার আশ্রয় ;
বসন্তের শেষ উপহার
না শুখাতে দ্বারে তব গর্জ্জিয়াছে দুর্ব্বাসার ক্রুর পরিহাস
লৌহকরাঘাত সম। নেভা দীপ আনন্দ উচ্ছ্বাস
ডুবিয়াছে বিষাদের মরণ-সাগরে
চিরদিন,---চির রাত্রি তার।
আজি এই অসময়ে এই অবেলায়
দিনান্তের ক্লান্ত---মৌন ধূসর ছায়ায়—
কী তোমা বুঝাব' বন্ধু ? সান্ত্বনার বাণী কই মোর !
এ কণ্ঠ যে স্বর হারা, ফুরায়েছে নয়নেরও লোর।

এতদিনে শুনাইলে তোমার ও গানখানি আজ
পাষাণ-বেদীর মূলে ! এতদিনে দিয়ে এলে
পূজাফুল-সাজ
প্রাণহীন মূরতি পূজিতে ? কী কহিব,
কী বুঝাব কারে !
দেবশূন্য দেবালয় ভ'রে ওঠে ব্যর্থ হাহাকারে—
কই---কই দেবতা আমার,—
পদচিহ্ন কোথা গেল তার !
ভগ্নবৃন্ত শুষ্ক ফুলদলে
নিত্য দাও ডালি পদতলে
পাষাণ মূর্ত্তির ! নিত্য জ্বালি ব্যথাতুর নয়ন-বর্ত্তিকা
ভিক্ষা চাহ দয়ার কণিকা
তারই কাছে !

প্রাণহীন মূর্ত্তি শুধু হাসে,—
তোমার প্রার্থনা কাঁদে অনন্ত আকাশে ॥

দ্বীপান্তরের চিঠি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অনেককাল পরে আজ কলমটাকে তুলে নিয়েছি।

মনে ভেবো না লিনা, তোমায় পত্র লিখবার উদ্দেশ্য নিয়েই লিখতে বসেছি। এ আজ আমার খেয়ালের ঝোঁক মাত্র, কারণ আমার পত্র যে তোমার কাছে গিয়ে পৌছাবে না তা আমি জানি।

তবু লিখছি বলেছি তো—এ আমার খেয়ালের বিলাপ মাত্র। অনেকদিন পরে হঠাৎ মনে হল আমি ছোট-লোকদের সঙ্গে মিশে ছোটলোকের কাজ করলেও

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বাস্তবিকই আমি ছোটলোক ছিলুম না। একটা দিন ছিল সেদিন—যাদের সঙ্গে মিশে আজ তাদেরই একজন হয়ে আমায় জীবন কাটাতে হচ্ছে, ওদের ছোটলোক বলেই ঘৃণা করতুম, ওদের এড়িয়ে চলতুম—যেন ওরা কোনক্রমে আমার নাগাল না পেতে পারে।

আজ আমি ওদের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কেবল মাত্র মানুষ হিসাবে ওরা যেটুকু দাবী করে যেটুকু পায়, আমি ভদ্রসন্তান ও উচ্চশিক্ষা পেয়েও কেবল সেইটুকুরই দাবী করতে পারি।

মানুষ আমি, কেবল মানুষ। ভদ্রসন্তান উচ্চশিক্ষিত নই, আমি কেবলমাত্র মানুষ।

কতদিনের জন্য এসেছি জানো—যাবজ্জীবন, অর্থাৎ কুড়ি বছর। তা থেকে কয়টা বছর বাদ দিলেও ষোলটা বছর নিশ্চয়ই হবে। ষোল বছর বাদে যখন ফিরব, তখন দেখব দেশ বদলে গেছে।

গিয়ে দেখব—যাদের এতটুকু দেখে গেছি তারা এক একটা সংসারের কর্ত্তা হয়েছে, তারা তখন খেলবে না, তারা গম্ভীরভাবে বসে সংসারের হিসাব নিকাশ করবে।

ছয় বছর গেছে, বাকী এখনও দশ বছর।

উঃ, কি করে যে আরও দশটা বছর কাটবে আমি তাই ভাবছি।

কাল রাত্রে তোমায় দেখেছিলুম—

সেই ছোটবেলার মত তুমি আমার কাছে ছুটে এসে-ছিলে, কত কথাই বলেছিলে।—

ঘুম ভেঙ্গে সেই কথাই ভাবছিলুম, আর সেই পূর্ব্ব স্মৃতিই আজ আমায় লেখার প্রবৃত্তি এনে দিয়েছে।

এখানে এসে সব ভুলে গেছি, এটা কোন মাস,—ইংরাজী সেপ্টেম্বরের শেষ, বাংলা আশ্বিনের প্রথম নিশ্চয়ই।

বাংলায় এতদিন পূজার উৎসব পড়ে গেছে।

প্রবাসীর দল বাড়ী ফিরছে, তাদের বুকে আনন্দ, মুখ উজ্জ্বল—কতকাল পরে তারা বাড়ী ফিরছে, তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের দেখতে পাবে।

একদিন আমিও বাড়ী ফিরতুম অমনি আশা আনন্দ নিয়ে। আমার দেশ আমায় ডেকে কোলে নিত, তার আহার্য্যে পানীয়ে আমায় পরিতৃপ্ত করত।

সাগরমাঝে এই দ্বীপে বসে আমি দেশের স্বপ্ন দেখছি। পূজো এসেছে।

আমাদের বাগানের একপাশে স্থলপদ্ম গাছটী ফুলে ভরে

উঠেছে, শিউলি ঝরে আজও তলা বিছায়। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেমেয়েরা প্রভাতের এক ঝলক আলোর মত ছুটে আসে হাসি ও আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়ে। কত ফুল তারা পাড়ে—কুড়ায়, কত ফুল তাদের পায়ের চাপে দলিত হয়।

বাজে ফুলগুলো আজও বাতাসে তেমনি দোলা খায়, বাঁশঝাড় নুইয়ে পড়ে, মাথা নুইয়ে মাকে যেন প্রণাম করে।

চলে যেতে শ্রান্ত পাখী সেই বাঁশের আগায় বসে দোলা খেয়ে যায়, তাদের কোলাহলে নীরব বনতল সরব হয়ে ওঠে। আর এখানে?

সবই একঘেয়ে। ভিখারী খঞ্জনী বাজিয়ে আগমনী গান গায় না।

গা তোল গা তোল রাণী
তোর হারা উমা এলো ওই।

একঘেয়ে জীবনযাত্রা চলেছে—এর আর শেষ নেই।

নীল আকাশে সাদা বকের মত টুকরো টুকরো যে সাদা মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে—ওগুলো নিশ্চয়ই বাঙ্গলায় চলেছে। নির্ব্বাসিত যক্ষের মত ওর পানে চেয়ে বসে থাকি, ওর বুকে যদি আমার সব কথা লিখে দিতে পারতুম।

ওরা স্বাধীন,—কত দেশের কত কথা নিয়ে আসছে, কত দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। আমি যদি ওদের মত স্বাধীনতা পেতুম।

জলে ঘেরা এই দেশটুকু, যে দিকেই যাই—যে দিকেই চাই, দেখতে পাই অগাধ জল, ওর মাঝে সুখের রাঙ্গা পদ্ম তো ফোটে না।

স্মৃতি মনে জাগে, কিন্তু তাতে শান্তি নেই, সুখ নেই, আরও ব্যথা জাগে মাত্র।

ছয়টা বছর আগে এমনি একটা দিনে আমি এখানে এসেছি, সেই কথাটাই আজ থেকে থেকে মনে পড়ছে।

আশ্চর্য্য জগতের লোক আমায় সন্দেহ করলে, তারা বললে আমি চুরি করি, ডাকাতি করি, নরহত্যাও করেছি, তুমিও কি করে সে কথা বিশ্বাস করলে বল দেখি?

একখানা পত্র তুমি আমায় দিয়েছিলে, সে পত্রের কথা আজও আমার মনে আছে।

তুমি স্পষ্টই লিখেছিলে—আমি যে এরকম তা তুমি জানতে না সেই জন্যই আমায় তখনও শ্রদ্ধাভক্তিটুকু দান করে দিয়েছিলে। যখন বুঝলে আমি এরকম প্রকৃতির লোক তখন আর আমার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, আমি যেন ভবিষ্যতে আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখি।

তথাস্তু—তোমার কথাই মেনে নিলুম।

অবশ্য দোষ আমার ছিল তার জন্যে যাবজ্জীবনের জন্যে দ্বীপান্তরে পাঠানো ঠিক উচিত বিচার হয়নি। স্বদেশ-সেবাব্রত নিয়েছিলুম, তার জন্যে দলে পড়ে অনেক কাজই করেছি, কিন্তু নরহত্যা করিনি।

বিচার অবশ্য হল—সে বিচারের ফল এখানে আসা।

(৪)

হ্যাঁ, আজ আমার সে জন্য দুঃখ নেই।

একদিন আমায় ভালবাসতে—বলেছিলে আমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। সেদিন তুমি জানতে পার নি আমি কি?

ভালোবাসা—বিশেষ যে ধরণের ভালোবাসার কথা তুমি বলেছিলে, এতটুকু একটু খুঁত পেয়েই তা মন হতে মুছে যায়, একেই তোমরা বল ভালোবাসা?

আমি জানতুম সেই ভালোবাসা—যার জন্যে পুরাণে সীতা কষ্ট জেনেও রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, বিপদসঙ্কুল জেনেও পদ্মিনী আলাউদ্দীনের শিবিরে গিয়েছিলেন, যে ভালোবাসার জন্যে একদিন মেয়েরা জহরব্রত করতেন, কিন্তু এর সঙ্গে সে সবের তুলনা হয় কি?

আজ কোথায় তুমি আর কোথায় আমি; সেই যে একদিন প্রাণপূর্ণ ভালোবাসার কথা বলেছিলে তারই বা কি শোচনীয় পরিণাম।

আজ তুমি অন্যের পরিণীতা স্ত্রী, সংসারে প্রবেশ করেছ, সুখী হয়েছ—

আর আমি হত্যা না করেও হত্যাকারীর শাস্তি বহন

রছি—দেশ ও আত্মীয় স্বজন হতে বহু দূরে—নীচদের মাঝে ঘৃণিত নীচজীবন যাপন করছি।

তোমার ঘৃণা উপেক্ষা পেয়েছি, তবু ভগবানের কাছে র মনে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও, তিনি তোমার মঙ্গল করুন।

বহু দূরে পড়ে আছি।

খেয়ালের বসে লিখছি অথচ জানি এ পত্র তোমার কাছে পৌঁছাবে না।

যদি এর মধ্যে—এই দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে আমার কিছু হয়,—আমি মরে যাই, বলে যাব ঠিকানা লেখা এই পত্র তোমায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেদিন তুমি পড়বে—একবার একটা নিঃশ্বাসও পড়বে নাকি?

আর যদি না মরি—আমার এ পত্র যাওয়ার সময় টুকরো করো করে সমুদ্রের নীলজলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব, এর কথা কেউই জানতে পারবে না।

যদি এ পত্র পাও, যদি আমি চলে যাই—একবার মনে করো—শরতের একটি দিনে আমি এ পত্র লিখেছিলুম। সে দিন তোমরা পূজার আনন্দে মত্ত হয়েছিলে, দূরে যে কত হতভাগা নির্ব্বাসিত জীবন ভোগ করছে তাদের কথা একবারও ভাব নি।

আকাশের মেঘকে আজ ডেকে বলছি—ওগো মেঘ আমায় আজ বয়ে নিয়ে চল আমার দেশে, আমি একটিবার বাংলার আনন্দ দেখে আসি, সেখানকার হাসিমুখ দেখে আসি।

কিন্তু না, এ সব স্বপ্ন—

আমি জেগে বসে স্বপ্ন দেখছি।

এই পর্য্যন্ত থাক—

বিদায়—

হতভাগা
পশুপতি
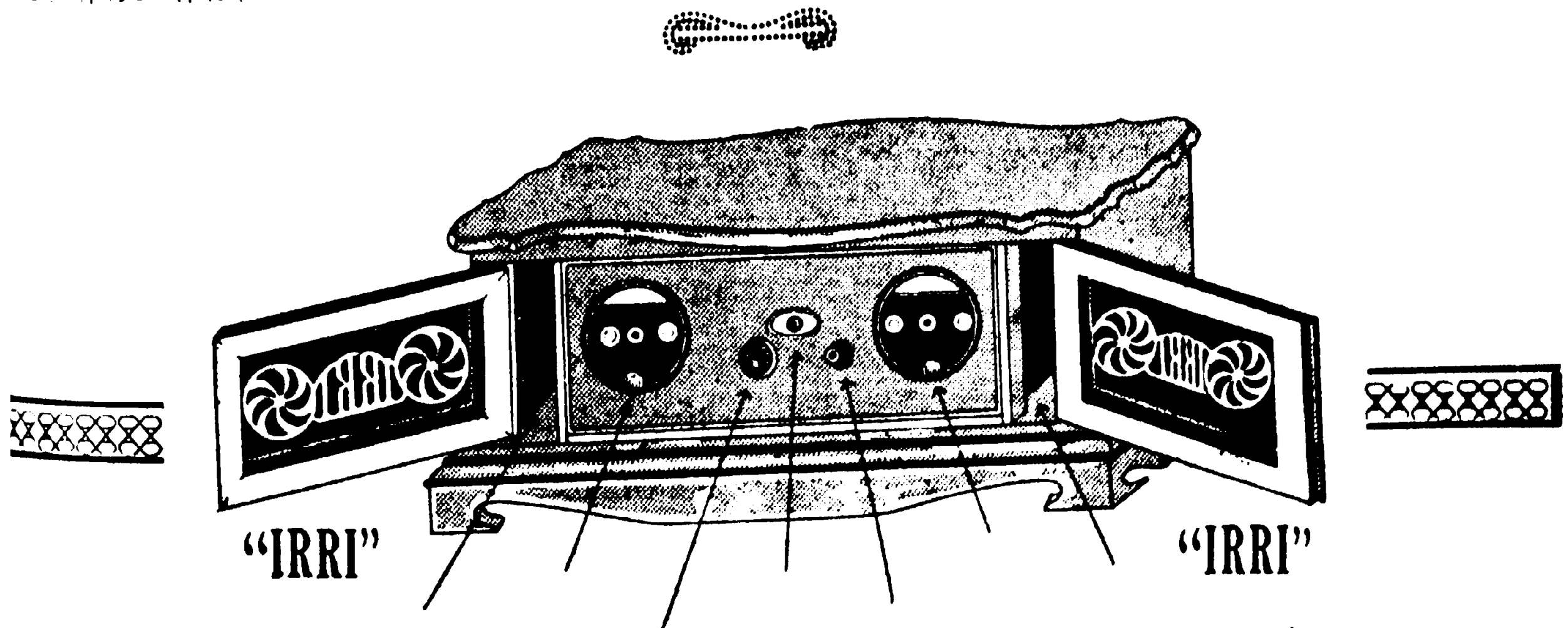
বাঁশি
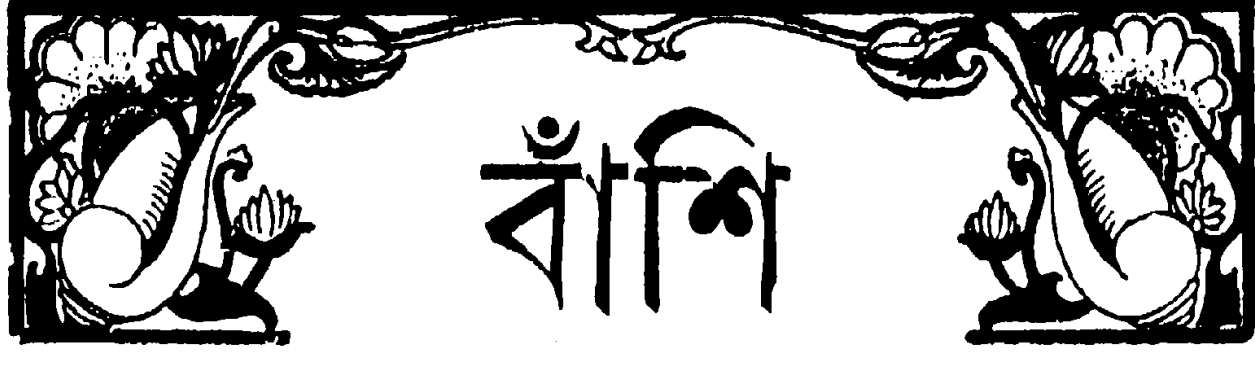
=শ্রীমণীন্দ্রকুমার সিংহ=

বাঁশি কি বলে জানো? মুখের কাছে মুখ রেখে বলে ওগো কে কোথায় অচেনা পথিক আছো, ছুটে এসো, আমি তা'দের ভালবাস্‌বো।

সে দূরের প্রাণীকে আপন কোরে নেয়, তার নিঃস্বার্থ অসীম ভালোবাসা দিয়ে। তাদের ভালবাসা পাবার অপেক্ষায় থাকে না, কারণ সে জানে ভালবাসা পাবার জন্য যে ভালবাসা, তা' পাপ, তা' নিস্ফল।

কিন্তু তার বুকের যে ব্যথা, যে বেদনায় তার বুক ঝাঁঝ্‌রা হোয়ে গেছে তার খোঁজ রাখ কি? খুব সম্ভব রাখো না, তার কারণ তার হৃদয়ের ব্যথা তার কথার সুরেই চাপা প'ড়ে যায়—তোমাদের ভাববার সময় দেয় না। সত্যি কথা, যেমন সুন্দরী রমণীর নিটোল মুখের ওপর ভাসা বড় বড় দুটো কালো চোখের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে-আসা অকপট হাসি। নয় কি? তার হৃদয়ের ব্যথা যতটুকুই বা যে কারণেই হোক্ না কেন, সে কথা ভাব্‌বার আগেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার অশ্রুসিক্ত মুখের অপূর্ব্ব রূপ।

শ্যামের মুখের ওপরই সে কত মিনতি ক'রে ব'লেছিল, ওগো, আর আমায় ব্যথা দিও না। সারা জীবন দিয়ে দিয়েই নিঃস্ব হ'য়েছি, পা'বার দাবী কি আমার কিছুই নেই? সারা জীবন এম্‌নি কোরেই কাঁদবে? ঠিক সেই সুরেই আকাশ-বাতাসের ভেতর দিয়ে আর একজনের গভীর মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস সংসারের কাজের গণ্ডী থেকেও বেরিয়ে এসে শ্যামের কাণে রণিত হ'ত।

তবু শ্যাম তাকে কি ব'লে বোঝায় জানো? বলে, জীবনে পাওয়াটাই কি সব? দেয়ার চেয়ে পাওয়া জিনিষ-টাই কি বড়, বাঁশি।

বাঁশি বলে, না—না, আমি বলিনে। বল্‌চি দিতেই কি চিরকাল হবে, পেতে হবে না একটুও?

শ্যাম বলে, দিতে যে এসেচে তাকে দিতেই হবে, পাওয়ার দিকে চাইলে তার চ'ল্‌বে না। দিয়ে-দিয়েই একদিন দেখ্‌বে যে অসীম পাওয়া পেয়ে গেছো তার ইয়ত্তা নেই, তখন সে পাওয়ার দিকে চেয়ে নিজেই বল্‌বে যে এতো দরকার তোমার মোটেই ছিল না, তখন কিন্তু সে পাওনা জিনিষ নিয়ে কোথাও যাবার এতটুকু পথ খুঁজে পাবে না।

রাধা-নামে-সাধা-বাঁশি তারপরে আর বল্‌বার কিছু খুঁজে পায়নি। আজীবন তেমনি কেঁদে কেঁদেই গান গেয়ে বিশ্বের রাজপথ দিয়ে চ'লেচে। যমুনার সর্ব্বাঙ্গে যে সুর একদিন কাজের ভেতর দিয়ে মিশে গিয়েছিল সে সুর আজো অনুক্ষণ অস্পষ্ট কানের কাছে ধ্বনিত হচ্চে।

তার সর্ব্বাঙ্গ মধুরতায় ভরা। তার জন্যেই আলোর সঙ্গে ছায়ার মিলন হোয়েছিল, কিন্তু তার মাধুর্য্যের স্বাদ এখনো পায়নি একজন, সে-আঁধার। আলোর সঙ্গে আঁধারের মিলন তার সুরে এখনো হ'য়ে ওঠেনি,—আঁধার পালিয়ে বেড়ায়, আলো তার পিছনে ছোটে, কোন দিন আঁধারের নাগাল সে পেলে না। প্রকৃতি হেসে বলে, বাঁশি এইখানেই কেবল তোমার পরাজয়!

বাঁশি বলে, কি ক'র্‌ব ভাই। যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েচি, নিঃশেষিত ক'রে দেয়ার ভেতর দিয়েই যে বিদ্যেটা কখন হারিয়ে ফেলেচি। তাকে কত বলি আমার সে বিদ্যাটুকু ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু সে কি বলে জানো ভাই! বলে, ছিঃ, দিয়ে কি আর ফিরিয়ে নিতে আছে? আমি লজ্জায় মরে যাই, আর চাওয়া হয় না, সেই জন্যেই এইখানে আমার পরাজয়।

জীবের হৃদয়ের ভেতরে সুর-দেওয়া ক'টা তার বাঁধা আছে, তা'তেই যখন বাঁশির সুরের পরশ লেগে অপূর্ব্ব গুঞ্জন ভেসে ওঠে তখন মনের বাঁধনটি ছাড়া সবই আল্‌গা হ'য়ে যায়। মন হয় তখন সবার আপন, তাকেই তখন নিঃসঙ্গ

...রতার ভেতর দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ব'ল্‌তে শোনা যায় ...—কী করুণ !

- বাঁশি, বাঁশি ! তোমার এ চলা-পথের শেষ কোথায় ?

—শেষ ? সে এক দেশে যেখানে মানুষের সর্ব্বাঙ্গ ...রতায় ভরা। এদেশে তো কেবল মুখের মধুরতাই বজায় ...খতে চায়। মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয় যে এই নিয়েই ...রা বড় বলে পরিচয় দেয় কি করে। কিন্তু ঘৃণা এদের ...রি না, অথচ তাদের মানতেও মনে বাধা পাই ?

- তোমার এ চলা-পথ কি দিয়ে তৈরি বাঁশি ?

- এপথ ছন্দ, সুর, আর মধুরতায় ভরা। এই পথেতেই ...কদিন প্রকৃতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সম্বন্ধ তার সঙ্গে ...দিন থেকেই বোঝাপড়া.হয়ে গেছে। আচ্ছা, মন তুমি ...ক আমায় ভালবাসো ?

—বাসিনা ! তোমার ছন্দের তালে তালেই আমার ...া নামা, তোমার পরশই আমার জীবন, তোমায় আমি ...লবাসি না ?

-- আমার আঁচলে ঢাকা আছো বলেই কি আমায় তুমি ...লবাসো, এর বেশী আর কিছু নয় ?

—এর চেয়ে বড় আর কি জীবনে আশা ক'রব ! আঁধার পথে আলো দিয়ে আমার হাত ধরে যখন চল তখন যে জিনিষ আমি পাই তা' ক'জনে আজ পর্য্যন্ত পেয়েচে, বাঁশি ?

নিশান্তে যখন উদীয়মান সূর্য্যের আভায় পূর্ব্বদিক রাঙা হোয়ে ওঠে, গাছে গাছে যখন প্রকৃতির বীণা বেজে ওঠে বাতাস যখন গায়ে গন্ধ মেখে ঘুরে বেড়ায় তখন বাঁশি বিছানার পাশে এসে ধীরে ধীরে ডেকে বলে, ওঠো, ওঠো—বেলা হয়ে গেল যে। আজকে যে তোমার অনেক কাজ রয়েচে।

এক ঝলক ফুলের হাওয়া নাকের উপর দিয়ে ব'য়ে যায়। বাঁশি আবার বলে কইগো উঠলে না যে !

মনের ঘুম ভাঙে। উঠে দেখে বাঁশি চলে গেছে, চীৎকার ক'রে ডাকে, বাঁশি—বাঁশি—

দূর মাঠে রাখাল বাঁশি বাজিয়ে গরু চরাতে যায়, সেখানে থেকে সুর ভেসে আসে, এখন আর না, রাত্রিতে ঘুম পাড়ানোর সময় আসবো।

ক্রমশঃ কোলাহলে বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। কাজের গাঁথা মালা আজো কেউ শেষ করতে পারেনি, কবে পারবে তাও জানিনে, কিন্তু প্রত্যেকটি কাজ সেই মালায় এক এক কোরে নিঃশব্দে গোপনে গাঁথা হয়ে যায়।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

—রাঁচিতে অন্তিম শয্যায়—

জন্ম···১৮৮৫ ইং

মৃত্যু···১৯৩৩ ইং

বোধনে বিজয়া

(গল্প)

শ্রীনীহার দেবী

সুতারার পিত্রালয়ে প্রতি বৎসর আনন্দময়ীর আগমনের ...ধন বসে, সুতারাকে লইবার জন্য প্রথম প্রথম পিতা ...সিতেন; ইদানীং ভ্রাতারা আইসে, অনেক সাধ্য সাধনা ...রিয়া শৈলেন্দ্রের মত টলাইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান ...র। সুতারা আশাভঙ্গের মনস্তাপে অন্তরালে অশ্রু ...সর্জ্জন করিত ক্ষণেক; কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর স্নেহাদরে ... অশ্রু শুকাইয়া যাইত। আজ এক বৎসর শৈলেন্দ্র ...জ্বরে ভুগিতেছে, প্রাণপণ যত্নেও সুতারা তাহার দ্রুত ...র গতি রোধ করিতে পারে নাই, তাই সে দিন জ্যেষ্ঠ ...তার মুখের উপরই শৈলেন্দ্রের অনুমতি সত্ত্বেও বলিয়া ...য়াছে যাইবে না। কথাটা শৈলেন্দ্রের কানে কদিন ...ছায় নাই, তাই চতুর্থীর দিন প্রভাতে যখন মাতা, পুত্রের ...থ্য লইয়া আসিলেন, শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "মা ওরা ...বপুরে চলে গেছে;"

মাতা উত্তর দিলেন "না।"

সবিস্ময়ে শৈলেন্দ্র কহিল "সেকি আমি বড়দাকে মত ...য়েছি, কেন যাবে না?"

জননী সস্নেহে বলিলেন "তুই মত দিলেই কি হয় বাবা, ...নবার বৌমাকে পাঠাস্‌না এবার তুই বিছানায় পড়ে— কি কখন আমোদ করতে যেতে পারে শৈল?"

বিরক্ত উত্তেজিত স্বরে শৈলেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, আমার ...সুখ করেছে বলেই তো সে যাবে, আমি ভাল থাকলে ...র আনন্দের অভাব হোত না কিন্তু এ অবস্থার আমি তাকে ... আনন্দ দেবো; এবার তাই পাঠাতে রাজী হয়েছি। ...তামার মৃত্যুপথ-যাত্রী ছেলের সঙ্গে তাকে নিরানন্দের মধ্যে পিষে মারবার অধিকার তোমাদের কারুর নেই, আমি তাকে পাঠাবোই।"

পুত্রের বাক্যে আহতা জননী আপন মনে বলিলেন "জানিনা বাছা, এখনকার ছেলেদের মন মেজাজই আলাদা। আমাদের কালে সোয়ামীর এমন ব্যামোর দিনে বউকে কোথাও—" বাকিটা আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে ডুবাইয়া শৈলেন্দ্র কহিল "তোমাদের কালের ব্যাখ্যা নীচে গিয়ে বামুনদির কাছে কর গে মা; আমার ভাল লাগে না শুনতে, তাকে পাঠিয়ে দাওগে, আমি তাকে পাঠাবোই।"

দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের জন্য শৈলেন্দ্রের স্বভাবটা বড় খিটখিটে হইয়াছিল; একটুতেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, ডাক্তার বলিয়াছেন রোগীকে আদৌ উত্তেজিত করিবে না, তাই জননী দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ......

কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রভাতের স্নিগ্ধ হাসিটুকু আপন অধরে ভরিয়া সদ্যস্নাতা সুতারা মূর্ত্তিমতী উষার মত আসিয়া শৈলেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, পত্নীর সুন্দর লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের পানে চাহিয়া পরিতৃপ্তিভরা হাস্যে শৈলেন্দ্র বলিল "সু আজ তোমায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, বাপের বাড়ী যাবে বলে খুব আনন্দ হচ্ছে নয়?" সহাস্যে সুতারা বলিল "আমি বাপের বাড়ী যাব না; শিব ছাড়া কি শিবানী কখন পিত্রালয়ে আসেন? পত্নীর স্নিগ্ধ উত্তরে অকারণে উত্তেজিত হইয়া শৈলেন্দ্র কহিল "কি যাবে না; মা বুঝি তোমায় যেতে বারণ করেছে? না ওসব হবে না, আলবৎ যেতে হবে, কেন মরা আগ্‌লাবার কেউ কি আর নেই যে—!"

স্বামীর বাক্যে বাধা দিয়া ধীরস্বরে সুতারা বলিল, "তুমি তো মরা নও"।

বিরক্তিতে বদন বিকৃত করিয়া শৈলেন্দ্র কহিল "দেখ তোমাদের এই মিথ্যে কথার মুন্সীয়ানা একবারে সহ্য করতে পারি না, খবরদার বলছি ওরকম মিথ্যে বলোনা, জীবন্তের কি আছে শুনি এক গলাবাজী ছাড়া ?

সুতারা হাসিয়া ফেলিল, "তোমার গলাবাজীই তো প্রমাণ করছে তুমি মরে যাওনি বেঁচে আছ, শুধু বেঁচে থাকা নয়, আমাদের চেয়ে সজীবতা তোমার মধ্যে আছে।"

হঠাৎ শিশুর মত আগ্রহ ব্যাকুলকণ্ঠে শৈলেন্দ্র কহিল, "বলছে সত্যি ? আচ্ছা সু, তোমার কি বিশ্বাস আমি আবার ভাল হয়ে যাবো ?" গাঢ় স্বরে সুতারা জবাব দিল "না ভাল হবেনা তো কি এমনি শুয়ে থাকবে নাকি ?"

অন্যমনস্কভাবে শৈলেন্দ্র ক্ষণেক নীরব রহিল, সুতারা বিছানায় বসিয়া স্বামীর শীর্ণ ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল, সহসা মুখ ফিরাইয়া পত্নীর পানে চাহিয়া শৈলেন্দ্র কহিল, "দেখ সু, আমার মনে হয় আমি বাঁচবো কিন্তু তোমাকে মরবে।"

ম্লান হাস্যে সুতারা কহিল, "নাগো তাও কি হয়, তোমায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারি না।"

শৈলেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা তুমি অমন কষ্টে হাঁসলে কেন ? তোমার কি মনে হয়।"

সুতারা বুঝিল সুচতুর স্বামীর নিকট তাহার দুর্ব্বলতার কিঞ্চিৎ ধরা পড়িয়াছে—কিন্তু না, কিছুতেই তাঁহার নিকট দুর্বলতা প্রকাশ করিবে না সে। আপনার চিত্তবল দিয়া স্বামীকে সঞ্জীবিত করিবে, ভরসা দিবে। ম্লান আননে মাধ্য হাস্যের বিদ্যুৎদীপ্তি ফুটাইয়া বলিল "তোমার মনে কি গো ?"

বিষণ্ণস্বরে শৈলেন্দ্র কহিল "আমি মরে যাবো।" পরিহাস-তরলকণ্ঠে সুতারা বলিল, "ওমা এত ভীতু তুমি, মরণকে আবার মানুষে ভয় করে নাকি ? আমি কিন্তু একটুও করি না।"

"কেন করনা সু ?"

সুতারা কহিল, "সে ভারী মজার কথা, আমার বড় মরণে ভয় ছিল, একবার আমাদের স্কুলে সাবিত্রী "প্লে" হয়, আমি তাতে যমের পার্ট নিয়েছিলুম"—মধ্যপথে বাধা দিয়া শৈলেন কহিল, "তোমার কিন্তু মোটেই যমের মত চেহারা নয়।" হাসিয়া সুতারা বলিল, "তা জানি, এখন শোন না মজার কথা, যমের ভূমিকায় নেমে অবাধ অধিকার পেয়ে মৃত্যু ভয় আমার সেই যে কেটে গেছে—এ-পর্য্যন্ত আর একটুও ভয় হয় না।"

একটা গভীর নির্ভরতার শ্বাস গ্রহণান্তর শৈলেন্দ্র বলিল, "তুমি যখন স্বয়ং যমরাজ তা'হলে তোমারই হৃদয়-কারাগারে আমায় বন্দী করে রাখবে নাকি ?"

হাসিয়া সুতারা বলিল, "যদি তাই করি ?" গভীরতর তৃপ্তির অবসাদে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শৈলেন্দ্র বলিল, "তা যদি করো আমি তোমায় কি দেবো সু ?"

সুতারা মনে মনে বলিল, "ওগো তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন সত্যি হয়, আমি যেন তা করতে সক্ষম হই।"......

(২)

পরদিন শারদ পঞ্চমী, নিদ্রাভঙ্গে সুতারা দেখিল স্বামী উঠিয়া বসিয়াছেন, আনন্দে তাহার বাক্য সরিল না। সারা দিন রাত্রি সে তাহার সজাগ আঁখির দৃষ্টিতে স্বামীর জীবন স্পন্দনটুকু কালের কঠিন কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে, দুনিয়াকে সে ভুলিয়াছে—বিশ্ব সংসারের সকল সচলতাকে ডুবাইয়া অহোরাত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া থাকিত শৈলেন্দ্রের রোগপাণ্ডুর বিবর্ণ মূর্ত্তি-খানি, সেই স্বামী আজ উঠিয়া বসিয়াছেন, এ যে কি অপরিসীম অব্যক্ত আনন্দ তাহা প্রকাশের ভাষা নাই··· ছুটিয়া শ্বশ্রুর গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে সুতারা ডাকিল, "মা"—গৃহমধ্য হইতে শঙ্কাকুল প্রত্যুত্তর আসিল, "কি হয়েছে বৌমা।"

"মা আজ উঠে বসেছেন তিনি"—দড়াম করিয়া খিল্ খুলিয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "চল মা বাছাকে একবার দেখে আসি"। উভয়ে শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল পালঙ্কে বসিয়া শৈলেন্দ্র খোলা জানালার পানে

চাহিয়া আছে। নিকটে আসিয়া মাতা ডাকিলেন "শৈল!" প্রসন্ন হাস্যে ফিরিয়া শৈলেন বলিল "মা।" যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া জননী বলিলেন "মাগো আমার মুখ রেখেছ মা!" বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন, "৫টা টাকা শৈলর কপালে ছুঁইয়ে রাখো তো মা, জগজ্জননী মুখ তুলে চেয়েছেন সপ্তমীর দিন মার ষোড়শোপচারে পূজো দেবো।"

শৈলেন ব্যঙ্গ ভরে বলিল "তোমার ঐ মাটীর খড়ের প্রতিমার মধ্যে মা আছে না হাতী, তোমার বউ যদি না থাকতো কেমন উঠে বসতুম দেখা যেত, সবার পূজোর আগে ওর পূজো করা উচিত, বুঝলে।"

আনন্দে গর্ব্বে সুতারার দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। মাতা জীব কাটিয়া বলিলেন "দূর তাও কি হয়, মা যে সাক্ষাৎ দয়াময়ী, তিনিই দয়া করে তোকে ফিরিয়ে দিলেন, সোয়ামীর সেবা তো সকলেই করে।"

বিরক্তস্বরে শৈলেন কহিল—"সকলে করে কিন্তু ওর মত পারে না, মিথ্যে তুমি তিনি তিনি করো না মা; তা'তে তোমার সামনের ঐ জাগ্রত প্রতিমার অপমান করা হয়।"

মাতা পুত্রের এই অসম্ভব প্রলাপোক্তিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিলেন। সুতারা বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া শ্বশ্রূর হাতে দিল। পুত্রের ললাটে ভক্তিভরে স্পর্শ করাইয়া সে টাকা তিনি বধূর হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "প্রাতঃ বাক্যি কর মা, যে মার পা বুকের রক্তে ধুয়ে দিবি।" সক্রোধে চীৎকার করিয়া শৈলেন কহিল "কেন? কিসের জন্যে ও বুকের রক্ত দেবে, এমনি প্রাণপাত করে আমায় বাঁচিয়েছে তোমরা সেই মহত্ত্বের পুরস্কার দেবে ওর বুকের রক্ত নিয়ে তা কখন হবে না।"

মাতা বিপন্নভাবে বধূর প্রতি চাহিলেন সুতারা ইঙ্গিতে জানাইল সে শপথ গ্রহণ করিয়াছে, শ্বশ্রূ প্রস্থান করিলে সে বুঝাইয়া শৈলেন্দ্রকে শান্ত করিবে। সস্নেহে পুত্রের প্রতি চাহিয়া জননী বলিলেন "মেলিনস্ ফুড্‌টা কি আনবো রে?" শৈলেন কহিল "যাও।" মাতা উঠিয়া গেলেন, সুতারা আসিয়া শৈলেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিল, সস্নেহে তাহার রোগশীর্ণ হাত দুটা মুঠার মধ্যে ভরিয়া বলিল, "আচ্ছা একটুতে অত উত্তেজিত হও কেন বলতো?" শৈলেন্দ্র কহিল "উত্তেজিত হবো না, এ যে অন্যায় আবদার! আমাকে সারালে তুমি, আর তোমার বুকের রক্ত খাবে মাটীর পুতুল!"

তিরস্কারপূর্ণ স্বরে সুতারা কহিল "ছিঃ ও কথা বলতে নেই, দেবী কখন কি দেহী হন? তিনি যে দেহাতীত। ঐ যে মাটীর কাঠামোর মধ্যে তাঁর অর্চ্চনা করে মানুষ ঐ বিধান তো মানুষেরই দেওয়া, নচেৎ দেবী সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান জাননা কি?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে শৈলেন কহিল "তা হোনগে দেবী খুসী, তুমি কেন বুক চিরে রক্ত দেবে?" স্বামী উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে দেখিয়া সুতারা তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশে বলিল, "আচ্ছা বেশ আমি রক্ত দেবো না।"

শৈলেন বলিল, "না আমি তোমার ঐ মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলছি না, সত্যি বলো দেবে না?"

হাসিয়া সুতারা কহিল, "এই দেখ ছেলেমানুষের মত আবদার, বলেছি তো দেবো না।" তথাপি আপন জে[illegible] বজায় রাখিয়া শৈলেন বলিল "না সত্যি করে বলো দেবে কি না?"

"না দেবো না"—বলিয়াই সুতারা সন্ত্রস্তা হইয়া জি[ভ] কাটিল। দেবীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া শেষে স্বামী[র] কাছে সত্য করিল, মনে মনে শিহরিয়া বলিল, "অপরাধ লই[ও] না মা, আমি তোমায় বক্ষ-রক্ত দিব, আমার অবুঝ স্বামী[কে] সান্ত্বনার মিথ্যা বাক্যদানের ত্রুটী আমার ক্ষমা কর মা!"

(৩)

……গভীর রাত্রে—হঠাৎ শৈলেনের ঘুম ভাঙ্গি[য়া] গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল অফুরন্ত জ্যোৎস্নাধারায় ক[ক্ষ] ভরিয়া গিয়াছে, তাহার শিয়রে বিনিদ্র চক্ষে বসিয়া সুতা[রা] পাখা করিতেছে। দূরের একটা ঘড়িতে টং টং করি[য়া] তিনটা বাজিল। টেবিলের উপর "এলার্ম" ঘড়িটা দ্রুততা[লে] টিক্ টিক্ করিতেছে, সুতারার পানে চাহিয়া বলিল, "এ[ম]ন করে নিত্য জাগলে যে অসুখে পড়বে সু।" সুতারা ত্র[স্তে] প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল, "এই মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গে[ল] উঠে দেখি তুমি বড্ড ঘেমেছ, তাই একটু হাওয়া দিচ্ছি

সারারাত জাগিনি তো !”—জ্যোৎস্নালোকে শৈলেন্দ্র তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিল—নিদ্রাহীন ক্লান্তিবিহীন আয়ত-নেত্রে তার কোথাও সন্ত সুপ্তিভঙ্গের ম্লানিমা নাই, জ্যোৎস্নার মতই শান্ত-ঔজ্জ্বল্যে কমনীয় স্নিগ্ধতায় আঁখি তারকা প্রশান্ত স্থির। শৈলেন্দ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, “কিসের বাজনা বাজ্‌ছে এত রাত্রে সু ?”

সুতারা কান পাতিয়া শুনিল শারদ সপ্তমীর বোধনধ্বনি। কহিল, “মায়ের বোধনের বাজ্‌না।”

“আচ্ছা সু পরশু বলেছিলে বাপের বাড়ী যাবে না, আজ বিকেলে মা বললে যাবে। কেন বলতো ?”

“মার পূজো দিতে।”

অসহায়কণ্ঠে শৈলেন কহিল “কিন্তু তুমি গেলে আমি এক মুহূর্ত্ত বাঁচবো না।”

হাসিয়া সুতারা কহিল, “তবে যে বল্‌ছিলে আমায় সেদিন জোর করে পাঠাবে ? তাই আমি ঠিক করেছি এখন আসবো না।”

সন্ত্রস্ত অনুনয়পূর্ণস্বরে শৈলেন কহিল, “না সু তুমি এসো, আমার শরীর তো এখনও ভাল সারেনি, মোটে দু’দিন একটু ভাল আছি, তুমি পূজো দিয়েই চলে এসো।”

সম্মতিসূচক শির সঞ্চালন করিয়া স্বামীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিল সুতারা, “আচ্ছা। বেশ পূজো দিয়েই চলে আসবো।”

“বা’রে কাল যে বলেছ পূজো দেবে না।”

অন্যমনস্কা সুতারা কহিল, “কই তাতো বলিনি, বলেছি বুকের রক্ত দেবো না।”

হঠাৎ শৈলেন্দ্র প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা সু যদি রক্ত তুমি না দাও দেবী তোমার উপর রুষ্টা হবেন না ?”

অন্যমনা সুতারা জবাব দিল—“না !”

চিন্তিতস্বরে শৈলেন কহিল, “আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি রুষ্টা হবেন। কেন এমন মনে হচ্ছে সু ?” স্বামীর শেষের ব্যগ্র ব্যাকুল কথাটায় সুতারার চমক ভাঙিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, “কি বলছো ?”

একবার সভয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শৈলেন বলিল, “তোমার বুকের রক্ত না দিলে দেবী তোমার ক্ষমা করবেন না সু। কেন এমন মনে হচ্ছে বলতো ?” সুতারার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, সভয়ে শৈলেন ডাকিল “সু !”—উদাস নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুতারা কহিল “কি ? তুমি অত গম্ভীর হয়েছ কেন ?”

সুতারা এবার হাসিয়া বলিল, “আমার গাম্ভীর্য্য তুমি দেখ্‌তে পার না কিন্তু তুমি কেন গম্ভীর হও বলতো ?”

ম্লানকণ্ঠে শৈলেন কহিল, “সু তুমি হাসচো না কাঁদছো ? আমার বড় ভয় করছে সু ? সুতারা !” চন্দ্রালোকে স্বামীর রক্তশূন্য পাংশু মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সুতারা সত্রাসে চমকিয়া তাহার মাথাটা আপন অঙ্কে তুলিয়া লইল। গভীর মমতা ভরে তাহার শীর্ণ গণ্ডে আপনার পুষ্ট কপোল স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, “ভয় কি, আমি তো তোমার কাছে আছি।”

শৈলেনের মনে হইল পত্নীর উষ্ণ নিঃশ্বাস পতনের শব্দে একটা ব্যবধানের বিরাট প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে, ভীত স্খলিতকণ্ঠে সে বলিল, “সু এ কি হচ্ছে, তুমি কই ?”

সুতারার বিশ্ব ভুবন আঁধারে ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি স্বামীর মনিবন্ধে হাত দিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল কই না ; কোথাও তো বিকৃতি ঘটে নাই, তবে ? বক্ষের উত্তাপ লইল দিব্য উষ্ণ, তবে কেন এমন হইয়া পড়িলেন, গভীর অনুরাগ সিঞ্চিত স্বরে সুতারা বলিল “তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?”

টানিয়া টানিয়া জড়িত স্বরে অবসাদ গ্রস্তের মত শৈলেন উত্তর দিল “কষ্ট কিছুই নয় আমার মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে আমায় কে ছিনিয়ে নিচ্ছে তুমি আমাকে যেতে দিও না সু, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে চাই না।” স্বামীর কাতরোক্তিতে ভীত হইয়া সুতারা অধিকতর আবেগে তাহার রোগক্ষীণ তনুখানি জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, “আমি তো তোমায় যেতে দিব না, কেন এত অধীর হচ্ছ ?” একটা গভীর আরামের শ্বাস লইয়া চক্ষু মেলিয়া শৈলেন বলিল, “দেখ সু, আমার কেবলি ভয় হয় যদি কেউ তোমার কাছ থেকে আমায় সরিয়ে নেয়। এই ছোট্ট বুকের অফুরন্ত

মমতার স্পর্শ থেকে যদি কেউ বঞ্চিত করে তাহ'লে আমি কি করে থাকবো ?"

(৪)

শান্ত উজ্জ্বল সপ্তমীর নবারুণাভা পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূজা বাড়ীর ঢাকের শব্দে বহু পূর্ব্বেই সুতারা জাগিয়াছিল। শৈলেন তখনও নিদ্রিত। অতৃপ্ত নেত্রে স্বামীর সুপ্তি-সমাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল সেই তরুণ সুকুমার কান্তি, রোগের অত্যাচারে কতখানি বিমলিন হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই শিশু সুলভ স্বভাবের আজিও বিন্দু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গত কল্যকার রাত্রির সভয় উক্তি এবং পরিতৃপ্তির বাণী মনে পড়িয়া গেল, দেবীর অনিষ্ট সাধনের কথাও মনে জাগিল, যুক্ত করে বলিল "মা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর মা" আকুতির ভাষা জানাইতে তাহার বাক্য সরিল না। পথে কে আনন্দ পরিপূর্ণ উচ্ছসিত কণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছে, "সোনার আলোয় ঝিকিমিকি মা আজি ঐ আসে।"

সুতারা বাহিরের পানে চাহিল। সত্যই শরতের সোনালী রৌদ্র ঘন গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে কিন্তু মায়ের নুপুর ধ্বনির শব্দ কই? আগমনীর সাড়াই বা কোনখানে? সুতারার মনে হইল সমস্ত প্রকৃতি যেন বেদনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, আজ সপ্তমী কিন্তু বোধনের গান বিসর্জ্জনের কারুণ্য লইয়া তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে কেন? সুতারা পথের পানে চাহিল, রাজপথে অবাধ জনস্রোত। দেবী দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলের মুখে একটা আগ্রহভরা আনন্দের চিহ্ন, পথের ধূলা উড়াইয়া একখানা মোটর দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গেল, উন্মত্ত যুবক-কণ্ঠের আনন্দোচ্ছ্বাস গভীর আর্ত্তনাদের মত আসিয়া সুতারার কর্ণে বাজিল, সভয়ে চমকিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া সুতারা দেখিল তাহার নিঃশ্বাস দ্রুততালে পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি নাড়া দিয়া ডাকিল, "ওগো"

শৈলেন চাহিল, দৃষ্টি ঘোলাটে বাকরুদ্ধ। আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "মা!"—বধূর আর্ত্তস্বরে শ্বশ্রূ ছুটিয়া আসিলেন, সুতারা স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া অশ্রুজড়িতস্বরে বলিল, "কি কষ্ট হচ্ছে গো বল?"

শৈলেনের দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর প্রশান্ত স্থির, বুকের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু থামিয়া গিয়াছে; জননী চীৎকার করিয়া উঠিলেন "শৈলরে!"—দূরে পূজা বাটীতে সপ্তমী পূজার প্রারম্ভে ঢাক বাজিয়া উঠিল এবং সেই ঢাকের শব্দে সুতারার আর্ত্তনাদ মিশিল, "এমনি করে আমার বোধনে—বিজয়া করলি মাগো!!!"

বন্দী-কায়া

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

আমি কি গো মুহূর্ত্তের ভোগের পূজারী ?
নিঃস্ব অশ্রুবারি
তাই বুঝি ধরাতটে ক্রন্দনের মত
বিষাইয়া চলে মোর পরাণের ক্ষত !
যত আশা বাঁধি
—লভিয়াছে তারা শুধু অনন্ত সমাধি !
বিরহ-বিহ্বলা-ম্লান আমার অন্তর
রহে নিরন্তর।
কল্পনারে ফেলে দূরে যে রিক্ত বাস্তব
তিলে তিলে জাগাইলো বীভৎস-উৎসব :
ছন্দোময় সকরুণ শোক
গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে খোঁজে পরলোক।

হাঃ হাঃ হাঃ হাসি পায় হে মোর ঈশ্বর
তুমি নিরন্তর,
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে বেদনার সুরে
দেহ অন্তঃপুরে।
শাপভ্রষ্ট দেব আমি, মুক্তি চাই। লাঞ্ছিত কমল
মেলি শতদল
হেসে কুটি কুটি শুধু কহে "মুক্তি চাও ?
বাণীহারা মঞ্জুস্বরে গুঞ্জরিয়া চুম দিয়া যাও।"
আয়ুর ভিখারী মোর মৃত্যুর নিঃশ্বাস
ঘনমান নীলিমার নিবিড় উচ্ছ্বাস
সদা উতরোল
মন-সাহারায় নাহি তরঙ্গ কল্লোল।

বেণু

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

বহুদিন হ'লো দ্বাপরে একদা বেজেছিলে তুমি মোহন বেণু !
মাতায়ে বিশ্ব, নিঃস্ব পরাণে ছড়ায়ে তোমার গন্ধ-রেণু।
এখনো সে সুর থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিছে ব্রজের বুকে
দিকে দিকে তব যশের বার্ত্তা ঘোষিছে বিরহী ধরার মুখে,
কুক্ষণে তোমা হারায়ে দুঃখে কেলিকদম্ব কাঁদিছে আজো
যমুনা বক্ষ ফাটিছে তৃষায়, —এসো আজি নব ছন্দে বাজো।
এসো এসো আজি সাথে লয়ে তব বদিকের সেই মিষ্ট বাণী
প্রলয়-গগনে কালো জলদের সিংহনাদের অস্ত্র জানি
মুছাও এ ঘোর কালিমা অমার, আঁধারের ঘন দীর্ঘকারা
ভেঙে দাও যত কঠোর বাঁধন নিঠুর পন্থা ডুবাও জলে
পদতলে দলি' সমাজ-শাস্ত্র, বেজে উঠো কোথা রাধিকা ব'লে
ধ্বনিয়া উঠুক সুর তব আজি সুদূরে নিকটে অগ্রে পাছে
চমকি উঠুক নিখিল বিশ্ব, জানুক এখনো কৃষ্ণ আছে।
স্বেচ্ছাচারীরা বুঝুক্ আজিকে সাঙ্গ তাদের রুদ্রলীলা,
দুদিন আজি আসুক্ ঘনায়ে হাসুক্ যাত্রী তীর্থশিলা
গোকুলে আজিকে নাচুক্ নন্দ যশোদার সাথে হৃষ্ট মনে
ছুটুক্ ধবলী শ্যামলী রাখাল বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে
নব বসন্তে আবার গোপিনী উঠুক শিহরি অন্তঃপুরে
জাগুক পুন সে বিমলাশান্তি হে বেণু তোমার নবীন সুরে।

নাট্য সাহিত্য

— শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ বি, এস সি —

উইলিয়ম আর্চার নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটী পুস্তকে লিখেছেন "যে কারণেই হোক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্য ছিল ধূসর মরুভূর মতো এবং গোল্ডস্মিথ ও শেরিডানের রঙ্গনাট্য ছিল সে যুগের মরুদ্বীপ।"

শেরিডানের ও গোল্ডস্মিথ দু'জনেই ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী কিন্তু দু'জনার জীবনের ধারা ছিল ভিন্নমুখী। গোল্ডস্মিথ পেয়েছিল প্রতিপদে বাধা ও দুঃখের প্রাচুর্য্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ

আর শেরিডান পেয়েছিল সুখ ও সফলতার প্রাচুর্য্য। শেরিডানের রচিত নাটকগুলি অল্প আয়াসেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়েছিল কিন্তু গোল্ডস্মিথের নাটকগুলির সে সৌভাগ্য ঘটে নি। শেরিডানের যশঃ-শিখা জ্বলে উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই গোল্ডস্মিথের যশঃ-দীপ নিভে গেলো। সে যাই হোক নাট্য-রচনার খ্যাতি দু'জনেই পেয়েছিল প্রচুর পরিমাণে।

গোল্ডস্মিথ ও শেরিডান যেন এসেছিল প্রদীপের নিভে' যাবার পূর্ব্বের উজ্জলতম দীপ্তি নিয়ে, কারণ তাঁদের মৃত্যুর পর যে অন্ধকার ছেয়েছিল পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যকে সে অন্ধকার বিদূরিত হয় নি এক শতাব্দী কাল।

মৃত নাট্য-সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের জন্মভূমি নরওয়ে; কিন্তু তাঁর কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বিদেশে।

জীবনের প্রারম্ভে প্রায় ছয় বৎসর কাল ইব্‌সেন স্বদেশে "ন্যাশনাল থিয়েটারের" পরিচালক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি অনেকগুলি নাটক ও তাঁর প্রথম সামাজিক ব্যঙ্গ-নাট্য "লাভস্‌ কমেডি" প্রকাশ করেন। শেষোক্ত নাটকটিতে তিনি জনসাধারণের নিন্দার পাত্র হ'ন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরেই "ন্যাশনাল থিয়েটার" দেউলিয়া হয়ে পড়ে; এই সব নানা কারণে ইব্‌সেন স্বদেশে জীবনযাপন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ভেবেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন ও প্রায় সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর প্রবাসে অতিবাহিত করেন। তাঁর কবি-প্রতিভা বিশেষভাবে সমাদৃত না হ'লেও ইব্‌সেনের কবিত্ব-শক্তি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। "ব্যাণ্ড" "পীয়ার জীণ্ট" এই দুই কবিতাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

ইব্‌সেন ছিলেন স্বাধীনতার সমর্থক। "ডলস্‌ হাউস" নাটকে পুরুষের অধীনতাপাশ হ'তে নারীর মুক্তির দাবী তিনি কোরেছেন। তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না, কারণ তাঁর মতে এ গুলি হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে বাধা। বিশিষ্ট মণীষি মতে, ইব্‌সেনের নাটকগুলি সম্পূর্ণ থিয়েটার-উপযোগী হ'লেও ফরাসী নাট্যকার স্ক্রাইব বা সারডুর নাটকের মতো কলাসম্মত নয়। ফরাসী নাট্যকাররা নাটকের থিওরির দিকে লক্ষ্য রাখতেন বেশী কিন্তু ইব্‌সেন "থিওরির" সাহায্য নিয়েছেন ততটুকু, যতটুকু নাটকটি গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ যাই হোক্‌ না কেন, ইব্‌সেন যে

ট্যসাহিত্যে নবধারার প্রবর্ত্তক এবং তাঁর নাটক রচনার প্রণালী যে সম্পূর্ণ অভিনব ও সুন্দর সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই।

ইবসেনের সমসাময়িক নাট্যকার সুইডেনবাসী ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাট্যরচনার খ্যাতিও খুব কম নয়। শিল্পী এবং ভাবুক হিসাবে ইবসেনের চেয়ে অনেক নীচে ষ্ট্রীণ্ডবার্গের আসন হ'লেও বিপরীত মতবাদী বোলেই সে যুগে তিনি ইবসেনের সমকক্ষ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ কোরেছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, ইবসেন যেমন ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ঠিক তেমনই ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষবাদী। স্রোতের প্রতিকূলে পাড়ি দিয়ে ইবসেন যে-খ্যাতি সে-যুগে অর্জ্জন কোরেছিলেন, স্রোতের অনুকূলে পাড়ি দিয়ে ষ্ট্রিণ্ডবার্গ সেই খ্যাতিই সে যুগে অর্জ্জন কোরেছিলেন। কালের কষ্টি-পাথরে তাই আজ নিরূপিত হ'য়ে গেছে কে ছিল উভয়ের মধ্যে শ্রেয়তর? ষ্ট্রিণ্ডবার্গ পেয়েছিলেন তখনকার অনঢ় সমাজের সহানুভূতি আর ইবসেন পেয়েছিলেন নিন্দা। সমাজ-প্রদত্ত এতখানি বৈষম্য দূর কোরে ইবসেন যে ষ্ট্রিণ্ডবার্গের সমকক্ষ নাট্যকার বোলেও পরিগণিত হ'য়েছিলেন, তা' শুধু তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বলে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ষ্ট্রিণ্ডবার্গের সামাজিক জীবন বড় সুখের ছিল না -তাঁ'র তিন স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। মনে হয়, এই কারণেই তিনি ঘোর নারী-বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। তিনি নারীকে মানুষের মধ্যেই গণ্য কোরতেন না, তাদের স্বাধীনতার দাবী তাই তিনি উপেক্ষাই কোরেছেন।

*   *   *   *

গোল্ডস্মিথ এবং শেরিডানের মৃত্যুর পর ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের দুর্দ্দশা হ'য়েছিল চরম। গোল্ডস্মিথ ও শেরিডানের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসর পরে স্যার আর্থার পিনারো নামক একজন নট কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। থিয়েটারের উপযোগী হিসাবে তাঁর নাটকের সমাদর আজো আছে এবং ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে তাঁর দান চিরদিনই স্বীকৃত হ'বে। সেই সময়ে সঙ্গীতবহুল নাটক রচনায় মিঃ জোন্স্ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর নাটকের সুখ্যাতি অনেকেই কোরেছেন এবং এমন কি মেথিউ আর্লণ্ডের মতো কূট সমালোচকও তাঁর নাটকের ভূয়সী প্রশংসা কোরেছেন। স্যার পিনারো ও মিঃ জোন্স্, এই দুই নাট্যকার, ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কোরে গেছেন তাঁদের রচনার প্রাচুর্য্যে এবং সুগম কোরে গেছেন পরবর্ত্তী নাট্যকারদের অন্যথা দুর্গম পথ।

*   *   *   *

তারপর ইংলণ্ডের নাট্যাকাশ দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে যার অপূর্ব্ব প্রতিভার উজ্জ্বলতম আলোয় তিনি হোচ্ছেন মিঃ বার্ণার্ড শ। শেরিডানের পর এতো বড় ইংরাজী নাট্যকার আর হয়নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, গোল্ডস্মিথ, শেরিডান এবং বার্ণার্ড শ, যাঁরা ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়েছেন, তাঁরা সকলেই জাতিতে আইরিশ। নাট্যকার হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ কোরতে মিঃ বার্ণার্ডশ'কে প্রচুর বাধাবিপত্তি অতিক্রম কোরতে হ'য়েছিল। তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক সাধারণের প্রশংসা লাভ কোরতে পারেনি। নাট্যকার-রূপে তিনি সমাদৃত হন যখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এর পূর্ব্বে অনেক নাটকই তিনি পুস্তাকাকারে প্রকাশিত কোরেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত মাত্র দু'এক-খানি ব্যতীত অধিকাংশ নাটকের রঙ্গমঞ্চের আলো দেখবার সৌভাগ্য ঘটেনি -এমন কি আজো তাঁর রচিত অনেক নাটক অনভিনীত অবস্থায় আছে।

মিঃ বার্ণার্ড শ'র সমসাময়িক যুগে অপর যে সব নাট্যকার প্রসিদ্ধি লাভ করে মিঃ গল্স্ওয়ার্দ্দি, মিঃ বার্কার, মসিয়ে ব্রায়াক্স, মিঃ শেকভ ও স্যার জেমস্ ব্যারি তাঁদের মধ্যে অন্যতম!

মসিয়ে ব্রায়াক্স সম্বন্ধে মিঃ বার্ণার্ড শ' বলেন যে ইবসেনের মৃত্যুর পর তাঁর শূন্য সিংহাসনের দাবী কোরতে পারে একমাত্র মসিয়ে ব্রায়াক্স। উপরি উক্ত অধিকাংশ নাট্যকারদের নাটকীভূত বিষয় হোচ্ছে সমাজ ও তার সংস্কার-মূলক সমস্যা। মিঃ গলস্ওয়ার্দ্দির নাম এ-দেশে অজানা নয়। এঁদের মধ্যে স্যার জেমস্ ব্যারির খ্যাতিই সর্ব্বাধিক এবং তাঁর মত :—

"জীবন সত্যই রহস্যপূর্ণ—কিন্তু জীবনকে যে বুঝ্‌তে শিখেছে মৃত্যু তার কাছে জীবনের মতোই রহস্যপূর্ণ।"

* * * *

পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্য ও তার ক্রমবিকাশ (বিশেষ কোরে ইংরাজী নাট্যসাহিত্য) সম্বন্ধে এতো কথা বোল্‌লাম কারণ, ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের যোগসূত্র আছে। বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছে হুবহু পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণে। আমার মনে হয়, সভ্যতার বিকাশ বা ক্রমোন্নতি দেশ, কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন না হোয়ে একটি রীতিই অনুসরণ করে। তাই ওদের উন্নতির পরিপন্থী যে সব বাধা দেখা দিয়েছিল এদেশেও পর্য্যায়ক্রমে সেই সব বাধা বিপত্তি আস্‌বে; আর তার সমাধান হ'বে ঐ একই উপায়ে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, যে আমাদের নাট্যসাহিত্য দুর্ব্বল ও দরিদ্র। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্র কাব্য বা উপন্যাস ততো দুর্ব্বল নয়। যদিও কাব্য ও উপন্যাস গড়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করে। তবে আমাদের নাট্যসাহিত্যের অবিকাশের প্রকৃত কারণ কি?

আমাদের অধুনিক নাট্যসাহিত্যের জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগ্রন্থ থেকে কোন আদর্শ সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য না হওয়ায়, তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যকে সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ কোরতে হোয়েছিল সমসাময়িক পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য হ'তে। দুরদৃষ্টক্রমে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য সে যুগে ছিল দুর্ব্বল এবং অসার। ফলে জন্মগত অধিকার রূপে যে দৌর্ব্বল্য আমাদের নাট্যসাহিত্য পেয়েছিল, সে দৌর্ব্বল্য হ'তে মুক্তি সে আজো পেলো না। যে-সময়ে উপন্যাসকে বা কাব্যকে এইরূপ আদর্শ সন্ধান কোরতে হ'য়েছে, সে-সময়ে পাশ্চাত্য উপন্যাস বা কাব্য প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কালক্রমে যখন পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর এলো, তখনো এ দেশের নাট্যসাহিত্য-সেবীরা প্রাণপণে আঁকড়ে রইলো সেই অচল যুগের রীতি পদ্ধতি। দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীতে নাট্যরচনা কোরতে গিয়েও গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সেক্ষপীরীয় নাট্যরীতি অনুসরণ কোরলেন। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ যদি সমসাময়িক যুগের নাট্যপদ্ধতি অনুসরণ কোরে নাটক রচনা কোরতেন তবে বোধ হয় আমাদের নাট্যসাহিত্য এরূপ লক্ষ্যহারা হোত না। গিরিশ বা ক্ষীরোদ-প্রতিভার পক্ষে যা' সম্ভব ছিলো, প্রতিভা-বর্জ্জিত নাট্যকারের প্রচেষ্টায় তা' সম্ভব নয়। ইদানীং কেউ কেউ ইব্‌সেনীয় নাট্যরীতি অনুসরণ কোরে নাট্যচরনা কোরেছেন বটে, কিন্তু সেই সব নাটকের ভাবধারাও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিদেশী। তাই সমাদর তারা পেলে না। অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসে কোন সুফল হ'বে না। পাশ্চাত্যের রীতি পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচ্যের ভাবধারার সুসামঞ্জস্য থাকা চাই। আধুনিক নাট্যকারের লক্ষ্য থাকা চাই আজকের বাঙ্‌লার প্রধান সমস্যা কি এবং তার সমাধান কি? নাটকের বিষয় হওয়া চাই সম্পূর্ণ আধুনিক আর তা'র সঙ্গে থাকা চাই নবতম রীতি পদ্ধতি।

রীতি পদ্ধতি নিয়ে কথা উঠ্‌তে পারে যে এ বিষয়েই বা অনুকরণ স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে কেন? আমাদের নাট্যসাহিত্যের রীতি পদ্ধতি কেনই বা হ'বে বৈদেশিক? এ সম্বন্ধে বোল্‌তে চাই যে আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিজস্ব কোন পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি। সম্পূর্ণ এদেশের উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি গড়ে তোল্‌বার মতো শক্তিমান নাট্যকার কোথায়? আর একটা কথা রীতি বা পদ্ধতিতে আদান প্রদানের প্রচলন চলে আসছে যুগ যুগ হ'তে। এবং সেই পদ্ধতি অবলম্বন কোরে যখন আমাদের অন্যান্য সাহিত্য এতো দ্রুত উন্নতি কোরতে পেরেছে তখন সেই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ কোরে আমাদের নাট্য-সাহিত্যই বা উন্নতি কোরতে পারবে না কেন? আসলে গলদ হোচ্ছে নাট্যকারদের সৃষ্টি-শক্তির অভাব।

* * * *

বাঙ্‌লার প্রথম মুদ্রিত ও অভিনীত নাটক হোচ্ছে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব"। সম্প্রতি

এর পূর্ব্বের রচিত এবং মুদ্রিত নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের অভিনয়ের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" প্রথম অভিনীত নাটক হিসাবে সৌভাগ্যের দাবী আজো করে। এর পর, বিষদ আলোচনা করে প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বাড়াতে চাই না। তবে, এর পর যাদের নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে গেছে, মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন কোরেছেন।

আমাদের নাট্য সাহিত্যের দুরবস্থার কথা স্মরণ করলেই মনে হয় যে শৈশবাবস্থা আজো সে অতিক্রম করে নি। আমাদের নাট্য-সাহিত্যে গৈরিশ যুগের সঙ্গে ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যে গোল্ডস্মিথ যুগের একটা সামঞ্জস্য আছে বলেই মনে হয়।

ইংলণ্ডের সে যুগের শেরিডান ও গোল্ডস্মিথের প্রতিভার আলোর মতোই বাঙলার অন্যথা অন্ধকারাচ্ছন্ন নাট্যসাহিত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার আলোয়। শেরিডান ও গোল্ডস্মিথের মৃত্যুর পর, পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যের যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের মৃত্যুর পর আমাদের নাট্য-সাহিত্যে সেই দুর্দ্দশারই সূচনা হোয়ে গেছে।

* * * *

বাঙলার এই মৃতপ্রায় নাট্য-সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত কোরতে পারে হয়তো ও-দেশীয় ইব্‌সেনের মতো প্রতিভা-সম্পন্ন কোনো নাট্যকার। জানি না, এই ধীসম্পন্ন বাঙলার নাট্যকারের আবির্ভাব হ'বে কবে?—শত বর্ষের অপেক্ষার পর কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে?

—*—

মমতাজ

শ্রীকনকলতা ঘোষ

কি প্রেমে সম্রাটে মুগ্ধ করেছিলে তুমি মমতাজ ?
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মোরা তাই ভাবি আজ।
রাজকীয় ভালবাসা কত নারী পায়
সহসা আসিয়া তাহা দুদিনে মিলায়,
সে শুধু রূপের মোহ সৌন্দর্য্য বিলাস
মুহূর্ত্তে আগত প্রেম অঙ্কুরে বিনাশ।

চিরদিন এই লোকে জানে
রাজা বাদ্‌শার প্রেমে মিথ্যা বলে মানে,
কিন্তু তুমি মহীয়সী তাজ
যে প্রেম লভিয়াছিলে সত্য তাহা অতি সত্য
কত প্রেম তার কাছে আজো পায় লাজ।

সম্রাটের প্রাণভরা উচ্ছসিত প্রেম
তোমারে আশ্রয় করি
পেয়েছিল সত্যের সন্ধান,
প্রেম যথা সত্য তথা প্রেমিক প্রেমিকা
এক আত্মা এক মন প্রাণ।

ধন্য তুমি সম্রাজ্ঞী মমতাজ—
একথা বুঝায়ে ছিলে নিজ প্রাণ দিয়া
সত্য প্রেম লভেছিল সাজাহান রাজ
তোমার নিকটে
বেঁধেছিলে পবিত্র প্রণয় ডোরে ভারত সম্রাটে।

ধন্য তুমি রাণী
সার্থক জীবন তব ধন্য তব পরিহাস বাণী।
তুমি যবে ধরা হতে লইলে বিদায়
প্রতিশ্রুতি নিয়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দর
পরিহাস ছলে,
প্রণয় পরীক্ষা তায় হইল রাজার
জয়ী হল সম্রাটের সত্যাশ্রয়ী প্রেম
তব প্রেম স্পর্শ লভি হৃদয়ের তলে।

সপ্তদশ বর্ষ ধরি বিশ হাজার লোক
পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য সমাধি মন্দির তব
করিল রচনা সেই মমতাজ-মহল,
সাজাহান সম্রাটের শোক অশ্রুজল।
পবিত্র মিলন-স্মৃতি রাখিল উজ্জ্বল
তাঁহার—তোমার
রহিল অমর হয়ে প্রেম দুজনার
এ মর ধরায়।

তার পর কত কাল গেছে চলে
বিস্মিত জগতবাসী মুগ্ধ চক্ষে চায় আজো
শ্রদ্ধাভরে করে নমস্কার
ভাবে মনে ধন্য সেই প্রেমিক প্রেমিকা
যাহাদের প্রেম—
মর্ম্মর পাষাণে করে প্রাণের সঞ্চার।

রাজ্ঞী মমতাজ—
অতীতের শুনি ইতিহাস, সাক্ষী দেয় আগ্রার "তাজ,"
গৌরবে পুলকে হর্ষে তোমারে স্মরণ করি আজ।
স্বামীকে জিনিয়াছিলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া
তাই হয়েছিলে তাঁর অন্তরের দেবী
জীবনে মরণে চির প্রেমময়ী প্রিয়া।
স্মৃতির সম্মান তব, "তাজ"
করিয়াছে প্রেমময় স্বামী, প্রতিশ্রুতি করেছে
পালন মহারাজ।

এই সত্য যুগে যুগে রহিবে জাগিয়া
কালের অতল গর্ভে মিথ্যা সব যাবে তলাইয়া
যতদিন রবে হেথা প্রেমের সম্মান
তোমরা উভয়ে রবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
আদর্শ হইয়া রবে তোমাদের প্রেম
যার কাছে ম্লান জ্যোতিঃ মণিময় "সিংহাসন হেম।"
কত ব্যর্থ প্রেমিকের নয়নের জল
হতাশার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
অর্ঘ্যরূপে লভিতেছে নিশিদিন মান
প্রেমের গৌরবে পূর্ণ "সমাধি-মন্দির" তব
"মমতাজ-মহল"।
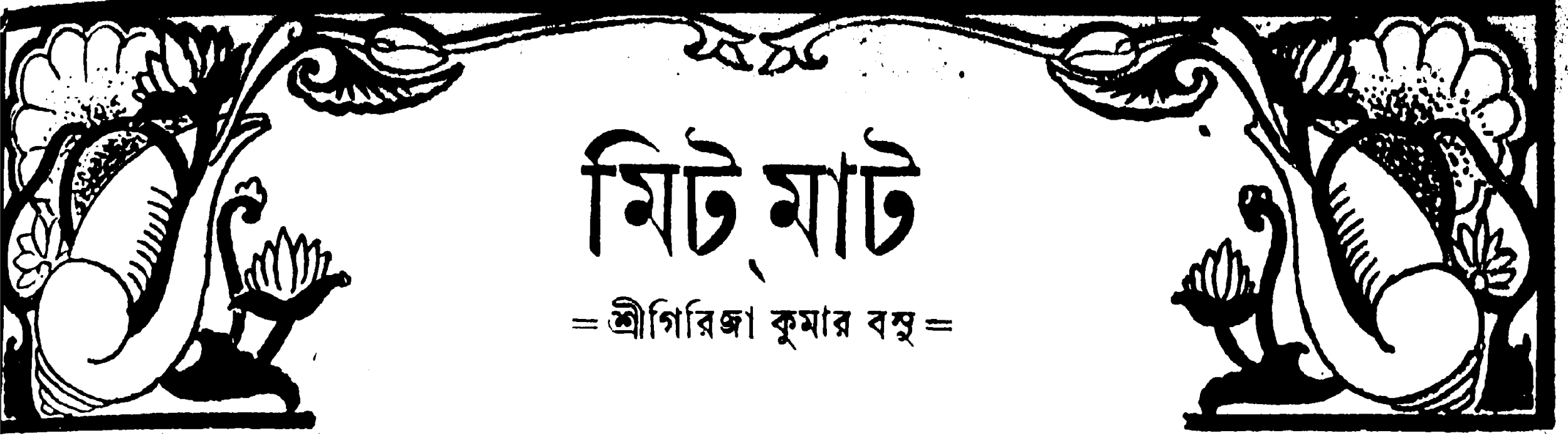
মিটমাট

= শ্রীগিরিজা কুমার বসু =

ভাই পদ্মা,

তুমি ঠিক্ই লিখেছ। আমার হার হ'য়েছে। একদিন নী-র জন্যে তোমাদের ওখানে যেতে চাইনি। আজ তারই জন্যে সেই জায়গায় যাবার জন্যে মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। তোমার একটা কথা কিন্তু ভুল। আমি রাগ ক'রে যেতে চাইনি, তা নয়—নী-র প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃই চাইনি। ইতি—তোমার ছো···দা।

শ্রীচরণেষু,

ছো···দা, আপ্নার চিটি পেলুম। একটা কথা জান্তে ইচ্ছে ক'র্ছে ব'ল্বেন কি? আমাদের প্রতি সদয় হ'য়ে যে আপ্নি আস্ছেন না, আস্ছেন মেজ্দির টানে তা জানি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আপ্নার এই পরিবর্ত্তনের কারণটা ধ'রতে পারছি না। ইতি—স্নেহের পদ্মা।

ভাই পদ্মা,

পরিবর্ত্তন কিছুই আমার হয়নি। নী-কে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসি এবং সেও সব চেয়ে আমাকেই ভালোবাসে এ-কথা তোম্রা বরাবরই জানো। তোম্রা আমাকে বার বার ক'রে আহ্বান ক'রেছিলে। আমি তার উত্তরে তোমাদের জানিয়েছিলুম যে আমি কিছুতেই যাবো না, যাবার বিশেষ বাধা আমার আছে। কি বাধা তাও ব'লেছিলুম। তোমাদের এই সোজা কথাটা বোঝ্বার মতো বুদ্ধি ছিল না যে নী-র আহ্বান পাবার অপেক্ষাতেই আমি ছিলুম। ইতি—তোমার ছো···দা।

শ্রীচরণেষু,

ছো···দা, বুঝ্লুম। মেজ্দি নিজে যাওয়ার ফলে, আপ্নাদের সব মান অভিমান চুকে গেছে। আমরাও তো ওখানে ছিলুম। ক'টা কথা আমাদের সঙ্গে ক'য়েছিলেন? ভালোবাসার কম বেশী আছে তা যদি মান্তেই হয়, একজন ডাকেনি ব'লে, আমাদের সকলের আমন্ত্রণকে আপ্নি তুচ্ছ ক'রেছেন, এটা যে বড্ডো বাড়াবাড়ি, তাও মান্তে হবে। ইতি—স্নেহের পদ্মা।

ভাই পদ্মা,

তোমরা এখানে ছিলে। আমার পক্ষে, নাম মাত্র। তুমি আর তোমার দিদি দিনরাত্তি গল্প-উপন্যাসের বইতে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে থাক্তে। ভালবাসা বা কৃতজ্ঞতার কথা তুল্ছিই না কিন্তু ভদ্রতা ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা তোমাদের কেউ শেখায়নি। নী-ও বই প'ড়তো খুব, কিন্তু বইকে সে আমার চেয়ে মনোযোগ-যোগ্য ব'লে কখনো ভাবেনি। তার বোন্ যে তোম্রা সে কথা মনেই হয় না। ইতি—তোমার ছো···দা!

শ্রীচরণেষু,

ছো···দা, যে যারে দেখ্তে নারে সে হেরে তার চলন বাঁকা। একদিন ব'ল্তেন "নী-র রকমটা কি? একখানা চিঠি লেখে না, চিঠি লিখ্লে জবাব দেয় না, আদব কায়দা কি কিচ্ছু সে জানে না? আর আজ ঘুর্তে ফির্তে "তোমার মেজ্দির কাছে থেকেও তোমরা এমন অসভ্য হ'লে কেন? 'নী-কি চমৎকার ক'রে কথা বলে', 'নী-না থাক্লে এক দণ্ডও কোনোখানে থাকা যায় না।' আপ্নার নী-নয় নারী-কোহিনুর, আমরা তা ব'লে টিন বা রাঙ্তা নেহাৎ নই। ইতি—স্নেহের পদ্মা।

ভাই পদ্মা,

লক্ষীটি, মেজ্দিকে হিংসে করোনা। বিধাতা তোমাদের সবার চেয়ে রূপে, গুণে তাকে শ্রেষ্ঠ ক'রে গ'ড়েছেন—সে জন্যে তাকে তো অপরাধী ক'র্তে পারো না। আর, সকলকে

সমান কেউ ভালোবাসতে পারে না। সব ছেলেমেয়েকে সমানভাবে মা-ও ভালোবাসতে পারেন না। যে মা বলেন তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সবাইকে একই রকম ভালোবাসেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ব'ল্বে, মহাপ্রভু তা'হলে বিশ্বজনকে প্রেম দিতেন আর দিতে ব'ল্তেন কি ক'রে? মহাপ্রভু সবাইকে প্রেম দিতে ব'লেছিলেন, সত্যি—কিন্তু ঠিক্ সমান দিতে ব'লেছিলেন, এ কথা জানি না। তা ছাড়া মহাপ্রভু পড়েন দেবতার পর্য্যায়ে, আমাদের মাপকাঠিতে তাঁকে মেপো না। ইতি—তোমার ছো···দা।

শ্রীচরণেষু,

ছো···দা, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'র্বার শক্তি আমার নেই। আপনি তো ব'ল্তে চান যে মেজ্‌দিকে, যারপর নেই আপনি ভালোবাস্‌বেন এবং আমরা যেন ছিটে ফোঁটা পেয়েই খুসী থাকি? তাই হোক্। আপনা হ'তে যা পাওয়া যায়, তাই ভালো। ভিখারীর বৃত্তি গ্রহণ ক'রবো না। ইতি—স্নেহের পদ্মা।
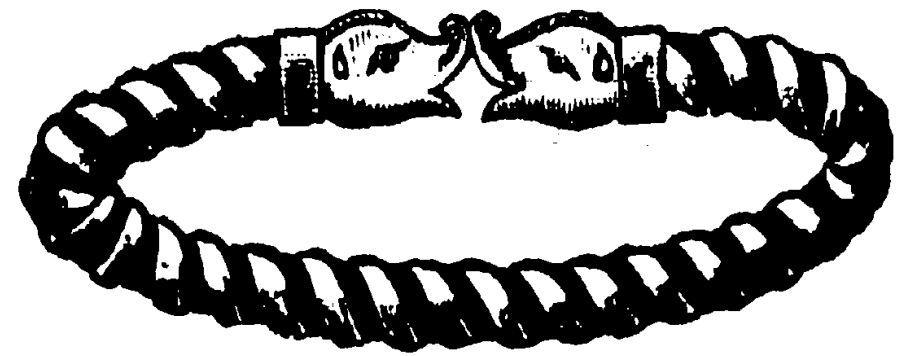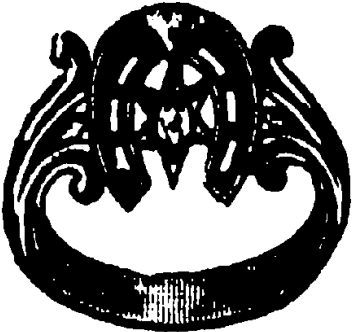
উপসংহার

বন্দে আলি মিয়া—

অখিল বাঁড়ুয্যে যে একদিন দেশের বড় একটা নেতা বা আর কিছু হবে এবিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। দিনাজপুর জেলায় ধরাইল গ্রামে তার বাড়ী। স্কুলে থার্ড ক্লাসে যখন পড়ে তখন হ'তেই স্বদেশী লোকের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে। বাড়ীতেই এক আখড়া তৈরী করে'—বাঁশের
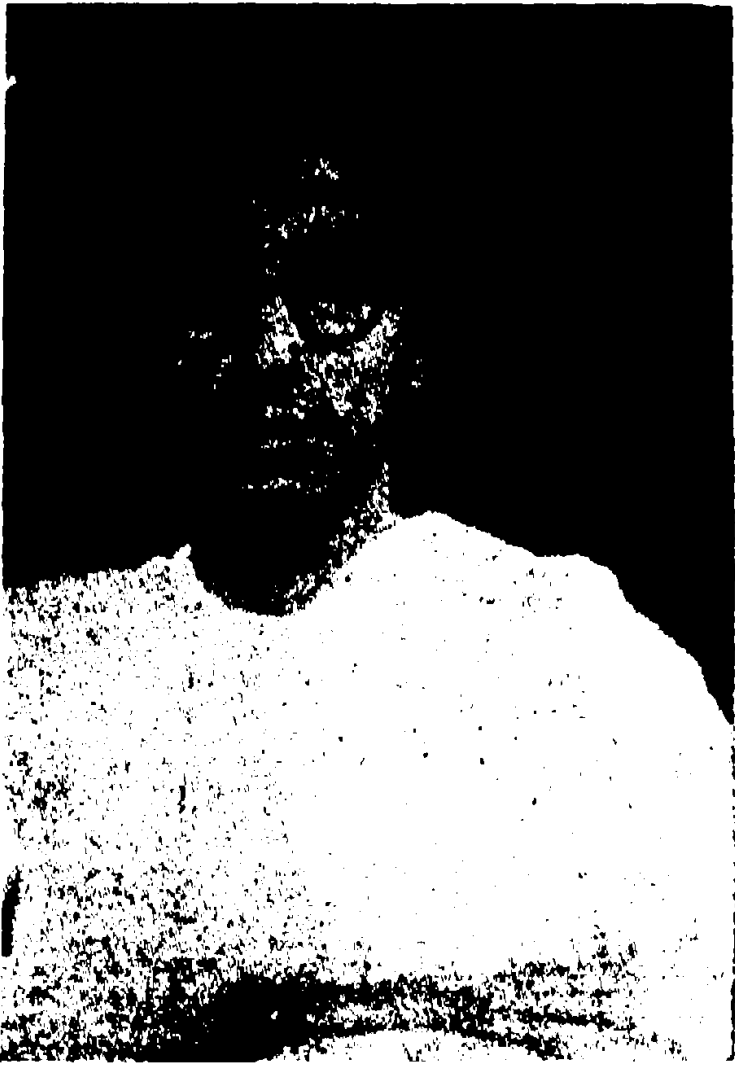
বন্দে আলি মিয়া

প্যারালাল্ বারে ব্যায়াম করে' শরীরের উন্নতি করলে! বুকের ছাতি চল্লিশ ইঞ্চি। মাথার চুল আগে পাছ সমান ছাঁটা। খদ্দর পরে, জুতা পায়ে দিত না। তার জীবনের মূল মন্ত্র—ভারতের স্বাধীনতা লাভ। যার জন্য চাই ব্যায়ামসমিতির পত্তন এবং স্বদেশিতার বীজ ছড়িয়ে দেয়া—গ্রামে গ্রামে প্রতি বাঙ্গালী নরনারীর তরুণ প্রাণে। তার আলমারীতে জমা ছিল যতরাজ্যের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার বই। অখিল নিজের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতো—এবং দেশের জন্য একটা কিছু করে যাবে প্রাণ দিয়ে শক্তি দিয়ে; দেশ জননীর বেদী মূলে... প্রভৃতি কতো কি ভাবতো বসে বসে।

ম্যাট্রিক পাশ করে অখিল কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে এসে ভর্ত্তি হলো—কিন্তু সভাসমিতি বক্তৃতা প্রচার-কার্য্য ইত্যাদি নিয়ে এত মেতে গেল যে পড়াশুনায় তার মন বসে না।

কিছুদিন পরে এলো স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা। দেশের নেতারা কাজে নেমে গেলেন। কি ভাবে নাম করা যায় সেজন্য অনেকেই নিজের নিজের দল পাকিয়ে ফেল্লেন। খবরের কাগজে একদলের নেতা অন্য দলের নেতাকে গালাগালি দিয়ে নিজের খ্যাতিবৃদ্ধি করতে লাগলেন। তরুণ আর তরুণীর দল কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় স্বদেশী প্রচারে মন দিলে।

একদিন একদল কাঁচা পাকা বয়সের কতকগুলি স্কুল কলেজের মেয়েছেলে নিয়ে আলীপুর কোর্টের উকিল গোকুল সেন গোলদীঘীর পারে সভা করে বক্তৃতা করতে লাগলেন মর্ম্মস্পর্শী, জ্বালাময়ী ভাষায়—"এস এস ভাইবোন এস তরুণ আর তরুণী, দেহ প্রাণ—চাই মুক্তি, মোচন কর দেশ-মার শৃঙ্খলভার।" স্কুল কলেজের ছাত্রদের ভিড়ে বক্তৃতার জ্বালাময়ী ছন্দে ও উত্তাপে আসর গরম হয়ে গেল, ঘন ঘন বন্দে মাতরম্ আর মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি হতে লাগল......তিন চারটি মেয়েও বক্তৃতা দিলে। পাকা উকিল চতুর স্বদেশীনেতা নগ্নপদে হাঁটু পর্য্যন্ত আট-পৌরে খদ্দর পরে খালিগায়ে একটি বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে একবার গম্ভীরভাবে চারিদিকে লক্ষ্য করলেন। তরুণ তরুণীরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম দিতে লাগল। আমাদের অখিল বাঁড়ুয্যের মন গোকুল সেনের বক্তৃতায় শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে বেঞ্চে উঠে সপ্তমে স্বর চড়িয়ে আরম্ভ করলে—"এস মোর ভাইবোন; মার ডাকে দাও সাড়া, আমরা আজ কুক্কুরের চেয়েও হীন" ইত্যাদি বলে সে একটা বই বের করে রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে অনল উদ্গিরণী বক্তৃতা দিলে। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি আর হর্ষধ্বনি করতে লাগল। গৌরবে প্রশংসায় অখিলের মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

গোকুল উকিল কী ভেবে অখিলের 'পর আকৃষ্ট হয়ে তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। রাত্রে ত্রিশ চল্লিশ জন যুবক এবং গুটি পঁচিশ মেয়ে এসে জমল। গোকুল বাবু বললেন, "দেখ আমি অনেক বচ্ছর যাবৎ স্বদেশী ক'রে আসছি, ছেলে মেয়েদের মুখ দেখেই বলতে পারি—কার কিরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, শক্তি প্রাণস্পন্দন আছে। আমার বিশ্বাস তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। তবে দেখ বাপু শুধু কাজ করেই যাবে আর একটা পুরস্কার পাবে না, এ আমি

সহ্য করতে পারি না। আমি আর তেমন বড় কি একটা নেতা, দেশের যারা প্রধান প্রধান পাণ্ডা—তাঁরাই দেখ নাম করতে চায় আগে;—যার তরে অবৈধ উপায়ে কত কীর্ত্তি করেন। ক্যানভ্যাসিং, স্রেফ্ ক্যানভ্যাসিং! কাগজে ঘরের কুৎসা প্রচার করা।...আর হাঁ্যা রাজনীতি! এর মধ্যে নেই সাধুতা, ধর্ম্ম, নীতির ঐক্য! যার যখন খুসি ইচ্ছামত সুর বদলাতে পারে নিজের মৎলব হাসিল করবার জন্য।”

অখিল মুখ নীচু করে বললে—“আজ্ঞে যা বলচেন সত্যি; কিন্তু কথা হচ্ছে আমার আদর্শ তা নয় কাজ করে যাব। মা'র মুক্তির জন্য বুকের রক্ত পর্য্যন্ত দেবো। অনাচারকে সহ্য করতে পারব না।” একটু চুপ ক'রে থেকে গোকুল বাবু বললেন—“ওঃ বুঝতে পারলুম তোমার অবস্থা। আচ্ছা বেশ, এখন থেকে তুমি আমার বাড়ীতেই থাক—তোমার দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে। ভাল কথা; তুমি বোধ হয় প্যারেড্ ড্রিল্ এসব জানো?...বেশ তাহলে আমিও একটা লেডি ভলেণ্টিয়ার লীগ্ গঠন করব,—তুমি হবে এর মেজর। আমাদের একটা মেজর পোষাকও আছে; কাল সেটাই তোমাকে দেয়া যাবে।”

একটু পর মহিলা সমিতির সম্পাদিকা কুন্তলা দেবী এসে হাজির হলেন। বললেন—“নমস্কার গোকুল বাবু, এইমাত্র আপনার চিঠি পেয়ে এলুম।”

কুন্তলা দেবী বাল-বিধবা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ, তবে দেহে এখনো লাবণ্য আছে। যৌবন যেন স্থির হয়ে রয়েছে। একটু ঢেউ লাগলেই যে আবার কুলকুল্ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে ছুটতে থাকবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গোকুল বাবু চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়ে বললেন—“আমার ইচ্ছা কি জানেন? আপনি হাতীবাগান কংগ্রেসের সভানেত্রী হন,—আমি সহকারী থাকব। কারণ, চাঁদা তুলতে গেলে মেয়েছেলে না হ'লে সুবিধা হয় না। আপনার উপরেই ভার রইল, পাড়ার স্কুল কলেজের মেয়েদের রিক্রুইট্ করা। মানে কথা হচ্ছে আমি না হয় বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে লম্বা বক্তৃতা দিতে পারি কিন্তু অন্দর মহলে ঢুকে মেয়েদের মাঝে প্রোপাগাণ্ডা করা অসম্ভব। সেই যে জমীদার গিন্নী হেমবালা দত্ত—বুঝলেন? খুব টাকা আছে। কালকে একবার যাবেন? যদি হাত করা যায়—আর যদি বলচি কেন হাত করাই চাই, নইলে আমাদের চলবে কেন? টাকা নইলে কংগ্রেস চলবে না, স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের খরচ যোগান চাইতো? অথচ, নিজের গাঁট হ'তে দেবার মতন শক্তি আমার নেই। এর আগে দুবার লোকসান দিয়েছি—আর নয়। তবে মুস্কিল হ'য়েছে নবীন চক্কোত্তীকে নিয়ে। সেই আমার বদনাম গেয়ে বেড়ায়।”

কুন্তলা দেবী বললেন—“কোন নবীন চক্কোত্তী? ওই যে মুনসেফ কোর্টের উকিল? সে যে এখন মস্তবড় দেশ-নায়ক! রোজ রোজ কাগজে তার প্রশংসা বের হচ্ছে।

গোকুলবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন—“তা হবে না কেন, পয়লা নম্বর ম'কার ভক্ত, বেশ্যাদের নিয়ে চাঁদা তুলে বেড়ায়,—আর পিকেটিং করে?—সেকী পারতো, শুধু বউটাকে তালিম দিয়ে ঠিক ক'রে প্রথম প্রথম সভা-সমিতি করতো। মেয়েলোকের ঠোঁটের লাড়া—দুচারটা কথা যাই ফুট্‌ত, শ্রোতার দল মুগ্ধ হ'য়ে হাততালিতে সভা গরম ক'রে তুল্‌ত।...তাইতো আমিও বলছি আপনি আমার সহায় হ'ন—দু'জনার সহযোগে একটা চমৎকার বস্তু গড়ে তুলব।”

* * * *

অখিল অতঃপর হাতীবাগানে গোকুল উকিলের বাড়ীতেই আস্তানা গাড়লে। দু'তিন বেলা ব্যায়াম করে খাওয়া-দাওয়া হয় খুব ভাল। স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে লাগল তার চেহারা স্বভাবতই সুন্দর—যাকে বলে সুপুরুষ; বয়স একুশ বাইশ—তার উপর এতদিন সে দস্তুর মত কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে এসেছে। নিরামিষ, হবিষ্যান্ন ভোজন আচার আচমন, ভোরবেলা স্নান সন্ধ্যা—রাত্রে খালি কম্বল পেতে শোয়া ইত্যাদি! অর্থাৎ সে কামিনীকাঞ্চন উপেক্ষা করে চলাই যৌবনের ও জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে আসছে। এখন তার বুকের মাপ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি—মস্তবড় ফিগার। বাড়ীর উড়ে চাকরটা ভোরবেলা আধপোয়াটাক কাঁচা সরষের তেল সর্ব্বাঙ্গে ডলে দেয়। লেডী ভলেণ্টিয়ার লীগে পঞ্চাশজন সৈনিকা নাম দিয়েছিল—এর মধ্যে চল্লিশ

স্কুল কলেজের বালিকা ও যুবতী, কেউ বা যুবতী আখ্যা প্রাপ্তির বাহিরে। মানে পঁচিশ বছরের পর বাংলার মেয়েদের যৌবন থাকে না। বিশেষ তথা কলেজ প্রভৃতি মেয়েদের বি, এ, পাশ দিতে দিতে দেহে আর কিছু থাকে না। এর বাকী দশজনের মধ্যে চারজন বালবিধবা, একজন মিশট্রেশ্, পাঁচজন কুলবধূ। তিন হাত লম্বা বাঁশের লাঠী এল, খাকী খদ্দরের মিলিটারী পোষাক, ইত্যাদি কিছুই বাদ গেল না। কতকগুলি ঘোঁড়া খাদ্যের অভাবে মৃতপ্রায় হ'য়েছিল, গাড়োয়ান বেচারীরা কিছু কিছু পেয়ে গোকুল উকিলের কাছে ভাড়া দিলে। একটা মিলিটারি ব্যাণ্ড হ'লো — মেয়েরাই বাঁশী, ঢাক, করতাল বাজিয়ে প্রাণে স্পন্দন ছুটাতে লাগল —"আর কারে করি ভয়, বল জয় জয় জয়।" অখিল বাঁড়ুয্যে দিনরাত খেটে খেটে মেয়েদের প্যারেড্ শেখাতে লাগল'। লেফ্‌ট্, রাইট, লেফ্‌ট্ রাইট, কুইক্ মার্চ্চ, হল্ট — খাকী খদ্দরের ইউনিফর্ম্—বুকের হাতকাটা ইউনিফর্ম্, পরনে হাফ্‌প্যান্ট্—বুকের উপর ঝুলানো ব্যাজ্, ভারতমাতার ছবি, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। অখিল সঙ্কোচ্ বোধ করে মেয়েদের হাত, গলা, পিঠ, পা—ইত্যাদি স্থান স্পর্শ করতে। অথচ না করলেও চলে না, ড্রিল শেখাতে হবেই। দেশের জন্য এরা আত্মোৎসর্গ ক'রেছে। প্রয়োজন হ'লে এরাই হাসিমুখে করবে মরণকে আলিঙ্গন। কখন কখন অখিলের রাগ হয়, এত ব'লেও এদের মনে থাকে না।

সেদিন ভোরবেলা মার্চ্চ আরম্ভ হ'য়েছে—পাশের একটা পোড়ো বাড়ীতে। একটি মেয়ে—নাম তার অনুপমা, বেথুনে পড়ত প্রথম শ্রেণীতে। বয়স ষোল সতেরো;—এই লীগের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু ড্রিল সে একটুও শিখতে পারলে না। মেজর অখিল বাঁড়ুয্যে পোষাক প'রেছে—পায়ে মিলিটারি বুট, মাথায় হ্যাট্, সার্টের বুকে একশো কার্তুজের ঘর, কোমরে সোর্ড ঝোলানো। বংশী ফুৎকার করতেই মেয়েরা ব্যাণ্ড-বাদ্য আরম্ভ করলে। তার তালে তালে বুকের রক্ত চাঙ্গা হ'য়ে নাচতে লাগল—গানের মাঝখানে হঠাৎ অখিল গিয়ে অনুপমার শরীরে খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিলে। এতদিনে কি শিক্ষা হ'লো!···অখিলের কম্পিত আঙুলের
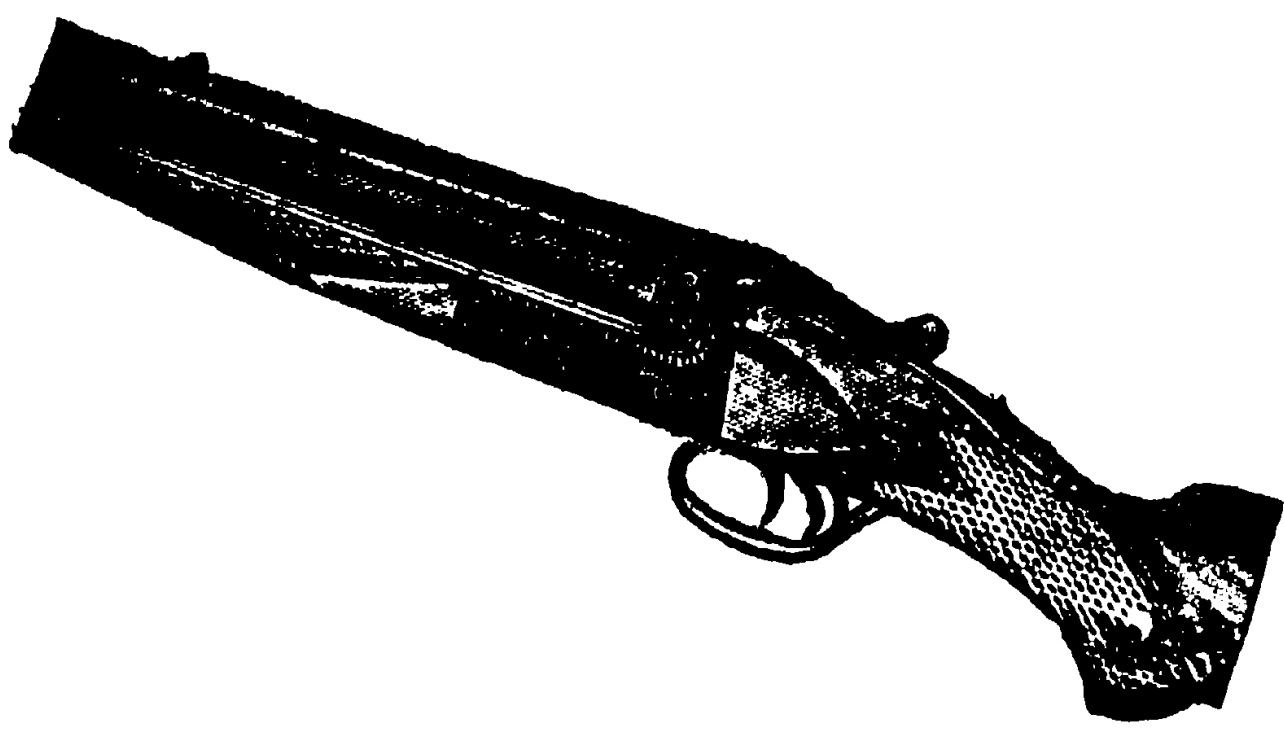
গাঢ় নিপীড়নে অম্বু ফিক্ ক'রে একটু হেসেই লজ্জায় মুখটা নীচু করলে।

*　　*　　*

মেজর অখিল বাঁড়ুয্যে ভোরবেলা উঠেই মেয়েদের মার্চ্চ করায়। সেই হাতীবাগান লেডিজ্ লীগ গড়ের মাঠে মার্চ্চ করতে করতে চলল। সবাকার আগে আগে মেজর বাঁড়ুয্যে··পিছনে কলেজের মেয়ে সৈনিকার দল···তারপর গোকুল উকিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা আকাশে উড়িয়ে চল্‌লেন। গোকুল উকিল বল্‌লেন—"চল একবার পতিতা পল্লীর ভিতর দিয়ে মার্চ্চ করা যাক্।"

তারা সোনাগাছির পথ দিয়ে মিলিটারি বাজনা বাজিয়ে চলল। পতিতারা ছুটে এলো—কেউ কেউ বারান্দার উপর হ'তে লাজ ও পুষ্প বরিষণ কর্‌তে লাগল। গর্ব্বে আনন্দে গোকুল উকিলের চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

গড়ের মাঠে আরো তিন চারিটি দল মার্চ্চ ও কুচ্ কাওয়াজ করছিল। একটি হ'লো নবীন চক্রোত্তীর। নবীন চক্রোত্তীর সেনাবাহিনীতে ফুলবাগানের আস্‌মানতারা সানাই ফুঁক্‌ছিল। গোকুলবাবু হেসে হেসে কুন্তলা দেবীকে বললেন—"দেখলেন শালার কাণ্ডটা? ফুল বাগানের মাগীদের নিয়ে মজেছে···অথচ এর মত এত বড় নেতা আর কেউ নেই।"

রবিবারে দুপুর বেলায় গোকুল উকিলের বাড়ীতে স্বদেশী নেতাদের এক বৈঠক বস্‌ল। নেতা ও নেত্রীগণ কার্য্যপদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা ও সোরগোল করতে লাগলেন। পিকেটিং মদ্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন, গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার, চরকা প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, কংগ্রেস অধিবেশন ইত্যাদি বাছা বাছা স্বদেশী কথাগুলির আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলতে লাগ্‌ল। কোন্ নেতা কংগ্রেসের নামে চাঁদা তুলে নিজে বড় বাড়ী করছে—কে গিন্নীর জন্য গহনা তৈরী করছে, কে আবার তলে তলে এম, এল, সি, বা রায়বাহাদুর হবার চেষ্টা করছে ইত্যাদি।

পরদিন গোকুল উকিলের দল মিছিল সহকারে গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর অঞ্চলে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে চললো। অখিল একটা বক্স হারমনিয়ম লাল ফিতায় পিঠে ও কোমরে ঝুলিয়ে বাজাতে লাগল। তার সাথে সাথে অম্বু প্রভৃতি মেয়েরা গান গেয়ে চলল—

"এস এস বোন দেশের মুক্তি লাগি' মায়ের চরণ পূজায়
পতিতা তোমরা মহৎ অতীব জননী আজ তোমারে চায়!"

পতিতারা কেউ সোনার হার, বালা, রুলী, নোট, টাকা, পয়সা যার যা সাধ্যমত দিতে লাগল। গোকুল স্নেহদৃষ্টিতে এগুলির ভালুয়েশন কষ্‌তে লাগলেন এবং তিনি ও কুন্তলা দেবী একটা লাল খদ্দরের চাদরের দুই দিকে ধ'রে আঁচল প্রসারিত করলেন। গোকুলের চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। অখিল ভাবলে—সত্যি লোকটার প্রাণ আছে···কোর্টে যাওয়া ছেড়েছে, আর দেশের জন্য দিন রাত কী খাটুনি! অনেকগুলি পতিতাও এসে দলে যোগ দিয়ে গান ধরলে। পতিতাদের নিয়ে গোকুলবাবু শ্যামবাজার ভদ্রপল্লিতে গান করতে করতে ঢুকে পড়ল। পুরমহিলারা যথাসাধ্য সোনার গয়না ও টাকা পয়সা নিক্ষেপ করতে লাগল। আট পৌরে ছ'হাত খদ্দর পরা আলীপুর কোর্টের নামজাদা উকিল গোকুল বাবুর চোখের জলে রাজপথে বন্যা বইতে লাগল। অনেক ভদ্রলোক ভাবলে—"লোকটা সত্যিকার দেশভক্ত, অক্লান্ত-কর্ম্মী, কিভাবে নিজের স্বার্থ বলিদান দিয়েছে। সাধে কী আর এত নাম ডাক হ'য়েছে?" কেউ ভাবলে—"লোকটা ডাহা জুয়াচ্চোর, সব ভণ্ডামী, যখন ধর পাকড় আরম্ভ হবে, তখনই লেজ গুটিয়ে পগার পার।" দোতলা, তিনতলার উপর হ'তে জননী ও ভগিনীরা শঙ্খ বাজিয়ে গোকুলের অভিযানকে আশীর্ব্বাদ জানালেন। কয়েকটা ফুলের মালা শোভা পেতে লাগল তাঁর গলে। বেলা তিনটার সময় সদলে গোকুল বাবু ঘরে ফিরলেন। এবং স্নানাদির পর সকলে উঠানে ও দালানের রোয়াকে ব'সে এক সাথে আহারে মন দিল। ঠিক তখন গোকুল বাবু মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—"আজকে চোখের সামনে আমি যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি তার তুলনা নেই। আমরা ভুলে গেছি উচ্চ নীচ, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র। স্পৃশ্য

দুঃখের কোন কথা নেই। মহামিলনক্ষেত্র আজ… বেগে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে। আমরা যদি এইভাবে ভাই ভগিনী হয়ে এক মনে এক প্রাণে এক সুরে মিল রেখে চলতে পারি, তাহ'লেই আমাদের যাত্রা জয়যুক্ত হবে। ভারতমাতার ভালে স্বাধীনতার জয়টীকা প্রভাতের তরুণ তপনের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। সেদিন আর বেশী দূর নয়—বল ভারতমাতা কী জয় ও গান্ধীজি কী জয়।" পরে জনতা বলে উঠল—"বাঙ্‌লার রাষ্ট্রনায়ক গোকুল উকিল কী জয়।"

এই বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করলো—তিন চারজন লোক। একজন বল্‌লে—"মশাই বাটপারি, জুয়াচ্চুরী খুব শিখেছেন দেখছি! বেশ্যা মাতালদের নিয়ে নেড়ানেড়ির দল গড়ে স্বদেশী নেতা সেজে নাম করার সখ্ আর ঘরের সিন্দুক বো্ঝাই করা—একী কারো অজানা?… কোন আক্কেলে আপনি ঘরের কুমারী মেয়ে আর বৌ ঝিদের এনে এদের সর্ব্বনাশ করতে ফাঁদ্ পেতেছেন? অত যদি সখ হয়—নিজের মেয়েকটিকে পথে নামিয়ে দিন—তারা দিব্বি স্বরাজ করবে!" অম্বু খেতে বসেছিল অখিল খাবারের থালাটা তার সামনে নিয়ে এলো। অম্বুর মুখখানা পলকের মধ্যে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। তার কাকা এসে হাত ধরে বললে—"ওঠ্, ওঠ্, চলে আয়।" বলেই তাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

গোকুল বাবু হুঙ্কার দিলেন—"এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে ট্রেস্‌পাস্ করে, ভদ্রমহিলাদের অপমান।"

অখিলের হাত থেকে থালাটা ঝনাৎ ক'রে রোয়াকে পড়ে গেল।

সুনন্দা

=শ্রীআশালতা দেবী=

শাল তমালের পিছনে ধীরে ধীরে চন্দ্রিকার আভাস পাওয়া গেল। যমুনার মৃদু কলরব আরতিরধ্বনি থামার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। বেতসের বন ধীর বাতাসে জলের উপর নুয়ে নুয়ে প'ড়তে লাগ্‌ল। কোন্‌ একটা পাখীর নীড় লক্ষ্য ক'রে উড়ে যাওয়ার শব্দ, তারপর আবার বনচ্ছায়াতল নিস্তব্ধ।

অরিন্দম ব'ললে, 'আমায় ক্ষমা কর সুনন্দা। অপরাধ তোমার নয়, আমারই।'

স্থিরদৃষ্টি অরিন্দমের মুখের উপরে স্থাপিত ক'রে তরুণী প্রশ্ন ক'রলেন, 'অপরাধ কিসে অরিন্দম?'

'এই যে তোমায় প্রত্যাখান ক'রলুম।'

'তার জন্যে দুঃখ কিসের? হয়তো আমি ভুল বুঝে-ছিলুম। তা হোক্‌, এতে কুন্ঠিত হবার কিছু নেই। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তোমাকে জানবার লোভে আমি মিছে কথাও তো ব'ল্‌তে পারি।'

ব্যথিতস্বরে অরিন্দম ব'ল্‌লে, 'না সুনন্দা, আমি জানি তোমার কথা মিথ্যে নয়। আমার দোষ নিও না, আমাকে ক্ষমা কর।···সুনন্দা, তোমাকে যে আমি চিরদিনই সব বাসনার অতীত ব'লে জানি, আজ আমায় এমনরূপে দেখা দিও না।···তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু প্রিয়ার রূপে যে কল্পনা ক'রতে পারি না; আমার দোষ নিও না সুনন্দা।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুনন্দা ব'ললে, 'চিত্রালীর কাছে প্রতিশ্রুত আছি, তোমাকে নিয়ে যাব। ব'লে যাই, পূর্ণিমা রাতে অমিতাভের মন্দিরে সে আস্‌বে, তার হাতের মালায় তোমাদের মিলন হবে। পূর্ণিমা রাতে অমিতাভের রত্নমন্দিরে, মনে থাকে যেন।'

ধীরপদে সুনন্দা চ'লে গেল। রত্ননূপুরের কাকলি নীরব বনবীথিকে সচকিত করে তুল্‌লে।···নিমেষমধ্যে বনস্থলী আবার নীরব হ'য়ে গেল।

অরিন্দমের ব্যথাভরা দৃষ্টি বনপথের ধূলিলীন একছড়া পুষ্পমাল্যে নিবদ্ধ ছিল,—কয়েক নিমেষ আগের দেওয়া সুনন্দার উপহার।

ধূপ ধুনা অগুরু চন্দনের গন্ধে কক্ষতল মদির। একে একটি ক'রে দীপ নিভে আস্‌ছে।

চিত্রালীর কম্পিত হাতের পুষ্পমালা অরিন্দমের রত্নমালার সঙ্গে বিনিময় হ'য়ে গেছে। আচার্য্যদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে নবদম্পতীকে নির্জ্জন আলাপের অবসর দিয়ে সরে গেছেন।

রত্নদীপালোকে উদ্ভাসিত কক্ষতলে অরিন্দম আর চিত্রালী দাঁড়িয়েছিল। সাম্‌নের প্রাঙ্গণে সুনন্দা অপেক্ষা ক'রছিল, অরিন্দমের।···

কখন অশান্ত বাতাসে মন্দিরের দীপ নিভে গেছে।···

মন্দির মুখরিত ক'রে দ্বিপ্রহরের ঘোষণা হ'য়ে গেল। চমকিত অরিন্দমের বাহুপাশ বেপমান চিত্রালীর কণ্ঠে শিথিল হ'য়ে এল।

'আবার কবে দেখা হবে?'—চিত্রালীর স্বরে ব্যথিত কম্পন, নয়নে অশ্রুর বাদল।

শ্বেত উত্তরীয়ের প্রান্তে তার অশ্রুধার মুছিয়ে সিক্ত চোখ চুম্বন ক'রে অরিন্দম ব'ললে, 'সুনন্দা জানে।···যে চোখের কোণ হাসির ছটায় পূর্ণ থাক্‌বে সে চোখের কোণে অশ্রুরেখা। এ আমায় বড় ব্যথা দিচ্ছে চিত্রা।'

চিত্রালী অরিন্দমের প্রশস্ত বুকের উপর মাথা রেখে ব'ললে, 'আমার বড় ভয় করে যে।'

গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে অরিন্দম শুধু ব'ললে, 'চিত্রালী!'······

দূরে অলক্ষ্যে সুনন্দার চোখ সহসা জলে ভ'রে উঠ্‌ল। একটা তীব্র দুঃখের দীর্ঘশ্বাস সংবরণ ক'রতে গিয়ে তার স্বর একবার কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ল।·········

চন্দ্রালোকিত বনপথ। দুজনে ফিরছিল। অরিন্দম ব'ললে, নন্দা, চিত্রা বড় অধীর হয়। তাকে একটু বুঝিয়ো।'

'তুমিই কেন বোঝালে না?'

'তাকে আমি ব'লেছি। তবুও তুমি বুঝিয়ো। তোমার কথায় সে বড় বিশ্বাস করে।'

'কি ব'লব?'

সলজ্জ অধীরতায় অরিন্দম ব'ললে, 'ব'ল, অরিন্দমের গৃহলক্ষ্মী চিত্রালী।'

মৃদুকণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, 'আচ্ছা'। হয়তো কণ্ঠের স্বর কেঁপে উঠেছিল, মুহূর্ত্তের জন্যে আবার হয়তো চোখে জল এসেছিল। তবু—না, সুনন্দার বেদনা শুধু সুনন্দারই জানবার। বাইরের প্রয়োজন তার নেই।

··· ··· ···

বিহারের প্রধান আচার্য্য সুনন্দাকেই অত্যন্ত ভালো বাসতেন। সুনন্দার বাহিরে সৌন্দর্য্য ছিল, অন্তরের মাধুর্য্যও ছিল অপরূপ। চিত্রালীর কাছে তার পরাজয়—এই বেদনা তার অন্তরকে আরো অপরূপ মাধুর্য্যময় ক'রে তুল্‌লে।······

নিস্তব্ধ নগরীর বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে নদীজল কল্লোল-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত। এক এক রাতে সে নদী তীরে ফিরে যেত। তার আধঘুমভরা চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠ্‌ত—যমুনাতীরের বেতস বনের ধূলায় প'ড়ে তার হাতের মালা, আর অরিন্দমের হাতে জড়ানো চিত্রালীর দেওয়া বরমাল্য।

সে হয়তো ভুলে গেছে, তার স্মৃতির বেদনা আজো তাকে ধ্যানের আনন্দ দেয়, অন্তরলোককে চিরজ্যোতির্ম্ময় ক'রে তোলে।

গান

= শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায় =

ওগো তোমার নূতন যেথায় আয়োজন কি থাকবে মনে?
নতুন চেনার চিত্ত যেথায় আকুল হয় গো মধুর স্বনে।
বাজবে আমার হৃদয় পুরে,
ব্যাকুল করা নূতন সুরে,
ভোলার ব্যথায় কাঁদবো শুধু,
প্রিয়ার আশে নিরজনে?
যে দিন ত দূর ছিলে না, আজকে তুমি হও সুদূর;
আমার সমাধি-বুকে তোমার বাজাও বীণা সুর মধুর;
আশা, আমার আজ নিরাশা,
করলে মোরে সাতার-ভাসা
গীতি তোমার ইমন সুরে—
মিলিয়ে গেল সমীরণে।

গান

= শ্রীঅখিল নিয়োগী =

(শ্যাম) আর ত যাবে না কোলে—
জিবে তোর রাঙা রক্ত মাখা গো—
গলে দেখি নর-মুণ্ড দোলে!
স্বামী দেহ' পরে রাখিলে পা'খানি—
কোন নামে শ্যামা তোমারে বাখানি—
রাক্ষসী মাতা জানি জানি তবু—
তোর নামে কেন এ-মন ভোলে!

দৃষ্টিদান

≡ মাতৃরূপিণী ≡

ভালবাসার স্মৃতি

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

চলছিলো সে আপনার মনেই। চোখের দৃষ্টি ছিল তার আপনার সম্মুখস্থ পথে। তখন এসেছিল সে আধপথে। বাড়ী এখন বহুদূরে। এখনও তাকে অতিক্রম করতে হবে সুদূর বিস্তৃত শ্যামল মাঠ। তখন অস্তরবি নীল আকাশটাকে লাল আলোকে রাঙিয়ে দিয়েছিলো। ওর সেই ক্লান্তিমাখা ম্লান মুখখানার পরে এসে পড়েছিলো, সেই অস্তরবির বিদায় আলো। চলছিলো সে দ্রুত চরণে। ওর সাধ্যমতই। ও তার বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলো সেই অরুণোদয়ের সাথে সাথেই। কোনও প্রকারে দু'চারটি বাসী ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়ে ছিল কাজের পথে। পরিশ্রান্ত দেহটাকে বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে, ধরার বুকে সাঁজের আঁধার ঘনিয়ে আসবে। বাড়ীতে বুকভরা আশা নিয়ে তার ছোট ছোট তিনটি শিশু ব্যগ্রনেত্রে পথের পানে চেয়ে আছে—তাদের জননীর আসার প্রতীক্ষায়। ওর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? যার ঘরে আছে দের বছরের কোলের শিশু বালক। সেত অনায়াসে পারে' পরের মুখের পানে চেয়ে থাকৃতে! বিশেষ করে সে ত রমণী, সেত পারেই। অনায়াসেই সে পারে সে তার স্বামীর মুখের পানে চাইতে। ও কি পারে নিশ্চিন্তে আপনাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে। যার শিশু বালক স্তনপানের উপযুক্ত। উপায় কি! করতেই হবে তাকে কাজ। কারণ স্বামী তার একজন কুলী। কামায় সে চারি আনা, ছয় আনার উর্দ্ধে কোনও দিনই নয়। সংসারে দেয় ইচ্ছামত। আপনার সুখ বিলাসের জন্যে খরচ করে যদি বাঁচে। সরদা সবই বুঝতে পারে। নির্ব্বিকারে সয়ে যায়। কথা বলা দরকার মনে করে না। বিয়ের ছমাস পরে থেকে আপনার চেষ্টায় কাজ খুঁজে খুঁজে জোগার করে নিয়েছিলো। ভগবানের দয়ায় আজ দশ বৎসর সে একটা না একটা কাজ করেই। এতদিন সে কাজ করতো পরম নিশ্চিন্তে। কারণ তার মা থাকতো তাদের বাসার পাশেই। এতদিন তার প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান দুটির জন্যে কোনও ভাবনা ছিল না। দু বছর হোলো তার মা মারা গিয়ে, কোলের শিশুটিকে নিয়ে মহা বিব্রত হয়ে পড়েছে। দিন কয়েক সে নিয়ে গিয়েছিলো তার কোলের ছেলেটিকে তার কর্ম্মস্থানে। কিন্তু বালক পারলোনা সইতে সেই দুপুরের অসহনীয় রৌদ্র-বহ্নি। একদিন সে মুখচোখ লাল করে দেহ এলিয়ে দিল ধরার কোলে। তখন ডাক্তার এসে বলেছিলেন এত রদ্দুরে কচি ছেলে রাখা ন্যায় সঙ্গত নহে। তারপর দীর্ঘ দিনটা কি তার বুকের দুধে চলে! কাজেই সরদার বাধ্য হয়ে কোলের ছেলেটি আট বছরের মেয়েটির জিম্মায় রেখে কাজে যেতে হয়। সেই গ্রামে দু'চার ঘর ভদ্র লোকের বাস আছে। তাঁরা ওকে কত সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কতজন পয়সা দিয়ে দয়া দেখাতে গিয়েছেন। কতজন মুখের মিষ্টি কথায় বুঝিয়েছেন, তোমার কি কাজে যাওয়া সাজে, ওই ছোট্ট ছেলেটি ফেলে। আর ওই দুধের মেয়ে পারে কি সংসারের খুটিনাটি কাজ করতে, আবার ছেলে ধরতে। সরদা বড় একটা কারো কথার বেশী জবাব দিতোনা। "হ্যাঁ আর না"—এই দুটি কথাই সে সব সময়েই ব্যবহার কোরতো। সে জানে জগতে অন্যের কথামত চল্‌তে গেলে, শেষে নিজেকেই দুঃখের বোঝা বইতে হবে। এ যতই দুঃখ হোক না কেন তবু স্বাধীনতা আছে। তার স্বজাতিরা নিজের মনেই এই অদ্ভুত মেয়েটির কথা ভাবতো। কেউ আবার কখনও কখনও বলতো;

ঝগড়া করে, মারামারি করে খসমের কাছে আদায় করে নিবি পয়সা। সরদা কেবল এই কথা শুনে আপনার মনে হাসতো। তাদের জবাব দিতো—"আচ্ছা"—বস এই পর্য্যন্তই। সেদিন বড়বাবু তাকে তাঁর বাড়ী নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সে সম্মতও হয়েছিলো, কিন্তু ও যখন শুনলো তাকে দয়া করে কাজ দিতে চাইছেন, সে তখনই সে কাজ প্রত্যাখ্যান করলো। সে জানে—ভালভাবেই জানে, কারো অনুগ্রহপ্রার্থী হতে নেই, হলেই চিরকাল, চিরদিন তার মন যুগিয়ে চল্‌তে হয়। কারও অনুগ্রহ ভিক্ষা নেওয়ার চেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল—তার মতে। সে কদিন খবর পেলো সেখানকার একজন ভদ্রলোক তাকে চাইছেন, ছেলে খেলানোর কাজের জন্য। সে তখনই গিয়ে গিন্নীর সাথে কথাবার্ত্তা কয়ে কাজটা ঠিক করে এলো কাল সকাল থেকে যাবার। পাঁচ টাকা মাহিনা খাওয়া পড়া আছে। শুনে তার মনটা বেশ ফুল্ল হয়ে উঠেছিলো। যদিও অর্থের দিক দিয়ে নয়। কারণ সে দিনে আট আনা, দশ আনা কামায়। তবে সে নিতে চেয়েছিলো সাদরেই। কেননা বাড়ীর সন্নিকটে বাড়ী। ছেলেমেয়েগুলিকে চোখের সামনে রাখ্‌তে পারবে। তার ঐ আট বছরের মেয়েটারও পরিশ্রম একটু উপশম হতে পারবে। বাড়ীর কাছে বাড়ী হবে, এক আধবার ছুটী পেলে, এক আধবার এসে বাড়ীর কাজ কিছু কিছু সারতে পারবে। লক্ষিয়া কি পারে? যদিও সে এতদিন করেছে। ছোট বালতী বালতী জল তোলা কুয়া থেকে। ঘর নিকান, রান্না-বান্না, কাপড় কাচা, তারপর ভাইটিকে ধরা, তাকে খাওয়ানো নাওয়ানো। সন্ধ্যাবেলা সরদা কোলের ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুয়েছিলো। কাল থেকে কাজে যাওয়ার কথা মনে করতেই, মনটা আনন্দে নেচে উঠ্‌ছিলো। হৃদয়সাগরে আনন্দ'র বাণ ডাকছিলো যেন। লক্ষিয়া পাশে শুয়েছিলো। সে বল্‌লো "হ্যাঁ মাই, বিহান ত তু উ কোঠিমে কামমে যায়গা, ভাইয়া তোরা সাথ রহেগা। হাম যায়গা মাটী উঠানো কাম্‌মে। আচ্ছা না মাই?" পরম সোহাগভরে, আপনার বাহুর মালা জননীর কণ্ঠে পড়িয়ে দিলো। সরদা একটু মলিন হাসি হাসলো। এ হাসি আনন্দর হাসি নয়। বড় ব্যথায় আপনার অজ্ঞানিতে যে হাসি অধর কোণে দেখা যায় সেই হাসি। লক্ষিয়ার রুক্ষ চুলগুলির ভেতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে, ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে সরদা বল্‌লো "না বেটি তু কাম্‌মে নেহি যানে সাকেগা। হামই ওত্‌না দূর যানে বুক যাতা"—।

* * * *

কতদূর আরও কতদূর এখনও ত অনেকটাই পথ। আহা ছেলেটা বোধ হয় ক্ষিদেতে ছট্‌ফট্ করছে। ওই দুর্দ্দান্ত ছেলেকে কি আর লক্ষিয়ার সাধ্য দুধ খাওয়ানো। আজ যেন সন্ধ্যা দেবী খুব তাড়াতাড়ি তাঁর আঁচল বিছিয়ে দিলেন ধরার বুকে। না। তা নয়। সন্ধ্যাদেবী আপনার

নির্দ্দিষ্ট সময়েতেই দেখা দিয়েছেন। ওই দোকানদারটা দিল দেরী করে আজ। যাই তাড়াতাড়ি। সে তার গমনগতি আরও বাড়িয়ে দিল।

কুটীর-দ্বারে, ব্যাকুল হৃদয়, পথের পানে চেয়ে আছে— লক্ষিয়া, রুতুয়া, আর কুছমী। রুতুয়া তার বোহিনটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, একাদিক্রমে কেঁদে কেঁদে। লক্ষিয়া যত রকম সান্ত্বনার বাণী জানে সে সব ব্যবহার করেও আজ সে রুতুয়ার কাছে হার মেনে গেল। সে উৎসুক-নয়নে চেয়ে আছে সুদূর বিস্তৃত সবুজ মাঠের দিকে। আর রুতুয়া হাত-পা গুলি দিদির মাথায় পিঠে সজোরে ছুড়ে চীৎকার আরম্ভ করে দিল, সে অবিশ্রান্ত ভাবে কাঁদতেই লাগলো। কিন্তু সে যে কাঁদছিলো, তাতে তার কোনও ত্রুটী নেই। সে যে মধুমাখা বাণী শোনার আশায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল, সবার আগে তার শ্রবণেই পশেছিল সেই বাণী। তাই সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারেনি। শরতের রৌদ্রের মত, তার মুখখানায় স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটে উঠলো। ক্ষণকালের মধ্যেই আবার বর্ষণ। সে ভেবে পেলোনা, হাসবে কি কাঁদবে। আনন্দ যে ধরে রাখতে পারছে না, কিন্তু অভিমানও এসে দাঁড়াচ্ছে তার পাশে, কেন মা এতো দেরী করে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের কোলে। সরদা তার পরিশ্রমের ভার ক্লান্তি মাখা, দেহখানা এলিয়ে দিল, দাওয়ার পরে, শিশুটিকে বক্ষে নিয়ে। লক্ষিয়া একখানা পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো। কুছমী এক গেলাস জল এনে মাকে দিল। সরদার প্রাণে শান্তিবারি সেচন করল। দুই বোনের সেবা। কিন্তু তার ক্লান্তি আগেই মুছে গিয়েছিলো তাদেরই পরশে। তাদেরই হাসিতে।

"মায়ী এতনা দের হুয়া কাহে আজ, আর উধার কাঁহা গিয়াতা ?" কুছমী জিগেস করলো।

সরদা উঠে বসল, আঁচলের গিড়ো খুলতে খুলতে বললো, "ওই বাবুকো নোকার ফিন্ বোলানে গিয়াতা, ঐ সাবাস্তে একদফে মুলাকাত কবৃকে আয়া সামঝায়কে বাল্ দিয়া হাম কাম নেহি করেগা রোজ রোজ দিগ্দারী হামরা আচ্ছা নেহি লাগ্তা।"
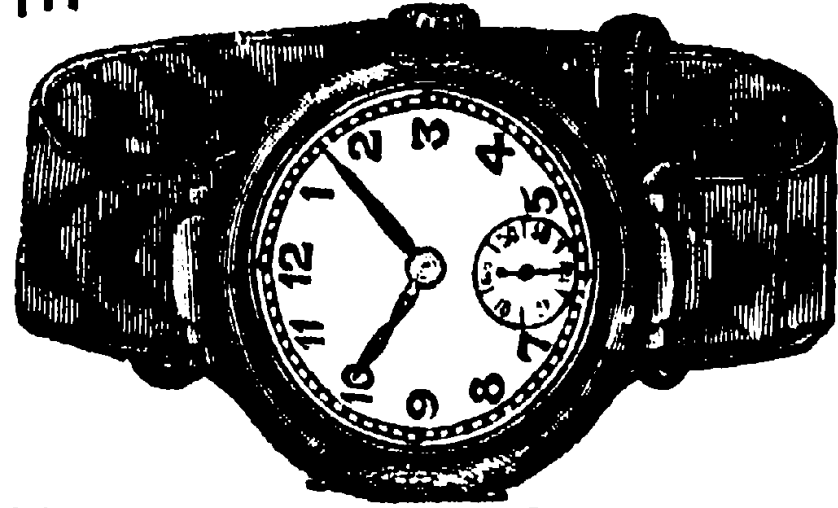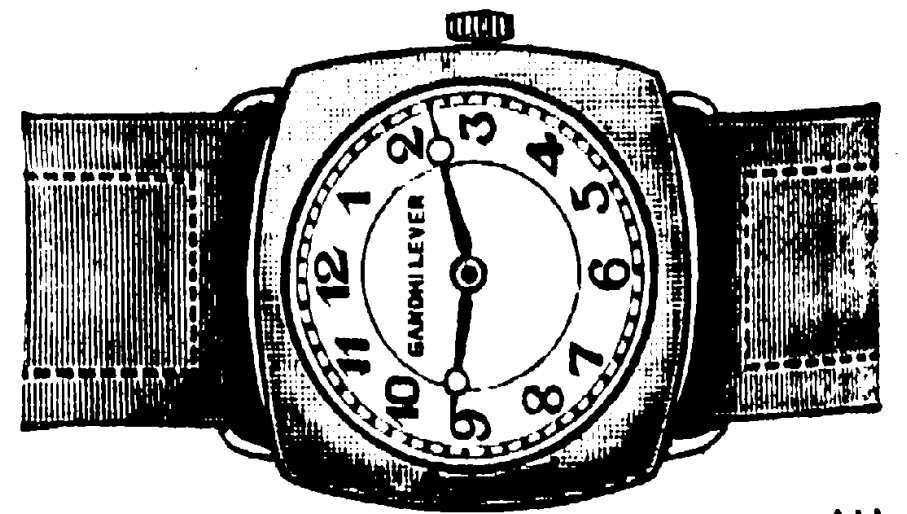
চারটে মুরকীর মোয়া রুতুয়া কুছ্‌মী লক্ষিয়ার হাতে দিল। দুই বোন তিনটির অধর কোণে খুসির হাসি উছ্‌লে পড়লো। নিবিষ্টচিত্তে তিনজনে আহারে মনোযোগ দিল। তখন সরদা দুঃখকে ডুবিয়ে দিল আবার আপনার বাড়ীর কাজে।

* * * *

দু'চার মাস পরের কথা।

তখন অপরাহ্ণ। দুপুরের রৌদ্রের তাপ ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসছে। সরদা বসে আছে তাদের দাওয়ার উপরে। তার মনটা ছিল তখন গভীর বেদনায় ভরা। সেই বেদনার ছায়া, তার মুখখানার পরে স্পষ্টভাবেই দেখা দিয়েছে। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদরের দুহিতা ইলা দেবী এল সরদার কুটীরে। তার দুটি হাত ধরে নাচতে নাচতে এলো কুছ্‌মী আর দুরুয়া।

ইলা বল্‌লো, "কিরে সরদা, আজ কাজে যাস্‌নি? মুখ এমন শুকনো কেন? অসুখ করেনি ত! চল মেলা দেখে আসি"। চপলকণ্ঠে কথার ঝরণা খুলে দিয়ে ইলা জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে রইলো, তার মুখের পানে।

সরদার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিলো। মুখ হতে বাণী সরছিলো না। সেই ক্ষণকালের মাঝেই আঁখি হতে বিগলিত ধারায় টপ্‌ টপ্‌ অশ্রু ঝরে পড়ল।

ইলা বুঝলো, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গভীর; তা না হলে সরদার চোখে জল! সে নির্ব্বিকারে সয়েছে সংসারে কত দুঃখ, কত দৈন্য, কত নির্য্যাতন, কত লাঞ্ছনা, কেউ কখনও তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখেনি। বরং দেখেছে তার পরিবর্ত্তে, তার মুখে তেজের দীপ্তি, আর অবজ্ঞার হাসি, আর তাচ্ছিল্যের ভাব। কেবল এই গ্রামের মধ্যে একটি মেয়ে তার মনের পরিচয় পেয়েছিলো মাত্র দু এক দিনের আলাপেই। ইলা মসৌরি বোর্ডিংএ থাকে। তিন মাসের ছুটীতে পিতার কাছে বেড়াতে এসে, এই সরদার মন জয় করে নিয়েছিলো। ইলা বুঝেছিলো, এই মেয়েটি ছোট ঘরের হলেও, হৃদয় তার উঁচু। ব্যবহার তার বড়ই মধুর। তার সব চাইতে ভাল লেগেছিলো, তার সেই—শান্ত শ্যামল মুখের উপর যে কমনীয়তার মাধুর্য্য বিরাজ করতো। আদেঃ দুচারদিনের আলাপেই তারা উভয়ে উভয়কে প্রীতির বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিলো। সরদার মনে যে সঙ্কোচের ভাবটা ছিল, সেটাও ইলার হাসিতে, গল্পতে কেটে গিয়েছিলো তার মন থেকে। ইলার সাথে, সরদার সাক্ষাৎ হত রোজই, সরদার কর্ম্মস্থানে। ইলা প্রত্যহ সান্ধ্য-ভ্রমণ সাঙ্গ করতো, সরদার কাজের জায়গায়। তারপর উভয়ে উভয়ে গল্প করতে করতে বাড়ীর পথে ফিরতো। এমনি ভাবে তাদের আলাপটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে হয়ে উঠেছিলো। অদূরে দাঁড়িয়েছিলো লক্ষিয়া। ইলা ব্যথা-ভরা চোখে তার দিকে চাইলো।

লক্ষিয়া ভারি গলায় বল্‌লো, "আজ মেলা আছে কিনা, তাই মা বলেছিলো, মেলা থেকে আমাদের কিছু কিনে দেবে, মার বাক্সতে চার আনা পয়সা ছিল, মা দেখ্‌লো সেটা হারিয়ে গিয়েছে। তাই মার দুঃখ হয়েছে।

ইলা বুঝলো ব্যথা পাবারই কথা। হঠাৎ তার মনটা ফুল্ল হয়ে উঠলো, একটা কিছুদিন আগের ঘটনা স্মরণ হতেই। কিন্তু সে মোটেই ব্যথা পেলো না পয়সাটা হারানোর জন্যে। বরং তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে এসে সরদার কণ্ঠালিঙ্গন করে, অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি আপন রুমালে মুছিয়ে দিয়ে, স্মিতহাস্যে ঠোঁটদুটো রঞ্জিত করে বল্‌লো, "দিদি মনে নেই সেদিন যে আমি তোর কাছে লটারীর টিকিট কেনার পয়সা চাইলাম, তুই ত ওই টিনের বাক্সটা থেকে দিয়েছিলি, মনে এসেছে এখন।"

বিস্মৃত কথা মনে আসতেই, সরদা ফিক করে হেসে ফেল্‌লো লাজরক্তিম অধরে।

"সে বল্‌লো, চল ইলি সাঁঝ হয়ে আস্‌ছে মেলা থেকে ঘুরে আসি আজকে তোর একটা টাকা খরচ করিয়ে ছাড়ব।" চপল কণ্ঠে ইলা বল্‌লো, "দেখ্‌ আগে কে কার পয়সা আজ খরচ করায়, এই নে তোর সেই চার আনা পয়সার পরিবর্ত্তে, ভগবান তোকে যা মিলিয়ে দিয়েছেন।

সরদা গভীর বিস্ময়ে, অপলকে চেয়ে রইল, যে হাজার টাকার নোট ইলা গুণেই চলেছিলো—তারই পানে।

বিজ্ঞাপনের ছিদ্র

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রায়ই শুনিতে পাই বিজ্ঞাপনদাতারা অনুযোগ করেন য়ে বিজ্ঞাপন দ্বারা উপযুক্ত ফল পান না, এই অনুযোগ এত বেশী হইতেছে যে এ সম্বন্ধে সকলের বিশেষ ভাবে ষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণ নেকেই ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিজ্ঞাপনের হায্যেই ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে পারা যায় কিন্তু থাপি এই অনুযোগ—কেন ?

কোন কোন স্থলে দেখা যায় বিজ্ঞাপনদাতা নিজেই হার বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল থাকেন না—টাকা ছে লোকে বলে—তাই বিজ্ঞাপন দেন—কিন্তু কি ভাবে—থায় কেন বিজ্ঞাপন দেন সে বিষয়ে সংবাদ রাখা বিশেষ য়োজনীয় মনে করেন না—আবার তাঁহাদের অনেকেই খনে সেখানে গল্প করেন—এত টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ লাম—কই ফল ত পেলাম না। ফল পেলেন না তাঁহাদের জেদের বিজ্ঞাপনের প্রতি উদাসীনতার জন্য—তাঁহারা ক্টি বিদেশী ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন পাঠ করুন—দেখুন কি বে তাঁহারা বিজ্ঞাপন করে—কিরূপ উপযুক্ত স্থানে কেমন দর ও সুচিন্তিত লেখা তাঁহাদের বিজ্ঞাপনে—তাহার জন্য ই না যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছে, এই কারণেই ত তাঁহারা ত দূরদেশ হইতে এখানে ব্যবসায় প্রসার করিতে সমর্থ ইয়াছেন। এক এক সময় দেখা যায়—দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ত্রবস্ত্রের বিজ্ঞাপন চলিতেছে ইহাকে কি বিজ্ঞাপন করা লে ?

এই জন্যই বিজ্ঞাপন করিতে হইলে বিশেষজ্ঞের উপর র্ভর করা উচিত। তাঁহারা ঠিক করিয়া দিবেন যে কি কারের বিজ্ঞাপন কোথায় কোন সময় দেওয়া উচিত। জ্ঞাপনের ভাষা কিরূপ হইবে এবং সাজান বা কেমন ওয়া উচিত। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে উপরিউক্ত সাহায্য দান করিবার জন্য বিজ্ঞাপন-এজেণ্ট আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল এত বেশী এজেণ্ট গজাইয়াছেন যে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে দাম কাটাকাটি লইয়া ব্যস্ত কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাগণকে প্রকৃত সাহায্য দানে বিমুখ। এইরূপ এজেণ্টগণকে সংবাদপত্র কিংবা বিজ্ঞাপনদাতা কেহই যদি কাজ করিতে না দেন ভাল হয়। সংবাদপত্র সকলের দেখা উচিত যে তাঁহাদের এজেণ্ট বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে চাহেন তাঁহাদের সত্যই বিজ্ঞাপন লিখিবার এবং বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে উপযুক্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা আছে কিনা। আর সকলের চেয়ে বেশী দেখা দরকার বিজ্ঞাপনদাতাগণের। নিজের তরফ হইতে যে এজেণ্ট আসিয়া নিজ অংশ হইতে দাম কমাইয়া দিয়া কাজ লইতে চায় তাহাকে একেবারে বিদায় করা আবশ্যক, কেননা সে ঐরূপ করিয়া কখনও উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারে না। বরং ভাল বিজ্ঞাপন লিখিবার জন্য "ডিজাইন" করিবার জন্য যদি আবশ্যক হয় "সার্ভিস ফি" দিয়া উপযুক্ত এজেণ্টের হস্তে বিজ্ঞাপনের ভার দেওয়া লাভজনক। বিজ্ঞাপন এজেন্সী বিভাগে শিক্ষিত লোকের বড়ই অভাব তাঁহারা যদি এদিকে আসেন বোধ হয় বেশ উন্নতি করিতে পারেন।

এতক্ষণ গেল বিজ্ঞাপনদাতার ত্রুটীর কথা কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, সুচারুভাবে বিজ্ঞাপন দিয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। ছিদ্র কোথায় ? অনুসন্ধানে জানা যায় যে বাজারে বহু পরিমাণ বিজ্ঞাপিত আসল জিনিষের বদলে নকল চালান হয়। অবশ্য যাহারা ট্রেড মার্ক, লেবেল বা প্যাকেট নকল করে আইনের সাহায্যে দণ্ডিত হয় কিন্তু কখন কি ভাবে নকল হইতেছে তাহার প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আর এক প্রকার আসলের বদলে নকল যাহা বাজারে প্রত্যহ চলিতেছে

তাহার জন্য সকলের সমবেত চেষ্টা করা উচিত। প্রায়ই দেখা যায় যে প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞাপিত কোন জিনিষের জন্য চাহিলেই তাহার পরিবর্ত্তে নকল আর একটি দেখাইয়া জবাব দেয়—এইটি নিন প্রায়ই একরকম অনেক সুবিধা প্রভৃতি এবং এইরূপে নকল জিনিষটি ক্রেতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয়। খুবই কম লোক আছেন যাঁহারা দোকানদারের দালালীতে না ভুলিয়া সেই জিনিষটির জন্য ধরিয়া বসেন এবং না পাইলে ফিরিয়া যান। এইরূপে বিজ্ঞাপনের অনেক ফললাভ ব্যবসায়ীর ঘটিয়া উঠে না। এই উপদ্রব অনেক ব্যবসায়ী ইদানীং সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন এবং স্ব স্ব দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পৃথক পৃথক দোকান খুলিতেছেন। কিন্তু মনে হয় যে ব্যবসায়িগণের সমবেত চেষ্টা অর্থের সুবিধার দিক হইতে এবং শীঘ্র কার্য্য-কারিতার দিক হইতেও বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। এ কারণ ব্যবসায়িগণকে অনুরোধ করা যাইতে পারে যে তাঁহারা বিজ্ঞাপনের দোষ না দিয়া ছিদ্র কোথায় বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। এবং সেই ছিদ্র সংশোধন করিতে পারিলেই ফল পাইবেন। নতুবা ছিদ্র-বিশিষ্ট পাত্রে জল রাখিবার ন্যায়—বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় বৃথা হইবে।

মানুষ-পাখীরা

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পাখীরা সাঁঝের বেলা উড়ে যায় কোন্ পারে!
পাখীরা সাঁঝের বেলা উড়ে যায় ওই পারে;
শ্রমভারী পাখাভরে
আকাশের পথ ধ'রে
মিশে যায় ঘননীল নীলিমার একধারে;
—কোন্ ধারে?
স্বাধীন জগতে তার প্রাণ-প্রিয় কুলা-দ্বারে।

মানুষ-পাখীরা সব একে একে কোথা যায়!
মানুষ-পাখীরা সব একে একে উড়ে যায়;
জীবনের ধূলি ঝেড়ে'
পরিচিত পথ ছেড়ে
কোথা যে উধাও হয় জানে না তা' নিজে হায়;
—তবু হায়,
পৃথিবী-পিঁজরখানা খোলা পেয়ে নীড়ে ধায়।
মানুষ-পাখীরা সব নিরুদ্দেশ নীড়ে ধায়।
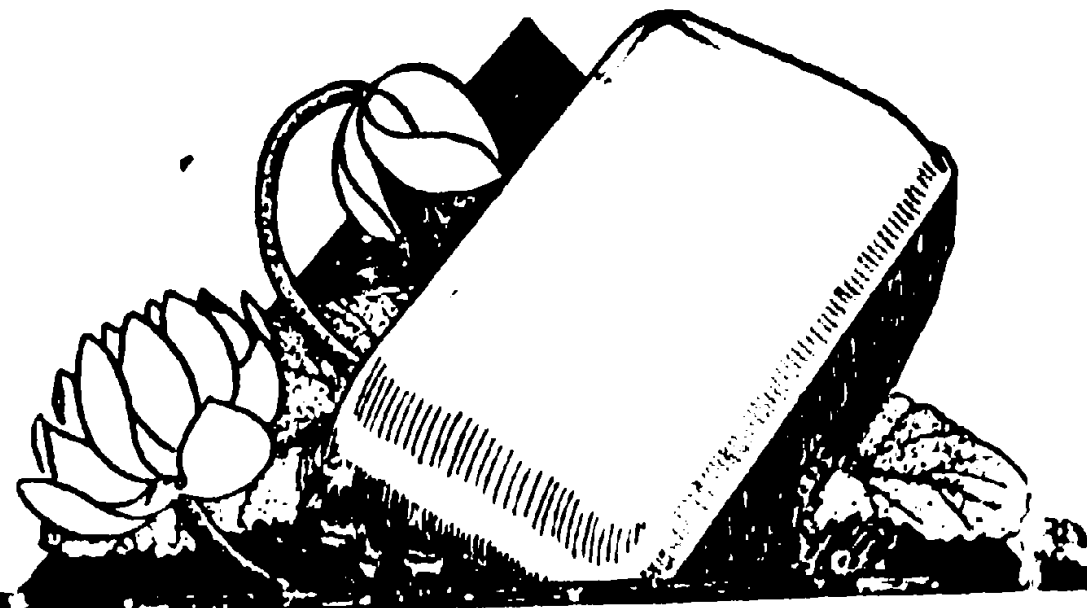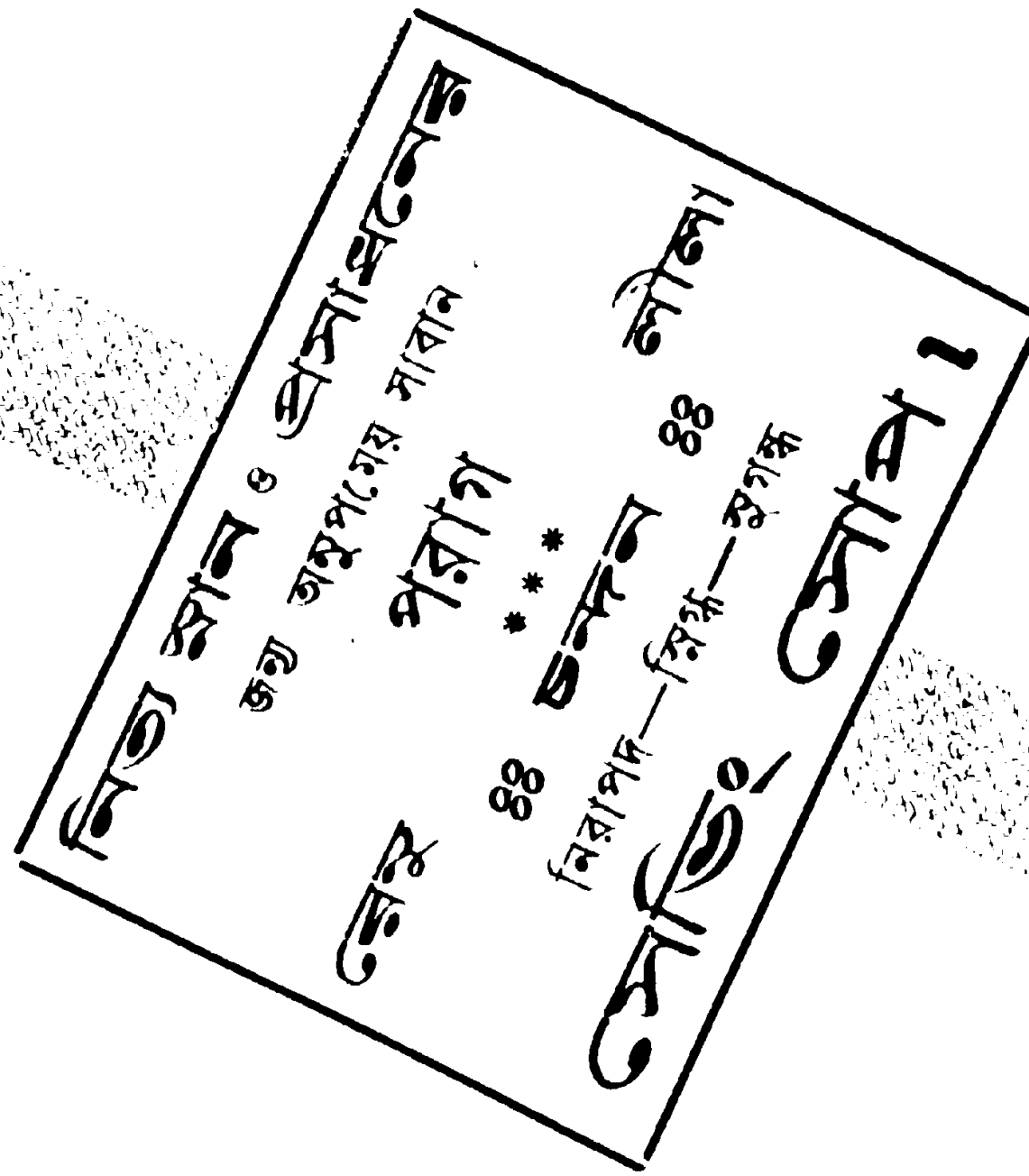
=আগমনী=

কেন ?

(গল্প)

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল বি, এল
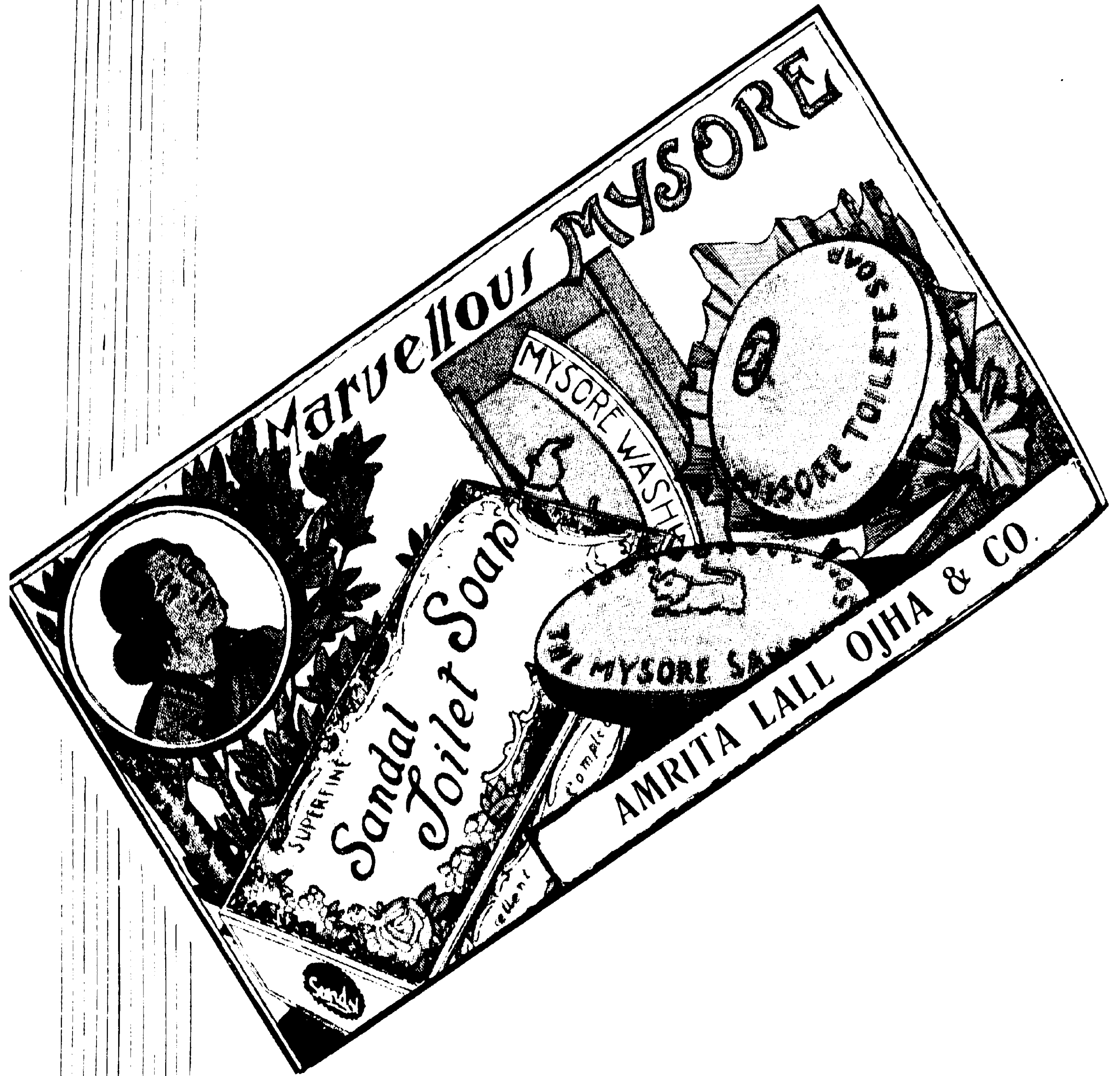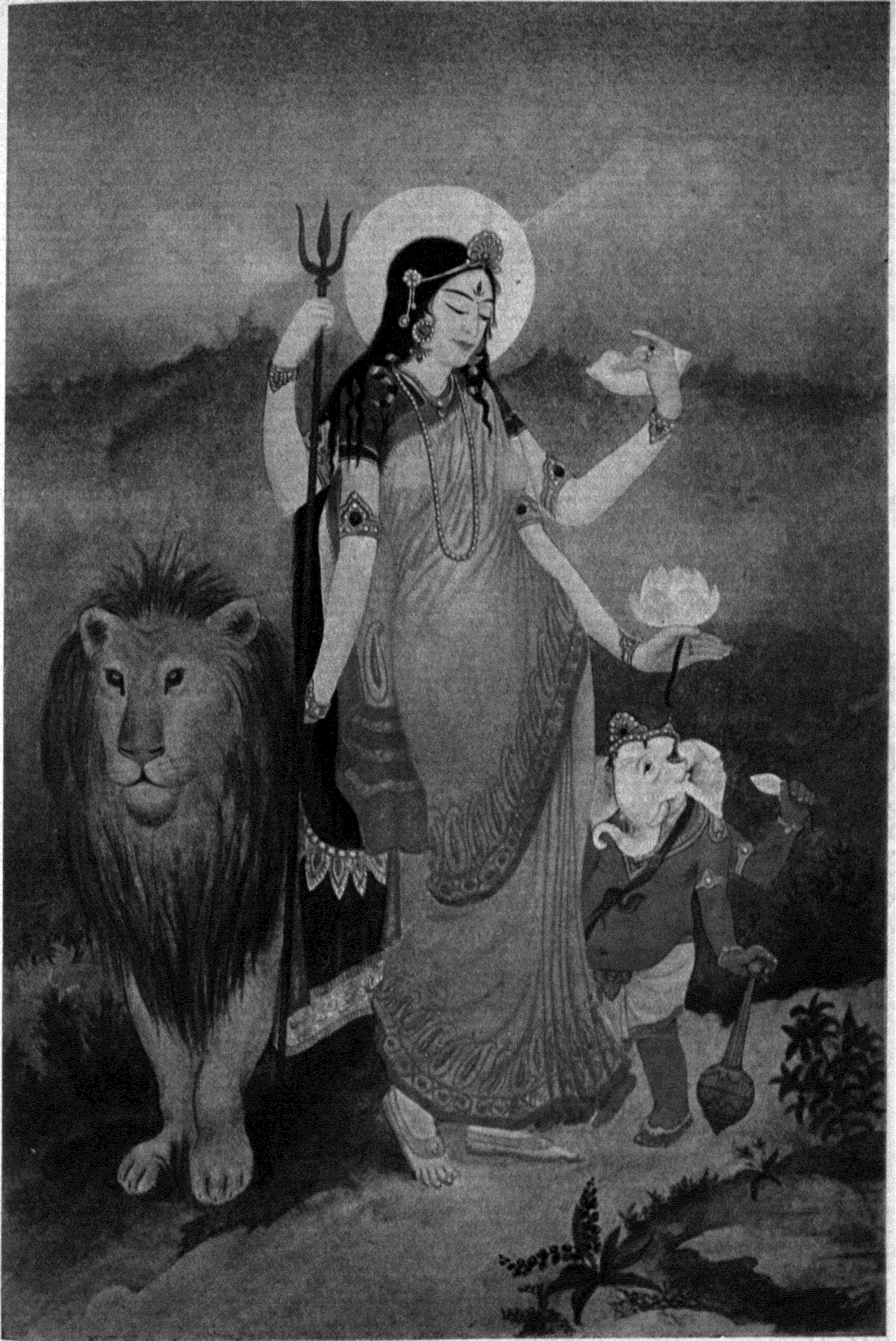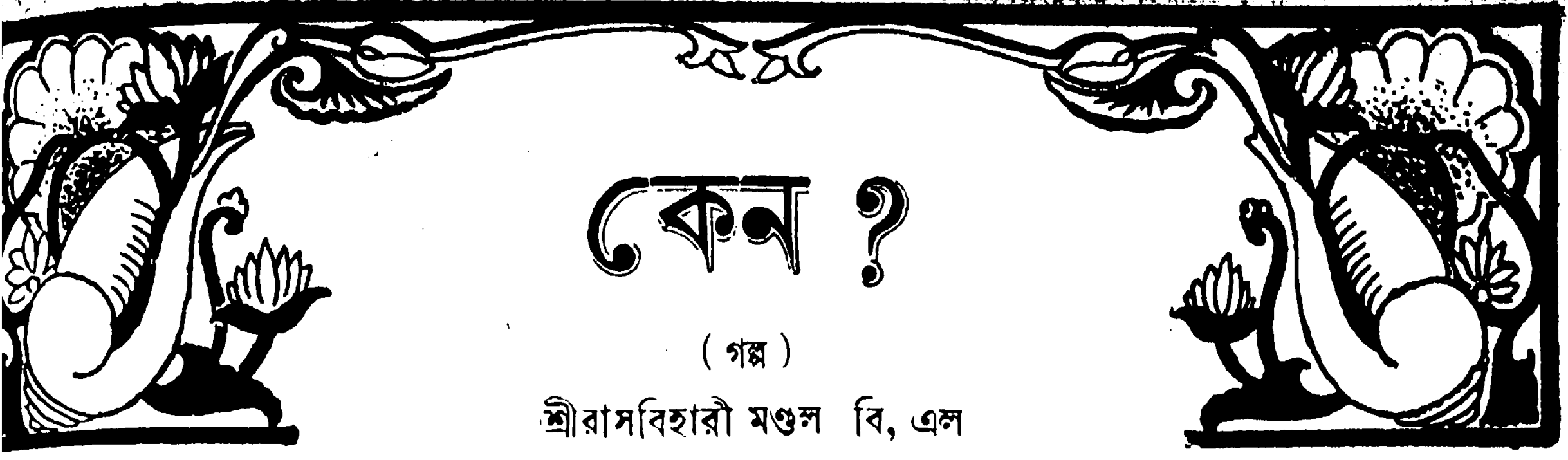
ভোর হ'তেই পাখীর কলরবের সঙ্গে জেগে ওঠে তার এস্রাজের ঝঙ্কার! ভোরের হাল্‌কা বাতাসে কেঁপে কেঁপে সে সুর শূন্যে মিলিয়ে যায়, তন্দ্রার আবেশের মতো! পল্লার সকলেই সে সুরের সাথে পরিচিত, সকলেই জান্‌তো বুকগুলো শুক্‌নো তার নিংড়ে বের করচে, ঐ অপরূপ সুরের রেশ, সুবোধের সুনিপুণ আঙুল!

সে কাজ করে চকের মোড়ের ঐ দোকানে। চকের ধারে হিন্দু-মুসলমানের দোকান। সুবোধকে জানে না, তাকে চেনে না, তাদের মাঝে এমন একজনও ছিল না। সকলেই তাকে ভালোবাসে, সকলেই তার বাজ্‌নার প্রশংসা করে। প্রভাতের আলো ফুটে উঠতেই সে বাজ্‌না বন্ধ ক'রে কাজ সুরু করে, সে কাজের শেষ হয় গভীর রাত্রে। তারই মাঝে সময় ক'রে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, বিশ্রামের প্রয়োজন হ'লে অবসর মত এস্‌রাজটি কোলে নিয়ে বসে। কাজের মাঝে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গান গায়, কখনও নিজের মজাতে গলা ছেড়ে দেয়। কাজে উৎসাহ অদম্য, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই যন্ত্রের মতো কাজ ক'রে চলেচে। আনন্দে মুখখানি উদ্ভাসিত! সুললিত কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত! সুরের রেশে বদ্ধ ঘরের বাতাস আগ্রহে কাঁপতে থাকে। প্রতীক্ষারত খরিদ্দারদল উন্মুখ হ'য়ে তার গান শোনে। সে গান ঝর্‌ণার সুরের মতো অবারিত আনন্দে তার কণ্ঠ হ'তে ঝরে পড়ে। তার গানের ছন্দে গাঁথা বাঙলার শস্যভরা মাঠের শ্যামলতা, ছায়ানিবিড় বনানীর মর্ম্মরতা, কূলভাঙ্গা তটিনীর চঞ্চলতা! কবে সে বাঙলা ছেড়ে দিল্লীতে এসেচে, আজো সে ভুল্‌তে পারেনি তার বাঙলা মায়ের সুশ্যামল ছায়াকোমল অঞ্চলের মাদকতা, সময়ে অসময়ে মন তার ছুটে যায় সেই সুদূর পল্লীর বুকে! কী গভীর সে ব্যাকুলতা!

গানের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে, কী সে আগ্রহ-ব্যাকুল কাতরতা! মন যেন উদাস হ'য়ে ছুটে যায়, সীমাহীন অনন্তের পানে, সে যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বুকফাটা কান্নার রেশের মতো গানের সে আর্ত্তসুর শ্রোতার বুকে আছড়ে প'ড়ে তাদের আকুল ক'রে তোলে।

বাঙালীর ছেলে সে, কবে যে সে বাঙলা ছেড়ে দিল্লীতে এসেচে তার ইতিহাস কারুর জানা নেই। তবে আজো তার মনে পড়ে সেই কোন্‌ বাল্যকালে তার পিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে এসেছিল চাক্‌রী করতে। তারপর সহসা একদিন নিঃসহায় তাকে বিশ্বের পথে একা ছেড়ে দিয়ে পিতা তার চোখ বুঁজলে আর সে এই প্রবাসে ঝড়ের পাখীর মতো একটা নিরাপদ স্থান খুঁজে বেড়াতে লাগল'।

বাঙলার কথা বল্‌তে পেলে সে মেতে উঠতো, বাঙলা ও বাঙালীর কথা শুনতে পেলে গর্ব্বে তার দেহখানা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতো, নিজেকে সে পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিতো, কল্পনার হাতে,' কত স্বপ্ন দেখতো সবুজ ঘাসের মখমল পাতা বাঙলার মাঠ! নদীর তীরে, বটের ছায়ে রাখাল বালকের বাঁশীর ধ্বনি, মর্ম্মরিত বনবীথির গন্ধব্যাকুল আহ্বান!···এমনি সব আকুল করা স্বপ্নের ঘোরে সে অভিভূত হ'য়ে থাক্‌তো।

ঘনিষ্ঠভাবে যে-ই তার সঙ্গে মিশেচে, সে-ই তার অন্তরঙ্গতার মাঝে সন্ধান পেয়েচে তার ব্যাকুল বুকের বেদন-ব্যথা। সে যখন প্রাণ দিয়ে গাইতো বাঙ্‌লার গান, যখন বাঙ্‌লার কথা বল্‌ত, তখন তার মুখের চেহারা এম্‌নি বদ্‌লে যেতো দেখ্‌লে মনে হতো তার অন্তরাত্মা একটা অব্যক্ত কাতরতায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌চে, খাঁচার বন্দী পাখীর মতো সে যেন লুব্ধনয়নে ঐ অসীম, অবারিত আকাশ-বুকের

পানে চেয়ে আছে। চোখে মুখে তার ফুটে উঠ্‌তো সকরুণ সজলতা!

যদি কেউ জিগ্‌গেস কর্‌তো, তুমি দেশে ফেরোনা কেন সুবোধ?

সুবোধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিতো, পয়সা পাবো কোথা, সে কি এখানে? পথ খরচ কি কম? তারপর কিছু পয়সা হাতে না নিয়েও তো দেশে যাওয়া চলে না?

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে দোকান ঘরের ভিতরে ব'সে সুবোধ এস্রাজের তারের বুকে ছড় টেনে একটা করুণ রাগিণী বাজাচ্ছিল। দোকানের সাম্‌নে পথবাহী যাত্রীর দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে বাজ্‌না শুনছিল। সুবোধ বাজাচ্ছিল ভেতরের ঘরে, বাইরে হ'তে সে ঘর দেখা যায় না।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো একখানা টাঙ্গা। টাঙ্গাখানা সামনে দাঁড়াতেই ভিড় সরে গেল, টাঙ্গা হ'তে নেমে একটি মেয়ে সোজা দোকানের ভিতর ঢুকে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো।

হিন্দুস্থানী চাকর লছমন সামনে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই মেয়েটি বল্‌লে, এক বোতল মিঠাপানী। চাকরটা ভিতরে যেতেই সুবোধ তার সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালো। সুবোধকে দেখেই মেয়েটি ঈষৎ হেসে বল্‌লে, আপনিই বুঝি বাজাচ্ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা আপনি বাজ্‌না বন্ধ ক'রে উঠে এলেন কেন? কিছু মনে কিছু না করেন তো সত্যি বলি, আমি আপনার বাজ্‌না শোন্‌বার লোভেই দোকানে এসেছি, মিঠাপানীর লোভে নয়।

সুবোধ সলজ্জ দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটির মুখের পানে চাইলে। কী যে বল্‌বে ভেবে পেলে না।

মেয়েটি হাসিতে ঠোঁট্ ভিজিয়ে বল্‌লে, এই পথে যেতে যেতে আরো ক'বার আপনার বাজ্‌না শুনেছি, কিন্তু সাহস ক'রে ভেতরে আস্‌তে পারিনি। আজ আর লোভ সামলাতে পারলুম না। আপনার পূরবীর ঐ করুণ ঝঙ্কার মনের মাঝে এমনি একটা আবেশ এনে দিলে যে আমি না এসে থাক্‌তে পারলুম না। ভারী চমৎকার আপনার হাত! আপনি কার কাছে শিখ্‌লেন এ বিদ্যে।

মৃদু হেসে বিনয়ের সুরে সুবোধ বল্‌লে, কী বা জানি যে শিখ্‌ব'।

মেয়েটি হেসে দীর্ঘায়ত চোখে কটাক্ষ হান্‌লে।

এমনিভাবে অপরিচয়ের আড়াল ভেঙ্গে এই মেয়েটির সাথে সুবোধের পরিচয়ের সূত্রপাত।

মেয়েটির নাম হীরা। দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাইজী হীরাবাঈ। তার অপরিসীম তরুণ রূপযৌবনের খ্যাতিতে দিল্লী শহর উন্মুখর। যার মুখের এক টুক্‌রো হাসি বা সুকণ্ঠের একটু সাড়া পাবার জন্য অজস্র অর্থ নিয়ে কত শত ধনী তার দ্বারস্থ হয়, সেই হীরার আজ এম্‌নি অযাচিত আলাপে সুবোধ বেশ একটু বিস্মিত হ'য়ে গেল।

সম্পূর্ণ একটি সন্ধ্যার আলাপে সুবোধের মনে হ'তে লাগল, এ-যেন তার কতদিনের চেনা, একে যেন সে চেনে বহুদিন হ'তে। চির-চেনার মতোই সে এলো অপরিচয়ের আগল ভেঙ্গে, মিলন-কাতর বুকে তার চির-জাগ্রত, চির-শঙ্কিত কামনা নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌লো। সুবোধের সারা দেহে পুলকের রোমাঞ্চ জেগে উঠ্‌ল'—দেহের রক্ত শির্ শির্ ক'রে মাথার পানে ঠেলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

স্বপ্নের মতো হীরাকে আশ্রয় ক'রে সুবোধের দিন কাটে স্বপ্নের ঘোরে। হীরা তার কাছে এস্‌রাজ শেখে। বিকেলের দিকে সুবোধ আসে হীরার বাড়ীতে। হীরার সজ্জিত ঘরের মূল্যবান আস্‌বাব পত্তর দেখে সে বিমূঢ়-বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌তো, তার সুপ্রশস্ত, সুকোমল শয্যার ওপর বসতে সে সঙ্কোচ বোধ করতো। কিন্তু হীরার সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা, তার দরদী হৃদয়ের সকরুণ সহানুভূতির স্পর্শে সুবোধের সঙ্কোচ গেল কেটে। সে যতক্ষণ হীরার কাছে থাক্‌তো ততক্ষণ মন তার এক অলৌকিক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতো। একটা তীব্র নেশার ঘোরে তার চেতনা লুপ্ত হ'য়ে আস্‌তো, মূর্চ্ছার তরঙ্গ এসে হৃ-হৃস্থাসে তাকে গ্রাস করে ফেল্‌তো।

ক্রমে সে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো হীরার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বিশ্রম্ভালাপে। অসহিষ্ণুতা, উন্মাদনার আবরণ গেল কেটে। আস্তে আস্তে নেশার মতো আলাপের এই সহজ ধরাটিকে সে বেশ আয়ত্ত ক'রে ফেল্‌লে, পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে!

হীরা ডাকে, ওস্তাদ!

সুবোধ উত্তর দেয়, বাইজি!

—তুমি শুধু ঐ স্বদেশী গান গাও কেন?

সুবোধ এস্‌রাজে সুর বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দেয়, দেশকে ভালোবাসি বলে। তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ পেলে না।

হীরা মুহূর্ত্ত মৌন থেকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, তুমি নিজের দেশকে ছাড়া আর কিছু ভালোবাস না ওস্তাদ?

উত্তরে সুবোধ শুধু হীরার মুখের পানে চেয়ে হাসে। হীরার সমস্ত মুখখানা লাল টক্‌টকে হ'য়ে ওঠে। সুবোধের মনে হলো, ভয়ানক সুন্দর ঐ লজ্জারক্ত মুখ!

পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল, হীরা মাথা নীচু ক'রে চুপচাপ ব'সে অকারণে মাথার বিনুনীটা টানাটানি করচে।

এস্‌রাজে সুর বেঁধে সুবোধ হীরার হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলে, সেই 'ছায়ানট'-খানা বাজাও।

হীরা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, ভালো লাগ্‌চে না, তুমি একখানা বাজাও, আমি শুনি।

সুবোধ তীব্র দুইচোখ বিস্ফারিত করে এস্‌রাজটা কোলে তুলে নিলে।

সুবোধ এস্‌রাজে ঝঙ্কার তুল্‌লে। উঃ! কী করুণ সে সুর! যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো। সুবোধ যেন ক্রমশঃ অচেতন হ'য়ে বাজনার মধ্যে ডুবে গেল। অনুভূতি নেই, চেতনা নেই, সব নিমেষে তার চেতনা হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল। ভুলে গেল, সে নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে, পার্শ্বোপবিষ্টা রূপসী হীরার অস্তিত্বকে! মুক্ত পাখীর মতই সে যেন কণ্ঠে গানের ঝঙ্কার তুলে শূন্যের পর শূন্য অতিক্রম করে চলেছে।

বাজনার মাঝেই একসময় হীরা বল্‌লে, উঃ! এতো করুণ সুরও তুমি বাজাতে পারোনা। ভারি কান্না পায় আমার। অথচ কান্না আমি মোটেই পছন্দ করি না।

অপ্রস্তুত হ'য়ে সুবোধ তার পানে চায়। হীরা বলে, আজ বাজ্‌না থাক্, তার চেয়ে তোমার দেশের কথা বল, শুনি।

সুবোধের মুখে তুব্‌ড়ী ছোটে। সে অনর্গল ব'লে যায় তার দেশের কথা। তার দেশের মানুষের কথা—তাদের সভ্যতার ইতিহাস।

হীরার মনে হয় তার বর্ণনার কাহিনী যেন সচল ছবির মতো তার চোখের সামনে দিয়ে শাঁ শাঁ ক'রে ছুটে চলে গেল।

হীরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে। উত্তেজনার আতিশয্যে তার মুখখানা আকর্ণ রাঙা হ'য়ে উঠেচে। ব্যগ্র দুটি চোখ সজল, ভারী হয়ে আস্‌চে। সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘায়ত বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

হীরা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, তোমার দেশকে যদি তুমি এতো ভালোবাস ওস্তাদ, তুমি দেশে যাওনা কেন?

সুবোধের বিবর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে ওঠে নিষ্প্রাণ হাসির রেশ।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উত্তর দিলে, গৃহহারা পথের ভিখারীকে গৃহের স্বপ্ন দেখিয়ে লাভ কি বাইজী!

হীরা সকাতর অনুনয়ের সুরে বল্‌লে, সত্যি ওস্তাদ, আমি ঠাট্টা করিনি। বল, যদি তুমি তোমার দেশে ফির্‌তে চাও, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

বিস্ময়ে হীরার মুখের পানে চেয়ে সুবোধ বল্‌লে, সে সৌভাগ্য কি কখনো আমার হবে?

—কেন হবে না? বল তুমি যেতে চাও, আমি আজই তার ব্যবস্থা কর্‌ব'।

—কী ব্যবস্থা কর্‌বে বাইজী, আমার যে এক কপর্দ্দকও সঙ্গতি নেই। আমার চল্‌বে কেমন করে? আমি কি নিয়ে ফির্‌বো?

—তার ব্যবস্থা আমি কর্‌ব'।

একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সুবোধের মুখখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাইজীর ঘরে বিরাট জলসা। সুবোধের ডাক এলো। শহরের সম্ভ্রান্ত ধনীর দল হীরার গৃহে সমবেত। সুবোধ সঙ্কুচিত হয়ে আসরে গিয়ে বস্‌লো। হীরা সুবোধকে নিজের ওস্তাদ বলে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে এবং তাদের জানিয়ে দিলে যে ওস্তাদের সম্মানার্থ এই জলসার আয়োজন। তিনি বহুদিন পরে গৃহে ফিরবেন।

হীরার নৃত্যগীত সুরু হলো। সুবোধ এস্‌রাজে সুর তুল্‌লে। দর্শকেরা সুবোধের বাজনায় মুগ্ধ হ'য়ে তাকে প্রচুর পুরস্কার দিলে।

উৎসব শেষে, গভীররাত্রে সুবোধ যখন ফির্‌বে, হীরা এসে তার হাতদুখানি ধ'রে বল্‌লে, তোমাকে ওস্তাদ ব'লে পরিচয় দেওয়া সৌভাগ্যের কথা।

পরদিন হীরা বল্‌লে, কাল্‌কের জলসায় আশাতীত উপার্জ্জন হয়েচে। এইবার তুমি ঘরে ফিরবার আয়োজন কর। আর তোমায় আটকে রাখ্‌তে চাইনি।

সুবোধের মুখে ঠিক্ তেমনি একটা করুণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল, প্রাণ-শক্তি নিভে আস্‌বার ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণে যেমনি হাসিতে মুমূর্ষুর মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

দিন ঠিক্ হলো। সুবোধ দেশে ফির্‌বে। হীরা তারই আয়োজনে ব্যস্ত।

হীরার বাড়ী হ'তেই সে যাত্রা কর্‌বে। অপরাহ্নে ট্রেন। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই এসে জমেচে হীরার বাড়ীর বাইরে, তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

যাত্রার আয়োজন শেষ ক'রে, সাজ-গোছ ক'রে সুবোধ বাইরে এলো সকলের কাছে বিদায় নিতে। মুখে তার অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্য,—একটা অনুভূতিহীন চেতনার মাঝে যেন সে মগ্ন হ'য়ে আছে। চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে ক্ষীণ নিষ্প্রাণ হাসির আভাস!

একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সুবোধ ভেতরে গেল হীরার কাছে বিদায় নিতে। ক'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু বাইরে অপেক্ষা কর্‌তে লাগল তার সাথে ষ্টেশনে যাবে বলে। সকলেই ম্লান, ম্রিয়মান!

বেলা বাড়ছে। ট্রেনের সময় এগিয়ে আসচে, অথচ বোধের দেখা নেই। বন্ধুরা বাইরে হ'তে তাগিদ দিচ্ছে, আর মোটে বিশ মিনিট বাকি !

—পনর মিনিট !

—সুবোধ ফেরে না !

—ব্যাপার কি ? বাইরে সকলে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছে। তেখানি পথ বেয়ে ষ্টেশন গিয়ে গাড়ী ধর্‌বে কেমন করে ? মোটে পনর মিনিট বাকি ! এখন—মোটরে গেলে ট্রেন পেতে পারে।

বন্ধুর দল উঁচু গলায় ডাক দিলে।

উত্তর নেই !

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগল।

ভেতর হ'তে সহসা একটা অস্ফুট কলরব ভেসে এলো। কলে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলে।

যেন কার চাপা কান্না !!···ভেতরের কলরব বেড়ে উঠ্‌লো।

বাইরের প্রতীক্ষীয়মান লোকগুলি অধীর হ'য়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে গিয়ে তারা যা দেখ্‌লে তাতে তাদের বুকের স্পন্দন গেল থেমে !

হীরার সজ্জিত ঘরের সামনে খোলা বারান্দায়, তার কোলের ওপর সুবোধের প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটা লুটিয়ে পড়ে আছে। তার উন্মিলিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি হীরার মুখের পরে স্থির হ'য়ে গেছে।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ হ'য়ে সুবোধের মুখের পানে চেয়ে রইলো। তাদের সপ্রশ্ন মিলিত দৃষ্টি যেন হীরাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চায় : কেন এমন হলো ? কেন ?

হীরার বেদনাচ্ছন্ন সজল চোখেও সেই সপ্রশ্ন সঙ্কেত : এমনভাবে আমার কাছে বিদায় নিলে,—কেন গো, কেন ?

ভালবাসিবার ধারা

[রূপক]

= শ্রীরাজেন্দ্রমিত্র =

পথ হারানো পথিক—

গভীর রাত্রি। গভীর বন। পথিক একলা চলে। পায়ে পা' জড়িয়ে আসে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, তবু পথের শেষ নেই। অশেষ পথ। পথ চলার বিরাম নেই।

সামনে পিছনে নিবিড় তরুশ্রেণী—নীরব, নিথর, কোথায় যায়, কেন যায় ও জানে না। কি আকর্ষণে ?···কোন ভবিষ্যত সুখের আশায় কে জানে ! মনের কোণে কেবল এই প্রশ্নই ওঠে কিন্তু উত্তর পায় না।

ক্লান্তিতে পথিকের দুটি চোখের পাতা নুয়ে প আধখোলা চোখে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলোয়

শ্রীরাজেন্দ্রমিত্র

মন্ত্রমুগ্ধ যেন। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কোজাগরী পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ চোখে পড়ে। চাঁদের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে আকাশে—ভুবনে, প্রান্তরে বনে। বাতাসে বাতাসে কোন অজানার আহ্বান ভেসে বেড়ায়—গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে বদ্ধ আলো-ছায়ার লুটিয়ে পড়া নীরব নিবেদনের মত—শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘুমন্ত। তবু পথিক চলে—নিঃসঙ্গ, একলা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে—পৃথিবীতে আজ আলো, এত বাতাস, ফুলের সুবাস, পাপিয়ার গান—এ কোন মূল্যই কী ওর কাছে নেই ?···ওর কী আজ এ আনন্দ নেই !···সত্যই দুনিয়ায় ও বড় একা, বড় অস ওর এই তরুণ বয়স···নবীন যৌবনের কী প্রয়োজন তবে !···শুধু পথ চলেই কী ওর জীবন কাটবে !··· কী ওর হবেনা কোন দিনই !···

শ্রান্ত, ক্লান্ত পথিক গাছের তলে বসে পড়ে—পায়ে গার সরু পথটির ধারে—যেখানে কৃষ্ণচূড়া গাছটি উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

পথিক ভাবে গালে হাত দিয়ে। বুকে ওর অসহ বেদনা···ও আর চলতে পারে না। আঁখির পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসে।

পথিকের তন্দ্রা যায় ছুটে। বাতাসে ভেসে আসে গানের দুটি কলি—

"আজ ভুবনের দুয়ার খোলা
দোল দিয়েচে বনের দোলা
কোন ভোলা সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে—"

পথিকের আনমনা মন এক অপূর্ব্ব ছন্দে নেচে ওঠে, আর কেঁপে ওঠে বনের লতাপাতা, বনের ঘাসগুলিও যেন······।

গানের সুরে পথিক মাতাল হয়ে ওঠে। ভাবে—এ সুর বনের কোন মায়াবিনীর মায়াজাল নয় তো!··· ওকেই জড়াতে চায়···ওকেই পথ ভুলিয়ে নিজের আবর্ত্তের মধ্যে টেনে নিতে চায় যে! না!···না!···ও যাবে না··· কখনোই যাবে না···ফাঁদে ধরা দেবে না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারে কই?···সুরের এ-কী প্রবল টান···এ-কী মোহ!···পথিক উঠে দাঁড়ায়।

বনের এক প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশের তলে ঘাসের ওপর নাচে আর গান গায় একটি মেয়ে। সুন্দরী! চোখ ফেরানো যায় না। জড়ানো খোঁপাটির মধ্যে অতি আলতোভাবে কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া জড়ানো···কানের দুপাশে দুটি পলাশ···গলায় এক গাছি বনফুলের মালা। গভীর রাত্রি। গভীর বন। সুন্দরী মেয়েটি নাচে আর গান গায়। ও নাচে অপরূপ নাচ! সবুজ পাতলা শাড়ীর আড়ালে মুকুলিত দুটি রাঙা ফুল কেঁপে ওঠে নৃত্যের তালে তালে। মনে হয় ওর তরুণ অঙ্গের সব মাধুরীটুকু গানের সুরে চাঁদের আলোয় যেন—ভেসে চলেচে
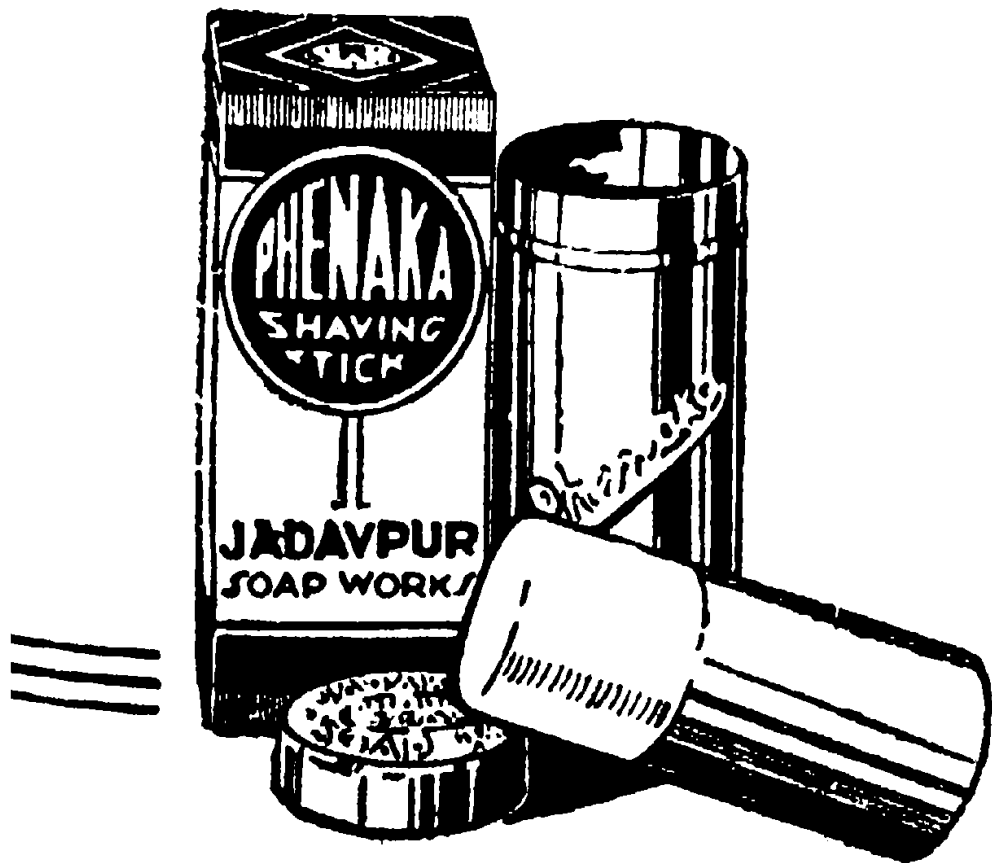
নিজেকে লুকিয়ে রাখলে চলে না আর। ঝোপের আড়াল থেকে পথিক সামনে এসে দাঁড়ায়। নাচ গান থেমে যায়।

মেয়েটি বলে "কে?..."

—"আমি পথিক। তুমি?"

"তোমার নাম নেই বুঝি—মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

—"আমি মুকুল। তোমার—"

—"আমি মল্লিকা। কী করে এলে তুমি এখানে। এই বিজন বনে তোমার ভয় করে না?"

—"না। তোমার গানের সুরের টানে আকুল প্রাণে তোমার কাছে ছুটে এলেম। থামলে কেন?—আর একটিবার গান গাও—দাঁড়িয়ে শুধু শুনবো, এর বেশী কিছু চাইনে মল্লিকা!..."

"এর বেশী কিছু চাইনে মল্লিকা"

মল্লিকা হাসে; মধুর সে হাসি। বলে—"কে তুমি আমায় নাম ধরে ডাকলে— এ-কী তৃপ্তি—ডাকোনা আ একবার!

মুকুল ডাকে বার বার। ডেকে সাধ মেটে না যে তারও। অপলক চোখে মল্লিকা তাকিয়ে বলে—"কত শ্রা তুমি হয়েছো পথচলে!...কেন চলো?...চলেছো কোথায়- কেউ আর নেই বুঝি?

মুকুল বলে—"ছিল না যে কেউই...তাই তো চলেি দীর্ঘকাল ধরে বুঝি তোমারই সন্ধানে—আজ তোমাকে পেয়ে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছে মল্লিকা! তরু যৌবনের নিজের চাওয়াকে আপন বুকে পাবার এ যে কি মোহময় আকর্ষণ বুঝে উঠতে পারিনে"। মুকুল মল্লিকার একটা হাত ধরে।

মল্লিকা বলে—"এ-কী তুমি আমায় ছুঁলে?

মুকুল ত্রস্তে হাত ছেড়ে দেয়।

"রাগ করলে?—মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

—"না"।

মুকুল বলে—"তোমার হাতটি আমার মুঠোর মধ্যে দাও, আমি খেলা করি, আমার সুখ হয় তাতে খুব।"

কী সুন্দর ওর বলার ভঙ্গী! ভালাবসার সুর!···

মল্লিকা নিজের হাতটি এগিয়ে দেয়।

মুকুল ওর হাতটি মুঠো করে ধরে। মল্লিকার এই স্পর্শ মুকুলের বড় ভাল লাগে। এ স্পর্শের স্বাদ ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন, এ সুখের সাথে ও কোনকালে পরিচিত নয়। এ সুখের স্বাদ মুখে বলবার নয়···এর কোন রূপ দেওয়া যায় না··· ভাষা ভেঙে পড়ে···শুধু নিস্তব্ধ, নিথর চাঁদনি রাতে খোলা আকাশের তলে হাতে হাত দিয়ে একে বোঝা যায়, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে বসে। শরতের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে মল্লিকারই স্নিগ্ধ নরম হাতটি বুলনোর মত। মল্লিকার ছোঁওয়া পেয়ে ওর সমস্ত শিরা-উপশিরা কেঁপে ওঠে···ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে—"আজ তোমাকে পাবার আনন্দেই মন ভরে উঠেছে; তুমি এত সুন্দর, এত করুণ, এত সুরময়! আমি এই পৃথিবীকে প্রণাম করি! এ সুখের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না"

মল্লিকা কোন কথা কয় না।

মুকুল ভাবে—ও প্রথম প্রেমের ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছে বুঝি বা!···"তুমি এত হালকা ছোট্টটি!"—মুকুল বলে—"তোমাকে কেউ এর আগে ভালবেসেছে মল্লিকা?···কেউ কী তোমায় এমনি বাহুর মধ্যে নিয়ে জড়িয়েছে···এমনি ···এমনি করে?"

"না"—ও খুব আস্তে বলে।

ওদের জীবনের এই ভোর বেলা···তরুণ ওদের দেহ-মন ···নিঃশ্বাসে ওদের বুক দুলছে।

আশে-পাশে হাওয়ায় গোছা গোছা কাশফুল দুলে ওঠে, সরসর কেঁপে ওঠে গাছের পাতা। পথ দিয়ে কে বাঁশী বাজিয়ে চলে যায়—
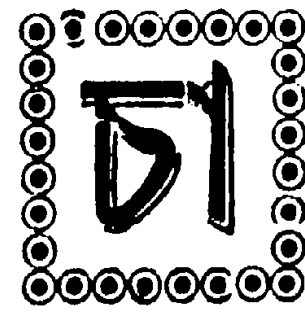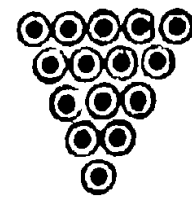
"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী জাগো, সখী জাগো—"

প্রিয়াকে জাগাবার সাধনায়···প্রিয়াকে বুকে পাবার জন্য কার তরুণ মন এমন চাঁদনি রাতে কেঁদে ফিরচে—

"জাগো নবীন গৌরবে
জাগো বকুল সৌরভে—"

নিজের প্রিয়াকে ঘুম হ'তে জাগিয়ে বুকে পাবার কী আকুলতা!

মুকুল তাই ভাবলো। মুকুল বল্লে—"মল্লিকা, আমিও এমনি বহু রাত কেঁদে কেঁদে ফিরে আজ তবে তোমায় পেয়েছি—নিজের প্রেমকে পাবার জন্য এযে কী আকুলতা, ভালবাসার এ কেমন ধারা বুঝিনে। জগতে পাপ নেই, দুঃখ নেই, বন্ধন নেই, সীমা নেই, কিছুই নেই; দুঃখ, পাপ, বন্ধন সবই ওই একমাত্র কামনার হয়রানি। প্রেমের সুখ অসীম। চাওয়ার আকুলতাই অতৃপ্তি। খুঁজে খুঁজে বেড়ানো, যতই পাও তবু সুখ নেই, তাই যা' সহজ, তাই হয়ে ওঠে দুর্গম, দুর্ল্লভ—তাই প্রেমের জন্য মানুষের এত হাহাকার।"

* * * *

রাত শেষ হয়ে আসে—

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে ঢলে পড়ে। মল্লিকা মুকুলের একটা হাত নিজের অধরে ছুঁইয়ে নিয়ে বলে—"এবার যাই···"

মুকুলের মুখ শুকিয়ে ওঠে। ওকে ছাড়তে মুকুলের মন চায় না। মুকুল বলে—"যাবে?···আর কী থাকতে পারো না?···তোমার হাতের মধ্যে হাতটি রেখে তোমাকে পাশে নিয়ে যদি জীবনের প্রত্যেকটি রাত কাটতো!···ভালবাসার সুখ বড় ক্ষণিক—না মল্লিকা?"

মল্লিকার মুখে ম্লান হাসি।

ওর মনে হয়—ওদের দু'জনে যেন কতকালের পরিচয়—দু'জনে কত ভাব! তাই যাবার বেলায় ওর মনেও বেদনা জাগে। তবু ধীরে ধীরে বলে যায়—"ভালবাসার সুখ বড় ক্ষণিক বলেই তাই তোমার কাছে আমার এত আদর···তাই আমি এত সুন্দর তোমার কাছে—।"

—"কিন্তু মল্লিকা প্রথম ভালবাসা এ ছাড়তে মন চায় না। বড় দুঃখ তাতে। প্রথম ভালবাসা বড় মধুর। ওর মৃদু কম্পন···সঙ্কুচিতা লজ্জিতা প্রথম প্রিয়ার যেন সলজ্জ চাউনি, একটি ইসারা শুধু, তাই এত মিষ্টি।"

মল্লিকা আর একবার ওর হাতটি নিজের অধরে ছুঁইয়ে নিয়ে বলে—"যাই তবে—"

ধীরে ধীরে ভোরের বাতাস বয়ে যায়। শিউলে ব··· নবকিশলয়, নবপল্লবের সাড়া পড়ে গেছে- মৃদু বাতা··· এক একটি করে ফুল মাটিতে ঝড়ে পড়ে। এবার ··· ফুলের গৌরবময় অবসান। ফুল সারারাত ধরে মন··· গন্ধ বিলিয়ে ভোরের নূতন আলোর স্পর্শ পেয়েই আ··· ঝরে যায়; একটি রাতের জন্য সুগন্ধ রঙের তুলি বু··· দেয়। অস্থায়ী বলেই তার এত আদর। মুকুল ··· কথাই ভাবছিল প্রেমের সুখও ফুলের মতই। অল্প সম··· মধ্যেই সে সার্থক হয়ে ওঠে, ক্ষণিকতার মধ্যেই প্রে··· নিবিড়তা অনুভব করা যায়, তারপর-ই তার অবসান, যা··· পালা—এই যাওয়া বুঝি আটকানো যায় না!···

মুকুল বলে—"ক্ষণিকতার মধ্য দিয়ে যে নিবিড়··· পেলেম—এ স্মৃতিটুকু চিরদিন অ-মলিন থাকবে।"

মল্লিকা শুধু হাসে। "সবাই তাই বলে—আবার ভু··· যায়"—মল্লিকা বলে।

মুকুল মল্লিকাকে ধরে রাখতে পারে না। মল্লিকা ··· গেল। মুকুল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর য··· পথটির দিকে—মল্লিকা একটু একটু করে আবছা আ··· মধ্যে মিলিয়ে যায়—আর দেখা গেল না। মুকুল দু'··· চোখ ঢাকে,—বাতাসে তখনো মল্লিকার শেষ গানের ··· বাজে

—"বরষ ফুরায়ে যাবে
ভুলে যাবে জানি—"

মুকুল উত্তেজিত, অথচ দুর্ব্বল। মুকুলের মনে ··· কে যেন ওকে চুম্বন করছে, ঠোঁটে ওর পরশ এ··· লেগে আছে। তরুণ যৌবনের আবার সেই আ···

…শা—মাথা ভারী হয়ে আসে। ও চোখ বুজে তারই …নের প্রতীক্ষা করে। মুকুল চাঁদটির দিকে তাকায়; …লে ভাবে—ওকে যদি চিরদিনের মত পেতাম খুব সুখী …তম—ওকে সব চেয়ে ভালবাসতুম···ওর জন্যই আমার …ই আকুলতা, তবু ওকেই ভালবাসি।

মুকুল অস্পষ্টরূপে সেই নামটা উচ্চারণ করে—"মল্লিকা! মল্লিকা!"

ওর কথা মনে করে হৃদয় স্পন্দিত হয়। মুকুল হাঁটু-…ড়ে বসে শিশিরভেজা ঘাসের ডগা চুম্বন করে—এই আশা…র যেন মুকুল ওকে পায়।

মুকুল ভাবে—কেন এমন হয়?···এই বুঝি ভালবাসার …রা?···ভালবাসার এই বুঝি ধর্ম্ম!···কত ক্ষণস্থায়ী এই প্রেমের সুখ!···

পথচারী বাতাস ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়।

মুকুল বলে—"কে?"

কেউ না। বাতাস। কী অতীন্দ্র বেদনায় ও জ্বলছে।

মুকুল আবার সেই পথ হারানো পথিক। ও উঠে দাঁড়ায়। এ পথ চলার বুঝি বিরাম হবে না কোনদিন!···

আবার সেই দুর্গম পথ। পিছনে ফেরবার প্রয়োজন নিঃশেষ!···আবার সেই একা একা পথ চলা—"ক্ষেপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর"···আবার সেই খোঁজার সুরু।

বনের পথ ধরে পথিক আবার একলা চলে—

—শেষ—

"জননী আসে"

= শ্রীমানারাণী দেবী =

কটি মেখলা উড়ায়ে ওই শারদাকাশে,
জননী আসে ওরে জননী আসে।

পরি উষার সিঁথি শ্বেত ললাট পরে
লয়ে স্নেহের অমিয়া রাশি নয়ন ভরে;
তনু জড়ায়ে শ্যামল অঙ্গবাসে,
জননী আসে ওরে জননী আসে।

আজ আকাশ কোলে মার মধুর হাসি
ওই বাতাসে বাজে তাঁর বোধন বাঁশী

আজি দ্যুলোক ভূলোক ভরি নীরব ভাষে
জননী আসে ওরে জননী আসে।

কচি ঘাসের বুকে মার আঁচল দোলে
ঘন অলক খোলা ওই মেঘের কোলে,
তাই প্রাণের পরশে আজ জীবন হাসে
জননী আসে ওরে জননী আসে।

রোম্যান্স

[গল্প]

= শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর =

রবীনের বিয়েটা ঘটে রোমান্টিকভাবে, তারই কাহিনী লি:

রবীনের একটু পরিচয় দি আগে—

রবীন কবি নয়, গাল্পিক। তবে সাধারণ প্রেমের কাহিনী স কোন দিনই লেখেনি, সে লেখে ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প—রোমাঞ্চকর রহস্যময় কৌতূহলোদ্দীপক। তা' কবি নাহলেও রবীন মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল রাখে, ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী রে, চুরুট খায়, চশমাও আছে একজোড়া—তা তাকে মানায় সবই—চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়। তার উপর গুর স্বরেও একটু মেয়েলী মিহিত্বের রেশ পাওয়া যায়।

কিন্তু এত গুণ থেকেও ভগবান তাকে একদিকে রলেন। বি-এ ডিগ্রীটা সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারলো না দু'বছরেও। এই বি-এ পাশ না রার দুঃখ তো শুধু ফেল-করার দুঃখ নয়, তার চেয়ে বড় খ লুকিয়ে ছিল তার মনের কোণে। প্রেমের কাহিনী না খলেও সে প্রেমে পড়েছিল, গাঁয়ের জমিদার-কন্যার সঙ্গে। র উপর কথা প্রসঙ্গে জমিদার হরিচরণ বাবুর মুখে এমন থাও সে শুনেছিল, যে ভাবী জামাতা হিসাবে জমীদার শাই এমন এক পাত্র চান, যার অন্ততঃপক্ষে বিলাত থেকে রিষ্টার হয়ে আসার যোগ্যতাটুকু থাকবে। তা রবীন শা করেছিল যে, বি-এটা পাশ করে বিলাত থেকে ঘুরে বে একবার, তা ব্যারিষ্টার না হয়ে একটা পি-এইচ-ডি ও ফিরবে—রাণুকে তার পাওয়া চাই, আর তার সঙ্গে ওয়া চাই যৌতুকস্বরূপ হরিচরণ বাবুর জমিদারীটা। কিন্তু আশা মনেই রইল, দুবার ফেল করিয়ে বিধাতা সে শয় বাদ সাধলেন।

কিন্তু তা বলে প্রেম তো আর বাধা মানবে না, কাজেই র মরিয়া হয়ে সে চেঞ্জে যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো বাড়ীতে অজুহাত দেখালো উপরি উপরি পরীক্ষার পড়ায় শরীর মন দুই ভেঙে পড়েছে, একটু হাওয়া না বদলালে স্বাস্থ্য বুঝি আর থাকে না।

মা বললেন—একাই যখন যাবি পুরীতে যা, রাণুরা আছে।

পুরীতেই সে যাচ্ছিল, তবু বললো—দেখি—দু-একটা জায়গা ঘুরে যেখানে ভালো বুঝবো, সেখানেই থাকবো দিন কতক।

কিন্তু কোন জায়গা না ঘুরে রবীন একেবারে পুরীতেই এলো। অনর্থক বাজে ঘুরে লাভ কি, এবার সে রাণুর বাবার সঙ্গে পাকা কথাই কইবে।

হরিচরণ বাবু তো রবীনকে পেয়ে খুব খুসী। রবীনকে তিনি আশৈশব পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন তার উপর বি-এ পরীক্ষায় ফেল করার জন্য রবীন তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি বছর খানেকের ওপর। এদ্দিন পরে রবীনকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ হবারই কথা। আরো আনন্দ যে রবীন লেখক হবার চেষ্টা করছে। রাণুর কাছে রবীনের অনেক লেখা তিনি দেখেছেন, পড়েছেনও। তাঁর বিশ্বাস কবে একদিন রবীনের লিখন-প্রতিভা বাংলার সাহিত্য আকাশে জ্যোতিষ্কের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠবে। রবীনের অসামান্য প্রতিভায় হরিচরণ বাবুর অসামান্য বিশ্বাস। রবীনকে উৎসাহ দিয়ে তিনি বললেন—বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাতজন, আর শিক্ষিতদের শতকরা একজনও লিখতে জানে না. জন শতেকের মধ্যে ভালো লিখতে পারে একজন মাত্র—তুমি সেই একজন, তোমার মধ্যে সে প্রতিভা আছে, একদিন তোমার নাম হবেই, তোমার লেখা তো আমি পড়েছি!

রবীন শোনে, হরিচরণ বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে একটু গর্ব্বের হাসি হাসে।

রবীনকে নিয়ে হরিচরণ বাবুর মজলিশ আরো জম্ জম্ রে।

বাড়ীর ভিতরেও রবীনের খাতির কম নয়, রাণু তাকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, তার লেখা গল্পের সমালোচনা করে। নানা কথাই হয়। এই নিমন্ত্রণের ঠেকায় পড়ে রবীনকে হোটেলে খাওয়া ছাড়তে হয়েছে। দেখে শুনে মনে হয় অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গতা যেন বাহিরের মজলিসকে ছাপিয়ে গেছে।

—এমনি ভাবেই দিন কাটে।

বলি বলি করেও ঠিক মত ভূমিকা ভেঁজে রাণুর সম্পর্কে কোন কথাই হরিচরণ বাবুর কাছে রবীন সুবিধা করে বলতে পারে না কোনদিনই, হরিচরণ বাবুকে একলা পাওয়া যায় না কোন সময়েই। অন্দরে রাণু তো সব সময় কাছে কাছে আছে আর বাহিরে একবার এসে বসলে হয় পাড়ার পাঁচজন এসে জুটবে, যাবার নামটী কর্ব্বে না। কথায় কথায় নানান কথা তুলবে—পরচর্চ্চা রাজনীতি অরাজনীতি সাহিত্য কিচ্ছুই বাদ যায় না! তাদের জেঁকে বসতে দেখে রবীন মনে মনে ক্রুদ্ধ হতে থাকে।

সেদিন বিকালেও এমনি আলোচনা চলছিল সাহিত্য নিয়ে।—

ওদিক থেকে নরেনবাবু বলে উঠলেন—আজকাল একদল ছোকরা লেখক গজিয়েছে, বিলাতী বয়ের তর্জ্জমা করে তারা যা খুসী তাই লেখে, নিজেদের অভিজ্ঞতা ক অব্‌জারভেশন কিছুই তাদের নেই—শুধু অনুবাদ করা বিদ্যে।

কথাটা হরিচরণ বাবুর মনের মতই হয়েছিল, বললেন—া ঠিক, তাদের কবলে পড়ে আজ আমাদের সাহিত্যের সাহিত্যিক আদর্শ, নীতি সব নষ্ট হতে বসেছে—

ওপাশ থেকে মুরুব্বিয়ানার স্বরে প্রবোধবাবু বললেন—তরুণ সাহিত্যিকের সামনেই তরুণ দলের নিন্দে? এক-তরফের রায় দিলে তো আর চলবে না, ওদের ব্যক্তব্যটাও বলতে দাও। বলুন না রবীনবাবু, আপনাদের কথা আপনিই বলুন—

এই কটাক্ষের পরেও চুপ করে থাকা শক্ত। রবীন বললো—দেখুন অভিজ্ঞতা বা অব্‌জার্ভেসন ব্যক্তিগত কথা, আসল লোকটাকে না জেনে তার অভিজ্ঞতা কদ্দুর, অব্‌জার্ভেসন কি রকম ধারণা করা শক্ত—

বাধা দিয়ে প্রবোধবাবু বললেন—বেশ তাহলে আমরা ব্যক্তিগত কথাই বলি। আপনি তরুণ দলের একজন, আপনাকে আমরা জানি, আপনি এই যে এত গোয়েন্দার গল্প লেখেন, চুরী বা গোয়েন্দাগিরী সম্বন্ধে আপনার কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলে তো আমার মনে হয় না!

এমন ভাবে আক্রান্ত হবার প্রত্যাশা রবীন করেনি। সে প্রথমে একটু বিব্রত হয়ে উঠলো, তারপর ঘুরিয়ে জবাব দিলে—এরকম স্বতঃসিদ্ধ 'মনে না হওয়া' ভুল, আমার অভিজ্ঞতা আছে কিনা তার প্রমাণ নির্ভর করছে পরীক্ষার ওপরে, আপনারা ইচ্ছা করলে আমায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

কথাটা ঠিকই—পরীক্ষা করলেই তো এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে যায়, আর কথার কি আছে! কিন্তু পরীক্ষা করা চলে কেমন করে কোন বিষয় উপলক্ষ করে, তাহাই সমস্যার কথা। সকলেরই মুখরতা স্তব্ধ হোল পরস্পর মুখের পানে তাকিয়ে রইল অন্যের প্রশ্নের সমাধানের প্রত্যাশায়, কিছুকাল চুপ করে থাকার পর নিম্ন কণ্ঠে দু'একটা প্রস্তাব উঠলো বটে, কিন্তু অন্যের মনঃপুত না হওয়ায় মধ্য পথেই চাপা পড়ে গেলো। শেষে তাদের দিক থেকে সমাধানের কোন সম্ভাবনো না দেখে নরেনবাবু বিষয় নির্ব্বাচনের ভার দিলেন রবীনেরই ওপরে।

তর্কের খাতিরে কথাটা বলে ফেলে রবীন চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, কি করে প্রমাণ করে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করবে তাই সে এতক্ষণ চিন্তা করছিল এখন বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তারই উপরে পড়ায় তার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো, মিনিট ছ'য়েক সে ভাবলো, সহসা ওপর থেকে রাণুর গানের রেশ ভেসে উঠতেই বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত একটা কথা রবীনের মনে উঠলো, সে বললো—আপনারা যখন আমারই ওপর পরীক্ষার ভার দিলেন, তখন আমার দিক থেকেই বলি,—গোয়েন্দার গল্প আমি লিখি, তার মধ্যে গোয়েন্দার চেয়ে চোরের কার্য্যতৎপরতাকে আমি প্রাধান্য দিই বেশী, সেই জন্য

চৌর্য্যবৃত্তির অভিজ্ঞতাই আমি দেখাতে চাই। আপনারা নিজেদের মধ্যে একজনকে নির্দ্দিষ্ট করুন তার বাড়ী থেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা মূল্যবান সম্পত্তি আমি অপহরণ করবো, তবে এই সর্ত্তে যে সে জিনিষটার উপর মালিকের আর কোন দাবী থাকবে না, সেটা আমায় দিয়ে দিতে হবে একেবারে।

আবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাইয়ের পালা। এমন ধারা চৌর্য্যবৃত্তির দায়িত্বকে তার নিজের বাড়ীতে স্বেচ্ছায় কে আহ্বান করবে তাহাই সমস্যা। নরেনবাবু কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন, বললেন--এ দায়িত্ব হরিচরণ বাবুরই নেওয়া উচিত। রবীনকে তিনি ছেলেবেলা থেকেই জানেন, যা যাবে তা' একেবারে অজানা অপাত্রে যাবে না।

হরিচরণবাবুর কোন কথাতেই না বলতে শেখেননি, রাজী হলেন। রবীনের মুখে হাসি দেখা দিল। সকলে স্বস্তি বোধ করলো।

তারপর পরীক্ষার কাল নির্দ্দিষ্ট হোল--সাতদিন, সা দিনের মধ্যে রবীনের যা করার করতে হবে।

একটির পর একটী দিন কাটে।

রবীন আগেরই মত আসে যায়, ভিতরে বাহিরে তা আগের মতই অবাধ গতি।

হরিচরণবাবু বসে থাকেন নীচের ঘরে, রবীনের ওপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন ঢুকতে বেরোতে। বাড়ীর ঝি চাকরদের জানিয়েছেন বাজীর কথা, রবীন সামনে পড়লে তা আপাদমস্তক তারাও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। এ সতর্কতা দেখে রবীনের মুখে হাসির একটা ক্ষীণ রেশ লেগে থাকে।

শেষে ষষ্ঠ দিন কেটে গেলো।

সপ্তম দিন সকালে রবীন রাণুকে গিয়ে বললে মনে থাকে যেন আজই শেষ দিন!

রাণু তখন স্নান করে এসে সদ্য ভিজে চুলগুলো পিঠে

উপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল, একটু হেসে বললে—জানি কিন্তু…

রবীন কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়লো, ঠিক সেই সময় হরিচরণ বাবু চাকরের কাঁধে বাজারের ধামা দিয়ে সেখানে এসে পড়লেন রবীনের আর বলা হোল না। হরিচরণ বাবু তাকে বাজার করতে ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন চল হে চল, বাজারে তো যাওনি কোনদিন বাজারটা বেরিয়ে আসবে চল—

রবীনের অন্তরের কথা অন্তরেই রইল।

সন্ধ্যার দিকে হরিচরণবাবু কন্যাসহ সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। পিছনে ঘনায়মান অন্ধকার সমুদ্রের দিগ্বলয়ের রক্তাভ ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে স্তিমিত করে দিচ্ছে। অন্ধকারভীতা জলকন্যারা আলোর আশায় দিগন্তরে ছুটাছুটি করছে, তাদের আর্ত্ত উচ্ছ্বাসের বেদনায় জলও চঞ্চল হয়ে উঠছে, তট-ভূমির উপর আছড়ে পড়ে পড়ে তাদের বেদনা জানাচ্ছে মাটী মা'য়ের কাছে—ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ করে গুমরে ওঠার বিরাম নেই। এই আর্ত্ত জলোচ্ছ্বাস মনকে আচ্ছন্ন করে, অনন্ত আলোক রশ্মির আকাঙ্খায় চিত্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

স্তব্ধভাবে হরিচরণবাবু রাণুকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সহসা রবীন কোথা থেকে ছুটে এসে বললো—চলুন, এখ্‌খনি চলুন, পুলিশে আপনার খোঁজ করছে, আপনার বাড়ীর জিনিষপত্র সব তছ্‌নচ করে দিলে আপনাকে খবর দোব বলে এসে আমি তো খুঁজে খুঁজে হায়রান, চলুন—

পুলিশ! তার বাড়ীতে! হরিচরণ বাবুর মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলযোগ বেধে যায়, কি করবেন প্রথমে তিনি বুঝতে পারেন না হতবাক হয়ে রবীনের মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন কতক্ষণ।

রবীন বোঝে, দম দিয়ে বললে—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, চলুন, ওরা এসেছে এক বোমাড়ের খোঁজে আপনি নাকি তাকে আপনার বাড়ীতে লুকিবে রেখেছিলেন ছুটে চলুন একবার—

কয়েক পা গিয়েই ফিরলেন, রাণু যে পড়ে রইল পিছনে, এই সন্ধ্যাবেলা তাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া তো ঠিক হবে না। রবীন যেন তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারলো, হরিচরণবাবুর সঙ্গেই সে চলে আসছিল, থেমে বললো—মিছে দেরী করবেন না, রাণুর জন্যে ভাববেন না, ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনি এগোন—

হরিচরণবাবু আর সেখানে দাঁড়ালেন না। হরিচরণ বাবুর দৃষ্টির অন্তরালে যেতেই রাণুর হাত ধরে রবীন বললে—আমরা .আর ওদিকে গিয়ে কি করবো, এসো আমরা এদিক দিয়ে চলে যাই—

রাণু একটু ইতস্তত: করে বললো—কিন্তু…

রবীন বললো—এখনও তোমার কিন্তু? এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে তোমায় পাবার আশা আমার চিরজীবনের মত ছাড়তে হবে কিন্তু তা আমি পারবো না, আমি তোমায় ভালবাসি—তোমায় আমার চাই—

রবীনের কথায় রাণু লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি নাবিয়ে নিলো। রবীন তার হাতখানা ধরে আকর্ষণ করতেই সে যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেলো, যেতে যেতে রবীন বললো—আমার সঙ্গে যেতে তোমার ভয় হচ্ছে, কিছুনা, একটা রাত কোন রকমে ঠিক কাটিয়ে দোব, না হয় বাজারের পাশে উড়েদের যাত্রা হচ্ছে তাই দেখিগে চল হাসতে হাসতে রাত কেটে যাবে—এছাড়া আর উপায়ই বা কি বল?

রাণু কোন উপায়ই বললো না চুপ করে রবীনের সঙ্গে অগ্রসর হোল শুধু।

ফিরে এসে হরিচরণ বাবু পুলিশের চিহ্নও দেখতে পেলেন না। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলেন রবীনের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ব্যাপারটা তাঁর কাছে রহস্যময় বলে মনে হোল। রবীনের উপর বিরক্তিতে হরিচরণবাবুর মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো।

নরেনবাবু বেড়িয়ে ফিরছিলেন, অন্ধকার বৈঠকখানা সামনে অমনভাবে হরিচরণ বাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দে থমকে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করলেন—কি হরিচরণ বা অমন করে দাঁড়িয়ে যে? চলুন ভিতরে বসিগে—

অন্যমনস্কের মত হরিচরণবাবু বললেন—আমায় এম ঠকানোর উদ্দেশ্য কি বলুন তো?

—কে ঠকালে আপনাকে?

নরেনবাবুর জেরার মুখে হরিচরণবাবু একে একে ব ফেললেন সব কথা।

নরেনবাবুর বুদ্ধির দোষ দিতে আজ পর্য্যন্ত কে পারেনি, সব শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর দেরী হো না একটুও, হরিচরণ বাবুকে বললেন—তাইতো, ছোকরা কোন মতলব আছে,—আজকেই বাজীর শেষ দিন। আমার কেমন ভালো মনে হচ্ছে না, শেষে আবার রাণুকে নিয়েই না সরে পড়ে, চলুন দিকি একবার সমুদ্র তীরে দেখিগে—

দুজনে আবার সমুদ্রতীরে ফিরে এলেন, অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু রবীন কি রাণু কাউকেই দেখা গেলো না। হরিচরণবাবু গুম হয়ে বাড়ী ফিরলেন!

প্রতিদিনকার অভ্যাস মত সে রাত্রেও একে একে পরিচিতেরা এসে মজলিশ জমাট করে তুললো। কিন্তু কারুর মুখেই কথা নেই, যদিবা কেউ দু-একটা কথা বলে, তাও অত্যন্ত নিম্নস্বরে ফিস্ ফিস্ করে। ব্যাপারটা সকলেই জেনেছে, নরেনবাবু দু'পাচ কথায় ঘটনাটী শুনিয়ে দিয়েছেন সকলকে।

চুপচাপ আর কতক্ষণ বসে থাকা যায় কিছুক্ষণ বাদে সকলে উঠি উঠি করছে সহসা একটী ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলে—এইটে কি হরিচরণবাবুর বাড়ী?

—হ্যাঁ, কেন?

—চিঠি আছে—বলে ছেলেটী একখানি খোলা চিঠি নরেনবাবুর হাতে দিলে। খোলা চিঠি, নীচে রবীনের নাম সই দেখে নরেনবাবু বললেন—ছোকরা আবার একখানা চিঠি লিখেছে হরিচরণবাবু—শুনুন, পড়ি: -

শ্রদ্ধেয় হরিচরণবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সমীপেষু

বিনয় নিবেদন,—

আজ বাজীর শেষ দিন, আমার প্রতিভা প্রমাণের জন্য হরিচরণবাবুর সব চেয়ে প্রিয়া, তাঁর একমাত্র কন্যা রাণুকে অপহরণ করেছি। এখন আপনাদের সর্ত্ত মত আমার অপহৃতাকে আমার হাতে সমর্পণ করুন, বংশ মর্য্যাদা ও পাত্র হিসাবে আমি অযোগ্য নই—ইতি— বিনীত

রবীন…

এতক্ষণে সকলের মুখে হাসি ফুটলো—ছেলেটী ভারী ফন্দীবাজ তো!

হরিচরণ বাবু এতক্ষণ উৎগ্রীব হয়ে শুনছিলেন এবার জিজ্ঞেস করলেন—দেখুন তো কোত্থেকে লিখেছে, ঠিকানা দিয়েছে?

চিঠিতে ঠিকানা ছিল না, যে বালকটী চিঠি এনেছে তার কাছে ঠিকানা পাওয়া যাবে ভেবে তার খোঁজ করতে দেখা গেলো চিঠি পড়ার ফাঁকে কোন সময় সে চলে গেছে।

একটু বাদে সে রাত্রির মত মজলিশ ভেঙে গেলো।

সারা রাত উদ্বেগে হরিচরণবাবু ঘুমোতে পারলেন না। একমাত্র মেয়ে সে কিনা শেষে এই করলো, আর রবীন তাকে তিনি শৈশব থেকে স্নেহ করে আসছেন, সে এমনি ভাবেই সেই স্নেহের প্রতিদান দিলে। বংশের এই কলঙ্ক তিনি চাপা দেবেন কেমন করে? কিন্তু তাঁর রাণু আর রবীন কি এতটা নির্ম্মম হতে পারবে তাঁর উপর? মনে তো হয় না, এখুনি হয়তো তারা ফিরে আসবে সামান্য একটা বাজী উপলক্ষ্য করে একটা রহস্য করছে বৈ তো নয়!……

কিন্তু রাণু ও রবীন ফিরলো না, সারা রাত তাদের আগমন প্রতীক্ষায় হরিচরণবাবু জেগেই রইলেন।

পরদিন সকালে যথাসময়ের অনেক আগেই সকলে একে একে হরিচরণবাবুর বৈঠকখানায় এসে জড় হলেন। বেলা তখনও বেশী হয়নি। হরিচরণবাবু আধ-শোয়া অবস্থায় বিমর্ষমুখে বসে ছিলেন, সকলেই তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনার প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন এমন সময় রাণুকে নিয়ে রবীন এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। তারপর ঘরের ভিতরে এসে হরিচরণবাবুর পদধূলি নিয়ে রবীন সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে বললো—আপনারা এবার প্রমাণ পেলেন তো, যে তরুণ সাহিত্যিকদের বুদ্ধি ও প্রতিভা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী। এখন আপনাদের প্রতিজ্ঞা আপনারা রক্ষা করুন।

কথাটা উপস্থিত সকলের গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিলেও তখন প্রত্যুত্তর দিবার মত কিছুই ছিল না।

রাণু ও রবীন হরিচরণ বাবুর মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলো, হরিচরণ বাবুর মুখের প্রসন্নতা আবার ফিরে এল।

তখন না হলেও পরে হরিচরণ বাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন, রাণুর সঙ্গে রবীনের বিয়েটা সেখানে না হলেও হয়েছিল কোলকাতায় ফিরে এসেই। নিমন্ত্রণের ভূরী-ভোজন থেকে আমরাও বাদ যাইনি।

এইটুকুই রবীনের বিবাহের রোম্যান্স!

নারী-প্রগতি

শ্রীসুনীলকুমার ধর

সুচরিতাসু,

জবাব না পেয়ে রাগ কোরেছ নিশ্চয়, নইলে চিঠি লিখতে ত' তুমি কখনও এত দেরী করো না! কিন্তু যে প্রশ্নের জবাব চেয়ে চিঠি লিখেছিলে, ঠিক ফেরৎ ডাকে তার উত্তর পাঠালে, তুমি যে আমার উপর চিঠি না লেখার চেয়ে একটুও কম রাগ কোরতে না, এই যা সান্ত্বনা। কিন্তু কিছু না লিখলে রাগ ভাঙানোর কোন কৈফিয়ৎ-ই এখন নেই, তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে যা হোক কিছু লিখতে হবে বৈকি! তবু-ও বলছি, দোহাই তোমার, রাগের মাথায় ভুল বুঝো না!

নারী-প্রগতির কথা ব'লতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে স্বাধীনতার কথা। নারীর স্বাধীনতার কথা। অথচ ঘরে বাইরে আমরা কেহই স্বাধীন নই। যাঁরা বলেন বাইরের স্বাধীনতা ভিন্ন ঘরের স্বাধীনতা আসে না কিংবা ঘরের স্বাধীনতা ভিন্ন বাইরেয় স্বাধীনতা আসে না—তাঁদের কেহই অন্যায় বলেন না, কিন্তু আমার মনে হয় এই কলহের জন্যই আমরা আজো অনেক পিছনে পড়ে আছি—সবদিক দিয়ে! এই দেব-দেবীবহুল ও পুরুষের স্বেচ্ছাচার শাস্ত্রের দেশে খুব শীঘ্রই যে এ কলহ মিটবে তা আমার মনে হয় না। কিন্তু এমনি মজা যাঁরা শাস্ত্রের (মনু) দোহাই দিয়ে ঘরকে air-tight কোরে রাখতে চান, তাঁরা কোন দিনই স্বীকার কোরতে চান না যে, ঐ শাস্ত্রেই আছে—যে ঘরে নারীর যথার্থ মর্য্যাদা আছে, অবরোধের বেদনায় নারীর অশ্রু যে বাস্তভূমির মাটী সিক্ত করে না, সেই ঘরেই ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব! কিন্তু আসল কথা কি জানো, শাস্ত্র ঐ সব ভণ্ডদের সত্যকারের নজির নয়। আর তা না হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা বন্ধনের প্রবৃত্তিই তখনকার (শাস্ত্রকারদের সময়) মানুষকে শাস্ত্ররচনায় প্রবৃত্ত কোরেছিল। আর এ প্রবৃত্তির মূলে ছিল instinct (পাশবিক) দরজা বন্ধ রাখলেই ঘরের পবিত্রতা রক্ষা হয় এই মোটাবুদ্ধিই তাদের ছিল কিন্তু বন্ধ ঘরের আবহাওয়া দূষিত হয়ে মানুষের মনকে আক্রমণ করে এ বৈজ্ঞানিক তথ্য তাদের জানা ছিল না। তাই একাধিপত্যের সুযোগ পাওয়া দেশে পুরুষ তার নিজের সুবিধামত শাস্ত্র তৈরী কোরেছে!

আমরা যতই আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী হই না কেন আমাদের এই শাস্ত্রগুলো যতদিন না সময়োপযোগী করে বদলে নেওয়া যাচ্ছে ততদিন আমরা আসলে জড়বাদী থাকবো। এবং এই জন্যেই এদেশের পুরুষ আবেগভরে যাকে দেবী ব'লে নিজের ঘরে ও হৃদয়ে বরণ করেছে তাকেই একদিন পদাঘাত কোরতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে নি। পুরুষের প্রয়োজন অনুসারে নারী দেবী ও দাসী হ'য়েছে।

পুরুষদের গালাগালি দিচ্ছি ব'লে মনে মনে তোমার খুব আনন্দ হ'লেও, তুমি যে মুখ ফুটে একে সমর্থন কোরবে না তা আমি জানি। হাজার হোলেও তুমি এদেশের মেয়ে, স্বামী দেবতা!

কিন্তু নারীকে বন্দিনী সেবাদাসী কোরে পুরুষের সে অনুতাপ হয় নি এমন নয় কিন্তু এ অনুতাপের আগুনে, সে অবিশ্বাসের সাপকে হত্যা কোরতে পারে নি ব'লেই, যে মুহূর্ত্তে অনুতাপ কোরেছে তার পর মুহূর্ত্তেই আবার পদাঘাত কোরতে তার এতটুকু সঙ্কোচ হয় নি। যার উপর নির্ভর করে চ'লে তাকেই বিশ্বাস করা সম্ভব কিন্তু এদেশের পুরুষ কোনদিনই নারীর উপর কোন বিষয়ে নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি। তাই নারীকে সে নিজের অন্যান্য অস্থাব সম্পত্তির পর্য্যায়ে ফেলেছে।

এদেশের নারী যে চিরকালই আজকের (ধরো বছর কতক আগ পর্য্যন্ত) মত জড়-পুটুলী ছিল না এর প্রমাণ কিন্তু অসংখ্য পাওয়া যায় তবু-ও সে স্বাধীনতা হারিয়ে সে

যে কেমন কোরে সংসারের এক কোনে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে আশ্রয় নিলে, শুধু আশ্রয় নিলে নয়, নিজকে পরগাছার মত পরাধীনতায় অভ্যস্থ কোরে ফেল্লে, এ এক আশ্চার্য্য ব্যাপার! এর জন্যে পুরুষ প্রধানতঃ দায়ী হ'লেও নারীকে একেবারে "কিচ্ছু জানে না"র পর্য্যায়ে ফেলতে পারিনে। তবে এটাও ঠিক আজ পর্য্যন্ত যারা বাইরে থেকে এসে ভারতের বন্দিনী নারীর দুর্দ্দশায় সাশ্রুনেত্র হ'য়ে সমবেদনা জানিয়েছে, সাহায্য করবার চেষ্টা কোরেছে—তাদের সাহায্য করবার ভঙ্গীতে আড়ম্বরেয় কোন অভাবই নেই কিন্তু আন্তরিকতা যে এক বিন্দুও নেই এ কথা যে কোন বিদেশী বা বিদেশিনীর লেখা ভারতে নারী প্রগতির ইতিহাস পড়লেই বুঝা যায়। আর নারীর স্বভাবগত দুর্ব্বলতাও পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে এদেশের যে সব পুরুষ সংস্কারকরা এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—"অসহায় নারী, আমার কথা শোন—নীতি অনুসরণ করো, তোমাকে অবরোধের কারগার থেকে মুক্ত কোরে বিস্তৃত আকাশের তলায় এনে দাঁড় করাব; তোমার পায়ের তলায় থাকবে স-সাগরা পৃথিবী আর সামনে থাকবে মুক্ত জীবন, সাচ্ছন্দ জীবন",—তাদের সদুদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান না হ'য়ে নারী যতবারই আত্ম-সমর্পণ কোরেছে পুরুষের হাতে ততবারই নারী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজকের নারী যদি মুখ ফুটে ব'লেই থাকে—'থাক্ বাপু; ঢের হ'য়েছে', সেটা হয়ত খুব কর্কশ শোনাবে পুরুষের কানে কিন্তু অন্যায় ও অসঙ্গত হবে না। তবে পুরুষের দয়ার কর্ত্তৃত্বকে অবজ্ঞা কোরে ফিরিয়ে দেওয়ার সাহস আজও হ'য়েছে কিনা, সে কথা বিবেচ্য।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই অন্য আর একজনের মধ্যস্থতায় পাওয়া যায়—তাতে বিপদও কম কিন্তু স্বাধীনতা এমনি জিনিষ, একে অন্যের সাহায্যে আয়ত্ত করা গেলেও আয়ত্তে রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। স্বাধীনতাকে আয়ত্ত কোরতে গেলে প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের দরকার এবং ভারতের বিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তা ও শিক্ষিতা নারীর (বিশেষ কোরে বাংলার) কতক পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী হ'য়ে উঠ্‌লেও এতদিনের মজ্জাগত ভীরুতা ও সঙ্কোচের পিছুটান যে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি এ কথা বোলতেই হবে। আর এ ভয় ও সঙ্কোচকে যে নারী কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে এমন মনে হয় না, এর জন্যে দায়ী তার anatomy, পুরুষের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরলে নারী কতদিনে প্রাপ্য স্বাধীনতা পাবে (সমান অধিকারের কথা উঠ্‌তেই পারে না) এবং একেবারে পাবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—তাই পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরলে যেমন চ'লবে না তেমনি একটু আল্‌গা পেয়েই পুরুষকে টেক্কা দিতে যাওয়া হবে অত্যন্ত হাস্যকর। পুরুষের হাত ধোরেই নারীকে উঠে দাঁড়াতে হবে কিন্তু পরে দাঁড়াবার শক্তি থাকার দরকার। সীতা-সাবিত্রীর কথা আজ আমাদের দেশে কেবল উপাস্য উপাখ্যান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা হয়ত সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা বিশ্বাস কোরতে পারবে না, না পারাই স্বাভাবিক, কেননা, আগুণ দহনই করে। আর মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যে কোন মতেই সম্ভব এ কথা এ বৈজ্ঞানিক যুগের কেহ বিশ্বাস কোরবে ব'লে মনে হয় না। আদর্শের দিক থেকে সীতা সাবিত্রীর তুলনাই হয় না কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাকে modify করা দরকার।

ঘর ভাঙ্গে ভাঙ্গুক। সহজলভ্য স্বাচ্ছন্দ্য, পরিমিত জীবন যাপনের মোহ ও অশুচিতার শুচিবাই না কাটাতে পারলে (তোমাদের পক্ষে এ কথা উচ্চারণ করাও পাপ, কি বলো?) ভারতের নারী-আন্দোলন কোন দিনই সফল হবে না। আত্মাহুতি দিতে হবে বৈকি!

চন্দ্র ও পৃথিবী

= অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণধন দে এম-এ =

তোমারে বেসেছি ভালো, এই শুধু মোর অপরাধ,
আর কিছু নহে দেবি !···এ কলঙ্ক তোমারি লাগিয়া
ললাটে আঁকিয়া গর্ব্বে সারানিশি রয়েছি জাগিয়া
স্তব্ধ নীলাকাশতলে। প্রেম মোর ছুটেছে অবাধ
শান্ত জ্যোৎস্নার রূপে। যৌবনের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ
সর্ব্বাঙ্গে উথলে তব, আমি শুধু রয়েছি চাহিয়া
তোমারি মুখের পানে,—কটীতটে উঠিছে গাহিয়া
তরঙ্গমেখলা মৃদু, পাতিয়াছে অপরূপ ফাঁদ
কানন কুন্তলরাশি, হৃদয়ের অফুরন্ত সাধ
উচ্ছ্বসিত-রূপে-গানে দিকে দিকে গেছে ছড়াইয়া,
তুষার বসনে তব গিরিস্তন রেখেছ ঢাকিয়া
আকুল সরম ভরে। সহিয়াছি শত অপবাদ,—
তবু আজ মোর পানে ক্ষণিক চাহিয়া দেখ রাণি,
মেঘের গুণ্ঠন আর দিওনা দিওনা মুখে টানি'!

চিত্র পরিচালক কা'দের হওয়া উচিত

শ্রীধূম্রলোচন

বোম্বাই ও পাঞ্জাবের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতীয় ফিল্ম-শিল্প ব্যবসায়ের উর্ব্বর ক্ষেত্র যে আজ বাংলা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে এটা বাংলার জনসাধারণের কাছে খুবই আশাপ্রদ; কারণ অন্নসমস্যার যুগে এই নবজাত ব্যবসা-শিশুর ক্রমবর্দ্ধমান জীবনী ও স্বাস্থ্যের ওপর বাংলার অনেক নরনারীর অন্নসমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

সব গন্তব্যের মত এই ফিল্মশিল্প ব্যবসায়েরও এমন একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে যা সরল, সুগম ও নিরাপদ; তবে সেটা জানা থাকা বা জানবার আগ্রহ থাকা চাই। এরও একটা বিজ্ঞানসম্মত দিক আছে যেটা নিজের ব্যক্তিত্বগর্ব্বে অস্বীকার করাতো যায়-ই না বরং স্বীকার করে নিলে তার মূল্য পাওয়া যায়।

বাংলার নামসর্ব্বস্ব অসংখ্য চিত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে দুই একটির ভিত্তি সত্যিই ব্যবসা-বুদ্ধি, অর্থ, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা পর্য্যন্ত এই যথানির্দ্দিষ্ট পথে চলতে রাজী নন।

অভিজ্ঞতা বোলে জিনিষ আমাদের দেশে নেই। বিশেষ কোরে সাহিত্য ও ফিল্ম-শিল্প-ক্ষেত্রে। কে অভিজ্ঞ এবং কে নয় ভাবতে গিয়ে ভাবনার সূত্র হারিয়ে ফেলি। যাঁরা দেশে বা বিদেশে থেকে কোন এক বিশেষ বিষয়ে আংশিকভাবে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কোরেছেন, তারা আসরে অবতীর্ণ হোয়েই সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা পুরুষ সেজে বসেন। একাধারে ডিরেক্টর, প্রডিউসার, সিনারিও লেখক, এডিটর কেউ বা ক্যামেরাম্যান পর্য্যন্ত। এঁদের প্রত্যেকেরই যে এক একটি বিশেষ বিভাগ ও স্বতন্ত্র কর্ম্মপদ্ধতি আছে তা এঁরা স্বীকার করতে চান না।

চান না প্রধানতঃ এইজন্য যে প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত অর্থ সরবরাহ করেন না তাঁদের। তাঁরা একজন লোকের কাঁধে লাঠী রেখে বাজী মাৎ করতে চান। বিশেষজ্ঞরাও পকেটে পয়সা পেলে তবে এক একটা 'খেল' দেখাতে থাকেন। দোষ তাঁদেরও বিশেষ দেওয়া যায় না। সপরিবারে হাওয়া খেয়ে তো আর ফিল্মশিল্পের বৈজ্ঞানিক দিক নির্ণয় করা ঘটে ওঠে না দিনের পর দিন। কাজেই—

কিন্তু এটাও তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে যে যোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে তাঁদের নিজেকে, শুধু আজকের জন্য নয় অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।

এখন দেখা যাক, কোন কোন বিভাগে ভারতীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণতঃ দৃষ্টি দেন না। প্রথমতঃ পরিচালন বিভাগ (Directing).

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালকই (Director) হচ্ছেন একমাত্র দায়গ্রস্ত কর্ণধার যাঁর হাতে উৎপন্ন চিত্রের শুভাশুভ ও সাফল্য নির্ভর করে। পরিচালক নির্ব্বাচনে, প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যক্তিগণই মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতর। সহকারী পরিচালক (assistant directors) লেখক (Writers) সংযোজক (Cutters) এবং যন্ত্রী (Cinematographers).

প্রযোজকের (Producers) চাহিদা মত চিত্র-গ্রহণ (Shooting) পরিচালনার দায়িত্বে প্রয়োজন মত নিজের সৃজন-প্রতিভার (Creative Spirit) আংশিক বিকাশ দেখিয়েও সহকারী পরিচালক নিজেকে যোগ্যতর প্রতিপন্ন করতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তা করেন না। নিজের ঘড়ি ধরা কাজটুকু সেরে নিতে পারলেই তাঁর ছুটি। এতে শুধু নিজেদের ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। তিনি লেখাও শেখেন না, ছবিতে কাঁচি চালাতেও শেখেন না—ক্যামেরা ম্যানের কাজ তো নয়-ই। এঁদের উন্নতির পথে বাধা এইখানেই।

লেখকরা পরিচালকের অনেকখানি সহায়। আমি গল্পাংশ রচয়িতার কথা বলছি না—যারা সিনারিও লেখেন। নিজের গণ্ডীটুকু ছাড়াও তাঁর যথেষ্ট দূরদর্শিতার (Visualization) প্রয়োজন কিন্তু সব সময়ে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁরা শুধু কথার পর কথার মালা গেঁথেই চলেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধনে তিনি কিছুই করেন না। তবে একটা জিনিষ তাঁরা আংশিকভাবে আপনা হতেই শেখেন যাকে বলে সংযোজনা (Cutting) তার প্রাথমিক অবস্থার খানিকটা। পক্ষান্তরে ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান-ই সাধারণতঃ থাকে না।

সংযোজকরাই (Cutter) সত্বর পরিচালকের কর্ম্ম-পদ্ধতিটুকু আয়ত্ত করতে পারেন কারণ পরিচালকের কাজ নিয়ে তাঁরাই বেশী নাড়াচাড়া করেন। যন্ত্র-শিল্প-বিজ্ঞানের (Mechanical) সূক্ষ্ম শিক্ষণীয়টুকু তাঁরা আয়ত্ব করেন আর আয়ত্ব করেন পরিচালকরা তাঁদের প্রতিভার যে বিশেষ স্পর্শটুকু ছবিতে দেন সেইটুকু। কিন্তু ছবি তোলবার সময় তাঁরা পরিচালকের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য পান না।

যে কয়জনার কথা বলা হ'ল এঁদের মধ্যে পরিচালকের পাশে থেকে প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ ও সুবিধা পান সহকারী পরিচালক। লেখকরা তাঁর আফিসে বসে শুধু ক্যামেরা বিভাগের থিওরী নিয়ে মাথা ঘামান আর সংযোজকরা ল্যাবরেটরীতে বসে পরিচালকের টেকনিক জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন।

সহকারী পরিচালক চিত্র-গ্রহণের সমগ্র ব্যাপারটীতে পুরোধা হ'য়ে থাকেন। যা কিছু কার্য্য সবই তাঁর চোখের সামনে ঘটে। তবে তিনি ক্যামেরার ওপর সব সময় সবিশেষ নজর রাখতে পারেন না, আর বোধ হয় সব সময়ে সম্ভবপরও হয় না; তা না হোক, তঁর দৃষ্টিশক্তি সমগ্র ছোট বড়ো ব্যাপারের ওপর সজাগ থাকে।

এখন যন্ত্রীর (Cinematographer) কথা ধরা যাক।

প্রকৃতপক্ষে তিনিই চাক্ষুস কর্ম্মকর্ত্তা। পক্ষান্তরে পরি-চালকের পাশাপাশি থেকে আগাগোড়া তিনি কাজ করে যান। অধিকন্তু পরিচালকরা অনেক সময় তাঁর ওপর অনেকখানি নির্ভর করে থাকেন।

যন্ত্রী নিজের কান দুটিকে অবাধ মুক্ত করেও নিজের কাজ চালাতে পারেন, যাতে করে তিনি অভিনেতাদের প্রতি পরিচালকের সতর্কবাণী বা উপদেশ, অভিনেতাদের কথোপকথন প্রভৃতি শুনে সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে

পারেন। নিত্যনূতন কথোপকথন (Dialogue) শুনে তিনি নিজে ওবিষয়ে বেশ ভালরকমই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন।

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, যিনি এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচালকের সমগ্র কার্য্যপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ ও সুবিধা পান এবং সেই সঙ্গে সমগ্র চিত্র নাট্যটির কার্য্যতঃ বিকাশ দেখতে পান, যেমন পারেন—যন্ত্রী (Cinematographer). এক্ষেত্রে যদি কোন শিক্ষিত মেধাবী যন্ত্রী, যাঁর কতকগুলি নরনারীকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা আছে, স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় অনায়াসে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে বৃত হতে পারেন।

খুঁজলে এমন দৃষ্টান্ত খুবই পাওয়া যাবে, যেখানে যন্ত্রী পরিচালকরূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। Carl Freund পাঁচ বছরের ওপর ছবি তুলে সম্প্রতি পরিচালক হয়ে বসেছেন, আর Rouben Mamoulian এখন পরিচালক হ'য়ে নিজের যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিচ্ছেন।

যিনি ক্যামেরার কার্য্য-কৌশল প্রণালীর মূল্য বোঝেন, আলোক বিষয়ের গুরুত্ব জানেন, দৃশ্য-সজ্জায় প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রত্যেকটী যাঁহার নখদর্পনে, অভিনেতাদের ভাবাভিব্যক্তি থেকে জানালার পরদা টাঙানর পটুত্ব পর্য্যন্ত যাঁর অনুশীলনে সহজসাধ্য হয়েছে এমন যন্ত্রী পরিচালকের আসন দাবী করলে তাঁকে অস্বীকার করবে কে ?

একজন যন্ত্রীর পক্ষে যে যে গুণ থাকলে তিনি পরিচালক হ'তে পারেন তা হচ্ছে : (১) পর্য্যবেক্ষণ পটুতা বা সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি (observation) (২) সৃজন প্রতিভা (creative ability) এবং (৩) নাটকীয় জ্ঞান (a sense of the dramatic).

পর্য্যবেক্ষণ পটুতার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই একটু বলেছি। যন্ত্রী বা অপর যে কেউ হোন এই দূরদৃষ্টি বা পর্য্যবেক্ষণ পটুতা না থাকলে এক্ষেত্রে তাঁর কোন স্থান নেই। যিনি দেখে শিখতে পারেন না তিনি কিছুই শিখতে পারেন না।

জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের স্বতন্ত্রভাবে শেখানর সময় ফিলম-শিল্প ব্যবসায়ে নেই।

যন্ত্রীর পক্ষে সৃজন প্রতিভা একান্ত প্রয়োজনীয়। সেরূপ প্রতিভাধররা সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়ার নূতন রসসৃষ্টি করতে থাকেন, ইচ্ছামত ক্যামেরায় angle দেন।

পরিচালক হোয়ে তিনি এ সকল কাজতো করবেনই, তাছাড়া কতকগুলি নরনারীকে তাদের ভাবানুভূতি দিয়ে লীলায়িত করে তোলেন, গল্প ও আখ্যায়িকার টুকরো ও অন্যান্য উপকরণের ভগ্নাংশ নিয়ে। যদি কোন যন্ত্রী স্বীয় প্রতিভার বিকাশ দেখিয়ে পরিচালক হোতে পারেন তো তিনি দেখবেন যে তাঁর ধারণা, তাঁর যুক্তি, তাঁর স্বপ্নকে মূর্ত্তি দেবার কি সুযোগ-ই না তাঁর হাতে এসেছে এই ছবি তৈরী করার ভেতর দিয়ে—।

নাট্যজ্ঞান বা নাটকীয় রসবোধ ও কম দরকারী নয় তাঁর পক্ষে। এবং এইটুকুরই ওপর যন্ত্রী-পরিচালকের সাফল্য নির্ভর করে। কাজের সময় তাঁর যন্ত্রী-মনটুকু ক্যামেরা নিয়ে কাজ করে যাবে এবং বাকীটুকু পরিচালক রূপে কাজ করে যাবে নাটকীয় বস্তুতন্ত্র নিয়ে !

যে যন্ত্রী-পরিচালক কর্ম্মপদ্ধতির পেছনে সজাগ দৃষ্টি না রাখে, চলচ্চিত্রের নাটকীয় রসবোধ যাঁর ধারণায় সহজ ভাবে ধরা না পড়ে, তিনি কখনো পরিচালক হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবেন না। এই যুক্তিগুলি বারবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

ভূতপূর্ব্ব যন্ত্রী এমন অনেক পরিচালকের ছবি দেখা গেছে যা ফটোগ্রাফীতে উৎকৃষ্টতর হয়েও শুধু নাটকীয় সন্ধিক্ষণগুলির কলা-সম্মত সুপ্রকাশ না হওয়ায় দর্শক সাধারণের মাত্র নিন্দাই কুড়িয়েছে। সম্প্রতি এমন যন্ত্রী-পরিচালকও দেখা গেছে, যিনি কলা-কুশলী প্রথম শ্রেণীর নট-নটী, উৎকৃষ্ট গল্পাংশ হাতে পেয়েও সন্তোষজনক ছবি তৈরী করতে পারেন নি। অবশেষে পরিচালক বদল করে, ভাল দৃশ্যগুলির চিত্র পুনর্গ্রহণ ক'রে তবে সে ছবিকে বাজারে প্রকাশ করতে হয়েছে।

এটা জানা কথা, যে যখনই কোন সুনিপুণ যন্ত্রী

পরিচালকের আসনে বসেন, তিনি যন্ত্রীর সঙ্গে একযোগে কাজ তো করবেনই তা ছাড়া চিত্র-পরিচালনার সুদুর্লভ কৌশলটুকু তাঁর নখদর্পনে থাকবে তাঁদের চেয়ে ঢের বেশী রকম যাঁরা ভিন্ন পথ হ'তে এসে পরিচালক হয়েছেন।

চিত্র-নাট্যোক্ত চরিত্রের প্রত্যেক নট-নটীকেই একবার ক'রে ফটোগ্রাফীক 'ব্রেক' করানো দরকার এবং প্রত্যেক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সুষ্ঠু বা সুন্দর ভঙ্গীগুলি নজীব স্বরূপ ছবিতে ধরে রাখা দরকার এবং প্রত্যেক B ckgroundটী পর্য্যন্ত finally সাজিয়ে নিয়ে মহলা দিলে খারাপ ছবি তোলার দরুণ সমস্ত Productionটী মাটী হয় না। এবং এ ব্যাপারগুলি ভিন্ন-পথাগত পরিচালক অপেক্ষা যন্ত্রী-পরিচালকের নিকট বেশী করেই প্রত্যাশা করা যায়।

যন্ত্রী বা যন্ত্রী-পরিচালক যিনিই হউন না কেন কর্ম্ম-জীবনে সাফল্যলাভ করতে হ'লে এই সৃজন প্রতিভার (creative ability) একান্তভাবে অনুশীলন করতে হবে। তবে এই অনুশীলন স্পৃহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

যদি যন্ত্রী দরদ ও বুদ্ধি দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক ও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের কার্য্যপদ্ধতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁদের 'হাতের প্যাচ' টুকু আয়ত্ত করতে পারেন, আজ না হোক দু'দিন পরে পরিচালকের আসনে বস্‌তে তাঁর ডাক আসবে-ই।

আমরা একথা বলছি না যে ভিন্ন পথাগত চিত্র-পরিচালকরা যন্ত্রী-পরিচালকদের অপেক্ষা সবক্ষেত্রেই হীনবোধ, স্বল্পপ্রতিভান্বিত বা অপর কিছু। আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই যে দায়িত্বপূর্ণ পরিচালকের সম্মানজনক আসন লাভের জন্য একমাত্র যন্ত্রীই বোধহয় সর্ব্বাধিক নিকটতর ও যোগ্য ব্যক্তি। *

* Carl Laemmle, Jr এর প্রবন্ধ থেকে।

মেঘদূত

—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী এম. এ
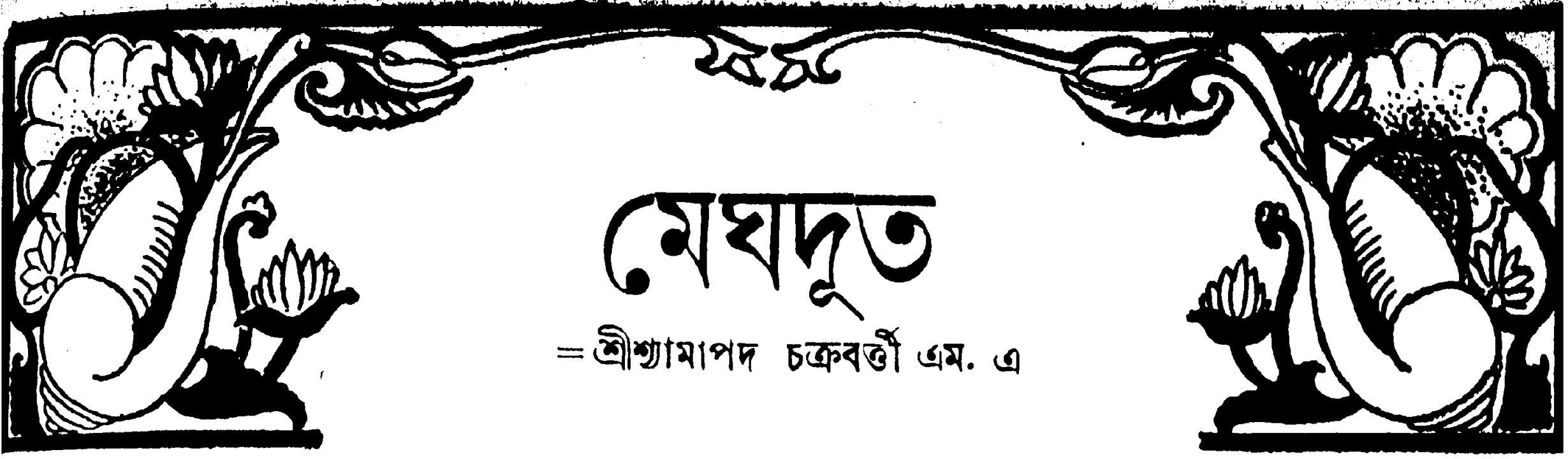
যে দিন মরিল যক্ষ রামগিরিশিরে,
আমি ছিনু মৃত্যুশয্যাপাশে।
বিরহী বন্ধুরে মোর বার বার ক'রেছিনু মানা ;
বলেছিনু—
'তোমার বক্ষের বহ্নি সঙ্গোপনে বক্ষেই জ্বলুক,
কি হবে তা' মেঘেরে জানায়ে ?
পাঠায়োনা অলকায় দূত করি তা'রে।'
শোনে নাই।

উড়িল যক্ষের মেঘদূত
মধুর দাক্ষিণ্যভরা দক্ষিণ-সমীরে পক্ষমেলি'।
শত গিরিমরু আর কান্তারে প্রান্তরে আর নগরে সজল ছায়া ফেলি'
যক্ষের ভবন শিরে শেষে বুঝি হ'লো উপনীত।
যক্ষের ব্যথার গান হয়তো শুনালো তার অলকাবাসিনী দয়িতারে
ভারাতুর মেঘের মল্লারে
মন্দাক্রান্তা তালে।
তা'রপর একদিন উৎকণ্ঠিত বিরহীর কাছে
ফিরে এলো।
সমবেদনার ছলে নয়নের কোণে অশ্রু আনি
প্রচ্ছন্ন আনন্দভরে মেঘ তা'রে শুনাইল বাণী—
'হায়, যক্ষ, মোর গান কেহ শুনিল না।'
ক্ষণেক নীরব রহি কহিল আবার—
"বাতায়ন মুক্ত ছিল :
হেরিলাম দীপোজ্জ্বল গন্ধিত শয়নকক্ষে তব
ফেন-শুভ্র পুষ্পাকীর্ণ কোমল পেলব শয্যাতলে
পুরুষের বক্ষোলীন প্রিয়ারে তোমার।"

কাঁপিয়া উঠিল যক্ষ ! মেঘ কহে—
'জানোইতো
অতল-রহস্যময়ী নারী।
নারীর চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্যলেখা স্বয়ং বিধাতা নাহি জানে।"
ভাঙিয়া পড়িল যক্ষ, পলকে সে চূর্ণ হ'য়ে গেল।
যে-স্বপ্নের স্বর্গ রচি রে'খেছিল অতি সাবধানে,
তা'র সীমাচ্যুত যক্ষ কোথায় আশ্রয় পাবো বলো ?
অন্তরে বাহিরে অন্ধকার ;
যাত্রাপথ সমাকীর্ণ সূচীমুখ কণ্টকে কণ্টকে,
জাগরণে বাস্তবের দাহ,
তন্দ্রা ক্ষত বিষাক্ত স্বপনে।
নিমেষে বিরহী যক্ষ মৃত্যুমাঝে মিথ্যা হ'য়ে গেল।

আমারে বাসিলে ভাল

—সনেট্—

= শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্-এ =

সে দিন ধরণী ছিলো মধুর উজ্জ্বল,
প্রাণ ছিলো প্রেরণার আনন্দ আগার—
দৃষ্টি ছিলো নয়নের অসীম অপার
মন ছিলো কল্পনায় অথির চঞ্চল ;—
বক্ষে ছিলো রাগ রক্ত প্রেমের স্বপন ;
ধমনীর রক্ত-নৃত্য আবেগ কম্পন
জাগাইত অভিনব কামনা ইন্ধন
বহাইত দেহমনে পুলক তখন

রমণীর রূপ-তৃষা সে যৌবন দিনে।
সৃজিত যে উন্মাদনা আমারি এ প্রাণে
হে কল্যাণি, শুচিতায় নিলে তারে জিনে।

শান্ত করি দিলে তৃষা চুম্বনে আশ্লেষে,
ভরি দিলে হৃদি মোর প্রশান্তির গানে,
আমারে বাসিলে ভাল নির্ভয়ে অক্লেশে।

?
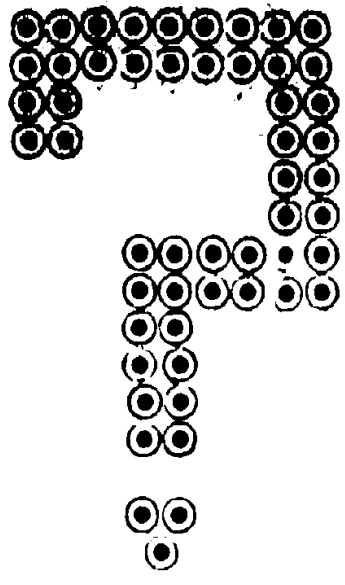
—শ্রীবাঙালীচরণ বাঙাল—

জীবনের পথে চলতে চলতে হুঁচোট খেয়েও পড়তে তো য়, যে ভাবেই যে পড়ে যাক পতনের আঘাত লাগেই লাগে··· থা পায়···ক্ষণকালের জন্য তখন জাগে প্রাণে পতনের বসাদ···আঘাতে আহত মন বিদ্রোহী হয়ে বলে···এ গ্লানি হবো না আর···পথ বদলে চল···উঠবে চল···সবাই যে লেছে চলার গৌরব নিয়ে···গৌরব করার পথে। পড়েইছো হয় প্রথম একটা ভুলের দুর্ভাবনা দমন করতে আরও ল আরও অপরাধে মগ্ন হয়ে···উঠা কি যায়না তবুও ?

···পথের বাঁকে থমকে সে ভাবে। সেই বাঁক যে াক, বাঁক তো বলে না কোন দিকে চলে গৌরব !! নী চোখে জমে প্রাণের কামনা যত···অনুতাপ বহ্নি জ্বলে বেদনার্ত্ত চোখে। আঁখি ছেয়ে থাকে শ্রান্ত যৌবনের অশান্ত ল মায়া···জীবনের মায়া বড় কিম্বা বড় জীবনের ক্ষণিক াস কাম ?

···জীবন তো চায় গতি···সে যে চির চঞ্চল গতিশীল··· মে না সে কোন বাঁকে···কারও ভয়ে···কারও মমতায়। তে আপনভোলা মায়ার কাঙাল মন বাধা দেয় জীবনের পথে চলার সময়···পথে পথে কত মায়া কান্না কাঁদে মন কতবার লুটায় ধরায়···লুটায়ে চরণে চলমান জীবনেরে য়ে দিতে সে চায় !! ফিরে যেতে চায় যেখানে পেয়েছে ···ফিরে গিয়ে দেখে নিতে চায় মন বেদনাদায়কে··· দিতে চায় ব্যথা যে দিয়েছে তাকে···ভুলে যায় সেওতো ছে পথে, অবিরাম গতিশীল তার ও যে জীবন···নেইতো যেখানে সে ছিল···পেছনে সে পড়ে অথবা চলেছে গ, ব্যথা সে দিয়েছে কি সে আপনার গোপন ব্যথার কয় গেছে ব্যথার্ত্ত ভাষায়···ব্যথা তার দান কিম্বা সেই আঘাতের প্রতিদান···বুঝে কি ব্যথিত জন ?

···পথে চলে চলন্ত জীবন···চলা শুধু চলা···চলাই তো বেঁচে থাকা, চলা শেষ জীবনের শেষ···জীবন বিকৃত নয়··· জীবন জীবন···কলুষ কালিমা তারে করেনা অচল···কালো ছাপ থাকে দেহে, কালো হয় মন···কালো অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকে···জীবন তখনও চলে···পথে যারা দেয় বাধা তাদের সকল ফেলে চলে যেতে চায়···এই ঠেলে ফেলা, ফেলে পথ চলা দ্বন্দ্বের মাঝে পরিচয় হয় কত পথিকের সনে, জানা হয় কত যে অজানা···পথে চ'লে অজানা জানার দলে মাত্র কয়জনে মনে হয় যেন কত জানা···কারও মুখ মনে আনে কত কথা—অতীত দিনের ; ক'জনারে মনে হয় পূর্ব্ব-পরিচিত···মুহূর্ত্তের আলাপে কেহ হয় যেন কত আপনার··· কোথায় কে দেখেছে কারে, কোথা থেকে এলো সে আবার···কিসে সে আপন···কেন মন চায় তারে নিরালায় ডেকে কয় সব বেদনার কথা···জীবনের কথা, তারে বলে যেন হবে বেদনা মোচন···বলে যেন পাবে সান্ত্বনা···কে সেই অজানা পথের চেনা···কেন এতো মনের আপন··· চলা পথে ব্যথা সে দিয়েছে মনে অথবা পেয়েছে ব্যথা,— বেদনাদায়ক কিম্বা ব্যথিত সে জন ? তারে বলে বেদনা জ্ঞাপন করা হয় কিম্বা হয় আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া ?

ব্যথিতের প্রাণে বাজে ব্যথার বেদনা···হৃদিতন্ত্রি শিহরিয়া উঠে তার ব্যথার্ত্ত দৃষ্টির আঘাতে অজ্ঞাতে···ব্যথিতেরে করে সে আপন······সমজ্ঞানে সমব্যথি জনে সমবেদনায় বুকে তুলে নেয়···স্থান দেয়···সাথে নিয়ে চলে···কাণ পেতে তার কথা শুনে···কতবার কাঁদে তার সনে···ব্যথিত সে, আঘাত পেয়েছে সেও···প্রাণে তাই জাগে তার বেদনায় করুণ কাকলি···চোখে আসে জল···দীর্ঘশ্বাসে বুক ফুলে উঠে···সশব্দে ধ্বনিয়া উঠে হৃদস্পন্দন···সেই জল বায়ু নাদ সমতানে কয়—"তোরা এক···ওরে তোরা পরস্পর মিলে

পথ চলে বেদনারে কর জয়···জীবনেরে কর দুর্জ্জয়···উন্নয়নে কর দৃঢ়পণ···ব্যথিত জীবন পথে বেদনার সাথে হয়েছে যে আত্মপরিচয় অবজ্ঞেয় নয় যে তা ; এইতো মিলেছে পথ······ জীবনের নিঃশঙ্ক প্রগতি শক্তি পায় নিগূঢ় ব্যথায়”···অগ্নি জল বায়ু তার অতীত পুড়িয়ে নব সাজে নব রূপে নবীন জীবন গড়ে···সে জীবন ভোরে থাকেনা কালিমা, অতীতের গ্লানি কিম্বা স্মৃতির তাড়না।” সে নব জীবন লোভে লুব্ধ হয় ব্যথিত পতিত আর্ত্ত অনাশ্রিত অধীর জীবন···

আঁখি জল ঝরে···করজোড়ে মিনতি জানায় স্তব্ধ পথহারা ···পথিক দাঁড়ায় পাশে···ক্ষণকাল ভাবে শক্তি তার আছে কিম্বা নাই—নিজে চলে অচলেরে চালিয়ে নিতে···বিচার বিবেক বোধ ছেয়ে ফেলে আর্ত্ত মানবতা···বাড়ায় সে হাত··· অচল অশক্ত পায় চলমান জীবনের বিজলী পরশ···সে পরশ গতির পরশ···সে পরশে ফিরে আসে চলার হরষ···

চলে তারা···অশ্রু মুছে ব্যথা গ্লানি ভুলে···শক্তি, গতি, উন্নতির আনন্দে মাতাল যেন···অচলেরে চালিয়ে নিয়ে চলমান করে তার শক্তি ক্ষয়, প্রতিভার অপব্যয় কিম্বা মানে মানবের প্রাণের নির্দ্দেশ ?

পথের পথিক চলে···পাশের বসতি থেকে কতজন কত কথা কয় ; কেউ কয়···ওই যে চলেছে দু'জন···কোথা যাবে ওরা···এলো কোথা থেকে···দুজনার চলা যেন বড় অসমান ? রূপ লক্ষ্য গতি, ফিরে চেয়ে দেখা···চলে যেতে থামা···সবই কেন এত অসমান ? পেছনের জন যেন ফিরে চায়, বারবার দেখে কতদূরে এলো, কেন এলো, কেন ছেড়ে এলো—কতকাল ধরে যেখানে সে ছিল সে স্থান থেকে, মন তার যেন করে হায় হায়, যেন ছুটে ফিরে যেতে চায়···সেই পুরানো প্রাঙ্গনে যেখানে ছিলনা কেবলি চলা, পথ হাঁটা, এত পরিশ্রম··· অদূরে বা দূরে কি রয়েছে কোথা ছিল না অজানা যখন··· পুরানো জানার প্রতি এমনই মায়ার বাঁধ···অজানারে জানার ব্যগ্রতা নাই···পথ চলে এগিয়ে চলতে তার এতটুকু আগ্রহ যেন নাই···আছে শুধু দুঃসহ শ্রম···এরূপ চলায় যেন তৃপ্তি নাই···শুধু বিরক্তিই আছে।

অন্যজন···সেই-ই আগে চলে······পেছনের জনে দেখিয়ে চলে সে পথ···সেও থামে, সেও ফিরে চায় পেছনে পায়ের ধ্বনি নীরব যখনই হয়···তার দৃষ্টি যেন বলে······“এরকম দাঁড়ালে কি চলে ···চল চল দাঁড়িয়ে কি ভাব········ অজানা পথের রেখা চলেছে অশেষ······সীমা-হীন শ্রান্তিহীন··· পেছনে সে পড়ে নেই কারও মমতায়, চলেছে সে আগে। ভালো না পেছনে পড়া···থেমে ভাবা··· ফিরে ফিরে দেখা···যখন যে পথেই চল ; থামা ভাবা ফিরে দেখা দুর্ব্বলতা শুধু··· অতীতের মোহ···উদ্যমের অভাব বুঝায়। ভালো যদি নাই লাগে···উদ্যমের এতই অভাব যদি, শ্রান্তি যদি ভেঙে দেয় চলার আগ্রহ শক্তি তবে চলা কেন··· বড় কথা বলাই বা কেন···?

সঙ্গী বলে···শ্রান্ত আঁখি তুলে—“সবাই ভাবো কি পাষাণ কঠোর তোমারই মত···অতীতের মায়া দোষনীয়, তবু একদিন অতীতও যে ছিল—অজানা অজ্ঞেয় ভবিষ্যতেরই মতো প্রেরণাদায়ক···তবে কেন অতীতেরে এত অসুন্দর ভাবো !! কেন তবে অতীতেরে অতীত না ভেবে ভবিষ্যত ম্লান মনে কর !! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের পথ পড়েছে পেছনে, সম্মুখে অশেষ পথ যুক্ত তারি সনে। অচ্ছেদ্য অশেষ পথে—অশ্রান্ত জীবন চ'লে কতটুকু করেছে অতীত—কতক্ষণ থাকে ভবিষ্যত··· প্রতি পলে অতীতের কোলে ভবিষ্যত মূর্চ্ছা যায় সংক্রামক ব্যাধির মতো বর্ত্তমান যে মুহূর্ত্তে তারে স্পর্শ করে। বরেণ্য, শোভন যদি ভাবো এই ক্ষণজীবি ভবিষ্যতে, এত গর্ব্ব এতই আনন্দ কর মহামারীসম খল মারাত্মক বর্ত্তমান লয়ে, দিতে কি পার না শুধু অতীতেরে এতটুকু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, গৌরবের প্রাপ্য অংশ তার !!! একি নয়—মিথ্যাময় আত্ম-পরিচয়, নয় কৃতঘ্নতা, রূঢ় অবিচার ?”

সংস্কার

— শ্রীশেফালি রায় —

সরলা সত্যই ছিল সরলা···অনেক সময় তাঁর নির্দ্দোষ সরলতার দরুণ কেহ কেহ বলতো 'বোকা'···গ্রাহ্যও সে করতো না, কখনও কখন প্রত্যুত্তরে শুধু বলতো···"আছি বোকা বেশ আছি তা তোমাদের কি?" তার সরল ছেলেমানুষী ভাব স্বভাবের জন্য পাড়ার সবাই তাকে স্নেহ করতো।···আদর করে' ডেকে হ'ক না হ'ক কথায় রাগিয়ে রগড় দেখতেও ছাড়তো না।

বিয়ে হ'ল সরলার···বর পূর্ব্বেরই পরিচিত···দু'জনার ভাব হ'ল খুব···পাড়াপড়শীরা বলতো "কেমন সরি, বলিনি··· হ'বি তুই ভাতার সোহাগী···" স্বামীর আদরিণী হ'বার ভবিষ্যতবাণী পাড়ার সবাই যখন তখনই সরলাকে শুনাতো··· কারণ···সরলার নাকের ডগাটা সব সময়ই ঘেমে থাকতো খুব। নাকের ডগা ঘামা নাকি মেয়েদের স্বামীর আদরিণী হবার নির্দ্দেশ···বিয়ের পূর্ব্বেও ঘামতো···বিয়ের পরে সবাই জোর করে বার বার বলতো···সরলা কেবলই নাকের ডগাটা রগড়ে দেখতো ঘেমেচে কি না···কপাল থেকে সিঁদুরও পড়ে নাকের উপর···ওটাও নাকি আর একটা বিশেষ লক্ষণ। সরলার নাকি দুটোই দেখতে পাওয়া যায়···সরলার বুক ফুলে ওঠে যতবার সে অপরের মুখে শোনে···যতবার সে নাকের ডগাটা রগড়ে দেখে।

প্রাতঃস্নানের পর কপালে সিঁদুরের টিপ্ পরবার সময় মনের আবেগ বশতঃ হাত কেঁপেই হ'ক বা খুব পুরু করে' সিঁদুর পরবার জন্যই হোক, সরলার নাকের উপর সিঁদুর পড়তোই,—আর দেহের স্বাভাবিক কোন বিশিষ্ট উষ্ণতার জন্যই হোক বা বারংবার হাতে রগড়ানোর জন্যই হোক— নাকের ডগাটা ঘামতোও মন্দ নয়···

সরলা এই লক্ষণ দুটী বিশ্বাস্ করতো প্রাণে প্রাণে। সরলার স্বামী কালাচাঁদ—যখনই আদর করে বলতো ভালোবাসার কথা···যখনই বড়াই করতো বলে' তার প্রেমের কথা···সরলা অপরূপ অঙ্গ ভঙ্গিমায় হেলে দুলে··· তর্জ্জনীতে নাগের ডগাটা নির্দ্দেশ করে' শুধু বলতো··· "ঘামে যে, সিঁদুরও পড়ে··· জানো না!!"

শ্রীশেফালি রায়

অমনি সে নাকের ডগাটা রগড়ে সিক্ত সিঁদুরে আঙ্গুলটা রঙিয়ে—কালাচাঁদের চোখের সামনে ধরে বলতো··· "দেখছো।···ঘামে সিঁদুরে লালে লাল"···টেনে টেনে এমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়সূচক স্বরে সে বলতো যে কালাচাঁদ সগর্ব্বে সরলাকে বুকে টেনে নিয়ে—বলতো···"তাই তো এতো ভালবাসি তোমায়, না—?" সরলা হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে আড় চোখে চেয়ে বলতো···"নিশ্চয়ই"

পাড়ার বিন্দি সেদিন রগড় করিতে বললে···কই সরি নাকটা শুকনো যে রে···ব্যাপার কি ?

সরলা চমকে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নাকে হাত দিয়ে চট্ করে নাকটা দেখে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে—"তোমাদের কথা বার্তার যেন ছিরি নেই···এইতো ঘামানো রয়েছে—কই শুকনো···এসব ভাল মন্দর কথা নিয়ে তোমরা যখন তখন রগড় করোনা বলে দিচ্ছি···ওসব আমার ভাল লাগে না··· শুকনো যেদিন থাকবে সে দিন আমিই সবার আগে টের পাবো···দিনে দু'শবার আমি নিজেই ডগাটা হাতিয়ে দেখি।"

—সেদিন সকাল থেকেই খুব ঠাণ্ডা। পশ্চিমে হাওয়ায় শীতের কন্‌কণানী—গায়ে কাঁটা দেয়···একটা জমির মামলায় দু'তিন দিন থেকে কালাচাঁদ খুব ব্যস্ত···উকীল মোক্তারের বাড়ী ঘুরে বেড়ায়···সরলার সঙ্গে বেশী কথা কইবার ফুরসত নেই···সরলা জানেনা কিসে এতো ব্যস্ত তার স্বামী··· ভাবে "বাড়ীতেই থাকেন না যে বেশীক্ষণ—ব্যাপার কি ? ভালো কথা তো নয় !"

সরলা অত্যন্ত উদ্বেগাকুল হয়ে উঠলো। মাঝে একবার কালাচাঁদ বাড়ী এসেছে মামলার কি দলিল তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে। দলিল খানি অনেক কষ্টে খুঁজে বার করার পর কালাচাঁদ সরলাকে বলে যাচ্ছিল—"আমার ফিরতে দেরী হবে আজ, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরোনা, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো।"

সরলার মনে প্রবল দ্বন্দ জেগে উঠলো—কালাচাঁদের প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ভাবে বক্ষভেদী দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে বললো—হুঁ।

কালাচাঁদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কি হলো— এ আবার কি রকম ?"

কালাচাঁদের বড়ই তাড়াতাড়ি ছিল ; সে একটু রেগেই বললো—"কি ছেলেমানুষী হচ্ছে—কাজের সময় একি ? কি হয়েছে, কি ?"

সরলা মুখ বাঁকিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললো—"তাইতো, হয়েছে কি—মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায়···বড্ড তাড়া যে !"

"তাড়ার কাজ হলে তাড়াতাড়ি করবো না ? এ আবার কি নূতন খেয়াল তোমার ?"

"খেয়াল—হুঁ খেয়ালই তো ; বটেই তো, বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? আজকাল ক্ষণে অক্ষণে কোথায় ডুবে থাকা হচ্ছে,—শুনি !"

কালাচাঁদের তাড়া ছিল খুব···মামলার দরুণ মেজাজটাও ভালো ছিল না বড়··এবার সে রেগে গেল···রাগত স্বরেই বললো···"বলছি কাজ আছে···বড্ড তাড়াতাড়ি—আর ততই তুমি বকাচ্ছো খামোকা···ভালো লাগে সবই যখন মন মেজাজ ভালো থাকে···"

সরলাও রেগে যাচ্ছিল খুব···বললো, "মন মেজাজ আমারও খুব ভালো বই কি ! সময়টা ভালো···কপালটা ভালো···স্বামীটি তার চেয়েও ভালো···"—বলেই সরলা চকিতে একবার নাকের ডগাটা রগ্‌ড়ে হাতের আঙ্গুল ক'টা নিরীক্ষণ করে দেখলো···শুকনো !!!···নাকটা ঘামেনি আদৌ। মেজাজটা ভালো না থাকার দরুণ সিঁদুরের ফোঁটাটাও দেওয়া হয়নি রীতিমতো,—সিঁদুরও পড়েনি নাকের উপর !

কালাচাঁদ আর দেরী করতে পারছিল না। উকীল যদি বেরিয়ে যায়···তাকে কাগজপত্র আজই দেখানো দরকার, এ সময় সরলার এরূপ ব্যবহার সে কিছুতেই সহ্যের সহ্য করতে পারছিল না। "মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে"— বলে কালাচাঁদ ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মামলার দলিলটা কালাচাঁদের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে সরলা ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। কালাচাঁদ পেছন পেছন গিয়ে বন্ধ দরজায় বার বার আঘাত করে ডাকতে লাগলো—"ওগো খোল, আমার দেরী হয়ে যাবে— জরুরী কাজ, শেষে সব পণ্ড হবে, সর্ব্বনাশ হবে—"

সরলা ভিতর থেকে গর্জ্জে গর্জ্জে বলতে লাগলো— "সর্ব্বনাশ হ'ল, দেরীতে পণ্ড হ'ল তো আমার ভারি বয়ে গেল !! আমার যে সর্ব্বনাশ হচ্ছে তার খবর কে রাখে—"

কালাচাঁদ বাইরে থেকে বললো, "কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে তোমার, কি পাগলামো করছো ? এ সময় এসব ছেলেমানুষী

ভালো লাগে না।...খোল দরজা...দাও দলিলটা...কাজ সেরে ফিরে আসি—তারপর যতো পার বকো আর ন্যাকামো কোরো..."—কালাচাঁদ এবার রেগে গেছে...দরজায় ঘা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো—"খোলনা দরজা...শুনছো..."

সরলা পার্শ্বের একটা জানলা খুলে গরাদের ফাঁকে হাত বার করে হাত নেড়ে বললে—"আজ আরতো নয়ই, বুঝি আগে ব্যাপারটা ভেবে চিন্তে, কাল দেখা যাবে।"

কালাচাঁদ রাগের মাথায় চেঁচিয়ে উঠলো, "কোথাকার মাথা পাগলা বোম্বেটে বউ গা? কাল মামলা আজও উকীলকে দলিল না দেখালে আমার যে মাথা বিকিয়ে যাবে! এখনও বলছি দাও, আমি যাই তারপর তুমি দোর বন্ধ করে যত পার লম্ফ ঝম্ফ কর।"

"এত বোকা মেয়ে মনে কোরো না, চোখ কাণ খালি তোমারই নেই"—বলেই সরলা আর একবার তার নাসিকায় হাত বুলিয়ে দেখলো; শীতের কণকণে হাওয়া একটু জোরেই বইছিলো তখন, নাকের ডগাটা শুকনোই ছিল তখনও, সরলার চোখ ফেটে জল বার হচ্ছিল প্রায়; তড়াতাড়ি সশব্দে সে খোলা জানলাটাও বন্ধ করে অন্ধকার ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল। মাথার উপরে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দের চেয়েও জোরে যেন সরলার বুকের ভিতর থেকে দ্রুত হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছিল।

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কালাচাঁদ কিছুক্ষণ নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জে গর্জ্জে তখন হতাশভাবে সিঁড়ির উপর গুম হয়ে বসেছে। কাল মামলা। জমির ব্যাপার, দলিলপত্রগুলো আজই এতক্ষণে উকীলকে দেখানো উচিত ছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই উকীল বাবু বেরিয়ে গেছেন; উপায় কি হ'বে—কালাচাঁদ কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলো না। রাগে দুঃখে আক্ষেপে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, হাত পা অবশ হয়ে আসছিল এক একবার ভাবছিল দরজাটা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে খুব দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে দলিলটা জোর করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে...পাড়ার লোক কি মনে করবে কি জানি, কালাচাঁদ তাও ভাবছিল। একবার ভাবলে, "অনুনয় বিনয় করে বলে দেখি"—পর মুহূর্ত্তেই তার মন বিদ্রোহী হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "কেন, কিসের জন্য, জমিজমা যায় যাক

ওই কোড়লে বোকাটাকে নাকি মিনতি করে বলবো,— রক্ষে, কখ্খনো না।"

গালে হাত দিয়ে বসে কালাচাঁদ আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

দরজা জানালা বন্ধ ঘরটার ভিতরে বসে বসে সরলার অস্বস্তি বোধ হলো···মনের দুঃখে এতক্ষণ সে নাকের কথাটাও ভুলে গেছে। হঠাৎ অভ্যাসমত মাথা নুইয়ে নাকটায় হাত দিতেই ঘর্ম্মাক্ত সরলার ললাট গণ্ড নাসিকাগ্র হতে টস্ টস্ করে স্বেদবিন্দু ঝড়ে পড়লো মাটির উপর। সরলা একলা ঘরে আপন মনেই চেঁচিয়ে উঠলো,—"ফাঁড়া কেটেছে রে, বাঁচা গেল।"

ঘাম দিয়ে সত্যই যেন সরলার জ্বর ছেড়ে গেল, তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে হাত-আরশীটা চোখের সামনে ধরে সরলা দেখলে ঘামে তার ললাটের সিঁদুর গলে বেয়ে নেমেছে নাকের উপর দিয়ে। বারংবার অন্ধকারে নাকের ডগা রগড়ানোয় সারা নাকমুখময় লেগে গেছে গোলা সিঁদুর —আরশীটা ছুঁড়ে ফেলে সশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে কালাচাঁদের পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে দলিলটা তার কোলের উপর ফেলে দিয়ে সরলা বললো—"নাও গো,— এখনিই যাবে, না খেয়ে নেবে —?"

অপহৃত দলিলটা সাগ্রহে সজোরে দুহাতে চেপে ধরে কালাচাঁদ রুষ্ট বিরক্ত ভাবে বললো,—"মাথা ঠাণ্ডা হলো, এমন বিটলে মেয়েও দেখিনি আর, এখন কেন দিলে—"

সরলা একটা অবোধ্য শব্দে এক গাল হেসে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ঘর্ম্মাক্ত নাসিকাটার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে—"দেখছো" বলেই সহসা ব্যগ্র বাহুতে কালাচাঁদের কণ্ঠ বেষ্টন করে আনন্দাতিশয্যে শির সঞ্চালন করে হেসে পাশে গড়িয়ে পড়লো।

কালাচাঁদ প্রথমটা নির্ব্বাক থেকে সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো হো হো শব্দে—"কি বিপদ !!!"

পত্রলেখা

শ্রীপ্রণব রায়

ভাবছিলাম, একখানা চিঠি লিখব।

এখন শরৎকাল। সহরের রুক্ষ কাঠিন্যের ওপরেও অপূর্ব্ব একটি প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়েচে। আকাশ সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল, বাতাসে চঞ্চলতা। ভাবলাম, খুব সুন্দর' একখানা চিঠি লিখব। কাকে লিখব, সেটা নিতান্তই গৌণ; চিঠি-লেখাই আজকের মুখ্য উদ্দেশ্য। কি লিখব? যা-খুশী-তাই; শরৎকালের এলোমেলো হাওয়ায় আমার জানলার সামনে ওই নিমগাছটা যেমন অকারণ মর্ম্মরে মুখর হ'য়ে উঠেচে, তেমনি। কথার যে ছোট ছোট ঢেউগুলি আমার মনের মধ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেচে, ভাষায় ও'দের কল্লোলকে প্রকাশ করতে চাই।

জীবনে এমন অবকাশ কদাচিৎ আসে—এমন নিশ্চিন্ত, নিরালা ছুটির অবকাশ। কৃপণের মতো এই অবকাশটুকু উপভোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে! গল্প কবিতা লিখে এই ছুটির বেলা না-ই-বা নষ্ট করলাম! দিনমানের কাজের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে গল্প লেখার পরিমিত অবসর জুটবে কবিতা লেখার জন্যে রয়েচে রাত্রির রহস্যময় নৈঃশব্দ্য।

কিন্তু আজকের এই অবকাশ, সকালের আলোর মতো নিজের মনকে মেলে ধরবার অবকাশ। আজকের অবকাশ ইণ্টারভ্যাল নয়,—ছুটি। তাই ভাবলাম, ১৩৪০ এর দোসরা আশ্বিনের 'আমি'কে বাঁচিয়ে রেখে যাব, অকাজের কথায় পুষ্পিত দীর্ঘ একখানি পত্রে।

বাস্তবিক, চিঠি লেখার রেওয়াজ আজকাল আর নেই বললেও চলে,—আমাদের এখনকার চিঠি লিপি নয়; ফ্রী প্রেস বা এ, পি'র টেলিগ্রাম! নিছক ঘটনা বা কাজের কথায় ঠাসা, আগাগোড়া ভরাট! যেন মিলের আটহাতি মোটা কাপড়, কারুকার্য্য খচিত বারোহাতি মসলিন নয়। কাজের কথার চাপে অকাজের আনন্দ পড়েচে মারা।

চিঠি লেখা আজকাল একটা মৃত আর্ট। বাংলা সাহিত্যে চিঠি লিখিয়ে মাত্র একজন,—তিনি রবীন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি নাম-করা সাহিত্যিকরা যা' লিখেচেন, তা' ঠিক চিঠি নয়, পত্রাকারে প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্যে 'ছিন্নপত্রের' সঞ্চয় মাত্র একখানি।

এমনকি, ইংরেজি সাহিত্যেও—পত্রসম্পদে যে সাহিত্য সবচেয়ে সমৃদ্ধ—চিঠি আজকাল বিরল। আজ শেলীও নেই, হ্যারিয়েটও নেই, কীট আর ফ্যানীই বা কোথায়? ল্যাম্ব, কাউপার, ওয়ালপোল'এর যুগও গত হয়েচে। ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের বদলে সার্ব্বজনীনতাই এ-যুগের লক্ষণ। জনতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, গণবাণীর সঙ্গে কণ্ঠ মেলানোই এখনকার নীতি।

ইংরেজি সাহিত্যে পত্রযুগ সুরু হয়েছিল সেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে।

এর আগে চিঠি লেখা ছিল বিলাসিতা। কেন না, কাগজ কলম প্রভৃতি লিখন-সরঞ্জাম এখনকার মতো সস্তা ছিল না এবং চিঠি পাঠানোও ছিল রীতিমত ব্যয়সাধ্য ও দুস্কর ব্যাপার! তা' ছাড়া অক্ষর পরিচয়ের অভাব তো ছিলই।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর খান কয়েক পুরাণো চিঠি এখনও সঞ্চয় করে' রাখা হয়েচে। সাহিত্যের দিক থেকে তত না হ'লেও সেই চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। সেগুলি থেকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ-সমাজের জীবন ধারা সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মায়।

এলিজাবেথীয় যুগ কাব্য ও নাটকের যুগ। কিন্তু সে-যুগের চিঠি খুব কমই পাওয়া যায়। এমন কি শেক্সপীয়ার-এর চিঠি ছেঁড়া টুকরোগুলোও কালের হাওয়ায় কোথায় উড়ে' গেচে! Stratford-on-Avon'এর সেই মনীষীর

...জীবনের কোনো কথাই আমরা জানতে পারলাম ...। চিনলাম শুধু নাট্যকার শেক্সপীয়রকে।

চিঠি সাহিত্যের পর্য্যায়ে স্থায়ী আসন পেল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বিশপ হল এবং জেমস্ হাওয়েল লিপি-লিখনকে আর্টেরই একটা শাখা বলে' প্রমাণ করলেন। ...সের সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে চিঠি এল আর্টের রূপায়-...। জেম্‌স্ হাওয়েলকে বলা হয়: 'Father of epis-...lary literature. একখানা চিঠিতে তিনি চিঠি লেখার ...গুলিকে সুন্দর করে' ব্যাখ্যা করেছেন। চমৎকার চিঠি ...র মূলে হাওয়েলের মস্ত একটা সুবিধে ছিল। তাঁর ...অখণ্ড অবসর। জীবনের যে সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সে-সময় রয়্যালিষ্ট বন্দীরূপে তিনি ...লেন কারাগারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্ট হিসেবে চিঠির চরম উৎকর্ষ ...। তবে, মাঝে মাঝে এই আর্ট এত artificial ...উঠ্‌ত যে, চিঠির অবস্থা হ'ত টবে-পোঁতা পাতাবাহারের ...র মতো। কষ্টকল্পনা, বাছা বাছা কথার আড়ম্বর এবং ...র প্রখর বর্ণচ্ছটায় চিঠি হ'য়ে পড়ত ছদ্মবেশী অভিনেতার ...কৃত্রিম। সহজ মনের যোগ যেত নষ্ট হ'য়ে, নকল ...র ভণিতাই হ'য়ে উঠ্‌ত প্রধান। তবু, ইংরেজি ...ত্যের বেশীর-ভাগ ভালো চিঠিই এই সময় লেখা হয়। ...র কারণ হচ্ছে, সে-সময়কার জীবনযাত্রা চিঠিপত্র লেখার ...য় অনুকূল ছিল। তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার ...সংগ্রাম হ'য়ে ওঠেনি, এবং লোকের অবকাশ ছিল ...। তা' ছাড়া, ইকনমিক কারণও ছিল; চড়া ...ষ্টেজ, ডাক-সরবরাহের অত্যধিক ব্যয় এবং জনসাধারণের ...w Standard of living সুতরাং ঘন ঘন চিঠি লেখবার ...উপায় ছিল না, তখন মাত্র একখানা চিঠি ভালো করে' ...য়ে লিখতে লোকে সারা দিনমান কাটিয়ে দিতে পারত।

তা' ছাড়া সংবাদপত্র তখন ছিল সংখ্যায় বিরল এবং ...র দামও ছিল চড়া। প্রচারের অসুবিধা বশতঃ খবর ...ছুত অনেক দেরীতে। ফলে, বহুদিনের সঞ্চিত সংবাদ ...করত পত্রদূত। তখন প্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপের একমাত্র মধ্যস্থ ছিল চিঠি; তাই অধিকাংশ চিঠিই হ'ত সুলিখিত।

John Wishart পুরাণো ইংরেজি চিঠির যে চয়নিকা বের করেছেন, তা'র ভূমিকায় তিনি সত্যিকার ভালো চিঠির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন এই বলে:—

> A realy letter is more than a bundle of news, it is the expression of the writer's natare. All uncon sciously while he is thinking only of his letter and his correspondent, he is drawing a likeness of himself.'

অর্থাৎ, সত্যিকার ভালো চিঠি নিছক সংবাদ সমষ্টি নয়; লেখকের মনের ও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। চিঠির মধ্যে লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে অনেকখানি ধরা দিয়ে ফেলে।

চিঠি ছাড়া অন্য কোনো রচনার মধ্যে আত্মগোপন করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব নয়, তাঁর নায়ক-নায়িকাকে লোক-লোচনের সামনে এনে নিজে তিনি নেপথ্যে বাস করতে পারেন। কিন্তু চিঠিতে লেখকের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে, তাঁ'র সঙ্গে হয় যেন মুখোমুখী দেখা!

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। চার্লস্ ল্যাম্ব—ইংরেজি সাহিত্যে ল্যাম্বের মতো চমৎকার চিঠি-লিখিয়ে তিন-চার জনের বেশী নেই—গত ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থকে যে চিঠি লেখেন, তা'র একস্থানে তিনি লিখেচেন:—

> 'The lighted shops of the Strand and Fleet Street; the innumerable trades, tradesmen and customers, coaches, waggons, play-houses; all the bustlex and wickedness round about Convent Garden; the very women of the Town the watchman, drunken scenes, rattles; life awake, if you awake, at all hours of the night; the impossibility of being dull in Fleet Street; the crowds, the

very dirt and mud, the sun shining upon the houses and pavements...... all these things work themselves into my mind and feed me, without a power of satiating me.

'The wonder of these sights impels me into night-walks about her (London) crowded streets, and I often shed tears in the motley Strand from fulness of joy at so much life.........'

উদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে townsman ল্যাম্বকে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। ওয়ার্ডসোয়ার্থকে লেখা এই চিঠিখানি পড়তে পড়তে আমরা মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, ফ্লীট্ ষ্ট্রীটের জনতার সঙ্গে মিশে একটি লোক চলেছেন, উঁচু কলাওয়ালা লম্বা ওভারকোট তাঁ'র গায়ে। তিনি ল্যাম্ব। আমরা বেশ বুঝতে পারি, অসংখ্য সৌধ, বিপনী, ক্রেতা-বিক্রেতা, জলযান, কলরব ও চীৎকার, নাগরিকা এবং নৈশ রহস্য নিয়ে লণ্ডন-নগরী ল্যাম্বের জীবনে কী অদ্ভুত মোহ রচনা করে'ছিল!

'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে প্রকৃতি-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা পাই, তাঁ'র কোনো উপন্যাসে তা' পাই কি?

এই ধরণের চিঠি সম্বন্ধে Wishart সাহেব বলেচেন :—

'To read such letters is to enter into the life of days gone by, to accompany the writers in their business and in their pleasure, to know their friend and to look at the world as they know it through their eyes.'

অর্থাৎ, এইসব চিঠি পড়তে পড়তে আমরা বিগত দি ফিরে যাই, লেখকদের জীবনের নিভৃত আনন্দোৎস আমরাও যেন আমন্ত্রিত হই, তাঁ'দেরি দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবী দেখি, চিনি।

আমরা যে-যুগে বাস করছি, সেটা হচ্ছে যন্ত্র-সভ্যত যুগ, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির যুগ, 'age of crowd' বলতে পারি

জীবনে আমাদের দেখা দিয়েচে নব নব সমস্যা, বেড়ে কাজ, সেই অনুপাতে আমরা জীবনের অবসরকে কর সংক্ষিপ্ত। 'সময় নেই' এইটেই হ'ল বিংশ শতাব্দীর জীব সংজ্ঞা। সুতরাং চিঠি লিখা কখন? আমরা লি Scrappy notes এবং তা' যথাস্থানে পৌঁছতে কতক্ষ বা লাগে? বিজ্ঞানের বাহাদুরীতে দুনিয়াময় টেলিগ্রা তার বসেচে, চলেছে 'এয়ার-মেল'।

ভূর্জ্জপত্রে কাজলের মসী দিয়ে চিঠি লেখার যুগ হয়েচে। তা'র স্থান এখন অধিকার করেচে লেটার প্যা ফাউন্টেন পেন, কার্ব্বন পেপার, রেমিংটনের মেশি যতটা সময় সংক্ষেপ করা যায়! পারতপক্ষে, অ ফোনেই সেরে নি, নেহাৎ যদি লিখতে হয়, তবে বড়-জো লিখি 'কেমন আছ? ভালো আছি।'

জীবনে আমাদের কথাও ফুরিয়ে এসেচে।

এটা আশ্বিন মাস। নীল আকাশে আর কাশের ব শরৎ এনেছে ছুটির বার্ত্তা, আমাদের কর্ম্মব্যস্ত দ্রুতধাবম জীবনে সেই ছুটির খবর পৌঁছল কই?

পল্লী-ব্যথা
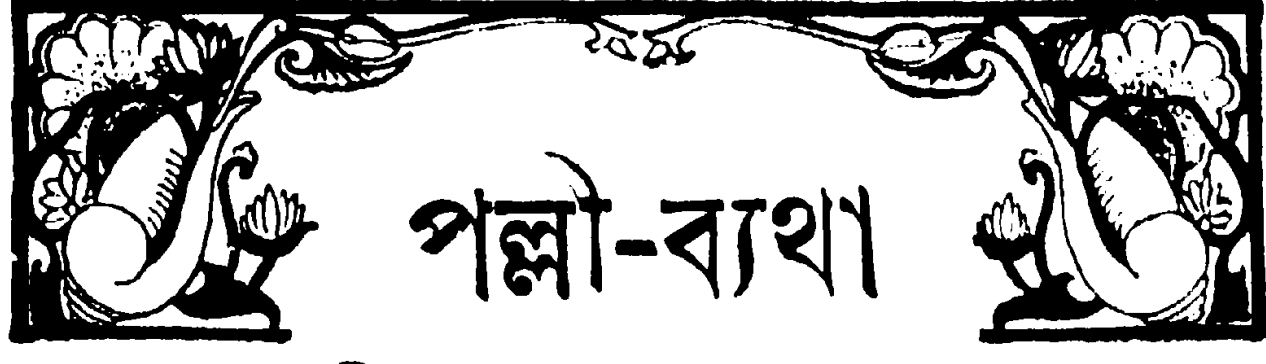
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুঘুপুর গ্রামে,
বিকট রবে চোমকে সবে,—
মোটর এসে থামে।
হুঁকে রেখে কোঁচা দিয়ে গায়,—
জেলার সাযের ভেবে
হরিশ সভয়ে দাঁড়ায়।
শব্দ শুনে ছেলের পাল
বেরয় যেন নরক হতে
চলন্ত কঙ্কাল।
রুমাল টিপে নাকে
মুখ বাড়ালেন অভয় মিত্তির,
খোঁজেন যেন কা'কে।
"এই যে হরিশ, খবর কি ?"
"প্রাতঃপ্রণাম বেশ আছে সব,
টাকায় দেড় সের ঘি !"
'হা হা' হাসি, "বেশ বেশ,
খবর নিতে এলুম,
যাক্, নেই ত' কারো ক্লেশ ?"
"আজ্ঞে না, পায়নি অন্ন স্বাদ
জন্মবধি, বেশ আছে তাই।
ও-কথা দিন বাদ।—
"আপনি কেমন বলুন,
চৌরঙ্গিতে কষ্ট নেই তো ?
ঘুরে দেখবেন চলুন।—
"আছেন তো দু' দিন ?"
"আরে বাপ্ সে কি হয় ?
দেখনা এই রুটিন্।
"ডি-ভি-সনে ভোট দান,
বড়রা হাঁ করে আছেন,
তাঁদের জয়েই মোদের মান।—
"প্রজাদের সব ডাকো,
পূজোর কিস্তি মিটিয়ে
দিব্যি নির্ভাবনায় থাকো"
"খেতে পায় না, সব্ পড়ে' যে জ্বরে !"
"টাকায় দেড় সে ঘি থাক্‌তে,
তবু ওজোর করে ?
"যে মরে সে মরুক্,
পাওনা আমার মিটিয়ে দিয়ে—
সবুতে হয় সরুক্।
"বাজে কথা আর
শুনচেন না অভয় মিত্তির।
যা যা আছে যার
"করুক এনে হাজির,—
গরু বাছুর হাল্ গোৎ
যা আছে যে পাজির।"
"গাড়িখানা রাখি
(চল্‌বে না এ হাঁটু কাদায়)
চলুন একবার ডাকি
"দেখি তারা কে কি কয়,
ক'-কেঁড়ে ঘি রাখে,
হাড়্-পাজি সব হয়।
"দেখাও হবে পিসিমাকে,
থাকেন পথ চেয়ে ;
সেরে ফেলুন এই ফাঁকে।"

"মরতে বল 'নাকি!
দুর্গন্ধ সে গ্যাসের ডিপোয়
কিছুক্ষণ থাকি—
বাঁচে নাকি লোকে?"
"পিসিমা তো রয়েছেন,
দেখচিও এই চোখে।"
"এন্-এল্-সির মূল্য,—
ভাবলে বুঝি
হবে' শাস্ত্রের তুল্য!"
নাক সিঁটকে ইক্যালিপ্টস্ শুঁকে
"আর না—শরীর যেন কেমন";
এক দাগ ঢেলে মুখে
'চললুম, চাই বুধবার।
পঞ্চমীতে দার্জ্জিলিং,—
সাড়ে সাতশো দরকার—
"না না, শুনতে চাই না কিছু;—
—সোফেয়ার পার্ক-ষ্ট্রীট্"।
চাইলেন না আর পিছু।
এ-ওর মুখ চাই,
সবাই বল্লে ভাই
"মা দুর্গা আর নাই"!
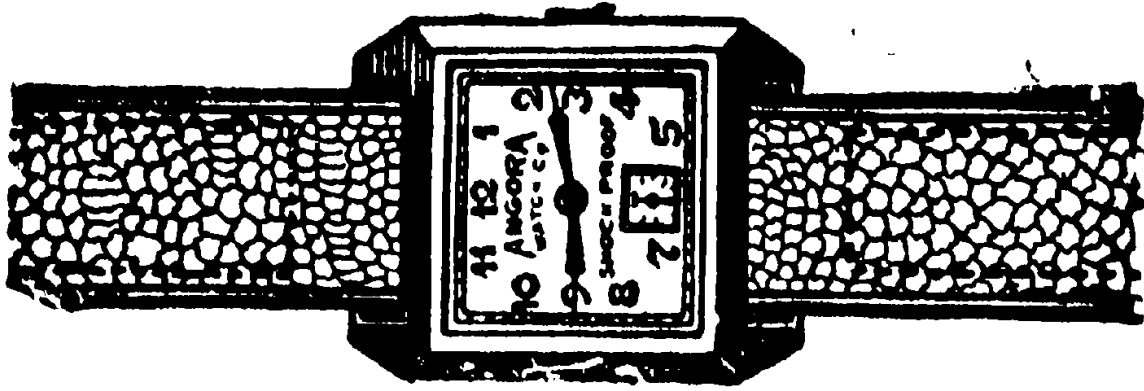
বাসর

=শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ=

গরীবের ঘরের মেয়ে হোলেও রূপে যৌবনে অতুলন ঐশ্বর্য্যবতী ছিল সে। ষোলটি পরিপূর্ণ বসন্ত যেন নিজেদের সমস্ত রস-মাধুর্য্য নিঃশেষে নিংড়ে তারি ভেতর আত্মপ্রকাশ কোরে পরিতৃপ্ত হোয়েছিল।···

কিন্তু দারিদ্র্য তাকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে দিলে।

মা-বাপ মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। তাঁদের মুখে নিজের দায়ভারের অনিচ্ছুক সহিষ্ণুতা অনুভব কোরে সে নিজে জীবিকার চেষ্টায় সহরের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সে বৃথাই!···

হাতের সঞ্চয় শেষ হোয়ে আসে। পান্থশালায় রূপোপজিবীনি তরুণীর দল নিত্য আসে, নিত্য যায়···বলে চলো আমাদের সঙ্গে···তোমার অভাব কি?···

সে যায় না।···মৃদু হেসে ভাবে···অভাবই কি জগতে বড়ো?···

দিনের সঙ্গে সঙ্গে নিরাশাও বেড়ে যায়···অভাব তীব্রতর হোয়ে ওঠে।···

তরুণী বান্ধবী বলে···দিন চল্‌বে কেমন কোরে?··· আজ আমার সঙ্গে চলো···কায়িক পরিশ্রমের কাজই তোমায় দেবো···তাও যদি না পারো···ঘরে ফিরে যেও! মা-বাপের কোলেই অনাহারে মোরবে।···
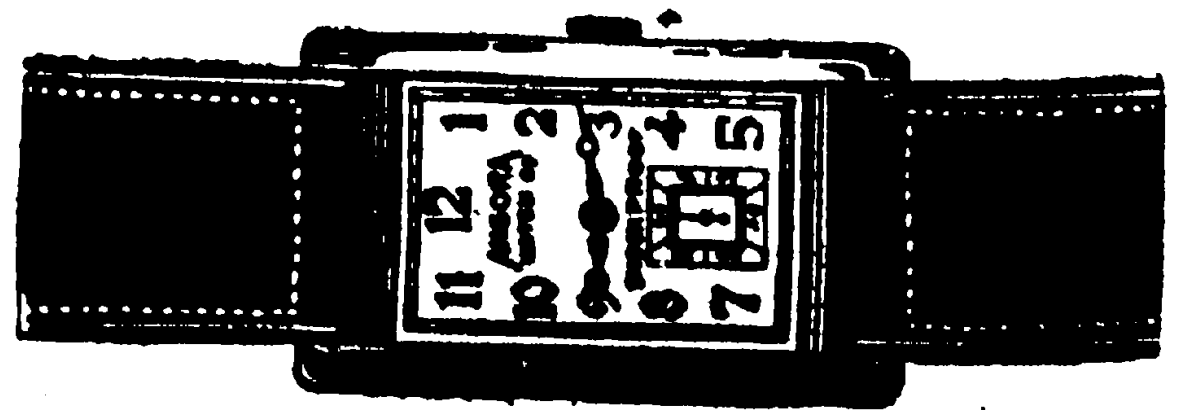
শিল্পীর চিত্রাগার। তরুণী বান্ধবী দেহের গুণ্ঠন ফেলে দিয়ে শিল্পীর সামনে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় তার তনুলতাকে লীলায়িত কোরে তোলে···আর শিল্পী প্রহরের পর প্রহর বোসে তার রূপ ও যৌবনের মঞ্জুশ্রীকে তুলি দিয়ে নিংড়ে যেন কাগজ ধোরে রাখে।···

ফেরবার সময় হাতে পায় আশাতীত অর্থ।···

বান্ধবী বলে···কেমন, পারবে তো?···

সে ঘাড় নেড়ে অক্ষমতা জানায়।

পান্থাবাসের বান্ধবীদের অনুগ্রহে তার দিন কাটছিল··· কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সে ভিক্ষায় বেরুলো।···

সহরের রাস্তায় সুন্দরী তরুণীর ভিক্ষা পাওয়া কঠিন নয় কিন্তু অপমানের।

অনাহারই বরণ কোর্‌লে সে।

রূপ ম্লান হোয়ে আসে, শীর্ণ যৌবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে··· তবু প্রাণটুকুকে ধোরে রাখবার জন্যে পান্থশালার দীর্ঘ সোপানশ্রেণীর একপাশে শুয়ে যাত্রীদের পানে মেয়েটির সে-কী করুণ দৃষ্টিপাত!···

বান্ধবীদের জীবন যাত্রার লীলা-বিলাস স্মরণ কোরে এক একবার মন লুব্ধ হোয়ে ওঠে!···কত সহজেই না সে সৌভাগ্যকে জয় কোরতে পারত···তার অপরূপ সৌন্দর্য্য দিয়ে! কিন্তু···হায় রে মানুষের মন!

অবশেষে একজন এলো···সে শিল্পী।

বিগত-রূপ-বৈভবের কঙ্কাল দেখে সে শিউরে উঠলো। সাগ্রহে···পরম যত্নে নিয়ে এলো তাকে স্বাচ্ছন্দের শান্তি-মন্দিরে। সাধক যেমন কোরে তার আরাধ্যা দেবীকে প্রসন্ন ক'রে নেমনি কোরেই শিল্পী মেয়েটির সাস্থ্য ও প্রসন্নতা কামনা করতে লাগলো সেবা-যত্ন ও প্রীতির নৈবেদ্য সাজিয়ে দিনের পর দিন-রাত্রি ধরে।

শিল্পী যেন তার স্বপ্নদৃষ্টা মানসীকে খুঁজে পেয়েছে আজ রক্ত মাংসের ভেতর দিয়ে···বিরহ তমসার পারে···চেতনার রমণীয় প্রত্যূষে!···

স্বাস্থ্য ফিরে এলো…রূপ লাবণ্যযুক্ত হলো…আর যৌবন?…সে ত ঘুমিয়ে ছিলো!

অপরিচয়ের অন্ধকার কেটে গিয়ে শিল্পী ও তার মানসীর চিত্তাকাশে ফুটে উঠ্‌লো একটি স্নিগ্ধ সৌহার্দ্দের আলো…রূপে রমণীয়, রসে প্রানবন্ত…গন্ধে সুরভিত!

দিনগুলি কাটে সুর-মধুর একটি গানের ছন্দের মতো!

দুঃখের দিনের ইতিহাসটুকু অকপটেই মেয়েটি শিল্পীর কাছে প্রকাশ কোরতে, শিল্পী বল্‌লে…আমার সাহায্য তুমি নেবে তো?…

বন্ধুর মিনতি তার মন অস্বীকার কোরতে পারলে না। প্রতিদানের গর্ব্ব সে করে না…এখন চায় আত্ম-নিবেদনের সুযোগ!

মানসীকে সামনে বোসিয়ে শিল্পী তার পট ও তুলিকা নিয়ে বস্‌লো!

এক একখানি চিত্র শেষ হয়…অর্থ আসে…যশ আসে…তবু শিল্পীর মনে হয়…যতটুকু পাওয়া উচিত এ যেন ততটুকু নয়…!

বোল্‌লে…এবার বসনের মায়া ঘোচাও বান্ধবি…লজ্জার বিনিময়ে তোমায় আমি অমরতা দেবো…।

বান্ধবীদের প্রথম অনুরোধ মনে পড়লো!…

সেই দেহ আছে…রূপ-লাবণ্য-যৌবনশ্রী এখন বিকশিত হোয়েছে সমৃদ্ধতর হোয়ে কিন্তু সেই মনটি আর সে খুঁজে পেলে না!

ঠিক কৃতজ্ঞতা নয়…যেন একটু দুর্ব্বলতা।

লজ্জা-নম্র মৃদুহাসি দিয়ে সে বন্ধুর অনুরোধ অভিনন্দিত কোরলে।…

প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন…শিল্পী যেন শব-সাধনায় বোসেছে!

আর মেয়েটি…মানসলোকের আদর্শ তার, বিবসন দেহখানিতে ভঙ্গীমা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে…মুখের পানে চেয়ে…সরম-সহজ-গণ্ডীতে অবকাশের আকাঙ্ক্ষায়।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা…তারপর শরৎ…শীত ঋতু বিবর্ত্তিত হয়…শিল্পীর সাধনা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হোয়ে ওঠে।

সাধনার অন্তরালে সিদ্ধির দুর্দ্দম আকাঙ্খা শিল্পীর অন্তরে সজাগ হোয়ে থাকে…। আর কৃচ্ছ্রসাধনার সমাপ্তিতে মেয়েটির মনে জেগে থাকে এমন একটি রসার্দ্র অনুভূতি…যা তার উত্তর জীবনকে যেন রমণীয় করে তুলবে…এই দরদী শিল্পীকে কেন্দ্র কোরে…।

কিন্তু দেহের প্রতি এই ইচ্ছাকৃত ঔদাসিন্য তাকে দিনের পর দিন দুর্ব্বল কোরে দিলে এবং একদিন ব্যাধির তাড়নায় শিল্পীর ব্যগ্র বাহুবন্ধনের ভেতর লতিয়ে পোড়লো জ্ঞান হারিয়ে···। শিল্পীর তুলিকা বন্ধ হোল।

সহানুভূতির একটি সস্নেহ আগ্রহ নিয়ে সে বোসে থাকে তার মানসীর রোগশীর্ণ দেহখানিকে কোলে নিয়ে··· চেয়ে থাকে অপলকে তার চোখ-মুখের পানে···অনুচ্চারিত কোন ভাষার আভাস প্রত্যাশায়।

মানসী যেন আজ তার নবতর আকর্ষণের বস্তু হোয়ে দাঁড়ালো···অন্তর্লোকে দিব্যবিভায় মূর্ত্তি নিয়ে।

···কিন্তু ধোরে রাখা গেল না!

অসম্ভাবিত রূপে পথের পাশে যাকে কুড়িয়ে পাবার সৌভাগ্য হোয়েছিল···জীবনের অসতর্ক মূহুর্ত্তে তাকে আবার হারিয়ে ফেলে শিল্পী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও রিক্ত মনে কোরলে!

বৈরাগীর মন নিয়ে সে পথে এসে দাঁড়ালো তার নিরুদ্দিষ্টা মানসীর পরিচিত পদচিহ্নের সন্ধানে···অনন্ত পথ ধূলির মাঝখানে।···

বহুকাল কেটে গেছে!···

মানসলোক থেকে হারাণো প্রিয়ার স্মৃতি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে শিল্পী······দেশান্তরের হাওয়ায়······ঐশ্বর্য্য বিলাসের মাঝখানে। দিনের পর দিন, তুলিকার টানে কত ছবি গড়ে উঠলো···দেশ-বিদেশে কত প্রচার হোলো···!

অর্থ আসে···যশ আসে···কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ, আর তার মনের অনুভূতি!···

অভিজাত এক বান্ধব সাক্ষাৎ কোরতে এলো শিল্পীর সঙ্গে···তার লোক-বাঞ্ছিত চিত্রাগারে···।

শিল্পী তখন সেখানে ছিলো না।···

আগন্তুক বিস্মিত হোয়ে দেখছিলো শিল্পীর অসাধারণ সৃজন প্রতিভা···নিপুণ তুলিকার দরদভরা আঁচড়ে মূক মূর্ত্তি-গুলি কেমন সজীব হোয়ে ফুটে রয়েছে···কক্ষের চারিদিকে ···অপরূপ রূপে! তাদের সম্মিলিত দৃষ্টিতে···নিশ্বাসে··· অশ্রুত গুঞ্জণে সে জনবিরল কক্ষ যেন মুখর হোয়ে রয়েছে··· স্বপ্নদৃষ্ট কোন্ রহস্যলোকের মতো।

সহসা লক্ষ্য পড়লো···আবরণ-মণ্ডিত কোন দীর্ঘ-পরিত্যক্ত বিশাল চিত্রাবয়বের প্রতি···ধূলি মলিন···বিবর্ণ··· বিগত-গৌরব বিলাস-সামগ্রীর মতো!

আবরণ সরিয়ে আগন্তুক স্তব্ধ হোয়ে গেলো! কোন রূপসী তরুণীর দেহপ্রমাণ নগ্ন চিত্র।···অসমাপ্ত তবু যেন তার বুকের স্পন্দন অনুভব করা যায়···ওষ্ঠাগ্রের শব্দহীন ভাষা অন্তরে অনুরণিয়া ওঠে···লাবণ্যের উদ্বেল তরঙ্গ শব্দায়মান হয়···! আনন্দে···শ্রদ্ধায়···গৌরবে আগন্তুকের চিত্ত ভোরে উঠলো···অকারণে আঁখি দু'টি অশ্রু-সজল হোয়ে এলো। পরিমার্জ্জিত কোরে চিত্রখানি প্রবেশ পথের সামনে রেখে সেশিল্পীর অপেক্ষা কোরতে লাগলো।···

চিত্রাগারে প্রবেশ কোরে শিল্পী আর্ত্তনাদ কোরে উঠলো!···একান্ত অনিচ্ছায় যে ধরণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলো,···মরণের ওপার থেকে বিচ্ছেদ-বিধুরা সেই প্রেয়সী তার, রক্ত মাংসের মায়াময়ী দেহ নিয়ে আবার তার উষ্ণ আলিঙ্গনে ফিরে এলো না কি?

ওগো হারাণো দিনের মনের কামনা আমার···!

···শিল্পী ছবির বুকে ঝাঁপিয়ে পোড়তে গেল······ আগন্তুক বন্ধু এসে বুকে চেপে ধোরলে···বোললে···এত যদি অধীরতা···একে মুক্তি দাওনি কেন?

শিল্পী বোললে,···পারিনি···কায়া হারিয়ে তার ছায়া নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিনি কিন্তু বিস্মৃতির আগল ঠেলে নিজে যে অতর্কিতে এসে অন্তরে প্রবেশ কোরলে আজ···বলো বন্ধু···তাকে নিবারণ করি কি কোরে?···

বন্ধু বোললে···কোন প্রয়োজন নেই! আসন যেখানে যার সুপ্রতিষ্ঠ হোয়েছে···সেখানে তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো! ছবির সমাপ্তি দাও···তোমার তুলিকায় সে বেঁচে থাক্···।

আবিষ্টের মতো শিল্পী শুধু বোল্‌লে···তবে তাই থাক্···!

নব প্রণয়ীর মতো মানসীর মূর্ত্তি বুকে নিয়ে বহুকাল পরে শিল্পী আবার তার সাধনমন্দির অর্গলবন্ধ কোরলে···।··· *

---

* "La Soruce"-এর জন্ম কাহিনী থেকে।

চিত্রাভিনেত্রী—শ্রীমতী কমলা বালা দেবী।

প্রাচ্য প্রচার শিল্পে বাঙালীর দান

শ্রীপরমানন্দ রায়।

মনমোহন দাদার জেদ আমাকেও একটা কিছু লিখতেই হ'বে। আমি কি লিখবো, বিশেষ করে এই সংখ্যায়! কবিতা লিখতে কলম ভাঙবে, সাহিত্যের সঙ্গে তো মোটেই সখ্যতা নেই। কাজ করি প্রচার শিল্পের তারও প্রথম ভাগই শেষ হয়নি এখনও !!

সাহস ক'রে প্রচার শিল্প সম্পর্কেই দু'চার কথা বলি।

সৌন্দর্যানুরাগী বর্ত্তমান যুগের নরনারী······সর্ব্বত্রই মানুষ এখন সৌন্দর্য্য সন্ধান করে······সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়······মানুষের বসন ভূষণ আহার বিহার অধ্যয়ন, ক্রীড়া কৌতুক সব কিছুর মধ্যেই মানুষ চায় সৌন্দর্য্য পরিবেশন করতে, সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করতে। মানুষের চারদিকেই যেন চারুশিল্পের প্রতিযোগিতার বিরাট মঞ্চ······ ··· অশেষ রূপায়তন।

যুগানুযায়ী বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এ যুগের অন্যতম শিল্প······প্রচার শিল্পকেও এক বিশিষ্ট রূপ দান করেছে, অপর পক্ষে মানুষের বর্ত্তমান রুচি ও অভিরুচিও পাঠ্য কি দর্শনীয় প্রচার বার্ত্তাকে রূপবান দেখতে চায়। এই রূপ প্রসাধনের সাধনা এবং রূপ দর্শনের দাবী প্রাচ্য প্রচার শিল্পকেও কম উন্নত করে নাই।

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই প্রচার কার্য্যের শিক্ষা নবিশী আরম্ভ করেছিলাম তখন থেকে এই আট বৎসর প্রচার বার্ত্তাবাহী পত্রিকা বড় কম দেখিনি এবং এই প্রচার শিল্পের আত্ম-প্রসাধনও বড় কম লক্ষ্য করিনি। বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নয়, প্রাচ্য প্রচার শিল্পের কোন বিশিষ্ট প্রাচ্য রূপ ছিল না বললে বোধ হয় মিথ্যা বলা হ'বে না। বিজ্ঞাপনের বুকে প্রাচ্যের বিশিষ্ট রূপ ও রসধারা ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথম বোধ হয়······বাঙলার অন্যতম শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়······সেই রূপ ও বৈশিষ্ট্যের কৃষ্টি সাধন বিশেষ ভাবে করেছেন বাঙলার অপর যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন সেন······বাঙলারই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার কার্য্যে।······বোধ হয় "অগুরু"র প্রচার কার্য্যেই প্রথম। এর কোন ক্রমিক ইতিহাস নেই কাজেই হয়ত শিল্পীর স্থান নির্দ্দেশ অভ্রান্ত হবে না।

······ কিন্তু একথা সত্যই সত্য যে প্রাচ্য দেশজাত দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনের একটি বিশিষ্ট প্রাচ্যরূপ দান করেছে বাঙালী শিল্পী। এই বিশিষ্ট প্রাচ্যরূপ ও চিত্রাদির জন্য বিদেশীদের কাছে ইহার আর কোন পরিচিতির প্রয়োজন হয় না। যে কোন ভাষায় মুদ্রিত হলেও প্রচার পত্রের এই প্রাচ্য স্বভাব ও রূপের জন্য ইহার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। প্রাচ্যের প্রচার শিল্পের এই উন্নতি ও রূপ সম্পদ—বাঙালীর দান !!!
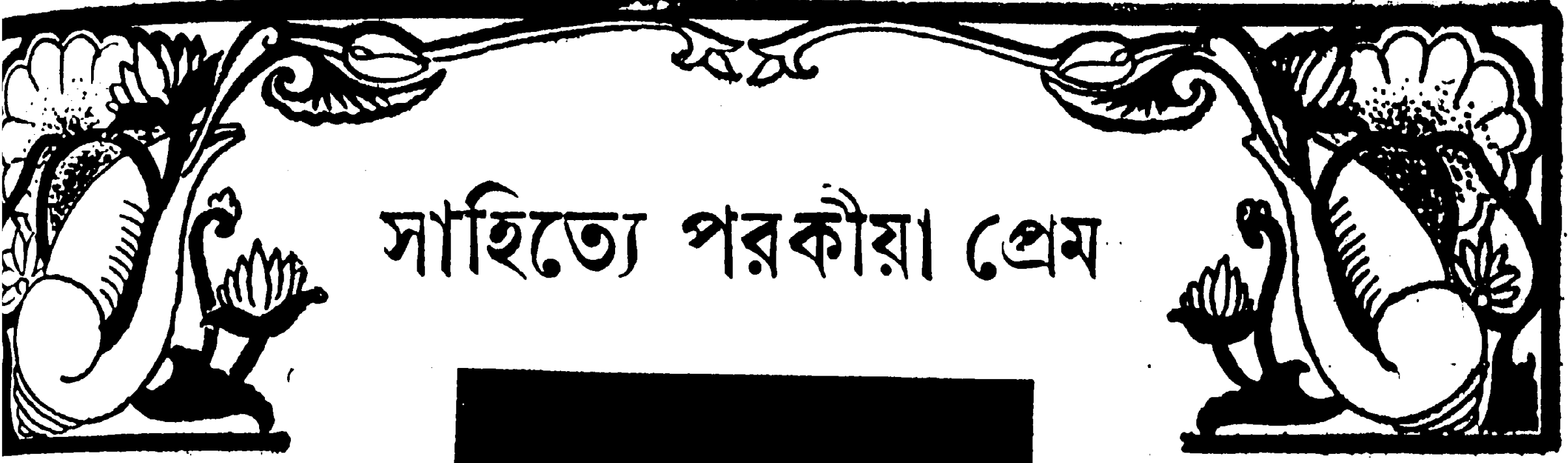
সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম

= শ্রীপ্রচণ্ড মিত্র =

"দ্বিজ চাণ্ডদাস কয়, সেদিনই জানিবে
পীরিতি কেমন জ্বালা—"

কবি পরকীয়ার কাছ হতে এই পীরিতের জ্বালা য়ছিলেন। পরকীয়া প্রেম যত জ্বালাময়ই হোক তবু ীয়া প্রেম বড় মধুর। মানুষ পরকীয়ায় এমন কী সুখ জানিনে যার জন্য মানুষ বিশেষ ভাবে কবিরা এত ন। কবি এবং লেখকরা পরকীয়ায় পিছু কেন ভাবে ধাওয়া করে কী জানি!…সকল দেশে… কালে সব সাহিত্যেই দেখা গেছে পরকীয়ার প্রতি দের লোভ যথেষ্ট। এই পরকীয়া প্রেমের জন্য কে কলেজ থেকে; বায়রণকে দেশ থেকে তাড়িয়ে ছিল। তাঁরা কোনোদিন ঘরের স্ত্রীকে নিয়ে কাব্য-য় রস পাননি। আমি স্বীকার করি কবিদের রসবোধ হ। সেই জন্যই দেখি—কবি দান্তে নিজের স্ত্রীর চেয়ে "রা"কেই অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন বেশী। আর দেশে—চণ্ডিদাস বলেছেন,—

"রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।"

"কামগন্ধ" নয় নাই থাকুক এ নিয়ে তর্ক করতে বসলে অনেক কথা বলতে হবে তবে এখানেও সেই পরকীয়া রজকিনীর রূপবর্ণনা। এর পর বিদ্যাপতিরও যে এ অপবাদ ছিল না এমন বলতে পারিনে। সংস্কৃত কাব্যের একমাত্র উপজীব্য অভিসার আর বৈষ্ণব কবিদের পরকীয়া প্রেম একচেটে। 'শকুন্তলা' নাটকে যে নারীকে প্রেমিকা বলা হয়েছে সে স্ত্রী নয়। কালিদাস অমর 'মেঘদূত' গ্রন্থে যক্ষপ্রিয়াকে কোনস্থানে "স্ত্রী" বলেননি; প্রিয়া হলেই যে স্ত্রী বুঝতে হবে এমন কোন কথা নেই—বিশেষ ভাবে কবিদের প্রিয়া। বিশ্বসাহিত্যে "ওমর খৈয়াম" এর তুলনা হয়না, ওমর জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছেন "সুরা" এবং "সাকী" নিয়ে; কিন্তু "সাকী" স্ত্রী নয়। "সাকী" বললে স্ত্রীকে বোঝায়না—পান্থশালার পানাগারে যে তরুণী অভ্যাগতদের সুরা পরিবেশন করে সে-ই 'সাকী'। রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালও বলেছেন—

"কী সুখেরই হতো পৃথিবীরে
যদি অন্য সবাই হতো আমার স্ত্রীরে—"

এতেও সেই পরকীয়ার কথা…

তারপর এযুগে তরুণ ভায়াদের পরিচয় নূতন করে দেবার প্রয়োজন নেই—তাঁরাতো পথে ঘাটে আফিস যেতে··· কলেজ যাবার পথে ট্রাম বাসে···পাশের বাড়ীর ছাদে জানলায়—অনবরতই প্রেমে পড়চেন—তার কোন হিসেব নিকেশও নেই। এযুগের মাসিক-সাপ্তাহিক প্রকাশিত গল্প-কবিতা পড়লেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরকীয়া প্রেমে এই দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ কেন—এর কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না—কোন যুক্তিও নেই—তবে এইটুকু বুঝি যাকে পাওয়া যায় না—তাকে ভালবাসাই বুঝি প্রেমের ধারা—রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"যত তোরে নাহি বুঝি তত ভালবাসি"; দুষ্প্রাপ্যের জন্য এই হাহাকার মানুষের জীবনে চিরন্তন চলে আসছে। চলবেও চিরদিন। পরকীয়া প্রেমও সেই দুষ্পাপ্য এবং দুর্ব্বোধ্য বস্তু যার নাগাল সহজে পাওয়া যায় না।—তাই মানুষের জীবনে এত ব্যাকুলতা, এত হাহাকার। কাম-কামনা প্রেম-প্রণয় সবারই অন্তরে আছে—সাধারণ মানুষেরও যে পরকীয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে না এমন কথা বলি না; তবে সাধারণ মানুষ না পাবার কথা দুঃখ ব্যথা অন্তরে গোপন করে রাখে; কিন্তু কবির নিজের ভাষা আছে। নিজের চাওয়াকে না পাওয়ার ব্যথা যত কঠোরই হোক এবং তা' প্রকাশ করতে যত লজ্জাই থাকুক, কবি ভাষায় ব্যক্ত করে তার একটা রূপ দিয়ে পাঠকের চোখের সামনে ধরে দেয়। সেই জন্য পরের স্ত্রীর প্রতি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের নজীর সকল দেশের, সকল কালের সব সাহিত্যেই আছে এবং দেখা গেছে পরকীয়া প্রেমে হতাশ হয়ে কিম্বা পরকীয়া প্রণয়ের সুখ অন্তরে উপভোগ করে কবি তার যে রূপ ভাষায় দেয়—তাই আবার সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে।

আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের চোখে পরের স্ত্রীর প্রতি লোভ,—অন্যায় এবং অশোভন; এটা সমর্থন করতে সাধারণ মানুষের চক্ষুলজ্জায় বাধে। কিন্তু কবিদের রকম সকম দেখে সমর্থন না করেও উপায় নেই। কবি রূ
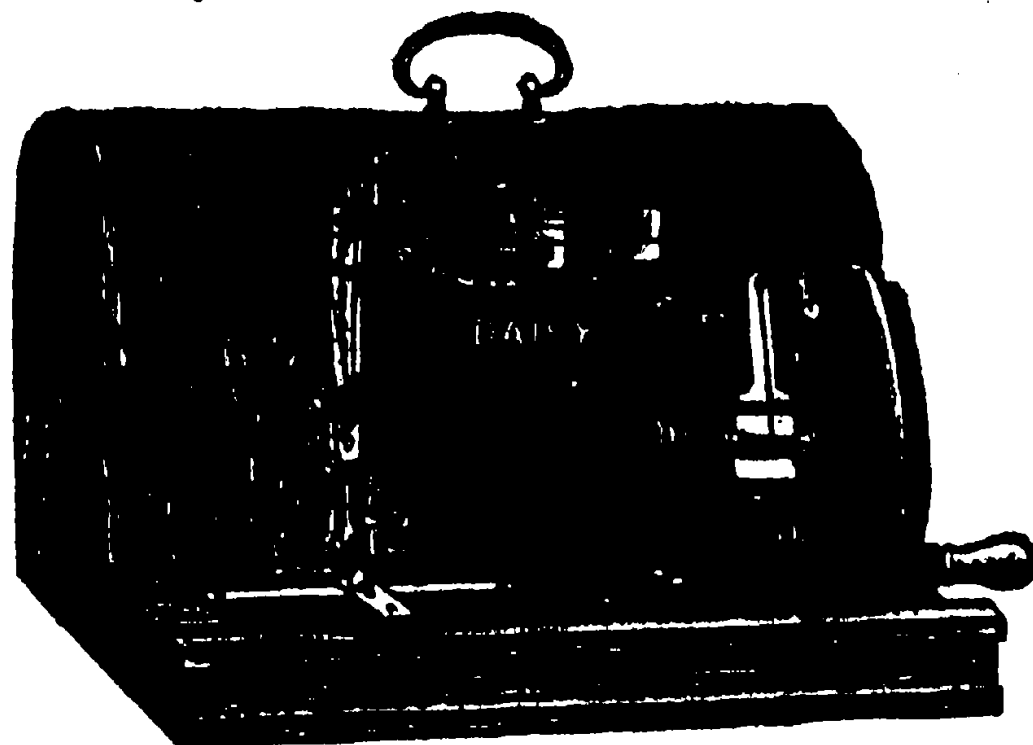
প্রষ্টা। কবি নারীর সৌন্দর্য্য মন্দিরের মুগ্ধ পূজারী। সহজে যে মিলনসুখ পাওয়া যায়—সে সুখে কবির মন ভরে না—তাই পরকীয়া প্রিয়া কবির কাছে এত সুন্দর। যদিও সে মিলনে তৃপ্তি আসে না, অতৃপ্ত বাসনার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ব'য়ে আনে। সেই বৈষ্ণব কবির কথা—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু তনু জুড়ন না গেলি।"

সকলের জীবনেই এই এক কথা।

এই অতৃপ্ত বাসনার দীর্ঘনিশ্বাস সব কবিকেই ফেলতে হয়েছে। সেইজন্যই হয়ত কবিদের মধ্যে অধিকাংশই দুঃখের কবি। বায়রণ প্রথম যৌবনেই যদি কুমারী চওয়ার্থের কাছে প্রত্যাখ্যাত না হতেন তাহলে কখোনই কলমের ডগায় না পাবার ব্যথাকে অমন সুন্দর-রূপ দিতে পারতেন না—"I am Suffering the tortures of the lost."

শেলীও যদি এলিজা জেকিন্সের প্রেমে হতাশ না হতেন তাহলে কী করে তার কলমে বেরবে—"She hits upon the gravest Secret of my life." নিজের কাম্যকে না পাবার ব্যথা বড় যন্ত্রণাদায়ক। শেষ পর্য্যন্ত এলিজা জেকিন্সের জন্য আত্মহত্যার বাসনাও তাঁর মনে এসেছিল। তাই কবি অতৃপ্ত বাসনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—ভাষায় সেই ব্যথার যেরূপ দিয়ে গেছেন—সেইগুলোই আজ হয়েছে সাহিত্যের অপূর্ব্ব বস্তু। পরকীয়া প্রেমের রীতিই এই রকম সেখানে না পাবার দুঃখটাই বেশী তাই সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের একটি বিশেষ মূল্য আছে—অস্বীকার করবার উপায় নেই!

—শেষ—

ব্যাচিলর

= শ্রীকৃষ্ণেন্দু ভৌমিক =

চমৎকার সকালবেলা। পরিপূর্ণ অবকাশ। কি করা যায়, তা'ই ভাবছিলাম। হাতের কাছে রয়েছে Vicar of wakefield খানা,—অন্যমনস্কের মতো পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। কয়েকটা লাইন চোখে পড়ে' গেল। তা'র বাংলা তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায় এই : "বরাবরই আমার মত এই যে, যাঁরা বিবাহ করে' একটি সমগ্র পরিবারের শিক্ষা ও লালনের ভার গ্রহণ করেছেন, অবিবাহিত ব্যক্তি—জাতি গঠন সম্বন্ধে যা'রা মুখে অনেক কথা বলে' থাকে,—তা'দের চেয়ে তাঁরা সমাজের ঢের বেশী কল্যাণ সাধন করতে পারেন।..."

এই পর্য্যন্ত পড়েই মনে মনে বলে উঠ্‌লাম্ : "থাম হে বন্ধু, থাম। ফস্ করে' আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় চার্জ্জশীট দাখিল করে' বো'সো না। বিচার একতরফা হয় না। আমাদেরও জবানবন্দী শোনো"।

ব্যাচিলর যা'রা তাদের সুবিধে অনেক। (বারম্বার 'অবিবাহিত' কথাটি লেখার চেয়ে ইংরেজি 'ব্যাচিলর' শব্দটি ব্যবহার করাই ভালো মনে করি। কেননা, বাংলা 'অবিবাহিতে'র চেয়ে ইংরেজি 'ব্যাচিলরে'র গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা ঢের বেশী।)

হ্যাঁ, বলছিলাম, ব্যাচিলারদের অনেক সুবিধা। ব্যাচিলার জীবন যাপন একটা অভিজাত বিলাসিতা। সুতরাং, মুসোলিনী যে আমাদের ইতালীয়-বন্ধুদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করবে এটা কিছু বিচিত্র নয়। আমাদের জীবন অতি-আধুনিক সাহিত্যের ভাষার মতো স্বচ্ছন্দ, প্রখর ও দ্রুত-বেগশালী। আমাদের জীবনে স্পীড আছে,—বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে আমরা ছুটেছি ; কেননা, ললনারূপ কোনো লগেজ আমাদের নেই! যখন কোন বিবাহিত বন্ধু অহেতুক শুভাকাঙ্ক্ষা জানিয়ে আমাদের বলেন : "কদ্দিন আর ব্যাচিলর থাকবে হে ? এইবার দেখে শুনে"...তখন কর্ত্তিত লাঙ্গুল শৃগালের হিতোপদেশ স্মরণ হয়।

মুক্তপক্ষ পাখীর মতো আমাদের স্বচ্ছন্দগতি জীবনের পানে তাকিয়ে ওরা চায় পিঞ্জরের মোহে আমাদের ভুলিয়ে দিতে। আচ্ছা, ধরা যাক্, বিবাহ ব্যাপারটা অত্যন্ত রোমান্টিক, মধুর, সুন্দর। স্বীকার না হয় করলাম (তর্কের খাতিরে), বিবাহিত ব্যক্তিরা এক নতুন সোণার খনির সন্ধান পেয়েছে। তারপর ? বিবাহিত বন্ধু নিরুত্তর। তারপর আর কি ? রোমান্সের স্বপ্ন গেছে 'ডেস্‌ড্রেন্ চায়না'র মতো চুরমার হয়ে, মাধুর্য্য হয়েছে বিস্বাদ, সুন্দর হয়েছে সাধারণ! এক কথায়, প্রেম হয়েছে গার্হস্থ্য জীবনের নামান্তর।

তার চেয়ে ঢের ভালো দু'চোখে নবাবিষ্কৃত সোণার খনির স্বপ্ন নিয়ে জীবনের পথাতিবাহন। সে-স্বপ্ন কখনো টুটবে না।

তোমাদের জীবন, বন্ধু, মিউনিসিপালিটীর রাস্তাধরা, বাঁধা, পরিমিত। তোমাদের গতি নির্দ্দিষ্ট। ভাগ্যের কাছে তোমরা আত্মবিক্রয় করেছ। আর আমরা ? আমাদের জীবন রহস্যময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আমাদের গতি আমরা নিজে নিয়ন্ত্রণ করি। আমরাই আমাদের জীবনের বিধাতা!

আমরা অবিবাহিত, ইচ্ছা করলে বিবাহিত হতে পারি। কিন্তু বিবাহিতের কৌমার্য্য কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতোই অসম্ভব। তোমরা মুদ্রিত রচনা, বিবাহ একটা মুদ্রাকর প্রমাদ। তোমাদের জীবনের পাতায় ডাইভোর্সের শুদ্ধিপত্র জুড়ে, দিতে পার বটে, কিন্তু মুদ্রিত ভুল তাতে ঢাকা পড়ে না। তোমরা বড় জোর বিপত্নীক হ'তে পার, but a widower is a widow for all that.

কবি বলেছেন : "সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে!"

বিবাহিত সংসারী যা'রা, তা'রা সন্ধ্যায় কর্ম্মস্থল থেকে ফিরে আসে পরিচিত ও পুরাতন গৃহকোটরে। ছোট

ছেলেটা চেঁচাচ্ছে, বড় খুকীর জ্বর, গয়লার তাগাদা, মুদীর বিল এবং রুদ্ধশ্বাস ঘরে গৃহিণীর নিয়ত অভিযোগ। এই তো সংসার—বিবাহিত জীবন! ঘরে ঘরে এই ছবি, বালিগঞ্জের বাসিন্দাদের সংখ্যাই বা কটি?

কোনো রাতে ফির্‌তে যদি দেরী হ'ল, তবে কথাই নেই। দেখা যায়, কর্ত্তা হয় থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল পকেটে নিয়ে, নয়ত মনে মনে ভয়ানক বিস্ময়কর একটা য়্যাকসিডেণ্ট'-এর গল্প রচনা করতে করতে ঘরে ফিরছেন।

সন্ধ্যার পর আমরা বাড়ীতে ফিরি, তখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম। নির্জ্জন ঘর, সুখ উত্তপ্ত শয্যা এবং চুরুটের বাক্স। বেশী রাত হ'লে, গভীর রজনীর মায়া-মাধুর্য্য কপোল-কল্পিত কৈফিয়তের দুশ্চিন্তায় আমাদের কাছে বিস্বদ হ'য়ে যায় না। পত্নীরূপ পেত্নীর আতঙ্ক আমাদের রাত্রিকে দুঃসপ্নময় করে তোলে না।

এই ব্যাচিলর-লাইফ!

বেশ বুঝতে পারছি, আমার অলক্ষ্যে বহু কাজল-আঁখি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে—অনুরাগে নয়, রাগে। কিন্তু পেত্নী বলেছি পত্নীকে, নারীকে নয়। আমার অলক্ষ্যে কাণাকাণি শুনতে পাচ্ছি: "হতাশ প্রেমিক আর কি! সেই যে কে বলেছিল, দ্রাক্ষফল টক," ইত্যাদি।

কিন্তু দ্রাক্ষার মর্য্যাদা বোঝে শুধু ব্যাচিলর। তার জীবনের সুরাপাত্র নিঃশেষ হয়ে যায় না, নব নব সুধারসে নিয়তপূর্ণ। নারী-প্রেমের অযথা নিন্দা আমরা করি না। নিন্দা করি, তা'র যে একটী মাত্র নারীর মোহে তার প্রেমকে করেছে সঙ্কীর্ণ।

আকাশের মতো এই অনন্ত বিস্তীর্ণ প্রেম, এই প্রেমই যুগে যুগে কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে। স্মরণ কোরো বন্ধু, মিল্‌টন্ "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখেছিলেন, যখন তিনি বিবাহিত এবং স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন ঘটল, তখন—প্যারাডাইস্ রিগেনড্!!

শরৎ-রাণী

বলাকার একতারাতে—
বাজিয়ে এ কোন সুর জাগানি,
সোণার রথে এলো কে আজ
নিয়ে শ্যামল প্রভাত খানি ?
সবুজ বনের ধানের ক্ষেতে
বসলো ও-কে আসন পেতে ?
পাশেতে তার কেয়া ফুলের
ফুটলো কিবা ধূপের দানি !
কেশের রাশি এলিয়ে মেঘে
এলো এ কোন স্বপন-রাণী ?

কাশের বনে বসন রেখে
দিঘীর বুকে নামলো চানে,
কালো জলে রক্ত কমল
ফুটলো, চেয়ে আকাশ পানে।
দূর্ব্বাদলে শিউলি-ঝরা
কার পা দু'টি আলতা পরা ?
ভিজে চোখে উতল সায়ক
বিজ্‌লীতে কে চিত্তে হানে ?
প্রাণের দ্বারে বরণ করি
শরৎ ওগো ঋতুর রাণি !

—শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী—
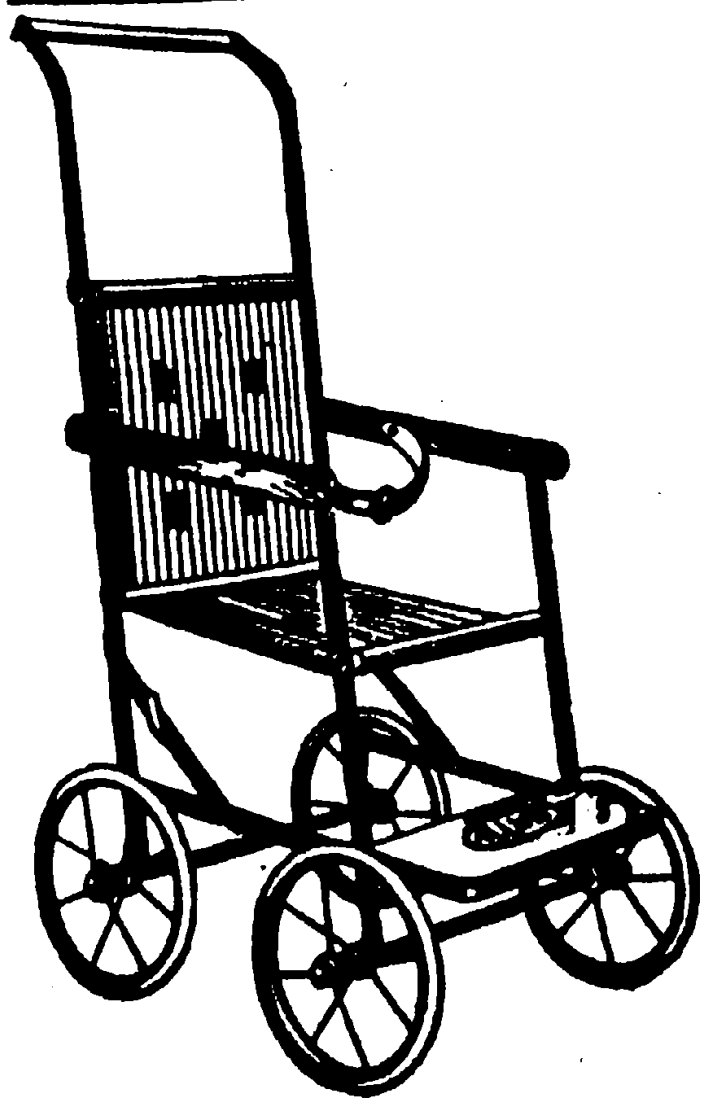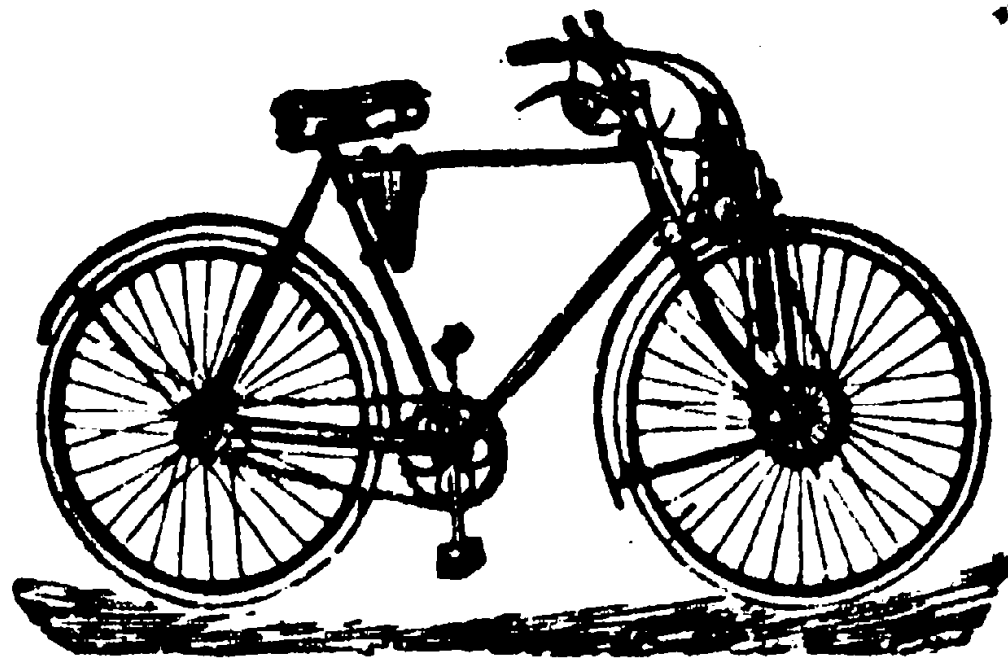
—নারী-প্রকৃতির প্রতীক—মা আনন্দময়ী—

শ্রীকমলা দেবী

বারংবার ভেবেছি অনেক দিন; কত বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভেবেছি; সংবাদপত্রে যে দিন সতী যশোদা-অপহরণের মর্ম্মান্তিক কাহিনী প'ড়লাম, যে দিন সতী সাবিত্রীরাণীর কাহিনী প'ড়লাম সে দিনও ভেবেছি, প্রত্যেক দিন ভোরের কাগজগুলো যখন পড়ি তখনও ভাবি···এ দেশটা এখনও অতল জলে ডুবে না গিয়ে শস্যশ্যামলা সুফলা রয়েছে কি ক'রে! এখনও এদেশের বুকে বাজ পড়ে' পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি কেন !!! ······

···সতীর উপর অত্যাচার তো দূরের কথা, একটা কলুষ দৃষ্টিও তো বিধাতা সহ্য করেননি···সতীকুলরাণী সীতা অপহরণের ফলে সোণার লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়েছিল, দ্রৌপদীর অভিশাপে কুরুবংশ নির্ম্মূল হয়েছিল, পদ্মিনীর অপমানে আলাউদ্দীন জাহান্নামে গিয়েছিল, খিলিজি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, হেলেনের জন্য ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল···বিধাতা কোনকালেই তো সতী রমণীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেননি। এমন কি, অখণ্ডনীয় নিয়তিকে হার মানিয়ে সতী সাবিত্রী মৃত সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, সতী বেহুলা গলিত শব-শয্যা থেকে লক্ষীন্দরকে জাগিয়ে তুলেছিলেন···সতীর সাধনা কখনও ব্যর্থ হয়নি, সতীর অভিশাপ থেকে কেউ তো মুক্তি পায়নি !!···তবে ?···

তবে নিত্য এই পাশবিকতা, সতী নারীর প্রতি এই রোমাঞ্চকর অত্যাচার, নারী নির্য্যাতন···সমস্ত বাঙলায় আজ যা' যেন সূর্য্যোদয়ের মতো নিত্যকার সত্য সংবাদ···সত্ত্বেও কেমন ক'রে এ দেশটা বেঁচে আছে, নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার-মন দেশবাসীও বেঁচে আছে···তাই ভেবে পাইনে।

আজ সকালে অনেকগুলো কাগজের শারদীয় সংখ্যায় মা আনন্দময়ী দেবী দশভুজার চিত্র দেখে আর লেখক, সম্পাদকগণের কবিতা প্রবন্ধ পড়ে হটাৎ মনে এলো······তাই, তাই সম্বৎসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়—শুধু তিনটি দিনের অকপট মাতৃ-পূজায়·········

বাঙলার নর নারীর প্রতি যত অবজ্ঞাই না দেখাক, বাঙালী ব্যাভিচারীর দল নারী-নির্য্যাতন করে যতই না পশু-বৃত্তির পরিচয় দিক এই তিনটী দিন সবাই তারা নারী প্রকৃতির প্রতীক মা আনন্দময়ী দশভুজা দুর্গাকে 'মা' বলে ডাকে, নর তার সমস্ত অক্ষমতা, সমস্ত অপরাধ সরল ভাবে স্বীকার ক'রে নারী-শক্তি মা মহাশক্তির পায়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে; সন্তানের ডাকে স্নেহময়ী নারীর বুকে মাতৃত্ব জেগে উঠে······নির্য্যাতিতা নারী-শক্তি তখন সন্তান চিত্তে কামোন্মাদ দানব মহিষাসুর রূপ পাশবিকতাকে পদদলিত—নিহত ক'রে সন্তানকে পরিত্রাণ করেন। মায়ের শুভেচ্ছায় বর্ষাসিক্ত হিম-করুণ কঙ্কাল বাঙলা শারদ শোভায় ফুটে উঠে--ফুলে ফলে নব কিশলয়ে !!'

শারদীয় সংখ্যা সচিত্র
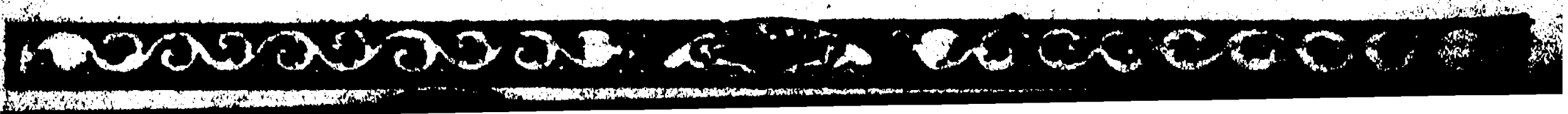
৩য় বর্ষ :::: মহালয়া :::: ৩রা আশ্বিন
১০ম সংখ্যা :::: মঙ্গলবার :::: ১৩৪০ সাল

...দশভুজার পরিকল্পনা...

বৎসরান্তে আবার মা আসচেন, সুদীর্ঘকাল সন্তান তাঁর এই শুভাগমনের অপেক্ষা করেছে কত না আগ্রহে, কত উৎসাহে !! বাঙলায় এইতো একটা যোগ, সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন পর্য্যুদস্ত বাঙালীর ঘরে এইতো একটা সত্যিকার উৎসব...বৎসরান্তে এই একবার...মাত্র তিনটি দিন। এই তিনটি দিন তিন রাত্রি মা তাঁর প্রবাসী ছেলেকে কাছে পাবে, সতী তাঁর স্বামীকে কাছে পাবে ; সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ বিরহ বেদনার শেষে এই তিনটি দিন থাকবে না কারোও কোন আক্ষেপ...কোন ব্যথা।

মাতৃত্ব কি অপরূপ, মাতৃমূর্ত্তি কি অপরূপ, মাতৃস্নেহ কি অপরূপ, মায়ের সন্নিধানে কি তৃপ্তি...কোন ব্যথা কোন কথাই তো এই মিলনানন্দকে বিকল করে দিতে পারে না !! কোন অভাব কোন গ্লানিই তো এই মাতৃপূজা ব্যাহত করতে পারে না !!

এই তিনটি দিন তিন রাত্রি ছেড়ে এর পূর্ব্বের রাত্রিশেষে পরের প্রত্যূষে যে বাঙালী হিন্দু শত অভাব, নির্য্যাতন ক্লেশের নিষ্পেষনে আর্ত্তনাদ করে, অপরিসীম রিক্ততার বেদনায় ম্রিয়মান হয়ে থাকে তাদের কারও মুখে এতটুকু ক্লেশ-কালিমা কেউ দেখবে নাতো !! কোনও ঘরে দীনতার মর্ম্মোচ্ছাস কেউ শুনবে না তো !! শয্যাশায়ী রুগ্ন, মুমূর্ষু পর্য্যন্ত কি এক অজ্ঞেয় উৎসাহ ও উজ্জীবনার শক্তিতে উঠে ব'সে রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে হেসে মাকে প্রণাম করে অবনমিত শিরে, সন্তানকে কোলে নেয় দু'হাত বাড়া'য়ে, প্রিয়কে বুকে ধরে ব্যগ্র বাহু বেষ্টনে......

আনন্দময়ী জননীর পরিকল্পনা, সর্ব্ববিষাদ-বিবাদ-বেদনা বিনাশক মাতৃপূজার পরিকল্পনা করেছিলেন যেই হিন্দু তাঁদের ঘরে জীবন্ত মাতৃস্বরূপিণী নারী ছিল শ্রদ্ধেয়া...ছিল চিরমঙ্গলময়ী, শক্তি আনন্দ প্রদায়িণী......

মনে হয় মঙ্গলময়ী দশভুজার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা নারীর দশরূপ-দর্শনে—জননী নারী, ভগ্নী নারী, ভাতৃজায়া নারী, পত্নী নারী, কন্যা নারী, পুত্রবধূ নারী, ব্রতচারিণী নারী, সেবাব্রতে নারী, পরিচর্য্যায় নারী, শক্তিরূপিণী নারী—এই দশমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁরা দশভুজারূপে মাকে অভিনন্দিতা করেছিলেন। ঘরে ঘরে তখন নারীর এই দশরূপ দশ শক্তিতে হিন্দুকে উজ্জীবিত করতো, হিন্দুর সর্ব্ব-অভাব মোচন করতো, সর্ব্বদুঃখ হরণ করে আনন্দ বর্ষণ করতো। হিন্দুর সংসার নারীর সেই দশরূপের রূপায়তন। ঘরে ঘরে আজ সেই দশমূর্ত্তির অভাব বলেই বুঝি হিন্দুস্থান আজ নিরানন্দময়, হিন্দু এমন অধঃপতিত...অধোমুখ। নারীর ওই দশরূপের বোধন গাও হিন্দু, নারীর প্রতি অবজ্ঞা পরিত্যাগ কর, নারী নির্য্যাতন পরিত্যাগ কর, নারীকে ওই দশরূপে জাগিয়ে তোল, ওই দশরূপকে অভিনন্দিত কর, আনন্দময়ী দশভুজা দুর্গা তোমার ঘরে চিরবিরাজ ক'রবেন, এই তিন দিনের আনন্দ, এই তিনটি দিনের শক্তি-শান্তি-উৎসাহ অটুট থাকবে চিরকাল !!!...

=মন্তব্য=

গডরেজ ও বয়েসের ষ্টীলের আসবাব

ভারতীয় শিল্পের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহার অন্যতম নিদর্শন বোম্বাইয়ের গডরেজ কোম্পানীর ষ্টীলের আসবাব ও সিন্দুক। গডরেজ নিৰ্ম্মিত উক্ত সমুদয় জিনিষ কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বিদেশীয় জিনিষের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। গডরেজের বিরাট কারখানা দেখিলে বিস্ময় লাগে। উহা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বৃহত্তম কারখানা সমূহের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে সুসমৃদ্ধ।

গডরেজ কারখানার বাড়ী বৰ্ত্তমানে ৭০,০০০ বর্গফুট স্থান লইয়া অবস্থিত এবং ওই কারখানায় এই দুর্দ্দিনেও ৭০০ শিল্পী ও শ্রমিক স্থায়ীভাবে নিযুক্ত। এই কারখানার ষ্টীলের আসবাব, সিন্দুক প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট ধরণের হয় বলিয়াই ভারতের সর্ব্বত্র ওই সমুদয় সমাদৃত হয় এবং চাহিদাও বেশী। আমরা এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রসার কামনা করি।

"গান্ধী" হাতঘড়ি।

প্রিন্স্ লি ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোম্পানীর "গান্ধী" হাত ঘড়ি [illegible] দেখি সুদৃঢ় সন্দেহ নাই। সমস্ত [illegible] অপেক্ষার মূল্যবান ঘড়ির ন্যায় নির্দ্দোষ। এক কথায় ঘড়িটি বেশ।

ব্যবসায়ে ধনী-সন্তান—

ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনী সন্তানগণের কৃপাদৃষ্টি আম বরাবরই আকর্ষণ করিয়াছি। দেশস্থ ধনী যুবকগণ ব্যবস ক্ষেত্রে নামিলে দেশের অভাব অনেকাংশে ঘুচিয়া যা নিরন্ন দেশবাসী শ্রমিকগণ বাঁচে। সম্প্রতি বাগবাজ মদনমোহনের সেবাইত বিখ্যাত মিত্র পরিবারের শ্রীম রাজেন্দ্র মিত্র ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রভৃতি কাজের এক কারখানা খুলিয়া সৎসাহস ও শিল্পানুরাগের প্রকৃত পরি প্রদান করেছেন—স্বয়ং রাজেনবাবুর তত্ত্বাবধানে কারখান কাজকর্ম্ম ভালোই চলিতেছে।

রূপের দেয়ালী লেখক—"রং"—

প্রচারকে "রূপের দেয়ালী" লেখক সহৃদয় সুহৃদ শ্রীযু রণধীর আইচ মহাশয় অসুস্থ থাকায় এবার শারদীয় সংখ্যা তিনি লিখিতে পারেন নাই। আমরা সত্বর তাঁহার আরোগ কামনা করি। মা আনন্দময়ী তাঁহাকে সুস্থ করিয়া শারদী আনন্দে যোগদান করিতে সমর্থ করুন।

Editor, Printer & Publisher—Atulananda Rai, 2F, Nalin Sircar Street, Calcutta. Phone—4096 B. B.
Printed at The Mohammadi Press, 91, Upper Circular Road, Calcutta.

মিস্ সুলতানা—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হিন্দি বই বিদ্রোহ এবং বিমাতায় অভিনয় করিয়াছেন।

গল্পলহরী

একাদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ | অষ্টম সংখ্যা

মায়ের প্রাণ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক দিনই অভাবের তাড়নার মধ্যে সে জাগিয়া ঠে। উঠিয়া শুনে সেই একই সুরে বাঁধা গান—নাই, ই। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও বুকে সে কতখানি ক্তির আস্বাদের লালসায় পাগল হইয়া উঠে, তা জানেন ধু তার অন্তর নিবাসী মূক পাষাণ নিষ্ঠুর ভগবান। য়! সাধনার ফল স্বর্গের আলো ছেলেপুলেগুলিকে মাইয়া আনিয়া সে যখন পেট পূরিয়া তাদের খাইতে তে পারে না, তখন এ বাঁচিয়া থাকা কেন?

কিন্তু সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতেও সে পারে না। হিণী শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, "এত অভাবের সংসারে ছেলে মান কেন, এই উঠেই যে খেতে চাইবে কি দেব তাদের? ও কি একটা, ভুলিয়ে রাখব—গণ্ডায় গণ্ডায়। মা মীর কৃপা নেই, ষষ্ঠীর খুব আছে...তা তাতে লোকের কি, তারা ত অফিস আদালতে বেরুবে, মর শালী তুই... সারাদিন কি করে যে কাটে, তা আমিই জানি...বলি ধান কিছু কিনে দাও, তা সে কথা কানে শুনলে যে মহা-পাতক হবে।"

পল্লীগ্রাম। ধান কিছু কিনিয়া দিলে অনায়াসে মুড়ী তৈয়ার হইতে পারে তা সে জানে। সতী মুখে যতই বলুক, গতর খাটাইতে এতটুকু আলস্য সে যে করে না, কথাটাও বড় ঠিক্...কিন্তু দৈনিক সব খরচের হিসাব মিলাইতে গিয়াই না সে ফাঁপরে পড়ে,—চাল নাই, দাল নাই, গরুর খড় নাই, এত নাইএর ভিতর একটার অনাটন মিটাইতে সে ভরসা পায় না, আবার নূতন কিছু হাঙ্গামা জুটাইয়া কাজ কি? আয় ত তার বাঁধা ধরা কিছু নয়, পল্লীগ্রামের রেজেষ্টারী অফিসের মুহুরী, মক্কেল

জুটাইতে পারে, তবেই দু পয়সা। নহিলে...সে নহিলে কথাটা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে!

সেদিন দিনের কাজ সারিয়া আসিয়া সে বলিল, "শুনছ গা! আজ বেমক্কা গোটা পঁচিশ টাকা পাওয়া গেছে, কি করা যায় বল ত? কাহন কত খড় কিনে চণ্ডীমণ্ডপটা ছাওয়াই, না নবনে যা বলছিল তাই শুনি। ভেবে কূল-কিনারা কিছু পাচ্ছি না, তাই তোমার কাছে যুক্তি নিতে এলুম।"

সতীর সদা পরুষ মুখখানা হঠাৎ তৃপ্তির আনন্দে কোমল হইয়া আসিল। ধীরভাবে স্বামীর কথাগুলা শুনিয়া সে বলিল, "নবনে কি বলে?"

শীতল চক্রবর্ত্তী আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিল; কেন না, ভাবিবার অংশী একজন সে আজ পাইয়াছে। দারিদ্র্যের রুদ্র তাড়নে সতীর দৈনিক মেজাজটাকে এতটাই রুক্ষতায় ভরাইয়া রাখে যে, নিজের স্নেহ-ভালবাসার পাওনাটা কোন দিনই সে সেথায় আশা করিতে পারে না; তা বলিয়া দোষও সে দেয় না—দিনের সকল দিকের ছেঁড়া সুতায় জোড়াতাড়া দিয়া যাহাকে চলিতে হয়, তার পক্ষে এ ভাব কত বড় যে স্বাভাবিক সে তা জানে; আর জানে বলিয়াই তার দেওয়া সকল পরুষ কঠোর ভাষাগুলো নির্ব্বিবাদে সে হজম করিয়া যায়। কোনদিন, কোন ছলে প্রতিবাদ সে তুলে না। আজ সেই পত্নীর মুখে শান্তি কোমল ভাব দেখিয়া আনন্দ উৎসাহে প্রাণ তার ভরিয়া উঠিল···

ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "নবনে বলে, চক্রবর্ত্তী-মশাই, রায়েরা পুকুরটা জমা দিতে চায়, তুমি নাও, বকরায় তোমার আমার করা যাবে। জমির খাজনা জমিই দেবে চক্রবর্ত্তী-মশাই, সে জন্যে ভেব না, অভাবের সংসারে ছেলেপুলে-গুলো ভাতের পাতে মাছ খেতে পাবে সেইটেই কি বড় লাভ নয়?"

চিন্তিত ভাবে সতী জিজ্ঞাসা করিল, "জমা কত?"

"তা বড় বেশী নয়, আমি যদি নিই ত বছরে গোটা ষাটেক টাকায় ওরা ছেড়ে দিতে পারেন..."

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া সতী বলিল, "যে চাপ তোমার মাথায় ভগবান চাপিয়েছেন, তারি জালায় পাগ... কাজ নেই সাধ করে আর ভাগ জুটিয়ে···"

"তা হ'লে...অমলীর সে চুড়ী ক'গাছা কি আছে...এ সুযোগে পার ত কিনে নাও, একসঙ্গে একদিনে এতগু... টাকা যে কখন হাতে আসবে, আমার পক্ষে তা স্বপ্ন। আ... সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে, বাকী ওটুকুও..."

"না, শীত আসছে ছেলেপুলেগুলোর দোলাই এক-আ... খানা করে কিনে দাও, আহা বাছারা ছেঁড়া কাপড় গা... বেঁধে বেঁধে ক'বছর বেড়িয়েছে..."

"আমি বলি তা নয়, ক'বছর যা চলে এসেছে, আজ তাই চলতে পারে, আমার ঘরে এসে গায়ে ত কোনদিন কিছু উঠলো না...না না, আপত্তি করো না, অমলী... ডাকাই..."

"গায়ে গয়না পরবার বয়েস আর আমার নেই। সা... ছেলের মা, লজ্জা তোমার কিছু না থাকতে পারে, আমা... আছে—বেঁচে থাক ওরা সাত ভায়ে! সাত দিক থে... যখন আসবে, তখন···"

"অত আশা করো না গিন্নী, মনে রেখ আজকালকা... ছেলে ওরা..."

"যাও, আমার ছেলেপুলের নিন্দে আমার সামনে তু... করো না—তোমার মুখ থেকে এলেও আমি ... সইব না!"

দুই

"দেখ, দেখ মা, কতগুলো মাছ ধরে এনেছি, তবু বা... তার ভাল ছিপটায় আমায় হাত দিতে দেবে না..."

মাছ দেখিয়া অন্তরে আনন্দ হইলেও সতী তা মু... প্রকাশ করিতে পারিল না, একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "কা... পুকুরে মরতে গিয়েছিলি হতভাগা, এমনি গাল দিয়ে দূ... ভাগিয়ে দেবে··· ?"

"ইস্, দিলেই হ'ল কি না! গাল রাস্তায় প... রয়েছে, মুখ নেই আমি দিতে পারব না?"

মায়ের মুখে প্রসন্ন একটু হাসির রেখা ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল। গম্ভীর মুখে সে বলিল, "বড় ম...

ক্তি নয়, লোকের পুকুর ওজাড় করতেও করবি, গাল খেতে তারাই খাবে !"

নন্দলাল বিকৃত মুখে বলিল, "তা খাবে বই কি। জটের বিল থেকে ধরে আনলেও মাছগুলো যদি তাদের পুকুরের হয়,—খাবে না ?"

আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া মাতা কহিল, "জটের বিলে ? বলিস কিরে হতভাগা, একা সেই ততদূরে গেছলি !..."

"যাব না ! তোমার থোড়, ডুমুর, কলমী শাক রোজ খেতে হবেই এমন ত কোন কথা নেই !..."

সতী আর কিছু বলিল না, আঁস বঁটি লইয়া উঠানের ছাই গাদার নিকটে গিয়া মাছ কুটিতে বসিল। দাওয়ার এক পাশে বসিয়া তার হাতের কাজে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দলাল বলিয়া উঠিল, "খাব ত মাত্র দু'বেলা, অত কুচুচ্ছ কেন ?"

মা হাসিয়া বলিল, "বেলা দু'টো হতে পারে, কিন্তু মুখ ত আর একটা নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সবাই ত খাবে ?"

"কেন, কেন, খাবে কেন ? ধরতে যেতে পারে না ! না না, আমি ধরে এনেছি, আমি একা খাব, কারুকে ভাগ দিতে পারব না।"

ভৎসনা মাখা কণ্ঠে মা বলিল, "ছি বাবা, দেব না কি বলতে আছে, তুমি বড়, সব বিষয়ে বড় হতে হবে। তোমারি ত সব কচি কচি ভাই..."

নন্দলাল বারবার মাথা চালিয়া বলিতে লাগিল, "না না, থাক্ কচি কচি ভাই, জন্মে পর্য্যন্ত আমি কেবল ভাগ দিয়েই আসছি, কেন না আমি নিরেট বোকা। না, এবার থেকে আর বোকা থাকব না, যেখান থেকে পারে ওরা নিয়ে আসুক। এবার থেকে পূরোপূরি আমি ভোগ-দখল করব, ও ভাগাভাগিতে আর আমি নেই।"

মাতার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই সে না পুত্রগর্ব্বে প্রতিবেশিনীকে বলিয়া আসিয়াছিল, "আমার সাত ছেলে, ভাবনা কি ? সাতজনে সাত মুঠো আন্‌বে, ভাগাভাগি করে খাবে। ওরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে এ দৈন্য দুর্দ্দশা আর আমাদের থাকবে না।"

কিয়ৎকাল পরে স্মিত হাস্যে মাতা কহিল, "আচ্ছা, ভায়েদের না দিস্ তোর, ওকে ত দিবি..."

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া পুত্র উত্তর দিল, "কেন, কেন দেব কেন, আমায় ছিপে হাত দিতে দেয়..."

"বেশ, তাকে না দিস্, আমি মা হই, এত কষ্ট কচ্ছি আমায় ত দিবি ?"

এবার আর প্রতিবাদ তুলিতে না পারিয়া পুত্র নন্দলাল খানিক 'গুম' হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর নিজ হাতে কতকগুলো মাছ আলাদা করিয়া দিতে দিতে সে গাঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই নাও। এই, এই, আমার সামনে বসে খেতে হবে কিন্তু ; বক্‌রা নিয়ে ছেলেপুলেকে খাওয়াবে, তা হতে দিচ্ছি না।"

পুত্র গৌরবে মাতার অন্তর আবার স্ফীত হইয়া উঠিল। আঁস হাতের কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া নিজ বাহু বেষ্টনীর ভিতর সে তাহাকে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিল।

তিন

বৎসর কয়েক পরের কথা। নন্দলাল বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিনিষগুলা দাওয়ার উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—"অবাক কল্লে মা, দু বেলায় দেড়পো দাল উঠিয়ে দিলে ! এমন বেমক্কা খরচ যদি কর, তোমার সংসার চালাতে আমি পারব না।"

কাচুমাচু মুখে সতী বলিল—"কি করব বাবা, আর ত তরকারী কিছু নেই, কাজেই দালটা একটু বেশী ওঠে..."

"ওঠে উঠুক্, তোমরা চালাও, আমায় কিছু বল না, তোমার কুপুষ্যিদের পেট চালাতে আমি পারব না।"

মা কথা কহিল না, নীরব ধৈর্য্যের আশ্রয়ে পুত্রের এতবড় অনুযোগের ধাক্কাটা সে সহ্য করিল। মাস-কতক হইল নন্দলাল পিতার সহিত মুহুরীগিরির কাজে বাহির হইতেছে। রেজিষ্ট্রার দীননাথবাবু এ স্বল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ মুহুরীর দিকে একটু স্নেহের টান দেখানয় পিতার

অপেক্ষা আয়টা তার দ্বিগুণ। অনেক আবেদন নিবেদনের ফলে আজ তিনদিন হইল সংসারের তরিতরকারীগুলোর ভার সে নিজের স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দলাল হঠাৎ কোপপূর্ণ মনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, হঠাৎ বাবুরা এমন নবাব হলেন কোত্থেকে তা বল ত? এতদিন ত লঙ্কা-গোলার জলে চলত, আমিও ত তোমাদের তাই খেয়েই এত বড়টা হয়েছি—আজকাল তা আর রোচে না কেন?"

সহসা উত্তেজিত হইয়া মাতা বলিয়া উঠিল, "কেন, কেন, রুচ্‌বে কেন তাই বল, তোরা দুই বাপ বেটায় রোজগার করছিস না, চিরকাল আমি সেই লঙ্কা গোলা তেঁতুল গোলা ভাত খেতে যাব কেন?"

পুত্র দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "যেমন ভাগ্যি নিয়ে এসেছ! তার বেশী চাও—পাবে কোথায়? ......আমার রোজগারের কথা বলছ, দুদিন পরে আমার নিজের সংসার ত বাড়বে, তখন তোমাদের মুখ চেয়ে থাকতে গেলে ত চলবে না, কাজেই বলা। অত হাত বাড়িও না রাশ টান...নইলে আমার আর কি, পরে নিজেদেরই পস্তাতে হবে!"

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে শীতল চক্রবর্ত্তী বলিল, "সেই ভাল নন্দলাল, এ কুপুষ্যির জন্যে মিছে পয়সা উড়িয়ে কিছু লাভ নেই, তুমি আলাদা হয়ে পড়ো..."

সতী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি, পাগল হলে!"

শীতল চক্রবর্ত্তী বেশ শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "পাগল হই নি গিন্নী, পাছে হতে হয় তার জন্যেই সাবধান হচ্ছি; তবু ওদের দুটো দুটো চারটে মুখ দু বেলায় যদি কমে কতটা হাল্কাই হব।"

"ছিঃ, তুমি কি! ছেলের উপর রাগ..."

বাপ বিষাদভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নয় গিন্নী, শেতল বড় শেতল! তাই ছেলের মুখে এত কথা শুনেও অপর ছেলেগুলোকেও এখন থেকে ঘাড় ধরে না বিদেয় করে দিয়ে তাদের পুষতে চাচ্ছে। ভয় নেই, ও নেমকহারামের দল কেউ তোমার আপনার হবে না। বিদেয় কর গিন্নী, বিদেয় কর। কাল সাপ যখন ফণা তুলেছে, ছোবলাবেই। তার আগে আরও দুধকলা দিয়ে, পাপের হাত থেকে নিস্তার হও।"

"কি বলছ তুমি,—ছেলে পাপ..."

"পাপ বলে পাপ, মহাপাপ...আগের দিনে বল্‌ত বটে, ছেলে হয়ে পুন্নাম নরক হতে ত্রাণ করে। আজকালের দিনে কিন্তু তা নয়—উল্‌টে ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাত শ' নরক হাঁ করে গেলবার জন্যে..."

রাগত কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, "ছেলে একটা কি না কি কথা বলেছে ত অমনি গায়ে বিষ ছড়িয়ে গেল! এত হিংসা যদি তোমার, আর পাঁচজনকে নিয়ে আদালতের কাজ চালাও কি করে?..."

শীতল হাসিল। তারপরে বড় শান্ত কণ্ঠে বলিল, "যে অবুঝ, তাকে আর কি বোঝাব গিন্নী! এই বেলা অঙ্কুর ছাড়তে পারতে, ভালই হ'ত, এরপর অনেক দণ্ডাতে হবে কিন্তু বৃথা বলা! একটা কথা ও ঠিকই বলেছে, ভাগ্য কপালের লিখনের জন্যে নারায়ণকে যখন পাথরে লুকিয়ে শনির দাঁত সহ্য করতে হয়েছে, তখন তুমি আমি কোন ছার!"

* * *

বড় ছেলে নন্দলাল পিতৃআজ্ঞা পালনে অবহেলা করে নাই। একটা শুভদিন দেখিয়া অন্যত্র বাসা বাঁধিয়াছে শোনা যায়, লক্ষ্মীছাড়ার ঘর ছাড়িয়া লক্ষ্মীও না কি তাহার উপর কৃপা করিয়াছেন। পুত্রের এ ব্যবহারে শীতল চক্রবর্ত্তী যত হাসিয়াছে, লক্ষ্মী তত 'গুম' হইয়া গিয়াছে।

চার

আরও কয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দিনটা রবিবার। রেজেষ্টারী অফিস বন্ধ। শীতল চক্রবর্ত্তী উঠানে বসিয়া ছেঁড়া গায়ের কাপড়খানি রিফু করিতেছিল। শীত আসন্ন প্রায়, এখানিকে জোড়া তাড়া দিয়া ব্যবহার যোগ্য না করিয়া লইলেই নয়।

সতী বোধ হয় বাহিরে কি কাজে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শুনছ, সুরো আমাদের ঘোষেদের বড় আম বাগানটা জমা নিয়েছে।"

"তবে আর কি, যেখানে যত নোড়ানুড়ি আছে তার সিন্নি চড়াও। আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, ও বাগান জমা নেওয়া নয়, তোমার আমার জ্বালানোর সমিধ সংগ্রহ।"

"দেখ, মিছে বকো না। ছেলেপুলের কাজ এত নেড়ামীর চোখে দেখাটা কিন্তু এক চোখোমীর কাজ।"

ঠিক এক সপ্তাহ পরে মেজ ছেলে সুরসূদন নিকটে আসিয়া বলিল, "এটা কিন্তু বড় অন্যায় মা, বাগান নিয়েছি তোমার ছেলেদের হুটোপুটি করবার জন্যে নয়, যাকে তাকে নিয়ে আবাগেরা যাবে..."

"গিন্নী! গিন্নী! ভারত শুনেছ, ওই যে হিন্দু নারীর পরম শিক্ষার বই গো! শুনেছ, না শুনে থাক ভাল করে শুনে নাও, ইহজন্ম ত বটেই, পরজন্মের কিছুকাল পর্য্যন্ত কথাগুলো স্মরণ থাকবে..."

"দেখুন, এই জন্যেই বড় দা আলাদা হয়েছেন। ভাল কথা বলতে এলে আপনি যদি এমনি করেন...নাচার!"

"আলাদা হয়ে পড়ো সুরো, আলাদা হয়ে পড়ো, এমন সুযোগ আর পাবি না রে···গিন্নী গিন্নী, বলেছি ত, সমিধ সংগ্রহ, এ আর কিছু নয় সমিধ সংগ্রহ।"

সুরসূদন কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "না, আপনাদের ব্যবহারটা নেহাৎ ইয়ে···ওর মুখে শুনতে পাই পেট পূরে খেতেই পান না···বড় দা' কতদিন বলেছেন, বেরিয়ে আয়। এতদিন তা পারি নি কর্ত্তব্য ভেবে,—বেশ আপনি নিজেই যখন আজ সে কর্ত্তব্যের বাঁধান ছিঁড়ে দিয়েছেন, আমি করব কি! ভাল কথা, লোকে জিজ্ঞেস করতে এলে এই কথাই বলবেন..."

সদর্পে সুরসূদন সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

হাসিয়া শীতল চক্রবর্ত্তী বলিল, "দেখেছ গিন্নী, একটা একটা করে খসছে! পাখী খুঁটে খেতে শিখেছে আর কেন, এইবেলা মানে মানে বাকীগুলোর মায়া পার যদি কাটিয়ো ফেল! কেউ থাকবে না, বুঝলে, কেউ থাকবে না! উড়তে না পারার ওয়াস্তা, শুধু উড়তে না পারার ওয়াস্তা! ডানায় ভর দিয়ে মুক্ত বাতাসে যেতে আসতে যেদিন পারবে, সেদিন তুমি, তুমি বলে আর পুঁছবে না, তাই বলি সময় থাকতে মায়া ছাড়।···"

সতী বিষাদভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হয় না—আমি যে মা! তোমারি মুখে ত চণ্ডীর ব্যাখ্যায় শুনেছি, মায়া হয়ে মা আমার এমনি মায়ার আসন ছড়িয়ে রেখেছেন, ক্ষিদেয় বুক জলে গেলেও ঠোঁটের আগার দানাটা ঘেট্‌বার উপায় নেই, মুখে নিয়ে কচি বাচ্ছার মুখে পৌঁছে দিতেই হবে...বুঝছ, এ আমাদের কর্ত্তব্য, এই মায়া, আর এ আছে বলেই আমরা মা। তা ছাড়া, ওরা ত অন্যায় কিছু করে নি—ছেলেমানুষ আমাদের বোঝা কাঁধে বইতে যদি নাই পারে, দোষ দেওয়া চলে না ত। আশীর্ব্বাদ কর—ওরা সুখী হোক্। আমার তুমি রইলে ভাবনা কি বল?"

"বুঝেছি, বুঝেছি সতী, এতদিন পরে বুঝেছি তোদের আসন কেন এত উঁচু! কেন শাস্ত্র, ব্যাখ্যার হিসাবে বলে গেছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী!' শুধু এই জন্যে, শুধু এই জন্যে, পৃথিবীর সৃষ্টির বিশেষ সব ধ্বংসের মুখে নেমে যেতে পারে—কিন্তু না, মা নয়! যদি কিছু থাকে এই মা থাকবে। "আজ নতুন আলো জ্বালিয়ে দিলে সতী! না, এভাবে এমন করে মা শব্দটার অর্থ কোনদিনই আমি করতে পারি নি, পারতুম না, পারব না। ঠিক্ ঠিক্, মা, মা-ই থাকবে!···"

সতী কোন কথাই বলিতে পারিল না, নীরবে স্বামীর পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দু' দিনের পরিচয়

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য, বি-এ

বালীগঞ্জের মোড়ের কাছে একটা ট্যাক্সী-চালক পাঞ্জাবী মুসলমানের সহিত একজন রমণীর বাক্য-বিনিময় শুনিয়া একটা বড় বাড়ীর গেট খুলিয়া একজন যুবক বাহির হইয়া আসিল। সে সটান গাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া হিন্দীতে বলিল, "এঁদের কোথায় নিয়ে যাবি ?"

গাড়ীর মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন, "আমাদের মিছিমিছি অনেক ঘুরিয়েছে বাবা। লোকটাকে ভালো ব'লে মনে হ'চ্চে না।"

যেমন করিয়া ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ঘোড়াকে দাঁড় করাইয়া রাখে, তেমনি মোটরখানার হেড্ লাইটের উপর হাতখানা রাখিয়া যুবকটী বলিল, "আপনারা দয়া ক'রে একটু নামুন ত' ?"

গাড়ী হইতে একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রৌঢ়া, একটী তের চৌদ্দ বছরের বালিকা এবং তাহারই হাত ধরিয়া একটী ন' দশ বছরের ছেলে নামিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইল। যুবকটী কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রৌঢ়া রমণীটি বলিলেন, "আমরা আসছি বাবা, এলাহাবাদ থেকে। বিশেষ এক কাজেই কোলকেতায় এসে পড়েছি। একজন আত্মীয়ের বাড়ী যাবো। আমরা বারমাস এলাহাবাদেই থাকি—সেইখানেই আমাদের ঘর বাড়ী, কোলকেতার পথ ঘাট বাড়ী চিনি নে।"

যুবকটি তখন ট্যাক্সী-চালকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ব্যস্ত ছিল। অনেকক্ষণ বাক্য-বিনিময়ের পর, তাহার ব্যায়ামপুষ্ট ঘুঁসিটা বেশ জোরেই ড্রাইভারটার উপর লাগাইয়া দিল। এমন জোরে লাগাইল যে, অতবড় দীর্ঘ বপুখানি অনায়াসেই রাস্তার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তারপর অদূরবর্ত্তী একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বালিকাটীর দুটী সুন্দর আয়ত চক্ষু যেন অজস্র ধারায় তাহার উপর অন্তরের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা বর্ষণ করিতেছে। যুবকটী বলিল, "আপনারা কোথায় যাবেন ? আপনাদের আত্মীয়ের বাড়ী কোথায় ?"

প্রৌঢ়া রমণীটি বলিলেন, "আহিরীটোলায়। কত নম্বর রে শুভা ?"

বালিকাটি তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর করিল, "তা আমি কি জানি ?"

প্রৌঢ়াটি বলিলেন, "এমন বিপদেও মানুষে পড়ে বাবা! তার ওপর, সঙ্গে একটা পুরুষমানুষও নেই। এলাহাবাদ থেকে কোলকেতা পর্য্যন্ত ট্রেণে আমাদের লোক ছিল। আর হাওড়া ষ্টেশনেও লোক থাকবার কথা ছিল। তাকে আগে খবর দেওয়া হয়েছিল। সেও চিঠিতে জানিয়েছিল যে, হ্যাঁ, সে, এই ট্রেণে হাওড়ায় থাকবে। কেন যে সে আসতে পারে নি তাও বুঝতে পারছি না বাবা, হয় ত' অসুখ বিসুখই বা করলো ? একখানা ট্যাক্সী করলুম। কিশোর বললে, আর শুভাও বললে, 'আহিরীটোলায় গেলেই বাড়ীর পথ চিনে নিতে পারবে।' কিন্তু গেরো ছাখো বাবা ! ট্যাক্সীওয়ালাটা যে আমাদের কোথায় নিয়ে এলো—"

আকস্মিক দুর্বিপাকে অনেকের মুখই অমন খুলিয়া যায়। প্রৌঢ়া রমণীটির বোধ হয় তাহাই হইল। তিনি আরো বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু যুবকটী বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা পরে শুনবো 'খন্। এতো রাত্রে আজ ত' আর আহিরীটোলায় সেই আত্মীয়ের বাড়ী খোঁজা হ'তে পারে না। আজ আমার বাড়ীতে থাকুন। তারপর কালকে আমি বাড়ী খুঁজে আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। আসুন। এই মুটিয়া, ইধার আও।"

জিনিষগুলি মুটের মাথায় দিয়া তাহারা তাহার বাড়ীতে

ঢুকিল। যাইতে যাইতে যুবকটি বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন। ছেলেটী আপনার—"

মুখের কথা না ফুরাইতেই প্রৌঢ়া বলিলেন, "ও আমার বনপো, আমার ওই শুভা ওর বড় বোন্। তোমার নামটি কি বাবা?"

—"আমার নাম চন্দ্রকান্তি মুখুয্যে।"

বাড়ীর ভিতর দোতলায় তাঁহাদের লইয়া গিয়া চন্দ্র একখানা সুন্দর প্রশস্ত ঘর খুলিয়া দিল। এবং তাহাদের জিনিষপত্তরগুলি ঘরের কোণে গুছাইয়া রাখিল। তারপর তাহাদের বিছানা বাঁধা লগেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ রাত্রে কিন্তু কোন উপায় দেখছি না—দোকানের খাবারই খেতে হবে।"

সশব্যস্তে প্রৌঢ়াটি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, আমরা সব খেয়েছি। বর্দ্ধমানে খাবার-দাবার খাওয়া হয়েছে। পেট এখনো দম্‌সম্। আর আমার ত' রাত্রে—বিধবার খাওয়া—"

চন্দ্র পা দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "আপনার না হয় খিদে নেই, কিন্তু এই ছেলেমানুষকে দোকানের খাবার খেয়ে রাতটা থাক্‌তে হবে। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, না কিশোর?"

বালকটী সত্যই হোক্ আর লজ্জার খাতিরেই হোক্, প্রচণ্ডভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে মাসীমার কথার সমর্থন করে। শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোড়দি'র খিদে পেয়েছে ঠিক।"

শুভা হাসিয়া ছোট ভাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না না।"

রমণীটি বলিলেন, "তা বাবা, এতবড় বাড়ী তোমাদের খালি দেখছি কেন?"

চন্দ্র বলিল, "আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলেই পশ্চিমে গেছে হাওয়া খেতে। শুধু আমি আর আমার এই বোন্ আছি একজামিন ব'লে। সেই জন্যে ত' আরো মুস্কিল—খাওয়া-দাওয়ার ভারী অসুবিধে। একে ত' আমি উড়ে বামুনের হাতের রান্না খেতে পারি না—যার তার হাতের ছাই-পাঁশ রান্না কোনোকালেই খেতে পারি না—তার ওপর আমাদের বামুনের দু' দিন হ'ল জ্বর হয়েছে। এ দু' দিন এক রকম উপোস ক'রেই আছি।"

প্রৌঢ়াটী বলিলেন, "কেন, তোমার বোন্ রেঁধে দিলেই ত' পারে? তুমি দুটো রেঁধে ভাইকে দাও না কেন মা?"

কনক হাসিয়া উঠিল, "দিই ত'—কাল রেঁধে দিই নি দাদা তোমাকে? কি করবো বলুন? দাদার মুখখানি এমন, রান্না একটু যদি কম-বেশী হ'লো ত', ব্যস্। আর মুখে করা চলবে না।"

চন্দ্র বলিল, "সে আড়ম্বর কত, জানেন? পাকশিক্ষা ব'লে একখানা বই কিনে আনালুম। সেইখানা হাতে ক'রে আমার কর্ম্মিষ্ঠা বোন্ ত' রান্না ঘরে ঢকলো। তার পর শুনুন। বইখানা দেখে দেখে ত' রান্না করতে লাগলো। বইয়ে যেমনটি লেখা, ঠিক তেমনটি করে রান্না করা চাই কি না? 'কুড়ি মিনিট নাড়াচাড়া করিতে হইবে', ত' ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ঠিক কুড়ি মিনিট খুন্তি দিয়ে অনর্গল নাড়া, 'আধ কাঁচ্চা নুন' ত', নিক্তি দিয়ে ওজন ক'রে নেওয়া ইত্যাদি কোনো ত্রুটিই হ'লো না। অর্দ্ধেক রান্নার পর—আমারও দুর্ভাগ্য, কন্‌কিরও দুর্ভাগ্য—বইয়ের পাতাটা হঠাৎ উল্টে গেলো। মহামুস্কিল! সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'জনে পড়ে পাঁচ-ছ' মিনিট ধ'রে খুঁজে বের করলুম। তারপর কড়ার দিকে চেয়ে কন্‌কিকে ওগুলো উঠোনে রাখ্‌তে বললুম। কেন না, ঝিয়ের ছাইয়ের দরকার হয়। তারপর—"

সকলেই হাসিতেছিল। শুভা একটা অসংবরণীয় হাসির প্রাবল্য রোধ করিতে গিয়া ভয়ানক কাসিতে লাগিল। চন্দ্র বলিল, "সেদিন কিন্তু কন্‌কির ওপর ভারী রাগ হয়েছিল—পোড়ারমুখী এমন অপদার্থ! সত্যি, রান্না একটা শিল্প এ মনে ক'রে প্রত্যেক মেয়েরই জিনিসটা রীতিমত শেখা উচিত—আমি ত' তাই মনে করি। মেয়েমানুষ রাঁধতে জানে না—কথাটা বড্ড মর্ম্মান্তিক! কেমন, নয়, বলুন?"

প্রৌঢ়াটি হাসিয়া বলিলেন, "তা বই কি বাবা।" তারপর শুভার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কাল সকালে দুটো রেঁধে খাওয়াস্ ত' শুভা।"

এমনি অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা গল্পগুজব হইল, যা জীবনে প্রথম এবং হয় ত' বা শেষ পরিচয়ে বড় একটা হয় না, এবং হওয়াও হয় ত' বা উচিত নয়। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহারা পথহারা, ওই যুবকটীর অনুকম্পার উপর সকল রকমেই নির্ভরশীল, এবং চন্দ্রও ভুলিয়া গেল, তাঁহারা তাহার একদিনের আশ্রিত, পরদিন হইতে হয় ত' আর জীবনে কোনোদিনই সাক্ষাৎ ঘটিবে না।

পরদিন সকালে চন্দ্র ডাকিল, "মাসীমা!"

ডাক শুনিয়া শুভা বিস্মিত দৃষ্টিতে চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। মাসীমাও বিস্ময়, প্রশংসা এবং স্নেহমাখানো চোখ দুইটী অমলের মুখের উপর সংন্যস্ত করিলেন। তিনি যে এক রাত্রে ওই হৃদয়বান শিক্ষিত যুবকটীর এত আপনার হইয়া গিয়াছেন, এই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ তাঁহার নারী হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় অমৃত সিঞ্চন করিল। ডাকিলেন, "কেন বাবা?"

—"কাল রাতে কোনো অসুবিধে হয় নি?"

—"না বাবা।"

—"কিন্তু এ বেলা খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবে মাসীমা?"

—"সে ব্যবস্থা আমিই সব ক'রে দিচ্চি বাবা। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। শুভা রাঁধবে 'খন। যা ত' মা, স্নান করে এসে দুটো চড়িয়ে দে—তোর চন্দ্র দাদাকে দুটো রেঁধে—"

'তোর চন্দ্র দাদাকে' কথাটী মাসীমা চন্দ্রের প্রতি এবং তাহারও প্রতি স্নেহাতিশয্যেই উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শুভা মাসীমার ওই নিষ্প্রয়োজন স্নেহের প্রাবল্যটুকু মনে মনে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত সে তাহার আনত মুখখানা মাসীমার দিকে ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু ওই প্রৌঢ়া রমণীটি সে পথের ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে শুভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা না মা, করবি কখন? শুন্‌ছিস, চন্দ্র আজ ক'দিন রান্নার অভাবে খায় নি?"

শুভা আর কোনো কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। চন্দ্র শুভার মাসীমার সঙ্গে সেইখানেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। খানিক পরে শুভা স্নান সারিয়া সিক্ত বস্ত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে শুভাকে কাল হইতে একবারও ভাল করিয়া দেখে নাই। আজ যখন শুভা অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সে চোখ দুইটাকে ফিরাইতে পারিল না—শুভাকে এমনই শিশির-স্নাত ফুলটীর মত সুন্দর দেখাইতেছিল। শুভা উনানের ধারে বসিয়া গেল, আর কনক তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। উনান ধরাইতে অনর্গল ফুঁ দিয়া যখন শুভা রান্নাঘরের বাহিরে আসিল, চন্দ্র দেখিল, ধোঁয়ায় তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই শরণাগত ভদ্রপরিবারবর্গকে সে আজ তাহার এমন হীন কাজে লাগাইয়াছে—বিশেষতঃ, এই ছোট মেয়েটীকে—এই আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার মাসীমার মুখে শুনিয়াছিল, এ এলাহাবাদে একজন মস্ত বড় উকীলের মেয়ে। নিজ হাতে রান্না করা, উনান ধরানো, হয় ত' কেন, নিশ্চয়ই অভ্যাস নাই। অথচ, ইহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া সে এই কাজই করাইয়া লইতেছে। নিজেদের বাড়ীতে গিয়া হয় ত' এ কথা সকলের সঙ্গে গল্প করিবে। তাঁহারা ভাবিবেন, একজন অভদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। ছি ছি ছি!

শুভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি দরকার ছিল নিজে উনুন ধরাবার? ঝিকে বললেই ত' হতো?"

চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শুভা জবাব দিল, "উনুন মাসীমা ধরিয়ে দিয়েছেন।"

শুভা সবই করিল। রান্নাবান্না ত করিলই, এমন

কি চন্দ্রের ঠাঁইটা পর্য্যন্ত করিল। কনক কতবার তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে তা'তে স্বীকৃত হয় নাই।

চন্দ্র আহারে বসিল। বসিয়াই লক্ষ্য করিল, এই তুচ্ছ কার্য্যটার ভিতর, অর্থাৎ ঠাঁই করার ভিতরও কেমন একটা পারিপাট্য, একটা সৌষ্ঠব রহিয়াছে। আসনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলের গেলাসটা কেমন বা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তারপর কুণ্ঠিতপদে যখন ওই বালিকাটী সম্মুখে থালা হাতে করিয়া পরিবেশন করিতে আসিল, তখন তাহার মুগ্ধদৃষ্টি বারেকের জন্য শুভার সুন্দর মুখখানির প্রতি সংন্যস্ত হইল। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা লইয়া সে আজ খাইল। কনককে ডাকিয়া বলিল, "কন্‌কি, পোড়ারমুখী, রান্নাটা ওর কাছ থেকে শিখে নে। কোনো কাজের হ'লি নে তুই।"

দুপুরবেলা আহিরীটোলায় সে তাহাদের আত্মীয়ের সন্ধানে গেল। গেল অবশ্য শুভার মাসীর তাগাদায়। সে জানিত, আজ কোনোমতেই সেই আত্মীয়ের সন্ধান বাহির করিতে পারিবে না, এবং একথা জানিত বলিয়াই সে সন্ধান বাহির করিতে পারিল না। কারণ, এ বেলা শুভার হাতের রান্না খাইবার অসংবরণীয় প্রলোভনের কাছে তাহাদের আত্মীয়ের সন্ধান করা কাজটা শুধু অকিঞ্চিৎকর নয়, ক্ষতিকরও। সন্ধান হইলেই ত' তাহারা চলিয়া যাইবে।

বিকালবেলা ফিরিয়া আসিয়া নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, শুভা একখানা চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছে। ঘরের মেঝেতে তাহার ছায়া পড়াতে শুভা ফিরিয়া চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। চন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিস্মিত হইল। একবেলার মধ্যে ঘরটার রূপ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝে ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে—টেবিলের উপর বইগুলি সুন্দরভাবে গুছানো, কলমদানীতে কলমগুলি সাজানো। এমন কি, দেয়ালে ঝুলানো নিজের ফটোখানা, যা' দু' বৎসরের ধূলা ও ঝুলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেটি পর্য্যন্ত আজ এক অজ্ঞাত হস্তের নৈপুণ্যে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। টেবিলের কাছে গিয়া দেখিল, রঘুবংশ খোলা। এই বইটাই সে পড়িতেছিল। পাতা উল্টাইয়া দেখিল, নাম লেখা কুমারী শুভা চট্টোপাধ্যায়। এত অল্প বয়সে সে রঘুবংশ পড়ে! বইয়ের পাতার পাশে ছোট ছোট করিয়া লেখা নোটগুলি পড়িয়া দেখিল তাহার সংস্কৃতে জ্ঞান খুব ভালই। চেয়ারখানির উপর বসিয়া পড়িয়া চন্দ্র ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, শুভার কথা। যেদিক দিয়াই বিচার করিতে লাগিল, দেখিতে পাইল, কৈশোর-যৌবনের সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান ওই অনিন্দ্য বালিকা মূর্ত্তিটী এক ভবিষ্যমান নারীর সমস্ত রত্নসম্ভার লইয়া তাহার চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

কাল রাত্রে রাস্তার উপর সেই ট্যাক্সীর দুর্ঘটনা—তারপর শুভা ও তার মাসীমার তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়া—সমস্তটাই তাহার কাছে একটা মস্ত বড় রহস্য—শুধু রহস্য নয়, বেদনার কারণও বটে। দু' দিন আগে জগতে যাহাদের অস্তিত্বের কথাও সে অবগত ছিল না, তাহারা আজ তাহাদের বাড়ীতে তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইছে; তাহাকে এবং সেও তাহাদিগকে, আপনার করিয়া লইয়াছে। আবার কাল এই তিনটি কণিকা বিশ্বসংসারের জনসমুদ্রে কোথায় চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে! দু' দিনের আসা, দু' দিনের যাওয়া, এই বহুপ্রচলিত সরল সত্যটুকু সে আজ বড় মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করিল।

"—চন্দ্র, বাবা, আহিরীটোলার কোনো খবর পেলে না?"

"—কেন মাসীমা?"

"—না মাসীমা। কালকে যেমন ক'রে পারি খুঁজে বার করবো।"

"—তাই করো বাবা, শুভা ভারী ব্যস্ত হয়েছে।"

"—ও, তা' ত' হবে।" তারপর সপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও একটু ব্যস্ত হতেই পারে--বেচারীকে হাঁড়ি পর্য্যন্ত ধরতে হচ্ছে।"

কথাগুলি শুভাকে শুনাইবার জন্যই চন্দ্র বলিয়াছিল;

কারণ দোরের পাশে শুভাও দাঁড়াইয়াছিল। মাসীমা হাসিয়া উঠিলেন। তারপর শুভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুইই বল্ না?"

"—কি মাসীমা?"

—"আমার শুভা বলছে, তা' নয়। ওর বাড়ীতে সব কি ভাবছে, সেই জন্যেই ব্যস্ত হয়েছে। বলছে, মাঝে মাঝে এসে না হয় রেঁধে খাইয়ে যাবে।"

চন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এটা প্রতিশ্রুতি বলে মনে ক'রে নিতে পারি ত'?"

অস্ফুট এবং সস্মিত উত্তর আসিল, "হ্যাঁ।"

পরদিন চন্দ্র সমস্তদিন ঘুরিয়া তাহাদের সেই আহিরী-টোলার আত্মীয়ের সন্ধান বাহির করিল। যে ভদ্রলোকটীর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবার কথা ছিল, তিনি হঠাৎ কি একটা রোগে সেইদিনই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর সুস্থ হইয়া শুভাদের খোঁজ করিতেছিলেন, কিন্তু এই দু' দিন কোনো সন্ধানই পান নাই। তারপর যখন চন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাহারা তাহাদেরই বাড়ীতে সসম্মানে রহিয়াছেন, তখন তিনি চন্দ্রকে মাথায় কিংবা কোথায় রাখিবেন তাহার কোনো কিনারা করিতে পারিলেন না, এবং সাশ্রুনেত্রে হৃদয়বান যুবকটীর উপর অন্তরের অজস্র অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। চন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল।

বিকালবেলা চন্দ্র তাহার পড়িবার ঘরে একেলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শুভাদের সেই আত্মীয় ভদ্রলোকটী আসিয়াছেন। আজ রাত্রে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। চন্দ্র পড়ায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের মধ্যে বেদনার সহিত এই কথাটী বারংবার ঘুরিয়া মরিতেছিল, "কে ইঁহাদের মাথার দিব্য দিয়া আসিতে বলিয়াছিল, আর কেই বা এমন করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল?"

শুভার মাসীমা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আজ বিকালে আমরা যাচ্ছি। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলুম, তুমি আমাদের জন্মে অনেক করেছো বাবা—তোমাকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো?"

চন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিল, শুভা আনতমুখে মাসীমার পিছনে দাঁড়াইয়া। সেও বোধ হয় ওই কৃতজ্ঞতাটুকু নীরবে জানাইতেই আসিয়াছিল। হাসিয়া বলিল, "লাভ ত আমারই—আপনার আশীর্ব্বাদ পেলুম! আমি আর আপনাদের কি করেছি? করেছেন বরঞ্চ আপনারা। আপনারা দু' দিনে আমাদের বাড়ীটাতে একটা শ্রী এনে দিয়েছেন। দেখুন ঘরটার দিকে চেয়ে—কি ঘরই ছিল, আর কি হয়েছে—যেন হাস্‌ছে।"

মাসীমা নিরতিশয় আত্মপ্রসাদের সহিত বলিলেন, "শুভাই আমার শ্রী। ও যেখানে পা বাড়ায়, সেইখানেই শ্রী আপনিই ফুটে ওঠে।"

শুভা আরক্ত মুখখানা উঁচু করিয়া মাসীমার দিকে চাহিল। একটা কথার উত্তরে কথা কিরূপ শুনায়, তা' না ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্নেহের প্রাবল্যে মাসীমা এইভাবে অনেক কথাই যার তার কাছে বলিয়াছেন, এবং শুভা ইহার জন্য কতবার সরল-হৃদয়া রমণীকে সতর্ক করিবার জন্য বেশী কথা কহিতেই নিষেধ করিয়া দিয়াছে। কালও চন্দ্রের সম্মুখে এই ধরণের একটা কথা বলিয়াছেন, আজও শুভা যে ভয় করিতেছিল, ঠিক তাই হইল। চন্দ্র না থাকিলে হয় ত' সে মাসীমাকে ইহার জন্য বকাবকি করিত, কিন্তু নিরুপায় হইয়া আরক্ত মুখখানা নত করিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঘরের মেঝে খুঁটিতে লাগিল।

চন্দ্র শুভার এই মনোভাবটুকু বুঝিল। কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "সত্যি, আপনাদের যেন ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দু'টি অন্নদান করতে। দু'টি উপবাসীর মুখে আপনারা অমৃত দিয়ে গেলেন—অমৃত, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি নে।"

মাসীমা শুভার আপাদমস্তক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বুলাইলেন। বলিলেন, "তোর রান্না আমার চন্দ্রের বড় ভাল লেগেছে। এলাহাবাদ ফিরে যাবার আগে আর একদিন এসে রেঁধে চন্দ্রকে খাইয়ে যাস্ ত' মা?"

চন্দ্র একটা প্রত্যুত্তরের আশায় শুভার আনত মুখখানার

দিকে চাহিল। শুভা কোনো কথা বলিল না; শুধু একটা সম্মতি-ব্যঞ্জক হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠে একবার স্ফুরিত হইয়া উঠিল। কনক দাদার পাশেই ছিল। বলিয়া উঠিল, "সত্যি, আজ আপনারা যাচ্ছেন, আপশোষ হচ্ছে যে, মা ফিরে এলে মাকে এই রত্নটী একবার দেখাতে পারলুম না। আমি বলছি আজকে আর কালকে এই মাত্র আর দুটো দিন যদি—"

মাসীমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মা, আর এক মুহূর্ত্তও নয়। কি কুক্ষণেই ঘরের বাইরে পা দিয়েছিলুম, এমন বিপদ মানুষের হয়! শুভার বাবা একজন মস্ত উকীল, মস্ত লোক, আমাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে তিনি হয় ত' এতক্ষণ কত কি কচ্ছেন!" বলিয়া তিনি ওই কাল্পনিক বিপদের কথা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই শিহরিয়া উঠিলেন।

চন্দ্র নিজেই তাঁহাদের বিছানা-পত্তর, সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক গুছাইতে লাগিল। শুভার বইগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া তুলিল। দেখিল, নানান রকম সংস্কৃত বই, এবং কোনো কোনটাতে সুন্দর অক্ষরে লেখা কুমারী শুভা চট্টোপাধ্যায়। শুভা পাশেই ছিল। তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে বড় কৌতূহল হইতেছিল—কিন্তু অযাচিত হইয়া কথা বলিবার জন্যই কথা বলাটা কেমন দেখাইবে ইহা ভাবিয়া সেই কৌতূহলটুকু সংবরণ করিল। তার চেয়েও আর একটা বড় বাধা, সে তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে 'আপনি' না 'তুমি'। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের ভিতর অনেক আখড়াই দিয়া, শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, "এগুলো কি পড়ার বই?"

শুভা একটা কাপড় পাট করিতে করিতে উত্তর দিল, "হাঁ।"

"—কোন্ পড়ার? ইণ্টার মিডিয়েট না—"

"—না, মধ্য।"

চন্দ্র আর কোনো কথা না বলিয়া জিনিষ-পত্তর গুছাইয়া দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ বিকালের পূর্ব্বেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন! ঘরের টেবিলের উপর সুবিন্যস্ত বইগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিল, আবার দু' দিন পরে বইগুলি তেমন ছড়ানো এলোমেলো হইয়া থাকিবে, আর কেউ ত' পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া রাখিবে না? ঘরের মেঝে অমন সুন্দর পরিষ্কার করিয়া দিবে না? অথচ ওই শুভা মেয়েটীর অস্তিত্ব দু' দিন আগে সে জানিত না, দু' দিন পরেও হয় ত ভুলিয়া যাইবে। আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশের মত তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের উপর এই যে একটা আকস্মিক রহস্যের স্ফুরণ হইয়া গেল—ইহা ক্ষণিক হইলেও, হয় ত' স্মৃতিটুকু জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিতে হইবে!

বিদায় মুহূর্ত্তে শুভা প্রণাম করিতে গেল। চন্দ্র প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই বালিকাটী আনতমুখে তাহার দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রও হেঁট হইয়া মাসীমার পা দু'খানি স্পর্শ করিল। মাসীমা সিক্তচক্ষে চন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন।

তখনো বালীগঞ্জ এভিনিউ নির্জ্জন। ট্যাক্সীখানার চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ চন্দ্র ট্যাক্সীখানার দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, উহারা তাহার অন্তর-পথ বাহিয়া অমনি করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই দিনই রাত্রে চন্দ্রের বাড়ীর সকলে পশ্চিম হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। মা কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ছেলেকে একটা সুসংবাদ দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "চাঁদু, পশ্চিমে তোর একটা বিয়ের যোগাড় ক'রে এলুম। এলাহাবাদ কোর্টের উকীলের মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি! রূপে গুণে! এখনও পড়ে—গান-বাজনা, শিল্প—আর রান্না, সে কি সুন্দর তা' কি বলবো তোকে! আমাকে একদিন নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করে খাইয়েছিল।"

"আমি সামনের মাসেই বিয়ে দেবো—কথা দিইছি, যদি তোর দাদার মেয়ে পছন্দ হয়। তাঁরা দিন তিনেক হলো ওই জন্যই কোলকাতায় এসেছেন।"

চন্দ্র মূঢ় দৃষ্টিতে কনকের দিকে চাহিল। কনকও হতবুদ্ধির মত দাদার চাহনির অর্থ নির্ণয় করিতে লাগিল।

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

সাপের জাত

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

নিদারুণ গ্রীষ্মের পর সন্ধ্যা মাথায় করিয়া এক পশলা বৃষ্টি বেশ একটা শান্ত উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায়, অভয় সাজগোজ করিয়াই পাথরের টেব্‌লের সামনে একখানি চেয়ার টানিয়া পাখা খুলিয়া বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কী যেন ভাবিতেছিল।

অল্প কিছু পূর্ব্বে কে যেন ধূপদানে ধূপটী জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে—মনমাতান সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। অভয় হঠাৎ ধূপদানটী টানিয়া লইয়া জ্বলন্ত ধূপটির মুখে ফুঁ দিয়া খেলা করিতে লাগিল। কিছু পরে একখানি প্যাড টানিয়া লইয়া বসিল।

বোধ করি সে কবিতা লিখিতেছিল—মন তখন তাহার কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল বলা কঠিন, কিন্তু তাহারই চেয়ারের অদূর পার্শ্বস্থিত কৌচখানির উপর 'ধপাস্' করিয়া পতনের একটা শব্দে সে বিসদৃশভাবে চমকিয়া উঠিল—তাহার ভাবের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পত্নী সুলেখা। সদ্য প্রসাধন শেষ করিয়া লোভনীয় সাজে আপনাকে সজ্জিতা করিয়াছে। পরণে তার আধুনিক রুচিসম্মত ম্যাজেণ্টা রং-এর সিল্কের ছাপা শাড়ী—হাতে সদ্য-আহরিত টকটকে লাল একটী সুবৃহৎ গোলাপ—পায়ে শাদা জরির ষ্ট্র্যাপ লাগানো ক্রেপ্ সোল্ স্যাণ্ডেল।

কলমটী টেব্‌লের উপর রাখিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে অভয় বলিল: কি ব্যাপার, বৃষ্টি মাথায় করে কোথাও চল্‌লে না কি?

সুলেখা সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া হস্তস্থিত গোলাপটী আপনার গালে বুলাইতে লাগিল। কিছু পরে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল: আমি শুধু একটা কথা তোমাকে জিগেস করতে চাই।

অভয় বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া পত্নীর দিকে খানিক চাহিয়া রহিল। পত্নী আর কোন কথা বলিল না দেখিয়া বলিল: কি বলো?

গোলাপটীর পাপড়িগুলি এক একটী বিচ্ছিন্ন করিতে করিতে সুলেখা বলিল: এই রকমই চলবে না কি?

—কি রকম?

গাম্ভীর্য্য দ্বিগুণ বাড়াইয়া সুলেখা বলিল: তাও খুলে বলতে হবে? রকমটা কি সত্যিই তুমি জানো না?

অভয় আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কিছু পরে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল: আজ তোমার কী হয়েচে বলো ত?

স্বামীর রুক্ষতায় বিচলিতা হইয়া বোমার মতো ফাটিয়া সুলেখা বলিল: হবে আবার কি? দুপুরে কলেজ থেকে ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে করে আর কাকে নিয়ে এসেছিলে শুনি?

কতকটা শান্ত হইয়া অভয় বলিল: ও, হতভাগা মেয়েটা বুঝি এসে লাগিয়েচে তোমায়? হ্যাঁরে ঝুনু—

সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা ঝরণা—ওরফে ঝুনু, বোধ করি অদূরেই কোথাও খেলা করিতেছিল। পিতৃ আহ্বানে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে সুলেখা বলিল: ওটুকু মেয়ের ওপর অত তম্বী কিসের? ঝুনু তুমি যাও, খেলা কর গে।

ঝুনু একবার পিতার এবং একবার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নিম্নকণ্ঠে অভয় বলিল: মেয়ে জাতটাই ভগবানের একটা গোলমেলে সৃষ্টি। গণ্ডগোল পাকাতে এদের যুড়ি আর কেউ নেই। তারপর সুলেখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: কেন, তোমায় বলি নি, আমাকে 'য়্যাসিষ্ট' করবার জন্যে ছায়াকে হাসপাতাল থেকেই 'য়্যালট্' করেচে। ওর-ও বাড়ী ত এইদিকে, তাই আমার ট্যাক্সিতেই এসেছিল।

ভ্রূকুটী করিয়া সুলেখা বলিল: শুধু হাসপাতালে, না

...তে-ও 'য়্যাসিষ্ট' করবার জন্যে বড়সাহেব ব্যবস্থা করে ...য়েচেন? সেখানে তবু দরজা জানলা খোলা থাকে, ...তে কি সেগুলোও বন্ধ করে 'য়্যাসিষ্ট' করবার কথা ...কি?

—দরজা জানালা বন্ধ ছিল, একথা তোমায় কে ...ছে? ঝুনু? হ্যাঁরে—

বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: কেবল ওকে নিয়ে পড়ছ ...? ও কিছুই বলে নি আমায়। আমি নিজে কি ..., না কালা? ঝুনুর মুখে খবর পেলুম তুমি ফিরেছ। ... ভেতরে আসতে দেরী হচ্চে দেখে, বাইরে কি করছ ...র জন্যে গিয়ে দেখলুম, দরজা বন্ধ ভেতর থেকে ...নের গলার আওয়াজ আসছে—মাঝে মাঝে হাসির ...রা-ও চল্‌ছে।

ব্যাপারটা লঘু করিবার উদ্দেশ্যে অভয় হাসিয়া ...ল: ও, এই। হাঁ হাঁ, আজ হাসপাতালের একটা রুগীর ...সে খিদের কথা আলোচনা হচ্ছিল বটে। কিন্তু জানলা ... ছিল, এ কথা তোমায় কে বললে? দরজা ত শুধু ...ম ছিল।

দ্বিগুণ বিরক্তির সুরে সুলেখা বলিল: থামো, থামো, ...য়েচে। আমি সব বুঝি।

...র সহিত অভয়ের কোন গূঢ় সম্পর্ক ছিল কি না ...ঠিন, কিন্তু পত্নীর কথায় হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে অভয় বলিল: ...মাদের 'বোঝা'র মানে করতে আমি ত ছেলেমানুষ, অনেক বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত পর্য্যন্ত হেরে গেছেন। ...জন পুরুষের পাশে একজন মেয়েকে দেখলেই—

বিপুল জোরে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: তোমার ... এ কথা শোভা পায় না। তারপর টেব্‌লের পাথরের ...র হাত ঠুকিতে ঠুকিতে রুদ্ধ রোষে সে হাতের ...গাছা শাখা গুঁড়া করিয়া ফেলিল।

তাহার একখানা হাত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া অভয় ...ল: ও কি হচ্ছে? সত্যি, আমি দেখচি তুমি দিন দিন ...ন ছেলেমানুষ হচ্চ। যাক্—কতকগুলো টাকার ক্ষতি ...করবার তা' ত হোল—আর কি বক্তব্য আছে বলো ...কি?

রাগিলে সুলেখার জ্ঞান থাকিত না। রুদ্ধরোষে ফুলিতে ফুলিতে গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল: আমি এখুনি বায়োস্কোপে যাব।

বিস্ময়ের সুরে অভয় বলিল: এখন বায়োস্কোপে যাবে কার সঙ্গে?—কোথায়?

—কার সঙ্গে আবার? ঠাকুরপোর সঙ্গেই যাব। কোথায় যাব তা' এখনো ঠিক করি নি, তবে যেখানকার টিকিট পাব, সেইখানেই ঢুকে পড়ব।

—তা' ছ'টার শো ত কোন্‌কালে আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন গিয়ে আর কি হবে?

ভ্রূকুটিপূর্ণস্বরে সুলেখা বলিল: ছ'টা অনেক আগে বেজে গেছে তা' আমি জানি, আমরা সাড়ে ন'টার ট্রিপে যাব।

দ্বিগুণ বিস্ময়ে অভয় বলিল: সাড়ে ন'টার ট্রিপে! তোমার মাথা খারাপ হলো না কি? অজয়ের কিসের বয়েস—ওর সঙ্গে এতরাত্রে যেতে চাও তুমি কোন্ দুঃসাহসে!

—বি-এ পড়বার মতো বুদ্ধি হয়েচে যে ছেলের, তাকে তুমি এখনো হয় ত নিজের কোন স্বার্থের খাতিরে ছেলে-মানুষ করে দেখতে পারো, কিন্তু আমি বলব, সে আমায় আগলাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েচে।

গম্ভীরকণ্ঠে অভয় বলিল: কিন্তু আমি বলচি—না, যাওয়া হবে না।

উচ্ছ্বসিত রোষে সুলেখা বলিল:—একথা বলবে তা' আমি জানি। কিন্তু এখুনি যদি সেই নার্স মাগী এসে বলত, চলুন, বায়োস্কোপে যাওয়া যাক্, তা' হ'লে বিনা দ্বিধায় মোটরে উঠে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে হয় ত গাড়ীতে 'ষ্টার্ট' দিতে বলতে।

অভয় হঠাৎ যেন একটু দমিয়া গেল। পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল: দেখ, বড্ড 'লিমিট্' ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি কিছু শুনতে চাই না। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না এখন। যেতে হয় কাল আমার সঙ্গে যেও।

হঠাৎ কৌচ্ ছাড়িয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া সুলেখা বলিয়া উঠিল: তোমার মতো অমন সঙ্কীর্ণ মনের লোকের সঙ্গে

যাওয়ার চাইতে আমার মতে শুধু বায়োস্কোপে কেন, কোন যায়গাতেই না যাওয়া ভালো।—বলিয়া রিষ্টওয়াচটা খুলিয়া টেবিলের উপর সজোরে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঘড়িটি অভয়ের গায়ে লাগিয়া টেব্‌লের উপর ছিটকাইয়া পড়িল।

পত্নীর আচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভয় 'গুম্' খাইয়া বসিয়া রহিল,। পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল :—যাবার মত দিলেই খুব বড়-মনের লোক হতুম নিশ্চয়।...পর মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া প্যাড্ মুড়িয়া একটা কোট টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

সুলেখা ছাদের হাতায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল। সে উপস্থিত থাকিবে এবং তাহারই চোখের সম্মুখে স্বামী এইরূপ অবহেলা দেখাইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাকে কিছুতেই তার মন প্রশ্রয় দিতে চাহিল না—সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।

তাহার বিবাহের প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতুল অজিত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছিল—দীর্ঘদিন পরে প্রবাস হইতে আজ ঘরে ফিরিয়াছে। তাহার নিকট যাইবার জন্যই সুলেখা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। মাঝে হইতে হঠাৎ কি হইয়া গেল! কিন্তু মুহূর্ত্তে সে নিজেকে স্থির করিয়া লইল। এই অজিতকে কেন্দ্র করিয়াই সে স্বামীকে সমুচিত শিক্ষা দিবে মনস্থ করিয়া অজয়কে একখানি গাড়ী ডাকিতে বলিয়া দিল। অজয়ের নিকট এ সম্বন্ধে সে কোন কথা লুকাইল না এবং তাহাকে এখনি মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিতে হইবে এ কথা-ও বলিল।

দাদাকে অজয় যথেষ্ট ভয় করে। অথচ, বৌদি'কেও কম ভালবাসে না। তাই সমস্যায় পড়িয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে সে বৌদি'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পাঞ্জাবীর একটা প্রান্ত ধরিয়া খেলা করিতে করিতে সুলেখা সহাস্যে বলিল : ভয় নেই গো, ভয় নেই তোমার। এ-খবরটা, অর্থাৎ, তুমি যে আমায় নিয়ে যাচ্ছ এ-কথাটা যাতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রকাশ থাকে, সেই চেষ্টাই তোমাকে করতে হবে। আমার কাছ থেকে এ খবর বেরুবে না, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো। তিনি ফি নিশ্চয়ই তোমায় আমার কথা জিগেস করবেন, ত বলো, গাড়ী ডাকিয়ে কোথায় চলে গেছি—রামদাসকে সেইরকম শিখিয়ে যাব। আমার এক মামা বিলে গেছেন এইমাত্র তিনি জানেন—কখনো তাকে চোখে দেখেন নি। তা' ছাড়া, মামা যে ফিরেছে, সে খবরও তি জানেন না। অতএব নির্ভয়ে তুমি আমায় পৌঁছে দি যেতে পারো। ট্যাক্সি করে যেতে-আস্‌তে আর ক সময় লাগবে?—অবশ্য তার মধ্যেই যদি উনি ফিরে আ এবং হাতে-নাতে পথে আমাদের আবিষ্কার করে সে হলো স্বতন্ত্র কথা।

ইহার পরিণাম কি হইতে পারে না ভাবিয়া নিত কৌতূহলের বশেই শেষ পর্য্যন্ত অজয় বলিল : বে তা' হ'লে একখানা টাক্সি ডেকে আনি, কি বলুন?

ট্যাক্সি আসিলে কন্যাকে লইয়া, বহুদিনের পুরা ভৃত্য রামদাসকে একটু টিপিয়া দিয়া সুলেখা অজ সহিত গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

'বউমা'র এই লুকোচুরির কোন হেতু খুঁজিয়া ন পাইলে-ও বৃদ্ধ রামদাস রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধের পরিণামে প্রভাব মনে মনে কল্পনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শূন্য বাড়ী আগ্‌লাইতেই মনোনিবেশ করিল। দাদাবাবুর জীবন যাত্রার পথে কোথায় যেন একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থি হইয়াছে বুঝিতে তাহার ছাপান্ন বছরের অভিজ্ঞ জীবনে বিলম্ব হইল না।

* * *

সুলেখাকে আরো একটু বেশীরকম ক্রুদ্ধ করিবা মানসে একটা জরুরী কাজের অছিলায় ছায়াকে লইয়া ইচ্ছা করিয়া একটু বেশী রাত্রেই অভয় বাড়ী ফিরিল। চির প্রথামত রামদাস দ্বার খুলিয়া দিল।

ছায়াকে দেখিয়া অভয় বলিল : চলুন, আপনি ওপরে বসবেন চলুন। বাইরে ঘরে আর এত রাতে বসে কা নেই। আমি একটু শুধু জলটল খেয়ে নেব। ততক্ষ আপনি ওদের সঙ্গে গল্প করবেন 'খন।

অগত্যা ছায়া তাহাকে উপরে অনুসরণ করিল। সুলেখা উপরেই আছে এবং তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিবার জন্য নিশ্চয় এখনও জাগিয়াই আছে কল্পনা করিয়া নিতান্ত অবান্তরভাবে উচ্চকণ্ঠে অভয় বলিল: নিশ্চয়ই এখানে আপনার খুববেশী অসুবিধা হবে না। এই টুকিটাকি খাটুনিটুকু যাতে আপনার পুরোমাত্রায় উশুল হয়, সে ব্যবস্থা কাল করে দেব।...

দ্বার ভেজান ছিল—ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বিছানার দিকে না চাহিয়াই অভয় বলিয়া চলিল: আপনি ততক্ষণ একটু খাটের ওপর বসুন, যদি কষ্ট হয় ত, না হয় একটু গড়িয়ে নিন্।—বলিয়া আড়-চোখে বিছানার দিকে চাহিল। আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, তাহাদের আলাপে সুলেখা ক্রোধে ফুলিতে থাকুক। কিন্তু শূন্য শয্যা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বুকটা বারেকের জন্য যেন 'ছ্যাৎ' করিয়া উঠিল। ঝুনুর ক্ষুদ্র স্থানটুকুও খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া ঝড়ের বেগে সে পাশের ঘরে অজয়ের অনুসন্ধানে গেল। দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। আরো একটু দমিয়া গিয়া ডাকাডাকি করিয়া সে তাহাকে তুলিল। তাহার মুখে পত্নীর যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিল, তাহাতে সে মোটেই সুখী হইতে পারিল না। বৌদি'র ইঙ্গিত মতো অজয় বলিল: অভয়েরই এক বন্ধুর সহিত তাহার যাইবার কিছু পরে বৌদি' বায়োস্কোপ দেখিতে না কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন।

অভয় তখন ছুটিল ভৃত্য রামদাসের কাছে। বেচারী তাহার ময়লা বিছানাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া মাত্র পুনর্ব্বার শয়নের যোগাড় করিতেছে, অভয় ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: হ্যাঁরে, তোর বৌমা কোথায়?

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের বৌমার সতর্ক বাণী তাহার স্মরণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রীতিমত ভয় পাইয়া থত-মত খাইয়া বলিল: তিনি মোটরে করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তবে যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা সে সঠিক জানে না।

সংবাদ শুনিয়া অভয় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল। ইদানীং সংবাদ-পত্রে মেয়েদের দুঃসাহসের যেরূপ নমুনা সে আজ কয়দিন হইতে পাইতেছে, তাহাতে সুলেখা সম্বন্ধে কতগুলি কুচিন্তা আসিয়া একযোটে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

* * *

মাতুল হইলেও অজিত সুলেখা অপেক্ষা বয়সে কয়েক মাসের ছোট। তাই তাহাদের সম্পর্ক ঠিক মামা ভাগ্নীর মত ছিল না; অর্থাৎ, কথাবার্ত্তায় আচরণে তাহারা ঠিক্ সমাজ নিয়ম মানিয়া চলিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুলেখা মাতুলকে চাপিয়া ধরিল: মামা, তুমি বিলেত থেকে ঘুরে এয়েছ, আজ বাদে কাল কোন অফিসের বড়সাহেব হয়ে বসবে, তখন হুকুম চালাবার অনেক লোক পাবে, আজ পাঁচ মিনিট মাত্র আমার হুকুম শোন, এই শুধু আমার মিনতি।

তাহার পিঠে আস্তে একটি চাপড় মারিয়া অজিত বলিল: এই ক'বছরেই অনেক কথা শিখে গেছিস সুলি—আগে যে মুখ দিয়ে কথা বেরোত নারে তোর? তা' বেশ, আজ রাত্তিরের জন্যে তুই-ই না হয় আমার মনিব হ'।

হাসিয়া সুলেখা বলিল: রাজী ত? তবে শোন। প্রথম নম্বর আমাকে এখুনি আমাদের বাড়ী পৌঁচে দিতে হবে। পৌঁচে দেবে বটে, কেন্তু সেখানে আজ আমার মামা হ'তে পারবে না। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিত লাফাইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল: তবে কি তোর চাকর হবো না কি?

ভ্রূকুটী করিয়া সুলেখা বলিল: ধ্যেৎ! চাকর কেন হবে? হবে আমার বন্ধু, যাকে বলে 'ফ্রেণ্ড।'

হাসিয়া অজিত বলিল: ব্যাপার কি বল দিকি! অভয়কে 'এপ্রিল ফুল'-টুল করবার মতলব করেছিস না কি? তোর কথা শুনে আমার বিলেতের ঐ দিনকার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে।

বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: দোহাই তোমার মামা, সে না হয় আর একদিন শুনব, আজ তুমি আমার কথাগুলো শোন লক্ষীটি।

গম্ভীর হইবার ভান করিয়া অজিত বলিল: বেশ, তাই

না হয় হবে। তবে আমি তৈরী হয়ে নি কি বল্? শুধু তোমার 'ফ্রেণ্ড' হলেই হবে ত, না শেষ পর্য্যন্ত শান্তিস্বরূপ অভয়ের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিস? বিলেতে মেয়েদের যা' সব কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখেছি—

বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: ফের বিলেতের কথা? বলেছি না, ও সব কথা আর একদিন শুনব।

* * *

ভৃত্য রামদাসের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চিত্তে অভয় পুনরায় উপরের ঘরে আসিল। ছায়া তখনও খাটের একপ্রান্তে স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় অজিতকে লইয়া সুলেখা ধীরপাদক্ষেপে উপরে আসিয়া পাঁচিলের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়াইল। অভয় ঘরে ঢুকিতেই ছায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল: দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে কাজ করছি বলে যে আপনি এমন করে আমায়...এ আমি একবারও ভাবতে পারি নি। পেটের দায়ে এবং স্বার্থের খাতিরে কাজ করতে বেরিয়েছি বলেই যে আপনার স্ত্রী আছেন বলে ওপরে নিয়ে এসে আবার অপমান করবেন, তা' হবে না। আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াব না। দরকার হ'লে আপনার ব্যবহারের কথা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দেব। তবু—

ঠিক্ সেই সময় সুপরিচিত খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে তাহার মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল।

—আসুন রমেনবাবু, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।—বলিয়া অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের ভিতর আনিয়া উপস্থিত করিল।

অবাক্-বিস্ময়ে ছায়া এবং অভয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলেখার মুখে চোখে যেন হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। এ যেন এক অদ্ভুত প্রহসন!

পুতুলের মতো অজিত আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই, অভয় কট্‌মট্ করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল।

বিন্দুমাত্র না দমিয়া সুলেখা বলিল: ইনিই সম্ভবতঃ তোমার হাসপাতালের সেই নার্স? তা' রাতদুপুরে ব্যাপার কি, কোন অসুখ-বিসুখ···

থতমতভাবটা একটু সামলাইয়া উচ্ছ্বসিত রোষে অভয় বলিল: ব্যাপার আমার?—না, তোমার? এ আমি কোনদিন কল্পনাও করি নি সুলেখা!

বিদ্রূপের স্বরে সুলেখা বলিল: কিন্তু করাই উচিত ছিল। অন্ততঃ, নিজের দিক্‌টা ভেবে দেখ্‌লে এ জন্যে অত দুঃখ-ও থাকত না।

এতবড় খোঁচাটা নীরবে হজম করা ছাড়া পথ ছিল না। সত্যই বড় দুঃখে অভয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুন জানি না, বিনা দোষে তোমাদের দু'জনার চোখেই আমি অপরাধী হয়ে রইলুম! আমাকে ভুল বুঝে রাগ করে তুমি গেলে বন্ধু নিয়ে হাওয়া খেতে, আর ভাগ্যে এত সব ছিল বলেই বোধ করি, আমি-ও তোমাকে আরো রাগাব কল্পনা করে নিতান্ত অপ্রয়োজনে এমন সময় ওঁকে এখানে এনে হাজির করলুম। তুমি নেই দেখে উনিও··

সুলেখা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল: থাক্, আর দুঃখ করতে হবে না তোমায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর সব কথাই শুনেছি, আর শুনে অবধি মনে মনে লজ্জাও পাচ্ছি! তোমার ভুল উনি বুঝতে পেরেছেন, সে জন্য উনি তোমায় ক্ষমা করবেন। আমার অজিত মামার নাম ত শুনেচ, ইনি আমার সেই অজিত মামা। আজই সকালে উনি বিলেত থেকে ফিরেচেন। দেখা করতে যাবার জন্যে সকালেই আমাদের দু'জনকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন। তুমি ত কোন কিছু না বলে রাগ করে কোথায় যেন চলে গেলে, অগত্যা আমিই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছলুম। যাক্, এখন তাড়াতাড়ি উঠে একটা বড় গোছের পেন্নাম করে ফেলো দিকি!

অবাক্-বিস্ময়ে অভয় অজিতের দিকে চাহিয়া রহিল। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর মাতাইয়া অজিত বলিয়া উঠিল: তুই বিলেতের মেয়েদের-ও হার মানিয়ে দিলি সুলি! সাধে কি কবিরা তোদের নাম দিয়েচেন—'সাপের জাত!'

শ্রীকার্ত্তিক শীল

সন্ধ্যার অতিথি

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। সারা প্রাবৃটাকাশ কাজল মেঘে ছাওয়া। পল্বল ভরে ওঠে বৃষ্টির জলে। আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ গতি পল্লী-পথ ডুবে যায়। দমকা হাওয়ায় তরু-শীর্ষ কাঁপে—প্রথম-প্রায় ভীরু কুমারীর মত।

সে দুর্য্যোগে অপরিসীম এক শূন্যতা কাঁদে বাইরের আকাশে বাতাসে। আলো কোথাও নেই···সব অন্ধকার —শুধু ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসে সজল বাতাস বেয়ে। প্রলয়ের দূত যেন নেমে আসে এতদিনের পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে তার নির্দ্দয় প্রহরণ দিয়ে। মানুষের সমস্ত কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না সেদিন।

কবিগুলোর ওপর রাগ হয়। এর মধ্যে সৌন্দর্য্য তারা খুঁজে পায় কোথায়। এর চেয়ে কোলকাতা ত' ঢের ভাল—থাকুক্ সেখানে পাটের কল,—থাকুক্ বাড়ীর পাশে বিরাট কারখানা,—তবু মৃত্যুর মত এমন নীরবতা সেখানে নেই—এমন ভয়াবহ স্তব্ধতা নেই—এমন সীমা-হীন শূন্যতা নেই।···

ধীরে ধীরে ডাকি—দুলারীর মা, চায়ের জল চাপিয়েছ কি?—উত্তর আসে—না বাবু; দুলারী না ঘুমোলে ত' হবার উপায় নেই। কিন্তু দুলারী ঘুমোয় না। অগত্যা বলে উঠি—ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি চা করো।

দুলারী আসে। ছোট একটা ছেলে। চুল-গুলো গভীর কালো—শিশু-সুলভ সারল্য সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। ওকে বসিয়ে দিই ছোট চৌকীখানার 'পরে—যেখান হতে দেখা যায় বাইরের বিরাট, কালো আকাশটাকে—জানলার গরাদে ধরে সে দাঁড়ায় তার কচি পায়ে ভর করে। বাইরে তখন চলে ভৈরবের প্রলয় লীলা। ঝাউ-গাছগুলো ঝড়ে ভেঙে যায়,—নারকেল গাছ দুলে ওঠে—সে তাই দেখে নিষ্পলক নেত্রে।

ঘরের মধ্যেটা পুঞ্জ অন্ধকারে ভরা। ধীরে ধীরে উঠে আলো জ্বালি,—সারা ঘর সে আলোয় হাসে। রাত জাগা একটা পাখী কেঁদে ওঠে সকরুণ সুরে—সে সুর দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে যায়।

ঝিমুনি লাগে আমার তন্দ্রালস চোখে। পেছন ফিরে বসি। স্তব্ধতায় সে ঘর ভরা—কেবল দুলারীর চঞ্চলতায় সে স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় মাঝে মাঝে। দু' তিনটে মিনিট কেটে যায় এই ভাবে।

হঠাৎ দুলারী যেন ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে—কে যেন তার কণ্ঠ-রোধ করে। সে অস্ফুট তীব্র আর্ত্তনাদ কেঁদে বেড়ায় আকাশে বাতাসে।

আমার তন্দ্রা ছুটে যায়—নিমিষে পেছন ফিরি। কিন্তু এ কী! কার অদ্ভুত কালো ছায়া-মূর্ত্তি চলে বেড়ায় যেন। কে যেন জান্‌লার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়—কার দৃঢ় ভুজ বন্ধনে যেন দুলারী কেঁপে ওঠে। দু'খানা হাত জান্‌লা দিয়ে এসে তার কণ্ঠ রোধ করে যেন।...বুঝি অশরীরী কোনও প্রেতাত্মা এ। আশঙ্কায় আমার মুখ শাদা হয়ে যায়—কাগজের মত। তবু সাহসে ভর করে বলে উঠি--কে ওখানে···?

লাণ্ঠানের খানিকটা মৃদু আলো বাইরে বিকীর্ণ হয়। সে ক্ষীণালোকে দেখা যায়—স্পষ্ট এক মানুষের মুখ—কোঠরাগত নিষ্প্রভ তার চোখ জ্বলে ওঠে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে—লম্বা চুল,—মুখের শ্রী নষ্ট হয়ে যায় অসংখ্য গোঁফ-দাড়িতে। সে মুখখানা হেসে ওঠে। বলে—অতিথি,—ভেতরে যেতে পারি কি?

আমার প্রায়-স্পন্দন-হীন বক্ষ আবার সজাগ হয়ে ওঠে এই সামান্য কথায়। অস্পষ্ট কম্প্র-স্বরে বলে উঠি—আসুন। সে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে। ভিজে লম্বা চুল বেয়ে জলধারা গড়ায়। একগাল হেসে সে বলে—জাঙ্গী-পাড়ায় যাব মশায়! দু'ক্রোশ বই ত' নয়—কিন্তু

যে ঝড় জল—ষেতে আর দিলে কই, তার উপর অন্ধকার...।

অশরীরী প্রেতাত্মা তবে নয়, মানুষ, আমারি মত মানুষ সে...আমারি মত জাগ্রত হৃৎপিণ্ড তারও অন্তরে কম্পিত হয়। দুঃখে-সুখে আমারি মত কাঁদে, হাসে—আমার মত বিস্মিত হয় ওঠা-নামার বৈচিত্র্যে। আঃ, কী তৃপ্তি! অনাবিল আনন্দে বুক দুলে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে দু'দণ্ড কথা কইবার সঙ্গী পাই। ঝিমিয়ে-আসা মন ক্ষণিক সঙ্গ লাভের আনন্দে উৎসাহ-শীল হয়ে ওঠে। ভাবি কত ভুলেই না ভরা মানুষের এই চোখ। সারা দেহে আনন্দের হিন্দোল বয়ে যায়।...

হেঁ, হেঁ, বিড়ি আছে মশায়—সে বলে ওঠে।

উঠে বসি, সিগার-কেশটা এগিয়ে দিই। বলি—তা' ভিজে জামাটা খুলে টাঙ্গিয়েই দিন্ না—শুকোগ্ ততক্ষণে—দুলারীর মা, চা তোমার হল, দু'কাপ নিয়ে এস শীঘ্রি।

এ্যাঁ, চা! তা' ভাল মশায়—বলে সে চারিদিকে চায় চঞ্চল ভাবে। ছেলেটি কী আপনার—দুলারীকে নির্দ্দেশ করে সে বলে ওঠে।

আজ্ঞে না,—বাড়ীর ঝির,—আমি বিবাহই করি নি।

করেন নি...বেশ, বেশ মশায়...করবেনও না। ওর মত পাপ দুনিয়াতে আর নেই। শেষে আমার মত অবস্থাও ত' হতে পারে বিয়ে করে...তা এ কি আপনার বসত বাড়ী? সে বলে ওঠে।

আজ্ঞে না, আমার বাড়ী কোলকাতায় কালীকিষণ লেনে। হপ্তাখানেক হল বদলী হয়ে এসেছি এখানে।

দুলারীর মা ঘরে ঢোকে—চায়ের পেয়ালা নিয়ে। বলে উঠি—দুলারীকে ভেতরে নিয়ে যাও—এখানেই হয় ত ঘুমিয়ে পড়বে।

হেঁ, হেঁ, আমার একটা ছেলে ছিলো মশায়—ঠিক্ ওই রকমই—তাই তো ওকে আদর করছিলাম বাইরে থেকে—কিন্তু কেঁদে ফেল্‌লে ও ভয় পেয়ে। শুনবেন আমার কাহিনীটা—সে বলে ওঠে। দু'চোখ তার জলে ভরে যায়—কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সে অশ্রু-ধারা।

সহানুভূতির স্বরে বলি—শুন্‌বো, কিন্তু চা-টা জুড়িয়ে যেতে পারে,—আগে খেয়ে নিন।—

অতিথি সুরু করে—

পাগল আমি নই মশায়, কিন্তু এ তারি পূর্ব্বাবস্থা। পাগল হলে কোনও কষ্ট থাকে না মানুষের—সব সে ভুলে যায়, নিজের নামও। ভোলার নেশা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু এ অবস্থাটাই বড় ভয়ানক,—তা হোক, হেঁ হেঁ, শুনুন মশায়।

জাঙ্গীপাড়ায় আমার বাড়ী ছিল। বাপ কিংবা মা কেউ তখন বেঁচে নেই। এত বড় পৃথিবীতে আমি তখন একা, নিতান্তই একা, সম্বল কিছু নেই—থাকার মধ্যে ছিল অকৃত্রিম বন্ধু সলিল, অবস্থা তার ভালই। হাত পেতে দাঁড়ালাম তার কাছে।

বিমুখ আমায় করলে না—সে যাত্রায় বেঁচে গেলুম তার সাহায্য আর অনুকম্পা পেয়ে—মনে মনে তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

দুটো বছর কেটে যায়। আমার অবস্থার উন্নতির সুরু হল। অমনি ছুটে এল পাড়াপড়শীর দল। বিয়ের জন্যে তাগিদ সুরু করে নিত্যই। ভাবি—কথাটা মন্দ নয়—একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য কিছু দরকার—তা ছাড়া রোগ-দুঃখে দেখবে কে?

সলিল মেয়ে দেখে আসে,—পছন্দও হয়।

ফাল্গুনেই শুভপরিণয় শেষ হয়ে যায় চাঁপাডাঙার যমুনার সঙ্গে।

তারপর কী সুন্দর আর মধুর লাগলো এই জীবনটাকে। জীবনকে সুন্দর করে দেখা সেই আমার প্রথম আর সেই আমার শেষ। দিনগুলো আনন্দেই কাটে। সলিলকে ভুলি নি তা বলে। সে প্রত্যহ আসে আমার কাছে আর কলহাস্যে আমাদের বাড়ী আনন্দ-মুখর করে তোলে। তার সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে যমুনারও ভালবাসা গিয়ে পড়ে তার ওপর।

সলিল বলে ওঠে,—আচ্ছা বৌদি, যেদিন তোমায় দেখতে যাই অমন করে হেসে পালালে কেন?

কি জানি কেন যমুনার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

সে তামাসায় আমিও যোগ দিই,—বলি,—জানিস না কি, বর চিনতে যে তোর বৌদি ভুল করেছিল। সলিল হাসে,—আমিও হাসি। যমুনা কিন্তু চটে যায়। রাগে চোখ ছুটো লাল করে আমার দিকে তাকায়—কী সুন্দর সে কটাক্ষ!

এমনি হাসি-তামাসার মধ্যে দিয়ে ছুটো বৎসর গড়িয়ে যায়।

একদিন আমার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অনির্বচনীয় আনন্দে দেহের তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে। শিশু বাড়ে শশীকলার মত। কত রঙীন কল্পনা দোলা দেয় মনে। আমি বলে উঠি—যমু, পূজো ত আসছে, খোকার কিছু পোষাক নিয়ে আসি কোলকাতা থেকে, ছু একটা কাজও সেরে নেব অমনি। সে সায় দেয়। পরের সকালেই বেরিয়ে যাই। কিন্তু ছুদণ্ড তিষ্ঠুতে পারি না সেখানে—খোকার মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়। তার আধো-আধো ভাষা কানের চারপাশে বাজতে থাকে মিষ্ট হয়ে। অগত্যা ফিরেই আসি ছুদিন পরে।

রাঙামাটির পথ বেয়ে চলি। রাঙ্গচিতায় ঘেরা আমার চূড়াটা দেখা যায়। ভাবি—যমুনা হয় ত' তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালায় এখন। খোকা জেগে আছে হয় ত'—আমায় দেখে এখুনি ছুটে আসবে মাতালের মত অসংলগ্ন পা ফেলে।

ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করি, নিথর, নিস্পন্দ সব। বুকটা নিমিষে কেঁপে ওঠে। ডাকি—যমু। উত্তর আসে না। কেবল প্রতিধ্বনি আমায় ব্যঙ্গ করে। সন্ধ্যার বাতাস হাহারবে গড়াগড়ি দেয় শূন্য প্রাঙ্গনের পরে। সীমা-রেখাহীন রিক্ততা গুমরে কাঁদে জমাট অন্ধকারের মাঝে।

কথাগুলো শেষ করে অতিথি হাঁপিয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়। সজল চোখের ছুবিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নিশির শিশিরকণার মত।—কই, জল ত ধরলো না এখনও,—ধরবেও না বোধ হয়;—হেঁ হেঁ, যদি অনুমতি করেন ত' এখানেই আজকের রাতটা।—সে বলে ওঠে।

ঘড়িতে তখন নটা বাজে।

আমার মনও সহানুভূতিতে ভরে যায়। বেশ ত' আপনার অসুবিধে না হলে মাঝের ঘরটা ছেড়ে দিতে পারি—ওই যে ছুলারীর মা'র পাশের ঘরটা,—কিন্তু তারপর কি হল,—আমি জিজ্ঞাসা করি।

—তারপর হেঁ, হেঁ,...বুঝতে পারেন নি বুঝি, আমার অকৃত্রিম বন্ধু সলিলের সঙ্গে সে পালিয়েছে—আমার খোকাকে নিয়ে। কত খুঁজেছি আমার খোকাকে,—কিন্তু আজও পাই নি। এবার কান্না রোধ করবার সামর্থ্য তার থাকে না। ছোট ছেলের মত হাউহাউ সে কাঁদে।

রাত গভীর হয়ে ওঠে। মাঝের ঘরে বিছানা পাতা হয় নবাগতের জন্যে। আমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসে। শুয়ে শুয়ে ভাবি এই অবসন্ন জীবনেতিহাস। ভাবি—সংসারে এমন অনেক লোকই আছে—গভীর আঘাতের সংস্পর্শে এলে যারা প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। একটু স্নেহ-অনুকম্পার প্রত্যাশী হয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কে খোঁজ রাখে তাদের। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি কখন।

•

ভোরের সোণালী রোদে তখন ঘর ভরে ওঠে। বিহঙ্গ কলকণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। গত রাত্রের দুর্যোগের স্মৃতি মনেও থাকে না। কী একটা কোলাহলে জেগে উঠি। ঘুম ভেঙ্গে যায়। কার যেন কাতর ক্রন্দনে বায়ু-স্তর ভারী হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। এ কণ্ঠস্বর ছুলারীর মা'র। আমার মাথা ঘুরে যায়—শিরায় শিরায় রক্ত ছোটে। কী বীভৎস, কী করুণ সে দৃশ্য! কে ছুলারীকে যেন কণ্ঠরোধ করে মেরেছে। আঙ্গুলের রেখাগুলো ত' স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ছুলারীর মা কাঁদে অঝোর ধারায়।

মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে যাই। অনেক

লোকজনে সে স্থান ভরে যায়। পারলেন না মশায় ধরে রাখতে—ইনসপেক্টর বলে ওঠে আমায় দেখে।

বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করি,—কাকে?

কেন, পাগ্‌লা পাতঞ্জলকে,—রামদীন,—কটা খুন কর্‌লো একে নিয়ে? পাঁচটা না?—ইনসপেক্টার বলে ওঠে।

—হ্যাঁ বাবু পান্‌ঠো—মল্লিকবাবুকে লেড়কা; এক,—পঞ্চানন বাবুকো; দো,—আউর...

চেঁচিয়ে উঠি—পাগলা পাতঞ্জল!—কে সে?

—চেনেন্‌ না তাকে, মাথায় লম্বা লম্বা চুল,—বাঁদিকের ভ্রূর ওপর কাটা দাগ। ক্রোশ দুয়েক উত্তরে থাকে। লোকে বলে তার একটা ছেলে ছিলো—ভালবাসতো তাকে প্রাণের চেয়েও—তারই বউ না কি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়—সেই শোকে সে পাগল। কথা-বার্ত্তায় বোঝ্‌বার উপায় নেই কিন্তু। বেশ কথাবার্ত্তা কইবে। কিন্তু ছেলেপুলে দেখলেই ওই রকম ভাবে মেরে রাখে—খুনের নেশা জেগে ওঠে। নিজের ছেলে হারিয়েছে, অপরের দেখলে হিংসে হয়—তাই ভাবে এদেরই বা থাকে কেন তবে।...চেনেন্‌ না বুঝি তাকে? ইন্‌সপেক্টর বলে ওঠে।

—চিনি, আমি তাকে চিনি—এ ত' পাতঞ্জল নয় এ যে আমার সন্ধ্যার অতিথি! ঝড়ের বেগে ছুটে যাই মাঝের ঘরে। হাহা করে ঘর-খানা হেসে ওঠে।... অতিথি নেই।

গত সন্ধ্যার একটা ছবি ভেসে বেড়ায় আমার চোখের সামনে—

দুলারী দাঁড়িয়ে থাকে জান্‌লার ধারে—নীরব নিস্পন্দ সব...বাইরে ঝড়বাতাসের তুমুল মাতামাতি কার কালো ছায়া-মূর্ত্তি ঘুরে বেড়ায়—প্রকাণ্ড দু'খানা হাত এগিয়ে আসে তার কণ্ঠরোধ কর্‌তে।

আমার মাথাটা ঘুরে ওঠে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি অর্থহীন ভাবে। শুধু দুলারীর মা'র অন্তর্ভেদী কাঁদনের সুর আমার কানের চার পাশে বেজে ওঠে—ফিরে আয়, তুই ফিরে আয়...!

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

চোর

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

নিঝুম নিশীথের কালো অন্ধকার। পল্লীপ্রান্তের নিরালা কুটীরখানি সেই কৃষ্ণতায় নিজেকে ঢাকিতে পারিয়া একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে। যা হোক তবু, কয়েক ঘণ্টার জন্যও নিজের জীর্ণ দরিদ্র দেহখানিকে লোকচক্ষুর ব্যর্থ কুটিল করুণা হইতে—তাচ্ছিল্যের—নিন্দার করুণা হইতে সে বাঁচাইতে পারিল তো।

যদি ভাবা যায় যে, ওই ঘরখানির ভিতরে পাতা আছে এক শয্যা, না ভাবিয়া যার বিশেষণ দেওয়া যায় 'দুগ্ধফেন-নিভ', আর সেই শয্যার কোলে নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় রহিয়াছে কোনো এক খেয়ালী লক্ষপতি, তবে তা হবে খাপছাড়া কল্পনা। এবং সত্যই যদি তাই হয়, তবে সে হয় রীতিমত 'রোমান্স।'

কিন্তু কুটীরের ভিতরের বিনিদ্র বেকার যুবকটি—আপনার রূপের এবং অর্থের অতি দৈন্য লইয়া রোমান্সের স্বপ্নও কোনোদিন দেখার দুঃসাহস সে করে না।

দীনেশের ঘুম পাইতেছিল না। পাওয়া অসম্ভব। দুইদিন ধরিয়া উদরে শুধু মাত্র সলিলের শূন্যতা লইয়া ঘুমাইতে কেহ পারে? দুইদিনই,—আজ রাত্রিটা কাটিয়া গেলেই পরিপূর্ণ দুইদিন সে উপবাসী। পরশু রাত্রে নিজের শেষ পয়সাখানি দিয়া সে চিঁড়া কিনিয়া খাইয়াছে। মুড়ি নয়—মুড়কী নয়—চিঁড়া, কারণ তা বেশীক্ষণ পেটে থাকিবে।

কিন্তু এক পয়সার সে চিঁড়া কোন্‌কালে পেটের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর যতবার ক্ষুধার তীব্রতা অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, ততবারই সে শুধু জল খাইয়াছে—শুধু জল। আর কিছু না। এই জল পাওয়ার জন্য ভগবানকে যত দিয়াছে, তার বেশী ধন্যবাদ দিয়াছে সে পুকুরের মালিককে। কারণ জলের জন্য তিনি পয়সা নেন না। নেন না কেন? দীনেশ বিস্মিত হয়। এবং তার চেয়েও বেশী করিয়া সে ধন্যবাদ দিয়াছে দেশের শাসককে, কারণ জলের উপর 'ট্যাক্স্‌' বসাইয়া পুকুরের মালিককে তার দার দাম নিতে তিনি বাধ্য করেন নাই। অসীম দয়া!

পুকুর যাঁর দয়া তাঁর সত্যই আছে। তা না হইলে নিজের ভুখাকাতর দেহখানিকে দীনেশ রাখিত কোথায়? অনেক জায়গায় ব্যর্থ ঘুরিয়া এখানে আসিয়া মাসিক তেরো টাকা মাহিনায় কাপড়ের কলের কুলি-গিরিটি জুটাইতে পারিয়া ভারী ভাবনায় সে পড়িয়া গিয়াছিল, থাকিবে কোথায়।

এ ভদ্রলোক তখন তাঁর শূন্য বাগানবাড়ীর জীর্ণ কুটীরখানি তাকে থাকিতে দিয়াছেন। দীনেশ বর্তিয়া গিয়াছে। দুইমাস হইল চাকরীটি তার নিতান্ত বিনা কারণেই গিয়াছে। কর্মচারী কমাইয়া মিলের কর্তৃপক্ষ খরচ কমাইয়াছেন। হাজারো টাকা যেখানকার আয়, মাসিক তেরো টাকা বেশী খরচ করিয়া দীনেশকে প্রাণে বাঁচার সুযোগ দিলে কি এমন ক্ষতি তাঁদের হইত, তা সে বুঝে না।

গত কালও সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। তিনি তাঁর পুরাতন পরিচিত বহু-উচ্চারিত সেই জবাব দিয়াছেন, চাকরী খালি নাই এবং সত্বর-ভবিষ্যতে খালি হওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে নাই। দীনেশ সারা দিনের উপবাসী, তা শুনিয়াও চারটি পয়সাও তাঁর হাতে উঠে নাই।

যাঁদের আছে তাঁরা, যাদের নাই তাদের উপরে এত নির্দ্দয় কেমন করিয়া হইতে পারে! আশ্চর্য্য! পেটের ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি যখন জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, তখনো মুখ ফুটিয়া লোকের দুয়ারে ভিক্ষা চাওয়ার মত

দুঃসাহস কেন সে করিতে পারে না, একথা ভাবিয়াও দীনেশ কম বিস্মিত হয় না।

আজিকার সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কাহারো কাছে সে হাত পাতিতে পারে নাই, হয় তো ক্ষুধার দাহন সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই বলিয়াই। এখন, কোনো লোকের দেখা মিলার সম্ভাবনা এখন নাই। থাকিলে, এ অবস্থায় দীনেশ হয় তো যার তার কাছে হাত পাতিয়া বলিতে পারিত,—একটা পয়সা দয়া করে আমায় দিন, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি। কিন্তু জনহীন রাতে কোথায় মানুষ। ভিখারী আসার সম্ভাবনায়ই বা কোন পুণ্যকামী এখনো জাগিয়া আছে? কেহ নাই।

উঃ! আর সে পারে না। ক্ষুধায় সে মরিয়া যাইতেছে। তাই বা যাইতেছে কই? মরিলে তো বাঁচিত সে, বাঁচিত।

কষ্টে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরের কোণে গেল। মাটির কলসীতে জল আছে। এক গেলাস ঢালিয়া লইল। ঢক ঢক করিয়া নিঃশেষে গিলিয়া ফেলিল। পেটের ভিতর একটা মোচড় খাইয়া গেল। এবং একটু পরেই বমি হইয়া সব জল বাহির হইয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ভগবান! জল, বিনা পয়সার জল তার পেটে থাকিবে না?

দীনেশের ভয় হইল। সত্যই সে মরিয়া যাইবে? অথচ একটু আগেই সে মনে করিয়াছিল, মৃত্যুর চেয়ে বড় কাম্য এ অবস্থায় তার আর থাকিতে পারে না কিছু।

হতভম্ব হইয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কিছুই ভাবিতে পারিল না। মাথার ভিতর কতগুলি পোকা যেন কিলবিল করিয়া ঘুরিতেছে। নড়িবার কোনো চেষ্টাও সে করিল না। হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া রহিল।

জল, শেষে জলও সে খাইতে পারিবে না?

আবার একগ্লাস জল সে ঢালিল। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল। তার মনে হইয়াছিল একবার যে, খালিপেটে অতগুলি জল একেবারে খাইয়াছিল বলিয়াই বমি হইয়াছে। ধীরে ধীরে সবটুকু জল সে খাইয়া ফেলিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এবারে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়ায় তাই অনুভব করিতে চাহিল। নড়িল না। পাছে নড়াটাই যদি বমি হওয়ার একটা কারণ হইয়া দাড়ায়। ওই জলটুকুকে তার সবখানি চেষ্টায় পেটের ভিতর জমাইয়া রাখিতে চাহে। বাঁচিতে চাহে সে।

কতক্ষণ কোনো উপদ্রব দেখা গেল না। একটু পরেই কিন্তু পেটে মৃদু বেদনা সে অনুভব করিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিছানায় আসিল। পেটের তলায় বালিশ চাপা দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তাতে একটু আরাম পাওয়া গেল। ক্রমে ব্যথাটা আর বোধ হইল না এবং দীনেশের দুটি চোখ পাতলা একটু ঘুমের আমেজে মুদিয়া আসিল।

কতক্ষণই বা? পনেরো মিনিট। তারপরই সে জাগিয়া গেল। কেমন অস্বস্তি বোধ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। হঠাৎ আবার বমি হইয়া সবগুলি জল পড়িয়া গেল। বিছানা ভাসিয়া গেল। একটু সামলাইয়া নীচে নামিবার অবকাশটুকুও সে পাইল না।

বমি করিয়া দীনেশ হাঁপাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সত্যই কি বাঁচিবে না? কি খাইয়া বাঁচিবে?

কি করিবে—এখন সে করিবে কি? কি করা উচিত? কে বলিয়া দিবে। কিছু ভাবিয়া স্থির করার মত অবস্থা নয় তখন।

অনাহারে মৃত্যু কি রকম? আর কতক্ষণ পরেই তার দেহটি নিঃসাড় হইয়া পড়িবে না কি। তারপর হয় তো নিঃশ্বাসও পড়িবে না। পরদিন যদি কেহ কোন কাজে আসে এদিকে, তবে আবিষ্কার করিবে যে দীনেশ মরিয়াছে। তারপর তার মৃতদেহটীকে গোর দেওয়া হইতে পারে অথবা গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইবে হয় তো। আর, কেহ যদি না দেখিতে পায়, তবে তার শবদেহটি এই ঘরেরি ভিতরে—এই বিছনারি উপরে পচিয়া গলিয়া থাকিবে। শিয়াল কুকুরে মহাআনন্দে তা কাড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।

দৃশ্যটি কল্পনা করিতে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল।

মা বাবা দীনেশের নাই। ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সবাই এখন হয়তো ভাবিয়াই পাইতেছে না যে, কেন সে দুইমাস ধরিয়া টাকা পাঠান বন্ধ করিয়াছে। চাকরী যাওয়ার পরে সে একখানি চিঠিও বাড়ীতে লেখে নাই। লিখিয়া লাভ নাই। তার বেকারত্বের দুঃখ বুঝার কেহ সেখানে নাই।

কিন্তু এমন করিয়া সে মরিতে পারে না। অসম্ভব। আর সে এমনই বা কেন? নিজের উপরে তার রাগ হইল। পেটের ক্ষুধায় যখন মরিয়া যাইতেছে, তখনো লোকের কাছে চাহিতে কেন সে পারে না!

দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এত রাত্রিতে সে যাইবে কোথায়? বাজারে খাবার দোকান অনেকক্ষণ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে নিশ্চয়ি। খোলা থাকিলেই কি বাকীতে সেখানে খাবার পাওয়া যাইবে? যাইবে না? দোকানদার কি এত নিষ্ঠুর যে, দুই দিনের উপসী জানিয়াও কিছু তাহাকে খাইতে দিবে না।

দীনেশ বাহির হইয়া পড়িল।

দুই দিনের উপবাসী। কি অকর্ম্মন্য শরীর তার? কত রাজবন্দী যে কত দিন ধরিয়া অনশনে থাকে, তারা তো মরে না। আর দুই দিনেই সে মরিয়া যাইবে?

কিন্তু রাজবন্দীরা অনশনে থাকিতে পারে, একটা উত্তেজনা থাকে বলিয়া। দীনেশ কিসের উত্তেজনা লইয়া বাঁচিবে। উপার্জ্জনহীন জীবনে কোন উত্তেজনা নাই। নিরাশার শীতলতায় এমনি সে মরিয়া থাকে। তাই দুদিনের উপবাসকে সে সহিতে পারিতেছে না।

আর দিনের পর দিন অনাহারে থাকিয়া নাকের ডগায় নিশ্বাসটুকু লইয়া বাঁচিয়া থাকায় তাহার কি লাভ? তার চাইতে কিছু খাবার পাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিলে পাঁচ জায়গায় চাকরীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারে সে।

দীনেশ চলিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীর। পা উঠিতে চায় না। না, আরো দুর্ব্বল হইলে তার চলিবে না। নূতন চাকরীর খোঁজ তাকে করিতে হইবে।

পথের দুইপাশের বাড়ীগুলি নিঃশব্দ ঘুমন্ত। এসব বাড়ীর লোকগুলি কি নিশ্চিন্তেই না ঘুমাইতেছে। দীনেশের মত দুর্দ্দশায় পড়িয়া ঘুমাইতে পারে না বলিয়া কেহ জাগিয়া নাই।

খাবার দোকানে যাইয়া দোকানীকে হাঁকডাক করিয়া যদি জাগাইয়া তোলা সম্ভব হয়, সে খাবার দিবে কি? যদি না দেয়—

একটা কাঁচা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দীনেশ দাঁড়াইল। মিলে যখন সে কাজ করিত, তখন এ বাড়ীতে একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রন পাইয়াছিল সে। এ বাড়ীর একটি ছেলেও মিলে কাজ করিত। অন্য মিলে এখন ভাল কাজ সে পাইয়াছে। তার বিবাহে এ মিলের সব বাঙালী কর্ম্মচারীকে সে নিমন্ত্রন করিয়াছিল।

সেদিনকার ভোজ্যগুলির দৃশ্য মনে ভাসিয়া উঠিতেই দীনেশের ক্ষুধা যেন হাজারগুণ বাড়িয়া উঠিল।

আচ্ছা, ওদেরকে ডাকিয়া জাগাইলে কেমন হয়? জাগাইয়া যদি সে খাইতে চায়, তবে কি দিবে না ওরা? যদি জানায় যে, দুইদিনের সে উপবাসী তবু দিবে না, নিশ্চয়ই দিবে। বাঙালী কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে?

বাড়ীটার চারিদিকে প্রাচীর নাই। কাঁটাতারের বেড়া আছে। বড় বড় কাঁচা ঘরগুলি—করগেট টিনের চাল। অবস্থা মন্দ নয় ওদের। পাকা বাড়ী করিতে পারে শীঘ্রই। বাঁশের তৈয়ারী ফটক খুলিয়া দীনেশ বাড়ীতে ঢুকিল।

কোন দিকে টুঁ শব্দটী নাই। ঘরগুলিও যেন ঘুমাইতেছে। সম্মুখে গিয়াই বাঁদিকে ওদের রান্নাঘর। নিমন্ত্রনে আসিয়া দীনেশ দেখিয়াছে।

ওই ঘরের এককোণে নিশ্চয়ই রহিয়াছে একটি হাঁড়ী—সে পিতলের হোক আর এলুমিনিয়ামেরই হোক। মাটিরও হইতে পারে। তার আশেপাশে আছে তিন চারিটি

লোহার কড়াই, কয়টি বাটি, হাতা, খুন্তী—এমনি রান্নার সব সরঞ্জাম।

দৃশ্যটা দীনেশ যেন দেখিতে পাইতেছে।

হাঁড়িটির মুখের ঢাকা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে চার্‌টিখানি ভাত তার তলায়। বাঙালীর বাড়ীর হাঁড়িতে, দীনেশ জানে, একজন লোকের ভাত অন্ততঃ থাকেই। আর একটি কড়াইতে হয়তো ঢাকা আছে একটু তরকারী; আরেকটিতে একটু মাছের ঝোল।

মাছের ঝোল!

দীনেশ ডাকিয়া উঠিল,—কে আছেন বাড়ীতে?

আর না ডাকিয়া সে থাকিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠ। কেহই সাড়া দিল না। সেই একটুখানি শব্দে নিথর নিশীথ থম্‌থম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল দীনেশের মন। চুপ করিয়া সে দাঁড়াইল খানিকক্ষণ।

ক্ষুধা। তার কাছে ভয় মানিল পরাজয়। ওই ঘরের হয়তো ওই কোণটিতে আছে ভাত তরকারী—

তার মনে আসিল নূতন ভাবনা। না, ওদেরকে ডাকিয়া জাগাইয়া কাজ নাই। এত রাতে ঘুম ভাঙার বিরক্তিতে দীন-বাৎসল্য তাদের যদি ঢাকা পড়িয়াই যায়?

আর একটুও শব্দ না করিয়া দীনেশ পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া চলিল—রান্নাঘরের দিকে।

জাগিয়া কেহ নিশ্চয়ই নাই। থাকিলে তার ডাকে সাড়াই দিত। দীনেশ খাইতে আরম্ভ করিলে কেহ যদি টের পাইয়া যায়? যাইলেই বা। অতখানি ক্ষুধা লইয়া একজন লোক তাদের বাড়ীতে দুটি ভাত খাইতে দেখিলে মনে তাদের দয়ার উদয় হওয়াই তো উচিত। আর তাদের স্বজাতিই দীনেশ।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ভাতের হাঁড়িতে তার হাত ঠেকিল। পুলকে অন্ধকারে দুটি চোখ তার জলিয়া উঠিল। ভগবান!

আ-স্তে, খু-উ-ব আস্তে হাঁড়ির মুখের ঢাকা সরাইয়া সে ভিতরে হাত দিল। সত্য তার অনুমান। ভাত আছে অনেক।

তরকারী? যদিও এ দারুণ ক্ষুধা লইয়া তরকারীর খোঁজ করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়; তবু তরকারীর খোঁজ সে করিল। মিলিয়া যায় যদি তো সোনায় সোহাগা।

মিলিল। পাশে একটি ধামার তলায় একখানি ছোট রেকাবীতে—এনামেল করা লোহার রেকাবী, তা বুঝা গেল—পাওয়া গেল দুইটি তরকারী। কি তরকারী কে জানে? তরকারী—ভাতকে মুখরোচক করিয়া তোলার দুইটি উপাদান—ব্যস্!

দীনেশ সেই রেকাবীতেই ভাত তুলিয়া লইল। ক্ষুদ্র রেকাবীতে যা ধরিল তা ছাড়া হাঁড়ির মুখের সরায় করিয়াও লইল। তাকে যে অনেক খাইতে হইবে। কি প্রচণ্ড তার ক্ষুধা!

ভাত তরকারী উনুনশাল হইতে একটু তফাতে লইয়া রাখিয়া সে খাইতে বসিল।

একটা তরকারী একটু খারাপ হইয়াছে। হোক। খারাপ-ভাল দেখার অবস্থা তার নয়। গপাগপ কয় গ্রাস সে গিলিল।

তৃপ্তি—আঃ, কি তৃপ্তি!

একটু খাবার জল হইলে ভাল হয়। সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাছেই—হাতের নাগালের মধ্যে কি একটা অন্ধকারে একটু চক্‌চক্ করিতে লাগিল। ঘটি বা গেলাস বা এমনি কিছু হইতে পারে। দীনেশ হাত বাড়াইল।

হাত ঠেকিয়া কি কতগুলি বাসন-কোসন পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। তার বুকের ভিতর খচ্ করিয়া উঠিল।

—কে—কে! সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠিল। বেশী দূর হইতে নয়। সেই ঘরেরি ভিতর হইতে। রান্নাঘরেই যে সে বাড়ীর ঝি শোয়, তাতো দীনেশের জানা থাকা সম্ভব নয়।

দীনেশ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। ভয়ে সে ছুটিয়া

পলাইতেও পারিল না। মনকে সে বুঝানর চেষ্টা করিল রে, তার অবস্থা জানিলে দয়াই ওদের হইবে। কিন্তু কার দৃঢ় হাত তার বুকের ভিতরের হৃৎপিণ্ডটিকে এমন জোরে াকড়াইয়া ধরিয়াছে, নিশ্বাস তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতে ায়।

ছ্—অ—ৎ করিয়া দিয়াশলায়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল। রা পড়িল দীনেশ। ঝি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, -চোর—চোর! মুহূর্ত্ত কয়েক। তারপরেই হুড়হুড় রিয়া বাড়ীর লোক সব ছুটিয়া আসিল।

হাতে হাতে চোর ধরার উত্তেজনায় দীনেশের নিজের থাটা কাহারো কানে গেল না। হিড়হিড় করিয়া সবাই াকে টানিয়া আনিল উঠানে। তারপর যে প্রহার চলিল, মন দুর্ব্বল দেহে তারপরেও মানুষের বাঁচিয়া থাকা েহের দৃঢ়তার বিস্ময়কর প্রমাণ।

মার থামিতে একজন বলিয়া উঠিল,—এ যেন চেনা চেনা ঠেক্‌ছে?

দীনেশের আশা হইল। এতক্ষণে চিনিতে পারিয়াছে া হোক। আরেকজন লোক আলোটি তার মুখের কাছে ধরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল,—এ যে ঠাকুরবাগানের লোকটি হে।

দীনেশের আশা এবার জোর পাইল। মিথ্যা আশা কিন্তু। একজন মন্তব্য প্রকাশ করিল,—কাপড়ের কলটা হয়ে চোর-ছ্যাঁচোড়ে গাঁ ভরতি হয়ে গেল দেখছি।

দীনেশের কান ধরিয়া আগের লোকটি বলিল,—চুরি করবার আর জায়গা পাও নি বাপধন। যে গাঁয়ে থাকো, শেষে সেই গাঁয়েই চুরি? চলো এবার থানায়।

দীনেশের এবার আশার ধারা গেল উল্‌টা দিকে। যাক্, জেল যদি হয় তো খাইয়া বাঁচিতে অন্ততঃ পারিবে সে।

প্রবীণ গোছের একজন লোক তখন গল্প ফাঁদিয়াছেন—কেমন করিয়া চোরেরা আজকাল গেরস্তের ভাত আগে মারিয়া পেটঠাণ্ডা করিয়া তারপর চুরি করে এবং কতবড় সেয়ানা আজকাল চোরেরা হইয়াছে—তাই লইয়া।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রতীক্ষার শেষ

শ্রীপ্রকাশ বসু

পূর্ব্বদিগন্তে উদয়োদ্যত রবির মৃদুল আভায় একরাশ সাদা পালকের মতো হাল্কা মেঘ গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল। ভোরের বাতাস পুষ্প পরিমলে ভরা,—ভোরের আকাশ নিশার শেষ আর প্রত্যুষের মিলন মুহূর্ত্তটির লজ্জানিবিড় অরুণিমায় রঙীন্।

অর্ণবের ঘুমের ঘোর তখনো কাটে নি—অন্য ঘরে কণিকা তার মধুর তরুণ কণ্ঠে প্রভাতী ধরেচে। তার গানের সুর অর্ণবের তন্দ্রালস কাণে স্বপ্নস্নিগ্ধ মধুরিমায় ভরে উঠ্‌ছিল, সে ভাব্‌ছিল—"যদি পৃথিবীটা শুধু ঘুমে জাগরণে মেশা প্রভাতী গানের সুরে ভরা হতো—" কিন্তু সম্মুখেই পড়ে আছে দীর্ঘ নিরানন্দ অলস দিনটি। তার মুখে অতৃপ্তি ও ক্লান্তির রেখা ধীরে ফুটে উঠ্‌ল।

খানিক পরে যখন সে নীচে নেমে এল, তখন কণিকা বিচিত্র চিত্র আঁকা সৌখীন পেয়ালায় চা ঢালছিল; অর্ণব বল্লে,—"বৌদি, আজ সকালে ত বেশ গাইছিলে; আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল।"

অর্ণবের দাদা অসিতরঞ্জন ঈষৎ হেসে খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে বল্লেন,—"তোর ত ভাল লাগ্‌বেই—আমার এদিকে ভোরের ঘুমটা একেবারে মাটী—"

বেচারী কণিকার শুভ্র ললাট অরুণাভ হয়ে উঠ্‌ল; সে বাঁ হাতে অবাধ্য চুলগুলি কাণের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে, অসিতের পেয়ালা শূন্য দেখে বল্লে,—"আর এক পেয়ালা ঢেলে দেবো?"

অসিত মৃদু হেসে বল্লেন,—"ঘুম ভাঙানোর ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ?" বলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পুনরায় বলে উঠ্‌লেন—"থাক্, অন্যদিক দিয়ে পুরিয়ে নেবো।" বলে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে।

অর্ণবও প্রাতরাশ শেষ করে ওপর তলায় নিজের বসবার ঘরে চলে গেল।

আজ কিছুদিন এঁরা বাংলা ছেড়ে এই সুদূর বিদে[শে] এসেছেন। এখানে আসার কারণ, একঘেয়ে বাংলা থেকে তাঁদের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই যদি এ[ই] সুদূর বিদেশে কিছু নূতনত্ব পাওয়া যায় এই আশায়।

অর্ণব ওপরে তার ঘরের জান্‌লার পাশে দাঁড়ি[য়ে] বাইরে দেখ্‌লে,—সাম্‌নে সুপ্রশস্ত লাল রাস্তাটা দুদিকে অনেক দূর চলে গেছে। খানিক দূর অন্তর অন্ত ছবির মতো সুন্দর এক একটা বাংলো; আর তাদে[র] মাঝে মাঝে দু একটা বড় সুদৃশ্য অট্টালিকা,—চারিদি[কে] প্রাচীর দেওয়া, বাগানে ঘেরা, অসংখ্য তরুলতায় সয[ত্নে] সাজানো।

অর্ণবদের নিজেদের বাড়ীখানিও এই প্রকার এক[টি] সুরম্য অট্টালিকা। অর্ণব তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছি[ল] —কণিকা নিঃশব্দে ওপরে এসে বলে উঠ্‌ল,—"কি দেখ[] হচ্ছে ঠাকুরপো।"

সে ফিরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেসে বল্লে,—"কই? বিশে[ষ] কিছুই তো নয়!"

কণিকা তার নিবিড় ভোমরা কালো চুলের গুচ্ছ আঙুলে জড়াতে জড়াতে, জানলার কাছে সরে এসে বল্লে, —"ঠাকুর পো, বল্‌তে পারো, সাম্‌নের ঐ বাংলোটি কাদের? কেউ ত নেই—থাক্‌লে কিন্তু বেশ হতো!"

অর্ণব অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লে,—"না, জানি না ওটা কার বাংলো।"

অসিত, কণিকা ও অর্ণব কয়েক দিন হল এখানে এসেচেন। অসিতের সদা প্রফুল্লচিত্ত কিছুতেই অপ্রফুল্ল হয় না। তিনি সকাল সন্ধ্যে বেড়িয়ে বেড়ান স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। সঙ্গীর অভাব তাঁর কোথাও হয় না; এখানেও তিনি অনেকগুলি বন্ধু আবিষ্কার করে ফেলেচেন। কিন্তু কণিকা সে অভাব একটু বোধ করছিল। তবে অর্ণবের

কথা স্বতন্ত্র,—তার এক জ্যোৎস্নাময় ছাড়া বোধ হয় দ্বিতীয় বন্ধু আর কেউ ছিল না। আর সেও এখন কোলকাতায়; কাজেই দীর্ঘ দিনগুলো তার নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

সেদিন সে ওপরের বস্‌বার ঘরে একটা বড় সোফায় আরামে হেলান দিয়ে একটা মাসিক পড়ছিল, কিন্তু তার মন ছিল অন্য দিকে। সে ভাবছিল অনেকদিন আগেকার কথা,—তার মুখে বিষণ্ণ হাসির আভাস ফুটে উঠ্‌ল।...

তরুণ জীবনের প্রভাতে,—উচ্ছ্বাসের সেই প্রথম তরঙ্গে—এমন একটি সময় প্রায়ই আসে, যখন ফাল্গুনের সবুজের উন্মেষের সঙ্গে, আকাশের আলো আর বাতাসের শিহরণের সঙ্গে, হৃদয়ও বসন্ত মাধুরীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে! তখন শুক্লাত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না প্লাবনের মাঝে, স্বচ্ছ প্রভাতের স্নিগ্ধ শ্যামলতার মাঝে, স্তব্ধ প্রদোষের গভীর শান্তির মাঝে, সুন্দরের সহিত আত্মার প্রথম পরিচয় হয়! তরুণ অর্ণব কৈশোরের প্রান্তে উপনীত হয়ে একদিন অকস্মাৎ এই পরিচয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

—কিন্তু জগৎ কঠোর বাস্তবতায় পূর্ণ; সোনালী স্বপন গোধূলির স্বর্ণরাগের মতো অচিরে বিলীন হয়; রেখে যায়, —একটা পুঞ্জীভূত অন্ধকার, যেটা জ্যোতিরুৎসবের পরেই বড় দুঃসহ হয়ে ওঠে।...অর্ণবের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। তীব্র বিরক্তি ও অতৃপ্তি তার মন তিক্ত করে তুল্‌ল।

দুই

যখন অসিতরা এখানে এলেন, তখন জ্যোৎস্নারও আসবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে তার আসা হল না; ঠিক হল দিন কতক পরে সে আস্‌বে।

সেদিন বিকেলে কোন খবর না দিয়েই জ্যোৎস্না হঠাৎ এসে পড়ল। রাতে খাওয়ার পরে সবাই ওপরে ড্রয়িংরুমে এসে বসেচে। কণিকা আপন মনে পিয়ানো বাজাচ্চে; অসিত।জ্যোৎস্নার কাছ থেকে কল্‌কাতার আধুনিকতম খবরগুলি জেনে নিচ্চেন। অর্ণব বসেছিল এক পাশে; একটু পরে সে জানলার পাশে সরে এসে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, —"বৌদি, এদিকে এসো একবার।"

কণিকা উঠে এলে অর্ণব বল্লে,—"ওই বাংলোয় আলো জ্বলচে দেখ্‌চো?—নিশ্চয়ই আজ বিকেলে কেউ এসেচেন।"

অসিত তাদের দিকে চেয়ে বল্লেন,—"ব্যাপার কি?"

কণিকা তাঁকে ব্যাপারটি জানালে, তিনি বিজ্ঞভাবে হেসে বল্‌লেন,—"ওটা ত আমাদের মুরারীবাবুর বাংলো, তিনিই এসেচেন সম্ভবতঃ।"

কণিকা বল্‌লে,—"মুরারীবাবু কে?"

অসিত বল্‌লেন,—"তিনি বাবার বন্ধু; এখন চাকরী থেকে অবসর নিয়েচেন, তাই বোধ হয় এখানে এসেচেন বেড়াতে।"

অর্ণব বল্‌লে,—"হাঁ বুঝেচি,—আমি তাঁকে আমাদের বাড়ীতেই বোধ হয় বার কতক দেখেচি।"

কণিকা গল্পের সাথী পাবার আশায় মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল; তার উৎসাহ এরি মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক কমে গেছে—বৃদ্ধ মুরারীবাবুর সঙ্গে ত গল্প করা চলে না, অন্ততঃ তাঁর স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়া থাকলেও হতো—কণিকা তাই ভাব্‌ছিল।

জ্যোৎস্না হঠাৎ বলে উঠল,—"দ্যাখো অর্ণব, আমার এতক্ষণে মনে পড়েচে,—আমি যখন ষ্টেশনে নামি, তখন আমার পাশের ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট থেকে একজন বৃদ্ধ ও একটি তরুণী নাম্‌লেন। তাঁরাই হয়ত এসেচেন ওখানে—"

কণিকার নির্ব্বাণোন্মুখ আশা দীপ আবার জ্বলে উঠল, অসিত জ্যোৎস্নাকে বল্‌লেন,—"ঐ বৃদ্ধটিই মুরারী-বাবু—"

অর্ণব কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত মৃদুকণ্ঠে জ্যোৎস্নাকে বল্‌লে,—"তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে হে—আমাদের বাড়ীর পাশেই এক তরুণী!—জ্যোৎস্না, আমি তোমার জন্য চিন্তিত, বিশেষ যখন—"

অর্ণবের কথা শেষ করতে দিল না, জ্যোৎস্নার সুপুষ্ট হাতের একটি বিশিষ্ট আঘাত অর্ণবের পিঠে সশব্দে পড়্‌ল।

সে উচ্চহাস্যের সহিত বললে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে, কে কার জন্য চিন্তিত!"

অর্ণবের মন্তব্যটুকু অসিতের কাণে যায় নি,—হঠাৎ উচ্চ হাসি ও একটা শব্দ শুনে, মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—"কি হল?"

জ্যোৎস্না অতি ভাল মানুষটির মতো বললে,—"না, বিশেষ কিছু নয়—"

তার পরদিন বিকেলে সবাই বেড়াতে বেরিয়ে তাদের পাশের বাংলোর সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখ একজন যুবক ও একটি তরুণী বাংলো হতে বার হয়ে অসিতদের সামনে এসে পড়ল। কণিকা বিস্মিত হয়ে ডেকে উঠল,—"লহরী!—"

লহরী তখনও তাকে দেখে নি, পরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনে চম্‌কে চাইতেই সে কণিকাকে দেখতে পেলে।

অসিতরঞ্জন তাদের বললেন,—"তোমরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, না—?" তারপরেই কণিকাকে বললেন,—"তোমার বন্ধু ও কলেজের সহপাঠী লহরী যে মুরারী-বাবুরই কন্যা, তা আমি জানতুম,—কিন্তু তুমি নিজে তা জান্‌তে না; তাই আমি ইচ্ছে করেই কিছু বলি নি—বিশেষ অন্যায় করি নি—কি বল লহরী? চিনু, তুমি ফিরলে কবে? আমি জানতুম তুমি এখনো অক্সফোর্ড-এ।"

চিন্ময় এতক্ষণ অনেকগুলি বিস্ময়ের ধাক্কায় নির্ব্বাক্ হয়ে গেছিল, এখন সে সহাস্যমুখে বললে,—"সম্প্রতি সেখানের পড়া শেষ করে কল্‌কাতা এসে বাবার অসুস্থতা হেতু এখানে এসেচি।" তারপর জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বললে,—"দেখুন, আপনাকেও আমি চিনি; স্কটিস চার্চ্চ কলেজে আই-এস-সি পড়বার সময় আপনাকে দেখিছি আমাদের সঙ্গে পড়তে।"

জ্যোৎস্না হেসে বললে,—"আমারও ঠিক্ তাই মনে হচ্চে।"

অসিত মুরারীবাবুর কথা জিজ্ঞেস করায় চিন্ময় বললে,—"বাবা আজ আর বেরুলেন না—আমাদের বললেন একটু ঘুরে আসতে।"

খানিক পরেই সবাই গল্প জুড়ে দিয়েচে দেখে অসিত রঞ্জন বললেন,—"যখন এইখানেই দেখা হয়ে গেল, তখ একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

অর্ণব এতক্ষণ নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সক অগ্রসর হলে সেও সকলের পশ্চাতে চল্‌ল।

ঘণ্টা দুই পরে যখন তারা ফিরল, তখন সবায়ের আলাপ বেশ সহজ হয়ে এসেচে,—অর্থাৎ চিন্ময় ও জ্যোৎ পুরাণো বন্ধুর মতোই গল্প করতে করতে আগে আ চল্‌ছিল; লহরী, কণিকা ও অসিতরঞ্জন তাদের পশ্চাতে অর্ণব একলা সবার শেষে।

তিন

চিন্ময়দের সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা যেরূপ দ্রুতবেগে বে উঠ্‌ল, তা কল্‌কাতায় গত কয়েক বৎসরের আলাপেও হ পারে নি, বাংলার বাইরে, বিদেশে, এরকম হঠাৎ পাও বন্ধু যদি বাড়ীর পাশেই আবিষ্কৃত হয়, তবে সে সৌহৃদ্যে আর কল্‌কাতার বিরাট কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে কেতাদুর ভদ্রতা রক্ষার তফাৎ অনেক।

দুপুরবেলা অসিতদের ড্রয়িংরুমে প্রায় রোজই এ তরুণ তরুণীদের বৈঠক বসে। হাসি কোলাহল, গান গল্প জমাট্ মজলিসের আর অফুরন্ত বেড়ানোর মধ্যে দি দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছে।

...এতদিন কণিকাই পিয়ানো বাজাত,—অর্ণব নিতে সেতার। লহরী এসে অবধি পিয়ানোর ভারটা কণিক তারই ওপর দিয়েচে, অর্ণব আর লহরী দুজনে রো দুপুরে নূতন নূতন সুর বাজায়। কিন্তু গান গাইবা বেলা, এক জ্যোৎস্না ছাড়া আর কেউ অব্যাহতি পায় না প্রথম দিন জ্যোৎস্নাকে অনুরোধ করায় সে বলেছিল, যে তাকে গাইতে বল্লে সে কল্‌কাতা ফিরে গিয়ে কালোয়া এর কাছে শিখে আসবে।

প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলি অর্ণবের কাছে এখন আ কর্ম্মহীন নিরানন্দ ক্লান্তি নিয়ে উপস্থিত হয় না।

একদিন বিকেলে রোদের তেজ কমবার আগে

জ্যোৎস্না আর চিন্ময় গুপ্ত, ষড়যন্ত্র করে অনেক দূরে একটা জায়গায় যাবার জন্ম বেরিয়ে পড়্ল। তারা ভাল করেই জান্ত যে, মেয়েদের নিয়ে বার হলে অর্দ্ধেক পথেই সন্ধ্যা হবে। কাজেই তারা বুদ্ধিমানের মতো সরে পড়েচে। অর্ণবকে সঙ্গে নিতে জ্যোৎস্নার সাহস হল না। কারণ অত ক্রোশ মাঠ জঙ্গল ভেঙ্গে, দুটো ঝর্ণা পার হয়ে সেখানে যাবার কথা শুন্লে, অর্ণব তার প্রতি এমন দু'একটি মধুর বিশেষণ প্রয়োগ করত, যে, শেষে সবাই ভাব্তো সত্যিই বুঝি জ্যোৎস্নার মাথার গোলমাল হয়েচে।

আরো খানিক পরে রোদ কম্লে অসিত একজনের বাংলোয় ব্রীজ খেল্তে গেলেন।

জ্যোৎস্না ও চিন্ময়ের খোঁজ করে তাদের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তখন অর্ণব, বৌদি ও লহরীর খোঁজে এসে দেখ্লে তারা মুরারীবাবুর বাংলোর বারান্দায় বসে বেশ নিশ্চিন্তভাবে গল্প করচে। সে বলে,—"জ্যোৎস্না, দাদা, চিনু, সবাই যে যার সরে পড়েচে—আর তোমাদেরও তো কোথাও যাবার উদ্যোগ দেখচি না; আমি একটু ঘুরে আসি।"—এই বলে সেও বেরিয়ে পড়্ল।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে অর্ণব দেখলে বাড়ীটা তখনো নিস্তব্ধ। সে বুঝলে দাদা বা ওরা দুজন, কেউ ফেরে নি। সে ওপরে বস্বার ঘরে এসে দেখ্লে কণিকা খোলা জানলার ধারে বসে আছে। তার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য ঢালা সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসির আভাস। তার খোলা চুল বাতাসে উড়ে কপালের ওপর এসে পড়েচে। অনেক কৌতুক খেলার খনি বড় বড় টানা চোখ দুটি চেয়েছিল দূরে আকাশের পানে,—সেখানে লক্ষ তারা দীপালী জ্বেলে দিয়েছে। লহরী টেবিলের সাম্নে দাঁড়িয়ে একটা উপন্যাস নিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছিল। অরুণ রঙে রঙীন রেশমের ঝালরে ঢাকা আলোর লালিমা তার শুভ্র ললাটে মৃদু আদরের স্পর্শ এঁকে দিয়েচে।

অর্ণব দরজায় দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্তের জন্ম তার দিকে চেয়ে, —ঘরের নিস্তব্ধতা চকিত করে ডাক্লে,—"বৌদি, চুপ্‌চাপ্ সব কি হচ্চে?"

লহরী তার অতর্কিত প্রবেশে চম্‌কে উঠে উপন্যাসখানা বন্ধ করে সরে এল। অর্ণব ঈষৎ হেসে বল্লে,—"বৌদি, বল্‌তে পারো, লোকে আমায় দেখে মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠে কেন?'

লহরী অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মতো ম্লান মুখে বল্লে,—"সেটা অবশ্য আপনার দোষ নয়; দোষ লোকেরই। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলে হঠাৎ আপনাকে আস্‌তে দেখে—"

"যথোচিত অভ্যর্থনা করতে পারি নি"—এটকু কণিকা শেষ করে দিল।

লহরী বলে উঠ্‌ল,—"কি যে বলো তুমি"—তারপর অর্ণবকে বল্লে,—"তাই আপনাকে আসতে দেখে চম্‌কে উঠেছিলুম।"

অর্ণব বল্‌লে,—"যাক্,—ওদের ফিরতে বোধহয় দেরী হবে; ততক্ষণ একটু বাজানো যাক্ আসুন।"

যখন তারা দুজনে রবীন্দ্রনাথ রচিত—"আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন"—গানখানির সুরপুঞ্জে ঘরখানি ভরিয়ে তুলেচে, তখন অসিত নিঃশব্দে ওপরে এসে কণিকার পাশে সোফায় বসলেন।

চার

লহরীর ছুটী ফুরিয়ে এসেচে,—দুদিন পরেই তার কলেজ খুল্‌বে,—কাল মুরারীবাবুরা কল্‌কাতায় ফিরে যাবেন।

অসিত এখনো কিছুদিন থাকতে চান্। অর্ণব আর জ্যোৎস্না এম্-এ পাশ করে অবধি বড় কিছু করচে না, তাদেরো ফিরে যাবার কোন তাড়াতাড়ি নেই।

কিন্তু অর্ণবের এক একবার মনে হচ্ছিল, তাদেরো ফিরে গেলে ভাল হতো।

আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় সবাই একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠেচে। দুপুরবেলা অর্ণব বসবার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, বৌদি একলা পিয়ানো বাজাচ্চে—আর কেউ সেখানে নেই। জিজ্ঞেস করে সে জান্‌লে যে চিন্ময়, জ্যোৎস্না ও

অসিত মুরারীবাবুদের জন্য একখানা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করতে ষ্টেশনে গেছেন। লহরীর কথা জিজ্ঞেস করতে বৌদি বল্লে,—"সে বোধ হয় যাবার আয়োজনে ব্যস্ত—তা তুমি একবার দেখে এসো না; যদি বিশেষ ব্যস্ত না থাকে তবে ধরে নিয়ে এসো।"

কণিকা লহরীকে দেখে বল্লে,—"কি গো, যাবার আমোদে আমাদের ভুলে গেলে না কি?"

প্রচ্ছন্ন স্নেহের আঘাতে লহরীর মুখ ম্লান হয়ে এল; অর্ণব তাড়াতাড়ি বল্লে,—"না, উনি দু একটা চিঠি লেখা শেষ করেই আস্‌ছিলেন—আর আমিও ঠিক সেই সময় গিয়ে পড়লুম।"

কণিকা মৃদু হেসে বলে উঠল—"লহরী তোমাকে ওকালতির কিছু দক্ষিণা দিয়েচে বুঝি?"

পাঁচ

কাল লহরীরা চলে গেছে। অর্ণব ভাব্‌ছিল,—"কাল যখন তাদের বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চিন্ময়ের অনুরোধে একটা গান গাইছিলুম, তখন একজনের গভীর দৃষ্টি নিবিড় কালো পল্লবের আড়ালে সজল মাধুর্য্যে ছল্‌ছল্‌ করছিল। একটিবারমাত্র তার দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে সে নিজের নয়ন আনত করলে।...কিন্তু কিসের এ অশ্রু?—কেন?"

*   *   *   *

প্রায় একমাস কেটে গেল। অর্ণবের মনে আজ একটা কথা তাকে উত্যক্ত, অশান্ত করে তুলেচে, সে সদাই ভাব্‌চে—"কিন্তু সে কি—? নাঃ, এর একটা মীমাংসা চাই,—অনিশ্চিতের ঘূর্ণীদোলায় আমার যে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড় হয়েচে!"

*   *   *   *

মাস তিনেক পরে তারা কল্‌কাতায় ফির্‌ল। জ্যোৎস্না এখন একটা প্রোফেসারী পেয়েচে স্কটিস্‌ চার্চ্চ কলেজে, এখন সে আর একটা গুরুতর কাজের সঙ্কল্প করেচে।...আর কণিকা ও অসিতরঞ্জন দুজনেই চিন্ময়দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; অর্ণব যায় নি...একটা কাজের ওজর দিয়েছিল। সেদিন কণিকা একলা লহরীর কাছে গিয়েছিল, সেদিনও অর্ণব যায় নি। কি একটা সঙ্কোচ তার দেখা করাটা প্রতিদিনই পিছিয়ে দিতে চায়!...

*   *   *   *

সেদিন বিকেলে অর্ণব বেড়াতে যাবার জন্য নেমে আস্‌বার উদ্যোগ করচে, এমন সময় চিন্ময়দের 'ডজ-কার'-খানা তাদের দরজায় এসে থাম্‌ল।...অর্ণব একটু বিপদে পড়ল, এতদিন না দেখা করার কি সঙ্গত কারণ সে তাদের দেখাবে?—সে যখন নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল তখন চিন্ময় অসিতের সঙ্গে প্রকাণ্ড তর্ক জুড়ে দিয়েচে। লহরী তাকে দেখেই মৃদু অনুযোগের স্বরে বলে উঠ্‌ল,—"আচ্ছা, আপনি একদিনও আমাদের ওখানে যান্‌ নি কেন বলুন তো?"

অর্ণব তার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বল্লে,—"আপনার একজামিন-এর পড়ার ব্যাঘাত হবে বলে আমি আর বিরক্ত করতে যাই নি।"

মৃদু হেসে লহরী বল্লে,—"আপনি ত দেখচি খুব পরার্থপর! আমি কি সারাদিনই বই হাতে করে বসে আছি না কি? তা ছাড়া আমাদের একজামিন তো শেষ হয়ে গেছে কবে!"

অর্ণব তখন তার স্বচ্ছধরণের সুযুক্তিগুলির নিতান্ত অযোগ্যতা দেখে বলে ফেল্লে,—"আচ্ছা, যাব একদিন,—পাছে পড়ার ব্যাঘাত হলে দোষ দেন, এই ভয়েই এতদিন যাই নি—"

কণিকা সেই সময়ে হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল,—"না, তা ভালই করেছে;—কিন্তু, রাগ কোরো না ঠাকুর পো, সেদিন অত করে সাধলুম যাওয়া হল না, আর এখন লহরীর সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ হচ্ছে—"

সেই দিন রাত্রে, তেতলার বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে অর্ণব তার অমীমাংসিত সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন রকমেই কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সে মনে মনে স্থির করলে—উত্তর তার চাই-ই

অনিশ্চিতের সান্ত্বনায় নিজেকে সে ভুলিয়ে রাখতে আর রাজী নয়।

সহসা মাথায় কার কোমল স্পর্শে চমকে ফিরে দেখলে—বৌদি! কণিকা বল্‌লে,—"ঠাকুরপো, বসে বসে কি এত ভাবনা হচ্ছে?—ঘুমোতে যাও, অনেক রাত হয়ে গেছে—"

পিতৃগৃহ হতে নূতন সংসারে এসে অবধি কণিকা এই আপন ভাবে মগ্ন দেবরটির সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে নিয়েছিল; সে পিতার একমাত্র কন্যা; ভাই ছিল না বলেই ভ্রাতৃস্নেহ কি, তা সে জানত না। অর্ণবের বিষণ্ণ-সুকুমার মুখ সহজেই তার সুপ্ত ভ্রাতৃস্নেহ জাগিয়ে তুলল। জননীর মৃত্যুর পর প্রায় বার বৎসর পরে, আবার প্রভাত হতে সন্ধ্যা অবধি ছোটবড় প্রতি বিষয়টিতে স্নেহ-প্রবণ নারীহস্তের আন্তরিক যত্নের স্পর্শ বুঝতে পেরে অর্ণবের মন নবাগতা বৌদির ওপর সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তাদের অকপট বিমল সৌহৃদ্য অসিতরঞ্জনকে এক গুরুতর চিন্তা থেকে মুক্তি দিলে। তিনি ভেবেছিলেন যে, তার ভাইটি যেমন জগৎ সংসার থেকে দূরে সরে যায়, তেমনি যদি নিজের বৌদির সান্নিধ্য হতেও নিজেকে দূরে রাখে, তবে সে বেচারী এই নিঃসঙ্গ আত্মীয় বন্ধু শূন্য সংসারে কি করে দিন কাটাবে? কিন্তু অর্ণব, জনসংঘ থেকে দূরে থেকেও, লোকচরিত্রের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারত; সেটা তার অভিজ্ঞতার ফল নয়,—তীব্র অন্তর্দৃষ্টির স্বাভাবিক শক্তি মাত্র! তরুণী কণিকার কৌমুদীর মতো অম্লান সৌন্দর্য্যের আড়ালে যে একখানি অগ্নি অম্লান সুন্দর হৃদয় লুকানো আছে তা সে কদিনের পরিচয়েই বুঝেছিল; তাই সে, তার স্নেহের বন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়ে অনেক দিন পরে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ছয়

লহরীই সহাস্য মুখে অর্ণবকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। চিন্ময় বাড়ী ছিল না, জ্যোৎস্না তাকে টেনে নিয়ে গেছে। মুরারীবাবু গেছেন তাঁর প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে, লহরী ঈষৎ হেসে বল্‌লে,—"আপনি যে এত শীগ্‌গির কথাটা রাখবেন তা আমি ভাবি নি।"

অর্ণব অন্যমনস্কভাবে বল্‌তে যাচ্ছিল—"কেন?" কিন্তু তা না বলে অল্প দু একটা কথার পর যখন সে বল্‌লে—"আজ তবে আসি, চিনুকে বল্‌বেন আর একদিন আসব, যেন সে রাগ না করে—"

তখন লহরী আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌ল,—"বেশ লোক তো আপনি! ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যেতে চান—সে হচ্চে না, দাদা তা হলে আমায় বেজায় বক্‌বে—আপনি বসুন, আমি এখুনি আস্‌ছি—"

অর্ণব অগত্যা একটা চেয়ারে বসে পড়ল, একটু পরেই লহরী নিজের হাতে প্রচুর আহার্য্যপূর্ণ একটি রেকাবী নিয়ে এল।

অর্ণব মনে মনে স্থির কর্‌লে, আজ যখন তাকে সেখানে বস্‌তেই হল, তখন সে তার অমীমাংসিত উত্তরটা না নিয়ে কিছুতেই উঠ্‌চে না।—তা সে যার সাহায্যেই হোক্!—কিন্তু নানারকমের গল্প করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়েও বেচারী অর্ণব কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না কথাটা কি করে তোলা যায়! নিজের এরূপ বিরাট অজ্ঞতায় তার নিজের লজ্জা হচ্ছিল! অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলে ফেল্‌লে,—"দেখুন, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি—"

লহরী হেসে বল্‌লে,—"যার মীমাংসা আপনি করে উঠ্‌তে পারচেন না!"

অর্ণব খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,—"ঠিক তাই! শুধু একটি লোক সে সমস্যাটির মীমাংসা কর্‌তে পারে—"

লহরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে,—"কে?"

অর্ণব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি লহরীর মুখের ওপর রেখে বল্‌লে,—"তুমি!"

লহরী অত্যন্ত অবাক হয়ে শুধু বল্‌লে,—"আমি?"

এমন সময় চিন্ময় ঘরে ঢুকে বলে উঠল,—"হালো, ফ্রেণ্ড, কতক্ষণ! আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। ব্যাপার কি? তারপর—?"

অর্ণব বল্‌লে,—"তোমাদের মত রাজামানুষদের সঙ্গে

আমাদের কি পোষায় ? এই তো প্রায় দু তিন ঘণ্টা বসে আছি, কতক্ষণে হুজুরের শুভাগমন হবে, এ অধমের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য !

দু এক কথা কইতে কইতে চিন্ময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে অর্ণব চলে গেল, সে চলে গেলে পর লহরী সেইখানে অনেকক্ষণ বসে রইল।—সে অর্ণবের সমস্যার কথাটা ভাবছিল, কিন্তু কোন অর্থই সে বুঝতে পার্‌লে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, অর্ণবের একটি কথা,—"তুমি"—সেই একটি কথাই আঁধার পথে বিজলী চমকের মতো পথিকের পথ নির্দ্দেশ করলে।

সাত

দু'একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অর্ণবের সমস্যাটি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোলা রইল। লহরী আই-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করেচে। চিন্ময় সস্ত্রীক চলে গেছে রেঙ্গুনে একটা চাকরী পেয়ে।

এদিকে জ্যোৎস্নার সঙ্কল্পটা সফল হয়েছে,—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের কৃতি ছাত্রী রমলা দেবী, যাকে সে এতদিন কলেজে পড়িয়ে এসেচে, তারই সাথে শুভ-পরিণয় হয়েছে ! জ্যোৎস্না তাই আজকাল সময়াভাবে অর্ণবের ওখানে বড় একটা যেতে পারে না।

নিঃসঙ্গ অর্ণব নিজের ওপর আর অনেকেরি ওপর অভিমান করে দীর্ঘ দেশ ভ্রমণে বার হ'ল।...তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। অনেক প্রভাত, মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণে জলে উঠে স্তিমিত সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবে গেছে।

লহরী সেই দূর পশ্চিমে, তাদের বাংলার বারান্দায় বসে কত কি ভাবছিল। মুরারীবাবু খাওয়া শেষ করে শয্যায় আশ্রয় নিয়েচেন। চিন্ময় প্রায় মাসখানেক হল রেঙ্গুন থেকে সপরিবারে ফিরে এসেচে। সে নীচের একটা ঘরে বসে রেঙ্গুন আফিসের কি একটা কাজ কর্‌চে। লহরী একটা চিঠি হাতে করে নীচু বেতের চেয়ারটায় এসে বসল। স্নান সিক্ত এলো চুলের গুচ্ছ তখনো তার শুকায় নি। কালো রেশমের মতো অজস্র, দীর্ঘ, নরম চুলের রাশি তার পিঠের ওপর ও দুহাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়েচে।

চিঠিখানা কণিকার ! সে লহরীকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে এসেচে ; শেষ চিঠিতে সে লিখেছিল,—"ঠাকুরপোর দেশভ্রমণও এখনো ফুরোয় নি—কবে হবে তাও জানি না। ঠিক কথা ,—তোমাকে কি কখন সে চিঠি লেখে না ? কারণ সে আমার চিঠিতে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে পাঠায়..."

লহরী উত্তরে লিখেছিল,—"আমাকে কেন লিখবেন তিনি ? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কি তাঁর দেশভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে ?"

কণিকা চিঠিখানা পড়ে মনে মনে হেসে বলেছিল,—"তা হতেও পারে।"

গত বৎসর প্রবাসে যখন কণিকার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল, সেই সময়ে সেখানেই কবে একদিন কণিকা তার দেবরটির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা-প্রবণতার কথা প্রসঙ্গে নিতান্ত পরিহাসের ভাবেই লহরীকে বলেছিল,—"তুমি যখন সাম্‌নে থাকো, তখনই শুধু, ঠাকুরপো গম্ভীর হতে ভুলে যায় !"

সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রাশির নিম্নে যাদের চিত্ত প্রবীণ হয়ে উঠেচে, তাদের চেয়ে স্বভাব কোমল তরুণ হৃদয়ের উদ্যত সহানুভূতি যে অধিকতর উচ্ছ্বসিত, আগ্রহ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে—সে তো খুবই স্বাভাবিক !...কাজেই সেদিন লহরী সে কথাটা শুধু পরিহাসের ভাবেই নিতে পারলে না। তার নিতান্ত অনভিজ্ঞ চিত্ত একটা অসম্ভব রকমের প্রতিজ্ঞা করে ফেল্‌লে। সে মনে মনে বল্‌লে—"আমিই তবে ওই মুখে চিরদিনই হাসির রেখা ফুটিয়ে রাখ্‌বো—"

আজ এই দূর প্রবাসে বসে ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে, সে সেই কথাটাই ভাবছিল—হায় রে ! আজ তার প্রতিজ্ঞা সে কি করে রক্ষা কর্‌বে। আজ তার নিজের মুখে কে হাসি ফোটায় !

তার দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। সহসা চিন্ময়ের আহ্বানে চমকে উঠে সে কণিকার অপঠিত চিঠিখানায় মনোনিবেশ করল।

ক্লান্ত

ট্রেণের জানালার ওপর মাথাটা রেখে অর্ণব বসেছিল। সে বাংলায় ফিরে চলেছে; আজ তার বলতে ইচ্ছে হচ্চে, —"ওগো, আর না—আর না; সব আশাই তো ছেড়ে দিয়েচি—"

একটি বড় ষ্টেশনে এসে ট্রেণ থামল। অর্ণব মাথাটা বাড়িয়ে গ্যাস্-পোষ্টে লেখা ষ্টেশনের নামটি দেখলে;— দেখলে, এটা সেই বহু পুরাতন ষ্টেশন, এখানে নেমেই তাদের সেই পশ্চিমের বাড়ীতে যেতে হয়। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে, তাই সে প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়াবার জন্ম নেমে পড়ল।

চিন্ময় কোন কোনদিন বিকেলে ষ্টেশনে বেড়াতে আসে—আজও এসেছিল। হঠাৎ অর্ণবকে ষ্টেশনে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে তার কাছে এসে বলে উঠল—"অর্ণব যে!—কোত্থেকে?"

সে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে চিন্ময়কে দেখে সাগ্রহে তার দিকে কর প্রসারিত করে বল্লে,—"তুমি এখানে আবার কবে এলে?"

—"কেন, লোকে কি আর আসে না?—কিন্তু তুমিও তো এসেচ?"

—"না, আমি কল্‌কাতা যাচ্চি!"

—"সত্যি না কি?···ওসব হচ্চে না। যখন আমার হাতে ধরা পড়েচ, তখন সহজে ছাড়চি না। এখন আপাততঃ কল্‌কাতার প্রাসাদে না গিয়ে এই গরীবের কুটীরে—"

অর্ণব অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল; বল্লে,—"তাও কি হয় না কি? কতদিন পরে বাড়ী যাচ্চি!"

চিন্ময় এবার হেসে বল্লে,—"তা ঠিক!—মাস দশেক যখন তাঁরা অপেক্ষা করতে পেরেচেন, তখন আরও দুচার দিনে কিছু এসে যাবে না। ওহে বলো না, কি নামিয়ে নেবে, সময় হয়ে এল যে!"

* * *

অর্ণব কল্‌কাতা ফিরেচে।

বসন্ত প্রভাত। তরুবীথির শাখায় শাখায়, মুঞ্জরিত সবুজ পাতার আড়ালে পাখীগুলি প্রাণের সবটুকু আনন্দ তাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠে ভরে তুলচে। দখিণ বাতাসের সঙ্গে অসংখ্য সদ্য ফোটা ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসচে।

অর্ণব তার পুষ্পোদ্যানের পথে পথে বেড়িয়ে উজ্জ্বল হীরের মতো ভোরের শিশিরে ভেজা নিবিড় লাল গোলাপ তুলছিল। অধরে তার মৃদু হাসির রেখা,—মেঘলা দিনের বর্ষণের পর, দিনান্তে বৃষ্টি ধোওয়া অম্লান রোদটুকুর মতোই মধুর! তার আয়ত নয়নের গভীর দৃষ্টি তৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল;—বিষাদের কণাগুলি অশ্রু লেখায় ধুয়ে গিয়ে আজ হাসির আলোয়, মণিকণার মতো দীপ্ত হয়ে উঠেচে! তাদের বিচ্ছুরিত আভা অর্ণবের চোখের কোলে আলোর অঞ্জন এঁকে দিয়েচে।

কক্ষতলে পাতা নরম পুরু কাজকরা কার্পেটের ওপর লঘুপদক্ষেপে একটুও শব্দ না করে একটি তরুণী অর্ণবের পড়বার ঘরে এসে দাঁড়াল। দেখলে, টেবিলের ওপর অর্ণবের একটা ডায়েরী পড়ে রয়েচে,—বেগুনী ভেলভেটে বাঁধানো, সোণার বন্ধনী আঁটা, একখানি খাতা, মলাটের ওপর ঠিক মাঝখানে সোণার জলে আঁকা লহরীর বুকে একটি সুসজ্জিত অর্ণব, যেন সমতালে নাচ্ছে! ঈষৎ হেসে, সে খাতাখানা খুলতেই সামনে পড়ল—দশই অক্টোবর।

তারিখটা দেখে সে পড়তে আরম্ভ করলে;—

"মঙ্গলবার!···দীর্ঘ একটি বৎসর পরে। কতদিন নির্ব্বান্ধব দূর প্রবাসে বিনিদ্র নিশীথে, আমি কত প্রকারে সেই একই কথাটির উত্তর পেতে চেষ্টা করেচি।... যার দুদিনের পরিচয় আমার নিরানন্দ নিকষে সোণার রেখা এঁকে দিয়েচে সে কি?·· কতবার ভেবেচি আমি যাবো, —যাবো—আমার আধখানা বলা কথাটা শেষ করে· একটা উত্তর নেবো—কিন্তু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা, একটা ব্যর্থতার ভয়, বিরাট কালো অশুভ ছায়ার মতো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার উদ্যত উদ্‌গ্রীব চরণ, উৎকণ্ঠ উৎসুক লেখনী স্থগিত করেচে।

"আজ আবার দেখা হবে···অনেকদিনের পর। শত

শত চিন্তার ফেনিল আবর্ত্তময় উদ্বেল তরঙ্গ সংঘাত আমার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত করে তুলেচে।

"...মুরারীবাবু সস্নেহ সাদর অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিলেন; তাঁর উদার হৃদয়ের সরল আন্তরিকতা অমল জলের মতোই স্বচ্ছ,—কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা নেই!

"...অনেক চেষ্টা করেও লহরীর ব্যবহারে বা অভ্যর্থনায় অপ্রত্যাশিত পরিচিত অতিথির আগমনজনিত স্বাভাবিক আনন্দের আভাটকু ভিন্ন আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না।"

পাঠিকা পাতা উল্টে ফেল্‌লে।—

"বুধবার! দুপুরবেলা; লহরী এসে বল্‌লে,—'এতদিন ঘুরে ঘুরে কি দেখলেন বলুন।' মুরারীবাবু এরি মধ্যে নিদ্রামগ্ন হয়েচেন। চিন্ময় বিশেষ কোন কাজের জন্য ঘণ্টাখানেকের অবসর চেয়ে নিয়েচে। অনেকক্ষণ গল্প করে কেন জানি না, হঠাৎ বলে উঠলুম,—'আজ সন্ধ্যের ট্রেণেই বাড়ী যাচ্চি।'

"ক্ষুদ্র একটি নিমিষের জন্য লহরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু তখনি সে স্বাভাবিক পরিহাসের স্বরেই বল্‌লে,—'কল্‌কাতা যাবার জন্যে বুঝি এতদিন পরে মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেচে।'

"আমি বল্লুম,—'ব্যস্ত মোটেই নয়। আমি অনায়াসে এখানে মাসখানেক কাটিয়ে দিতে পারি—'

"লহরী বলে উঠল,—'তবে থাক্‌চেন না কেন?'—

"কেন থাক্‌চি না? —এ যে বিষম প্রশ্ন! কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে আমি আমার ব্যথিত দৃষ্টি তার শান্ত সুন্দর কালো চোখের ওপর রেখে বল্লুম,—'শুনতে চাও?'

"বিস্মিত, চকিত লহরীর কণ্ঠ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, একটি ছোট অস্পষ্ট—'হ্যাঁ'—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিবিড় রক্তিমায় তার আকণ্ঠ রঞ্জিত হয়ে গেল।

"আমি বল্লুম,—'তবে শোন; তোমাকে একদিন আমার একটা অমীমাংসিত সমস্যার কথা বলেছিলুম,—মনে আছে?—আমার এখানে না থাক্‌বার কারণ, সেই প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত, কেন না তার উত্তর নির্ভর করচে তোমারি ওপর!—'

"লহরীর হাত দুখানি তার কোলের ওপর বাতাসে শিউরে ওঠা পাতার মতো কাঁপছিল। তার শুভ্র ললাটে স্বেদবিন্দু চন্দন লেখার মতো ফুটে উঠ্‌ল। আমি অগ্রসর হয়ে তার কম্পিত হাত দুখানি আমার তপ্ত মুঠির মধ্যে চেপে ধর্‌লুম। একটু বাধা দেবার শক্তি তার ছিল না,—সে অবসন্ন হয়ে আসছিল। আমি অনুনয়ের স্বরে বল্লুম—'আজ আমার অনেকদিন অপেক্ষা করে থাকা কথাটার উত্তর দেবে, লহরী?'

"সে চমকে চোখ তুল্‌লে; তার মুখ কুঙ্কুম লালিমায় রাঙা হয়ে উঠে শুভ্র যুথিকার মত শাদা হয়ে গেল।

"আমি আবার বল্লুম,—'লহরী, উত্তর দেবে না? আমার পথের শেষ,—প্রতীক্ষার শেষ, কি এখনো হয় নি? এবার আর বাংলায় একা ফিরুচি না, হয় তোমায় সঙ্গে নেবো, নয়, যে পথে এসেচি, সেই পথেই ফির্‌ব!'

"একটি দীর্ঘ মুহূর্ত্ত সোৎকণ্ঠ অপেক্ষায় কেটে গেল।.. তারপর গলানো মণির মতো, অজস্র শুভ্রোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু তার চোখ হতে আমার হাতের ওপর ঝরে পড়ে তাদের পুষ্পমাল্যের মতো সাগ্রহে বেষ্টন করে ধরল। বন্যার স্রোতের মতো পুলক প্লাবনে আমার বিগত বর্ষচয়ের সমস্ত তিক্ত ক্লান্তি, বিরক্তি, অতৃপ্তি নিঃশেষে ধুয়ে গেল,—রেখে গেল একটা সিক্ত সরলতা! ধীরে লহরীকে আমি আমার বাহু বেষ্টনের মধ্যে বন্দী কর্‌লুম।

"...সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা;—সন্ধ্যালগ্নে আমাদের শুভ পরিণয় হয়ে গেল!—স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস ভরে গেল! মুরারীবাবু আমাদের মস্তকে ধান দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন; বল্‌লেন,—'তোমাদের যাত্রাপথ শুভ মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক'!"

শ্রীপ্রকাশ বসু

বুদ্ধির দৌড়

শ্রীপান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে, একখানা নভেল নিয়ে সবেমাত্র প্রতিমা শুয়েছে ;—এমন সময় কানে এলো—"বৌদি ঘুমিয়েছ না কি ?"

স্বর খুবই পরিচিত! প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে পড়ল! ভেজান দরজা ঠেলে পরিমল ঘরের ভেতর ঢুকে বল্‌লে—"কী ব্যাপার—ঘুম ?"

প্রতিমা হেসে বল্‌লে—"ঘুম কোথা ভাই ? এইতো সবে খেয়ে উঠলুম ! বসো—"

"হ্যাঁ বসছি" বলে খাটের ওপর বসে—পরিমল বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"এই খেয়ে উঠলে মানে ? বেলা দুটো বাজে—"

প্রতিমা জবাব দিলে—"সংসারের কাজ সেরে উঠতে এমনি দেরী হয়েই থাকে! তারপর তুমি—এই রণরণে দুপুরে কোথায় বেরিয়েছ ?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পরিমল বল্‌লে—"তুমিও যেমন বৌদি। আমরা হচ্ছি কুলী কাছারি মানুষ, রোদ্দুর বিষ্টি দেখতে গেলে চলে ?"

প্রতিমা বল্‌লে—"নাঃ, তা কি আর চলে ? একেবারে লোহার শরীর কোরে এসেছ ; তবু যদি না একমাস আগে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগতে।"

হো হো করে হেসে পরিমল বল্‌লে—"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আবার একটা অসুখ ? যাক্—পিসিমা কোথায় ?..."

প্রতিমা বল্‌লে—"মা এই খেয়ে দেয়ে ওঘরে শুয়েছেন। কেন—দরকার আছে কিছু ?"

পরিমল বল্‌লে—"না, পিসিমাকে কোন দরকার নেই! তোমার ও বাড়ীর খবর কি ?"

ও বাড়ী অর্থাৎ প্রতিমার বাপের বাড়ী। বৌদি ফিক্ করে হেসে ফেলে বল্‌লে—"হাঁ গো হাঁ, তুমি যার কথা জিজ্ঞেস কোরছ সে ভাল আছে—রিণা ভাল আছে।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পরিমল বল্‌লে—"বা রে, আমি বুঝি তার কথা জিজ্ঞেস করছি? তোমার বাবা মা কেমন আছেন—"

বৌদি বল্‌লে—"থাক্ মশাই, থাক্—আর বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হবে না! আগে তো কই কখন ভুলেও তাঁদের খবর নাও নি। আর আজ যেই রিণার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হোল অমনি তাঁদের খবরের জন্যে ব্যস্ত হয়েছ, কেমন ? আমি কচি খুকী, না ?

পরিমল ঘাড় হেঁট করে হাসতে হাসতে বল্‌লে—"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সোজা কথাকে এমন বাঁকা করে ধরো।"

প্রতিমা হেসে ফেলে বল্‌লে—"ঐ ভাই আমার কেমন দোষ। যাক্, হাতে ওটা কি বই ?"

পরিমল বইখানা প্রতিমার হাতে দিলে,—একখানা পাতা উলটিয়েই সে আবার ফিক করে হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে—"ব্যাপার কি ঠাকুরপো! গহনার ক্যাটলগ নিয়ে ঘুরছ ?"

পরিমল একটু হতাশভাবে বল্‌লে—"না, তোমার দ্বারা হবে না দেখছি! কোথায় ভেবেছিলাম তোমার 'হেল্‌প' একটু নেবো, তা তুমি যা ঠাট্টা সুরু করেছ তার ঠেলায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোল।" বলে সে উঠে দাঁড়ালে।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে বল্‌লে—"থাক, আর রাগ কোরতে হবে না! আচ্ছা, আমি আর ঠাট্টা কোরব না,—এখন বল—কি করতে হবে বলছিলে।"

পরিমল বসে পড়ে বৌদির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

প্রতিমা বল্‌লে—"বল না কি বলছিলে ?"

পরিমল একটু হাসলে, পরে বল্‌লে—"নাঃ, শুনলে তুমি খেপাবে!"

বৌদি কথাটা আদায় করবার জন্যে একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"না, তুমি বিশ্বাস করো আমি কিছু বলব না!"

পরিমল বৌদির মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"কিন্তু খবরদার আর কাউকে বোলতে পারবে না! এমন কি পেসাদ দা'কেও নয়। সে শুনলে আর আমার কোলকাতায় থাকতে দেবে না!"

বৌদি বল্‌লেন—"না গো না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

পরিমল এবার ইতস্ততঃ করে বল্‌লে—"ঐ বইখানার ভেতর থেকে—একটা আংটী আর একটা ক্রুচের ডিজাইন তোমার বোন্‌কে পছন্দ কোরে দিতে বলবে! কাল তুমি ও বাড়ী যাবে আমি জানি! আমি দিন দুয়েক পরে বইখানা তোমার কাছ থেকে আনিয়ে নেবো।

বৌদি এতক্ষণ অনেক কষ্টে হাসি চেপেছিল; এইবার হেসে ফেললে, বললে—"ওঃ এই ব্যাপার! আর এরই জন্যে এত দিব্যি, এত সর্ত্ত!"

পরিমল বল্‌লে—"সে যাই হোক, কিন্তু খবরদার! যদি আর কাউকে বলো—তা হলে মজা দেখবে, কিন্তু! আমি সব ভেস্তে দেবো।"

বৌদি বল্‌লে—"কি ভেস্তাবে শুনি?"

পরিমল বল্‌লে—"আসল জিনিষ—অর্থাৎ বিয়ে!"

ঠোঁটটা একটু উল্টে, অবজ্ঞার স্বরে বৌদি বল্‌লে—"ইস্! ভারি মুরোদ! দৌড় আমার জানা আছে!"

আরও আধ ঘণ্টা থেকে পরিমল উঠে পড়ল।

পরিমলের বাবা জ্ঞানদা চাটুর্য্যের অবস্থা খুবই ভাল! কোলকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী, দুখানা মোটর, চাকর-চাকরানীতে বাড়ী ভর্ত্তি! নদীয়ার কাছে তাদের মস্তবড় জমীদারী আছে! কোম্পানীর কাগজ ও ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণও বিশিষ্ট রকমের!—তার ওপর সম্প্রতি তিনি কোলকাতার 'নটরাজ থিয়েটার'টীর স্বত্ব কিনে নিয়েছেন! পরিমল তার 'ফাইন্যানসিয়াল সেক্রেটারী।' তা ছাড়া, পরিমলের নিজেরও একটা 'হার্ডওয়ার বিজনেস' আছে—তার আয়ও বেশ মবলক ধরণের! সংসারে জ্ঞানদাবাবুর স্ত্রী, একমাত্র ছেলে পরিমল ও একটী মেয়ে মায়া।—মায়া বিয়ে আজ তিন বছর হ'ল হয়ে গেছে। সে শ্বশুর বাড়ীতেই আছে, শ্বশুর-বাড়ী এলাহাবাদে!

প্রতিমার স্বামী প্রসাদ পরিমলের পিসতুতো ভাই কিন্তু মামাতো পিসতুতো ভাই হলেও দুজনের ভেতর প্রীতি ছিল অটুট! এবং উভয় উভয়ের সঙ্গে ব্যবহার কোরত ঠিক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। ফলে প্রসাদ দুবছরের বড় হলেও পরস্পরের ভেতর হাসিঠাট্টা ইয়ারকি অবাধে চলত।

প্রসাদের বিয়ে বছরখানেক হলো হয়েছে! প্রতিমার একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টাতে তার মেজ বোন্ রিণার সঙ্গে পরিমলের বিয়ের ঠিক হয়েছে! অবশ্য এই ইচ্ছার পেছনে ছোট একটু ইঙ্গিত ছিল—সেটা পাত্র ও পাত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের গোপন অনুরাগ।—

বিয়ের প্রায় সবই ঠিক, কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ, আর দিন স্থির টুকুই বাকী। সেটা কেবল প্রতিমার বাবার অফিসের ছুটি পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। তা হলে এটা ঠিক যে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সব পাকাপাকি হয়ে যাবে।

প্রতিমার বাপের বাড়ীতে আসার দুদিন পরে বিকেল বেলা—তার দাদামশাই এলেন। দাদামশাই থাকেন শিবপুরে। খুব কমই এখানে আসেন।

প্রতিমার মা নানান কথার পর, রিণার বিয়ের খবর সবিশেষ দিলেন। দাদামশাই একটু খুঁৎখুঁতে মানুষ। সব শুনে তিনি বললেন—"দেখ মা, সব ভাল, কিন্তু ঐ। বললে ছেলে থিয়েটারে প্লে করে—"

কাছেই প্রতিমা বসেছিল, সে বললে—"না দা। সে কেন প্লে করতে যাবে। সে সেক্রেটারী, টাকাকড়ি ব্যবস্থা সে করে—"

দাদামশাই বললেন—"তা হলেত আরও ভাল। টাকা যদি হাতে থাকে, তা হলে আরও ভয় পা পিছলোবার।"

প্রতিমা মুখটা একটু ভার করে বললে—"না দাদু ঠাকুরপো সে ধরণের ছেলে নয়। সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না, তার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবাই অন্যায়।"

দাদামশাই বল্‌লেন—"আরে পাগলী, আমি কি বল্‌

সে খারাপ! হাজার হলেও এ বিয়ের ব্যাপার। ভাল কোরে সব খবর নিতে হবে! ঐ থিয়েটারের লোকদের স্বভাব চরিত্র প্রায়ই বিগড়ে থাকে! বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না! ভেতর থেকে খবর নিতে হয় খুব ভাল কোরে! আর তোর ত সবে একবছর বিয়ে হয়েছে! তার ওপর সে থাকে কোলকাতায় আর তোরা থাকিস বেহালায়! কতটুকু খবর তার রাখতে পারিস বল্?"

প্রতিমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"আমি একবছরের সঠিক খবর জানতে পারবো না—আর আপনি দুদিনে কি করে সব ঠিক খবর যোগাড় কোরবেন?"

দাদামশাই হেসে বল্লেন—"ঐ তো মজারে! এই কোরেই ত মাথার চুল পাকালুম!"

এমন সময় রিণা একহাতে এক কাপ্ চা, অপর হাতে এক ডিস্ জলখাবার এনে দাদুর সামনে রেখে বল্লে—"নিন্ দাদু, এখন তর্ক রেখে একটু গলাটা ভিজুন দেখি! তখন থেকে বক্‌বক্ করে গলাটা শুকিয়ে গেছে!—" বলে একটু হাসলে!

দাদু হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন—"খুব বলেছিস্! দেখ না, একজন ত তার দেওরের নিন্দে শুনে চটে লাল! তা তোর মুখটা কি রকম দেখি—চতুর্দ্দশী না অমাবস্যা?" বলে চায়ের বাটিটা তুলে নিলেন!

* * * *

ছ'দিন পরে, সন্ধ্যার সময় প্রসাদ দা' পরিমলের ঘরে ঢুকে বল্লেন—"ওরে ছোঁড়া, এই নে তোর 'ইষ্টি কবচ' এর ভেতর 'মার্ক' করে দেওয়া আছে!" বলে তার সামনে সেদিনের ক্যাটলগটা ফেলে দিলেন।

পরিমলের মুখটা লাল হয়ে উঠল! সে বল্লে—না, বৌদির এটা ভারি অন্যায়! আমি পইপই করে কাউকে বলতে বারণ করেছিলাম!"

মুখটা একটু ভেংচে প্রসাদ দা' বল্লেন—"তা আর পারবে না!—তা না হলে ফূর্ত্তি হবে কেন। এর মধ্যে ওকে গয়না পছন্দ করান হচ্ছে! বাঁদর কোথাকার!—"

লাফিয়ে উঠে পরিমল,প্রসাদ দা'র মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্লে—"আরে, চুপ করো। পাশের ঘরে মা রয়েছেন, —শুনতে পাবেন যে—"

নির্ব্বিকার ভাবে প্রসাদ দা' বল্লেন—"শুনতে পাবেন বলেই বলছি! মামীমাকে তাঁর গুণধর পুত্রের কীর্ত্তির একটু পরিচয় না দিলে আমার যে পাপ হবে।"

হাত দুটো যোড় করে পরিমল বল্লে—"দোহাই তোমার! আর কখনও কিছু তোমার কাছে লুকোব না।"

এবার প্রসাদ দা' শান্তভাবে বল্লেন—"আচ্ছা, এবার তোমায় ক্ষমা করা গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যথা করলেই—বুঝবে মজা! যাক্ এক কপ্ চা আনাও!"

পরিমল ডাক্‌লে—"যদু।"

চাকর এসে দাঁড়াল!

পরিমল বল্লে—"চা হচ্ছে, না?"

যদু বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ।"

পরিমল বল্লে—"শীগ্‌গির দু কপ্ চা নিয়ে আয় দেখি,—আমায় এখুনি বেরুতে হবে।"

প্রসাদ দা' জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় বেরুবে?"

"থিয়েটারে।"

প্রসাদ দা' বল্লে—"আজকে ত সোমবার। প্লে নিশ্চয় নেই।"

পরিমল বল্লে—"না, প্লের জন্যে নয়! জন চারেক নতুন অ্যাকট্রেস্ নেওয়া হবে, আজ তাদের 'ট্রায়েল' হবে।"

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রসাদ দা' বল্লেন—"হুঁ।" একটু পরে আবার বল্লেন—"ট্রায়েল দেবে তাতে তোমার যাবার প্রয়োজন?"

পরিমল বল্লে—"বাঃ, আমার যাবার দরকার নেই?—মিটিং হবে, আমি সেক্রেটারী, আমার অপিনিয়ন দিতে হবে।—কত মাহিনেয় নেওয়া যেতে পারে; এই সবের মীমাংসা করতে হবে।"

গম্ভীরভাবে প্রসাদ দা' বল্লেন—"বটে! আমি কিছু বুঝি না, না? রোসো রিণাকে গিয়ে বোলতে হচ্ছে যে—ছোকরা ঘন ঘন থিয়েটারে যেতে আরম্ভ করেছে!..."

হো হো করে হেসে পরিমল বল্লে—"ওঃ! খুব লোক

তুমি! তোমার অসাধ্য কিছু নেই! কিন্তু ভয় নেই; বাবাও সেখানে থাকবেন! তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছি!"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে—"দাদাবাবু গাড়ী তৈরী,—বাবু ডাকছেন!"

দুজনে উঠে পড়ল!

* * * *

দিন চারেক পরের কথা।

সেদিন বুধবার। বউবাজারের সার্পেনটাইন লেনের ভেতর দাদামশাই ঢুকলেন! খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীর রোয়াকে কতকগুলি ছোকরাকে বসে গল্প করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে বীরেন রায় কোন্ বাড়ীতে থাকেন? যিনি নটরাজ থিয়েটারে প্লে করেন?"

একটি ছোকরা তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লে—"বীরেনবাবু? ঐ সামনের বাড়ীতে থাকেন!" বলে আঙ্গুল দিয়ে খান তিনেক পরের একখানা বাড়ী নির্দ্দেশ করে দিলে!

দাদামশাই এগিয়ে গিয়ে,—সদর দরোজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলেন—একখানা সাজান ঘর, আর ভেতরে দুজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদামশাই তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—"বীরেনবাবু আছেন কি?"

ভদ্রলোক দুটীর মধ্যে একজন সহাস্যে বল্‌লেন—"ভেতরে আসুন! আমারি নাম বীরেনবাবু!"

দাদামশাই খুসী হয়ে ভেতরে ঢুকলেন!

বীরেনবাবুর বয়স দেখলে মনে হয়, বছর চল্লিশ। রঙ শ্যামবর্ণ, দাড়ীগোঁফ কামান, সুশ্রী চেহারা; চোখে কালো 'সেলুলয়েডে'র চশমা!

অপর যে ভদ্রলোকটী বসেছিলেন, তাঁর বয়েস বীরেনবাবুর তুলনায় অনেক অল্প,—বছর পঁচিশ হবে। তবে রঙ খুব ফরসা আর বেশ সুপুরুষ!

বীরেনবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্‌লেন—"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

দাদামশাই যুত করে বসে, পকেট থেকে একটা পুরোনো 'সেভিং ষ্টিক'-এর কৌটা বের করলেন, এবং তার ভেতর থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে বল্‌লেন—"আমি আসছি শিবপুর থেকে; কিন্তু তা বল্‌লে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি একটী খবর জানবার জন্যে এসেছি।"

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"বেশ বলুন! আমি সাধ্যমত 'ইনফরমেশন' দেবার চেষ্টা করব!"

দাদামশাই বল্‌লেন—"জ্ঞানদাচরণ চট্টোপাধ্যায় আপনাদের থিয়েটারের মালিক না?"

বীরেনবাবু ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

দাদামশাই বল্‌লেন—"তাঁর এক ছেলে পরিমল বলে,—ঐ থিয়েটারে কাজ করেন না?

বীরেনবাবু বল্‌লেন—"হ্যাঁ—করেন, তিনি এই থিয়েটারের সেক্রেটারী।"

দাদামশাই এবার একটু হেসে বল্‌লেন—"আমি এই পরিমলবাবুর সম্বন্ধে কতকগুলি খবর জানতে চাই!" এই বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

বীরেনবাবু এবার একটু নড়ে চড়ে বসে বল্‌লেন—"বেশ! কিন্তু আপনি তাঁদের খবর জানতে চান—তার কারণটা একটু ভেঙ্গে না বললে ত কিছু বুঝতে পারছি না!

দাদামশাই তাঁর সাদা দাড়ি ও গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে বললেন—"নিশ্চয়ই, বলব বই কি! অর্থাৎ,—জ্ঞানদাবাবুর ছেলে—এই পরিমলের সঙ্গে আমার একটী নাতনীর বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে!"

বীরেনবাবু এবার একগাল হেসে বল্‌লেন—"তাই বলুন, আমি এতক্ষণ অন্ধকারে ঘুরছিলুম।" বলে অপর যুবকটীর দিকে চাইলেন!

সেও উৎকর্ণ হয়ে এঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল! বীরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হাসলে!

বীরেনবাবু আবার আরম্ভ করলেন—"আপনি তা হলে পরিমলবাবুর দাদাশ্বশুর হবেন—কেমন? বেশ, এবার কি কি জানতে চান, বলুন! ছেলেটীর চরিত্র কেমন? স্বভাব কেমন? এই না?" বলে দাদামশাইয়ের দিকে চাইলেন।

দাদামশাইও একগাল হেসে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"ঠিক তাই!"

বীরেনবাবু বলে যেতে লাগলেন—"আমি যতদূর জানি পরিমলবাবু পাত্র হিসাবে খুব 'ডিজায়ারএবল।' অতি বিনীত স্বভাব, আর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক!—একটা সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না। ভারি তোখোড় ছেলে—এই বয়সেই দু দুটো কারবার 'ম্যানেজ' করছে! মানে—এক কথায় ছেলেটী অতুলনীয়!" বলে সেই যুবকটীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"কেমন হে, ঠিক বলি নি?" সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসলেন।

উত্তরে সে বল্লে—"হ্যাঁ, 'জাষ্ট এণ্ড ইমপার্শিয়েল'।"

কিন্তু কথাটি সে এমন একটী ভঙ্গীতে বল্লে, যার মানে—ব্যঙ্গ অথবা প্রকৃত—দুইই ধরা যায়!

বীরেনবাবু কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন,—বাধা দিয়ে যুবকটী বল্লে—"বীরেন দা', দশটা বাজে; আমায় এখুনি উঠতে হবে। 'কাইণ্ডলি' সেই 'ম্যানেসক্রিপ্'টা এনে দিন।"

বীরেনবাবু বল্লেন—"আচ্ছা, দিচ্ছি এনে।" তারপর দাদামশাইয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আপনার আর কিছু জানবার থাকে ত বলুন? তার বিষয় সম্পত্তির খবর সব জানেন আশা করি?"

দাদামশাই বল্লেন—"হ্যাঁ, তা জানি, অগাধ পয়সা। —না, আর কিছু জানবার আমার নেই? তবে একটা কথা—" বলে একটু ইতস্ততঃ করে আবার বল্লেন—"আপনার এই খবরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি ত?"

বীরেনবাবু দাদামশাইয়ের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে বল্লেন—"নিশ্চয়ই?" সঙ্গে সঙ্গে চোখটি ফিরিয়ে যুবকটীর দিকে চাইলেন।

মনে হলো উভয়েরই ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসি খেলা করে গেল। দাদামশাইয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেটা এড়াল না।

দাদামশাই বিদায় নেবার একটু পরেই—যুবকটীর হাতে এক তাড়া খাতা দিতে দিতে সহাস্যে বীরেনবাবু বল্লেন —"একবার ভাবলুম বুড়োকে দিই সব ফাঁস করে।"

যুবকটীও হেসে বল্লে—"হতো মন্দ নয়। যাক্, আমি তা হলে এখন উঠি।" বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

বউবাজার ষ্ট্রীটের ওপর ট্রাম 'ষ্টপে'র কাছে এসে যুবকটি দেখলে দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে গিয়ে সে বল্লে—"ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?"

দাদামশাই ফিরে যুবকটীকে দেখে বল্লে—"এই যে আপনি? হ্যাঁ, ট্রামের জন্যেই।"

যুবকটী বল্লে—"কতদূর যাবেন? শিবপুর?"

দাদামশাই বল্লেন—"না, একবার কালীঘাটে যাব—সেইখানেই আমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী। আপনি কত দূর?"

যুবকটি বল্লে—"আমায় একবার ধর্ম্মতলায় যেতে হবে, তারপর থিয়েটারে।"

দাদামশাই বল্লেন—"আপনিও থিয়েটারে কাজ করেন না কি?"

যুবকটী সহাস্যে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি একজন আর্টিষ্ট।"

দাদামশাই বল্লেন—"বটে! তা আপনার নামটী জানতে পারি কি?"

যুবকটী বল্লে—"বিলক্ষণ! আমার নাম নলিনী-রঞ্জন চাটুর্য্যে।

এমন সময় একখানি ট্রাম এসে দাঁড়াল। নলিনীবাবু, দাদামশাইকে বল্লে—"আসুন, ওঠা যাক্।"

দুজনেই ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলেন। একটু পরে নলিনীবাবু দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর, পরিমলবাবু সম্বন্ধে সঠিক খবর পেলেন ত?" বলে একটু হাসলে।

দাদামশাই বল্লেন—"কেন বলুন ত নলিনীবাবু,—কিছু কি—" বলে তার দিকে উৎসুক ভাবে চাইলেন।

নলিনীবাবু একটু হেসে বল্লে—"বীরেনবাবু সবই বলেছেন, তবে একটু কাপড় পরিয়ে—এই যা তফাৎ।" বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দাদামশাইয়ের দিকে চাইলে।

দাদামশাই আগ্রহের সঙ্গে বল্লেন—"মানে?"

নলিনীবাবু এবার একটু কুণ্ঠিত ভাবে বল্লে—"দেখুন, সব ভেঙ্গে বলতে গেলে আপনার হয়ত লাভ হবে

প্রচুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে !"

দাদামশাই যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন ! বল্লেন—"ভেঙ্গে বল্লে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তার মানেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।"

নলিনীবাবু একটু হেসে বল্লে—"বুঝতে পারলেন না ? অর্থাৎ, কথাটা আমি বলেছি তা যদি প্রকাশ হয়, তা হলে আমার চাকরীটি রাখা দুষ্কর হবে।"

দাদামশাই ব্যস্তভাবে বল্লেন—"পাগল হয়েছেন। এ খবর তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠবে না। আমায় ব্যাপারটা খুলে বলো ভাই—" বলে নলিনীবাবুর হাতটা চেপে ধরলেন !

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে, বিনীতভাবে নলিনীবাবু বল্লে—"আমায় অত করে বল্তে হবে না। আপনাকে ভালমানুষ দেখে আমি নিজে থেকেই তো বল্তে চাইলুম ! বিশেষ করে একটা মেয়ের সারাজীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে যখন কথা।—কেমন নয় কি ?"

দাদামশাই সোৎসাহে বললেন—"নিশ্চয়ই। এ হিন্দুর বিয়ে, একবার হয়ে গেলে আর বদ্‌লাবার কোন উপায় নেই। হাজার ছেলে বদ্ হোক আর শাশুড়ী জঞ্জাল হোক—।"

নলিনী বললে—"ঠিক তাই। এ যেন গাছ থেকে ফল পড়ার মত। একবার বোঁটা থেকে ফলটা খসে পড়লেই হোল,—তারপর হাজার চেষ্টা করুন আর কিছুতেই সে ফল বোঁটায় লাগাতে পারবেন না। যাক্, পরিমলবাবুর আসল ইতিহাসটা তা হলে শুনুন।" বলে সে চারিদিক একবার চেয়ে নিলে যে, পরিচিত কেউ আছে কি না,—তারপর অতিনিম্নস্বরে দাদামশাইকে সবিশেষ শোনালে ! শুনতে শুনতে দাদামশাইয়ের একবার করে চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠ্‌ছিল এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি নলিনীবাবুর এই কথাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বলেই যেন গ্রহণ করেছেন !

কথা শেষ করে নলিনীবাবু বল্লে—"শুনলেন ত !"

দাদামশাই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"ঠিক ! আপনি যা বল্লেন তা খুবই সত্যি এবং সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে !"

নলিনীবাবু সহাস্যে বল্লে—"বীরেনবাবুর কাছে সব শোনবার পর, আপনার মুখ দেখে মনে হলো, আপনি সব বিশ্বাস করতে পারেন নি—কেমন, নয় ?"

দাদামশাই বল্লেন—"ঠিক ধরেছ ! আমরা হাজার হলেও বুড়ো মানুষ, লোক ঘেঁটে ঘেঁটে চুল পেকে গেল আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া কি সহজ হে।" বলে একটু গর্ব্বিত দৃষ্টিতে নলিনবাবুর দিকে চাইলেন !

নলিনীবাবুও বেশ উৎফুল্ল ভাবে থিয়েটারী ভঙ্গীতে বল্লে—"নিশ্চয়ই ! আমাদেরও দেখুন না, 'সাইকোলজিক্যাল পার্ট প্লে' করে করে এমন একটা 'পাওয়ার' এসে গেছে যে, লোক দেখলেই বলে দিতে পারি তার মনের কথা !"

ট্রামখানা ততক্ষণে এস্প্লানেডে এসে পৌঁছে গিয়েছিল ! নামবার মুখে নলিনীবাবু বিনীত ভাবে আবার বল্লে—"দেখবেন দাদামশাই, আমার নামটা যেন প্রকাশ না হয়।"

দাদামশাই ব্যস্তভাবে বল্লেন—"আরে, না না, এ খবর তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমায় ধন্যবাদ ভাই নলিনী না পরিমল—কি বোলব !" বলে সহাস্য দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চাইলেন। ...পরিমল স্তব্ধ হয়ে গেল !

মাথার ওপর আচমকা একটা লাঠি মারলেও বোধ হয় পরিমল অতটা চমকাত না, যতটা সে দাদামশাইয়ের কথায় চমকে উঠল ! দাদামশাই তা' হলে আগাগোড়া তাকে চিনে এসেছেন, আর সে আহাম্মুকের মতন চালাকী করতে গিয়েছিল ! ওঃ ! কি ঠকানটাই দাদামশাই আজ তাকে ঠকালেন ! তারপর এই খবর বৌদিদের কানে উঠবে, রিণা শুনবে, প্রসাদ দা' শুনবে ! সে আর ভাবতে পারলে না !

দাদামশাই তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। পরিমল যেন সম্বিতহারা হয়ে গিয়েছিল, লজ্জায় মাথা তোলবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না।

পরিমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি আমায় গোড়া থেকেই চিনতে পেরেছিলেন ?"

দাদামশাই হাসতে হাসতে বললেন—"হ্যাঁ হে চালাক ছেলে। বীরেনের সঙ্গে আমার আজকের চেনা নয়। ছেলেবেলা থেকেই সে মানুষ হয়েছে শিবপুরে, বুঝলে ? আর তোমাকে চিনলুম তোমার অফিসে গিয়ে, তুমি অবশ্য আমায় দেখ নি। তারপর বীরেনের বাড়ীতে গিয়ে তোমায় দেখে, একটু রগড় করতে ইচ্ছা হলো, আর বীরেনও দেখলুম তাতে বেশ যোগ দিলে। আর অভিনয়ও একবারে চমৎকার !"

এতক্ষণে পরিমলের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। উঃ, বীরেন দা' কী দুষ্ট! পরিমল দাদামশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—"হাজার হলেও—আমরা কাঁচা, আপনাদের পাকা বুদ্ধির সঙ্গে পারবো কেন? কিন্তু দোহাই দাদু, একথাটা যেন ওখানে প্রচার করবেন না। তা হলেই আমার আর রক্ষে নেই !"

হাসতে হাসতে দাদামশাই বললেন—"বটে! কিন্তু আশ্বাস খুব দিতে পারছি না।—"

এমন সময় কালীঘাটের ট্রাম এসে দাঁড়াল। দাদা-মশাই বসে পড়ে বললেন—"তা' হলে চললুম ভাই।—আর একটি ভাল পাত্রটাত্র পাও ত খবর দিও। ওখানেত আর নাতনীটার বিয়ে জেনে শুনে দিতে পারি না, কি বল ?"

লজ্জায় পরিমল ঘাড় হেঁট করে রইল ;—কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছিল। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠলো !......

শ্রীপান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র-বার্ত্তা

প্রকৃতির একটী অমূল্য সম্পদকে মানবের ভৃত্যরূপে ব্যবহার করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভগবান বিবস্বান মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ সূর্য্যতাপ অপচয় হয়, তদ্বারা সাতহাজার তিনশত অশ্বশক্তির একটী ইঞ্জিন চলিতে পারে।

* * *

সূর্য্য তেজকে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই মানবের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই। প্রায় সতের শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের মহামানব আর্কিমিডস কয়েক খণ্ড কাঁচের সাহায্যে বিশ্ববিজয়ী রোমের নৌবহর ভস্মীভূত করিয়া-ছিলেন। সতের শত সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক তিনশত খণ্ড কাঁচের সাহায্যে দুইশত ফিট দূরবর্ত্তী এক বনে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর জর্ম্মানীর ড্রেসডেন নগরে এক বৈজ্ঞানিক কতকগুলি দর্পণ চক্রাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া একটী সৌরতাপ-যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ইহাতে এরূপ তাপ কেন্দ্রীভূত হইত যে, দুই সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন ধাতু গলিত হইয়া জলবৎ দ্রব হইয়া যাইত।

ভৌতিকগল্প

মায়া

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যা উতরে গেছে। কোলকাতার ভীষণ হট্টগোলময় একটা রাস্তা। 'কুলপি বরফ', 'বেলফুল মালা' ইত্যাদি চীৎকারে পাড়া মুখরিত। প্রতীপ বসে আছে নিজের ঘরে, কিন্তু মন তার ছুটে চলে গেছে কোনও এক ছায়া সুনিবিড় শান্ত পল্লীর নিভৃত কুটীর প্রান্তে। থেকে থেকে উৎসুক চোখে রিষ্টওয়াচের পানে চাইছে আর নিঃশব্দে হাতের চুরুটটা নিঃশেষ করছে। পাশে তার বেডিং, সুটকেস, ফ্লাস্ক, মেডিসিন বাক্স ইত্যাদি ছড়ান রয়েছে। এমন সময় ঘরে ঢুকল তার প্রিয় বন্ধু অলর্ক। মৃদু হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে সে শুধালে, "কি হে যোগী,—কার ধ্যানে মগ্ন, নামটা শুনতে পাই নে?"

চমকে উঠে প্রতীপ বললে, "আরে, অলর্ক যে! কবে বাড়ী থেকে ফিরলি ভাই? আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজে আজ বিদেশ যেতে হচ্ছে।"

অলর্ক বললে, "আয়োজন দেখে তাই ত বুঝছি; কিন্তু কোথায়?"

প্রতীপ পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে অলর্কের হাতে দিলে। অলর্ক পড়তে লাগল—

"শ্রীচরণেষু,

প্রতীপ দা', তুমি কেমন আছ? আশা করি ছোট বোনটিকে একেবারে ভুলে যাও নি। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর আমার চিঠি পেয়ে তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিধাতার লীলাক্ষেত্রে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। মানুষের জীবনের কখন যে কি মুহূর্ত্ত আসে, তা কেউ বলতে পারে না। আমার জীবনে এসেছে এখন ভীষণ অশুভ মুহূর্ত্ত, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে আজ পাঁচদিন হ'ল, আমার বুক ছেঁড়া খুকুমণি আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে খোকাটী ভুগছে। স্বামীর শরীর ভাল নয়। এই ভীষ দারিদ্র্য সংগ্রামের সঙ্গে আমি একলা আর যুঝতে পারছি ভাই। তুমি ডাক্তার, শুনেছি খুব নাম করেছ, আমা তুমি আগে বড় স্নেহ করতে, সেই অধিকারে আ আমার এই বিপদের দিনে তোমায় ডাকছি। আগে দুট ভাইবোনে ছিলাম ত বেশ, একসঙ্গে কলেজ যাওয়া সিনেমা যাওয়া, গল্প করা, তারপর ভাগ্যের মোড় গে ঘুরে, তুমি দিলে সমুদ্রে পাড়ি, আর আমার ভাগ্য আমা দান করলে, একটী অজানা অচেনা নবীন বন্ধু, তারপর আরও অনেক কিছু—কিন্তু থাক ভাই, আর লিখব না। নিশ্চয় করে এস, মোটে দেরী কোর না। প্রণাম নিও। ইতি,

অভাগিনী

প্রবাহিনী"

চিঠিখানি শেষ করে অলর্ক প্রতীপের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "মনে পড়েছে। সেই প্রবাহিনী চৌধুরী, তোর বাড়ীতে রোজ কলেজ আসত? আহা, সত্যি বড় দুঃখ হয় ভাই তার জন্য! তুই কি আজই যাবি?"

প্রতীপ বললে, "নিশ্চয়! কিন্তু কেন জিগ্যেস করছিস?"

অলর্ক বললে, "ওই গ্রামে আমার এক মামা আছেন। তুই যদি কাল যেতিস, তা' হলে কিছু কিনে দিতুম তাঁর জন্য! তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। একটা দিন অপেক্ষা করবি ভাই?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রতীপ বললে, "তাতে কি হয়েছে ভাই, বেশ, কালই তবে যাব।"

রাত্রি তখন প্রায় বারটা। ছোট্ট একটী ষ্টেশনে ট্রেণ থামতেই, প্রতীপ নেমে পড়ল। নীরব নিস্তব্ধ প্ল্যাটফরম। দূরে দূরে কেরোসিনের বাতিগুলি ঠিক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। না আছে একটা কুলী, না আছে ভাড়াগাড়ী, একেবারে অজ পাড়াগাঁ। প্রতীপের মনটা মুসড়ে গেল। এক হাতে টর্চ্চ আর একহাতে সুটকেস নিয়ে সে হন্‌হন্‌ করে গাঁয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। সহসা তার পিছন থেকে একটী মেয়ে বল্‌লে, "ও পথ ভুল প্রতীপ দা', ওদিকে যেও না। উঃ, আমি কতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছি তোমার জন্য!"

চমকে উঠে প্রতীপ বললে, "এ কি প্রবাহিনী, তুমি! এখানে একলা গাছতলায় দাঁড়িয়ে, সঙ্গে কেউ আসে নি?"

প্রতীপ কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সে মেয়েটী সত্যই প্রবাহিনী। কিন্তু বিশ্বাস তাকে করতেই হল। একবার যাকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চেনা যায়, তাকে কি কখনও মানুষ ভুলতে পারে? খিলখিল করে হেসে উঠে প্রবাহিনী বললে, "ভয় পেয়েছ, নয় প্রতীপ দা'? আমি না এলে তুমি কেমন করে বাড়ী চিনে যেতে বল ত? ঠিকানাটাও লোকে আনে ত। যাক, এস আমার সঙ্গে।"

তার পিছনে যেতে যেতে টর্চ্চ ফেলে প্রতীপ তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, প্রবাহিনী অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে। চুলগুলি বড় রুক্ষ। বাতাসের সাথে সমান তালে নাচছে। কিন্তু তার চিঠিখানি যে সে আনে নি প্রবাহিনী তা বল্‌লে কি করে? পকেটে হাত দিতেই সে শিউরে উঠল, তাই ত ও কি অন্তর্য্যামী। তার মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ হতে লাগল। সেই নির্জ্জন আঁধার পথে তার সঙ্গে যেতে কি জানি কেন তার গাটা ছমছম করে উঠ্‌ল। প্রবাহিনী ভদ্রঘরের কুলবধূ হয়ে এত রাত্রে পথে বেরুল কেমন করে? পরক্ষণেই মন বলে উঠল, "না না, সে কি কখনও হতে পারে? প্রবাহিনী যে তাকে ভালবাসে, সে ভালবাসা স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত পুষ্পের ন্যায় চির সুগন্ধময়, চির পবিত্র, চির অমর। রাত্রে পাড়াগাঁয়ে চলা অনভ্যস্ত প্রতীপ পথে কষ্ট পাবে বলে, সে সমস্ত সরম ভীতি ত্যাগ করে তাকে নিতে এসেছে।"

প্রতীপের চিন্তাজাল ছিন্ন হোল, "ও কি প্রতীপ দা', তুমি যে একেবারে পিছিয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি পা চালাও—"

প্রতীপ লজ্জিত হয়ে ছুটতে সুরু করে দিল। বললে, আমি আর পারছি না প্রবা, আর কতদূর যেতে হবে?"

একটী দেবদারু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী বললে, কষ্ট হচ্ছে প্রতীপ দা'? কিন্তু আমার কষ্ট যদি জানতে!"

তা বটে! নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথাটা তার এতবড় করে দেখা উচিত হয় নি। লজ্জিত হয়ে সে বললে— "তোমার ছেলেটি কেমন আছে প্রবা? কর্ত্তার কাছে তাকে রেখে এসেছ বুঝি?"

প্রবাহিনী হেসে উঠ্‌ল। কী অস্বাভাবিক সে হাসি! হঠাৎ তার মনে হোল ভারী করুণ স্বরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। ভীষণ অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন, একটা বিকট দৈত্য তার কালো ডানায় সমস্ত আলো লুকিয়ে রেখেছে। শুধু ঝোপের ভিতরকার ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত গান শুনে তবুও একটু ভরসা

হয়, মনে হয় পৃথিবীর চেতনা বুঝি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। বিনিয়ে বিনিয়ে সেই করুণ কান্না প্রতীপকে পীড়া দিতে লাগল। সে প্রবাহিনীকে ডাকতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক। কম্পিত হাতে টর্চ্চটা জ্বালতেই তার উজ্জ্বল আলোয় প্রতীপ স্পষ্ট দেখলে—অদূরে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী কাঁদছে। কোলে তার একটি সুন্দর শিশু।

এ শিশু কোথা থেকে এলো! প্রবাহিনীর সঙ্গে ত কেউ ছিল না। ভাল করে আর একবার দেখবার আগেই হাতটা শিথিল হয়ে টর্চ্চটা মাটীতে পড়ে গেল।

প্রতীপ ভয়ে চীৎকার করে উঠলো, "প্রবা, প্রবাহিনী!"

প্রবাহিনী মৃদুকণ্ঠে বললে, "কি প্রতীপ দা', এই ত আমি রয়েছি। ভয় পেলে না কি? আমি মেয়ে মানুষ, আমার ভয় হয় না, তোমার এত ভয়!"

সত্যাই ত! প্রতীপ নিজেকে সংযত করে নিলে। মনের দুর্ব্বলতা কত মিথ্যা বিভীষিকাই না সৃষ্টি করে! সে ধীরে ধীরে টর্চ্চটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললে, "সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম প্রবা, তুমি যখন সঙ্গে রয়েছ, আর ভয় করব না আমি।"

প্রবাহিনী বললে, "সহরে লোক, পাড়াগাঁয়ে ত আস নি কখনও, ভয় পাবারই কথা। প্রথম আমি যখন শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে আসি, তখন তোমার চেয়েও বেশী ভয় ছিল আমার। তখন রাস্তায় বেরুন ত দূরের কথা দাওয়ায় পর্য্যন্ত একলা বেরুই নি। আচ্ছা প্রতীপ দা', কোলকাতায় এখন তেমনি ট্রাম চলে, তেমনি মটরের হুড়াহুড়ি হয়, মেয়েরা তেমনি পড়তে যায়। এ কবছরে সব যেন আমি ভুলে গেছি।"

ছোট কথাটির মধ্যে যে জীবন-যুদ্ধে পরাজিতার কতবড় বেদনা লুক্কায়িত আছে, তা বুঝতে প্রতীপের বাকী রইল না। সে, সে কথা না তুলে অন্য কথা পাড়ল, বললে, "জামাইবাবু কি করেন প্রবা?"

"করেন না, করতেন বল! বেশী কিছু নয়, পাড়াগাঁয়ে লোক যা করে, জমি-জিরেৎ ভোগদখল, গল্প-গুজব, তাস-পাশা। আর জমীদারের সেরেস্তায় হিসাব নবীশি। কাটছিল মন্দ না, বেশ ছিলুম।"

"তারপর..."

"তারপর কোথা থেকে এল কাল জ্বর, চাকরী গেল, হাতে পয়সা না থাকলে যা হয়ে থাকে, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' আর কি! কিন্তু ঘিও জুটল না, লাভে জমিগুলো অন্যের ঘরে উঠল। তোমার ত অনেক পয়সা, লোকজনও ত রেখেছ, ওঁকে কি তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখতে পার না। বলতুম না, ভুগে ভুগে এমন হয়েছে, বোধ হয় আর বাঁচবেও না। তুমি না দেখলে··"

প্রতীপ হেসে বললে, "যদি তোমার না কষ্ট হয়, আমার আপত্তি নেই নিয়ে যেতে।"

"কষ্ট, আমার?" প্রবাহিনীর হাসির শব্দ প্রতীপের কানে এসে বাজল। সে বললে, "আঃ বাঁচলুম! কথা দিলে ত প্রতীপ দা'?"

"দিলাম বই কি প্রবা!"

প্রবাহিনী একটা জরাজীর্ণ পোড়োবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, "এই আমার বাড়ী। তুমি সামনের ফটক দিয়ে ঢোক।"

প্রতীপ বললে, "তুমি!"

"বৌ যে, খিড়কী দিয়ে যেতে হয়, জান না"—বলে মৃদু হেসে প্রবাহিনী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রতীপ দাঁড়ালো। সে বাড়ীতে জনমানব বাস করে বলে বিশ্বাস করা দায়। থমকে সে কয়েক মিনিট চেয়ে রইল। তারপর দরজা খোলা দেখে ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কুচিত পদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করল। সিঁড়ির পাশে একটী ছোট কুঠুরী—তাকে ঠিক ঘর বলা চলে না—তাতে একটি আমকাঠের তক্তাপোষের উপর একটী জীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি বসেছিল। ঘরে আলো ছিল না। প্রতীপ টর্চ্চের সাহায্যে তাকে আবিষ্কার করলে। ঘরে ঢুকে সে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার নাম কি দিলীপ বাগচী?"

দিলীপ তার পানে চেয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

তার মুখ দেখে মনে হয়, বয়স বড়জোর বছর ত্রিশের বেশী নয়। চেহারা এককালে বোধ হয় সুন্দরই ছিল, কিন্তু এখন তার ছাইয়ের মত গায়ের রং, হাড় বার করা নাক, কোটরাগত চোখ, ভাঙ্গা গাল—দেখে মনে হয়, একটী অতি সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। প্রতীপ বললে, "নমস্কার।"

ঠিক তেমনইভাবে বসে দিলীপ হাত তুলে প্রতি নমস্কার করে বললে, "আপনার নাম?"

"শ্রীপ্রতীপ চৌধুরী।"

দিলীপ সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, "কি বললেন, প্রতীপ চৌধুরী? আপনি কি কোলকাতা থাকেন? ডাক্তার কি আপনি?"

প্রতীপ বললে "হ্যাঁ তাই।"

সে বুঝতে পারলে প্রবাহিনীর কাছে দিলীপ তার কথা শুনেছে।

সহসা দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি এসেছেন, সত্যই এসেছেন? কিন্তু অন্ততঃ কালও যদি আসতেন! সে আপনাকে দেখলে বড় খুসী হ'ত!"

সবিস্ময়ে প্রতীপ বলে উঠল—"হ'ত কি বলছেন!"

"ঠিকই বলছি ডাক্তারবাবু, সে আপনাকে একবার দেখ্‌বার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পথ পানে চেয়েছিল। চলুন এখন একবার তার কাছে, তবু যদি সে শান্তি পায়।"

দিলীপের নির্দ্দেশমত বাইরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রতীপ চীৎকার করে উঠল। দিলীপ বললে—"ও ঠিকই করেছে ডাক্তারবাবু, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে নিজের চোখের ওপর যার ছেলে মেয়ে মরে, তার পক্ষে এর চেয়ে আর ভাল ব্যবস্থা কি হতে পারে বলুন। আজ সকালে এ দৃশ্য দেখা থেকে কেবলই ভাবছি, এ ভাল হয়েছে, এ ভালই হয়েছে!—"বলতে বলতে তার কণ্ঠে আর ভাষা সরল না।

প্রতীপ আর একবার দৃষ্টি তুলতেই দেখলে—বারান্দার ছেলেদের খাটানো দোলনার দড়িতে প্রবাহিণীর দেহলতা দুলছে। সুন্দর মুখখানি—বীভৎস—ভয়াবহ হয়ে উঠেছে!...

পরদিন দিলীপকে নিয়ে প্রতীপ কলকাতা রওনা হ'ল। চোখে রইল অফুরান অশ্রু!

শ্রীকৃষ্ণপ্রভা দেবী

বিচিত্র-বার্ত্তা

শুনিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রায় ৫০০০০০০০০০০০০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ পড়িয়া আছে, অথচ তাহা ভোগ করিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। মানবের কল্যাণে এ বিপুল সম্পদকে নিয়োজিত করিবার উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যিনি এ কার্য্য করিবেন, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হইবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু 'হু ইজ্‌ টু বেল্‌ দি ক্যাট্?' অর্থাৎ, ঘণ্টা বাঁধে কে? সমুদ্র জলে এই স্বর্ণ মিশ্রিত আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন টেলিফোন কোম্পানী ঠিক বেলা তিন ঘটিকার সময় প্রত্যেক টেলিফোনে ডাকিয়া বলে যে, যদি আপনার কিছু ক্রয়-বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, নূতন চাকরের প্রয়োজন হয়, কোন জিনিষ হারাইয়া থাকে, কোন হারাণ জিনিষ পাইয়া থাকেন, যদি কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে টেলিফোন কোম্পানীকে সংবাদ দিবেন। আমরা সকল কাজ ফেলিয়া আপনাদের সহায়তা করিব।

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরো
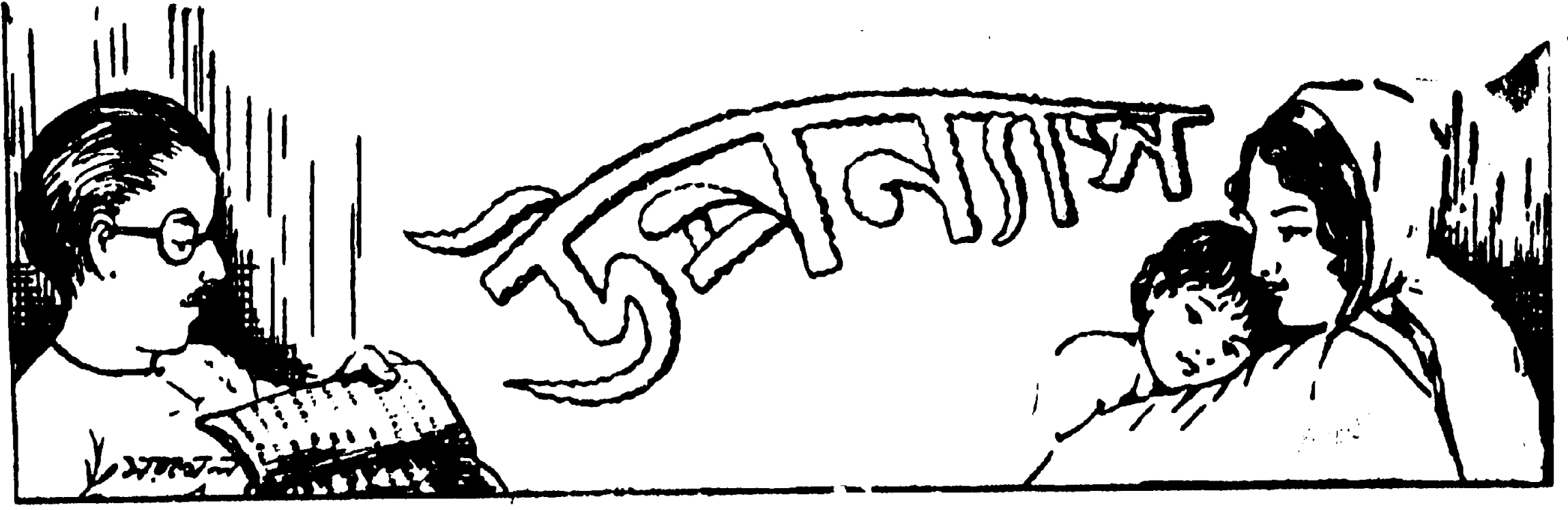
হাওড়া ষ্টেশনের নিকট গাড়ীটা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখনও সরযূর হুঁস্ হয় নাই। গাড়োয়ানের ডাকে অজয়ের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেই সে সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল— গাড়ী ষ্টেশনে এসে পৌঁচেছে—আমরা কোথায় যাব সরযূ?

প্রশ্নটা যত সোজা, উত্তর দেওয়া কিন্তু ততটা নয়। সরযূর মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বাহির হইয়া আসিল— কোথায়ঃ যাবো?

কাল রাত্রি হইতে আজ এই কতক্ষণ পর্য্যন্ত সে শুধু ভাবিয়াছে কোথায় যাইবে? কোথায় গেলে তাহার চিন্তার অবসান হইবে। কিন্তু প্রশ্নই জাগিয়াছে—উত্তর মিলে নাই। পৃথিবীর মধ্যে আশ্রয়-স্থল তাহার আর যে কোনস্থানে আছে ইহা সে ভাবিয়া পায় নাই।

ভূপালীর কথা বারবার মনে হইয়াছে—কিন্তু শেফালীর অফুরন্ত স্নেহধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর একজনকে হারাইবার সাহস তাহার হয় নাই, তথাপি বোধ হয় সে ভূপারই কথা স্মরণ করিয়াই হাওড়া ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল।

মধ্যপথে কি জানি কেন হঠাৎ মনে হইল সেখানে যাওয়া তাহার হইবে না। তবে সে যাইবে কোথায়?

গাড়োয়ান হাঁকিল—এখানে গাড়ী আর কতক্ষণ দাঁড়াবে বাবু, না নাম্‌লে পুলিশে ফাইন করে দেবে।

তাই ত! সরযূ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। তারপর অজয়কে নামাইয়া লইয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ষ্টেশনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল।

মনে পড়িল—পিতার কথা! জীবনের যাত্রাপথের শেষ সীমায় আসিয়া ব্যাচারী শ্রান্ত অবসন্ন হৃদয়েই বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন।

তাঁহাকে বিব্রত করিবার কল্পনাও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়া সে এ দুর্দ্দিনে দাঁড়াইবেই বা কোথায়? অজয়ের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মমতার বেদনায় তাহার সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল! শিশুর মত অসহায় এই লোকটার প্রতি দৃষ্টি যে তাহাকে দিতে হইবেই। নিজের দিকটা না হয় নাই ধরিল—কিন্তু অজয়কে লইয়া একটা স্থানে আশ্রয় না লইলেই যে নয়।

মেয়েদের টিকিট ঘরের সাম্‌নে আসিতেই সহসা সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর কাশীর দুইখানা টিকিট কিনিয়া লইয়া—প্লাটফর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইল। আর বিলম্ব নাই, এখনই বেনারসগামী একখানি গাড়ী ছাড়িবে। রেলের নির্দ্দেশসূচক লাল আলোটা জলিয়া জলিয়া সাধারণের

নিকট গাড়ী ছাড়িবার সময়টা প্রতি মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট করিয়া মনে পড়াইয়া দিতেছে।

জনস্রোতও উন্মত্তবেগে সেইদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সরযূও অজয়কে লইয়া সে জন-প্রবাহের মধ্যে মিশাইয়া গেল। তারপর একখানি ইন্টার ক্লাশের কামরায় ঢুকিয়া পড়িয়া অজয়কে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়া বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অজয় এতক্ষণ কথা কহে নাই, এইবার কহিল, বলিল—কাশীতে আমরা কোথায় যাব সরযূ ?

হাসিতে চাহিয়া সরযূ বলিল—বাবার কাছে যাবো অজয় দা'।

অজয় কি বুঝিল, কে জানে! সে আর কথা কহিল না।

ঘণ্টা দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

* * *

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। এবং রাস্তার দূরত্ব অনুযায়ী যাত্রী সংখ্যাও হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়জন গাড়ীর মধ্যে আছে, তাহারাও নিদ্রাসুখ অন্বেষণে ব্যস্ত।

অজয় শুধু উন্মুক্ত জানালা-পথ দিয়া নিঃসীম আকাশ ও অস্পষ্ট পৃথিবীর মধ্যে যোগসূত্র গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর একটা জানালায় মুখ দিয়া সরযূও চাহিয়া আছে। প্রকৃতির সহিত তাহাদের অন্তরও যেন মূক হইয়া গিয়াছে। অন্তরের অন্তরালে কি কোন ঝড় উঠিয়াছে, কে জানে!

সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সরযূর দৃষ্টি ফিরিয়া অজয়ের দিকে পড়িল। সে দেখিল, একরাশ চোখের জলে তাহার সারা মুখখানি ভাসিয়া চলিয়াছে। সরযূ কহিল—সারারাত বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে অজয় দা', তুমি শুয়ে পড়।

অজয় কথা কহিল না। সরযূ নিজে আর একটু সরিয়া গিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিতে দিতে বলিল—শুয়ে পড় লক্ষীটি, সারারাত বসে থেকে অসুখ হলে কে দেখবে বল ত ? এই ত কালও দেখেছি তোমার গাটা গস্‌গস্ করছে। ও কি, ছেলেমানুষের মত চোখে জল কেন! আমরা মেয়েমানুষ কাঁদতে পারি, তাতে লজ্জাও নেই, কিন্তু তোমার কাঁদলে কি চলে? ছিঃ! কথা শোন! শোও, শুয়ে পড়, জায়গাই নেই শোবার ? নাই রইল, কোলেই মাথাটা থাক—বলিয়া সরযূ পরম যত্নে অজয়কে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল।

এবারও অজয় কথা কহিল না। শুধু তাহার চোখের জল প্রবলবেগে বাহির হইয়া আসিয়া সরযূর উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

সরযূ আর বাধা দিল না, তাহার মৌন বেদনার নীরব সাক্ষী হইয়াই যেন বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

* * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেনারস ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। অন্য যাত্রীদের সহিত সরযূও নামিয়া পড়িল। অধিকাংশ লোকই বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন মানসে চঞ্চল! সরযূর সে বালাই ছিল না, সে সবার পশ্চাতে ধীরে ধীরে ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা এক্কাওয়ালা সরব চীৎকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কুলীর মাথা হইতে মোট্‌টা একরূপ ছিনাইয়া লইয়া গাড়ীতে তুলিতে তুলিতে—চলিয়ে মায়ীজী, বাঙালী ধর্ম্মশালায় এখনই পৌছে দেব আমি—বলিয়া একরূপ জোর করিয়াই তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া লইল!

সরযূ বলিল—ধর্ম্মশালায় নয়, 'গনেশ মহাল্লা'য় নিয়ে চল তুমি।

গণেশ মহাল্লার উদ্দেশ্যে গাড়ী ছুটিল।

সরযূর মন তাহার পূর্ব্বেই শুধু গণেশ মহল্লায় নয়, তাহার একান্ত পরিচিত একখানি গৃহে গিয়া উপনীত হইয়াছে।

রাস্তার নিকটেই তাহাদের বাড়ী। সেইখানে আসিতেই, গাড়ী দাঁড় করাইয়া সরযূ তড়তড় করিয়া নামিয়া পড়িল। এবং অজয়কে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই একেবারে গলির মধ্যে ঢুকিয়া গেল। যখন বাড়ীতে পৌছিল, তখন বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবু বারান্দায় বসিয়া

গীতার কি একটা অধ্যায়ের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু দৃষ্টির সল্পতা প্রযুক্ত বারবার তাহা ব্যাহত হইতেছিল। সরযূ তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেই, কে? কে? বলিয়া তিনি চমকিরা উঠিলেন।

আমি সরযূ! চিন্তে পারছেন না বাবা?

ওঃ সরযূ। সব ভাল ত মা, অমর কই? তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস্ বুঝি? না, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। যা যা, না থাক, আমিই তাকে নিয়ে আসছি। চোখের আর সে জোর নেই মা, যে, ছুটে যাবো। বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিলেন। সরযূ বাধা দিয়া বলিল—সে আসে নি বাবা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

সে আসে নি! বৃদ্ধ বিস্ফারিত নয়নে একবার ভাল করিয়া কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবে একা তুই কেমন করে এলি মা? ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?

একা নয়, অজয়বাবু সঙ্গে এসেছেন। দাঁড়ান, তাকে গাড়ী থেকে নিয়ে আসি আমি বলিয়া তাঁহার শেষ কথার উত্তর না দিয়াই সরযূ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বৃদ্ধ তাহার গমন-পথটার দিকে অর্থহীন-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

চৌদ্দ

পরিচয়-পর্ব্বটা কোন রকমে সমাধা হইয়া গেল। বৃদ্ধ সত্যজিৎ কন্যার অনুরোধ সত্ত্বেও আর বাড়ী বসিয়া রহিলেন না; বাজার করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরিলেন, তখন একা নহে, সঙ্গে একটী চাকর ও তাহার মাথায় একরাশ আনাজ-পত্র, চালদাল, নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষে ভরা।

সরযূ কহিল—এ কি করেছেন বাবা? একেবারে সব বাজার ঝেঁটিয়ে এনেছেন যে।

সত্যজিৎ বলিলেন—ঝেঁটিয়ে কোথায় মা, যা নইলে একেবারেই চল্‌বে না, তাই নিয়ে এলুম। দু'চার দিন ত থাক্‌বি এখানে—ঘরে যে কিছুই নেই।

সরযূ হাসিতে চাহিয়া বলিল—এখনই তাড়াতে চান কেন বলুন ত? দু'চার দিন কেন, দু'চার বছর থাক্‌ব বলেই ত এখানে এসেছি আমি।

ভ্রূ কুঞ্চনে বৃদ্ধের চোখের চশমা দুইটা নামিয়া আসিয়াছিল—তিনি সেটাকে যথাস্থানে সংরক্ষিত করিতে করিতে বলিলেন—অধিকার হারিয়েও অধিকার করবার মোহ রাখার নামই যে দুঃখ মা, অমরের হাতে যেদিন তোকে তুলে দিয়েছি, সেদিন থেকে তুই তারই। আমার কল্পনাও থাকা উচিত নয়।

আচ্ছা সে তখন বোঝা যাবে, থাকে কি না। এখন রান্নার যোগাড় করি ত!

সরযূ ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিল।

চাকরটাকে মায়ীজীর আদেশ মত কাজ করিবার উপদেশ দিয়া বৃদ্ধও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি যখন ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়। সরযূ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—বেশ লোক যা হোক, এখনও ঘুরছেন, কখন খাবেন বলুন ত! বড় হয়ে বক্‌তে পারি না কি না, তাই বাড়িয়ে তুলেছেন

হাসিতে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—আমার জন্যে বসে আছিস্? তাও ত বটে, আমার বলে যাওয়াই উচিত ছিল। আমি খাব না মা, মিসিরজীর কাছে এই ত খেয়ে আস্‌ছি আমি।

সরযূর মুখে সপাং করিয়া কে যেন একটা চাবুক মারিল। পাণ্ডুর মুখ দিয়া সহসা তাহার কোন ভাষাই প্রথমটা বাহির হইল না, বহুকষ্টে ঢোক গিলিয়া ধীরকণ্ঠে সে বলিল—মিশিরজী!

হাঁ মা, শেষের দিন কটার সেই ত সঙ্গী আমার। নিজের করবার শক্তিও নেই, উৎসাহও নেই। মিশিরজী...

ওঃ বলিয়া অন্য কোন কথা না শুনিয়াই সরযূ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৃদ্ধ খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দরজার নিকট আসিয়া

দেখিলেন, অজয়কে একখানি আসনে বসাইয়া সরযূ ভাত রাখিয়া খাওয়াইয়া দিতে সুরু করিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিয়া অজয় একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, বলিল—সরযূ না থাকলে না খেয়েই মরতে হ'ত কাকাবাবু, এমনই করে ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু কি লাভ এ বেঁচে থাকায়!

লাভ লোকসান পরে বোঝা যাবে, এখন খাও ত! বসো না বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

না মা, একটু গড়াতে হবে, নইলে শরীর টেঁকবে না। বলিয়া সত্যজিৎবাবু বাহির হইয়া গেলেন। একটা অপ্রসন্নতার ছায়া যেন তাঁহার সারা মুখখানির উপর খেলা করিতে লাগিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তখন সরযূর ছিল না। সে অভুক্তকে আহার করাইতে ব্যস্ত রহিয়া গেল।

* * *

দিন দুই কাটিয়া গিয়াছে। সরযূ বলি বলি করিয়াও সত্যজিৎবাবুকে তাহার বর্ত্তমান জীবনের কথা বলে নাই। কতকটা পিতার মনে বেদনা না দিবার জন্যও বটে, আবার কতকটা ঠিকমত সে অবসর তাহার মিলে নাই বলিয়াও বটে। কেন না, সকল সময়ই বৃদ্ধ ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়াছেন। পিতার এই মায়াজয়ের প্রচেষ্টা দেখিয়া সরযূ কখন হাসিয়াছে, কখন সহানুভূতিতে তাহার সারা অন্তর ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

বহুদিন হইল মা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। একটী ভাই ছিল, সেও নাই। জ্ঞাতি কুটুম্ব বলিতে অনেকে আছেন সত্য, কিন্তু নিজের সংসার লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত! তাঁহার প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? অমর অবশ্য তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন মতেই রাজীহন নাই। কুটুম্বের নিকট কি চিরদিন থাকা চলে! তিনি জোর করিয়াই পেনসনের টাকা কয়টী সম্বল করিয়া কয় বৎসর হইল কাশীতে আসিয়া উঠিয়াছেন, এবং ওপারের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এপারের মায়া এড়াইবার এই যে প্রচেষ্টা, ইহাকে উপেক্ষা করাও ত যায় না।

কিন্তু ইহা ছাড়াও যে আর একটা দিক থাকা সম্ভব, তাহা সরযূর মনেও পড়ে নাই। যখন পড়িল, তখন সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া অন্য কোন পন্থাই খুঁজিয়া পাইল না।

সত্যজিৎ বাড়ী ছিলেন না, পিওন আসিয়া তাঁহার নামের একখানি চিঠি দিয়া গেল। বাবাকে চিঠি লিখিবার মত কে আছে ভাবিয়া না পাইয়া কৌতূহলবশে সরযূ লেফাফাখানি হাতে লইতেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে এবং ইহা লিখিয়াছে যে অমর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে এখানে চিঠি লিখিল কেন? কি তাহার প্রয়োজন!

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই সরযূ পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। অমরই লিখিয়াছে বটে। পড়িতে পড়িতে সরযূর মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাইয়াছে:—আপনার কন্যার সহিত আজ বৎসরাধিক আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের খবর লইবার কৌতূহলও আমার অল্প। তবে কয়দিন পূর্ব্বে তাহারা আমার এখানে আসিয়াছিল—কিন্তু একান্ত কর্ত্তব্য বোধেই তাহাদের এখানে রাখিতে পারি নাই। প্রণত

অমর

অনর্থক হরফগুলার উপর চোখ রাখিয়া সরযূ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কতবার যে সেখানি পড়িল, তা সে নিজেই জানে না। তারপর ধীরে ধীরে সেখানি পিতার শয্যায় রাখিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিক কি ভাবিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল—দুখানা ঘর দেখে দিতে পার লছমন্?

লছমন উনানে আগুন দিয়া আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে। সে বলিল—কাশীতে ঘরের ভাবনা কি মা, এখনই দেব, কিন্তু কার জন্যে?

দরকার আছে—অন্য কাজ আমি করে নেব খন, তুমি ঠিক করে এস, বুঝেছ? ভাড়া তিন চার টাকার বেশী না হলেই ভাল হয়।

লছমন ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অজয় বলিল—ঘর কি হবে সরযূ?

সরযূ হাসিতে চাহিয়া বলিল—যেতে হবে না আমাদের? বা রে, আপনার লোকের কাছে বারমাস থাকতে আছে না কি?

অজয় ব্যস্তভাবে কহিল—কিন্তু এমন আশ্রয় ছেড়ে যাওয়াও যে উচিত নয় সরযূ! তা ছাড়া, উনিই বা কি মনে করবেন!

মনে কি করিবেন সে কথা না ভাবিলেও এস্থান ত্যাগ করা যে উচিত নয় ইহা কি সরযূ জানে না, কিন্তু কতবড় দুঃখে যে আজ তাহাকে যাইতে হইতেছে ইহা প্রকাশ করিবার সুযোগও যে তাহার নাই। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণ প্রযত্নে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—তবু যেতেই হবে অজয় দা', আপনার লোকের বাড়ী তিনদিনের বেশী থাকতে নেই, তাতে মান্য থাকে না। সত্যি নয় কি? বলিয়া সে কোন রকমে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

প্রতিবাদ করিবার শক্তি অজয় হারাইয়া ফেলিয়াছে, কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

* * *

সারা বাড়ীটার মধ্যে যেন কি একটা বিপ্লব সুরু হইয়াছে। বৈকালের দিকে সত্যজিৎবাবু যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন একটা প্রবল ঝঞ্ঝার আলোড়নে তাঁহার সমস্ত অন্তর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মুখখানি শুষ্ক, বিবর্ণ; দুইদিন পূর্ব্বেও তাঁহার শরীরে যে শক্তি ছিল; আজ যেন কে তাহা নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে। একান্ত পথ না চলিলে নয় বলিয়াই যেন তিনি প্রতিদিনকার মত বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইতেছেন।

সরযূ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সত্যজিৎ উদা[illegible] অর্থহীন দৃষ্টিতে সরযূর মুখের পানে চাহিয়া থমকি[illegible] দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

সরযূ মৃদুকণ্ঠে কহিল—আপনি বেড়িয়ে ফিরে এ[illegible] হয় ত দেখা নাও হতে পারে, তাই পায়ের ধূলোটা নি[illegible] রাখি বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিতে গেল কিন্তু সত্যজিৎবাবু ত্রস্তে খানিকটা পিছাইয়া গেলেন সরযূ সবিস্ময়ে মুখখানি তুলিয়া একবার পিতার হৃদয়ে[illegible] অন্তস্থলটা অবধি দেখিয়া লইতে চাহিল। তাঁহার ক্ষমাহী[illegible] মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে সোজা হইয়া উঠি[illegible] দাঁড়াইল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—আপনি আমা[illegible] ছোঁয়া খান্ নি, হয় ত তার যোগ্যও নই, কিন্তু পায়ে[illegible] ধূলো নেবারও কি অধিকার নেই আমার?

বৃদ্ধের জলদগম্ভীরকণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল—না[illegible]

সরযূ এতটুকু বিচলিত হইল বলিয়া বুঝা গেল না। [illegible] ধীরকণ্ঠে বলিল—অজয়বাবুকে লছমন নতুন বাড়ী[illegible] রাখতে গেছে, সে এলেই আমি চলে যাবো, ততক্ষণ য[illegible] না অপেক্ষা করতে পারেন, চাবীটা...

বোধ করি দৃষ্টি শক্তিটা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি[illegible] তাই কোন মতে পথ চিনিয়া চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলি[illegible] উঠিলেন—মিশিরজী, হাঁ, মিশিরজীর কাছেই পাঠি[illegible] দিও ওটা।

বৃদ্ধ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরযূ শূন্য আকাশটার পানে চাহিয়া একবার হাসিল তারপর ধীরে ধীরে ঘরগুলিতে চাবী দিয়া নিজেদে[illegible] অবশিষ্ট বাঁধা পুঁটুলিটা লইয়া সদর দরজার সামনে আসি[illegible] লছমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রথমে গ্রামের ভিতর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু কালের অশ্রান্ত স্রোতে ক্রমে ক্রমে তাহা বিলীন হইল। সরমাকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কেহ বলেন—"সোমত্ত মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে গিয়ে স্বামী ত্যাগ করে চলে এলে কি রকম কি রকম যেন ঠেকে।"

কেহ বা বলেন—"বিয়ের সময় নিশ্চয়ই কেউ মন্দ করেছে।"

অনেকের মতে ও সব বাজে কথা, ভিতরে কিছু আছে।

পুনরায় কথা উঠে—"ওর স্বামী যে দুর্ব্ব্যবহার করতে পারে, এত বিশ্বাস হয় না। সংসারে আর কেউ নেই, থাক্‌লেও বা বোঝা যেত তারাই পীড়ন করে।"

পল্লী-মেয়েদের ধারণা যখন স্বামী উচ্চশিক্ষিত, সহরে থাকে, গভর্ণমেণ্ট চাকুরী করে, দেখতে-শুন্‌তেও ভাল, তখন এরূপ ব্যাপার তাহার দ্বারা ঘটিতে পারে না। উঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে বলেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছে অভাব তো কিছু নেই, কোল্‌কাতায় বাড়ী আছে, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তবে কেন এ রকম হয়।"

দুই একজন বৃদ্ধা বলেন—"বোধ হয় ওর সহর ভাল লাগে না।"

দুই একজন প্রৌঢ়া বলেন—"না তা' নয়, মা ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, ওর মায়ের ঐ ত একটি মাত্র মেয়ে।"

সারাদিন কাজের মধ্যে থাকিয়াও সরমার মা এবং বউ-দিদি স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা সরমার জন্য চিন্তাকুল।

উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলে। মা বলেন—"বুঝ্‌লে বউমা, আমার মেয়েরও দোষ আছে। বরের সঙ্গে বনিয়ে-সনিয়ে ঘর না করলে মেয়ে-ছেলের অশেষ দুর্গতি। সব পুরুষই যে এক রকম প্রকৃতির হবে, তার ত কোন মানে নেই। সুরেন যা' না পছন্দ করে, তা' কর্‌বার কি দরকার?"

বউদিদি বলেন—"তোমার জামায়েরও দোষ আছে মা। অতটা বাই কিন্তু পুরুষের ভাল নয়।"

মা বলেন—"ছেলেবেলা থেকেই ও কেমন যেন স্বাধীন প্রকৃতির। দেখেছি, যার তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলা ওর একটা অভ্যেস। কত বুঝিয়েছি, বকেছি, অবাধ্য মেয়েকে আর কত শাসন করা যায়? বড় হয়েছে, বেশী কিছু বল্‌তেও পারি না—"

প্রত্যুত্তরে বউদিদি উত্তেজিতা হইয়া কহিলেন—"তা' বলে কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সামান্য ব্যাপারে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় না। আজ যদি আমাদের পয়সা থাক্‌তো তেমন—"

মা কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলেন—"পয়সা থাক্‌লেই কি মা কেলেঙ্কারী করা উচিত, না সবাই তা' করে—"

শ্রাবণের ধারার মত মায়ের চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রুপাত হয়। আষাঢ় সন্ধ্যার কাজল মেঘের মত মুখখানি লইয়া বউদিদি আবার সংসারের কাজে চলিয়া যান।

সরমা ভাবে—"মরণ ছাড়া আর তার জুড়োবার স্থান কোথায়?"

সারা দিনরাত ধরিয়া তাহার কাতর ম্লান মুখখানি কুটীর প্রাঙ্গণে অন্ধকারকে যেন মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, অশ্রু-নদীর সজল গাথা শুনাইয়া বুঝি বাউল বাতাস বনে বনে ফিরিতেছে। সে ভাবে—"সত্য তার মরণই মঙ্গল!"

পরক্ষণে আবার মনে হয়—"কি তার অপরাধ! মরবেই বা কেন? কি এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়েছে, যাতে করে তাকে নিয়ে এত চোট? কারো খায় না, পরে না, কারো কথায় থাকে না—তবু কেন সবাই তার কথা আলোচনা করে? ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, লোকের তা'তে কি?"

অবসর পাইলেই মা আসিয়া বলেন—"আমার পেটের মেয়ে হয়ে শেষে তুই শত্রু হাসালি—বাপ-পিতামোর নাম ডোবালি। আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকৃতেন ত কিছুতেই তোকে ক্ষমা করতে পারৃতেন না।"

সরমা চুপ করিয়া থাকে। বউদিদি বলেন—"স্বামীর ঘর করৃতে পারৃলে না ঠাকুরঝি! ছি ছি, স্বামী যা' অপছন্দ করেন তা' না করৃলেই পারৃতে! একরাশ টাকা দিয়ে তোমায় বিয়ে দেওয়া গেল, শেষে এই সর্ব্বনাশ করৃলে? এখনও যে দেনা শোধ যায় নি?"

অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া সরমা ম্লানমুখে কহিল—"তুমি কি বলৃতে চাও বউদি'—স্ত্রী আর ক্রীতদাসী এক?"

বউদিদি বলিলেন—"কিছুই বলৃতে চাই না, তোমার মত নভেল-পড়া নভেলী মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভই হবে না—নভেলের ক্রিয়া যে তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তা' বেশ বুঝৃতে পেরেছি। তবে কি জানো, স্বামী ভিন্ন নারীর আপনার বলৃতে কেউ নেই! সেই স্বামীর কাছ থেকে তুমি যখন চলে এসেছ, তখন তোমার স্থান যে কোথায় হবে ভেবে পাই না।"

এই কথার পর সরমা আর কোন কথা কহিল না।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়, মানসিক যন্ত্রণায় অধীরা তরুণী কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য আনিতে পারে না। কেহই তাহাকে সান্ত্বনা দেয় না। সে আপন-মনে বলে—"এবার বোধ হয় পাগলই হয়ে যাব।"

তাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বনের পাদপশ্রেণী শিহরিয়া উঠে, পাখীর কূজন থামিয়া যায়, নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে।

কত রজনী সরমা বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছে এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে—"এবার আমায় তোমার কাছে ডেকে নাও ঠাকুর!"

ঈশ্বর কিন্তু সাড়া দেন না—তিনি কি নিষ্ঠুর!

নদীর ধারে মালঞ্চ-ঘেরা পর্ণ-কুটীর সরমার পিত্রালয়। আশপাশে দুই-একখানি করিয়া কুটীর ইতস্ততঃভাবে বিক্ষিপ্ত। মধ্যে বাঁশবন ও আম্রকুঞ্জ। পিতা জীবিত নাই। একটি মাত্র ভ্রাতা, তাও বিদেশে চাকুরী করেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনিও বিশেষভাবে মর্ম্মাহত। বউদিদি তাঁহার পত্র দেখাইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সরমা কহিল—"বুঝেছি বউদি', পৃথিবীতে আমার আপনার বলৃতে কেউ নেই! সম্পর্কীয় দেওরের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছি, থিয়েটারে গিয়েছি—এইতো আমার অপরাধ! বলি কেউ কি তা' যায় না? তা'তেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—"

বউদিদি কহিলেন—"ঠাকুরজামাই ও সব পছন্দ করে না, এটা ত বোঝা উচিত—"

সরমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"আমাকে সে বিশ্বাস করতে পারলে না—ঈশ্বরের নামে শপথ করৃলুম, তবু না। তার আমি কি করতে পারি বলো ত? এখানে এলাম, তোমরাও আমাকে অবিশ্বাস করৃছো—বিচার করে' বলো কি আমার অপরাধ!"

ঘরে তখন টিক্‌টিকির শব্দ উঠিল—"ঠিক, ঠিক্!"

মা পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে সব শুনিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"তুমি যে বরাবরই বেহায়া কি না, তারই পরিণাম। এখন কেঁদে কি হবে? চরিত্রে অপবাদই যে মেয়েদের মস্ত বড় কলঙ্ক—"

সরমা নীরব হইল। বাপের বাড়ীতেও সহানুভূতি না পাইয়া সে আরও আঘাত পাইল। সে আপন-মনে বলিতে লাগিল—"কি করে আবার তার কাছে ফিরে যাবো! গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে দরজায় খিল দিতেই ত মনের ঘৃণায় চলে এসেছি—সে ত

আর আমায় ঘরে নেবে না! আমাকে যদি ক খুন করতো, বিষ খাইয়ে মারতো, তাও যে ছিল ভালো।"

জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সরমা বিশেষ চিন্তাতুর। নারী-জীবনের স্বাধিকার না থাকিলে সবই বিড়ম্বনা। প্রশ্ন উঠে—বাস্তবিকই কি নারী-জীবনের স্বাধিকার আছে? তাহার মন বলিয়া উঠিল—"স্বাধিকার আছে কি না দেখা যাক্, এমনভাবে আর থাকা চলে না।"

গ্রামটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মধ্যে মধ্যে শিবা ও সারমেয় সম্প্রদায়ের কোলাহল উঠে মাত্র। কতিপয় বাদুড়ের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ অন্ধকার রজনীর স্তব্ধ হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সরমা একাকী বাটী হইতে বাহির হইল। পথ বাহিয়া সে চলিল ষ্টেশনের দিকে—উদ্দেশ্য কি তাহা কিছুই স্থির হয় নাই, তবে কলিকাতায় ফিরিয়া না গেলে কোন মতলবই ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সে যখন ষ্টেশনে পৌছিল, তখন রাত্রি দুইটা। টিকিট কাটিবার সাহস হইল না, পাছে ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে সন্দেহ করিয়া ট্রেণে না উঠিতে দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ট্রেণ আসিল। একটি তৃতীয় শ্রেণীর খুব ছোট নির্জ্জন কামরার দরজা খুলিয়া দেখিল, কেহ নাই; কেবল একটি ভদ্রলোক বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছেন। সন্তর্পণে সে তাহাতে উঠিল। অন্তরে ভয় হইতেছিল—ভদ্রলোক কিরূপ প্রকৃতির, তাহা কে জানে! আবার ভাবিল—"সর্ব্বহারার আর কিসের ভয়? ভাবনার মধ্যে দিয়েই ত তার চলার পথ। এখনই ভয় পেলে চল্‌বে কেন?"

দরজা খোলার শব্দ পাইয়া ভদ্রলোকটী চাহিয়া দেখিলেন—একটী পরমা সুন্দরী তরুণী একাকিনী ট্রেণে উঠিতেছে, সঙ্গে কেহই নাই। একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। সরমা পার্শ্ববর্ত্তী বেঞ্চে গিয়া বসিল। ট্রেণ চলিতে সুরু করিল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। ভদ্রলোক কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছিলেন না। এত রাত্রে একা কোন বাঙালী ভদ্র রমণী যে বাড়ীর বাহির হইতে পারে, ইহা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস হইতেছিল না। অবশ্য প্রগতি-উপাসিকা দু'-দশজন আজকাল দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের গোত্রে ইহাকে ফেলা কোনমতেই যায় না; কেন না, লজ্জা, ভয় এবং অনভ্যস্ততার সমস্ত লক্ষণই ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। তবে? নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়া ইনি এভাবে যাইতে বাধ্য হইতেছেন—কিন্তু কি সে বিপদ?

স্থির থাকিতে না পারিয়া সহসা তিনি সরমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন?"

সরমা কোন উত্তর দিল না।

—"অপরিচিতা কোন স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করা উচিত নয়, তবু করছি এই কারণে যে, আমার মনে হচ্ছে আপনি বড় বিপন্না। যদি আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য করা সম্ভব হয়, আমি করতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমাকে নিজের ছেলের মতই বিশ্বাস করতে পারেন।"

মুহূর্ত্তে সরমার বুক হইতে যেন একখানা ভারী পাথর খসিয়া গেল।

তাহার নিকট হইতে ভদ্রলোকটী ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথাই জানিয়া লইলেন। সরমা জানিতে পারিল, তিনি 'সিউয়িং মেশিন কোম্পানী'র একজন বিশেষ পদস্থ কর্ম্মচারী।

তিনি কহিলেন—"বেশ ত আপনি যদি স্বাধীনভাবে থাক্‌তে চান, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। আপনাকে আমাদের 'লেডি ক্যানভাসার' করে নেব। উপরন্তু, গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েদের সেলায়ের কাজ শেখালে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করতে পারবেন।"

সরমা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তথাপি সসঙ্কোচে বলিল—"কিন্তু এখন আমি থাকব কোথায়? বুঝতেই ত পেরেছেন, আমার আর কোথাও জায়গা নেই।"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন—"তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে। উপস্থিত আমার বাসাতেই উঠবেন; তারপর ধীরে-সুস্থে একটা ব্যবস্থা করে নিলেই হবে।"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—আচ্ছা।

দীর্ঘ দশবৎসর পরের কথা।

মধ্যাহ্নকাল। একখানি দ্বিতলবাড়ীর একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুইটী স্ত্রীলোক কথোপকথন করিতেছিল। একজনকে আমরা চিনি—সে সরমা। অন্যজন অপরিচিতা।

অপরিচিতা বলিল—"একজিবিশনে বেড়াতে গিয়ে ত আপনার কথায় মেশিনটা কিনে ফেল্‌লুম, এখন শিখ্‌তে পারলে হয়।"

—"শিখ্‌তে পারবেন বই কি। আমি ত রইলুম। কোন ভাবনা নেই আপনার। আজকে—"

—"আবার আপনি। বল্‌লুম না আমাকে মাধুরী বলেই ডাকবেন। এত পারেন, আর আমার নামটা মনে রাখ্‌তে পারেন না? তারপর আপনার গল্প বলুন। স্বামী তাড়িয়ে দিলেন, বাপের বাড়ী চলে গেলেন, তারপর—"

—"আবার তারপর।"

—"তারপরই ত গল্প, বলুন না শুনি।"

"মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরতে পারলুম না, ইচ্ছা হ'ল না। মেয়েরাও মানুষ কি না ভগবানের বিচারে, তাদেরও স্বাধিকার বজায় রেখে বেঁচে থাকা চলে কি না দেখতে একদিন রাত্রে বেরিয়ে পড়লুম। সত্যি মাধুরী, মেয়েরাও মানুষ, তাদেরও বাঁচার প্রয়োজন আছে—নইলে রেলে অমন মহাপ্রাণের দেখা পাব কেন! তাঁর দয়ায় পেলুম এখানে চাকরী। কিন্তু এসব শুনে তোমার কি লাভ ভাই?"

—"দুনিয়াটাকে তুমি বুঝি শুধু লাভ আর লোকসান খতাবার যন্ত্র বলেই জেনে নিয়েছ দিদি? তাই কেবল তারই খোঁজ করছ।...ভাল কথা, কাল আসা চাই কিন্তু। কাল থেকে কাজ শিখতে হবে। বাজে বাজে দুটো দিন কেটে গেল। এরপরও হয় ত বাজেই যাবে, তবু—"

—"দোষ ত তোমারই বোন্, বেশ, কাল সকাল সকালই আসব। বাজে গল্প তুল্‌লে বকুনি খেতে হবে কিন্তু।"

হাসিয়া সরমা উঠিয়া পড়িল।

মাধুরী অর্থহীন-দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরমা না চিনিলেও প্রথম পরিচয়েই মাধুরীর বুঝিতে বাকী ছিল না যে, সে তাহার কে। বিনা অপরাধে বহিষ্কৃতা হওয়ায় স্বভাবতঃই সরমার জন্য একটা মমতা মাধুরীর বুকে জমা হইয়াছিল। এমন কি, শুধু এই কারণেই অদ্যাবধি স্বামীর সহিত সে প্রাণ খুলিয়া ঘর পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। কারণে অকারণে নিজে দগ্ধ হইয়াছে, সুরেনকেও দগ্ধ করিয়াছে।

আজ সেই সরমাই তাহার ঘরে নিজে আসিয়া হাজির হইয়াছে। আশ্চর্য্য আর কাহাকে বলে!

কিন্তু কি অমায়িক তাহার ব্যবহার, কি ভদ্র তাহার গতিবিধি!

ইচ্ছা করিয়াই আজ আর মেশিনটা মাধুরী তুলিয়া অন্যত্র চাপা দিয়া রাখিল না। সুরেন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া মেশিনটা যাহাতে দেখিতে পায়, এমনই করিয়া রাখিয়া দিল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হইতে ফিরিয়া সম্মুখে সেটাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

মাধুরী হাসিয়া বলিল—"এটা কিনে আন্‌লুম। কাল থেকে একজন মেয়ে-মাষ্টারও এঁরা দিয়েছেন। মাসে পনের টাকা করে দিলেই চলবে।"

সুরেন অপ্রসন্ন-মুখে কহিল—"আবার খরচ! মেয়েটা বড় হচ্ছে, তার বিয়ের কথা ভাবছ না কেন মাধুরী! দেনার দায়ে সেদিন বাড়ীখানা বিক্রী হয়ে গেল, এখনও বুঝে না চল্‌লে—"

—"পথে বস্‌তে হবে। কিন্তু আমি তার কি কর্‌ব? যা' ন্যায্য তাই করি। এর কমে কোন ভদ্রলোক ঘর করতে পারে।"

—"তা বটে।" বলিয়া সুরেন চুপ করিয়া গেল।

হয় ত প্রথমা পত্নীর কথা এখন মাঝে মাঝে সুরেনের মনে পড়ে। দোষটা তাহার যত বড় করিয়া সে দেখিয়াছিল, ততটা না দেখিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইত না ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয়—কিন্তু উপায় কি?

বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার শূন্যঘর পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দ্বারা অন্তরের অভাব মোচন হয় নাই।

এ স্ত্রী অতি আধুনিকা এবং স্বাধীন প্রকৃতির। সুরেনের কোন অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না। তবু একদিন সুরেন বলিয়াছিল—"দেখো, যার তার সঙ্গে থিয়েটার বায়স্কোপে যাওয়া, ট্রামে চেপে মাঠে হাওয়া খাওয়া ভাল নয়; অন্ততঃ, গেরস্থ-ঘরে চলে না।"

মাধুরী উত্তর দিয়াছে—"তবে ভাল কি শুধু ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাস না নিয়ে 'থাইসিসে' মরা?"

সুরেন বলিয়াছিল—"ও তোমার ভুল ধারণা মাধুরী, এতদিন ত মেয়েদের ওসব রোগ ছিল না।"

—"তাই তার প্রয়োজনও হয় নি। এখন হয়েছে, কাজেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যা' ভাল বুঝব করব, ইচ্ছে হয় ঘর কর, না হ'লে অন্য ব্যবস্থা করতেও ত তুমি খুব পটু—সরমার মত বদনাম দিয়েই না হয় বিদেয় করো একদিন।"

লৌহ-শলকার মত কথাগুলা সুরেনের অন্তঃস্থলে গিয়া বিঁধিয়াছে, কিন্তু সে একটা প্রতিবাদও আর করে নাই। সত্যের আঘাত বুঝি মানুষকে এমনই করিয়াই পঙ্গু করিয়া ফেলে।

কয়দিনের শিক্ষায় মাধুরী শেলাই সম্বন্ধে কতটা শিক্ষিতা হইয়াছিল বলা যায় না, তবে সরমার হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তাহা ভুলিয়া যাইতেও বিলম্ব হয় নাই। সরমা পত্র-দ্বারা জানাইয়াছিল—দুই-চারিদিনের মধ্যে পথ্য পাইলেই সে আসিবে, তবে সেখানে গিয়া সে যেন তাহাকে বদনাম না দিতে পারে, সে বিষয় নজর রাখা চাই, ইত্যাদি…।

কিন্তু যেদিন পথ্য পাইয়া সে মাধুরীর বাড়ী আসিয়া হাজির হইল, সেদিন মাধুরী শয্যা লইয়াছে।

সুরেন অচৈতন্য স্ত্রীর মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সরমাকে দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল—"সরমা, তুমি এখানে!"

সরমা বজ্রাহতের মত খানিক চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—"ওর অসুখ জান্‌লে আস্‌তাম না, ভাল হলে খবর দিতে বল্‌বেন। সেলাই শেখাতে এসেছিলাম আমি।"

কিন্তু তাহার চলিয়া যাওয়া হইল না। ঠিক্ সেই সময় একটু চৈতন্য হওয়ায় মাধুরী চোখ চাহিতেই সরমাকে দেখিতে পাইল। বলিল—"আমার পাশে বসো না দিদি!"

সুরেন ধীরে ধীরে সে ঘর ত্যাগ করিয়া গেল। সরমা মাধুরীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মুখের কঠোরতা মিলাইয়া যায় নাই। সেদিকে লক্ষ্য করিয়া মাধুরী হাসিয়া বলিল—"ধরা পড়ে রেগে গেছ, না? কিন্তু বোন্ বলে যখন স্বীকার করে নিয়েছ, তখন আর ফেল্‌বে কেমন করে বল ত?"

হাসিতে চাহিয়া সরমা বলিল—"ফেল্‌ব কেন, পাগল! আগের সরমা কবে মরে গেছে—তার বিষয় কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। এখন আমরা দু'টি বোন্ আছি বই ত নয়। কিন্তু হঠাৎ জ্বর করে' বস্‌লি কেন বল্ ত?"

—কেন আবার, তোমাকে জ্বালাব বলে!" বলিয়া মাধুরী হাসিল।

সরমা তাহার তপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"জ্বালানো ত পরে, এখন নিজে ত জ্বল্‌ছিস্, বেশ, তা' হ'লেই হ'ল।"

মাধুরী আর কথা কহিল না। বোধ হয় কথা কহিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই সে নীরবে পড়িয়া রহিল।

সরমা একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর আপনাকে অসীম বলে সংযত করিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন কয়েক পরের কথা।

সেদিন রাত্রে মাধুরী সুরেনকে কহিল—"তুমি যতই আমায় লুকোও না কেন, ডাক্তাররা নিশ্চয়ই আমায় জবাব দিয়েছে। এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচবো না। আমি ভাব্‌ছি কি জানো, মেয়েটা দু'বছরের মাত্র। ওকে মানুষ করে বড় করে তুল্‌তে অনেক দিন লাগ্‌বে। তুমি ত একা মানুষ কর্‌তে পার্‌বে না—শিশুপালন মেয়েরা ভিন্ন পুরুষদের দ্বারা অসম্ভব। আর বিয়ে কর্‌তে যেয়ো না; তা'তে মোটেই সুখী হবে না—বরং সরমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে আসি। ও এতদিন বাইরে বাইরে কাটালো—এর জন্য দায়ী কে? তুমিই ত। ও ত তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। একদিন অগ্নি সাক্ষ্য করে দেবতার সাম্‌নে শপথ করেছিলে—ওকে নিয়েই সংসার-ধর্ম্ম পালন কর্‌বে। সে শপথ ভঙ্গ করেছ, তা'তে তোমার মস্ত বড় পাপই হয়েছে।"

সুরেন তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"ও কথা থাক্ মাধুরী, তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তা' ছাড়া, সরমা কি আর এ ঘরে আস্‌বে? ও যে ভারী জেদী মেয়ে—"

মাধুরী বলিল—"সে ব্যবস্থা আমি কর্‌বো 'খন। তবে তুমি আর তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করো না, তাকে ঘৃণা করো না। বাইরেটা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করো, সত্যি সুখী হবে।"

আর না আসিবার সঙ্কল্প করিয়া এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেও অদৃশ্য আকর্ষণের টান সাম্‌লাইতে না পারিয়া সরমা আবার একদিন মাধুরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী বলিল—"কেমন পারলে না এসে? বোন্‌কে ভোলা সহজ কি না? ও গো শুন্‌ছ? কে এসেছে দেখো" বলিয়া সুরেনকে ডাকিয়া মাধুরী তাহাকে সরমার পাশে বসাইল।

সরমা আপত্তি করিতে যাইতেছিল। মাধুরী কহিল—"হাজার হোক্ ও ত তোমার স্বামী, যদি বা ভুলে বা পাঁচজন বন্ধুর পরামর্শে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকে, তার কি ক্ষমা নেই? নারী হয়ে পুরুষের মত কঠোর হয়ো না। তা' ছাড়া—অনাথা এই মেয়েটা, এর ওপরও কি তুমি দয়া কর্‌বে না দিদি?"

সরমা শেষের কথাটায় অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মাধুরী পরম যত্নে মেয়েটাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। বলিল—"আমার ডাক এসেছে—চলে যাচ্ছি। আমার কোলের মেয়েটাকে তুমি মানুষ করো—আজ হ'তে তুমিই ওর মা! সংসারের কিছুই জানে না, আমার কথা ওর স্মরণও হবে না, ও জান্‌বে—তুমিই ওকে পেটে ধরেছ। এই স্বামী, এই সংসার তোমারই—মাঝে একটা ব্যবধান ঘটেছিল মাত্র! মনে ভেবো ওটা স্বপ্ন!"

"হঠাৎ মাধুরীর দম বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

আজ সরমা মা হইয়া সংসার দখল করিয়াছে।

ইহাই তাহার পরম তৃপ্তি! সিঙ্গার কোম্পানীকে জানাইয়া দিয়াছে—সে আর চাকুরী করিবে না এবং বাহিরের সমস্ত সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে। সর্ব্বহারা নারী আজ সে নয়—আজ সে মাতৃত্বের আসন পাইয়াছে এবং ইহাই লাভ করিবার জন্য বুঝি তাহার অন্তরের অন্তরালে ছিল গোপন সাধনা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মোটর ডাকাতি

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, এল্‌-এম্‌-এফ্‌

পিস্তল ক্রয়

একটি যুবক—সুশ্রী, সুবেশ, বলিষ্ঠ, সুপুষ্ট ও সুদীর্ঘ—ভদ্রলোক কি? যুবক কোন দোকান হইতে একটি পিস্তল কিনিল; অন্যান্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষও লইয়া ধীর-স্থিরপদে এস্‌প্ল্যানেড জংশন অভিমুখে চলিল।

মাঘ মাস। বেলা একটা পঞ্চাশ। এস্‌প্ল্যানেড জংশনের এস্‌প্ল্যানেড হোটেল হইতে অপর একটি সমবয়স্ক যুবক বাহির হইয়া তাহাকে বলিল, "নীহার, ওয়ান ফিফ্‌টি।"

হাতের ঘড়ি দেখিয়া প্রথম যুবক নীহার বলিল, ওয়ান ফিফ্‌টি—তারপর সব ঠিক? আজই যাচ্ছ সুবোধ?"

"হাঁ, এখানে আর ভাল লাগছে না, কোন সুবিধেও হ'ল না, আজই পালাব।"

"কোথায়?"

"কানপুরে প্রথমে, তারপর দেখা যাবে।"

"একা?"

"দারোগা মনোহর রায় পেছু নেবে মনে হয়।"

"দারোগা?"

"আমার পরম আত্মীয়।"

নীহার হাসিয়া একখানি ট্যাক্সির দিকে লক্ষ্য করিল—গাড়ীখানি তাহাদের দিকে ধীর গতিতে আসিতেছিল। ট্যাক্সি থামাইয়া সুবোধকে টানিয়া সে গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইল।

"আরে, একেবারে ট্যাক্সি! যা' কথা ছিল, তার কি হ'ল?"

"আজ নয়, অপর জায়গায় অন্য কাজ আছে; আজ নতুন কাজে যাব।"

"কোথা?"

"গোপীমোহন বসুর লেন, বাগবাজার।"

"হঠাৎ?"

"ওঠ, বলছি।" বলিয়া নীহার সুবোধকে লইয়া গাড়ীতে বসিল। সফার দুইজনকে লইয়া ছুটিল—পশ্চাতে বসিয়া দুইবন্ধু যুক্তি করিল, সিগারেট পুড়াইল।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "পিস্তলটার দাম কত?"

নীহার দাম বলিল।

"বেশ সস্তা। তারপর, তোর হঠাৎ এ নতুন প্ল্যান্‌টার উদ্দেশ্য?"

"খুব গভীর বা মারাত্মক এমন কিছুই নয়—একটা খেয়াল।"

বাড়ীর ভিতরে

গোপীমোহন বসুর লেনে একখানি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে ট্যাক্সি থামিয়া গেল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী?"

"হাঁ, দেখ্‌ছিস না নম্বর?"

"তা' বটে, কার নাম লেখা সাইনবোর্ড রয়েছে না?"

"হাঁ, এস্‌ ঘোষ—বি-এল্‌। এই অল্প ক'দিনেই ট্যাব্‌লেট্‌ পর্য্যন্ত আটকান হয়ে গ্যাছে দেখ্‌ছি।"

"বেশ, তুই তা' হ'লে যা', আমিও সরে পড়ি, কাজ আছে অনেক।"

"কি কাজ?"

"দারোগার সন্ধান রাখ্‌তে হবে; সে সত্যই যায় কি না জানা চাই—সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে আমায়।"

"আচ্ছা যা'।"

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেল—সফারকে নিকটেই কোন সুবিধামত স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নীহার সম্মুখস্থ বাড়ীর মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিল—নিতান্ত পরিচিতের মতই তাহার গতি।

মোটর ডাকাত

ভোজপুরী বিশালবপু দারোয়ান পথরোধ করিল। "আপ কোন হায়, কাঁহা যাতে হেঁ?" বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নীহারের মুখের দিকে চাহিল।

"ভিতরমে ; বড়ী বহিনসে মূলাকাৎ করনেকে লিয়ে। স্থরেনবাবু মেরা বনহুঈ হ্যায়।"

একগাল হাসিয়া দ্বারবান পথ ছাড়িয়া বারান্দায় যেখানে রৌদ্র আসিতেছিল, সেখানে গিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় তিনটা। বাড়ীতে পুরুষেরা কেহই নাই। গৃহকর্ত্তা কোর্টে ও ছেলেরা স্কুলে। থাকিবার মধ্যে গৃহিণী ও তাঁহার দুই-তিনটি কন্যা। বড় মেয়ে নীহারবালা আই-এস্-সি পড়িতেছে ; শরীর অল্প খারাপ থাকায় আজ দুই-তিনদিন কলেজ যায় নাই।

যুবক নির্ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। কত সহজে মানুষ এই সব নির্ব্বোধ দ্বারবানদের প্রতারিত করিতে পারে চিন্তা করিয়া মনে মনে হাসিল। উপরে উঠিবার সিঁড়ি নিকটেই দেখিতে পাইয়া স্থিরচিত্তে উপরে উঠিতে লাগিল—পকেটের জিনিষগুলির মধ্যে দু'-একটি বাহির করিয়া হাতে লইল। সম্মুখেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকিতে দেখিয়া ডাকিল, "বড়দি'—আমি নীহার।"

চমকিত হইয়া গৃহিণী কন্যাকে বলিলেন, "কে ডাক্‌ছে তোকে, দেখ্ ত নীহার।"

ঘরের সম্মুখের দালানের উপর মাদুর পাতিয়া গৃহিণী কন্যাদের লইয়া রৌদ্রে শুইয়াছিলেন। কন্যা নীহারবালা একপাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের রসাস্বাদ করিতেছিল—অবিবাহিতা সে।

মাতার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। বই রাখিয়া আগন্তুককে দেখিতে গেল। সিঁড়ির রুদ্ধ দরজা খুলিয়া 'মামাবাবু' বলিতে গিয়া তাহার বাক্যলোপ হইল। উন্মুক্ত দরজা পথে দাঁড়াইয়া পিস্তল হস্তে এক যুবক। ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যুকে দেখিয়া ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মোটর ডাকাতির কথা সেই সময় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত—সংবাদ-পত্রে নীহারবালা এরূপ অনেক ঘটনার বৃত্তান্ত পড়িয়াছে—ছুটিয়া গিয়া সে মাতাকে বলিল, "মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মামা নয়, কোন খারাপ লোক—মোটর ডাকাত।"

"এ্যাঁ! এাঁ! বলিস কি! ও মা!" গৃহিণী মহা আত[illegible] চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট মেয়েরা ঘুম হইতে উঠি[illegible] ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

"আরে, পালাও কেন? ব্যাপার কি?" বলিয়া যুব[illegible] তেমনই ধীরপদে গৃহিণীর নিকট অগ্রসর হইল—পিস্[illegible] তাহার দক্ষিণ হস্তেই ছিল।

তারপর—?

গৃহিণীর ভয়ার্ত্ত চীৎকারে চিন্তিত যুবক ভ্রূকুঞ্চি[illegible] করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নীহারবালা ত[illegible] আর সেস্থানে ছিল না, শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঁপি[illegible] কাঁপিতে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সম্মু[illegible] টেবিলের একটা পেরেকের খোঁচায় তাহার শাড়ীর একা[illegible] ছিঁড়িয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর ক্রন্দন ও চীৎকার, সুদূর বাহি[illegible] ভোজপুরী দ্বারবানের তুমুল নাসিকা গর্জ্জন সমানে চলিয়[illegible] ছিল।

কাঁপিতে কাঁপিতে শুষ্ককণ্ঠে গৃহিণী কোনরূপে বলিলে[illegible] "বাবা, প্রাণে মের না! পিস্তলটা পকেটে রাখ—আমাদে[illegible] প্রাণ ভিক্ষা দাও! সোণাদানা যা' খুসি নিয়ে যাও।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হার, চুড়ী, বালা ও একগো[illegible] চাবি যুবকের দিকে ফেলিয়া আর আত্মসংবরণ করি[illegible] পারিলেন না, অজ্ঞান হইয়া মাদুরের উপর পড়ি[illegible] গেলেন। শিশুরা ভয়ে চুপ করিল।

ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত করিয়া যুবক নিমিষে একবা[illegible] হাত-ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিল—গৃহকর্ত্তার তখনও আসি[illegible] বার সময় হয় নাই। একবার চারিদিক চাহিয়া গহনাগু[illegible] এক এক করিয়া তুলিয়া একস্থানে জমা করিল[illegible] তারপর—?

তরুণীর স্বরা

দারোগা মনোহর রায় থানায় বসিয়া রিপোর্ট লিখি[illegible] তেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল 'রিসিভার' লইয়া তিনি ডাকিলেন, "হ্যালো, কে আপনি?"

"আমি উকিল এস্ ঘোষের বাড়ী থেকে কথা বল্‌ছি।"

"আমি মনোহর রায়। শ্যামবাজারের সাব ইন্সপেক্টার। লিস থানা থেকে বল্‌ছি।"

"আপনি যত শীগ্‌গির পারেন লোকজন নিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। কোন এক ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যু পিস্তল দেখিয়ে আমাদের গহনা-পত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে—একখানা ট্যাক্সিও বাড়ীর বাইরে দেখেছি। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই—আসুন, শীগ্‌গির।

"মোটরে এসেছে? মোটর ডাকাত?"

"তাই। সাংঘাতিক লোক—দুর্দ্দান্ত দস্যু।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন—আমরা যাচ্ছি—আপনার নাম-ঠিকানা।"

নাম ও ঠিকানা বলিয়া তরুণী টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিল। জানালা দিয়া পুনরায় বাহিরের ট্যাক্সিখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর হঠাৎ তাহার চক্ষের সম্মুখে বিরাট অন্ধকার জমিয়া উঠিল—চেতনা লোপ হইল—টলিতে টলিতে সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

দারোগার হাতে

পিস্তল প্রভৃতি পকেটে রাখিয়া চিন্তিতমনে ধীরপদে যুবক দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কোলাহল শুনিয়া এবং কয়েকজন লোকের সিঁড়িতে উপরে উঠিবার পদশব্দে বিস্মিত হইয়া একপাশে একটা থামের নিকট গিয়া সে দাঁড়াইল—আগন্তুকেরা যাহাতে তাহাকে দেখিতে না পায় এই ইচ্ছায় সে ঐরূপে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিল বোধ হয়।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দারোগা মনোহরবাবুর কুটিল চক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে যুবকের কলকৌশল নিমিষেই ব্যর্থ হইল। দারোগা তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলেন—সঙ্গী কনষ্টেবল তিনজন ও সন্ত্রস্ত নিদ্রোত্থিত ভোজপুরী দ্বাররক্ষক তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। পলায়নের আর পথ রহিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া যুবক বলিল, "কে মশায় আপনি? এ-ভাবে আমায় অপমান করতে সাহস করছেন—এর ফল কি জানেন? ভদ্রলোককে এরূপ অপমান?"

হাসিয়া দারোগা বলিলেন, "তা' বটে—ভদ্রলোক নম্বর ওয়ান! রামজী, হাতকড়ি লাগাও—দেখো, যেন ভদ্র-লোকের অপমান করো না!"

"সাবধান দারোগাবাবু, এখনও আপনাকে নিষেধ করছি, অপমান করবেন না আমাকে—আমি দস্যু বা ডাকাত নই।"

"বালাই, ষাট! আপনাকে দস্যু বলে কে—আপনি হলেন গ্যাঁড়াতলার পকেটমারের খুড়তুতো ভাই! দয়া করে এখন থানায় চলুন, খুব খাতির করা যাবে সেখানে। এখানে কেন এসেছেন?"

"ভুল হয়েছিল—দিদি এই বাড়ীতেই থাকেন, এই মনে করেই এসেছিলাম—অন্য উদ্দেশ্যে আসি নি।"

"এই রকমেই যে আপনারা দিদির বাড়ী, পিসী, মাসী সকলের বাড়ীই গিয়ে থাকেন তা' জানি। এখন তবে দয়া করে একবার শ্বশুর-বাড়ীই না হয় চলুন। মোটর ত বাইরেই আছে।"

"চলুন। তবে জান্‌বেন—এর জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে—আমি চোর-ডাকাত কিছুই নই।"

"ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা। রামজী, লে চল শালাবাবুকো।"

ভোজপুরী দ্বারবান হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, "শালা বদমাস্—মারকে ছাতু বানা দেঙ্গে।"

উকিলের জেরায়

প্রবীন ও বিজ্ঞ উকিল সুরেন ঘোষ সেই সময় বাড়ী আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আগমন জানিয়া গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। কন্যা শয়ন-ঘর হইতে বাহিরে আসিল। কন্যার মুখে আদ্যন্ত সমস্ত শুনিয়া তিনি বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

দালানের চেয়ারে বসিয়া সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক, তোমার নাম?"

"শ্রীপ্রেমনীহার বসু।"

"লেখাপড়া কিছু করেছ?"

"হাঁ, যৎসামান্য। গত বৎসর ইংরাজীতে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম হই।"

নীহারবালা বাপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত দস্যু এম্ এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটিতে প্রথম

হইয়াছে—নামটাও সে শুনিয়াছিল কি ? বিস্মিতা কুমারী ক্ষণেকের জন্য যুবকের দিকে চাহিল—ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যুর এই প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় চেহারা! সত্যই কি এ দস্যু—যদি সত্য না হইত! নীহারবালা আর একবার দেখিল।

সুরেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "এ বাড়ীতে আসবার কারণ ?"

"দিদির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।"

"আগে আর এ বাড়ীতে এসেছিলে ?"

"না, দিদিরা আজ ক'দিন হ'ল কোলকাতায় এসেছেন—তাঁরা লাহোরে থাকেন।"

"তাঁরা যে এ বাড়ীতেই এসেছেন, তা' কিসে জান্‌লে ?"

"দিদি লিখেছিলেন।"

"—নং গোপীমোহন বসুর লেন এই ঠিকানাই দিয়েছিলেন ? তোমার ভগ্নীপতির নাম ও পেশা কি ?"

"শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এল্—লাহোরের উকিল।"

"সৌরেন! সেই আমুদে সৌরেন তোমার ভগ্নীপতি! হাঁ, সে লাহোরেই গেছে বটে। বেশ মোটা, সুশ্রী চেহারা—নয় ?"

"হ্যাঁ—আপনি চেনেন ?"

"সে কথা যাক্—পিস্তল প্রভৃতি এনেছিলে কেন ?"

"ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দেবার জন্য। ও সব খেলার জিনিষ—টিনের।"

"দেখি ?"

সুরেনবাবু পিস্তল চাহিলেন, কিন্তু দারোগাবাবু তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিলেন। এসব মারাত্মক জিনিষ এখন বাহির করিতে দেওয়া উচিত নয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উকিলের ধমকে আর কিছু বলিলেন না। পিস্তল দেখিয়া সুরেনবাবু চকিত কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতেই ভয় পেয়েছিলে মা ?"

কন্যা পিস্তলটীকে বিশেষভাবে দেখিয়া লইল।

মিনতি

যুবক যেরূপ ধীর ও নিশ্চিন্তমনে উত্তর দিতেছিল, তাহাতে দারোগাবাবু নিতান্ত বিস্মিত এবং উকিলের উপর বিরক্ত হইতেছিলেন। নীহারবালা লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া মাঝে মাঝে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সত্যই কি সে দস্যু!

সুরেন উকিল হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বিবাহ করেছ ?"

মোটর ডাকাত বিবাহিত কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন কি ? বিজ্ঞ ও প্রবীণ উকিলের এই অসংলগ্ন প্রশ্নে দারোগাবাবু নিতান্ত বিরক্ত হইলেন; কিন্তু নীহারবালা তাহার সমস্ত শ্রবণ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া উত্তরের অপেক্ষায় রহিল—'হাঁ' কিংবা 'না' এই দুয়ের প্রভেদ কত! দু'টী অক্ষরের কত শক্তি!

যুবক বলিল—"না।"

পিতা হঠাৎ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; কন্যা বুঝিল না পিতা কি দেখিতেছেন—ধীরস্বরে কাতর কণ্ঠে কুমারীর মুখ হইতে বাহির হইল, "হাতকড়ি খুলে দাও বাবা, খুলে দাও!"

মিনতি দস্যুর জন্য।

নীহারবালা

মনোহরবাবু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অপর একটি যুবক সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। একজন চাপরাশী দুইজনকে দারোগাবাবুর নিকট লইয়া গেল।

যুবক দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দারোগাকে দেখিয়া বলিল, "মনোহর দা', করেছেন কি—কা'কে হাতকড়ি দিয়েছেন, খুলুন—খুলুন।'

বন্দী যুবক আগন্তুকের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "কে, সুবোধ ?"

"হাঁ ভাই। দারোগার সন্ধানেই আমি গিয়েছিলাম, থানায় শুনলাম সব ঘটনা—তাই তৎক্ষণাৎ তোর বাবাকে নিয়ে আমি এখানে এসে পড়লাম।"

"বাবাকে নিয়ে ?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণে উপরে উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগাবাবু চক্ষের নিমেষে বন্দীকে মুক্ত করিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি, কেদারবাবু!"

রায়বাহাদুর কেদারনাথ বসু পুলিস বিভাগে বহুকাল কার্য্য করিয়া পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ বাত ব্যাধিতে একবারে পঙ্গু হওয়ার কয়েক বৎসর পরে কার্য্য হইতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অবসর লইতে হইয়াছিল। তিনি অনেকেরই পরিচিত ছিলেন।

"শুন্‌লাম আমার ছেলেকে আপনারা ডাকাত মনে করে বন্দী করতে এসেছেন, কাজেই আসতে হ'ল।"

উকীল সুরেন ঘোষের আদেশক্রমে ভৃত্য একখানি চেয়ার আনিয়া কেদারবাবুকে বসিতে দিল। চেয়ারে বসিয়া তিনি সুরেনবাবুকে সকল ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেনবাবু সমস্ত কথা বলিলেন—তাঁহার অনুপস্থিতিতে নীহারের আগমন, পিস্তল প্রভৃতি অপরিচিত যুবকের হস্তে দেখিয়া কন্যার সতর্কতা ও পুলিশকে টেলিফোন্ করার কথা বলিয়া তিনি একবার কন্যার দিকে চাহিলেন। কেদারবাবুও দেখিলেন। লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা নীহার-বালা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শাস্তির আয়োজন

সুবোধ বলিল, "নীহারের সঙ্গে আমি আজ তিনটার ম্যাটিনিতে বায়োস্কোপ দেখ্‌বার জন্য একটা পঞ্চাশ মিনিটে এস্প্ল্যানেড হোটেলের সুমুখে দেখা করবার বন্দোবস্ত করি। নীহার সময় মতই আসে; কিন্তু তার মতের পরিবর্ত্তন দেখি। সে বলে, বায়োস্কোপে সে যাবে না। তার দিদি তাকে অনেকদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন, কিন্তু এতদিন সেকথা তার মনে ছিল না—আজ হঠাৎ মনে হওয়ায় সে দিদির বাড়ী যাবে বলে কিছু খেল্‌না আর ওই টিনের পিস্তলটা ছয় আনায় কিনেছিল। বায়োস্কোপ যাওয়া বন্ধ হওয়ায় এবং আমারও এই অঞ্চলে বাড়ী বলে' নীহার আমাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে' বাগবাজারে তার দিদির বাড়ীতে আসে। বাড়ীর নম্বর যা' আমায় নীহার বলেছিল, তা'তে এই লেনের ঠিক্ এই বাড়ীখানাই বোঝায়।"

কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহরবাবুর কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"উনি আমার আত্মীয়। তা' ছাড়া, আজ কোন তদন্তের জন্য রাত্রির ট্রেণে রাণীগঞ্জ যাবেন শুনেছিলাম, তাই সঠিক্ সংবাদ জান্‌বার জন্য যাই। আমাকেও আজ রাত দশটার গাড়ীতে কানপুরে একটা কাজের চেষ্টায় যেতে হবে। ভেবেছিলাম, একসঙ্গে যাব দু'জনে।"

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জামায়ের এখানকার ঠিকানা কি?"

"আহম্মক ছেলে রাস্তার ভুল করেছে মশায়! বাড়ীর নম্বর ঠিক্ এই বটে, তবে সৌরেন থাকে গোপীনাথ দের লেন, বউবাজারে, আর বাবু এসেছেন গোপীমোহন বসুর লেন, বাগবাজারে। ইংরাজিতে এম্-এ পাশ করেছেন, দে আর বসুর তফাৎ কি আর সাহেবদের মনে থাকে মশায়!"

উকিলবাবু বলিলেন, "আমাদের সকলেরই ভুল হয়েছে। আমার সাইন বোর্ডে 'এস্-ঘোষ—বি-এল্' লেখা আছে, আপনার জামাইও নামের পরিচয়ে,'এস্ ঘোষ বি-এল্—কাজেই নীহারের ভুল হওয়ার আশ্চর্য্য কিছুই নেই।"

"একটুও না—জেল যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়! এস্ ঘোষ দেখ্‌লেই ভগ্নীপতি ভাববেন, এতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে!"

"যাক্, আমাদের ক্ষমা করবেন কেদারবাবু। প্রথম দিকে ঘটনাটা যেরূপ দাঁড়িয়েছিল, তা'তে আমাদের বিশেষ দোষও নেই।'

"বিলক্ষণ, দোষ নেই আপনার তা' মানি! কিন্তু আপনার ওই মেয়েটি বড় দোষমুক্ত নন্—উনিই যত নষ্টের গোড়া—সব গণ্ডগোল ত ওই বেটীই করেছে। একটা ভাল লগ্ন দেখে আমি বেটীকে রীতিমত শাস্তি দেবার আয়োজন কর্‌ছি শীগ্‌গিরই।"

"আমরা আপনার শাস্তি ঘাড় পেতে নিচ্ছি কেদার-বাবু। এ রকম উপযুক্ত পাত্র—"এই বলিয়া সুরেনবাবু কন্যার দিকে চাহিলেন।

কিন্তু কন্যা কোথায়? নীহারবালা পলাইয়াছে—পিতার কথায় নিমেষে সেই ভদ্রবেশী দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই, উচ্ছ্বসিত, সমর্পিত হৃদয় লইয়াই কন্যা পলাইয়াছে। পলায়ন বুঝি বন্ধনেরই পূর্ব্বাভাষ!

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

'স্মৃতি শুধু জেগে রয় অতীত কাহিনী কয়'

ভ্যালেন্‌টিনো স্মরণে

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আকর্ণ লম্বা দু'টী টানা চোখ ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে এল। চাউনির মধ্যে চেতন মানুষের বক্তব্য যেন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। যন্ত্রণার সাড়া সারা শরীরের কোন কোন অঙ্গকে তখনও নাড়া দিয়ে যাচ্ছে—দু'জন ডাক্তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে, একজন নাড়ি দেখ্‌ছেন। ডাক্তারদের পাশেই ইন্‌জেক্‌সনের দরকারী জিনিষ-পত্র তৈরী করে', চার-পাঁচজন নার্স ইঙ্গিতের অপেক্ষায় সশঙ্কিত হয়ে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুডির বিশ্বস্ত ম্যানেজার জর্জ্জ উল্‌ম্যান কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু প্রয়াস তাঁর বোধ হয় ব্যর্থ-ই হ'ল—কানের কথা মনে আর পৌঁছল না।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' রুডল্‌ফ হোহো করে' হেসে উঠলেন—বোধ হয় বাঁচাবার এই ব্যর্থ প্রয়াসে, ডাক্তারদের উদ্দেশে এটা তাঁর বিদ্রূপেরই হাসি। স্তিমিত চোখ দুটো আবার যেন বাইরে আসতে চাইল—দৃষ্টি তাঁর এলোমেলো—কার দিকে যে তিনি চাইছেন, কি যে চাইছেন, কিছুই বোঝা যায় না। হাসির পর থেকেই অনর্গল তিনি কি বক্‌তে আরম্ভ করলেন। সচেতন মানুষ সে কথার 'খেই' খুঁজে পায় না, মানে বোঝে না। ডাক্তার-রা বলে 'ডিলিরিয়ম।' ভাষা কখনো ইংরাজী, কখন ইতালী—কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই—অথচ, প্রত্যেকটার মানে আছে।

তখন রাত বারটা বেজে গিয়েছে।

অবিশ্রাম রাত্র জাগরণের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ উল্‌ম্যান মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরে' তখনও বসে'—যদি সংজ্ঞা ফিরে আসে এই আশায়। অতর্কিতে চোখ দিয়ে বৃদ্ধের দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে এল—তাঁর মনে হ'ল ভ্যালেন্‌টিনো যেন চুপ করলেন—জ্ঞান যেন তাঁর ফিরে এসেছে—তিনি যেন উল্‌ম্যানকে কি বল্‌তে চাইছেন, বল্‌তে পারছেন না। ধীরে ধীরে তিনি ভ্যালেন্‌টিনোর মুখের কাছে তাঁর মুখটা নিয়ে গেলেন। দৃষ্টি অপলক! চাউনির মধ্যে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই—দীর্ঘাকার বিরাট রোমীয় পুরুষ যেন তাঁর সারা শরীরটাকে আজ মন থেকে মুক্ত করে' হংস-ধবল গদির বিছানায় বহু যুগের বিশ্রাম নিতে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন। কয়েক সেকেণ্ড সেই অদ্ভুত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উল্‌ম্যানের ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠল—একবার তিনি যেন ছুটে পালাতে চাইলেন, পরক্ষণেই আবার ভ্যালে[ন্‌]টিনোকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—পাশেই দু'জন না[র্স] তখনও অপেক্ষা করছিল, তারা বৃদ্ধকে ধরে' ফেল্‌লে- ডাক্তার-রা বাঁ পাশের ঘর থেকে ছুটে এল—উল্‌ম্য[ান] সাধারণ মানুষের মতই চীৎকার করে' কেঁদে উঠলেন।
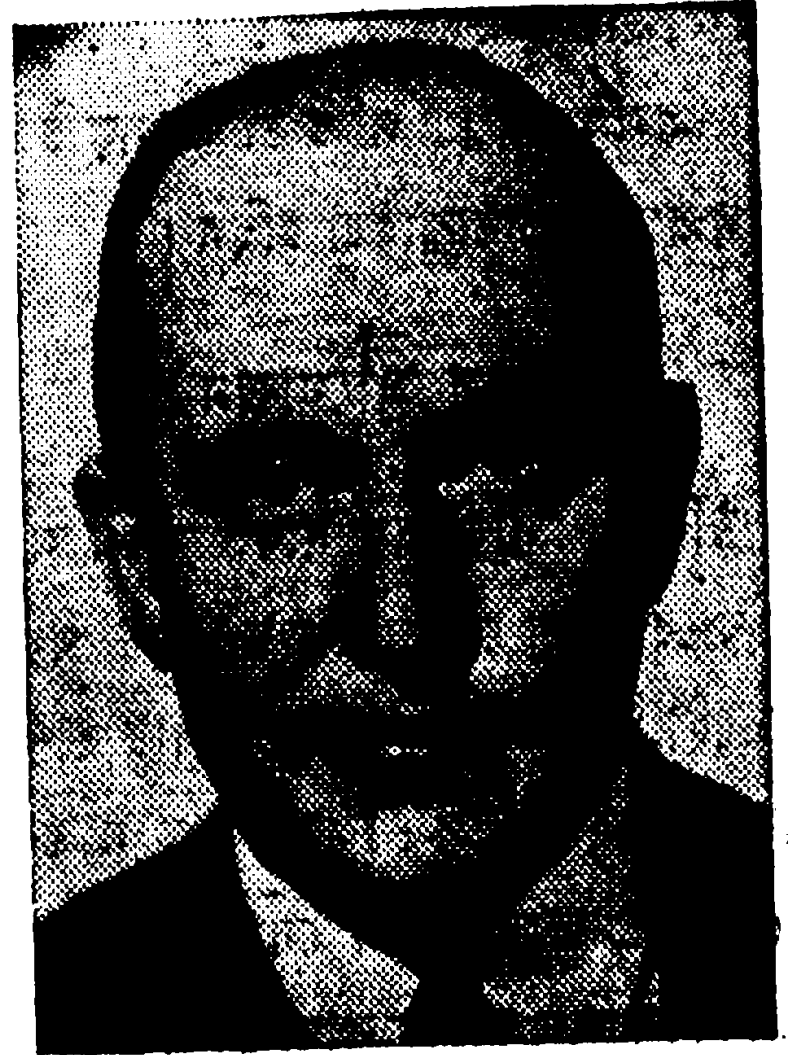
পলিক্লিনিক হাসপাতালের করুণ বারটী ঘণ্টা দশ মি[নিট] আগেও নিকটস্থ জনসাধারণকে রাত্রের বয়স সম্বন্ধে সত[র্ক] করে' দিয়েছে। কিন্তু তারপরই সেই কুয়াসাচ্ছন্ন গভীর রা[ত্রে] এক ভীতিপ্রদ করুণ আর্ত্তনাদ 'চার্চ্চ বেলে'র ভেতর দি[য়ে] আকাশ বাতাস তরিয়ে নিকটস্থ সকলেরই কানে কা[...]

বলে দিয়ে গেল—'আজ আর ভ্যালেন্‌টিনো নেই!' শয্যা-পার্শে প্রেমিকা প্রেমিককে আতঙ্কে বেষ্টন করে' চমকে উঠল—দলে দলে নিউইয়ার্ক সহরের শিল্পী, দার্শনিক, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র একইভাবে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে পলিক্লিনিক হাসপাতালের রুদ্ধ দ্বারে গিয়ে বিশ্বপ্রেমিক-কে দেখ্‌বার জন্য কত কাকুতিই না করতে লাগ্‌ল! তারপর অদর্শনের হতাশায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাজার হাজার লোক মুক্ত আকাশের তলে, পথের ধারে বাকী রাতটুকু অতি সহজভাবেই শারীরিক অস্বস্তিকে অস্বীকার করেই কাটিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন, মঙ্গলবার।

ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর এসে চিত্র-জগতের অনুপমকে দেখ্‌বার আশায় আকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু শোকে সারা আকাশ আজ মুহ্যমান। আলোর দেবতার চোখ দু'টী জলে ভরে' উঠল—সঙ্গে সঙ্গে দু'-একফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল। আকাশে বাতাসে, পথে ঘাটে একটা হারানোর সুর, একটা হাহা শব্দ, একটা বিষাদের গান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা এমেরিকাকে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌লে। নগর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একটা পাগলা হাওয়া সশব্দে 'নেই, নেই' বলে' বয়ে গেল।

বিভিন্ন নগর হ'তে, পল্লী হ'তে, মেয়ে-পুরুষ, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ হাজারে হাজারে পথ ঘাট ছেয়ে ফেলেছে। রূপকুমার ও রূপকুমারীদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত মায়াপুরী হলিউড যেন কোন্‌ যাদুমন্ত্রে, কোন্‌ রূপার কাঠির স্পর্শে অচেতন স্তব্ধ মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের ভেতর ও বাহিরে লক্ষাধিক লোকের জনতা, পুলিশের সুবিচারকে তুচ্ছ করে' রুডিকে শেষ দেখ্‌বার আশায় শবের সঙ্গ নিয়েছে। হাসপাতাল থেকে উনপঞ্চাশ ষ্ট্রীটে একটার্স চার্চ্চ যেতে পথের দু' ধারে বাড়ীগুলিকে ফুলে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথে মানুষ আর মানুষ!

একদিন যে দুরন্ত ছেলে সারা পৃথিবীটাকে তোলপাড় করে' ফেলার আনন্দে, নিত্য-নূতন রংঙের স্বপ্নে মসগুল হয়ে দেশ ছেড়ে আটলাণ্টিকের অপর পারে নূতন জগতের খোঁজে অকুল সমুদ্র-যাত্রা করেছিল—আজ সে আবার হলিউড এমেরিকা ও সারা পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়ে প্রেম-প্রীতি, প্রিয়-অপ্রিয় সব তুচ্ছ করে' কোন্‌ অজানা দেশে যাত্রা করেছে তা' কে বলতে পারে!

বাল্যে টরেণ্টের সেনাস্কুল 'দ্যস্তে এ্যালেগেরি'তে এবং পরে পেরুজোয়ার 'কলেজিয়ো ডেলাসিপেএগ্রা' থেকে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বিতাড়িত ভ্যালেন্‌টিনো—জেনোয়ার কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালের উচ্ছৃঙ্খল ভ্যালেন্‌টিনো—ভাগ্য পরীক্ষার আশায় মন্টিকার্লোতে জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত ভ্যালেন্‌টিনো—দুঃখ-দরিদ্র্যতায় উত্যক্ত, চাকরীর জন্যে পেট ভরে' দু'বেলা দু'টী খাবার জন্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ভ্যালেন্‌টিনো এবং তারপর শেষ চূড়ান্ত প্রশংসিত, পৃথিবীর চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল তারকা ভ্যালেন্‌টিনো আজ সব যুক্তি-তর্ক, সুখ-দুঃখ, সুনাম-দুর্নাম ও মান-অভিমানের বাইরে।

মানুষ এম্‌নি করেই একটা উপলক্ষকে অবলম্বন করে' চলে' যায়। কিন্তু পশ্চাতে যা' কিছু রেখে যায়, তাই হয়ে ওঠে তখন তার অবর্ত্তমানের পুঁজি বা সম্বল। দীর্ঘ ন'টী বছর কেটে চলেছে, কিন্তু আজও ইউরোপ এবং এমেরিকার ছায়া-চিত্র-জগতের নরনারী ও জনসাধারণ চব্বিশ-এ আগষ্টের কথা স্মরণ করে—আজও প্রতি বৎসরের ঐ দিনটীতে স্বপ্নের অলকানন্দা, সকল রূপ-রস-গন্ধের নন্দনকানন হলিউডের কিন্নর-কিন্নরীরা সেই অপরূপের বিরহ চিন্তায় ঠিক্‌ তেম্‌নি করেই চম্‌কে ওঠে এবং সমবেত হয়ে, বেভারলি পাহাড়ের ওপর ভ্যালেন্‌টিনোর 'কটেজ'টী ও গির্জ্জার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পথটী শাদা ফুলে ভরিয়ে তোলে, তাঁর মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করে।

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধায় নিজেদের গৌরবই বৃদ্ধি পায়। অতীত গৌরব স্মরণে নিজের স্মৃতিই মার্জ্জিত হয়—আর গুণী-জীবনের আলোচনায় জাতি, সমাজ ও শিল্পের উন্নতি হয়। আজ আমি ভারতবাসী, তথা বাঙালীর তরফ হ'তে প্রেমিক শিল্পীর প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা তাঁর এই বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবে, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে সমানভাবেই সেই অজানা দেশে পাঠালাম।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বেতারে কিশোরীদের নাট্যাভিনয়

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

পরিচালনায়

'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকাভিনয়ে

বাগবাজার-পল্লীর

'ব্যোমকালী-বালিকা-সঙ্ঘ'

সঙ্ঘের বালিকাগণ প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও অল্প-বয়স্কা। গত শুক্রবার, ত্রিশ-এ আগষ্ট বেতার অভিনয়ে ইহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও সঙ্গীত শিক্ষাদানে সুনিপুণ, সুকণ্ঠ গায়ক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহাদের অবিদিত নাই। কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন সংস্থা ও বহু
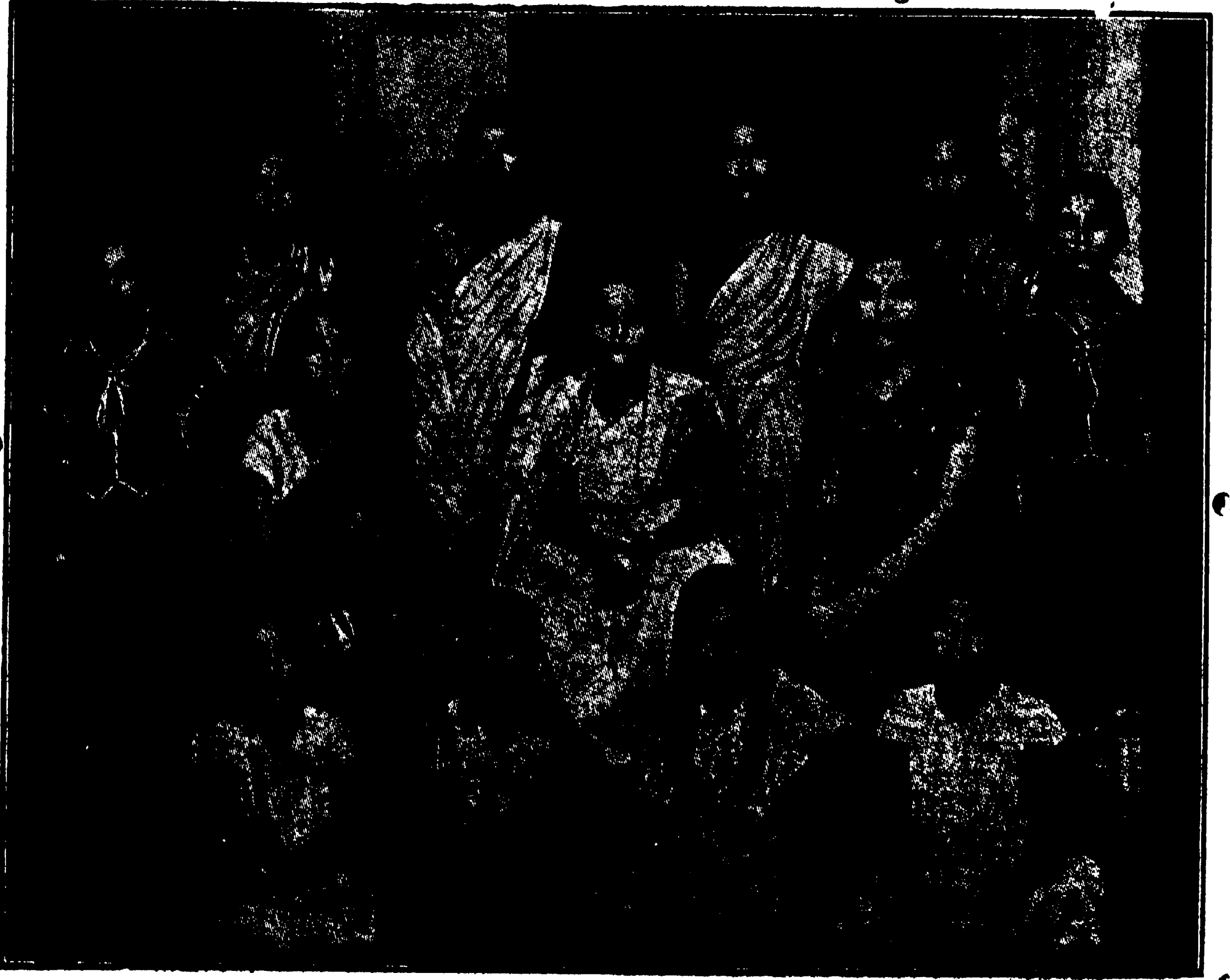
বালিকাদের পরিচয়—কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়, কুমারী শিবানী মুখোপাধ্যায়, কুমারী ঈশানী মুখোপাধ্যায়, কুমারী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী, কুমারী মাধবী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী রেণুকা মজুমদার, কুমারী প্রতিমা সেনগুপ্তা, কুমারী শোভারাণী রায়, কুমারী আরতি সেন, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়, কুমারী অলকা সেন, প্রভৃতি।

যাঁহারা সঙ্গীতবেত্তাদের সংবাদ রাখেন, আধুনিক বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীতাচার্য্যরূপে ইনি সুপরিচিত। এই উৎসাহী, মিষ্টভাষী, অমায়িক সুরশিল্পী বাগবাজার-পল্লীর অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোরী কন্যাদিগকে লইয়া এই নির্ম্মল সঙ্গীত সঙ্ঘটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বালিকারা সকলেই নারায়ণবাবুর ছাত্রী। তাঁহার কন্যা কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়ও এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তা। 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে' 'কয়াধু'র ভূমিকায় ইহার অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রার্থনা

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

গল্পলহরী

সম্পাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম বর্ষ | পৌষ, ১৩৪১ | নবম সংখ্যা

পরাশর

শ্রীবজ্রাচার্য্য

—জেলায় নিবিড় বনমধ্যে নদীতীরে একটী মন্দির। এক স্থবির পূজারী মন্দির-সংলগ্ন কুটীরে বাস করেন। লোকালয় হইতে বহুদূরে এই ক্ষুদ্র অথচ অতি সুন্দর মন্দির কেন নির্ম্মিত হইল ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত-ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। বুঝিলাম, কোন করুণ কাহিনী পশ্চাতে নিহিত আছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধের মনে ব্যথা দেওয়া ভদ্রোচিত হইবে না ভাবিয়া নিবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কৌতূহল এতই উদ্দীপিত হইল যে, আমি নিত্যই সেই বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতে যাইতে লাগিলাম। প্রায় একমাস পরে বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলেন। কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, জেলার নাম বা মন্দিরের অবস্থান কাহাকেও যেন প্রকাশ না করি। পূজারীর নাম-ধাম ত গোপন করিতে বাধ্য। তিনি চান অজ্ঞাতবাস; স্বেচ্ছায় যিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়াছেন, আবার তাহার সহিত তাঁহার সংস্রব কেন? তবে কেহ যদি আমার মত ঘটনা-চক্রে তাঁহার মন্দিরে যান, তবে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, আগন্তুক পাইবেন তাঁহার বুকভরা ভালবাসা, অনন্ত সহানুভূতি এবং অসীম আত্মনির্ভরতা। আমার মত কাঙাল যাত্রীর পক্ষে সে সঞ্চয় অল্প কম নহে।

দুই

তিনি বলিলেন—এটী প্রাণের কথা। মনে করিয়াছিলাম, কাহাকেও বলিব না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে পারিলাম না। ভগবান আমায় মার্জ্জনা করুন।

আমার স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া গৃহাভি-

মুখে যাত্রা করিলাম। কর্ম্মস্থান হইতে আমার বাসাবাটী প্রায় ষাট মাইল পার্ব্বত্য বনপথ। যান, একখানি মোটর সাইকেল। সেদিন পূর্ণিমা। শুভ্র জ্যোৎস্নায় ধরণী প্লাবিত। আন্দাজ আট ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়াছিলাম। পথ-পার্শ্বস্থ বনশ্রেণী অতি ভয়াবহ, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল। অন্য কোন সময় হইলে আমি কিছুতেই একাকী রাত্রিকালে বাটী আসিবার সংকল্প করিতে পারিতাম না। সেদিন কর্ত্তব্যের তাড়নায় আমি সম্পূর্ণরূপে ভয় বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, আমি অতি দ্রুতবেগে সাইকেল চালাইতে ছিলাম। প্রায় দুইঘণ্টা চলিয়া আসিয়া সহসা পথিপার্শ্বে দুইটী উজ্জ্বল আলোক দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। বহু বার ঐরূপ আলোক দেখিয়াছি, সুতরাং ভুল হইল না। দূরে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বসিয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কি করিব? সাইকেল থামাইব, কি চালাইব? ভাবিবার সময় পাইলাম না। সহসা সাইকেলের 'ব্রেক্' টিপিয়া নামিয়া পড়িলাম। সম্মুখে বিশালকায় ভীষণ ব্যাঘ্র।

আমি অভিভূত। ব্যাঘ্রটী স্থিরনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি ত তাহার চক্ষু হইতে অন্যদিকে আমার দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়া গেল; পরে ব্যাঘ্র অতি মন্থর গতিতে বনাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। আমি যেন ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলাম। কেন করিলাম তাহা জানি না।

তিন

অতি নিবিড় বন। কিন্তু ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ যাইতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কত-ক্ষণ অনুসরণ করিয়াছিলাম, স্মরণ হয় না; তবে অনুমান পনের হইতে বিশ মিনিট হইবে। চলিতে চলিতে ব্যাঘ্রটী স্থির হইয়া একটী বৃক্ষতলে বসিল এবং পুনরায় আমার দিকে তাকাইল। এবার আমি ব্যাঘ্রের দিকে না তাকাইয়া নিশ্চিন্তমনে চারিপার্শ্ব দেখিয়া লইলাম। যে বৃক্ষতলে আমরা অবস্থিত, তাহা হইতে একটী মধুর গন্ধ আসিতে-ছিল; অথচ ফুল কি ফল কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্থানটি বেশ পরিষ্কার। দেখিতে পাইলাম বৃক্ষতলে কি নড়িতেছে! অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী নবজাত সুন্দর মানব শিশু। লাল সূতায় বাঁধা একটী ঝুলি বুকের উপর রহিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সেই মুহূর্ত্তে কি যেন স্বর্গীয় সুখ ও শান্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার প্রতি শিরায় ছুটিয়া গেল—তাহা বর্ণনার অতীত। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় ব্যাঘ্রটী চলিতে আরম্ভ করিল। অগত্যা শিশুটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। যথাকালে ব্যাঘ্র আমার পরিত্যক্ত মোটর সাইকেলের নিকট আমাকে উপস্থিত করিল এবং নিমেষে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

চার

রোমাঞ্চকর বিস্ময়ে আমি কিয়ৎকাল অভিভূত হইয়া ছিলাম। শিশুর উষ্ণ ও কোমল স্পর্শে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পরিধেয় কামিজ উন্মোচন করিয়া শিশুকে আবৃত করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া একহস্তে শিশুটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, ও অপর হস্তে মোটর সাইকেল চালাইলাম। দুই ঘণ্টার পথ ধীরে ধীরে অতি-ক্রম করিতে আধঘণ্টা সময় লাগিল। যখন গৃহে পৌছি-লাম, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। সংবাদ শুভ, স্ত্রী ভাল আছে। গত রাত্রে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল, ভগবানের কৃপায় তাহা অতিক্রম করিয়াছে। এখন সেবা ও চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া যথাসময়ে আরোগ্য হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার বিধবা ভগ্নীর নিকট শিশুকে অর্পণ করিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বিশ্রামান্তে স্ত্রীকে শিশুর কথা বলিলাম ও শিশুটীকে দেখাইলাম। সে সুখী হইল না। যাহা হউক, সে তখন নিজের পীড়ার জ্বালায় অস্থির, শিশু সম্বন্ধে তাহার মতামত কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বুঝিলাম না। ভাবিলাম, স্ত্রীর অসন্তোষ আর কিছুই নহে—অসুস্থতার অভিব্যক্তি মাত্র। শিশুর বক্ষে যে ক্ষুদ্র ঝুলিটী ছিল। গৃহে কপাট বন্ধ করিয়া নিভৃতে তাহা পরীক্ষা করিলাম।

…লিটী সাধারণ মোটা খদ্দরের। ভিতরে এক চতুষ্কোণ …লক কাপাস তুলার ভিতর রক্ষিত। দেখিলাম, স্বর্ণ-…কের মধ্যভাগে উভয় পৃষ্ঠে একটী একটী ওঁকার খোদিত। …চ্ছাক্রমে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ঐ ওঁকারে চাপ …বামাত্র চতুষ্কোণ হইতে চারিখানি ক্ষুদ্র তালপত্র বাহির …ইল। বুঝিলাম, ভিতরে স্প্রিং-এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রকায় …রিখানি তালপত্র ধৃত আছে। ওঁকারে চাপ …পগত করিবামাত্র ঐ পত্র চারিখানি আবার চতুষ্কোণ …কে লুক্কায়িত হইল। অতি সূক্ষ্ম সূচ দিয়া রক্তবর্ণ …ক্ষরে তালপত্রে লিখিত শ্লোক চতুষ্টয়। আতসী কাচ …হায্যে পাঠ করিলাম। মহা বিস্ময়ে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ …ইয়া উঠিল। শ্লোকগুলি দেবনাগরী হরফে লিখিত। …নুবাদ এইরূপ—

প্রথম পত্র।—

ওঁ। পরাশর হইতে পরাশর। বৈয়াঘ্রপাদ গোত্র। …ীতম, আয়াস্য আঙ্গিরস প্রবর। ইচ্ছামৃত্যু। দেব-…ধীন জীবন। ওঁ॥

দ্বিতীয় পত্র।—

ওঁ। মহা ঐশ্বর্য্যময়, দেবদ্যুতি, দিব্যকান্তি। শয্যা …য়ে রত্নরাজি। পালক তাহার ভোগাধিকারী। ওঁ॥

তৃতীয় পত্র।—

ওঁ। কলুষিত জীবন পালনে অনধিকারী। পবিত্র-…পূত স্বর্ণফলক আদর্শে তাহার পরীক্ষা। ওঁ॥

চতুর্থ পত্র।—

ওঁ। শিশু ক্ষমাশীল, কিন্তু অভিমানী। তাহার …মানমাত্র দেবদূত আসিয়া লইয়া যাইবে। তন্মুহূর্ত্তে …ক ঐশ্বর্য্য ও শান্তির অনধিকারী। ওঁ॥

দিবারাত্রি আবৃত্তি করিয়া চারিটী শ্লোক কণ্ঠস্থ করি-…ম। বাড়ীতে শালগ্রাম শিলার সিংহাসনে, শালগ্রামের …তলে লুক্কায়িত করিলাম।

পাঁচ

এই ঘটনার পর আমার দিনগুলি বেশ সুশৃঙ্খলে যাইতে …গিল। স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিলে আমি সপরিবারে …স্থানে চলিয়া আসিলাম। সংসারে আমার স্ত্রী, দুই বৎসরের এক পুত্র, বিধবা ভগ্নী ও নবাগত শিশু। শিশুটীর ভার দিদিই লইয়াছিলেন। আমার স্ত্রী প্রথম হইতেই শিশুটীকে স্নেহের চক্ষে দেখিত না। সে সর্ব্বদাই বলিত, "কোন হতভাগিনীর সন্তান আমার সোণার চাঁদ সন্তানের অকল্যাণ করিতে আমাদের সংসারে আসিয়াছে। আমি নিতান্ত আহাম্মক, তাই ও পথের পরিত্যক্ত শিশুকে নিজ গৃহে স্থান দিয়াছি। সুতরাং, তাহাকে যে স্থান হইতে আনা হইয়াছে, সেই স্থানেই রাখিয়া আসা হউক।" আমি প্রতিবাদে কলহ করিতাম না; নীরবে শুনিয়া যাইতাম। বুকটা সজোরে কম্পিত হইত; ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতাম—"হে ঈশ্বর, যেন কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই, যেন ত্রুটি না হয়, অভিমানী শিশু যেন আমাকে ছাড়িয়া না যায়!" অভিযোগসত্ত্বেও আমার স্ত্রী শিশুটীকে যথাসাধ্য সেবা করিত; সময়ে সময়ে কোলে লইয়া আদর করিত; বলিত, "আচ্ছা, যখন আসিয়াছে থাক; যদি আমার পেটেরই হইত। নটুকে (আমার পুত্রের নাম) দাদা বলিবে; নটুর খেলার সাথী হইবে।" ইত্যাদি। যেদিন এরূপ দেখিতাম, সেদিন আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতাম। কিন্তু আদর অপেক্ষা অনাদরের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। আমি ও দিদি কাতর হইয়া পড়িতাম। ইহার উপর যদি নটুর অসুখ হইত ও পরু (নবাগতের ডাকনাম—পরাশরের অপভ্রংশ) ভাল থাকিত, তাহা হইলে সংসার অগ্নিময় হইয়া উঠিত। নিত্য পূজা করিবার সময় আমি সেই স্বর্ণফলকখানি চন্দনচর্চ্চিত করিয়া বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিতাম। ইহাতে আশ্বস্ত হইতাম বটে, কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কাজনিত আমার বক্ষ স্পন্দন নিবারিত হইত না। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখিতাম। দিদি ও আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। একদিন সুযোগ বুঝিয়া (আমার স্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবা, প্রায়ই ক্রোধবশতঃ মূর্চ্ছা যাইত) তাহাকে বুঝাইলাম যে, পরুকে অযত্ন করিলে আমরা সবংশে নষ্ট হইব; কেন না, পরু দেবশিশু। কতক সুফল ফলিল; আদর-যত্ন চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, পরুর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ-ব্যবহার শুধু আমার ও নটুর মরণ ভয়ে,

প্রাণের টানে নহে। এমনি করিয়া মানসিক অশান্তিতে দিন যাইতেছিল। আমার কাঠের ব্যবসায়; তাহাতে বিস্তর লাভবান হইয়াছিলাম। অতি অসম্ভব উপায়ে পরুর আগমনের ছয়মাসের মধ্যে আমার উন্নতি হইয়াছিল। কি উপায়ে যে অত অল্প সময়ের মধ্যে আমার যশ, মান, ও অর্থ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার কৃপণ স্বভাব নহে; দুই হস্তে মনের সুখে অর্থব্যয় করিয়াও আমার যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হইত। বোধ হয় একটু মাদকতা আসিয়াছিল; কেন না, আমি আমার উন্নত অবস্থা আরও উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলাম। লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে ফেলিলে আশ্চর্য্য লাভ হইবে এই লোভে টাকা কি করিয়া সংগ্রহ করা যায়, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুই-তিনদিন ক্রমাগত ভাবিয়া সহসা একদিন স্বর্ণফলকের দ্বিতীয় পত্রের কথা মনে হইল—"পালক রত্নরাজির অধিকারী।" কালবিলম্ব না করিয়া আমি রাত্রে সেই বনপথে যাত্রা করিলাম। যেখানে আমার ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইস্থানে দূরত্ব-জ্ঞাপক একটী প্রস্তর ছিল। আমি নির্ভীকচিত্তে সেই রাত্রে একাকী বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যথাকালে সেই পরিচিত সুগন্ধময় বৃক্ষের তলে উপনীত হইলাম এবং যেস্থানে পরু পড়িয়াছিল, সেই স্থান একটী বৈদ্যুতিক আলোক সাহায্যে স্থির করিয়া লইলাম। সামান্য খনন করিবার পর একটী লৌহময় বলয়যুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাইলাম। বিনাক্লেশে তাহা অপসারিত করিয়া একটী তাম্রময় কলস প্রাপ্ত হইলাম। তাহার ভিতর অগণ্য মণিমাণিক্য। যত পারিলাম থলিতে ভরিয়া লইলাম। কলসটী যে কত গভীর তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; কেন না, মণিমাণিক্য ভেদ করিয়া উপর হইতে তাহার তলে হস্ত পৌঁছিল না। কলসটীকে উপরে উঠাইতে পারি নাই। প্রস্তর ও মৃত্তিকায় স্থানটী পূর্ব্ববৎ করিয়া চলিয়া আসিলাম। সে রাত্রে যাহা আনিয়াছিলাম, তাহা বিক্রয় করিয়া সাতলক্ষ টাকা পাইলাম।

ছয়

পার্থিবসুখ কানায় কানায় পূর্ণ। এই সুখের উপর পরু কথা কহিতে ও হাঁটিতে শিখিয়াছে। কিন্তু নটুর শরীর কি জানি কেন রুগ্ন হইয়া পড়িল। সুতরাং, স্ত্রীর মং অর্থের দিক্ ভিন্ন, অপরদিকে পরু 'কুলক্ষুণে ছেলে।' স্ত্রী তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে এবং সময়ে সময় প্রহার পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। এই সময় আমি স্বর্ণফলক খানি বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিলাম। শুষ্কব দিয়া মর্জ্জিত করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার মুখে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কাচের আর্শিতে যেমন নিখুঁ দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ নিখুঁত দেখা গেল। চকিতে দেখি লাম—আমার বদনমণ্ডল কালিমামাখা, চক্ষু কোটরাবিষ্ট লোলচর্ম্ম, যেন বৃদ্ধের বদন। এ কি শরীর! শিহরিয় উঠিলাম। তবে কি আমার কলুষ-জীবন? পরু কি চলিয় যাইবে? আর আমি—অর্থাৎ, আমার অমন অর্থপ্রসূ ব্যব সায়, আমার স্ত্রী, নটু, দিদি ও আমি এই এতগুলির সমষ্টি কোথায় যাইব? চলতি ব্যবসা—আমার বক্ষের রক্ত, ইহ নষ্ট হইলে আমি বাঁচিব না। বনের ভিতর রত্নরাজি— অসামান্য ধনের অধিকারী! পরুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হারাইব। স্ত্রী, নটু ও দিদির জীবন—বিশ্বাস কি আমি? সকল ভোগের ভোগী আমিই কি থাকিব? এ সকল অনর্থের মূলে কিনা একটী সন্তান পালনে অযত্ন-কলুষ! সন্তান পালন কি এতই কঠিন কার্য্য? সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরুকে বুকে লইয়া অন্য কোথাও যাই ন কেন? নীরবে নিভৃত নিশীথে কাহাকেও কিছু না বলিয় আমি গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করি না কেন? একটী শিশুর সেবা করিতে আমি সক্ষম নই। সেই রাত্রে স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম যে, আমার গৃহে দেবশিশুর অপমান ঘটিলে, আমার কাঠের গোলা ভস্মসাৎ হইবে, আমি আত্ম-ঘাতী হইব, হয় ত নটুর অকল্যাণ হইবে। বিস্তর বাদানু-বাদ হইল; স্ত্রী বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, আপদ-বালাইকে গৃহে না আনিলে ত এ সব কথা হইত না। কি কাজ অর্থে? নটুকে লইয়া গরীব হইয়া থাকিলেও সুখী হইতাম। ইত্যাদি। শেষে মিটমাট হইল। স্ত্রী যথাসম্ভব যত্ন করিবে; গালাগালি দিবে না; প্রহার করিবে না; তবে সে লোক দেখান আদর-যত্ন করিতে পারিবে না; আমিও 'খুঁটিনাটি' দোষ ধরিব না। পরদিন স্বর্ণফলকে মুখ দেখি

লাম, পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম না। তারপর প্রতি দিন দেখিয়াছি, কখনও পরিষ্কার দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বদাই বিকৃত, সর্ব্বদাই কালিমামাখা নিজের বদনমণ্ডল দেখিয়াছি। যাতনায় ছটফট করিয়াছি; অথচ, বাহ্যিক কোন কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করি নাই। পরুকে বুকে লইয়াছি; তাহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে করিয়াছি, সে আমার সব দোষ ক্ষমা করিয়াছে। পরু কাঁদিতেছে শুনিলে, আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিবিধান করিতাম। দিদি ত তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন।

সাত

পরু ষোড়শ মাসে পদার্পণ করিল। ষোলকলায় পরিপূর্ণ চাঁদ যেমন সুন্দর, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা শতগুণ সুন্দর এই দেবশিশু। প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে তা'র মাধুর্য্য ক্ষরিয়া পড়িত। গান ও ছন্দের যদি কোন আকৃতি থাকে, মনে হয় পরুর আমার প্রতি স্পন্দনে তাহা ছড়াইয়া পড়িত। কি সম্মোহিনী শক্তি এই ষোড়শ মাসের বালকের! এমন লোক নাই যে, পরুকে স্পর্শ করিয়া মুগ্ধ না হইত। শিশু শুধু কল্যাণ বিতরণ করিত; 'হরিবোল' বলিলে দুই হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিত। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে করতালি দিয়া 'বাহবা' বলিত। কত অনিদ্র রজনী আমি এই দেবশিশুর অলৌকিক কথা ভাবিয়াছি; তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া কতক্ষণ তন্ময় অবস্থায় কাটাইয়াছি; নিজের স্বার্থের কত অসীম চরিতার্থতা-সাধন স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার মান, যশ, অর্থ পরুর জীবনের সঙ্গে জড়িত; সেই পরুকে অবজ্ঞা—অসম্ভব! অথচ সত্য!! স্ত্রী যে একেবারে অবাধ্য তাহা নহে, তবুও কি যেন মোহজালে জড়িত—কোথা হইতে অনাদরের প্রবল বন্যা; আমার সুখ শান্তি ভাসাইয়া দিল।

আট

সেইদিন সংক্রান্তি; ৺সত্যনারায়ণ পূজা। নটু পূজার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পরু কিন্তু দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতেছে। দিদি ও আমার স্ত্রী পূজার আয়োজন করিতেছে। দিদি মাঝে মাঝে হাস্যমুখে পূজার ঘরে আসিতে বারণ করিতেছে; পরু কিন্তু শুনিতেছে না। হঠাৎ সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকটা সিন্নি মুখে দিল এবং পরক্ষণেই একটা কলা তুলিয়া লইয়া মুখমধ্যে প্রদান করিল। আমার স্ত্রী বোধ হয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল, কিন্তু এইবার ধৈর্য্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া পরুর গণ্ডে ভীষণ চপেটাঘাত করিল। পরু মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে অক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দিদি কাঁদিয়া উঠিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে ছুটিয়া আসিলাম এবং স্বর্ণফলক বাহির করিয়া নিজের মুখ দেখিলাম। উঃ, কি ভীষণ বিকৃত মূর্ত্তি! এ কি মানব না রাক্ষস? রাক্ষসই বটে;—এত রক্তধারা দুই ওষ্ঠে? এতবড় চক্ষু? এত বৃহৎ মুখমণ্ডল? এ কি আমি? উন্মত্তের মত ছুটিয়া পরুকে বক্ষে ধারণ করিলাম। তাহার পর বাহ্যিক সংজ্ঞা হারাইয়া ছিলাম। দেবদূত আসিয়া পরুকে দাবী করিয়াছিল; আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, আমি অধম, অকৃতী, সন্তান পালনে অযোগ্য। অর্থে ও সামর্থ্যে সর্ব্বাংশে বলীয়ান হইলেও, অবহেলার কলুষ সন্তানের অকল্যাণ সাধন করে। দেবদূত বলিল, "হতভাগ্য, তোর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া আমি তোকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন দিয়াছিলাম। বল, বুদ্ধি, বিদ্যা সবই তোর ছিল, কিন্তু অভ্যাসদোষে কার্য্য-কুশলতা হারাইয়াছিস। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তুই তাহা প্রয়োগ করিতে অক্ষম হইলি! তোরই মত মন্দভাগ্য কোটী কোটী নরনারী সন্তান কামনা করিয়া সন্তান লাভ করে—কিন্তু কই, পালনে যত্ন কোথায়? তোরা অপ্রাণের উপাসনা করিস্—প্রাণের যত্ন শিখিস্ নাই। ঈশ্বর শিশুর অপমান সহ্য করেন না; আমরা তাই অপমানকারীর বুক হইতে লক্ষ শিশু দৈনিক কাড়িয়া আনি। সন্তান হারাইয়া হাহাকার সকলেই করে, কিন্তু এতটা বিসর্জ্জন দিয়াও প্রকৃত শিক্ষালাভ কাহারও হয় কি? বুঝে দেখ, নারায়ণকে দূরে ফেলিয়া তোরা কি না আজ কলার পূজা করিলি! ধিক!!"

নয়

দিদি বলিল, আমি পরুকে বুকে লইয়া সংজ্ঞাহীন হইবার পর এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। কেহ বাধা দিতে সাহসী হয় নাই; সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়াছিল। তাহার পর কতদিন বিগত হইয়াছে, সেই বনে কতবার গিয়াছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ আর চিনিতে পারি নাই। সুগন্ধ এখন আর সেই একটী গাছ হইতে বাহির হয় না; সারা বনটী ভরা সুগন্ধ। কাজেই আর পথ চেনা যায় না; বনে আসিলেই কোথায় কোন্ পথে চলিয়া যাই, তাহা স্থির হয় না। এখন মনে হয়, প্রতি বৃক্ষতলেই পরু শুইয়াছিল, তাই প্রতিবৃক্ষতলে ধনরত্ন আছে। উঃ, সারা বনটাই ত রত্নরাজিতে পূর্ণ! এখন কিন্তু একটী কাণাকড়িও প্রাপ্তির উপায় নাই। যেখানেই খনন কর শুধু মৃত্তিকা; সে প্রস্তরও নাই, তাম্র কলসও নাই। আমার ব্যবসার কি হইল? স্ত্রী, নটু ও দিদি কোথায়?—আর থাক্—সে সব কথা নাই বা শুনিলে।

দশ

এই মন্দিরটী করিয়াছি। ভিতরের বিগ্রহ একটী ষোড়শমাসের শিশুমূর্ত্তি। বক্ষে স্বর্ণহার, হস্তে স্বর্ণবলয়, মস্তকে কুঞ্চিত কেশকলাপ। বিগ্রহ দোলায় স্থাপিত। পূজার উপকরণ জল ও কমলালেবু, যাহা পরু ভালবাসিত। যে একান্ত-মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিগ্রহকে দোল দেয়, তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়—

"আমার মত্ত মনের মধুপ সে যে,
চিত্ত দোলায় নিত্য দোলে;—
দোল্—দোল্—দোল্—দোল্—দোলা।"—*

ওঁ

বজ্রাচার্য্য

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

স্পর্শমণি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

একমাত্র মেয়ে।

দুধে-আলতা রং, টানা টানা চোখ, জোড়া ভুরু, ভোমরা কালোচুল, মুক্তোর মত শাদা দাঁত, রক্ত-রাঙা ঠোঁট, মৃণালের মত বাহু, চাঁপার কলির মত আঙুল—যেন শিল্পীর প্রতিমা। কোথাও খুঁত নাই—এতটুকুও নাই। যে দেখে, সেই চেয়ে থাকে—চোখ ফেরাতে পারে না—চেষ্টা করলেও পারে না। চেয়ে চেয়ে চাইবার তৃষ্ণা যেন আর মেটে না—বেড়েই চলে।

মা নিভাননী সদাই মারমুখো। হাঁড়িপানা মুখখানা ভার করে' গম্ভীর গলায় বলেন—বাবা, মেয়ে ত নয় যেন ধিঙ্গি!—সংসারের কাজকর্ম্মে এতটুকু ইচ্ছে নেই—আছে কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে' 'টল' দিয়ে বেড়ান। কেন রে বাপু, তুই হলি মেয়ে, সংসারের সব কাজকর্ম্ম দেখ্‌বি—আমি মা, অসুখ শরীর নিয়ে একা পেরে উঠি নে, আমার সুখ-সুবিধার দিকে তাকাবি, তা' না বেড়াবি কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে'—তার আবার না আছে সকাল, না আছে সন্ধ্যে।

স্বামী মহিম—স্কুলের মাষ্টার। ছাত্রদের 'হোম্ টাস্‌কে'র খাতার ভুল সংশোধন করতে করতে বলেন—কেন সকাল-সন্ধ্যায় ইলাকে অমন করো? পাঁচটা নয়,সাতটা নয়, মোটে ঐ একটা মেয়ে—কোনদিন টুপ্ করে' সরে' যাবে, তখন বক্‌বার জন্যে কাউকেও পাবে না—মাথা কুটলেও না।

মহিমের কথায় নিভাননীর চোখ জলে ছলছল করে' ওঠে। বলেন—ইলা কি শুধু তোমারই মেয়ে—আমার কি সে কেউই নয়—আমি কি তাকে এতটুকুও ভালবাসি নে—কেবলি বকি?

—আমি ত তাই দেখি—মহিম বলেন।

নিভাননী বলেন—তা' হ'লে, আজ থেকে আমি যদি আর ইলার সম্বন্ধে কিছু বলি তবে—আবদার দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে যা' করে' গড়ে' তুলেছ—সারাদিন স্কুলে থাক, তোমার ত আর শুনতে হয় না কিছু—দিনের মধ্যে পঞ্চাশ দফা নালিশ শুনতে হয় আমাকে। কেউ এসে বলে—গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছে, কেউ বলে—বাতাবী লেবু গাছে আর একটাও রাখে নি তোমার মেয়ে, কেউ বলে—তোমার মেয়ে ত দেখ্‌লাম সতীশ মালোর সঙ্গে সাঁতার দিচ্ছে 'পাগলা দহে'—এমনি আরও—

—আরও আছে নাকি?—মহিম জিজ্ঞাসা করেন।

—হাঁ—কাল ত শুনলাম মেয়ে আমার রোজ সকাল-সন্ধ্যায় রায়েদের মদনের কাছে ছোরা, লাঠিখেলা শিখ্‌ছে—নিভাননী উত্তর করেন।

—সে ত বেশ ভালই—আজকাল যে রকম নারী-হরণের সংবাদ পাওয়া যায়, তা'তে শুধু মেয়েদের কেন, মেয়ের মায়েদেরও যদি সুযোগ সুবিধা হয় তবে ও সব কিছু কিছু শিখে রাখা ভাল—তুমিও একটু একটু শিখে নিয়ো না ইলার কাছে—বলা যায় না, বিপদ কখন কোন্‌দিক দিয়ে আসে—মহিম হাসতে হাসতে বলেন।

—তোমার ওই অলক্ষুণে হাসিই মেয়ের ভবিষ্যৎটা ঝর-ঝরে করে' তুলছে—আরও তুলবে। জান না ত, সেদিন 'দহে' যেতে দেখি, মদনদের বাগানে মদন আর ইলা দু'জনে লাঠিখেলা অভ্যেস করছে। কোনদিন শুনব—নিভাননীর কথা শেষ হয় না।

ধমক দিয়ে মহিম বলেন—যেদিন শুনবে, সেদিন শুনবে—এখন কাজ থাকে ত মুখ বুজে কাজ কর গে।

নিভাননী নিঃশব্দে সংসারের কাজে মন দেন।

ইলাকে নিয়ে নিভাননীর ও মহিমের এইরূপ বাক্-

বিতণ্ডা এই প্রথম ও নতুন নয়। রোজই হয়, কোন কোন দিনে আবার দু'বারও হয়।

ইলার সহিত দৌড়ঝাঁপে কেউ পারে না, গাছে ওঠায় কারও কাছে সে হারে না, সাঁতারে সে প্রমাণ করে' দিয়েছে যে, তারও সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে হ'লে মাণিক মালোকে পুনর্জ্জন্ম নিয়ে আস্‌তে হবে। কুস্তীতে নাকি মদনও এক-একদিন তার কাছে হেরে যায়।

মেয়ের এই তথাকথিত দোষগুলি নিভাননী মুখ বুজে হজম কর্‌তে চান্ না—চাইলেও পারেন না।

মহিম কিন্তু পারেন বলেই মেয়েকে মধ্যে মধ্যে প্রশংসাও করেন।

ইলাকে নিয়ে মহিম ও নিভাননীর বাক্‌বিতণ্ডার প্রথম ও প্রধান কারণ এইটাই। সংসারের কাজকর্ম্মে মাকে সাহায্য করা না করাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মহিম বলেন—ইলাকে আজ দেখতে আস্‌বে।

—কোথা থেকে—নিভাননী জিজ্ঞাসা করেন।

—রতনপুর থেকে। হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে—এইবার ডাক্তারী পাশ দিয়েছে—মহিম উত্তর করেন।

—বেশ ভালই—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা না করে' নিভাননী বলেন।

সেই রাত্রে হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে মেয়ে দেখে যায়।

নিভা জিজ্ঞাসা করেন—কি বল্‌ল, পছন্দ হয়েছে ত ?

—বল্‌ল—চিঠি পাবেন—মহিম উত্তর করেন।

—তার মানেই পছন্দ হয় নি—নিভাননী বলেন।

—তাই বুঝি বল্‌ল যে—বেশ মেয়ে—আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে মহিম বলেন।

—ওই রকমই বলে। আমার বোনের বিয়ের সময় ওরকম কত জায়গা থেকে মেয়ে দেখ্‌তে এল, বলে' গেল—বেশ মেয়ে, গিয়ে চিঠি দেব—কিন্তু চিঠি আর কোন জায়গা হতেই আসে না—নিভাননী বলেন।

—তা' তোমার বোন্ আর ইলা ?—আকাশ আর পাতাল তফাৎ। তোমার বোন্‌কে দেখে যারা বেশ বলেছে, ইলাকে দেখ্‌লে তারা খুব বেশ বল্‌ত—মহিম বলেন।

—ইলা ত তোমার খুব বেশ, কিন্তু গুণগুলো ত তার একটাও খুব বেশ নয়, তাই বোধ হয় তাদের পছন্দ হয় নি—নিভাননী বলেন।

—তা' না হোক্, দেশে কি আর ছেলের অভাব ?—মহিম বলেন।

—দেশে মেয়েরও অভাব নেই—ছেলেরও নেই। কাজেই ইলার অভাবে হরিশ মুখুয্যের ছোট ছেলে অবিবাহিত নেই। আর তার অভাবে ইলাও 'আইবুড়ো' নেই।

ইলার বিবাহ হ'য়ে যায়।

স্বামী সামান্য চাকুরে—তার তথাকথিত দোষগুলির কথা জেনে-শুনেই তাকে বিবাহ করে—তার অপরূপরূপে মুগ্ধ হ'য়ে—নিজে পছন্দ করে'।

ইলা শ্বশুর-বাড়ী আসে।

এতদিনের অভ্যাস কাটিয়ে ওঠা তার কাছে হ'য়ে ওঠে দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

দেবর সোমনাথের সঙ্গে ছাদের ওপর সকাল সন্ধ্যায় সে ছোরা খেলে, লাঠি ঘোরায়।

সোমনাথ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশের খবরের আশায় এবং অপেক্ষায় এতদিন বাড়ীতে বসেছিল। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশের খবর পেয়ে সে কোল্‌কাতায় যায়—বোনের বাড়ী থেকে কলেজে পড়্‌বে বলে'।

মেয়ের বাড়ী বেড়াবার জন্য শাশুড়ীও যান্—সোমনাথেরই সঙ্গেই।

মহা মুস্কিলে পড়ে ইলা।

মুস্কিল আসান করে, দেবেন—পাশের বাড়ীর একটী ছেলে। ইলাকে সে বৌদি' বলে' ডাকে—ইলার শ্বশুর-বাড়ী তার গতি অবাধ, অপ্রতিহত।

সোমনাথের অভাবে দেবেনই হয় তার ছোরা, লাঠি-খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী, কুস্তি লড়ার গুরু, সাঁতারের সঙ্গী।

মাস যায়।

শ্বাশুড়ী ফিরে আসেন। দেবেনের সঙ্গে বধূর অত নিষ্ঠতা তাঁর চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে। ছেলেকে ডেকে বলেন—হ্যাঁরে, বউ ত নিজে পছন্দ করে' আন্‌লি—বলি গেরস্ত ঘরের মেয়ে ত, না—

—কেন মা?—ছেলে জিজ্ঞাসা করে।

—বৌ-ঝিদের পাশের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অত নিষ্ঠতা কিসের? হ'লই না হয় বৌদি' বলে—

—কার সঙ্গে? ছেলে জান্‌তে চায়।

—ওই দেবেনের সঙ্গে। সেদিন দেখি—

কথা অসমাপ্ত রেখে মা আবার বলেন—ওকে পাঠিয়ে দে বাপের বাড়ী, আমি আবার তোর বিয়ে দেব।

—দেবেনের সঙ্গে অত মিশো না, মা রাগ করেন—অমল বলে।

—তা' জানি; কিন্তু রাগটা মিথ্যে ও অন্যায় তা'ত তুমি জান—ইলা বলে।

—আমি জানি, কিন্তু মা ত বোঝেন না। তুমি দেবেনের সঙ্গে ছোরা খেল, সাঁতার দাও, মা ভাবেন—

অমলের কথা বন্ধ করবার জন্য ইলা বলে—তা' দিন বয়ে গেল। আমার মা এতদিন ভেবে ভেবে যার প্রতিকার করতে পারেন নি, তোমার মা সামান্য এই দিনে তা' কি করে করবেন—

—তা' এক কাজ করি চল—দিনকতকের জন্যে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসি—মাও জীবনের বাকীটা কাশীতে কাটাব কাটাব করছেন অনেক দিন থেকেই—তোমাকে বাপের বাড়ী রেখে, মাকে কাশীতে থাকার একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে আবার তোমায় নিয়ে আস্‌ব—অমল বলে।

—সত্যি কথাটা বল্‌তে বুঝি মুখে বাধে, না? আমি কিছু শুনি নি ভেবেছ? তা' নয়, সব শুনেছি—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করতে চাও—এই ত। তা' একটা কেন, তুমি যদি পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করে' ফেলো, তাও আমি আমার অভ্যেস ছাড়তে পারব না—একটাও—কিছুতেই না—ইলা বলে।

—সত্যিই আমার উদ্দেশ্য তা' নয়—আমায় তুমি মিথ্যে বুঝো না ইলা—আমায় তুমি ভুল বুঝো না—অমল বলে।

—সত্যি মিথ্যেয় দরকার নেই—আমায় পাঠিয়ে দাও বাবার কাছে—দিনকতক আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—ইলা বলে।

•

একবছর পরের কথা।

ইলা সন্তান-সম্ভবা। কিন্তু স্বভাব তার এখনও বদলায় নি—এতটুকুও না। এখনও সে পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে, গাছে চড়ে' তাদের পেয়ারা লেবু পেড়ে দেয়। তাদের সঙ্গে বাজী রেখে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটে।

মা বলেন—ইলা, এখনও কি তোর দিস্যিপনা যাবে না—আজবাদে কাল যে ছেলের মা হবি।

—বলেছি মা, আমি না মলে কেউ আমায় ওসব ছাড়াতে পারবে না—তা' সে ছেলেই হোক্, আর যেই হোক্—মাতৃত্বের মহান দায়িত্বে অনভিজ্ঞা ইলা বলে।

—তুই মর্‌বি মর, কিন্তু পেটেরটা ত বাঁচাবি, না সেটাকেও মেরে ফেল্‌বি—মা বলেন।

—মলে আর আমি কি কর্‌ব—ইলা উত্তর করে।

—কি আর করবে? করতে তোমায় কিছুই হবে না—কেবল থাক্‌তে হবে চুপ করে', স্থিরভাবে, শান্ত হ'য়ে—আর ছাড়তে হবে তোমার গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, লাঠি-খেলা, দৌড়ঝাঁপ দেওয়া—মা বলেন।

—তা' পার্‌ব না মা, তা' পার্‌ব না—মাথা দুলিয়ে ইলা বলে।

মা বলেন—মর্ মর্, সব তা'তেই মেয়ের যেন আদি-খ্যেতা!

মরণ কারও হুকুমের চাকর নয় যে, বল্‌লেই কাউকে নিয়ে যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, পরপারে।

কাজেই ইলার মা বল্‌লেও ইলা মরে না—তার যে ছেলে হয়, সেও নয়।

মাস পুরিয়া যায়।

অমল ইলাকে নিতে আসে। তার মা জীবনের বাকীটা তীর্থক্ষেত্রে কাটাবার জন্যে কাশীবাসী হয়েছেন।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী—আর তারই সঙ্গে ছোরা, লাঠিখেলা ও যুযুৎসু কৌশল অমলদের ওখানে হয়। সেবারও হবার সময় এগিয়ে আসে।

সভানেত্রী হবার জন্য সকলেই অনুরোধ করেন ইলাকে।

ইলার ওসব বিষয়ে পারদর্শিতার কথা সকলেই শুনেছেন দেবেনের মুখে এবং কিছু অতিরঞ্জিতই শুনেছেন।

ইলা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে। বলে—পারব না, সময় কম।

শেষে সকলের অনুরোধে বলে—অন্য কাউকে অনুরোধ করুন, আমার উপর ভরসা করবেন না—কিন্তু যদি সময় করে' উঠ্তে পারি, তবেই যাব, নইলে নয়।

অমল বলে—এবার প্রদর্শনী শুন্ছি তোমার সভানেত্রীত্বে হবে, যাবে ত?

—তাই ত ভাবছি—ভদ্রলোকের মেয়েরা সব অনুরোধ করে গেলেন—ইলা উত্তর করে।

—যাবে বই কি—অমল উত্তর করে।—নিশ্চয়ই যাবে—তোমার ত ছেলেবেলা থেকে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান অভ্যেস—এখন দেখ্ছি সেটা একেবারে অনভ্যেস করে' ফেল্লে।

ইলা উত্তর করে—দেখা যাবে বিকালে।

বিকাল হয়।

ইলাদের বাড়ীর সাম্নে মোটর থামে। সহরের স[...] বড় ঘরের মেয়ে-বৌরা আসে। বলে—চলুন ইলা দি'।

—আমার যাওয়া হবে না ভাই—ইলা বলে।

—আপনি একটু অনুমতি দেন না—একজন মে[...] ঘরের ভেতর গিয়ে অমলকে বলে।

—আমার ত অনুমতি দেওয়াই আছে—অমল বলে।

—তবে আর কি, চলুন ইলা দি'—আর একজন মে[...] বলে।

—আমার যাওয়া হবে না দিদি, মিছে কেন আপনার দেরী কর্ছেন—আর কাউকে দেখুন—ইলা বলে।

বিফল হ'য়ে সবাই ফিরে যায়।

অমল বলে—যাও না, অতগুলো বড়লোকের বৌ-ঝির অত করে' অনুরোধ কর্ছে।

ইলা তেড়ে ওঠে—কি যে বল, এখুনি খোকা ঘু[...] থেকে উঠ্বে—তা'কে খাওয়াতে হবে—বাছার আমা[...] গা-টাও যেন একটু গরম গরম হয়েছে—তুমি বরং চ[...] করে' একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে এস দিকি।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বা[...]

অভিশপ্তা

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

তিন

রেখা উনুনে তরকারী চড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখছিল।

[illegible]রী ওপরে গেছে বিছানার পাট সারতে।

বাইরে অন্ধকার ঘোরালো হয়ে এসেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি [illegible]ও পড়ছে বুঝি।

এলোমেলো হাওয়াটা সহসা থম্‌কে গিয়ে যেন রুদ্ধ [illegible]শ্বাসে প্রতীক্ষা করছে—একটা অনিবার্য্য, আসন্ন [illegible]য়োগের জন্য। রেখার অন্তরও আজ মেঘাচ্ছন্ন।

কলের পুতুলের মত হাত দু'খানা চালিয়ে নিয়ে গেলেও [illegible]মন দিতে পারছিল না কোনো কাজেই। উদ্বেগ, [illegible]শান্তি, অনুশোচনা ভোগ করছে সে এখানে এসে পর্য্যন্ত, [illegible] চির-সহিষ্ণু শান্ত প্রকৃতি তা'র আজ্‌কের মত এমন [illegible] অধৈর্য্য হয় নি তো কোনোদিন। আজ কি হ'ল [illegible]র?

ঘরের মধ্যে একটা তীব্র আলোকছটা ঝক্‌মকিয়ে [illegible]ঠতেই রেখা সচকিত হয়ে দেখ্‌লে—বাগানের দিকের [illegible] জানলায় ছাতা মাথায় 'টর্চ্চ' হাতে মিহির—সে কি [illegible]নো [illegible] নি?

রেখা ত্বরিতে জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—[illegible]? —তুমি গেলে না?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি এইবার। বলছিলুম কি—আমার [illegible]তে যদি দেরী হয়—

—দেরী না করলেই ভালো,—আকাশের গতিক যে [illegible],—বৃষ্টিও তো পড়ছে—এর পর যদি বেশী—

—হোক্ না, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত যাই হোক্—আমাকে [illegible]তেই হবে যে!—না গিয়ে কি পারা যায়?—হ্যাঁ গা?—

টর্চ্চটা উঁচু করে ধরে, রেখার মুখপানে তাকিয়ে মিহির [illegible] মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

কী নিষ্ঠুর অথচ কী মধুর সে হাসি! চটুল নয়নের আবেশময় চাহনীতে কী মাদকতা তার!

অমন রূপ, যা' দেখলে সহজে চোখ ফেরে না—প্রসাধনে আবো সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন।

সিল্কের পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, ভুরভুর করছে হাস্নুহানার মোহময় মিষ্ট সুগন্ধে। কালো কুচ্‌কুচে রেশমের মত সুবাসিত চুলগুলি স্তরে স্তরে নেমে গেছে শুভ্র ললাটের দুইধারে। রক্ত-রাঙা চুনী দেওয়া আংটীটা তার সুগৌর সুগঠিত আঙুলটীতে কী চমৎকার মানিয়েছে!

সুন্দর! অপরূপ!—

কিন্তু, এই নয়ন-মন-বিমোহন সৌন্দর্য্যের অধিকারী যে, তার হৃদয় কি বিধাতা গড়েছেন শুধু পাথর দিয়ে?

একটা উতল দীর্ঘশ্বাস চাপ্‌তে গিয়ে রেখার বুকখানা দুলে উঠ্‌ল।

—রাগ করলে? না রাগ করো না রাণী!—আমিযত শীগ্‌গির পারি ফিরব,—তবে যদির কথা বলা যায় না তো, তাই বল্‌ছি, দেরী হয়ে গেলে তোমরা আমার অপেক্ষায় জেগে বসে থেকো না যেন,—বুঝলে? তোমার শরীর এম্‌নই ভাল নয়, আচ্ছা, চললুম তা' হ'লে—

দু'পা গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে আলোটা রেখার দিকে তুলে মিহির পুনরায় বল্‌লে,—যাই তবে? হ্যাঁ গো?

—যাও না! আমি কি বারণ করছি? যাও!

—আহা! যাও বল্‌তে নেই লক্ষ্মী! বলো, এসো!

রেখার অপ্রসন্ন মুখের পানে মধুর দৃষ্টিপাত করে, একটুখানি মুচ্‌কে হেসে মিহির চলে গেল।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে রেখার বুকের তটে তটে ছাপিয়ে

পড়া অবরুদ্ধ মর্ম্মবেদনা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল দু'টী নয়ন পথে।

তরী রান্নাঘরে ঢুকেই বললে—ও দিদিমণি, কি করো? তরকারীটা পুড়ে যায় যে।

রেখা ত্বরিতে বাহু দিয়ে মুখ চোখ যথাসম্ভব মুছে ফেলে তরকারী দেখ্‌তে এলো।

তরী আধ্‌মাখা ময়দাটা ঠিক্ করতে করতে রেখার আরক্ত ছলছল চোখ দু'টীর দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—দাদাবাবু এখন গেলেন নাকি?

—হুঁ্যা।

—একটু সকাল করে ফির্‌তে বলে দিলে তো?

—হুঁ্যা।

তরীর যেন ছট্‌ফটানি ধরেছিল—রেখাকে কি একটা বল্‌বার জন্যে এবং জান্‌বার জন্যেও।

কিন্তু এই মিতভাষিণী, ধীর প্রকৃতি মেয়েটী,—ধ্যানমগ্না তাপসীর মত নিজের চারিধারে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের আবরণ রচনা করে রাখে যে, তার মনের সন্ধান পাওয়া সহজ কথা নয়।

তবু যতটা পারা যায়—মিহিরের প্রতি তরীর মনের ভাব যেমন হোক্ রেখার যথার্থই শুভকামনা করে সে। রেখার দুঃখ তাকে ব্যথা দেয়, তাই তখনকার মত চুপ করে গেলেও খানিক পরে লুচি বেল্‌তে বেল্‌তে সে আবার বললে—তুমি একটুকু শক্ত হও দিদিমণি! নইলে দাদাবাবু যেরকম বাড়াবাড়ি কচ্ছেন—তাতে···শেষকালে তোমাকে গেরাহ্যিই করবেন না হয় তো।

—না করুক্ গে! মানুষের ইচ্ছার ওপর কারুর জোর নেই তো! রেখা গম্ভীর-মুখে অনাগ্রহের ভাবে বললে।

তরী সাহস পেয়ে বল্‌লে—জোর কারুর না থাক্, তোমার তো আছে? এই আজ্‌কের কথাই বল্‌ছি, উনি কোথায় গেল তা' জেনেও মানা করলে না একটীবার, তুমি জোর করে বলতে যদি—

—কি দরকার জোর-জবরদস্তি করে? অবুঝ তো নয় যে, তাকে ধরে-বেঁধে...না, সে আমি পার্‌ব না।

—কিন্তু ভুগতে হবে যে তোমাকেই দিদিমণি!

—ভুগ্‌তে হয় ভুগ্‌ব, এসেইছি তো ভুগতে! নই এ রকম—রেখা মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে কড়ায় ঘি ঢাল লাগল। তার কণ্ঠস্বর গাঢ়, কিন্তু অকম্পিত।

তরী অবাক্ হয়ে ভাবে—এ রাগ না অভিমান? যা হোক্, মেয়েটী কি চাপা বাপু! বলে 'বুক ফাটে তো মু ফোটে না।' সে হ'লে মনের জ্বালায় খুনোখুনী কাণ্ড ক বস্‌ত হয়তো, মেয়েমানুষ সব সইতে পারে, কিন্তু এ কি স করা যায় গা? আর কর্ত্তার আক্কেলকেও বলিহারী বলি কোথায় তাড়াতাড়ি দু'হাত এক করে দেবে—তা' নয় বুড়োর যত সব ভিট্‌কেলমি! যাক্, এখন এই কার্ত্তি মাসটা কোনোরকমে পেরিয়ে গেলেই, ব্যস্—

তরীর মনের কথা মুখে ব্যক্ত হয়ে পড়্‌ল—এই কার্ত্তি মাসটা গেলে বাঁচা যায় বাপু!

—কেন?

তরী বিস্ময়ের সহিত বলে উঠ্‌ল—ও মা! কে আবার? সাম্‌নের অঘ্রাণেই তো তোমাদের বিয়ে।

বিয়ে? হায়! এ তার উদ্বাহ না উদ্বন্ধন? ফাঁসী ব্যবস্থা তো হয়েই রয়েছে, কেবল গলার ফাঁস দিতে বাকি- তা'ও হবে এবার?···কিন্তু এ ফাঁস যদি সে টেনে ছিঁ ফেলে দেয় জোর করে...এটুকু শক্তি কি নেই তার কেন থাক্‌বে না?

মনের দুর্ব্বলতা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে, এ মরীচিক মায়া-মোহ সবলে কাটিয়ে রেখা যদি আজই এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যায়, তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে কে? সে তো নাবালিকা নয় যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...

—টাকাগুলো দত্ত-মশায় না ছাড়েন—যাক্ গে! নিজে জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতা তার আছে তো? তবে নারীত্বে এ লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে সে এখানে পড়ে থাকে আ কেন? কিসের আশায়?

না, এ বন্দীত্বের বন্ধনে আর নয়—ঢের হয়েছে সে আর থাক্‌বে না, বেরিয়ে পড়বে। এ দিক্‌কার একট হেস্তনেস্ত করে আজকালের মধ্যেই—

রেখার চোখের জল শুকিয়ে গেল। তার বেদনা

করুণ চিত্তে বেজে উঠ্‌ল একটা বিদ্রোহের রুদ্র স্বর। তরী ঠিক্ বলেছে—একটু শক্ত হও—শক্তই সে হবে এবার।

*   *   *

—জ্যাঠামশায়!

কর্ত্তা আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন না, ঝিমোচ্ছিলেন, আফিমের মাত্রাটা আজকে যেন একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য সেটা ইচ্ছা করেই,—বাদলার দিন!

নেশার ঘোরে দত্ত-মশায় খেয়াল দেখ্‌ছিলেন—লোচন মণ্ডলের কাছে প্রাপ্য সুদে ও আসলে টাকাটা আদায় করতে না পেরে তার বন্ধকী বাড়ীখানা ও বিঘাটাক জমী তিনি নিলামে চড়িয়েছেন। লোচন কিছুতে ছাড়ে না, কর্ত্তার হাতে পায়ে ধরে সে কাকুতি-মিনতি করছে আর মাসখানেক সময় দেবার জন্য। লোচনের বড় ছেলে নবীন নিষ্ফল আক্রোশে রুখে এসে গাল-মন্দ করেছে—যাচ্ছেতাই ভাবে! ছোটলোকের ছেলের এত বড় আস্পর্দ্ধা! দত্ত-মশায় অসহ্য হয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে—ব্যাটাচ্ছেলে পাজি নচ্ছার কোথাকার!—যত বড় মুখ নয়, ততবড় কথা! বলে যেই তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মারতে গেছেন—অমনি রেখার ডাকে চমক-ভাঙ্গা হয়ে তিনি ত্রস্তে বলে উঠলেন—কে? কে?

—আমি। আপনার দুধ নিয়ে এলুম।

রেখার হাত থেকে দুধের বাটী নিয়ে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন—মিহির গেল নাকি?

—হ্যাঁ; অনেকক্ষণ।

—সকাল করে ফেরে, তবেই—নইলে মুস্কিল আর কি?—একে অন্ধকার রাত, তায় বাদল বৃষ্টি। কাছে-পিঠে এমন কেউ নেই যে, ডাক্ দিলে সাড়া দেবে। গ্রাম-সুদ্ধ জানে বুড়ো ব্যাটা টাকার কুমীর।—বুড়োর লোহার সিন্দুকের ওপর সব শালার নজর। হাবাতের ব্যাটারা জানে না তো—কত কষ্টে বুকের রক্ত জল করে তবে টাকার মুখ দেখা যায়। হিংসুটের দল সব—গেরস্থর ঘরে দু'বেলা দু'টি চড়তে দেখলেই বুক ফেটে মরে, যো পেলে এরাই গলা টিপ্‌তে ছাড়বে নাকি?

খালি বাটীটা নামিয়ে রেখে রেখা জিজ্ঞাসা করলে—মশারিটা ফেলে দেব?

—না না, এখনি কি! মিহির যতক্ষণ না ফেরে আমার তো ঘুম হবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়।

—কিন্তু ওঁর তো কিছু ঠিক নেই,—দেরীও হ'তে পারে, বলে গেছেন—ওঁর অপেক্ষায় জেগে বসে থাক্‌বার দরকার নেই।

—হুঁ। দরকার নেই!—উনি তো বলে খালাস—তারপর? এদিক্‌কার ঠেলা সাম্‌লায় কে? কবে যে বুদ্ধি হবে! আরে বাপু, দিনে দিনে ঘুরে বেড়াও না যত ইচ্ছে, তা' বলে রাত বেড়ানো—এমন কি বন্ধুতা? আর তোমাকেও বলি বাছা, তুমি যদি একটু শাসন নিয়মে রাখতে ওকে—

—আমি! আমি করব শাসন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি! নয় তো কি পাড়ার লোকে আস্‌বে ওকে সাম্‌লাতে? কি বুদ্ধি দেখো! লেখাপড়া শিখেছ না—ছাই!

রেখা চুপ করে রইল। দত্ত-মশায়ের কথার পিঠে কথা সে কোনোদিনই বলে না। আজ যেটুকু বলেছে, নেহাত গায়ের জ্বালায়। যত দোষ তারই!

রেখার নির্ব্বাক্ ক্ষুব্ধ মুখের পানে তাকিয়ে কর্ত্তা গলার স্বর খাটো এবং সাধ্যমত মোলায়েম করে বল্‌লেন—বোকা মেয়ে! তোমার ভালোর জন্যেই বলি, এরপর ভুগ্‌তে হবে তো তোমাকেই? এই যে আজকাল খিদির-পুরে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করছে, দিন নেই রাত নেই—এর মানে কি? তুমি তো জানো না, ও সেখানে যায় কিসের লোভে—

—জানি!

বল্‌বে না মনে করেও কথাটা রেখার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অসতর্কে।

—জানো? তা' হ'লে মানা করো না কেন? অ্যাঁ?

—বারণ যদি কেউ না শোনে—

—আলবৎ শুন্‌বে! শুন্‌তে যে হবেই তাকে! ঘরের বউ তুমি—আরে, আজ না হলেও দু'দিন বাদে হবে তো?

রেখার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল, ইচ্ছা হ'ল বলে —না! এ বন্ধনে ধরা দিতে সে আর চায় না; চায় নিষ্কৃতি, মুক্তি!

কিন্তু উদ্যত রসনা তাড়াতাড়ি সংযত করে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ আরও অগ্রসর হবার আশঙ্কায় সে চলে যাচ্ছিল, দত্ত-মশায় বললেন—তরী গেল কোথায়?

—রান্নাঘরে, খেতে বসেছে বোধ হয়। কেন? কিছু চাই না কি?

—কিছু না, ওকে বলে দিও, ওপরে আস্‌বার আগে একবার গোয়াল-ঘরটা ও আলো ধরে বেশ করে দেখে সদরে আর খিড়্‌কীর দোরে তালা দিয়ে আসে যেন। মিহির এসে ডাক্‌লে খুলে দিলেই হবে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, না?

—খুব অল্প, টিপ্ টিপ্ করে। তবে রাত্তিরে হয় তো বেশীরকম —

—এঃ! তবেই তো গোল দেখ্‌চি। মিহির কখন ফিরবে কি জানি। তরীকে ভালো করে বলে দিও, বুঝলে? আমি তো জেগেই আছি, তবু সাবধানের বিনাশ নেই।

রেখা চলে গেল কর্ত্তার আদেশ পালন করতে। কিন্তু তরী তো নীচেয় নেই, রান্নাঘরে খিল দেওয়া, সে গেল কোথায়? পুকুরে না কি? আলোটাও নিয়ে গেছে। কী ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! ওঃ! রেখার গা-টা ছম্‌ছম্ করে উঠল যেন।

সে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল ওপরে। কিন্তু সিঁড়ির কয়েক ধাপ্ উঠেই দেখতে পেলে বাগানের দিকে একটা আলো। আলোটা আস্‌ছিল—বাগানে যে একখানা বড় চালাঘর আছে, তারই একটা ঘুলঘুলি দিয়ে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির গাঢ় আঁধারের মধ্যে আলোটা বড় উজ্জ্বল ও তীব্র দেখাচ্ছে। ও ঘরে কে? তরী নাকি?

চার

রাত ন'টা কি সাড়ে ন'টা হবে।

পল্লী এরই মধ্যে নিশুতি। দত্ত-মশায়ের আশে-পাশে কেবল দরিদ্র চাষী ও শ্রমিকদের বাস। দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত তারা, সকাল সকাল যা' হোক্ দুটো খেয়ে নিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে যে যার কুটীরে।

প্রকৃতি নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের সন্‌সনানি, আর এলোমেলো বায়ুবেগে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়া ছোট ছোট বৃষ্টি বিন্দুর টুপ্‌টাপ শব্দ শোনা যায়।

রেখা তার ঘরের সাম্‌নে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে, ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। তার কেশ-বেশ বিপর্য্যস্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস অসম্ভব দ্রুত, সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠ্‌ছে থেকে থেকে। ভয়ে, রাগে, কি উত্তেজনায়—কে জানে!

চারিদিক অন্ধকার কালো মিশ্‌মিশে। বাগানের সে আলোটাও আর দেখা যায় না তো! রেখা সেদিক্‌কার পাঁচিলে 'ভর' দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখ্‌লে—না, সে আলোটা আর নেই, কি জানি কখন—

যাক্ গে! সে চায় না—আর চায় না! না—না! এ 'না' যে কিসের বিরুদ্ধে তা' বোঝা যায় না, শুধু একটা আপত্তি, প্রবল আপত্তি রেখার আহত উত্তেজিত অন্তরে বিপ্লবের সূচনা করে বল্‌ছিল—না—না—না!

বাতাসেও সেই শব্দ—বাগানের উঁচু গাছগুলো আঁধারের কালি মেখে অশরীরী ছায়ামূর্ত্তির মত যেন মাথা নেড়ে বলে উঠ্‌ছে—না—না—না!

একটা উচ্ছ্বসিত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস রেখার মর্ম্ম মথিত করে বেরিয়ে গেল। না, সে আর সইতে পারে না, আর থাক্‌তে পারে না, সে চলে যাবে, পালিয়ে যাবে—এই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি, কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না!

কোথায় যাবে? যে দিকে দু' চক্ষু যায়! পালাবার এমন সুযোগ যদি আর নাই পাওয়া যায়! যদি—

কিন্তু কেন? এমন করে লুকিয়ে চোরের মত পালাতে যায় সে কেন? কিসের ভয়ে? কাল দিনের আলোয়, জিনিস-পত্র সব নিয়ে সকলের সামনে গেলে তাকে আটক করে রাখতে পারে কে?

মিহির...আঃ! সেই প্রিয়, অতি প্রিয় নাম!—আজ মনে আনতেও রেখার দেহ মন শিউরে উঠল যেন! উৎকর্ণ, উন্মুখ হয়ে সে অন্ধকারেই চেয়ে রইল—সেই বাগানের ঘর-

নার দিকে,—ও কি! ওখানে আবার আলো জ্বলে কি? নাঃ, ও একটা নক্ষত্র—কালো মেঘের ফাঁক থেকে কি মেরে চুপি চুপি কি যেন দেখ্‌ছে। অমন করে শিউরে ঠছে ও কি দেখে? ওঃ! তারাটা কি মস্ত!—কী জ্বল অন্তর্ভেদী ওর দৃষ্টি!

সেদিকে চেয়ে রেখার বুকটা কেঁপে উঠল গুরগুর রে। আবার,—ওদিকে, কে যেন চীৎকার করে না?—ঃ! কাছেই কোথায় একটা নিশাচর পাখী ডানা ঝট্‌-টিয়ে ডেকে ওঠে,—তীব্র কর্কশস্বর তার—কা'র বুক-ফাটা আর্তনাদের মত।

কিসের একটা অজানিত শঙ্কায় আপাদ-মস্তক কণ্টকিত য়ে রেখা ত্বরিতে চলে এলো ঘরে ভেতর।

তরীর দেখা নেই তখনো।

উত্তেজনার পর অবসাদ অনিবার্য্য। রেখা তা'র ক্লান্ত বশপ্রায় দেহ বিছানায় এলিয়ে দিতেই চোখ দুটো ড়িয়ে এলো,—তন্দ্রা ঠিক নয়, কেমন আচ্ছন্নের মত াব।

সেই অবস্থাতেই তার কাণে গেল—কান্নার শব্দ। এবার ন নয়, সত্যই,—নারীকণ্ঠের বড় আর্ত্ত ব্যাকুল সে রোদন, —ওঃ! অমন করে কে কাঁদে গো? এ যদি স্বপ্ন হয়? থমটা মনে হ'ল তাই, কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে চোখ গ্‌ড়ে চেয়ে দেখবার পরও যে…

শব্দটা আস্‌ছে যেন বাগানের দিক্‌ থেকে,—ক্রমশঃ কাছে,—আরো কাছে, নীচে থেকে ওপরে। কে ও? তরী না কি? তরী কাঁদে কেন? রেখা ধড়মড়িয়ে উঠে দেখ্‌তে গেল। এমন সময় ছাদের ওপর ধড়াস্‌ করে জোরে একটা শব্দ হ'ল…খুব ভারী জিনিস পড়বার মত। সঙ্গে সঙ্গে গোঙানী। সজোরে গলাটা টিপে ধরলে মানুষ যেমন কথা বল্‌তে না পেরে গোঁ গোঁ করে—ঠিক তেমনি।

রেখা শশব্যস্তে হেরিকেন্‌টা হাতে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে সিঁড়ি থেকে উঠ্‌তেই ছাদের ওপর পড়ে'—তরীই বটে, উপুড় হয়ে মুখ থুব্‌ড়ে—প্রসারিত হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে…হাত দুটোতে ও কি! রক্ত নাকি? কাপড়েও তো—

উঃ! এ যে টক্‌টকে লাল তাজা রক্ত! কী সর্ব্বনাশ!

তরী! ও তরী! তরীর কি হ'ল? জ্যাঠা-মশায় ও জ্যাঠা-মশায়! দারুণ আতঙ্কে রেখার গলা থেকে শব্দ যেন বেরোয় না, তবু সে চীৎকার করে উঠল প্রাণপণ শক্তিতে।

—বাপুরে বাপু! কি হ'ল তোমাদের? অমন করে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছ কেন?

বল্‌তে বল্‌তে দত্ত-মশায় বেরিয়ে এলেন।

—ও কে, তরী আছাড় খেলে বুঝি?—আঃ! যা' হুড়মুড় করে চলে ঝড়ের মত। কোথায় লাগ্‌ল?

কাছে এসেই তিনি চমকে উঠ্‌লেন—এত রক্ত! বাপ রে! এ রক্ত বেরোয় কোত্থেকে? কপালটা কেটে গেল না কি? আলোটা রেখে দত্ত-মশায় রেখাকে বল্‌লেন —একটু ধর তো একে সোজা করে দেখি, চোটটা লেগেছে কোথায়—

রেখা ধরবে কি তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল থরথর করে। হাত পা সব ঠাণ্ডা অবশ হয়ে আসে যেন।

দত্ত-মশায় ধমক্‌ দিয়ে বললেন—তুমি যে ভয়েই 'কাঠ' হয়ে গেলে। ধরো না একটু।

রেখার সাহায্যে তরীকে কোনোমতে সোজা করে শোওয়ানো হ'ল। কিন্তু কই?—তার কপালে, মুখে, নাকে, মাথায়, জখম তো কোনোখানেই নেই! তবে এ রক্ত এলো কি করে? দত্ত-মশায় আলোটা তরীর মুখের কাছে ধরে ডাক্‌তে লাগলেন—তরী! ও তরী!—কথা কস্‌নে কেন রে? কি হ'ল তোর, কোথায় লাগ্‌ল, বল্‌ না?

তরী কথা বল্‌বে কি? সে মূর্চ্ছিতা। চোখ দুটো তার আধ-চাওয়া শিবনেত্রের মত—দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। গলার মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছে।

—আমার ঘরের ছোট বাল্‌তীটা নিয়ে এসো দেখি—মুখে-চোখে খানিক জলের ঝাপটা দিলেই জ্ঞান হবে 'খন।

তাই করা হ'ল, কিন্তু তরীর জ্ঞানোন্মেষের কোনো লক্ষণই নেই।

—একি হ'ল জ্যাঠা-মশায়? রেখা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে।

দত্ত-মশায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে উদ্বিগ্নভাবে বল্লেন—কে জানে। ছুঁড়ীর মিরগী আছে নাকি? কিন্তু রক্তটা···আচ্ছা, ওর হাত দুটো ধুইয়ে দেখ তো, যদি বঁটীতে হঠাৎ কেটে ফেলে থাকে।

তরীর রক্তমাখা ঠাণ্ডা হাতখানা হাতে ঠেকতেই রেখা ভয়ানক চমকে উঠ্ল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। সে শোণিত স্পর্শ তার শিরায় শিরায় একটা প্রবল শিহরণ জাগিয়ে তুল্লে নিমেষে।—উঃ! আমি পারব না জ্যাঠা-মশায়, আমার বড় ভয় করেছে। এ রক্ত, এত রক্ত কা'র?

বলতে বলতে তরীর হাতখানা ছেড়ে দিলে।

দত্ত-মশায় মহা বিরক্তিভরে বলে উঠ্লেন—সরো। আমি ধুয়ে দিচ্ছি, তুমি জল ঢেলে দিতে পারবে? না, তাতেও ভয় করবে? আচ্ছা ঝামেলায় পড়েছি যা' হোক্।

কম্পিত করে তরীর রক্তাক্ত হাতে জল ঢাল্তে গিয়ে রেখা বারবার শিউরে উঠে অস্ফুট স্বরে বল্লে—এত রক্ত! উঃ! এত রক্ত কেন?

বাস্তবিক এ রক্ত লাগ্ল কেমন করে? হাতে তো কাটাকুটি দূরের কথা—এতটুকু আঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, আশ্চর্য্য!

বৃষ্টিটা মাঝে থেমেছিল, আবার আরম্ভ হ'ল। এবার বেশ বড় বড় ফোঁটায়। বাইরে থাকা আর চলে না। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে ঘন ঘন। দত্ত-মশায় ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন—একে টেনেটুনে ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেলি, নইলে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভিজে মরব যে। একটু পারবে ধরতে? কেবল পা দুটো—

এবার রেখা আর না বল্তে পারলে না। দু'জনে ধরা-ধরি করে তরীর অবশ শিথিল দেহটা কষ্টে-সৃষ্টে এনে ফেলা হল দত্ত-মশায়ের ঘরে। তখনো সে অচৈতন্য, কেবল মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা ঢিলে হয়েছে মাত্র।

—এখনো হুঁস হ'ল না? কি হবে গো!

রেখা তরীর গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্লে—তরী! ও তরী! কি হ'ল তোমার, বলো না? —ও তরী!

তরীর ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ নড়ে উঠ্ল, মুখ না খুলেই দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ গোঁ করে কি যেন বলতে চেষ্টা করলে,—বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু রেখার মনে হ'ল সে যেন বল্ছে—দা—দা—বা—বু—

—কি বল্ছ তরী? অ্যাঁ!

তরী আর সাড়া দিলে না। গোঙানীও বন্ধ হয়ে গেল তার। একটা অনির্দ্দেশ অমঙ্গল আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত ব্যাকুল হয়ে রেখা দত্ত-মশায়ের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বল্লে—কি হবে জ্যাঠা-মশায়? এর যে এখনো জ্ঞান হ'ল না।...একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে—

—হ্যাঃ!—ডাক্তার ডাক্‌ব না আর কিছু।—টাকা-গুলো আমার ফাল্‌তু এসেছে কি না? একটীবার নাড়ী টিপে চারটী টাকা অন্ততঃ···আর এই অন্ধকার দুর্য্যোগের রাতে বন-বাদাড় ভেঙে ডাক্তার ডাক্‌তে যাবেই বা কে, শুনি। আমার অত গরজ নেই। দত্ত-মশায় ভয়ানক বিরক্ত ও উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। দুশ্চিন্তা তো ছিলই। তা' ছাড়া, তরীর সঙ্গে এতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে—বুড়ো মানুষ তো! আফিসের নেশাও তাঁর ছুটে গিয়েছে তখন।

রেখা তাড়া খেয়ে চুপ করে গেল। কিন্তু সুস্থির হতে পারল না এক মিনিট। সে অতিমাত্র উদ্বেগের সহিত একবার মূর্চ্ছাহতা তরীর বুকের স্পন্দন, নাকের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে, আবার মুখে হাত দিয়ে দেখে দাঁতকপাটী খুলেছে কি না।

তার ব্যাকুলতা দেখে দত্ত-মশায় অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বললেন—অত ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন বাছা। মিরগী রোগে এমন ধারা হয়ে থাকে, তুমি দেখো নি তাই, খানিক বাদে আপনিই জ্ঞান হবে।

—কিন্তু রক্ত, এ রক্ত কিসের। রেখা ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করলে। বিবর্ণ পাংশুমুখে তার বিভীষিকার ছায়া সুস্পষ্ট। তার মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে দত্ত-মশায় হুস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কি জানি বাপু! আমি তো মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম একে নিয়ে! কোথায় কি করে রক্ত

মেপে এলো। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে...মিহিরও তো এলো না এখনো,—ক'টা বাজ্‌ল দেখ দেখি।

রেখা ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—সাড়ে এগারোটা।

—ওঃ! এত রাত হ'য়ে গেছে।—তা' হ'লে রাত্তিরে ...র ফিরছে না সে। থাক্‌—যা' দুর্য্যোগ! আমি একবার নীচে গিয়ে দেখে আসি, দোরতাড়া সব 'হাট্‌' করাই রয়েছে বোধ হয়। কে কোথা থেকে ঢুকে...

তখন বৃষ্টি পড়ছে বেশ। দত্ত-মশায় গায়ে মাথায় একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে, একহাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, আর অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছিলেন। রেখা সহসা ছুটে এসে তাঁর হাত চেপে ধরল—আমিও যাব জ্যাঠা-মশায়! আমাকেও নিয়ে চলুন।

—কোথায় গো?

দত্ত-মশায় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

রেখা ব্যগ্রতার সহিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে—নীচে। আপনার সঙ্গে আমিও একবার...আপনার পায়ে পড়ি জ্যাঠা-মশায়।

—বাবা রে বাবা! একি জ্বালায় পড়লুম গো? এরা আমাকে আজ পাগল না করে' আর ছাড়্‌বে না দেখছি! নাঃ, থাক গে—আমার আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। রান্নাঘরে বাসনগুলো রয়েছে, তাই...তা' যাক্‌ গে সব চোরে নিয়ে, আমার কি? আমি তো আর বুকে করে' নিয়ে যাব না সব? থাক্‌লে তোমাদেরই···

দত্ত-মশায় ঘরের দোরগোড়ায় লাঠি চাদর সব রেখে দিয়ে ফিরে এলেন বকতে বকতে। রেখা একান্ত অসহায়-ভাবে তরীর শিয়রে এসে বসে' পড়ল 'ধপ্‌' করে'।

—ওখানে আর বসতে হবে না, তুমি শুয়ে পড়ো এবার। খামকা রাত জেগে অসুখ বাঁধিয়ে বসো, তারপর ডাক্‌ ডাক্তার, আর আন্‌ ওষুধ!—একে এমনি তো রোজ অসুখ লেগেই আছে তোমার!

দত্ত-মশায়ের ঘরের পাশেই রেখার ঘর। মাঝখানে একটা দরজাও আছে। দত্ত-মশায় সেই দরজাটা খুলে দিয়ে রেখার ঘরের বাইরের দিক্‌কার দোর-জানলা সব বন্ধ করে এসে বল্‌লেন—ওঠো, শোও গে যাও।

—না জ্যাঠা-মশায়, আমি এখন শুতে পারব না, তরীর জ্ঞান হ'লে—

—আরে, জ্ঞান ওর হবেই—এতক্ষণ হয়েও থাক্‌বে—হয়তো ঘুমুচ্ছে, নয়তো বজ্জাতি করে মট্‌কা-মেরে পড়ে আছে আবাগী! নাড়ীতো বেশ টন্‌টনে রয়েছে দেখ্‌লুম—কোনো ভয় নেই। তুমি শুয়ে পড়ো। অমন ভাবে 'কাঠ' হয়ে বসে থেকে—শেষে তুমিও 'ফিট্‌' হ'য়ে পড়ো যদি, তবেই তো চিত্তির! মরতে হবে আমাকেই তো? আজকাল্‌কার মেয়েদের যে কথায় কথায় 'ফিট্‌'! যাও, ওঠো বল্‌ছি।

রেখা উঠ্‌ল না। তার বিপন্ন আর্ত্তভাব দেখে দত্ত-মশায় বল্‌লেন —ভয় করবে? আচ্ছা, তা' হ'লে আমার বিছানাতেই গড়িয়ে পড়ো, আমি তো এখন শুতে পারব না, দোরটোর সব খোলা—তারপর মিহির যদি এসেই পড়ে—

ঘরের কোণে একখানা বেতের ইজিচেয়ার রাখা ছিল কবেকার—সেইটে তরীর কাছে টেনে নিয়ে লাঠিটা হাতের গোড়ায় রেখে দত্ত-মশায় বসলেন।

রেখা আর বসতে পারছিল না, সে আস্তে আস্তে উঠে বিছানার একধারে শুয়ে পড়ল—বিপর্য্যস্ত অবসন্ন দেহমন নিয়ে।

বৃষ্টি এবার মুষলধারে পড়ছে।

তীব্র তড়িৎ শিখা থেকে থেকে ঝিলিক্‌ মারছে—অন্ধকার আকাশের নিকষ কালো বিশাল বুকখানা দু'খান্‌ করে' চিরে দিয়ে। ঝোড়ো হাওয়া গোঁ গোঁ করে ছুটছে—দিক্‌বিদিকে। ওঃ, কী দুর্য্যোগ!

এই দুর্যোগের মধ্যে মিহির যদি আসে...আসবে কি? যদি...যদিই সে আর না আসে...এই বিভীষিকাময়ী করাল রাত্রি...

—কড় কড় কড়াৎ!

কি ভয়ানক !—এ বজ্রপাত কোথায় হ'ল কি জানি।

রেখার বুকের ভেতর ধড়াস্ করে' উঠ্ল সজোরে। চকিতে মনে পড়ে গেল মিহিরের সেই হাসি আর কথা—

—যাও বলতে নেই লক্ষ্মী! বলো এসো!

রেখা হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে বস্ল। দত্ত-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'ল আবার?

—বাইরে কে চেঁচিয়ে উঠ্ল না?

খানিক উৎকর্ণ হয়ে দত্ত-মশায় বল্লেন—

—কই? ও তো বাতাসের শব্দ! তুমি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছ নাকি?

—তরীকে আর একবার...

—আবার! বলছি চুপ করে' শুয়ে থাকো একটু, তা' নয়। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে আমাকে আজ ছুটোতে মিলে! বাবারে বাবা! এমন জানলে মিহিরকে আমি ছেড়ে দিতুম নাকি! না হয় রাগই করত একটু।

তরী তখনো নিঃসাড়ে পড়ে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক। হাত-পায়ের সে আড়ষ্টভাব আর নেই—এইটুকু তফাৎ।

পাঁচ

—কর্ত্তাবাবু গো!

ভোর হয়েছে। রাতের ছুর্য্যোগ কেটে গেছে নিঃশেষে। দারুণ উদ্বেগ ও ছুশ্চিন্তায় ক্রমাগত ছটফট্ করতে করতে গভীর ক্লান্তিতে রেখা কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দত্ত-মশায় চেয়ারে বসেই ঢুলেছেন সারারাত। শেষ রাত্রে তন্দ্রাটুকু বেশ জমে এসেছে, তন্দ্রা ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখ্ছিলেন—ঘরে যেন চোর ঢুকেছে, একজন না ছু'-ছু'জন। ইয়া লম্বা চৌড়ো গোঁটাগোঁটা চেহারা, তাদের ইয়া দাড়ি গোঁফ্! একজন লোহার সিন্দুকের ভারি তালাটা ভাঙবার চেষ্টা করছে, অন্যজন দত্ত-মশায়ের লাঠি গাছটাই বন্দুকের মত উঁচিয়ে ধরে' ভয় দেখাচ্ছে তাঁ'কে—কী সর্ব্বনাশ!

ভীষণ আতঙ্কে তিনি যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও চেঁচাতে পারছিলেন না, সেই সময় স্বপ্নের ঘোর তাঁ'র কেটে গেল তরীর আর্ত্তনাদে।

রেখা আগেই জেগে উঠেছে, কিন্তু তার মুখে একটি শব্দ নেই, চোখেও পলক নেই!

—আঃ! কি করিস্ বাপু? চৌপর রাত চোখে-পাতায় এক করতে দিলি না—আবার এখনো...

দত্ত-মশায় চোখ মেলে সোজা হ'য়ে বস্তেই তরী—কর্ত্তাবাবু গো! দাদাবাবুকে দেখো—

বল্তে বল্তে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্ল।

—কে? কে? মিহির? কই, কি হয়েছে তার? অ গেল যা! কাঁদিস্ কেন আবাগী? বল না?

—কি আর বল্ব গো! তোমরা শীগগির করে' চলে গো! দাদাবাবু...

ক্রমশ

পূর্ণশশী দেবী
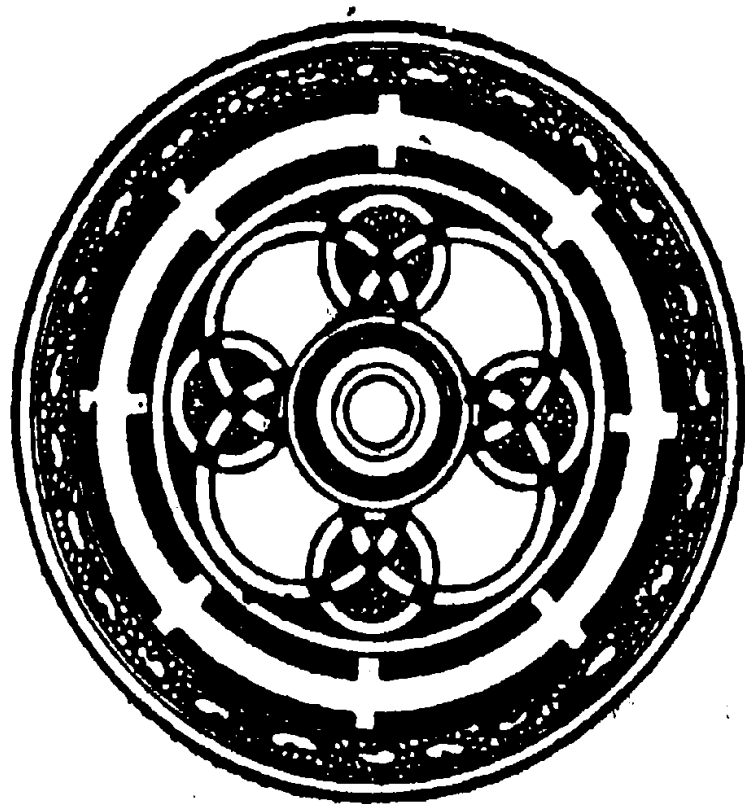
সমবেদনা

শ্রীমতিলাল দাশ

ছোট সহর। মানুষে মানুষে পরিচয়ে গভীর আত্মীয়তার স্পর্শ না মিলিলেও কুৎসা ও নিন্দার স্পর্শ সকলকে এক করে। যে জাতি বড়, সে অপরকে ঈর্ষা করে না—অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। আমরা মৃতকল্প। অপরকে ধূলায় নামাইয়া দম্ভ করিতে পারিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

জাতীয় চরিত্রের এই অন্ধকার যবনিকা আমাদের আখ্যাত সহরটীকেও সজ্জিত করিতে ভোলে নাই।

হরেনবাবুর বাড়ীতে আড্ডা বসে—তাস, দাবা ও পাশাখেলার হুল্লোড় চলে। নবাগত আমাকে ভবেশবাবু টানিয়া লইয়া গেলেন।

মজলিস বটে! আনন্দও উচ্ছল হইয়া সকলকে তৃপ্ত করে—কিন্তু কি সংকীর্ণতার পরিসর! আমাদের আশে-পাশে যে বৃহৎ জগৎ ভাবের দোলায় দুলিতেছে—তার কোনও দোলা যেন এখানে পৌঁছে না। আত্মতৃপ্তি—কিন্তু সে তৃপ্তির পিছনে ত প্রচণ্ড অবসাদ—সুবিপুল ক্লৈব্য।

বসিয়া খোস-গল্প শুনিতেছি, এমন সময় আসিলেন একটী অপরিচিত ভদ্রলোক—প্রৌঢ়, কিন্তু মুখ-কান্তি সৌম্য। মানুষটীকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। ভদ্রলোক বলিলেন—"হরেন দা'—আসাম-বন্যার জন্য কিছু করার দরকার।"

'ছ-তিন নয়' এবং 'কচে বারো'র দল মুখ তুলিয়া চাহিয়া খেলায় মনোনিবেশ করিল। 'ব্রিজে'র খেলোয়াড়েরাও বিরক্ত-দৃষ্টি হানিয়া খেলিতে লাগিল। হরেনবাবু বলিলেন—"দেখুন, অপ্রিয় কথা আমার মুখে নাই বা শুনলেন।"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ব্যাপার কি বুঝিলাম না। হরেনবাবু বিরক্তিটা কোনও মতে ঢাকিয়া বলিলেন—"আপনি জাতি-ধর্ম্ম ধ্বংস করেছেন—তবু আপনার লজ্জা নেই—আপনার সঙ্গে কেউ আর এখন কাজ করবে না।"

ভদ্রলোকের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, কোনও প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"কিন্তু এত সামাজিকতা নয়, হরেনবাবু।"

—"সামাজিকতা হোক্ না হোক্—আপনার মত কালাপাহাড়ের সঙ্গে কেউ চলবে না—কোনও কাজেই নয়।"

পাশাড়ুরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"কখনই নয়—চালো বারো পোয়া তেরো।"

'ব্রিজ' যাহারা খেলিতেছিল, তাহারাও বলিল—"যা' বলেছেন—কখনই নয়।"

ভদ্রলোক কথা কহিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মজলিসে নিন্দার শতমুখী-ধারা বহিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে ভবেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি জানেন নাকি?"

—"জনার্দ্দন চৌধুরীর কথা বলছ ত। লোকটা খুব কর্ম্মী—ওর ঘরোয়া জীবন নিয়েই শুধু নিন্দে। কতকটা জানি বটে—কিন্তু সে এক মহাভারত! আজ নয়, আর একদিন বলব।"

কৌতূহল উদগ্র হইলেও চুপ করিয়া রহিলাম। ভবেশবাবুকে বিরক্ত করা চলে না। গৃহের আনুগত্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র—সেখানে কোনও বিবর্ত্তন বাধাইতে সাহসী নই—আর রাত্রিও সত্যই অধিক হইয়াছিল।

কিন্তু রাত্রে ঘুমের ঘোরে সৌম্য ও তেজস্বী মুখখানি যেন বারেবারে চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল—নানা অসংলগ্ন স্বপ্ন-ঘটনা রচনা করিয়া আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইল।

ভাদ্রের ভরানদী।

কূল ছাপাইয়া উদ্দাম জলরাশি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, ছোট সহরটীর প্রাণ এই নদী।

ওপারে ধানের ক্ষেত জলে ডুবিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি চলে জলে জলাকার। মাঝে মাঝে দু'-চারিটি বনস্পতি শ্যামল শাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীকূলে দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম।

কাল রাত্রির দেখা সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনি এখানে নূতন এসেছেন?"

অমায়িক আচরণ। অন্তরে প্রশ্ন জাগে—যার চরিত্র এত মধুর, লোকে তাকে পাষণ্ড কেন বলে?

বলিলাম—"হাঁ, দু'-চারদিন এসেছি।"

—"আসবেন, এই নদীতীরে বেড়াবেন—এটা খুব ভালো বেড়াবার যায়গা।"

—"বন্যার কতদূর কি করলেন?"

অপ্রতিভ হইয়া ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন—কাল মজলিসে আপনি ছিলেন?"

—"হাঁ, গিয়েছিলাম।"

—"তা' হ'লে ত সবই জানেন।"

—"কিন্তু সহরে ত আরও মানুষ আছে—"

আমার প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"কিন্তু যাঁরা সহরের গণ্যমান্য, তাঁরাই যখন কিছু করবেন না—"

—"আমি অবাক হচ্ছি, ওঁরা কেন এমন করছেন?"

—"ওঁদের খুব দোষ নেই, ওঁরা রাগ করতে পারেন।"

—"কিন্তু কেন?"

—"শুনতে চান?"

—"অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন।"

—"বেশ চলুন, কাছেই আমার বাড়ী—সকালবেলায় একটু গল্প শুনবেন।"

আমি বলিলাম—"আপনাকে বিরক্ত করা হবে না ত?"

—"না, মোটেই নয়—তবে আমার মুখে আমা[র] ইতিহাস শুনলে আপনিও জলগ্রহণ না করে আমা[র] বাড়ী থেকে ফিরবেন।"

—আপনার ইতিহাস জানি নে, তবে মনে রাখবেন—সংসারে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে। কিন্তু আপনা[র] সাথে আগে পরিচিত হ'য়ে নেই। আমার নাম—"সরিৎকুমার সোম। আমি এখানে ডাক্তার হ'[য়ে] এসেছি।"

—"নমস্কার সরিৎবাবু। আমার নাম—জনার্দ্দ[ন] চৌধুরী।"

—"তা' জানি। শুনেছি—আপনি সত্যকার কর্ম্মী।"

—"সত্য মিথ্যা জানি নে, কায করেছি—কিন্তু আ[র] বোধ হয় করতে পারব না।"

ভদ্রলোককে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার সহি[ত] চলিলাম।

সুন্দর সুদৃশ্য কুটীর।

ফুল ও পাতাবাহার গাছের কেয়ারিতে অঙ্গন একা[ন্ত] মনোহর দেখাইতেছিল। অনুমান, ষোল-সতের বৎসরে[র] একটী তরুণী ফুলের বাগানে ফুল তুলিতেছিল—আমাদিগকে দেখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ইজিচেয়ারে বসিলাম। জনার্দ্দনবাবু বলিতে লাগিলে[ন] —"যাকে ফুলের বনে দেখলেন, তিনিই এই নাটকের নায়িকা। আমি তখন চাকরী করি—পোষ্ট অফিসে[র] কেরাণী। কিন্তু কেরাণীর কাজ করলেও মনে তখ[ন] আশা ও উৎসাহ ছিল, তাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার খেয়াল ছিল।

—"সেবার এই সহরে কলেরার বেজায় হিড়িক—রাত্রিদিন লোক মরছিল—কে কা'কে দেখে, কে কার সেব[া] করে।

—"আমি একটা সেবা-সমিতি গড়লাম—উহার মা বাপ কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গরীব বামুন—পুরুতগিরি করে' কোনও রকমে কাল কাটান—বিপদে কেউ তাঁর

হায় ছিল না। সমিতি থেকে তাঁদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হ'ল —কিন্তু ফলে মহামারী উল্কার মা বাপকে এক রাত্রেই নিয়ে গেল। উল্কা তখন দু'-তিন বছরের শিশু।

—"সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলকে অনুরোধ করলাম। কেউ এই শিশুর ভার নিল না। তাই আমার ঘরেই তাকে আশ্রয় দিলাম।

—"আমার ঘরেই উল্কা মানুষ হ'ল—কিন্তু আমি ছোট জাত—আমার জলচল নয়—তাই আমার ভাত জল খেয়ে উল্কারও জাত গেল।

—"উল্কা দিনে দিনে বেড়ে উঠল—ওর বিয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলাম—কোথায়ও ওর বিয়ে দিতে পারি নি। আমার স্ত্রী পাঁচ-ছ' বছর হ'ল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন। উল্কাই সেই থেকে আমার সংসার চালাচ্ছিল।

—"নিরুপায় হয়ে উল্কাকে বললাম—বাংলাদেশের কেউ তোকে বিয়ে করবে না—চল্, কাশী যাই—সেখানে অন্য দেশের কারও হাতে তোকে সমর্পণ করে' আমি দায়মুক্ত হবো।

—"উল্কা দৃপ্তকণ্ঠে বল্‌ল—'আপনার ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।'

—"আমি বললাম—'বলিস কি—বিয়ে না হ'লে তোর উপায় কি হবে—হিঁদুর মেয়ের বিয়ে না হ'লে যে চলে না।'

—"উল্কা বলল—'তা' জানি নে, আমি কোথাও যাব না।'

—"আমি অনেক বুঝিয়ে ওকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না—তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম—ও আমাকে ভালবেসেছে।

—"এ ভালবাসা শ্রদ্ধায় কি কৃতজ্ঞতায়—তা'বলতে পারি নে। প্রৌঢ় বয়সে এ ভালবাসাকে স্বীকার করতে কিছুতেই সম্মত হ'তে পারি কি—কিন্তু উপায়ন্তর না দেখে শেষে উল্কাকে আমি বিয়ে করেছি।

—"কিন্তু আপনাকে সত্য করে বলছি—এ বিয়ের পেছনে কোনও পীড়ন ছিল না, কোনও লোভ ছিল না।"

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বক্তার সত্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিলাম। পরে ভাবাবেগে বলিলাম—"আপনি আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিন্—আপনি সত্যিই দেবতা।"

জনার্দ্দনবাবু বলিলেন—"বলেন কি! আমি অত্যন্ত অধম—অতিশয় দীন।"

—"না—না, আমি আপনার কথার প্রত্যেক বর্ণ বিশ্বাস করছি—আপনি পরিণয়ের বাঁধনে না বাঁধলে এই তরুণীর কি দশা হ'ত জানেন?"

—"জানি বলেই ত দুঃসাহস করতে সাহসী হয়েছি। ওর আশ্রয় ছিল বারবনিতার গৃহে কিংবা কারও গৌরবময় রক্ষিতার আসনে—"

—"খাঁটী কথা বলেছেন। সেদিনও কাগজে পড়ছিলাম—অসবর্ণ বিবাহের ধর্ম্মপত্নী সমাজে চলে না—কিন্তু রক্ষিতায় কোনও দোষ নেই—তার কারণ, সমাজ জীর্ণ ও গলিত।"

—"কিন্তু আপনার ন্যায় মহৎপ্রাণ ক'জন আছেন—" আমরা সমাজে নির্য্যাতিত—আমরা সমাজের কাছে বিতাড়িত।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"আর কেউ না খান্, আমি আপনার বাড়ী খাব। আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু। ভয় করবেন না জনার্দ্দনবাবু,—নির্য্যাতনই জীবনের পরিচয়। মৃত যারা, তারাই স্বস্তিকে বরণ করে—জীবন্ত প্রাণ আঘাত খায়, আর আঘাত জয় করে—সেইখানেই তার মহত্ত্ব।"

—"তা' হ'লে চা করতে বলি।"

—"বলবেন বই কি, কিন্তু শুধু চা-য় চল্‌বে না বল্‌ছি।"

জনার্দ্দনবাবু হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনার কথায় উল্কা খুব খুসী হয়েছে—ওর জীবন বড় একলা কাটছে।"

—"আপনার অনুমতি হয় ত আমার স্ত্রী আসবেন—বৌদি'কে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। বন্যার কথাটা ভুলবেন না—লেগে পড়ুন, পেছনে আমরা আছি।"

জনার্দ্দনবাবু অপরিসীম আনন্দে অভিভূত হইলেন। আমি মনে মনে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। সংসারে এমনই সহানুভূতি, এমনই সমবেদনার কাজে যে কি অপরিসীম তৃপ্তি, কি অনন্ত শান্তি লুকানো আছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানে না।

মতিলাল দাশ

চাঁদা

রায়বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ও-বি-ই

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্মে চারিটি যুবক কলিকাতার রাস্তার ধারে একটী বাড়ীর ঘরে বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে 'ব্রিজ্' খেলিতেছিল। সকলেই খেলায় তন্ময়; কারণ, নন্দ ও নরেশের 'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যাম্' লাভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। দু'জনেই বাল্যাবধি সহপাঠী ও বন্ধু এবং উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান।

'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যামে'র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাস্তার দিকের দরজার কড়া হঠাৎ কে নাড়িতে লাগিল। খেলোয়াড়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। খেলা শেষ করিয়া দরজা খুলিয়া দিবে স্থির করিল; কিন্তু 'ফায়ার ব্রিগেডে'র ঘণ্টার মত সজোরে অনর্গল কড়া নাড়ার শব্দে বাধ্য হইয়া নন্দ উঠিয়া দরজা খুলিতে গেল। দরজা খুলিয়া নন্দ পিছাইয়া আসিয়া বলিল—"ও, আপনি? কি চান?" প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক তরুণী ঘরের ভিতর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরণে খদ্দরের সাড়ী ও ব্লাউস এবং পায়ে সাণ্ডাল। মস্তক হইতে গঙ্গা ও যমুনার মত দুইটী বেণী দুই স্কন্ধ দিয়া বহিয়া বক্ষদেশে পড়িয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বয়স প্রায় সতের-আঠার বৎসর। প্রকৃত সুন্দরী না হইলেও যৌবন-সুলভ গঠন ও মুখশ্রীতে রমণীকে সুন্দরী দেখাইতেছিল। ঘরের ভিতর আসিতেই বাকী তিনবন্ধু তাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের উষ্ণবায়ু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নন্দ দরজা বন্ধ করিয়া তরুণীকে বসিতে বলিল। তরুণী বলিলেন—"উঃ, কি গরম! তারপর আপনারা তাসে এত ব্যস্ত যে, দরজা খুলতেই চান্ না।" নন্দ বলিল—"আমরা ত জানি না আপনি এসেছেন।" সকলেই হাসিয়া উঠিল, যেন পূর্ব্ব হইতেই রমণীর আগমনের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল। তরুণী বলিলেন—"আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন বেহারে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছে।" নরেন বলিল—"সে বিকট সত্যটা আমরা ত অনেকদিনই মেনে নিয়েছি।" নন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি ভূমিকম্পের ভুক্তভোগী?" তরুণী বলিলেন—"না, আমি ভুগি নি, তবে যাঁরা ভুগেছেন, তাঁদের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।" সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই!" তরুণী তখন ধীরে ধীরে ব্লাউসের ভিতর হইতে একখানি রসিদ-বহি বাহির করিয়া বলিলেন—"আমরা চাঁদা তুলছি, আপনাদের কিছু দিতে হবে।" নন্দ বাড়ীর মালিক, সুতরাং সে বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া দিল। তরুণী নন্দর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রসিদ দিলেন। অপর তিনজন বন্ধুর নিকট টাকা চাওয়াতে তাহারা বলিল যে, তাহারা তাস খেলিতে আসিয়াছে, কাজেই সঙ্গে কিছু আনে নাই। তরুণী তাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনারা যে 'ব্রীজ্' খেল্‌ছেন। যে রকম তন্ময় হয়ে খেল্‌ছিলেন তা'তে মনে হয় টাকা বাজী রেখেই খেল্‌ছিলেন; সুতরাং সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু থাক্‌বার কথা।" বন্ধুরা পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল। নন্দ বলিয়া উঠিল—"আপনি সি-আই-ডিতে কাজ করেন নাকি?" তরুণী হাসিয়া বলিলেন—"হয় ত ভবিষ্যতে কর্‌তে পারি। এখন থেকে একটু এ বিদ্যে শেখা ভাল।" তখন তিন বন্ধুই পকেট হইতে একটী করিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। তরুণীও তাহাদের রসিদ দিলেন। পিপাসার জন্য এক গেলাস জল চাহিলেন। নন্দ বলিল—"শুধু জল খাবেন কেন? এত বেলা হয়েছে রোদে এসেছেন, একটু মিষ্টি ও জল খান না?" তরুণী বলিলেন—"তা' দিন। সেই সকালে এককাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখনও পেটে কিছু পড়ে নি।" নন্দ ভিতর হইতে একথালা খাবার ও ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। তরুণী ধন্যবাদ দিয়া তাহার সদ্গতি করিয়া উঠিলেন। বাহিরে যাইবার পরই নরেন বলিল—"ওরে, মেয়েটী আমা-

…ও ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল, কি জানি কিছু …আছে কি না। ওর নামটা রসিদেই দেখা …কিন্তু ঠিকানাটাও জেনে নিলে হয় না?" সকলেই …"ঠিক।" নন্দ তাড়াতাড়ি রাস্তায় ছুটিয়া গিয়া …ক বলিল—"আপনি ত আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে …নিজের ত কিছুই বল্লেন না। আপনার ঠিকানা?" …"বিদ্যাসাগর কলেজ—আই—এ, সেকেণ্ড ইয়ার …সমর—"সে ত হ'ল কলেজের ঠিকানা, আমাদের …ঠিকানার বদলে আপনার কলেজের ঠিকানা দিলে …কেন? বাড়ীর ঠিকানা কি?" তরুণী—"সাত নম্বর …ঙ্গা রোড্।" নন্দ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলকে …বলিয়া দিল। একজন বন্ধু বলিল—"আচ্ছা, …কা যে ভূমিকম্পে অভাবগ্রস্থ লোকের কাছে ঠিক্ …, তা' বিশ্বাস কি? আর একজন বলিল—"রসিদে …থ-সভা'র নাম আর ঠিকানা আছে, না হয় সেখানে …করা যাবে।" নন্দ—"লোককে অত অবিশ্বাস কর …যদি পেটের দায়ে মেয়েটা এই দুপুর রোদে ভিক্ষেই …কে, তাতেই বা কি হয়েছে?" নরেন—"সেটা কিন্তু …হবে। ভিক্ষে চাইলে অমন যুবতীকে আমরা নিশ্চয় …দিতাম; তবে মিথ্যে ভূমিকম্পের নাম নেওয়া ভাল … সকলেই আবার 'গ্রাণ্ড্ শ্ল্যামে' মন দিল।

দুই

…চ-সাতদিন পরে নন্দ 'অনাথ-সভা'র অফিসে …। একটী ভদ্রলোক খাতাপত্র লইয়া হিসাবে ব্যস্ত …। নন্দ তাঁহাকে নিজের রসিদ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা …—"মশায়, রেবা বোস যে ভূমিকম্পের চাঁদা আদায় …, সে টাকা আপনি পেয়েছেন কি?" ভদ্রলোক …সিদ দেখিয়া বলিল—"না, এখনও টাকা পাই নি। …চেকবই ফুরিয়ে গেলে একেবারে সব টাকা জমা …।" নন্দর মনে সন্দেহ হইল, হয় ত নরেনের কথাই … তরুণী টাকাটা নিজেই বোধ হয় লইয়াছে। …র আবিষ্কারের জন্য নন্দ সাত নম্বর মাথাভাঙ্গা …র দিকে চলিল।

তিন

রোড্ নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে মাথা-ভাঙ্গা একটা গলি। নম্বর দেখিতে দেখিতে সাত নম্বর বাড়ীর সম্মুখে নন্দ পৌঁছিল। বাড়িটি ছোট, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। উপরের জানালাগুলিতে বেশ 'হেম-করা' রঙ্গীন পরদা দেওয়া। সদর দরজা বন্ধ। তরুণী যেরূপ সজোরে নন্দর বাড়ীর দরজার কড়া নাড়া দিয়াছিলেন, নন্দ ততোধিক জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। উপর হইতে কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল—"কেও?" নন্দ কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিল না। যদি বলে—"আমি নন্দ।" রমণী তাহাকে কি করিয়া চিনিবেন? কত লোকে চাঁদা দিয়াছে, প্রত্যেকের নাম কি তাঁহার মনে আছে? কাজেই নন্দ প্রশ্নের উত্তরে—"এই আমি" বলিতেই রেবা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নন্দকে দেখিলেন এবং নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর?"

নন্দ—"এই এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাব্‌লাম—একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে' যাই। আর খোঁজ করি ভূমিকম্পের জন্য কত টাকা আদায় কল্লেন।"

রেবা—"আপনার রসিদটা দেখি।" নন্দ পকেট হইতে রসিদ বাহির করিয়া দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি ত খুব সাবধানী। এক টাকা চাঁদা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রসিদটা নিয়ে ঘোরেন। ভয় হয়েছে বুঝি, টাকাটা আমি পেয়েছি কিনা।" নন্দ—"না—না—সেজন্যে নয়। আপনি যদি আমায় চিন্তে না পারেন, সেজন্য রসিদটা এনেছিলাম।"

রেবা—"আর লুকোচ্ছেন কেন? এখানে আসবার আগে 'অনাথ-সভা'র অফিসে গিয়ে খোঁজ করেছেন—আমি যে টাকা নিয়েছি, সেটা জমা দিয়েছি কিনা।"

নন্দ আম্‌তাআম্‌তা করিতে লাগিল। রেবা বলিল——"দেখুন, এইমাত্র সভার সেক্রেটারী আমাকে ফোন্ করছিলেন যে, একশ' চুয়াত্তর নম্বর রসিদের মালিক এসে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমি যে চাঁদা তুলেছি, সেটা জমা দিয়েছি কিনা।"

নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—"কি জানেন,

বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে সন্দেহ করছিল, সেইজন্যে আমি আপনার সততা সম্বন্ধে একটু খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। আমার মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না।"

নন্দর দুরবস্থা দেখিয়া তরুণী বলিলেন—"থাক, ঢের হয়েছে, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এখন দয়া করে' ওপরে চলুন। আমাকে পেটপুরে খাইয়েছেন, সেটা কি আমি ভুলতে পারি?"

চার

বাড়ীর ভিতর আসিয়া নন্দ দেখিল—একতালায় দু'টি ঘর। একটিতে এক ভদ্রলোক নিদ্রিত। উপরে তিনটী ঘর। বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

নন্দকে যে ঘরে রেবা বসিতে বলিলেন, সেটি বিলাতী 'ড্রইংরুমে'র মত সাজান। তরুণী এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিয়া নন্দকে বলিলেন—"ইনি আমার মা।" আর নন্দকে দেখাইয়া মাকে বলিলেন—"ইনি নন্দবাবু। সেদিন চাঁদা তুলতে গিয়ে এঁরই বাড়ীতে খুব খেয়েছিলাম।" তারপর তিনজনে বসিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। রেবার মাতার উত্তরে নন্দ বলিল যে, সে এম-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে। কলিকাতায় বাড়ী। সংসারে একমাত্র বিধবা মা আছেন এবং তাহাদের সংসারের অবস্থাও সচ্ছল। নন্দও জানিল, রেবারা প্রবাসী, কলেজে পড়িবার জন্য তাহার কলিকাতায় আসা। নীচে যে ভদ্রলোক নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন, তিনি রেবার গৃহশিক্ষক। খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া রেবা একথালা মিষ্টান্ন আনিয়া নন্দকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, নন্দ হৃষ্টচিত্তে অনুরোধ রক্ষা করিল। কক্ষের একপাশে একটী আমেরিকান অর্গান্ দেখিয়া নন্দ রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি গান করেন?" রেবা বলিলেন—"হ্যাঁ—আজকাল গান না জানলে যে মেয়েদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না।" নন্দর অনুরোধে রেবা গান গাহিলেন। নন্দ চক্ষু ও কর্ণ বিস্ফারিত করিয়া শুনিল—শুনিয়া মুগ্ধ হইল। ভাবিতে লাগিল—এবার বুঝি চিরকুমার-ব্রত ভঙ্গ হয়। বিদায়ের সময় রেবা বলিলেন—"মাঝে মাঝে আসবেন। তবে বিকেলবেলা আসবেন সন্ধ্যের পর বড় ব্যস্ত থাকি।" বলা বাহুল্য, [illegible] অনুরোধে পুলকিত হইয়া 'তথাস্তু' জানাইয়া ফিরিল।

পাঁচ

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। নন্দর 'কোর্ট[illegible] খুব ক্ষিপ্রগতিতে চলিতেছে। একদিন বৈকা[illegible] বাড়ী যাইবার সময় একটা গরুর গাড়ীর স[illegible] বাইসিকেলে অকস্মাৎ ধাক্কা লাগায় তাহার গ[illegible] পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখে আ[illegible] ভাবিতে লাগিল—ভিতরে যাইবে কিনা। না[illegible] ভাল; কারণ, রেবার গৃহকার্য্যে বিঘ্ন হইতে পা[illegible] সন্ধ্যার পর আসিতেও ত নিষেধ ছিল। আবার [illegible] এতদূর আসিয়াছে, আর যখন আজ আসিবার কথ[illegible] তখন না হয় ক্ষমা চাহিয়া একবার দেখা করিয়াই [illegible] এই ভাবিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা [illegible] মাজিতে মাজিতে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলি[illegible] নন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদি[illegible] করছেন?" ঝি বলিল—"একজন বাবু এসেছেন, সঙ্গে যা' করেন, তাঁর সঙ্গেও তাই করছেন।"

নন্দ, বাবুর নাম জিজ্ঞাসা করায় বুড়ী বলিল—[illegible] নরেনবাবু।" নরেনের নাম শুনিয়া নন্দ স্তম্ভি[illegible] ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিন থেকে নরেনবা[illegible] আসছেন?" ঝি বলিল—"তুমিও যতদিন ধরে [illegible] ও বাবুও ততদিন থেকে আসছেন। তুমি বিকালে[illegible] আর উনি সন্ধ্যের পর আসেন।"

নন্দ দুঃখে ও রাগে ফুলিতে লাগিল। ভাবিল-[illegible] গিয়া রেবার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা [illegible] নরেনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ভাবিয়া [illegible] পরের বাড়ীতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে পরে অত্যা[illegible] হইবে। তখন সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে রাস্তার [illegible] নরেনের নিষ্ক্রমণের অপেক্ষায় পায়চারি করিতে [illegible]

ছয়

নন্দ যখন পথে পদচারণা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিল, তখন নরেনকে রেবার বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিল। একটু অন্ধকারে দাঁড়াইয়া নরেনের দিকে সে চাহিয়া রহিল। এই বন্ধুদ্বয়ের মিলন দুই ইঞ্জিনের 'কলিসনে'র মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। নরেন নিকটে আসিয়া নন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি নন্দ, কোথায় যাচ্ছ?"

নন্দ—"আমি যেখানেই যাই, তুমি রেবার বাসায় কি করতে গিয়েছিলে? ছিঃ, তোমার ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেল।"

নরেন—"এই যে চাঁদার টাকাটা দিয়েছি, সেটার কি হ'ল খোঁজ করতে গিয়েছিলাম।

নন্দ—"তা', দু'মাস ধরে' ঐ এক টাকার খোঁজ হচ্ছিল? তুমি ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর নীচ।"

নরেন—"বেশ করেছি, যদি রেবার বাড়ী দু'মাস ধরে' গিয়ে থাকি, তোমার কি ক্ষতি করেছি?"

নন্দ—"ওরে গাধা, আমি যে দু'মাস ধরে ওর সঙ্গে কোর্টসিপ্ কচ্ছি।"

নরেন—"তবে নীচ তুমিও। তুমি যখন কোর্টসিপ করতে গিয়েছিলে, সে কথা কি আমাকে বলেছিলে? আর মেয়েটা কি দাগাবাজ! সেও ত কিছু বলে নি।"

ক্রমেই বাদানুবাদ উচ্চৈঃস্বরে হইতে লাগিল। একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া বলিল—"এ বাবু, তোমলোক্ ভদ্দর আদ্‌মী, সড়ক্‌পর কাঁহে তক্‌রার্ করতা হায়, পাঁচ আইনমে চালান দেঙ্গে।" পাড়ার দুই-চারিজন লোকও বন্ধুদ্বয়ের বিবাদে তামাসা উপভোগ করিতেছিল। পাহারাওয়ালার আবির্ভাবে তাহারা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

সাত

আট-দশদিন তাসের আড্ডায় না যাইয়া নরেনের উস্‌পেপ্‌সিয়া হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ের ভিতর কোন বন্ধুই রেবার বাসায় যাইতে সাহস করে নাই; কারণ, সেখানে বন্ধুদ্বয়ের পুনরায় মিলন হইলে আইন-ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। অনেক ভাবিয়া নরেন স্থির করিল—বাল্যবন্ধুর সহিত বিবাদের একটা আপোষ মীমাংসা করাই ভাল।

নন্দও তাসের আড্ডায় নরেনের অভাব বোধ করিতেছিল। হঠাৎ নরেন আজ আড্ডায় হাজির হওয়াতে নন্দ আশ্চর্য্য হইল! অন্যান্য আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন নরেন অনুপস্থিত ছিল কেন? নন্দর ভয় হইল, হাটের মাঝে বুঝি নরেন হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন বলিল—"শরীর ভাল ছিল না।" এই বলিয়া নন্দকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—সে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে যে, একটা স্ত্রীলোকের জন্য বাল্যবন্ধুর সহিত মনোমালিন্য রাখা উচিত নয়; অথচ, রেবার মত রত্ন দুই বন্ধুর ভিতর একজনেরই লাভ হওয়া উচিত। দুই মাস পরিশ্রমের ফলে তাহাদের দুইজনেরই আইনের পড়া অনেক পড়িয়া গিয়াছে। কয়দিন ভাবিয়া সে এই জটিল ব্যাপারের এক সহজ সমাধানের পন্থা ঠিক করিয়াছে; অর্থাৎ, দুইবন্ধু একসঙ্গে গিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিবে—তিনি কাহাকে সত্যই ভালবাসেন। কারণ, এ ব্যাপারে বন্ধুদের অপেক্ষা রেবারই দোষ বেশী। যাহাকে বেশী ভাল কি সত্যই ভালবাসেন, তিনি তাহাকেই বাসায় প্রবেশাধিকার দিলে সকল দিক্ দিয়াই মঙ্গল হইবে, আর বন্ধুদ্বয়ের মনেও আক্ষেপের কোন কারণ থাকিবে না। নরেনের এই সমাধান নন্দের যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। স্থির হইল যে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু এই মোকর্দ্দমার মীমাংসার জন্য রেবার বাড়ী যাইবে এবং তাঁহার চিত্ত-সাগর মন্থন করিয়া দেখিবে, কাহার ভাগ্যে গরল এবং কাহার ভাগ্যে সুধা উঠে।

আট

গোধূলি-লগ্নে দুই বন্ধু রেবার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে স্থির হইল যে, নন্দ যখন রেবার বাড়ী আগে গিয়াছে, তখন সে তাহার বক্তৃতা

আগেই করিবে। সে সময় নরেন কথা কহিতে পারিবে না। সেইরূপ নরেন যখন তাহার প্রার্থনা জানাইবে, তখন নন্দও বোবার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। শেষে রেবা রায় প্রদান করিবেন। এই কার্য্য-তালিকা স্থির করিতে করিতে দুইজনে রেবার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কড়া নাড়িবার পর বুড়ী ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া বন্ধুদের দেখিয়া নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও মা, এতদিন পরে তোমরা কোত্থেকে!" নন্দ—"কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই আস্‌তে পারি নি। দিদিমণি কি করছেন?" ঝি—"ও মা, তাও বুঝি জান না? দিদিমণি ত পরশু শ্বশুর-বাড়ী গেছে।" নরেন—"সে কি! তোমার দিদিমণি ত বল-তেন তিনি কুমারী।" ঝি—"হাঁ, হাঁ, বিয়ের আগে সব মেয়েই ত কুমারী থাকে।"

নরেন—"তোমার দিদিমণির আবার বিয়ে কবে হ'ল?"

ঝি—"ও মা, কি হবে গা! এই আজ চারদিন হ'ল। তোমাদের বুঝি পত্তর দেয় নি?"

দুই বন্ধু একেবারে অবাক্! নরেন জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে বিয়েটা হ'ল?"

ঝি—"ঐ যে বাবুটী দিদিমণিকে পড়াতেন, আ[র] এখানে থাক্‌তেন—তাঁর সঙ্গে।"

নরেন—"দেখ নন্দ, আমাদের দু'মাসের পরিশ্রম কি[...] রকম বৃথা হ'ল!"

বুড়ী ঝি দন্তবিহীন মুখমণ্ডল বিস্তারিত করিয়া হাসিয়[া] বলিল—"ও, তোমরা দু'মাস খোসামোদ করেই মেয়ে[র] মন পাবে ঠিক করেছিলে—আর ওই মাষ্টারবাবু দু'বছ[র] মাইনে না নিয়ে পড়িয়েছে আর খোসামোদ করেছে। তাঁ[র] ত বক্‌শিস্ চাই।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বুড়ী দরজা বন্ধ করি[য়া] দিল।

পথে আসিতে আসিতে নন্দ বলিল—"তা', আমাদে[র] চাঁদার টাকার গতি কি হ'ল, সেটা না হয় একবার 'অনা[থ] সভা'র অফিসে গিয়ে খোঁজ করা যাক্।"

নরেন রাজী হইল না। বলিল—"থাক্, আর দরকা[র] নেই। ওই চাঁদা দিয়েই ত আমাদের এত লাঞ্ছনা।"

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যা[য়]

এম্‌নিই হয়

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

খাসা এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গরম কেটে গেছে। আষাঢ়ের সকাল। না শীত, না গ্রীষ্ম—বেশ উপভোগের। সরোজ বসেছিল—তার ঘরের সামনে ছাদের উপর। নীচেই নিকটে একটা ফুলের বাগান। স্নিগ্ধ সজল হাওয়া তারই গন্ধ বহন করে' সরোজকে মাতাল করে' তুলেছিল। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোওয়াভাবে সে আপনার মনে হাস্‌ছিল।

মল্লিকা এসে ডাকল—"বলি চা-টা খাবে কি?"

চেয়ার থেকে না উঠেই ঘাড় ফিরিয়ে সরোজ বল্‌ল—"নিশ্চয়—নিশ্চয়!"

—"তবে ওঠ" বলে' এগিয়ে এসে মল্লিকা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌ল—"ও কি! তুমি আজ আপন-মনে অত হাস্‌ছ কেন?"

—"হাস্‌ছি।" বলেই কথাটা সরোজ ঘুরিয়ে নিল—"তুমি রয়েছ সাম্‌নে। আমি কি আর না হেসে পারি?"

মল্লিকা একটু বিরক্তির ভান করে' বল্‌ল—"কেন, আমি কি সঙ—তাই আমাকে দেখে অত হাস্‌ছ?"

—"আহা! ঠোঁট ফুলোও কেন? তোমাকে যদি সঙ বলি, আমি কি হই?"

সরোজের কথায় মল্লিকা বেশ খুসিই হ'ল। মনে মনে হার স্বীকারও করে' নিল। হাসি চেপে বল্‌ল—"সত্যি বল না, কেন হাস্‌ছ?"

মুখের হাসিকে চোখে বদ্‌লি করে' সরোজ বল্‌ল—"নেহাতই শুন্‌তে হবে? আচ্ছা শোন—চামেলীকে নেমন্তন্ন কর্‌তে হবে।"

—"তা'তে আর হাসির কি আছে?" তারপর মল্লিকা একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"আহা! তাকে আর কেন?"

বাধা দিয়ে সরোজ বল্‌ল—"সেও হাস্‌বে।"

দুঃখের সুরেই মল্লিকা উত্তর দিল—"তার হাসি যে আট্‌কে গেছে।"

—"খুলে যাবে—খুলে যাবে!"

মল্লিকা বল্‌ল—"হাস্‌লেও সেটা প্রাণের হাসি হবে না।"

সরোজ বল্‌ল—"তা' না হোক্, তবু সেটা হাসি। তাকে নেমন্তন্ন করে' পাঠাও, সেও হাস্‌বে—হ্যাঁ, তাকেও হাস্‌তে হবে। না হেসে কি শেষকালে মারা যাবে?"

দুই

চামেলী আর মল্লিকা মায়ের পেটের দুই বোন্।—পিঠোপিঠি, কাজেই ভাবটা ঠিক্ সমবয়সী সখীর মত। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস রোধ কর্‌বে কি করে'? দুই জনেরই ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে হ'লেও ফল এক হ'ল না। মল্লিকা স্বামী-সৌভাগ্যবতী হ'ল। সামান্য একটু কারণে চামেলীর স্বামী তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌ল।

চামেলীর স্বামী রমণীমোহন লোক মন্দ নয়। তবে কবি মানুষ—কিছু খেয়ালী। একটুতেই তার মন মুসড়ে পড়ে' বুক ভেঙে যায়। সহিষ্ণুতা বলে' কিছু তার ছিল না। তুচ্ছ কারণেই শ্বশুর-নন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীর সহিত সে অসহযোগ করে' বস্‌ল।

প্রায় বছর তিনেক আগে—তখন চামেলীর বয়স বারো কি তেরো, তার ভাই তাকে নিতে এসেছিল বাপের বাড়ী থেকে।

রমণী বালিকা চামেলীকে প্রশ্ন কর্‌ল—"আমাকে ফেলে চলে' যেতে তোমার মন কেমন কর্‌বে না।"

রমণী যা' শুনবে আশা করেছিল—সাধারণ নায়িকারা এ সব সময়ে যা' বলে' থাকে—চামেলী তার কিছুই বল্‌ল না। সে শুধু বল্‌ল—"না, একবার ঘুরে আসি।"

রমণী তবু আশায় বুক বেঁধে আবার প্রশ্ন করলে—“আমায় ছেড়ে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে না ?”

এবার আশার ফল ফল্‌ল বটে, কিন্তু মন ভর্‌ল না। চামেলী বল্‌ল—“হ্যাঁ, মন একটু খারাপ হবে। কিন্তু দাদা যখন নিতে এসেছেন—তুমি আর অমত করো না। অনেকদিন বাপের বাড়ী যাই নি।”

রমণীর কবি-কোমল হৃদয় ব্যথিত হ’য়ে উঠ্‌ল। তার জন্যে মন খারাপ—শুধু ভদ্রতা হিসাবে—কিন্তু আন্তরিক টান তার বাপের বাড়ীর উপর। সে একবার ভেবে দেখ্‌ল না—সেইটেই যে স্বাভাবিক। যেখানে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান গেছে, যেখানে অনাবিল স্নেহ প্রথম জীবন হ’তে আজ পর্য্যন্ত সমানে পেয়ে আস্‌ছে, সেখানকার প্রতি যদি আন্তরিক টান না হয়, সেটা ত অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ।

কথা সেদিন এই পর্য্যন্ত হয়েছিল। তারপর যাওয়ার আগে কিশোরী চামেলী স্বামীকে প্রণাম করে’ আর একবার বিদায় চাইল। এবারে রমণীর অভিমানে ব্যথিত চিত্ত আর বাধা দিল না। এই ঘটনায় যে কালো মেঘের সৃষ্টি হ’ল, আর একদিনের এই রকম আর একটি ছোট ঘটনায় তার থেকে বর্ষণ দেখা গেল। ফলে রমণীদের বাড়ী থেকে বেচারী চামেলী ভেসে চলে’ যেতে বাধ্য হ’ল—বাপের বাড়ীতে।

তখনও পূর্ব্বের ঘটনার মাস কেটে যায় নি। রমণী চামেলীকে নিতে এসেছে। ছোট একটি মেয়ে, মাত্র কয়দিন বাপের বাড়ী এসেছে, এরই ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাড়া সকলের ভাল ঠেক্‌ল না। চামেলীর বাবা বলে’ ফেল্‌লেন—“বাবা, তোমার বাবার কি দু’দিনও সবুর সইল না ? মাত্র আজ ক’দিন এসেছে—এরই ভিতরে নিতে পাঠালেন ?”

রমণী শ্বশুরের কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সে মনে মনে চট্‌ল। ব্যাপারটা হচ্ছে—তার বাবার হয় তো সবুর সইত, কিন্তু সবুর যে তারই সয় না।

এর উপর আবার রাতে চামেলী নিজেও আরো কিছুদিন তাকে বাপের বাড়ী রাখ্‌বার জন্য রমণীর নিকট জিদ্‌ ধর্‌ল। রমণী প্রশ্ন কর্‌ল—“কই, তোমার দিদি তো বাপের বাড়ী থাকে না ?”

অজ্ঞাতসারেই চামেলীর মুখ থেকে বার হ’ল—“আগে দিদির মত হই, আমিও বাপের বাড়ী থাক্‌বো না।”

রমণী আর কিছুই বল্‌ল না। অভিমান-ভরে সে চলে’ গেল। চামেলী ভাব্‌ল—দেখা হ’লে সাধ্‌লেই রাগ পড়ে’ যাবে।

তিন

কিন্তু সেই দেখাটা আর হ’ল না। রমণীর বাবা আর চামেলীর বাবার মধ্যে একটু মনের অমিল পূর্ব্ব হ’তেই ছিল, এইবার সেটা রমণী ও চামেলীর ভিতরে প্রকাশ পেল। কাজেই ব্যাপারটা সরু মোটা দুটো তারে জড়িয়েই গেল।

এদিকে চামেলী তার দিদির মত বয়সও পেল, দিদির মত মনোভাবও তার গড়ে’ উঠ্‌ল; অথচ, তাকে বাপের বাড়ীই থাক্‌তে হ’ল এবং সে তার জন্যে দিন দিন ব্যথিতও হ’য়ে উঠ্‌ল।

সমবয়সী সখীদের ভিতরে দু’-একজন তাকে রমণীকে চিঠি লিখ্‌তে বল্‌ল। কিন্তু তা’ সে পেরে উঠ্‌ল না। খোসামোদ করে’ নিজের স্থান সংগ্রহ করে’ নেওয়া, আর যেচে অপমান স্বীকার করা, দুই-ই এক কথা। ছি ছি! তাও কি কখনো হয়? না—যে স্বামী তার মনের কথা না বুঝে মুখের বলাটাকেই বড় করে’ নিলেন, তাঁর কাছে সে নত হ’তে পারে না।

রমণীর মা ছেলের পুনরায় বিয়ে দিতে চান। রমণী অবশ্য সে বিষয়ে কোন কথাই বলে না। তার মন আর নতুন বিয়ে কর্‌তে চায় না। বিয়ের কথা উঠ্‌লেই তার চামেলীর সেই ছোট্ট কচি সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। ব্যথায় বুক্‌টা টন্‌টন্‌ করে’ ওঠে। ছি ছি, সে করেছে কি! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছে! সে বাপ মার কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে চামেলীকে নিয়ে আসার প্রস্তাব কর্‌তে পারে না, আবার বিয়েতেও অমত করে না। ভরসা—যদি তার বিয়ের কথা শুনে তার শ্বশুর চামেলীকে তাদের

বাড়ী রেখে যান। বিয়ের আলোচনায় তার ভরসা ছিল —কিন্তু তার বাপ বিয়ের কথায় রাজী হন্ না। তাঁর অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য ছিল। এই জীবিকা-সমস্যার দিনে একজনের দুই বিয়ে কিছুতেই করা উচিত নয়। চিরদিন কখন কলহ থাকে না। তার ফলে দুই বৌয়ের ছেলেপুলে হ'তে আরম্ভ কর্‌লেই চক্ষুস্থির! তাদের মানুষ করে' তুল্‌তে আর বিয়ে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত। যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায়—বিবাদ চিরদিনের মতই রয়ে যাবে—তা' হলেও মাসোহারা টান্‌তে হবে। মাস-মাস মাসোহারা টানাটাও সহজ বা প্রীতিপ্রদ নয়। তার চেয়ে কিছুদিনের পর চামেলীর বাপ আপনিই দাঁতে কুটো করে' মেয়ে রেখে যাওয়ার পথ পাবেন না। তিনি সেই ভরসাতেই আছেন।

চার

চামেলী আর মল্লিকা গল্প কর্‌ছিল। অনেকদিন পরে দুই বোনের দেখা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অনেক কিছুই গল্পে চল্‌ছিল। এমন সময় সরোজ সেখানে প্রবেশ করল কণ্ঠে সুরের লহর তুলে—

"সন্ধ্যাবেলার চামেলী আর সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি?"

চামেলী পাদপূরণ করে' দিল—

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

সরোজ হেসে বল্‌ল—"এ কিন্তু 'পথভোলা পথিক' না। মাঝে মাঝে মল্লিকা-কুঞ্জে এর দেখা পাওয়া যায়। যথ—"

ভ্রূকুটি করে' মল্লিকা বল্‌ল—"থামো! কি যে বলো তার মুণ্ডু কিছুরই যদি ঠিক থাকে।"

চামেলী জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"হাতে ওটা কি দাদাবাবু?"

গম্ভীর-কণ্ঠে সরোজ বল্‌ল—"এটা একটা পর্‌দা।"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া মল্লিকা বল্‌ল—"তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। ওতে কি হবে?"

—"হবে গো, হবে—অনেক কিছু হবে।" বলে' সরোজ হাস্‌তে লাগ্‌ল। বিরক্তি-পরিপূর্ণ-স্বরে চামেলী বল্‌ল—দাদাবাবুর বয়স হচ্ছে, তবু এই বুড়োবয়সে এত ঢঙ্-ও আসে?"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সরোজ বল্‌ল—"বুড়ো আমি হ'তে যাব কেন? বুড়ো হোক্ তোমার সেই বেরসিক, অবলা অত্যাচারী—বিভ্রমবিলাসী রমণীমোহন। যার কুঞ্জে কোনদিন কোনও বসন্তের কাকের সাড়া—কোনও শ্রাবণের জোয়ার ধারা আসে নি।"

মল্লিকা একটা তীব্র কটাক্ষ কর্‌ল। যেন সে মহাদেবের কটাক্ষে কামদেবের মত সরোজকে ভস্ম কর্‌তে চায়। সরোজ তা' গ্রাহ্যও কর্‌ল না, মুখ টিপে-টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

চামেলী আবার বল্‌ল—"বলুনই না, পর্দ্দার কি হবে?"

সরোজ উত্তর দিল—"তোমরা মেয়েমানুষের জাতটা কি রাশ পাতলা বলো তো? একটা কথা শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, আর একটুও তর সইছে না—ওটা এই দরজাটাতে দিতে হবে।"

একটা ইঙ্গিতের, হাসির আড়াল দিয়ে মল্লিকা বল্‌ল—"এতদিন পরে আবার ও খেয়াল হ'ল কেন?"

—"শোন, কাল আমার জনকতক বন্ধু এখানে খাবেন, তাঁরা এলে গ্রামোফোনে গান দিতে হবে। পর্দ্দানশীন চামেলী বিবি পর্দ্দার অন্তরালে বসে' গান কর্‌বেন, আর আমি স-বন্ধু এই বারান্দায় বসে' সেই গানের রস উপভোগ কর্‌বো।"

—"ওঃ! এই জন্যে সাত তাড়াতাড়ি আনা হ'ল।" বলে' মল্লিকা হঠাৎ উঠে গেল।

সরোজ কাগজ কলম নিয়ে নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ কর্‌তে বসে' গেল। ফর্দ্দে রমণীর নামও বদ পড়্‌ল না। এবং তাকে বিশেষ করে লিখল—"যদিও তুমি আমাদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছ, তবু লিখ্‌ছি—কাল সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করে' এখানে কবিতা 'রিসাইট্' কর্‌বেন—তোমার আসা চাই-ই।"

পাঁচ

সঙ্গীহীন জীবন আর রমণী বইতে পার্‌চে না। সে ক্রমেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ছিল। কি যে তার হারিয়েছে—কি যে তার নেই—সে তো তা' জানে—তবু তাকে ফিরিয়ে

নিতে পারছিল না। বাধা দিচ্ছিল তা'তে সঙ্কোচ, অদম্য লজ্জা আর পুরুষত্বের অভিমান।

কিছুই তার ভাল লাগে না। আলমারি থেকে বাঁধান খাতাখানা টেনে নিয়ে নিজেরই লেখা কবিতার দু'টি লাইন পড়ল—

"এমনি মধুর রাতে সুখ-স্মৃতি যায় যায়,
বঁধু মোরে বলেছিল—কাল যাব কালনায়।"—

কিন্তু আর ভাল লাগল না। দু'লাইন পড়েই খাতাখানা টান দিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দিল। তারপর আপনার মনকে শুনিয়েই যেন অস্পষ্টস্বরে বলে' উঠল—"না, আর পারা যায় না!"

তার মনও যেন বলে' উঠল—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? সরোজের কাছে যাও। তার হাত-পা ধরে' বলো গে—আর যে পারছি নে দাদা! তুমিই এর একটা বিহিত করো।

এমন সময় পিয়ন এসে বলল—"বাবু চিঠি?"

চিঠি পড়েই রমণীর বুকখানা আনন্দে নেচে উঠল। ঘড়ি দেখল—পঁচিশ মিনিট পরেই একখানা ট্রেণ আছে। জামা গায়ে দিয়েই সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সেই সময় একখানা ট্যাক্সি মোড় ফিরছিল। সে তা'তে চেপে বসে' বলল—"চালাও—হাওড়া ষ্টেশন।"

সরোজের বাড়ী বালি। রবীন্দ্রনাথ যে কেমন করে' হঠাৎ বালিতে কবিতা আবৃত্তি করতে সম্মত হ'লেন, তা' ভেবে দেখবার অবসর তার ছিল না। টিকিট কেটে ট্রেণে চেপে বসে' সে মনে মনে তরজমা করতে সুরু করে' দিল—সে কি করে কথাটা সরোজের কাছে পাড়বে।

ছয়

আকাশে মেঘে ভরা।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। আসর জমজমাট। বন্ধুরা প্রায় সবাই এসেছেন। বাইরে খোস্-গল্প চলছে।

পর্দ্দার ভিতরে চামেলী গ্রামোফোনের তোড়জোড় সব ঠিক করছিল।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। চামেলী গ্রামোফোনে দম দিচ্ছিল। সেই শব্দে রমণী সজাগ হ'য়ে উঠল। তবে কি রবীন্দ্রনাথ কলে আবৃত্তি করবেন? তাই এই যবনিকা? এ ষড়যন্ত্র! সে আর থাকতে পারল না, সরোজকে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা, ও-ঘরে যদি ঠাকুর-ম'শায় আছেন—তবে পর্দ্দা টাঙানো কেন?"

সরোজের হাসি ঠেকানোই অসম্ভব হ'য়ে উঠল। তবু সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে' বলল—"লোকের সামনে তিনি আজকাল আবৃত্তি করেন না। তার উপরে সব চেয়ে বড় কথা—তিনি পত্নী-ত্যাগীকে দেখা দেন না।"

রমণী সরোজের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। সে পর্দ্দা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। ঠিক সেই সময় চামেলী রেকর্ডে পিন দিল। ঠাকুর কবির অনবদ্য কণ্ঠের আবৃত্তি শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ়ের আকাশের বাঁধ ভেঙ্গে জলের বান ভেসে এল—

"বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়।
এলে তুমি ঘন বরষায়।"

এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্য তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ঘন বরষার আসা তাদের চিরন্তনী ভরসাকে সত্য করে' তুলল। তারা ভুলে গিয়েছিল, বাইরের অনেকগুলি লোক তাদের এই মিলন উপভোগ করছে।

আবৃত্তি থেমে গেছে। পিন তার অধিকারের বাইরে পড়ে' ঘ্যার্‌ঘ্যার্ করছিল। বাইরে থেকে ডেকে সরোজ বলে' উঠল—"আবৃত্তি কিন্তু অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে সুর করে' বলে' উঠল—
"সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো, সকালবেলার চামেলী
তোমার হ'ল কি!

লাজ-সঙ্কুচিত কণ্ঠে রমণী বলল—
"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

বাইরে হাসির হল্লা এবং পাশের ঘরে চাপা হাসি গুঞ্জন শোনা গেল।

বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

অনুভূতি

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

বীণা আমার উপর রাগ করিয়াছে…আর আমার উপর রাগ করিয়াই আমার জন্য বালিশের ঝালর দেওয়া ওয়াড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ওর রাগ দেখিয়া আমি মজা পাই, আমার হাসি লাগে।…

ও যখনই আমার উপর অভিমান করে, আমার যাহা প্রিয় সেই কাজগুলিই করিতে চায়।

একদিন যেমন—

কতদিন ধরিয়া বলিয়াছিলাম—আমার পড়ার ঘরটা গুছাইয়া দিতে।…গুছাইয়া রাখিতে আমি কোনদিন পারি না।…এলোমেলো, ওলট্-পালট্ হইয়া পড়িয়া থাকে, অথচ দরকারের সময় তচনচ করিয়া সমস্ত ঘর খুঁড়িয়া ফেলিবার জোগাড় করি; তবুও কাজের জিনিষ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু সে স্বভাব আমার কোনদিনও শোধরাইল না।

যাই হোক্, আমার কথার উত্তরে ও সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিল, আমার দ্বারা হবে না। মাগো, এত নোংরা মানুষ থাকতে পারে! তোমার ও 'ডাষ্টবিন্' আমি ঘাঁটতে পারবো না।

ওর আলগা বাঁধা মাথার চুলগুলো ঘাঁটিয়া আলুথালু করিয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি তো আমার ঘরের রাণী—আমার 'ডাষ্টবিন্'-টাই না হয় একদিন সাফ্‌সুফ্ ক'রে তোমার খাস্‌কামরা বানিয়ে দিয়ে এলে। বীণা উত্তর দিয়াছিল, আমার দায় প'ড়েছে। আজ গুছিয়ে দিই, আর কাল তুমি সব জঞ্জাল ক'রে এসো। দরকার কি বাপু আমার বাজে পরিশ্রম ক'রে।

অথচ ওর ঘরটায় দেখো—

সাজানো-গোছানো। চমৎকার ধবধবে পরিচ্ছন্ন বিছানাটা। ঘরের মেঝে, দেয়াল, ছাতের সিলিঙে পর্য্যন্ত একটু ধূলো ঝুল নাই। ড্রেসিং টেব্‌লে চুলের দড়ি থেকে চিরুণী, স্নো, পমেড, হেয়ার অয়েল, পাউডার, সেন্ট্ দিব্যি সাজানো। দেয়ালে ছবি, বারান্দায় ফুলের টব—সব তক্‌তকে পরিষ্কার।

আলমারীর বই, রাইটিং টেব্‌লের প্যাড্, কালী, লেটার পেপার, এনভেলাপ্ কোনটাই ওলট্ পালট্ নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়।

আমাকে তো কিছুতেই হাত দিতে দেয় না। যা' দরকার—চাহিয়া লইতে হয়।…

যাই হোক্, সেদিন বিকালবেলায় বেড়াইয়া আসিয়া আমার ঘর খুলিয়া দেখি, রাগের চোটে বীণা আমার ঘর পরিষ্কার করিয়া দিব্য সাজাইয়া গিয়াছে—এমনিই সুন্দর করিয়া যে, আমার মনে হইয়া গেল একটা কবিতা লিখিয়া ফেলি; কিম্বা বসিয়া বসিয়া গান গাহি—যদিও দুইটার কোনটাতেই আমার আদপেই দখল নাই।

বীণার আজিকার রাগের কারণ আমি ওর সঙ্গে সারাদিন মিশি নাই। দুপুরে আমার এক বন্ধু আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া মাতিয়াছিলাম। তারপর দু'জনে সিনেমায় গিয়া তাহাকে 'গুড্‌নাইট' করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার পরে বাড়ী ফিরিয়া দেখি প্রিয়া আমার ঠোঁট ফুলাইয়া বসিয়া আছেন।

খেয়াল হইয়া গেল—রাগের কথাই বটে। সারাদিন তো দূরের কথা, রোজ বিকালে ওর সাথে যে বেড়াইতে যাই, তাও আজ হয় নাই।

কৈফিয়ৎ কাটাইতে বলিলাম, অনেকদিনের দেখা—তারপর ওই-ই জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—তাই আর এড়াতে পারলুম না। তারপর একটু হাসিয়া বলিলাম, আর তোমার সঙ্গে তো সমস্ত রাতটাই প'ড়ে আছে।

একটা ঠোঁটও নড়িল না, উপরন্তু ওর মাথাটা আরও

মনোযোগের সহিত নীচু হইয়া গেল বালিশের ওয়াড়ের ওপর—যেখানে ছুটো লতা বুনিয়া তাহারই ভিতর আমার নামের প্রথমার্দ্ধ ও বসাইতেছিল—মণি। বলিলাম, এত যত্ন ক'রে নামটা বসাচ্ছ, ট্রেণে কি কোথাও যদি ওই বালিশ নিয়ে আমি ঘুমোই—যারা আমায় চেনে না তারা ভাব্‌বে মণি বুঝি আমারই প্রিয়তমার নাম৷

তবুও কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে মনে মনে হাসিয়া ওর ড্রেসিং টেব্‌লের কাছে গিয়া চিরুণীটা হাতে তুলিয়া লইয়াছি, ও ধড়মড় করিয়া আসিয়া আমাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, ব'লেছি কোনদিন ওসবে হাত দিও না, তবু দেবে।

আমি একেবারে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। তারপর বলিলাম, ও তুমি আছো—আমি এত কথা ব'লছিলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না দেখে ভাবছিলাম—ঘরে বুঝি লোক নেই।

ইহার উত্তরে শুনিলাম, ঠাকুর খেতে দাও।

বুঝিলাম আজিকার মানের পালা সহজে তো যাইবেই না, আর রাত্রিটাও সম্ভবতঃ চুপচাপ ঘুমাইয়া কাটিবে।

মনে মনে বন্ধুবরের উপরও রাগ হইয়া গেল। কেনই বা সে আমায় সিনেমায় টানিয়া লইয়া গেল।

ঠাকুর রোজকার মত দু'জনের খাবার একসঙ্গেই দিয়াছিল। আজ কিন্তু একজন কেবল পাশে থাকিয়া আমার খাওয়ার তদারকে রহিল, আর আমি চুপচাপ খাইয়া চলিলাম।...

একই বিছানায় দু'জনে শুইয়া—অথচ অভিমানিনী প্রিয়া আমার মাঝখানে একটা মস্ত পাশ বালিশ দিয়া আমাদের দু'জনার সংস্পর্শের অবরোধ গড়িয়া দিয়াছে, যেটা অন্য অন্যদিন অনাবশ্যক বোধে ও নিজেই দূরে সরাইয়া দেয়। মান-ভঞ্জনের পালা আমারই। বলিয়া চলিলাম, আমি জানি আমার বীণ্‌ আমায় সারাদিন না পেয়ে কত দুঃখ পেয়েচে। কিন্তু ভাই, আমি কি ইচ্ছে ক'রে তোমায় কষ্ট দিই! ঘটনা-চক্রে হ'য়ে যায়। এই দেখো, তুমিও তো মাঝে মাঝে এক-একদিন তোমার বন্ধুদের নিয়ে গল্প-গুজব কর, তাদের বাড়ী বেড়াতে যাও—

কোন উত্তর পাইলাম না। ও দেয়ালের ধারে কাত হইয়া শুইয়া রহিল।...

বলিলাম, যাক্‌ গে—কাল দু'জনে 'রূপবাণী'তে যাওয়া যাবে। নতুন ফিল্‌মটা দেখে আসা যাক্‌—কি বল?

তারপর ওর দিকে ফিরিয়া ওর গায়ে হাত দিলাম—ইচ্ছা, ওকে আমার দিকে টানিয়া ফিরাইব।

শুনিয়াছি, গোখ্‌রো কি কেউটে সাপের লেজে পা দিলে তাহারা সবেগে মাথা চাড়া দিয়া ফুলিয়া উঠে। দেখি নাই, কিন্তু দেখিলাম। (তাদেরই মত বোধ হয়) লাফাইয়া উঠিয়া বিছানায় বসিয়া বীণা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার মতলবখানা কি, আমায় ঘুমুতে দেবে না?

বলিলাম, কোনদিনই তো এত সকাল সকাল ঘুমোও না। বলিল, না চৌপোর রাত কেবল তোমার সঙ্গে মাতামাতি করি। হাসিয়া বলিলাম, সেটা তো আর আইন-বিরুদ্ধ নয়, আর তোমার আমার বয়েসের কারোর অবাঞ্ছনীয়ও নয়।

বলিল, তোমার সঙ্গে আমার বাজে বকবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি দুই-ই নেই। দোহাই তোমার, আমায় আর বিরক্ত করো না।...তারপর পুনরায় সেইভাবেই শুইয়া পড়িল, যেভাবে শুইয়াছিল।

হাল ছাড়িয়া দিলাম। বুঝিলাম, সহজে আজ আর রাগ কাটিবে না। মনকে প্রবোধ দিলাম, আমাকেও রাগ করিতে হইবে; দরকার নাই খোসামোদ করিয়া।...

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম—আমার শয্যা-সঙ্গিনী নিত্যকার মতই আগে আগে বিছানা ছাড়িয়া গিয়াছে। উঠিয়া মুখ ধুইয়া খবরের কাগজ হাতে লইতেই চাকর চায়ের টেবিলে চা আনিয়া দিল, কিন্তু চা ঢালিবার নিত্যকার সাথীটি আসিল না। মধুই চা ঢালিতেছিল। বলিলাম, তোদের মা কোথায় মধু? মধু বলিল, ও ঘরে চা খাচ্ছেন, আর কার্পেটে পশম বুনছেন। ইচ্ছা হইল, চায়ের ট্রে-শুদ্ধ ছুঁড়িয়া দিয়া আমিও খুব রাগ করিয়া বসি। কিন্তু চা আমি কিছুতেই না খাইয়া থাকিতে পারি না ও

নষ্ট করিতে চাহি না।···কাজেই পেয়ালা টানিয়া লইয়া মধুকে বলিলাম, দেখ্, তোকে আট আনা বকশিস্ করব, তুই তোর মাকে ব'ল্ গে যা' বাবু রাগ ক'রে চা ফেলে দিয়েছেন, খান্ নি। আর এখানে খানিকটা লিকার ঢেলে দিস্।

মধু একগাল হাসিয়া বলিল, সে আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি বাবু।

তাহাকে আট আনা দিয়া কাগজ লইয়া পড়ার ঘরে চলিয়া গেলাম। কিন্তু যাওয়াই আমার বৃথা হইল—কেহ সাধিতেও আসিল না, বা আমার জন্য নতুন তৈরী চা লইয়াও আসিয়া পৌঁছিল না। পরে শুনিয়াছিলাম, বুদ্ধিমতী গৃহিণী আমার নিজে আরও আট আনা দিয়া মধুর নিকট হইতে আসল কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।··· লাভে হইতে মধুর লাভ হইল নগদ এক টাকা। একেই বলে, 'কারো সর্ব্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস।'

বেলা দশটা—

উঠিলাম। অন্যদিন এতক্ষণ বোধ হয় প্রায় পঞ্চাশবার বীণা আমার কাছে আসিত, আমার পাশে আমার গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া একসঙ্গে আমার সহিত কাগজ পড়িত, গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিত ...আমি ওর সঙ্গে পড়িতে পড়িতে, গল্প ও গান করিতে করিতে ওর পায়ের উপর আমার পা তুলিয়া দিতাম, খুন্‌সুটী করিতাম, তারপর ওর গালে 'ফস্' করিয়া চুমু খাইয়া লইতাম।

ও আমার গায়ে হেলিয়া পড়িয়া আমার গায়ে চিমটী কাটিয়া দিত। আমি হয় ত প্রত্যুত্তরে ওর খোঁপাটা খুলিয়া দিয়া চুল এলাইয়া দিতাম। সমস্ত চুলের রাশি আমার মুখ চোখ ঢাকিয়া নামিয়া পড়িত।...

ওর কেশের সুরভি এখনো আমার নিঃশ্বাসে ভাসিতেছে।...

স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিনের মতই আমি গল্প-মাতাল হইয়া উঠিতেছি।

ওকে তেমনি করিয়াই সন্নিকটে পাইবার কামনা-বিধুর মনকে লইয়া আমি উঠিলাম। ঘরে গিয়া পৌঁছিলাম।

দেখি, ও বাথরুম হইতে আসিয়া ভিজা চুল আঁচড়াইতেছে। আমাকে একবার আড়ে দেখিয়া লইল, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া যেন আপন খেয়ালেই মত্ত হইয়া গেল। আমি পিছন হইতে ওর চোখ দু'টি টিপিয়া ধরিলাম, কিন্তু আজ আর ও অন্যদিনকার মত দু'টি হাত দিয়া আমার গলাটী ধরিয়া নীচে ওর কাঁধের কাছে টানিয়া নামাইল না। হাতের চিরুণী হাতে রাখিয়াই বিরক্তির ভঙ্গীতে দেহ দুলাইয়া বলিল, আঃ, চুলটাও বাঁধতে দেবে না ছাই! বলিলাম, লক্ষ্মী রাণী, আমায় আর কষ্ট দিও না ভাই। এমন ধারা বোবা মেয়ে আর আমি থাকতে পারি না।

তারপর ওর চোখ ছাড়িয়া দিলাম। ও কোন উত্তর দিল না—আপন মনেই নিজের কাজ করিতে লাগিল। আমার অসহ্য হইয়া উঠিল, এমন কি কান্নাও আসিতে লাগিল। এরকম দীর্ঘ মৌনতা আমাদের মধ্যে কোনদিনও থাকে নাই, এমন কি ওর কোন রাগেও নয়। ইচ্ছা হইল, মাপই না হয় চাইয়া বসি।

তবু যদি কথাতেই হয়—

বলিলাম, পরশুদিন কি লজ্জাটাই পেয়েছিলুম রাস্তায় বের হ'য়ে। যে দেখে সেই ঠাট্টা ক'রে ব'লছিল—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো,
মুকুর তুলিয়া চাঁদ মুখখানি দেখো।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দেখি, কপালে, গালে সিঁদুরের দাগ।

ও ব'ল্লে, তা' তোমাদের সময় অসময়ের আবেগের ঠেলায় তো আর বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে আমাদের লক্ষণ, আচার বন্ধ ক'রতে পারি নে।···আর তা'তেও যদি আমাদের দোষ হয়, শাস্তি দাও—আমরা তো তোমাদের পায়ে পড়া দাসী ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদের অপরাধ তো পদে পদে।...

বলিলাম, বীণু, তুমি যে আমায় এমন ক'রে আঘাত দেবে, আমি কখনও ভাবতে পারি নি। তুমি বলো, আমি কোনদিন তোমার সঙ্গে এরকম কোন ব্যবহার ক'রেছি।··

না ক'রে থাকো, কর।...আমরা তো তোমাদের দয়ার প্রত্যাশী জীব।

আমার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ওর এ রকম কথা আমি কোনদিন শুনিতে পারি না।

বউ—ও আমার সাথী, জীবনের প্রীতি, আনন্দ, সুখ, দুখ, প্রমোদের সমভাগিনী।...ওকে আমি কোনদিন হেলা-ফেলা করিতে চাহি না। ওদের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে কিংবা নিজেকে ওদের কাছে মস্ত করিয়া রাখিয়া কোন ভয়ের পূজা আমি পাইতে চাহি না।

বলিলাম, ছি বীনু, তুমি এত নিষ্ঠুর; আমায় এমন ক'রে পরের মত বেদনা দিয়ে কাঁদাতে চাও। বেশ... তা'তে যদি তুমি সুখী হও, আমার আপত্তি নেই।

সত্যিই আমার অন্তর বড় ব্যথাতেই আজ খান্ খান্ হইয়া গেল। একটা দিন না হয় বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিয়াই বেড়াইয়াছি, তার জন্য এত কঠিন...

আমি কোন কথা আর না কহিয়া চুপ করিয়া বিছানায় বসিলাম। তারপর শুইয়া রহিলাম নীরবেই।

বীণা ওর কাজগুলো একে একে সব শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর আমার জামাটী ঝাড়িয়া দিল, কাপড়-গুলো কোঁচাইয়া আল্‌নায় ঠিক্ করিয়া রাখিল। কৌটা খুলিয়া সিগারেট বাহির করিয়া আমার কেসে ভরিয়া দিল। তারপর বাহির হইয়া গেল—বোধ হয় রান্নাঘরেই।

খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। তারপর বিছানায় আমার কাছে আসিয়া কহিল, যাও, চান ক'রে এসো।

আমার অভিমান হইল। আমি তো চান করিব না, খাইব না···আমার কি রাগ দুঃখ নাই! উত্তর করিলাম না।

ও পুনরায় বলিল, ওঠো, শুন্‌চো!

বলিলাম, খাবো না।

খাবে না।

না।

কেন?

ইচ্ছে নেই।

রাগ ক'রেছো।

রাগ আমি কার ওপর ক'রতে যাবো।

আমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। ও বলিল, তবে?

এমনি।

ও আমার পাশটীতে বসিয়া বলিল, আচ্ছা, 'পিস্।' ওঠো এবার।

আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। ও বলিল, দেখো, তুমি আমার কাছে না থাক্‌লে ঠিক এমনিই আমার কষ্ট হয়। আমি চাই, তুমি সব সময়েই আমার পাশে পাশে থাকো। যাক্, আর বেলা ক'রো না। ঠাকুরের রান্না হ'য়ে গেছে, তোমার জন্য আমি নিজে আজ কালিয়া রেঁধেছি, ওঠো। তারপর ওর গালটী আমার গালের উপর রাখিল, ওর সোণার হাত দু'খানি দিয়া আমার চুল টানিয়া দিতে লাগিল। আমি আর পারিলাম না।...

গল্প, স্পর্শে আমার মিলন-বিরহী আত্মা পীড়িত হইয়া উঠিল।...ওকে আমি আমাব বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইলাম। আমারই মুখে ও মুখ মিলাইয়া পড়িয়া রহিল প্রায় পাঁচমিনিট। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ছাড়ো সিঁদুর লাগ্‌বে।

বলিলাম, লাগুক্।...

পাঁচুগোপাল মিত্র

ভ্রমণ

গোয়ালিয়রে একদিন

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

দুই বন্ধুতে সেবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করতে করতে আগ্রায় এসে পৌছলাম। আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখা প্রায় শেষ করে' সেদিন দুপুরে আহারাদির পর হোটেলে আমাদের ঘরে বসে' নব-পরিচিত আর একজন বোর্ডার সু—বাবুর সঙ্গে ভ্রমণ-সংক্রান্ত নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা হ'তে হ'তে স্থির হ'য়ে গেল যে, পরদিন প্রাতে আমরা গোয়ালিয়র দেখতে যা'ব। তৎক্ষণাৎ 'টাইম টেব্‌ল' বের করে' ট্রেণের সময় দেখা ও যাত্রার আনুসঙ্গিক অন্যান্য আয়োজন করা সুরু হ'ল। গোয়ালিয়র যেতে হ'লে আমাদের খুব প্রত্যুষে উঠে আগ্রা ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে গিয়ে দিল্লী থেকে বোম্বাইগামী জি-আই-পি রেলের মেন লাইনের ট্রেণ ধরতে হবে। ষ্টেশনের পথটিও নিতান্ত কম নয়। সেইজন্যে বিকেলে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা ঠিক্ করে' আসা গেল। শীতকাল। রাত থাকতে সহজে বিছানা ছেড়ে ওঠা সম্ভব হবে না বুঝে ঘড়িটাতে 'এ্যালার্ম' দিয়ে সন্ধ্যার পরই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন। তখনও রাত রয়েছে। তারকা-কণ্টকিত আকাশের নীচে দিয়ে 'মল্ রোড' ধরে' আমাদের টাঙ্গা যখন ছুটে চল্‌লো, শেষ রাত্রির আব্‌ছা অন্ধকারে মনে হ'ল সাজাহানের আগ্রা যেন 'মমতাজের বিরহে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে আছে। যাই হোক্, ট্রেণ যথাসময়ে এলে আমরা তা'তে উঠে বসলাম। আগ্রা ক্যাণ্ট থেকে গোয়ালিয়র মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ; সুতরাং, সেখানে বেলা সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌছে যাওয়া গেল।

পথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখি নি; তবে করদ-রাজ্য ঢোলপুরের ষ্টেশনটা পড়েছিল বটে। মোরার রোড আর গোয়ালিয়র ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে ট্রেণ থেকেই দেখ্‌লাম, 'গোয়ালিয়র পটারি ওয়ার্কস্'-এর কারখানা। তারপর চোখের সাম্‌নে সহসা ফুটে উঠ্‌লো সুনীল আকাশের পটভূমির' উপর সহস্র কীর্ত্তি-স্মৃতি-বিজড়িত গোয়ালিয়র দুর্গ উচ্চ পর্ব্বতের ওপর সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে তা'র সেই বিরাট্ সুমহান্ সৌন্দর্য্য দেখে কত কথাই মনে পড়লো...এই দুর্গেই এক-দিন স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়েছিল... মারহাট্টা রাজারা একদিন এইখান থেকেই সমস্ত উত্তর ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই দুর্গ কখনও পড়েছে মোগলদের হাতে, কখনও রাজপুতদের হাতে। একবার একে অধিকার করেছে তোমর-বংশীয় রাজারা, একবার দাস-বংশীয়েরা। আবার কখনও এসেছে সুর-বংশীয় মুসলমান রাজা সেরশাহের অধিকারে, কখনও গোহাদের হিন্দু জাঠ রাণাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে। কিন্তু গোয়ালিয়র দুর্গের কথা স্মরণ হলেই যাঁর অপূর্ব্ব বীরত্বে গৌরব বোধ করি

তিনি ঝাঁসির অলোকসামান্যা বীর রাণী লক্ষ্মীবাই। অনেক প্রবল ঝঞ্ঝা সহ্য করার পর গত আটচল্লিশ বছর এই দুর্গ সিন্ধিয়ার হাতে আছে। অবিলম্বে আমরা এর ভেতরে গিয়ে ভালো করে' দেখতে পাব ভেবে কৌতূহলে অধীর হ'য়ে উঠলাম।

গোয়ালিয়র ষ্টেশনের অদূরে একটি ধর্ম্মশালার খোঁজ পাওয়া গেল। বাড়ীটি বেশ বড়, ঘরও অনেকগুলি; কিন্তু বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, কৃষ্ণকায়, মলিন ও স্বল্পবসনতুষ্ট খঞ্জব্যক্তি এসে নিজেকে ধর্ম্মশালার 'মাণিজোড়' (অর্থাৎ ম্যানেজার—'মাণিজোড়' নয়) বলে' পরিচয় দিয়ে অতি রূঢ়ভাবে জানিয়ে দিলে, 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।' অর্থাৎ, কিনা সোজা ভাষায়, স্থানাভাব। তবে আমরা যদি ইচ্ছা করি, তা' হ'লে সেই ধর্ম্মশালার একাধিক দেয়াল আলমারির একটিতে আমাদের জিনিষ-পত্তর, কাপড়-চোপড় তালা দিয়ে রেখে বিশ্রামাদি করতে পারি। 'পড়েছি মোগলের হাতে—' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করে' আমরা অগত্যা একটি দেওয়াল আলমারিই অবশেষে দখল করলাম ও তাড়াতাড়ি সেই ধর্ম্মশালার কূপের জলে স্নান সেরে নিলাম। পরে অবশ্য ঘুরে ঘুরে আমরা সমস্ত ঘরগুলি দেখেছিলাম। অনেকগুলিই তালাবন্ধ। আর বাকীগুলির কোনটিতে স্থানীয় চানাচুরওয়ালা তাঁর ভাঁড়ার সাজিয়েছেন, কোনটিতে মিঠাইওয়ালা 'পারমেনেন্ট সেটেলমেণ্ট' করেছেন বলেই বোধ হ'ল। অবশ্য এঁদের সঙ্গে আমাদের অতিথিবৎসল 'মাণিজোড়ে'র যে কোনরকম আর্থিক 'সেটেলমেণ্ট' হয়েছিল, এ রকম সিদ্ধান্ত করা সু—বাবুর অন্যায় বই কি।

যাই হোক্, স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম অদূরবর্ত্তী 'পার্ক হোটেলে'র উদ্দেশে। একটি রমণীয় উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদোপম হোটেলটি। এ দিকটাকে 'লস্কর' বা 'নিউ গোয়ালিয়র' বলে। হোটেলের ম্যানেজার যুক্তপ্রদেশীয় একটি শিক্ষিত অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁ'র তদারকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হ'ল ও আহারাদির পর একটি টাঙ্গা ভাড়া করে' আমরা ফোর্টের অভিমুখে চললাম।

ফোর্টের মধ্যে যেতে অনেকগুলি গেট অতিক্রম করতে হয়। আমরা প্রথমে 'আলমগিরি গেটে'র সম্মুখে গিয়ে টাঙ্গা থেকে নামলাম। পাশেই দুর্গের বাইরে দেখ্লাম 'জুম্মা মসজিদ।' এই মস্‌জিদ্ আর 'আলমগিরি গেট্' বাদশাহ্ আওরংজীবের সময়ে নির্ম্মিত হয়; আবার কা'রও মতে মস্‌জিদটি জাহাঙ্গীরের আমলে তৈরী।

দ্বারীকে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা হ'ল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দক্ষিণ দিকে পড়লো 'গুর্জ্জরীমহল'। বহুতোরণ বিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত এই দ্বিতল প্রাসাদটি দুর্গের মধ্যে একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। রাজা মানসিংহ তাঁ'র প্রিয়তমা গুর্জ্জরী রাণী মৃগনয়নার জন্যে এই সুন্দর প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। উপস্থিত এটি 'আরচিওলজিক্যাল মিউজিয়াম'-রূপে ব্যবহৃত হচ্চে। আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজ ১৯২২ সালে যখন গোয়ালিয়রে যান, সেই সময় তিনি এই মিউজিয়মটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

'গুর্জ্জরী মহল' পেছনে রেখে আমরা ক্রমোচ্চ পথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠ্‌তে লাগলাম। কিছুদূর এইভাবে গিয়ে সকলেই বিশেষ তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় একটি লোকের নির্দ্দেশে পাশেই একটি গুহার মতন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে সঞ্চিত সুশীতল জলপান করে' বিশেষ তৃপ্তি বোধ হ'ল। শুন্‌লাম, উহা নাকি ঝরণার জল।

সমস্ত দুর্গটির মধ্যে আমরা যতগুলি বৃহৎ গেট অতিক্রম করেছিলাম তা'র মধ্যে 'হাতিয়া গেট্' দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুইটি গেট্‌ই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের আমলে নির্ম্মিত হয়েছিল। 'হাতি গেটে'র সম্মুখে আগে পাথরের হাতি শোভা পেতো, সেই জন্যেই নাম হয়েছে 'হাতিগেট' বা 'হাতিপৌর।' প্রতি গেট্‌টি চমৎকার কারুকার্য্যমণ্ডিত।

ফোর্টের মধ্যে অন্যতম প্রধান সৌধ 'মানমন্দির।' কি স্থাপত্যকৌশলে, কি শিল্পসমৃদ্ধিতে অথবা পরিকল্পনার পারিপাট্যে এর অবিংসবাদী শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই
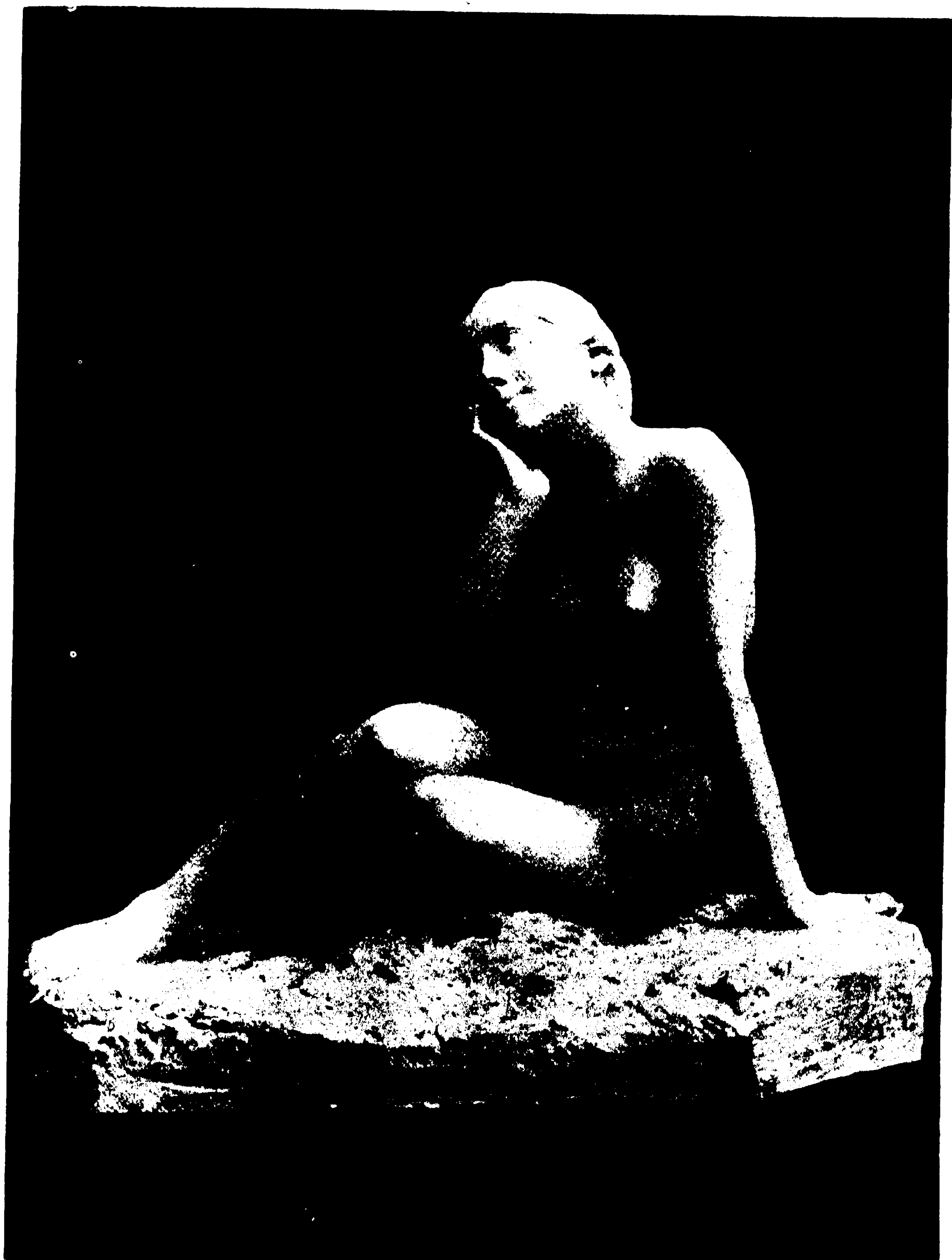
নগ্ন সৌন্দর্য্য

গ্রীসিয়ান ভাস্কর্য্যের আদর্শ।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ অজ্ঞাতনামা অথচ সুনিপুণ শিল্পীর হাতে এর সৃষ্টি, কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় এসব কারুকার্য্য বোধ হয় খুব বেশীদিন হয় নি শেষ হয়েছে। পাথরের টালির ওপর নানারঙের এনামেল করা ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির রঙীন প্রতিকৃতি দেখ্‌লে সহসা তা'দের কৃত্রিম বলে' বিশ্বাস করতে যেন বাধে। হাঁস, ময়ূর, হাতি প্রভৃতির ছবিগুলিই বা কী চমৎকার! অনেকগুলি বিরাট গেট্ পার হ'য়ে হঠাৎ এর সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই দর্শকের মনে হয় কোন এক সুগম্ভীর ব্যক্তির মুখ হঠাৎ যেন সুমধুর হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এই চারতলা বাড়ীটি দুই মহলে বিভক্ত। বাহির মহলে থাক্‌তো রাজভৃত্যেরা,আর ভেতর মহলে রাজা সপরিবারে। নীচের দু'টি তলা ভীষণ অন্ধকার; আমাদের টর্চ্চ ছিল, তাই সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। শুন্‌লাম, দুর্গ যখন মোগলদের অধিকারে ছিল, তখন এই সব অন্ধকার কুঠ্‌রি-গুলিতে অপরাধীরা বন্দী থাক্‌তো। 'মানমন্দিরে'র গাইড্ আমাদের একটি কক্ষ দেখিয়ে বল্‌লে—সেই কক্ষে সম্রাট্ আওরংজীব তাঁর সহোদর ভাই মোরাদকে বন্দী করে' রেখেছিলেন। মোরাদ খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সেই জন্যে বাইরের লোকের সাহায্যে দড়ির একটি মই লাগিয়ে একরাত্রে তিনি যখন পালাবার যোগাড় কর্‌ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সামান্য অসাবধানতায় অসতর্ক নিদ্রিত প্রহরীদের ঘুম ভেঙে যায় ও তাঁ'র চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর পর আওরংজীব শত্রুর শেষ রাখা ঠিক্ নয় বুঝে চক্রান্ত করে' তাঁর মস্তকটি দেহবিচ্যুত করেন ও তাঁর শবদেহ ঐ দুর্গের মধ্যেই একস্থানে প্রোথিত করা হয়। অকুস্থানে দাঁড়িয়ে অসহায় বন্দী রাজভ্রাতার সেই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুন্‌লে যুগপৎ ভয় ও করুণার দুই বিরুদ্ধ হৃদয়ানুভূতিতে বিচলিত হ'য়ে পড়তে হয়।

'মানমন্দিরে'র ওপর তলায় 'শিস্‌মহল' নামে যে বিচিত্র কক্ষটি আছে, সেখানকার পাথরের ঝিলিমিলিগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনুপম। এই ঝিলিমিলিগুলির মধ্য দিয়ে রাজ-পরিবারের পর্দ্দানশীন মহিলারা পথচারী পুরুষের দৃষ্টিপথে না পড়েও বাইরের সাধারণ দৃশ্য উপভোগ করতেন।

'মানমন্দিরে'র একজায়গায় প্রাচীরগাত্রের একাংশ দেখিয়ে গাইড্ বললে—সেইখান দিয়ে পূর্ব্বে তিনটি সুদীর্ঘ গুপ্তপথ ছিল; এখন সেই পথের প্রবেশমুখ বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বকালে শত্রুপক্ষ দুর্গ অবরোধ করলে, যখন দুর্গরক্ষার আর কোন উপায় থাকৃত না, তখন দুর্গাধিপতি তাঁর বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে গুপ্তভাবে দুর্গত্যাগ করতেন। এই তিনটি পথের মধ্যে একটি নাকি ছিল আগ্রা পর্য্যন্ত ও আর একটি নারওয়ার পর্য্যন্ত। তৃতীয় পথটির বিষয় গাইড্ বিশেষ কিছু বলতে পারলো না।

রাজা মানসিংহের (আকবরের সেনাপতি নয়) নাম থেকেই 'মানমন্দিরে'র নামকরণ। ইনি রাজকার্য্যে নিপুণ, আমোদপ্রিয়, দয়ালু, গুণগ্রাহী ও কবি ছিলেন। এঁরই আমলে 'গুর্জ্জরী মহল', 'মানমন্দির' প্রভৃতি অনেক-গুলি বিখ্যাত কারুকার্য্য-সমন্বিত সৌধ নির্ম্মিত হয়েছিল। সেগুলি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়, কারুশিল্প তাঁ'র কত প্রিয় ছিল।

'মানমন্দির' শেষ করে' আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। এক-স্থানে 'জহরকুণ্ড' নামে একটি বড় পুষ্করিণী দেখ্‌লাম। এই কুণ্ডটির নামের সঙ্গে একটি অতি করুণ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। পরিহার-বংশের শেষ রাণা সারঙ্গদেবের অধিকারে তখন এই দুর্গ ছিল। দাস-বংশের বিখ্যাত রাজা আল্‌তমাশ বহু সৈন্যসহ এই পথে দিল্লী যাচ্ছিলেন। গোয়ালিয়র দুর্গের সমৃদ্ধির কথা শুনে তিনি দুর্গ আক্রমণ করেন। রাণা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যখন দেখা গেল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হওয়া অবধারিত, তখন পুরনারীরা সকলে মিলে এইখানে 'জহরব্রতে'র অনুষ্ঠান করেন ও সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। বর্ত্তমান নারী-ধর্ষণের যুগের দুর্ব্বলাম্মন্যা অত্যাচারিতা নারীদের সঙ্গে সে সময়কার তেজোদ্দীপ্তা মহীয়সী নারীদের তুলনা করে' বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয়। বলা বাহুল্য, সেইবারই আল্‌তমাশ দুর্গ জয় করেন।

'জহরকুণ্ডে'র নিকট সুদীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত যে স্থানটি

এখন 'বারুদখানা'-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, ঐখানেই সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের প্রাসাদ ছিল। এখন সাধারণের ঐ প্রাসাদ দর্শনের উপায় নেই।

দুর্গের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য মন্দির দেখ্‌লাম। তা'র মধ্যে 'তেলীর মন্দির' উচ্চতম। মাদ্রাজের দিকে যে বিশেষ ধরণের মন্দির দেখা যায়, এটিও অনেকটা সেই রকম দেখ্‌তে। প্রস্তরনির্ম্মিত এই মন্দিরটিতে সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যও আছে। চতুর্ভুজ মন্দিরটি পাহাড়ের গা কুঁদে তৈরী। এটি 'বিষ্ণুমন্দির।' 'সূর্য্যমন্দির' আর 'চতুর্ভুজ মন্দির', এই দু'টি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধীদের বিশেষ আদরের জিনিষ; কারণ, এই মন্দির দু'টিতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু কারুকলা আর স্থাপত্যবিদ্যার চরমোৎকর্ষ যেমন দেখা যায় 'শাস-বহু মন্দির' দু'টিতে, এমন আর কোন মন্দিরে নয়। দু'টি মন্দিরের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়; একটি অপরটী হ'তে বৃহত্তর। শোনা যায়, শাশুড়ী-বউ থেকেই নাকি 'শাস-বহু' নামের উৎপত্তি;—যেটি বড় সেটী শাশুড়ী, যেটী ছোট সেটি বউ। মতান্তরে—'সহস্রবাহু' কথাটি কালক্রমে 'শাস-বহু'তে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু 'সহস্রবাহু' নামই বা কেন হ'ল তা'ও বুঝলাম না; কারণ, দু'টিই বিষ্ণুমন্দির। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, উদয়পুরেও এই রকম দু'টি মন্দির আছে, তা'দের নামও 'শাস-বহু মন্দির।' গোয়ালিয়র দুর্গের বৃহত্তর 'শাস-বহু মন্দির'টির চূড়া সম্ভবতঃ বাবরের আজ্ঞাতেই ভেঙে ফেলা হয়েছিলো; কারণ, এই পরধর্ম্মদ্বেষী, অরসিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানরহিত বাদশাহটির শ্রী-অসহিষ্ণুতার পরিচয় অনেক জিনিষ থেকেই পাওয়া গেল। দুর্গে ওঠবার পথের ধারে জৈন তীর্থঙ্করদের বহু অনিন্দ্যসুন্দর বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি। তাঁ'দের কোনটির মুখ চেঁচে ফেলা, কা'রও নাক, কা'রও হাত-পা ভেঙে তাঁ'দের শ্রীহীন করে' রেখেছে। এইসব বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখ্‌লে মন দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে' ওঠে। 'শাস-বহু মন্দিরে'র ভেতরে উৎকীর্ণ বহু মূর্ত্তিও অসীম ধৈর্য্যসহকারে ঐভাবে নষ্ট করা হয়েছে। শেষে তা'তেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে ভেতরটা সমস্ত চূণের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে সেই প্রলেপ অনেক কষ্টে পরিষ্কার করে' বড় মন্দিরটিতে ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন যা' আছে, তা'রই ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যরসলিপ্সুর মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে। মন্দিরের ভিতর ঢুক্‌তে যে বৃহৎ দরজাটি—কী সুন্দর তা'র পরিকল্পনা!...সকলের নীচে গরুড়ের মূর্ত্তি, তা'র ওপরে বিষ্ণু একক। সর্ব্বোচ্চে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিদেবের মূর্ত্তি। মন্দির অভ্যন্তরে গিয়ে ছাদের কারুকার্য্যের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়। কতবড় কুশলী শিল্পী ছিল তা'রা, যা'রা এই কঠিন পাথরের ওপর এইসব অপূর্ব্ব নক্সা এঁকে গেছে। কী অপরিসীম ধৈর্য্য ছিল তা'দের!

দুর্গের ওপর থেকে একবার বাইরের দিকে চেয়ে গোয়ালিয়রের 'প্যানোরমিক ভিউ' দেখ্‌লাম। সমস্ত সহরটি যেন ছবির মতন মনে হ'ল।

এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হ'য়ে গেল। আর মোটের ওপর দুর্গের প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি প্রায় সব দেখাও হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর বিলম্ব না করে' আমরা দুর্গ ত্যাগ করলাম।

টাঙ্গা বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল। তা'তে করে' দুর্গ থেকে প্রায় সিকি মাইল পূর্ব্বে মহম্মদ ঘোষের সমাধিস্থল দেখতে গেলাম। এটিও এখানকার একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। মহম্মদ ঘোষ ছিলেন সম্রাট্ বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক সূফী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বিখ্যাত ফকির। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সম্রাট্‌রা পর্য্যন্ত এঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন। একজন সুগায়ক বলে' এঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। এঁর বিষয়ে অনেক অলৌকিক জনশ্রুতির প্রচলন আছে। সম্রাট্ বাবর একবার কর্ণপীড়ায় খুব ভুগছিলেন। মহম্মদ ঘোষ তাঁর কাণে শুধু মন্ত্র পড়েই নাকি তাঁ'র অসুখ সারিয়ে দেন। এই সমাধি-মন্দিরটির চারিধারে চতুষ্কোণ অলিন্দ; মাঝখানে আসল সমাধি-কক্ষটি অবস্থিত। সূক্ষ্ম কাজ করা পাথরের একাধিক নিখুঁত জাফরির জন্যে এই সৌধটির খুব নাম আছে। এর বৃহৎ গম্বুজটি শুনলাম, এককালে নীলরঙে এনামেল করা ছিল, কিন্তু কালচক্রের নিষ্পেষণে এখন সে এনামেল আর নেই। এর পাশেই

দেখলাম সম্রাট্ আকবরের 'নবরত্ন-সভা'র উজ্জ্বলতম রত্ন, মহম্মদ ঘোষের প্রিয় শিষ্য, স্বনামধন্য গায়ক ও কবি তানসেনের সমাধি-ভূমি। তানসেন একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়েও পরে কোন অজ্ঞাত কারণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন। অতি সাধারণ এই স্থানটি অন্য হিসেবে তেমন দ্রষ্টব্য না হ'লেও, সমগ্র ভারতবর্ষে খুব কম ভারতীয় গায়ক-গায়িকাই আছেন, যাঁরা এই স্থানটিকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে না দেখেন। এটিকে গায়ক-যশঃপ্রার্থীদের তীর্থ বললেও খুব বেশী বলা হয় না। এর পাশেই একটি তেঁতুলগাছ আছে। তা'র পাতা গায়কেরা অতি ভক্তিভরে চর্ব্বণ করে' থাকেন—এই বিশ্বাসে যে, তাঁদের গলা বেশ ভাল হবে। অবশ্য এই সব শুনে আমরা তিনজনেও মুঠো মুঠো তেঁতুলপাতা চিবিয়ে ছিলাম; (যদিও গায়ক এ বদ্‌নাম কোন নিন্দুকই আমাদের দিতে পারবে না) কিন্তু সম্ভবতঃ ভক্তির ঘাট্‌তি পড়াতেই, দাঁত টকে' যাওয়া ছাড়া আর কোন ফল হয় নি।

যাই হোক্, এবার আমরা এস্থান ত্যাগ করে' টাঙ্গায় চড়ে' 'মতিমহল' আর 'জয়বিলাস-প্রাসাদ' দেখ্‌তে চল্‌লাম। সুবিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে এই দু'টি প্রাসাদ আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। প্রাসাদ দু'টি ভূতপূর্ব্ব মহারাজা জয়াজিরাও সিন্ধিয়া নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজা 'জয়বিলাস'-প্রাসাদে বাস করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যাওয়ায় 'জয়বিলাস-প্রাসাদে' প্রবেশের ছাড়পত্র আমরা যোগাড় করতে পারলাম না; বাইরে থেকে দেখেই মনকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল। তবে 'মতিমহলে'র ভেতর ঢুকেছিলাম—রাজপ্রাসাদ যেমন হওয়া উচিত, এক কথায় এটিও তেমনি। সম্মুখেই অতিথি-অভ্যাগতদের বিশ্রামের স্থান। তারপর একটি সুপ্রশস্ত বহিকক্ষ—বহু মূল্যবান, আধুনিক রুচি-সম্মত ফার্ণিচারে সাজানো। শুনলাম, এটিই নাকি 'কাউন্সিল-হাউস।' একটি রাজভৃত্য আমাদের সঙ্গে করে' ওপরে নিয়ে গেল। ওপরের একটি কক্ষে খুব বড় বড় আয়না আর ভূতপূর্ব্ব রাজা আর রাজন্যবর্গের প্রমাণ আকারের অয়েলপেণ্টিং ছবি দেখ্‌লাম। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় রাজারা সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ঘরটিতে রাজা একান্ত বিশ্বাসী পারিষদদের নিয়ে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে গুপ্তমন্ত্রণা করে' থাকেন। ছাদে উঠে আর একবার দূর থেকে দুর্গের সাধারণ দৃশ্য উপভোগ করা গেল। 'মতিমহলে'র একপাশে সরকারী দপ্তরখানা—বিভিন্ন বিভাগের অফিসের সারি চলে' গেছে।

এখান থেকে পায়ে হেঁটে 'কিং জর্জ্জ গার্ডেনে'র উদ্দেশে চল্‌লাম। পথে একস্থানে দেখলাম, রেলের লাইন পাতা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেটি 'গোয়ালিয়র লাইট রেলে'র একটি লাইন। এই রেলে করে' গোয়ালিয়র রাজের গ্রীষ্মাবাস 'শিবপুরী' অনেকে দেখ্‌তে যান।

প্রাসাদের হাতা ও একটি প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করে' আমরা একটি অনতিবৃহৎ চিড়িয়াখানার সাম্‌নে এসে পড়লাম। এখানকার বাঘ আর সিংহ রাখবার একটু বিশেষত্ব দেখলাম। খোলা জায়গায় একটি পাকা ঘর—তা'র চারিধারে গড়ের মতন কাটা, জলে ভর্ত্তি, আর এই সমস্তটা লোহার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। ব্যাঘ্র, সিংহ ইচ্ছামত কখনও ঘরের মধ্যে যাচ্ছে, কখনও বাইরে এসে জলের ধারে বিচরণ কচ্ছে।

'জর্জ্জ গার্ডেনে' যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন সূর্য্য অস্ত গেছে। ছায়ায় সমস্ত উদ্যানটি পরিভ্রমণ করা গেল। কোলকাতার লোকের কাছে উদ্যানটি অন্য কোন হিসেবে খুব চিত্তাকর্ষক না ঠেক্‌লেও, একটি জিনিষ খুব ভাল লাগবে নিশ্চয়—অন্ততঃ, আমাদের ত লেগেছিল। উদ্যানটির মধ্যে হিন্দুদের একটি মন্দির, মুসলমানদের মস্‌জিদ, শিখেদের গুরুদ্বার, আর থিয়োজফিষ্টদের জন্য একটি উপাসনা-গৃহ আছে। গোয়ালিয়র রাজের এবং বিশেষ করে' এই উদ্যানের নির্ম্মাতা স্বর্গীয় মহারাজা জয়াজিরাও সিন্ধিয়ার সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যাসমাগমের সঙ্গেই গুরুদ্বারে আরম্ভ হ'ল তবলা এবং সারেঙ সহযোগে মধুর ভজন, হিন্দু মন্দিরে সারেঙ, তব্‌লা ও মন্দিরাযোগে মধুর গীত ও দেবারতি, আর মস্‌জিদ্ থেকে শোনা গেল নামাজের জন্যে

মুয়াজ্জীনের আজান। সমস্তদিন ঘোরাঘুরির পর শ্রান্ত দেহে সেদিন সেই উদ্যানের একটি বেঞ্চে বসে' অনন্ত আকাশের অপূর্ব্ব বর্ণস্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে, স্ব স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস-মতে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সকলের অন্তরের এই ভক্তি-নিবেদনটুকু বড় মধুর লেগেছিল।

শ্রান্ত চরণযুগল আর চলতে চাইছিল না। কিন্তু বন্ধুবরের আগ্রহাতিশয্যের কাছে আমার কোন আপত্তি খাট্‌লো না। ট্রেণের দেরী ছিল; সুতরাং, ততক্ষণ দেশটাকে একটু দেখ্‌তে বার হওয়া গেল। তখন দোকানে দোকানে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বলে' উঠেছে। দেখ্‌লাম, সদর রাস্তাগুলি প্রায়ই বেশ প্রশস্ত; কিন্তু সহরের একটু অভ্যন্তরে রাস্তাগুলি অনতিপরিসর ও জনবহুল। কিন্তু 'লস্করে'র দিক্‌টা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শ্রান্তপদে আমরা আবার ধর্ম্মশালায় ফিরলাম। রাত্রি তখন আটটা বেজে গেছে। কোনরকমে বারান্দায় একটা সতরঞ্চি পেতে 'ফ্ল্যাট্' হ'য়ে পড়লাম। যখন গাত্রোত্থান করলাম, তখন ট্রেণের সময় খুব বেশী নেই; সুতরাং, দোকান থেকে পুরী-তরকারী ইত্যাদি কিনে 'জলযোগ করে' গোয়ালিয়রের স্মৃতিটুকু মনের মধ্যে জ্বালিয়ে নিতে নিতে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হওয়া গেল।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

রাত বারোটার রোমান্স

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[যে সব বাড়ীতে দুইখানি ঘর লইয়া গৃহস্থালী সম্পূর্ণ, তাহারই যে কোন একটিতে এই গল্প ঘটিয়া উঠিতে পারে। রাত্রি প্রায় বারোটা। ঘর জুড়িয়া বিছানা পাতা—তাহারই উপর গুটি পাঁচেক সন্তান লইয়া মহামায়া শুইয়া আছে। চুণ-বালিখসা ঘরটির মতই তাহার যৌবনের চেহারা। বেশ বোঝা গেল—সে ঘুমায় নাই। মাঝের ছেলেটাকে বোধ হয় মশা কামড়াইতেছিল—সে ঘুমের ঘোরে বারকতক কা'কে যেন 'শালা' 'শালা' বলিয়া চুপ করিল।...কিছুক্ষণ পরে মহামায়া উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নাঃ, নির্জ্জন রাস্তার ও প্রান্ত অবধি সতীশের চিহ্নমাত্র নাই।...মহামায়া মূর্খ নয়, বিবাহের পূর্ব্বে সে বাপের বাড়ীতে দস্তরমত লেখাপড়া শিখিয়াছিল—তাই এত রাত অবধি স্বামী বাড়ী না আসায় সে হাঁউ-মাউ না করিয়া—নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।... দুই বৎসর বয়সের কোলের ছেলেটা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। মহামায়া ফিরিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।—অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি পরিপূর্ণ নীরবতা।...ঘরের বাহিরে দরজায় ধাক্কা পড়িল—মহামায়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল সতীশ।]

মহামায়া—(সতীশের পিছনে আসিতে আসিতে) ওরে ক্যাবলা, এই দেখ্‌ তোর পিতা স্বর্গঃ বাড়ী এয়েছেন। হেদিয়ে মরছিলি হারামজাদা, এইবার উঠে পেন্নাম কর্‌।

সতীশ—(মৃদুস্বরে) আঃ, কী কোরছ! জেগে উঠ্‌বে যে!—

মহামায়া—ও মা, সত্যিই তো।

[সতীশ জামা-কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল—এবং ধীরে ধীরে ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভাতের ঢাক্‌নী তুলিয়া খাইতে বসিল]

মহামায়া—আপিস থেকে হেঁটে আসতে হ'ল বুঝি?

সতীশ—(খাইতে খাইতে) না।

মহামায়া—আজও কি বন্ধুর অসুখ করেছিল?—(সতীশ নীরব)—আহা! আজকালকার দিনে এমন বন্ধু কি কেউ পায়? আপিস থেকে বাড়ী না ফিরে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই—বন্ধুর বিছানায় কাঁদো-কাঁদোমুখে রাত বারোটা অবধি বসে' রইল।—এমন একটা বন্ধু আমাদের কপালে জোটে না গা?

সতীশ—কেন ব্যাজ্‌ব্যার্জ্জ্‌ কোরছ। বন্ধুর অসুখ করে নি।

মহামায়া—করে নি? কী করে' জানবো বল! মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—আর একদিন যেমন বুঝিয়েছিলে—আজও তাই মনে করে' বসে' আছি।—তা' কী হয়েছিল তবে আজকে?

সতীশ—(মরিয়া হইয়া)—বায়স্কোপে গিয়েছিলাম।

মহামায়া—কোথায়?

সতীশ—বায়স্কোপে।

মহামায়া—বায়স্কোপে? (স্থির দৃষ্টিতে সতীশের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা, আমার বয়স কত হ'ল?

সতীশ—কেন? বয়সের কি কথা আছে এতে?

মহামায়া—না না, শুনি। কত হ'ল বয়স আমার? পাঁচ ছেলের মা আমি তা' জান?

সতীশ—জানি বৈকি।—

মহামায়া—তবে? ও সব ধাপ্পা তুমি আর কারুর কাছে দিও—আমার কাছে নয়, বুঝলে? (একটু পরে) বায়স্কোপ তো সাড়ে ন'টায়। ছ'টা থেকে কোরছিলে কী? (সতীশ নীরব।) ন্যাকা চৈতন! বোকা বুঝোচ্ছেন আমাকে!

[সতীশের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে উঠিয়া

বাহিরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল—এবং বাক্যব্যয় না করিয়া নিজের স্থানটিতে গিয়া শুইয়া পড়িল।]

মহামায়া—(নিজের মনে) চাল নেই, চুলো নেই, তিরিশ টাকার ক্যারানী, তার আবার ফূর্ত্তি কত?—বায়স্কোপরে—হ্যানোরে—ত্যানোরে—যেন বাপের দেওয়া জমিদারী আছে। (একটু পরে) কোথায় গিয়েছিলে বলো। (সতীশ নীরব) মিথ্যা কথা বলতে মুখে একটু বাধে না, না? (উঠিয়া সতীশের পাশে গিয়া বসিল) বলো—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সতীশ—বললাম তো বায়স্কোপে।—

মহামায়া—ফের মিথ্যে কথা বলছো? ছ'টা থেকে কোরছিলে কী তবে?

সতীশ—প্রশান্তর বাড়ী গিয়েছিলাম।

মহামায়া—কার বাড়ী?

সতীশ—প্রশান্তর।

মহামায়া—সে আবার কে?

সতীশ—আমার স্কুলের বন্ধু।

মহামায়া—গায়ে এসেন্স দিলে কে?

সতীশ—তারই বউ।

মহামায়া—দেখ্‌তে ভাল বুঝি? বড়লোক, না?

সতীশ—হ্যাঁ।

মহামায়া—তাই তো বলি। তা' কি রকম জম্‌লো তার সঙ্গে?—

সতীশ—তার মানে?

মহামায়া—এম্‌নিই বলছি। বড়লোক বন্ধুর বউ—অল্পবয়েস—দেখতে ভাল—আর যায় কোথায়! অম্‌নি গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছ?

সতীশ—ছোটলোকের মত ইতরোমো করো না।

মহামায়া—(রাগিয়া) ইতরোমো আমি করছি—না তুমি কোরছ? বুড়োধেড়ে মিন্সে, পাঁচ ছেলের বাপ, লজ্জা করে না তোমার বন্ধুর বৌয়ের সঙ্গে পীরিত করতে?

সতীশ—(ধম্‌কাইয়া) চুপ কর।

মহামায়া—(চীৎকার করিয়া) কেন চুপ করবো? রাত বারোটা অবধি বাবু বাইরে প্রেম করবেন—আর ঘরে আছে বাঁদী—ভাত নিয়ে জেগে বসে থাক্‌বে, না?

সতীশ—থাম্‌বে?

মহামায়া—না। দেবে একদিন যখন জুতো পেটা করে'—তখন বুঝবে। ফর্সা মেয়ে দেখ্‌লে আর রক্ষে নেই।

সতীশ—(ঠাস্ করিয়া স্ত্রীর গালে একটা চড় বসাইয়া দিল) ষ্টুপিড্ কোথাকার—যা' মুখে আসে তাই। সেই তখন থেকে ঘ্যানোর ঘ্যানোর—যেন আমার গার্জ্জেন।

[ছোট ছেলেটা হঠাৎ প্রবলবেগে চেঁচাইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়া গিয়া নীরবে তাহার পাশে শুইল। ছেলেটার বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, খাদ্যবস্তু পাইতেই সে চুপ করিল]

সতীশ—গেছি একদিন বায়স্কোপে, তার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। তা'তেও রক্ষে নেই—মুচি-মুদ্দফরাসের মত মুখ খারাপ! যত কিছু বলি না—ততই যেন মাথায় চড়ে' বসে। ফের যদি শুনি কোনদিন এরকম কথা- লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো।

[মহামায়া কোন উত্তর দিল না। সতীশও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ঘরটির মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।...অনেকক্ষণ পরে। বোধ হয় দুই ঘণ্টা কি তাহারও বেশী সময় কাটিয়া গিয়াছে। আচম্‌কা ঘুম ভাঙিয়া সতীশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, যে, মহামায়া মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত শরীরে একটি ক্লান্তভঙ্গী বিস্তার করিয়া সে ঘুমাইতেছে। হঠাৎ স্ত্রীর জন্য সতীশের বুকের মধ্যে কী রকম করিয়া উঠিল। আহা বেচারী! সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া ছেলেপিলের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া রাত্রিবেলায় স্বামীর সঙ্গে একটু ভাল কথা কহিবার জন্য কত আশা করিয়া থাকে—নাঃ, মারাটা তাহার উচিত হয় নাই। আর সে সিনেমায় যাইবে না।...সতীশ উঠিয়া ধীরে ধীরে গিয়া ঘুমন্ত মহামায়ার পাশটিতে বসিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিল। তারপর ডাকিল]

সতীশ—মায়া!

মহামায়া—(অভ্যাসবশতঃ ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল) উঁ।

সতীশ—এদিকে ফিরে শোও তো, লক্ষীটি!

মহামায়া—(ঘুমের ঘোরে) কেন?

সতীশ—দরকার আছে। শোন। (মহামায়া চোখ মেলিয়া চাহিল) দেখ—ইয়ে—সেদিন যে তুমি সেফ্‌টি-পিনের কথা বলেছিলে—সেই যে রূপোর ওপর মিনে করা—আজকে দেখে এলাম। দু'রকম আছে, বুঝ্‌লে। একরকম হচ্ছে দু'দিকে দুটো ময়ুর আর মাঝখানে—(মহামায়া পাশ ফিরিয়া শুইল) শুনছো?

মহামায়া—না।

সতীশ—কী না? সেফ্‌টিপিন্ চাই না তোমার?

মহামায়া—না।

সতীশ—আচ্ছা, এত রাগ তোমার কিসের জন্যে। বৌকে কি কেউ মারে না, বকে না নাকি?—ঘর-সংসার করতে গেলে এ রকম হ'য়েই থাকে।

মহামায়া—সে আমি জানি। তোমাকে বক্তৃতা দিতে কেউ ডাকে নি। তুমি শোও গে।

সতীশ—তুমি যদি এই রকম ব্যবহার কর আমার সঙ্গে—তা' হ'লে আমি সহ্য কোরব না বলে' দিচ্ছি।

মহামায়া—কী কোরবে শুনি?

সতীশ—কী কোরব মানে? যা' হয়—রোজ এই রকম রাত বারোটায় বাড়ী ফিরবো—দেখি তুমি কী কোরতে পার।

মহামায়া—আগে থেকে সাফাই গেয়ে রাখবার কোনই দরকার নেই। আমি জানি, আজ থেকে ফিরতে তোমার রোজই বারোটা হবে। এবার একবার তোমার প্রাণের বন্ধুর বৌয়ের নামটা বলো—শুনে ধন্য হই।

সতীশ—আবার?

মহামায়া—(চটিয়া) কী আবার? ভয় দেখাচ্ছো তুমি কা'কে? ও সব চোখ রাঙানী অন্য জায়গায় দেখিও।

সতীশ—ফের মার খেতে ইচ্ছে আছে নাকি?

মহামায়া—তা' তো মারবেই। পরের বৌয়ের পেছনে পেছনে কুকুরের মত হ্যাংলাপনা করে' বেড়াবে তুমি—আর তা' বল্‌তে গেলেই আমাকে মার খেতে হবে। বুড়ো শালিকের সাধ কত!

[হঠাৎ সতীশ ক্ষেপিয়া গিয়া বিপুলবলে মহামায়ার চুলের গোছা চাপিয়া ধরিল। মহামায়া পাগলের মত পাখার বাঁট দিয়া সতীশের হাতের উপর আঘাত করিল। সতীশ ঠাস্ ঠাস্ করিয়া মহামায়াকে চড় মারিতে লাগিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্নার শব্দে ছোট ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া চেঁচাইতে লাগিল। এবং এই গণ্ডগোলে আর সব ক'টি ছেলেমেয়ে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সমস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল। সতীশ উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। রাস্তার গ্যাসের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছিল। দেখা গেল—সে মুখ অত্যন্ত নির্ব্বিকার।]

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ভৌতিকগল্প

জীবিত ও মৃত

শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সাহা

অজয় চিঠিখানি লইয়া আবার পড়িতে লাগিল—

...অনেকেই জানে, তুমিও হয় তো মনে কর দুরন্ত ক্ষয়রোগ আমাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে টেনে নিচ্ছে... জীবনের এই সুন্দর প্রভাতে, অফুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে আমি চলেছি কোন্ অজানা অন্ধকারময় জগতের ভয়াবহ স্থানে — এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্যই!...সত্যিই কি তুমি তাই বিশ্বাস করো? একবার স্বচ্ছন্দ চিত্তে, নিজের বুকের উপর হাত রেখে, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে' কি উত্তর দিতে পারবে?...জানি কোন ফল নেই, জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত যেমন তোমার অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবজ্ঞায় কেটে গেছে, এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর বেদনাকাতর শেষ দীর্ঘনিশ্বাসটীও তেমনি তোমার নিষ্করুণ শীতল সমবেদনাও পাবে না জানি...তবুও আজ মনে কত কথাই উদয় হয়। এই দুরন্ত উন্মাদ অন্তরের প্রতিটী স্পন্দন আজ যেন বড়ই দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। এতদিন নিজেকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে এসেছি, কিন্তু আজ বড় দুর্ব্বল... আজ আর নিজের উপরও আমার শাসন নেই।...নিষ্ফল... পরিবর্ত্তে একটা অসহ গাঢ় বেদনা...বুকভরা একটা আর্ত্তনাদেই হয় তো ফেটে পড়বে জানি, তবুও আজ জানতে ইচ্ছে হয়, অত ভালবেসে...অত স্নেহ, মায়া-মমতা দেখিয়ে এই তুচ্ছ বালিকার শান্ত মনে কতবড় যে মায়ার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিলে—সে কি মিথ্যে, শুধু কি অভিনয়?...

স-পত্র অজয়ের হাতখানা থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাহিরে হেমন্ত সন্ধ্যার অন্ধকারময় আকাশ-পটে অকাল মেঘের আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। দুরন্ত বাতাসের দাপাদাপি মাতামাতি কাল-বৈশাখীকেও যেন হার মানাইয়া দিতেছিল। নিঃসাড় পল্লী আতঙ্ক-স্তব্ধ। বিদ্যুতের দীর্ঘশিখা বজ্রহুঙ্কারে সেই আতঙ্ক-কম্পিত পল্লীর বুকে কখন কখন কোন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো চকিতে খেলিয়া যাইতেছিল। অজয় খোলা জানালা দিয়া বাহিরের এই উন্মত্ত প্রকৃতির দিকে চাহিতেই অকারণ সে আর একবার শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ তাহার বিস্মৃত-প্রায় কৈশোরের স্মৃতি দুলিয়া উঠিল। মনে পড়িল, এমনি এক সন্ধ্যা!... লেখাদের গ্রামেরই থানায় তখন অজয়ের পিতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। থানার পাশেই বাড়ী—একবারে গায়ে গায়ে মেশামিশি। লেখার বয়স তখন কতই বা—এই তের কি চোদ্দ! অথচ ঐ একটু মেয়েই কেমন করিয়া অজয়ের যৌবন-সুধাকুল অন্তরকে উন্মাদ করিয়া দিল। ভবিষ্যতের কোন কথাই মনে পড়িল না—সংসারানভিজ্ঞ এই দুইটী তরুণ প্রাণ আপন ভুলিয়া পরস্পরের অন্তর লইয়া স্বর্গ সৃষ্টি করিল। সে কত আশা—কত আনন্দ! সুখের কি গভীর

উন্মাদনা! আকাঙ্ক্ষার কি সুনিবিড় অনুভূতি! ...একটা সুখ স্বপ্ন—আদিও নাই, অন্তও নাই। অবিচ্ছেদ্য আশার কি গাঢ় মোহ!

...সেই কাল-সন্ধ্যা!

সন্ধ্যার অন্ধকার জমিয়া জমিয়া দৃষ্টির অচল হইয়া উঠিল। সেই গাঢ় তমিস্রায় ঢাকা আকাশ ভরিয়া কখন যে আরও মেঘ জমিয়াছে, কে-ই বা তাহা জানে! অকস্মাৎ মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—তিমির-ঘন আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্রশিখা আপন-ভোলা দুইটী প্রাণীকে চমকিয়া দিয়া আবার কোন অতল কালোয় তলাইয়া গেল। পাগল বাতাস কোথা হইতে হায় হায় করিয়া উঠিল।...

অজয় লেখা শিহরিয়া উঠিল।

কে জানে কেন লেখার অন্তর দুলিয়া উঠিল। কালো চোখ দুইটী আপনা-আপনি জলে ভরিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। অজয়ের ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া গাঢ়স্বরে লেখা কহিল—সত্যি যাবে অজয়...হয় তো আর দেখা হবে না।

একফোঁটা জল তাহার বেদনা-কাতর চোখ দুইটী হইতে গড়াইয়া পড়িল। গাঢ় অন্ধকারে অজয়ের তাহা চোখে পড়িল না, কিন্তু স্বরের সেই করুণ আবেগটুকু অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মাদকতায় অজয়ের অন্তর ভরিয়া দিল। অজয় লেখাকে উন্মাদের মতো বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার তুলতুলে নরম ঠোঁট দুইটীর উপর নিজের কম্পিত ওষ্ঠ চাপিয়া উন্মত্ত-কণ্ঠে কহিল—পাগ্‌লি!...লেখা যে অজয়ের ঘরের লক্ষ্মী...লক্ষ্মীহীন হ'য়ে সে কি একদিনও থাকতে পারে?

লেখার মুগ্ধকণ্ঠে ভাষার সঞ্চার হইল না। শুধু তাহার কম্পিত তনুখানি অজয়ের উষ্ণস্পর্শে যেন অনাস্বাদিত পুলকধারায় ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল...একটা মধুর স্বপ্ন, তাহার সেই সুখ-নিদ্রিত চক্ষু পল্লবে বারেবারে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।...

...সেই সুখ-সন্ধ্যা...সেই কাল-সন্ধ্যা...তাহাদের জীবনে দ্বিতীয়বার আর আসে নাই। কতদিন গিয়াছে...কত হেমন্তের মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশ বিগত দিনের সুখ-স্মৃতি-বেদনায় নীরবে নিষ্ফল অশ্রুবর্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত বসন্ত প্রভাতের আনন্দ সমারোহ এমনি একটী দিনের কথা মনে করিয়া অকস্মাৎ বিষাদ-স্তব্ধ হইয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উন্মনা হইয়া গ্রীষ্মের বুকফাটা হা হা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছে...শোকাকুল বরষার মেঘ-গাঢ় সজল আকাশ অজস্র চোখের জল ফেলিয়াছে...কতদিন কতবার...

বাহিরে দীর্ঘশীর্ণ নারিকেল বৃক্ষটী দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বজ্র ফাটিয়া পড়িল।...

অজয় সচকিত হইয়া চোখের জল মুছিয়া কম্পিত হস্তে আর একবার পত্রখানি আলোর নিকট তুলিয়া ধরিল।...

...জীবনের অজস্র ক্ষণগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে। ভয় হয়, যখন এই চিঠি তুমি পাবে—ওঃ! আজ মরণকে পেয়েও মর্‌তে কতো ভয় কর্‌ছে! অথচ এত দিন ধরে শুধু মনে মনে একেই ডেকে এসেছি...আজ শেষ দিনে পৃথিবী আমায় পাগল করে' তুলেছে...তোমার স্মৃতি আমাকে লোভাতুর করেছে...বুকজোড়া অনন্ত পিপাসা... অথচ উপায় নাই—উপায় নাই! কোন এক সময়ে সব শেষ হ'য়ে যাবে!...কিন্তু...না, কি-ই বা হ'বে...সবই বুঝি, তবুও আজ আর পারছি নে.. এই শেষ সময়টায় এই ছেলে-মানুষীই যেন আমাকে পাগল করেছে!...একবার কি আসতে পার না...তেমনি কাছে বসে', তেমনি মাথাটী বুকের উপর চেপে ধরে' ঠোঁটখানা এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর শীতল ওষ্ঠের উপর রেখে, তেমনি গাঢ়স্বরে—সেই অতীত দিনের মতো একটীবার...শুধু একটীবার লেখা বলে' ডাকতে পারো না?...কিছু না, শুধু শুনবো—সেই মোহময় স্বরের সুর-সমারোহ...সব গিয়েছে—কেবল এইটুকু—একটীবার—শুধু একটীবার...

অজয়ের হাত হইতে পত্রখানি স্খলিত হইয়া পড়িল। একটা দমকা বাতাস সমস্ত ঘরখানিকে সবেগে নাড়িয়া দিয়া একটা বিদ্রূপের মতো অজয়ের কাণের কাছে ফাটিয়া পড়িল।

অজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত তরুলতা ছায়াবিহীন রৌদ্রতপ্ত ধূসর প্রান্তরের দিকে চাহিয়া তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত পা দুইখানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অথচ এই মাঠটা পার হইতে পারিলেই লেখাদের গ্রাম। অজয় অসহায় করুণ-নেত্রে দিগন্তের সেই অস্পষ্ট সারি সারি কালো অচিন গাছগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—উহারই পর লেখাদের সাদা ধবধবে বাড়ী। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্তভাবে অজয় পাশের অশত্থ-ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ। ঝিরঝিরে বাতাস অজয়ের ক্লান্ত দেহের উপর গভীর আলস্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—শ্রান্ত চোখ দুইটী গভীর ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল।

অজয়!

শিহরিয়া উঠিয়া অজয় চোখ মেলিয়া চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার অসাড় কণ্ঠ হইতে একটা ভয়ার্ত্ত অস্পষ্ট স্বর বাহির হইয়া আসিল—লেখা!

লেখা মাথা দুলাইয়া হি হি হি হি করিয়া তীব্র হাসি হাসিয়া উঠিল। উঃ! সে কি হাসি! অজানিত ভয়ে অজয়ের সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার অপলক চোখ দুইটীতে একটা ভীষণ আতঙ্ক যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। অজয় কথা কহিতে পারিল না।

ললিত ঝঙ্কার তুলিয়া লেখা কহিল—চিন্তে পারচো না ...তা' পার্‌বে কেন? শেষের কথাগুলি যেন গাঢ় বেদনা-ভরা!

অজয় ভয়ে ভয়ে চোখ তুলিল। কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ যেন কে সবলে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে—শুধু ঠোঁট দুইখানি বারকয়েক নড়িয়া উঠিল মাত্র!

লেখা আবার হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি! অজয়ের দেহের প্রতিটী লোমকূপ দিয়া সেই তীব্র-করুণ ভীষণ হাস্যের সকম্প ভীতি সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন গাঢ় হিমে জমিয়া উঠিল! সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া শব্দ-স্পর্শ-জ্ঞান-হীন ভয়াবহ নিঃসাড়তা...একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার একটু আর্ত্তনাদ করিবার ক্ষমতাও নাই!

লেখা সরিয়া বসিল। তাহার লীলায়িত কমনীয় তনুর প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে—নিঃসীম শীতলতা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঃ, সে কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! অজয় যেন জমিয়া গেল!

করুণ হাসিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে লেখা কহিল—চিন্তে পারচো না?—আমি যে তোমারই লেখা! অকস্মাৎ লেখা আর্ত্তনাদ করিয়া ফাটিয়া পড়িল। উঃ, সে কি করুণ ক্রন্দন! অজস্র জলধারা বর্ষণ করিয়া বেদনা-ম্লান চোখ দুইটীর শীতল দৃষ্টি ফেলিয়া লেখা কহিল—ওগো, কেন আগে এলে না...এলেই যদি, তবে কেন দুটোদিনও আগে এলে না? তা' হ'লে...কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। অসমাপ্ত কথার মাঝেই আবার সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অজয়ের ভয়ত্রস্ত মনে একটু একটু করিয়া সাহস সঞ্চার হইতেছিল। ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে ডাকিল—লেখা!...

—পেরেচো? পেরেচো...সত্যি আমায় চিন্তে পেরেছো? আমি তো ভেবেছিলুম...লেখা তাহার মৃণাল ভুজবল্লরী দিয়া অজয়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। সাপের চেয়েও হিম-শীতল সে স্পর্শ নিষ্করুণভাবে অজয়ের মাংসের ভিতর যেন কাটিয়া বসিল। অজানিত ভয়ে আবার তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যৌবনের গর্ব্ব অকস্মাৎ ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল। সে ক্ষেপিয়া গেল নাকি? লেখাকে ভয় কি? অসুস্থ শরীরে বাড়ী ছাড়িয়া এতদূর আসিবার সঙ্গত কারণ নাও থাকিতে পারে—কিন্তু জ্বর-বিকার অসম্ভবকে সম্ভব করে। কে জানে লেখার...কিন্তু যদি তাই হয়...যদি মরণের...একটা অবিশ্বাসের কঠিন হাসি তাহার ঠোঁটের উপর দিয়া মিশাইয়া গেল!

কতকটা পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল—তোমার চিঠি পেয়েই এসেছি।

লেখা তাহার চোখের গাঢ় দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। অজয় একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই অভিমান-ক্ষুণ্ণ-স্বরে কহিল—অন্যায় না হয় আমারই হয়েছে—কিন্তু তুমিও তো দু'দিন আগে চিঠি দিতে পারতে? ভুল আমি যতই করতে পারি—কিন্তু এও তো

জান তোমার ডাক অবহেলা আমি করতে পারি না—পারি কি?

লেখার চোখ দুইটী ছলছল্ করিয়া উঠিল। অস্পষ্ট অশ্রু-গাঢ়-স্বরে কহিল, পার না···কিন্তু অভিমানই আজ আমায়...

বল হরি হরিবোল!...বল হরি হরিবোল...

অন্তহীন প্রান্তরের একদিক্ হইতে সেই ভয়াবহ চীৎকারের ভীষণতা সহসা উভয়কে সচকিত করিয়া দিয়া গেল।

লেখা চঞ্চল হইয়া উঠিল। করুণ চোখ দুইটীর মিনতি-ভরা দৃষ্টি নিথর হইয়া আসিল। ব্যাকুল-কণ্ঠে সে কহিল, অজয়, আমি যাই···আমি···

অজয় তাহার মৃত্যু-শীতল হাতখানি চাপিয়া ধরিল। সেই ভয়াবহ শীতলতায় তাহার শরীর আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠের স্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

বল হরি হরিবোল!...বল হরি হরিবোল!···

লেখা অজয়ের হাত ছাড়াইয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল, আর না—অজয়...অজয় আমায় যেতে হ'বে...যেতে হ'বে...অজয়...হি হি হি হি!—ত্রস্তপদে লেখা সম্মুখের সন্ধ্যার গাঢ় তিমিরাবৃত প্রান্তরের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠের তীব্র হাস্য অজয়কে ভীত স্তব্ধ করিয়া দিয়া গেল।

সেই নিঃস্তব্ধ প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া কতকগুলি অস্পষ্ট কণ্ঠের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অনতি-বিলম্বে পাশের আতা ঝোপের পাশ হইতে কয়েকটী লণ্ঠনের বাতির তীব্র আলোকরশ্মি অজয়ের চোখ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই তাহার চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল।

বল হরি হরিবোল;···বল হরি হরিবোল।···

শ্মশান-যাত্রীর দল একবারে অজয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—ভবতোষবাবু!

একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিয়া লণ্ঠনটী উঁচু করিয়া ধরিয়া পলকমাত্র অজয়ের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন—লেখা...

অজয় বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—লেখা...

ভবতোষবাবু চোখের জল মুছিতে মুছিতে অশ্রুভারা-ক্রান্ত-কণ্ঠে কহিলেন—নেই! অজয়—নেই!...আমার লেখা নেই!···মৃত্যু-সময় মা আমার তোমার কথা কতবারই না বলেছে···তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে, উঃ, মায়ের আমার সে কি কাকুতি! কান্নার ক'দিন বিরাম ছিল না···কেঁদে কেঁদে মা আজ অপরাহ্নে···

তারপর ভবতোষবাবু কি বলিলেন না বলিলেন, তাহা অজয়ের ভয়স্তব্ধ কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা বোঝা গেল না। শুধু একটা ভয়াবহ আর্ত্তনাদ রাত্রির বক্ষ ভেদ করিয়া দূর-দূরান্তের ঘুমন্ত পক্ষীশিশুকে পর্য্যন্ত আতঙ্কে জাগা-ইয়া দিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল। অজয়ের চেতনা-বিহীন দেহ সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

কয়েক মাসের দীর্ঘ ব্যবধানে অজয়ের মন হইতে হয় তো সেই দিনের সেই ভয়াবহ চিত্র—লেখার শেষ-যাত্রার একান্ত করুণ দৃশ্য মিশাইয়া গিয়াছে। তাহার দৈনন্দিন সহজ জীবন-যাত্রায় সে সব কথার আর যেন কিছু ধরাছোঁয়া যায় না। লেখা মরিয়া যেন প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল—অজয়ের নিকটেও সে মরিয়াছে।

অতীব বিচিত্র এই মানুষের মন। ইহার সুখ-দুঃখের ইহার অনুরাগ-বিরাগের, ইহার বিরহ-মিলনের, ইহার আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণার ইতিহাস আরও বিচিত্র। মনোরাজ্যে এই যে দুইটী বিপরীত ভাব ধারার নিরন্তর বিপ্লব—ইহা লইয়াই মানুষের জীবন। তাই মানুষ যখন অত্যন্ত প্রিয়জনকেও অনায়াসে ভুলিয়া যায়, কেহ তাহাতে বিস্মিত হয় না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে যখন সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, কেহ তাহাতে কথা বলে না—ইহাই মানু-ষের মন। এক সময় যাহাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়, তাহাকেই আর এক সময় ভুলিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার আর অন্ত থাকে না।

অজয় লেখার মৃত্যু-সমাধির উপর যবনিকা টানিয়া

দিবার জন্যই বোধ করি অকস্মাৎ বিবাহের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল—অথচ, এই কাজটাই আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে কেহ সম্ভবপর বলিয়া মনে করে নাই।

বিবাহ বাড়ী—আনন্দ-মুখর।

উৎফুল্ল অজয় নিরালা ঘরে একাকী বসিয়া থাকিয়া অধীর আগ্রহে বোধ হয় শুভ-মিলনের প্রিয় মুহূর্ত্তটীর অপেক্ষা করিতেছিল।

বাহিরে তখন ফাল্গুনের আকাশ জুড়িয়া রূপালী জ্যোৎস্নার হাসি আর ধরিতেছিল না। গাছে গাছে কচি পাতাগুলি আনন্দে চিক্‌চিক্ করিতেছিল। আম্রমুকুলের মৃদু মধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত। জ্যোৎস্না-বিলাসী কোন একটা পাপিয়া আকাশতলে মদির-কণ্ঠে গাহিয়া গেল—পিয়া—পিউ—পিউ—

অজয়!

অকস্মাৎ কাহার ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বানে চমকিয়া মুখ তুলিতেই পলকে অজয়ের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। তাহার বিস্মিত অপলক চোখ দুইটীর দৃষ্টিতে গভীর ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল।

হি—হি—হি—হি! লেখা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠের হাসিতে প্রেতলোকের ভয়াবহ আতঙ্ক অজয়ের প্রতি রক্তকণায় বিচ্ছুরিত হইয়া তাহার বক্ষের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও বুঝি বা চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিল।

দুইটী ভয়ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি মেলিয়া অজয় পাথরের মূর্ত্তির মত লেখার অসাড় অনড় দেহ এবং বরফের ন্যায় সাদা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লেখা 'ঝুপ্' করিয়া অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িল। একবার পলকহীন চোখের দৃষ্টি মেলিয়া অজয়কে দেখিয়া লইয়া লেখা কহিল—সুমতি আমার চেয়েও সুন্দরী, না?……তাকে ভালবাস, না? ভাল বুঝি খুব বাসো—খু-উ-ব?

লেখার কণ্ঠের সেই বিকৃত স্বর অজয়ের বরফের মত জমিয়া যাওয়া হৃৎপিণ্ডের উপর আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। অজয় কোনরূপে তাহার ভয়-চকিত দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিল—লেখার চোখ দুইটী অশ্রু-সজল—তাহার সাদা মুখখানির উপর বেদনা সুস্পষ্ট!

অজয় কি বলিতে গেল—কিন্তু অনেক চেষ্টাও করিয়া বলিতে পারিল না।

লেখা অকস্মাৎ সেই আগের দিনের মত আবদারের সুরে বলিতে লাগিল—আমাকে কি বিয়ে করতে পারতে না…পারতে না? কয়েক মুহূর্ত্ত অজয়ের চোখের দিকে সে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর সুগভীর একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল—তবে আমায় ভুলিয়েছিলে কেন…কেন আমায় স্পর্শ করে' আমার অন্তরে কামনা জাগিয়েছিলে…কেন উন্মাদ বাসনার সৃষ্টি করে'—আকণ্ঠ পিপাসা দিয়ে—আমার বুকে আগুন জেলে দিয়েছিলে?…আমি তোমার কি করেছিলুম—কেন তুমি আমায় মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমার জীবনটা নষ্ট করে' দিলে?—আমাকে…লেখা দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া হাউ-হাউ করিয়া বুকভাঙা কান্না কাঁদিতে লাগিল।

অবসন্ন ভয়-কম্পিত শ্লথ হস্ত লেখার মাথার উপর রাখিয়া অজয় অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল—লেখা!

—লেখা? কে লেখা—তোমার লেখা মরেছে - মরেছে …হি-হি-হি-হি!…লেখা মরেছে! যাও, তার মরণের চিতায় সুমতির আবাহন কর গে!…তুমি সুখী হও—সুখী হও!…তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

অজল চমকিয়া ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল—কেহ নাই—আগের মতই সে একা বসিয়া আছে। শুধু একটা দমকা বাতাসে লেখার অট্টহাস্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

তবে কি লেখা আসে নাই?…এ তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত একটা ভয়ার্ত্ত দুঃস্বপ্ন!…

কিন্তু তাহার ভয়-চঞ্চল দৃষ্টির সম্মুখে লেখার রক্তহীন বরফের মতো সাদা মুখখানি যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

সুমতি ঠিক বুঝিতে পারে না তাহার স্বামীর কি অসুখ। জ্বর নাই—ব্যাহ্যিক কোন রোগ লক্ষণও তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে পড়ে না; অথচ, অজয় দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে। তাহার সমস্ত মুখ চোখে যেন একটা সুগভীর আতঙ্ক পরিস্ফুট। আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই—সমস্ত দিনব্যাপিয়া কি যেন সে দেখে তাহার ব্যাকুল-নেত্রের বিহ্বল-দৃষ্টি কি দেখিয়া শিহরিয়া উঠে! সুমতি মিনতি করে, কতকথা জিজ্ঞাসা করে, অজয় শুধু ম্লান হাসে। কিছু বলে না।

সুমতির ভারি দুঃখ।

অপরাহ্নের ম্লান সূর্য্যালোকটুকু নিভিয়া আসিতেছে।

অজয় বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া পড়িয়াছিল। সুমতি চায়ের বাটী আনিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল—চা খেয়ে নাও।

অজয় সুমতির সাজসজ্জার দিকে বারেক স্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিল—অভিসারে না কি?

সুমতির সুগৌর মুখখানি ডালিম ফুলের মতো আরক্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখের চঞ্চল হাসিভরা দৃষ্টিতে অজয়কে পাগল করিয়া দিল। সে কহিল—যাও!

অজয় হাসিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাত দুইটী সবেগে কাঁপিয়া উঠিয়া চায়ের বাটিটা স্খলিত হইয়া সানের উপর পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সমস্ত মুখখানা মড়ার মত সাদা হইয়া গেল—তাহার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।...

সুমতি স্বামীর আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আতঙ্ক-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না—অথচ কেমন একটা বিহ্বলতা তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—কি যে করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ ইঞ্জিনের তীব্র 'হুইশিলে'র মতো সুতীব্র অট্টহাস্যে সুমতির পদনখর হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন ভয়ে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

হি-হি-হি-হি!—এই বুঝি নতুন বউ!...লেখার ছায়া-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সুমতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা বিকৃত স্বর ফুটিয়া উঠিল—বাঃ, বেশ্ সুন্দরী তো!...না অজয় দা', ঠকো নি...কিন্তু ...কিন্তু ওকি অমন করে' বসে' রয়েছো কেন? এস দু'জনে পাশাপাশি একবার দাঁড়াও, আমি দেখি।..

অজয় গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ইজিচেয়ার হইতে গড়াইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সুমতি ভয়ে আতঙ্কে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া উঠিল—কিন্তু মনে হইলে বুঝি সে চীৎকার সে নিজেই শুনিতে পাইতেছে না। আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার ...জোরে...আরও জোরে...হায়রে, কে যেন তাহার গলাটা আজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে।...শুধু তাহার কাণ দুইটীর পাশে একটা বিকট হাসি বারেবারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া সুমতি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লানকণ্ঠে কহিল—বেশ, লেখাকে বিয়ে কর্‌লে না কেন?

অজয়ের চোখ দুইটী সজল হইয়া উঠিল। কহিল—লজ্জায় বাবাকে বল্‌তে পারি নে। মা থাক্‌লে হয় তো... তারপর বাবা মারা যাবার পর আর কোন বাধাই ছিল না.....কিন্তু......

লেখা সংশয়-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—কিন্তু কি?

অজয় উদাস-কণ্ঠে কহিল—ঐ কিন্তুটা আজও আমি ভাল করে' বুঝ্‌তে পারি নি। নিজের কপালের দোষ ...দুরদৃষ্ট...নইলে......

বাধা দিয়া সুমতি কহিল—কিন্তু লেখাও তো এসব জানতো—তোমার মিলনের পথে কতো বাধা। না জান্‌লেও বিস্তারিত তোমার লেখা উচিত ছিল।

অজয় তেমনিভাবে কহিল, লিখেও ছিলুম সব—ও আমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করে নি—আমার একটা কথার উপর নির্ভর করে' ও মরণ পর্য্যন্ত বরণ কর্‌তে পার্‌ত। এ শিক্ষা আমিই ওকে দিয়েছিলুম—সে শিক্ষা মিথ্যেও হয় নি......আমার কথার উপর বিশ্বাস করে'......

—কিন্তু অমন করে' ম'লো কেন? তুমি তো তাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করো নি?

—তা' করি নি। কিন্তু এরই মধ্যে মামা এসে এক গোল বাধালেন। মামীমার কোন্ বোনের এক রূপসী মেয়ে—কথাটা আর গোপন রইলো না।

—অজয়ের দুই চোখ বহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সুমতির চোখও শুষ্ক রহিল না।

বাহিরে তখন সুনীল আকাশ জুড়িয়া রৌদ্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সেইদিকে কিয়ৎকাল নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কণ্ঠে অজয় কহিল—তোমার ভয় কর্‌ছে, না সুমু?

সুমতি চমকিয়া উঠিল। ম্লান হাসি টানিয়া কহিল—তুমি থাক্‌তে ভয় কি?

অজয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুমতির হাত ধরিয়া টানিয়া প্রায় বুকের কাছে আনিয়া তাহার ম্লান মুখ উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল— এই মুখখানা......কিন্তু সবটা শেষ করিতে পারিল না। অজয়ের গায়ে গাত্র স্পর্শ হওয়ায়—সুমতি চমকিয়া উঠিয়া কহিল—এ কি! এ যে পুড়ে যাচ্ছে—জ্বর হয়েছে নাকি? বলিয়া ভাল করিয়া তাহার কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা করিতে গিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অজয় সুমতির ভাব দেখিয়া হাসিল। কহিল—ও তো আমার রোজই হয়—একটুতেই তোমার যে ভয়......

কিন্তু স্বামীর কথায় সুমতির মনের ভয় গেল না। বুকের ভিতর যেন কেমন হা হা করিয়া উঠিল। স্বামীর তো পূর্ব্বেও জ্বর হইয়াছে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে এখন হাহাকার তো সে কোনদিন শুনিতে পাই নাই।

আতঙ্ক-কম্পিত-কণ্ঠে সে স্বামীকে কহিল কিসে যে তোমার হাসি আসে—রেধোকে পাঠিয়ে দি'—ডাক্তার আসুক।

অজয় আবার হাসিল। নানাভাবে সুমতিকে প্রবোধ দিল—সামান্য একটু জ্বর—জ্বরও ঠিক্ নহে,মাত্র গাটা একটু গরম হইয়াছে। এ তো সবারই হয়—এরই জন্য অতো উতলা কেন? তেমন কিছু হয়, না হয় ভোরে......

কিন্তু তাহার সমস্ত কথা ওলট-পালট করিয়া দিয়া রাত্রেই ভীষণ জ্বর তাহাকে পাগল করিয়া দিল। ভোরে ডাক্তার আসিল—ঔষধের ব্যবস্থা হইল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দেব-দেবীর কাছে সুমতি মাথা কুটিতে লাগিল—কিন্তু অজয়ের অবস্থা ক্রমশঃ যেন খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই —কি যে ভুল বকিতেছে...

সুমতি বুঝিল, তাহার কপাল পুড়িয়াছে। জোর করিয়া লেখার স্বামীকে সে দখল করিয়াছিল, আর কিছু নয় লেখাই আজ সেই দখল উল্টাইতে বসিয়াছে। ঔষধ-পত্র ডাক্তার-কবিরাজে এ রোগের কিছু করিতে পারিবে না। যাহার জিনিষ সে লইতে আসিয়াছে—মানুষ কি করিয়া ঠেকাইবে।

দেবতার অঙ্গনে অসহায় সুমতি মাথা কুটিতে লাগিল।...

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাঢ় তিমিরে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন! দূরে, নিকটে, লতাপাতার গাঢ় কালো ছায়ায় ছায়ায় অশরীরি আত্মার মতো জোনাকীগুলা জলিয়া জলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সুমতি দীর্ঘকাল তুলসী-মঞ্চে মাথা কুটিয়া গললগ্নীকৃত বাসে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুইটী চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত-স্ফীত। কোমল বুকখানি অব্যক্ত ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে কখন কখন কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সুমতি উঠিয়া অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশে অন্তরের সমস্ত বেদনা ঢালিয়া দিয়া অশ্রুধারায় প্রার্থনা করিল—হে ভগবান, আমাকে নাও... ওঁকে নিরাময় করো—ওকে শান্তি দাও!......

—সুমতি, বোস্!

একটা চাপা ফিস্‌ফিস্ ডাকে সুমতি চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিল। লেখার সমস্ত শরীর যেন গাঢ় অন্ধকারের সহিত লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—

শুধু দুইটী চোখের সুতীব্র দৃষ্টি এই গাঢ় অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া বিদ্যুতের মতো জ্বলিতেছে।

সুমতি 'কাঠ' হইয়া গেল। তাহার হাত পা সমস্ত যেন অবশ ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়া একেবারে মাটির সহিত আঁটিয়া গেল।

লেখা একটু সরিয়া আসিল। মিনতি করিয়া কহিল—সুমতি, বোন্, আমাকে ভয় কর কেন? যাক্, অজয় কেমন আছে?

সুমতির সাহস ফিরিয়া আসিল। কেমন একটা ক্রোধে, একটা অজানিত জিঘাংসায় তাহার অন্তর বিষাইয়া উঠিল। লেখা যে মানুষ নয়—তাহাকে যথেষ্ট ভয় করিবার আছে একথা সুমতি একেবারে ভুলিয়া গেল। শুধু তাহার মনে হইল, লেখা তাহারই মতো নারী, সে তাহার সুখের সংসার নষ্ট করিতে আসিয়াছে...তাহার সোণার সংসারে আগুন লাগাইতে বসিয়াছে···তাহার স্বামীকে...

ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে সুমতি কহিল—দিন দিন তাকে চুষে খেয়েই ফেল্‌ছো, শুধু জীবনটুকু—সেও তো আজ...

লেখা যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠ দিয়া আজ সেই অট্টহাসি ফাটিয়া পড়িল না। যেন মানুষের ন্যায় কাতর-কণ্ঠে কহিল—কি করেছি আজ...নিতে এসেছি...

সুমতি দাঁতে দাঁত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল—তাই সর্ব্বনাশী—রাক্ষুসী...

লেখা হাসিয়া উঠিল—বড় ম্লান সে হাসি—বড় করুণ! কহিল—সর্ব্বনাশী—রাক্ষুসী...তাই—তাই বোন্, তাই। কি চোখেই ওঁকে দেখেছিলুম, মরেও ভুলতে পারলুম না! ওঁর সর্ব্বনাশ করলুম, তোমার করলুম, নিজের ...তারপর হঠাৎ ব্যাকুলভাবে কহিল—কিন্তু সত্যিই কি বাঁচ্‌বে না দিদি...

সুমতির চোখেও কি জানি কেন জল আসিয়া পড়িল। রাগ করিয়া যাহাকে বকিবে, দু'কথা শোনাইয়া দিবে মনে করিয়াছিল, তাহারই ব্যাকুল অশ্রু-কাতরস্বরে তাহার কোমল নারী-হৃদয় কেমন কাঁদিয়া উঠিল। সুমতি নিরুত্তরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

লেখা অধৈর্য্য হইল। কাঁদিয়া কহিল—সুমতি!

সুমতি আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—বাঁচ্‌বে···যদি তুমি আর না আস...আর না তাঁকে দেখা দাও...

লেখার সমস্ত মুখখানির ওপর অব্যক্ত যন্ত্রণা, অপরিসীম বেদনা ফুটিয়া উঠিল। সুমতি কাতর হইয়া উঠিল। গল্পে সে অনেক শুনিয়াছে, রূপ-কথায় অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু অশরীরি আত্মার এই বিরহ-মলিন মুখের অবর্ণনীয় কাতরতা আজ সত্য-সত্যই চক্ষে দেখিল। সে অপরিসীম বেদনায় নির্ব্বাক বিস্ময়ে লেখার মুখের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

লেখা কতকটা আত্মগতভাবেই যেন অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—আর তাঁকে না দেখা দিই···সুমতি, বোন্, তাই হ'বে। আর আস্‌বো না—বুক ফেটে গেলেও আর দেখা দেবো না। ওকে দেখো দিদি...ও যে...কিন্তু এই ফুল দু'টি—ওর কপালে ছুঁইয়ে ওর বালিশের তলায় রেখে দিও···না-না-না, এ খারাপ কিছু নয়—দেবতার নির্ম্মাল্য—এতেই ও সেরে যাবে—মনের ভয় কেটে যাবে ...একবার দিদি···না...না...আর নয়...তুমি সুখী হও ভাই!···

সুমতি সভয়ে দেখিল—অকস্মাৎ যেমন অতল কালো অন্ধকার হইতে লেখা ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সেই অতল অন্ধকারে চক্ষের পলকে মিশিয়া গেল—তাহার চিহ্ন মাত্র নাই...শুধু সেই ফুল দুইটী লেখার আগমনের সাক্ষীস্বরূপ তখনও তাহার হাতের মধ্যে তেমনিভাবে ধরা আছে।

অজয় সারিয়া উঠিল।

সেই হইতে আর লেখা আসে নাই। কতদিন গিয়াছে—কত রাত্রির অন্ধকার বুকের উপর দুরন্ত মেঘ ঝড়-বৃষ্টির সাথে মাতামাতি করিয়াছে, ঘরের ভিতর হইতে সুমতি কাণ পাতিয়া কি শুনিয়াছে, কখন কখন ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে। অজয় হাসিয়া সুমতিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সোহাগভরা-কণ্ঠে বলিয়াছে—কি ভীতু! বাইরে ঝড় হচ্ছে, বৃষ্টি পড়্‌ছে তারই শব্দ। আর তুমি কি না—সুমতি তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাহার কর্ণে কর্ণে লেখার বুকফাটা ক্রন্দোনচ্ছ্বাস ভাসিয়া উঠে—তাহার সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস সে যেন আজও স্পষ্ট শুনিতে পায়। বাহিরে বাতাসের গোঙানি—বৃষ্টির ঝমঝম্ শব্দে সুমতি শিহরিয়া উঠিয়া মনে করে—লেখাই বুঝি তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ের মরু-তৃষ্ণা লইয়া এই বাড়ীটার চারিধারে অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!...

ভীতা সুমতি তন্দ্রা-জড়িত চক্ষে আরও ভয়ে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া শিহরিয়া উঠে।...···

মণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

পুরাতনের পরিচয়

সে কালের দারোগার কাহিনী

চোর বড়, না, দারোগা বড় ?

চোরের অনুসন্ধান শক্তি যে কত তীক্ষ্ণ এবং অব্যর্থ, তাহা যাঁহারা সে কর্ম্মের কর্ম্মী নহেন, তাঁহারা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন না।

আমাকে একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার বাসস্থানের নিকট এক গ্রামে ইদাজোলা নামক একজন অতি বৃদ্ধ মনুষ্য ছিল; তাহার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে এমন চোর ও ডাকাইত ছিল, যে তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল জেলখানায় অতিবাহিত হইয়াছিল; ইদা যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইত, তখন সে অন্যান্য কয়েদিদিগকে বলিয়া আসিত যে "ভাই দেখিস্, তোরা যেন আমার ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি"। বাস্তবিকও সে জেলখানা হইতে নির্গত হইয়া, কখন দশ পনের দিবস এবং অধিক হইলেও দুই তিন মাস বাহিরে থাকিয়া, পুনরায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাবদ্ধ হইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হইয়া সে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত হয়। এই সময় তাহার হাঁপানী কাশীর পীড়া হওয়াতে এবং কবিরাজে ভাল পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, ইদা ঐ পুরাতন ঘৃতের জন্য সেই ভদ্রলোকটীর নিকট আসিল; তিনি জানিতেন যে তাঁহার নিকট ঐ দ্রব্য নাই, তাহাতে ইদা বলিল যে "কি ঠাকুর? আপনি আমাকে কি জন্য প্রবঞ্চনা করিতেছেন? আমি নিশ্চয় জানি যে আপনার ঘরে যেমন পুরাতন ঘৃত আছে, এমন অন্য কোন স্থানে নাই"। তাহাতেও তিনি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে, ইদা জোলা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল যে "আপনি যদি সত্য সত্যই পুরাতন ঘৃতের বিষয় অনবগত থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাইয়া আপনার অমুক ঘরে অমুকদিগের কোণের নিকট মাটি খুঁড়িয়া দেখুন, এক ভাঁড় বহুকালের ঘৃত পাইবেন"। গৃহস্বামী সেইস্থানে অনুসন্ধান করাতে যথার্থ ঘৃত আবিষ্কৃত হইল। ইদা কহিল, যে সে অবগত ছিল, যে সেই ভদ্রলোকের পিতামহ তাঁহার নিজের পীড়ার জন্য সেইস্থানে ঘৃত পুরাতন করিবার জন্য একটা ভাঁড়ে মাটির মধ্যে এক সের ভাল গাওয়া ঘৃত পুঁতিয়া রাখিয়া ছিলেন। দেখুন গৃহস্বামী নিজে যাহা জানিতেন না, তাহা ভিন্ন গ্রামের একজন চোরে জানিত। ইহা ত গেল আমার শুনা কথা, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও বড় সামান্য নহে। বিবৃত করিতেছি; কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক বেটা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত যুগী ছিল; দেখিতে দরিদ্র, দুই খানা পুরাতন জীর্ণ চালা ঘর মাত্র তাহার বিত্ত, এবং পরিবারের মধ্যে কেবল এক বিধবা ভগিনী। লোক দেখান দুই এক জোড়া নূতন কাপড় বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিত। প্রতিবাসীরাও সকলে তাহাকে বিত্তহীন এবং ধনহীন বলিয়া জানিত, কিন্তু একজন চোর জানিতে পারিয়াছিল, যে "ইহার ধুকড়ির ভিতর খাসা চাউল আছে"। একরাত্রে দশ পনের জন অস্ত্রধারী মনুষ্য তাহার গৃহ আক্রমণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাতে আমার নিকট সংবাদ আসিলে আমি ঘটনার স্থানে যাইয়া যুগীর ঘর বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না যে নিকটে অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী থাকিলেও ডাকাইতেরা কি জন্য সেই সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এমন দরিদ্রের বাড়ী ডাকাইতি করিতে আসিল। যুগীও প্রথমে আমার নিকটে সকল

কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; কিন্তু তাহার ভগিনীর পরামর্শে সে অবশেষে প্রকাশ করিল, যে অন্যান্য স্থানে তাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং তদ্দ্বারা সে অনেক নগদ সম্পত্তি আহরণ করিয়া তাহার এই দুই ভাঙ্গা গৃহে মাটির ভিতর গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ডাকাইতেরা তাহা জানিতে পারিয়া প্রায় সহস্রাধিক টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সোণা রূপার গহনা ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না। ডাকাইতেরা মুখে কালী চূণ মাখিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

যদিও এই ডাকাতি কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে হইয়াছিল তথাপি নগরের সীমানার মধ্যে হওয়াতে আমার ও অধিবাসীগণের অত্যন্ত আতঙ্ক হইল; ভাবিলাম যে এই কার্য্যের কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিতে এবং শাস্তি দিতে না পারিলে, তাহারা যে পুনরায় অন্যদিকে এবং অন্যের বাড়ীতে হস্ত প্রসারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আমার চর অনুচরদিগকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম। আমি প্রত্যহ দুই বেলা যুগীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিতাম কিন্তু দুই তিন দিবস নিষ্ফলরূপে কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। এক দিন প্রাতে আমি যুগীর বাড়ী ঐরূপ যাইতেছিলাম, দেখিলাম যে নেঙটিয়া সেখ নামক একজন প্রতিবেশী পথের মধ্যে আমাকে দেখিয়া বিলক্ষণ সঙ্কুচিত চিত্তে অন্য দিকে যাইবার চেষ্টা করিল। যদিও আমি বেশ জানিতাম যে দারোগা দেখিলে ইতর লোক স্বভাবত সঙ্কুচিত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি সেই সময়ে নেঙটিয়ার ঐরূপ ভীরুভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ এক প্রকার সন্দেহ হইল। তাহাকে ডাকিয়া সে কি জন্য আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে ভালরূপে আমার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইল এবং আমার বোধ হইল, যেন তাহার কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া থাকিতেছে, মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রাগান্বভাবে "কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল "যে মহারাজ আমি চুরি করি নাই"। আমার সঙ্গে আমার প্রধান গোয়েন্দা বুদ্ধু বরকন্দাজ ছিল; সে নেঙটিয়ার কথা শুনিয়া "ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাই নে; তুই চুরি করিস্ নাই, তবে কে করিয়াছে রে ব্যাটা? চল্ আমার সঙ্গে থানাতে চল্, এখনি দেখাইয়া দিব, কেমন তুই চুরি করিস নাই" বলিয়া সে নেঙটিয়ার হাত ধরাতে নেঙটিয়া আমার পা ধরিয়া বলিল যে "দোহাই দারোগা মহাশয়! আমাকে মারিবেন না, আমি যাহা জানি বলিতেছি"! ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাহার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যের সে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া দিতে সম্মত হইল। আমরা যুগীকে সঙ্গে লইয়া নেঙটিয়ার গৃহে যাওয়াতে, তাহার ঘরের মধ্য হইতে একটা বড় হাঁড়ীতে চাউল দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েক জোড়া নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল এবং যুগীও তাহা তাহার দ্রব্য বলিয়া চিহ্নিত করিল। নেঙটিয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করে, তাহাদের সকলের নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল এবং সকলেই বলিল যে চিত্রশালী নিবাসী মুন্সী সেখ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার ছিল এবং অপহৃত সোণা রূপার অধিকাংশ দ্রব্য তাহারই নিকট আছে।

মুন্সী সেখ থানায় ধৃত হইয়া আসিবামাত্রই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে তাহার নিকট কোন অপহৃত দ্রব্য নাই, তবে তাহার সঙ্গীগণ তাহাদের নিজ নিজ অপরাধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহার নাম করিয়াছে। ফলে মুন্সীর ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যথার্থ, প্রবঞ্চনা নহে। আমি তাহার কথাগুলি যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সেই লিপিসহ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

তথন বি পামর নামে একজন যুবা সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া এইবার প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও তিনি জানিতেন না, কিন্তু হিন্দিতে তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। চরিত্রও খুব তেজস্বী ছিল।

প্রজাদিগের যাহাতে শান্তি হয় এবং বদমায়েস এবং কুচরিত্রের লোকেরা যাহাতে দমন থাকে; তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি এক দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অশ্ব পৃষ্ঠে সমস্ত কৃষ্ণনগর ভ্রমণ করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরের কোন স্থানে কোন গোলমাল দেখিতে না পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এক অশ্বের উপরে বসিয়া তিনি এক ঘণ্টা কাল আমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। তাহার মধ্যে একটি উপদেশ তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা এই যে "Daroga, never show your teeth before you bite." অর্থাৎ "দারোগা কামড়াইবার পূর্ব্বে কখন দাঁত দেখাইও না"।

এই মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি মুন্সীকে তাহার একরার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আইনের নিয়ম ছিল এবং তাহা অন্যান্য সকল মাজিষ্ট্রেটকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, যে থানা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকৃত কিম্বা অস্বীকৃত জবাবের সহিত একবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট থানা হইতে প্রেরিত হইলে, সে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া সেই জবাবের পোষকতা করুক, কিম্বা না করুক, সে আর থানায় পুনঃপ্রেরিত না হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইত কিম্বা জামিন দিয়া শেষ বিচার পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পাইত। কিন্তু পামর সাহেবকে তাহার বিপরীত করিতে দেখিলাম। মুন্সী সেখকে কাছারি পাঠাইবার কিছুকাল পরেই দেখিলাম, যে বরকন্দাজ তাহাকে লইয়া পুনরায় থানায় আনিল এবং প্রকাশ করিল যে সাহেবের নিকট মুন্সী উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ অস্বীকার করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া আমলাদিগকে বলিলেন, যে "দারোগা, আমার নিকট কি আসামি পাঠাইয়াছে? এ দেখিতেছি, একরার করে না; তবে ইহাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যক কি ছিল? ইহাকে পুনরায় থানায় পাঠাইয়া দেও"। তখন আমি বুঝিলাম, যে মুন্সী সেখকে আমি যেরূপ সরল ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, সে সেরূপ নহে; অতএব তাহাকে খুব করিয়া প্রহার করিতে বরকন্দাজদিগকে শিখাইয়া দিলাম। পর দিবস প্রাতে মুন্সী পুনরায় কাছারিতে যাইয়া যথার্থ কথা বলিতে চাহিবায়, আমি তাহাকে পুনরায় সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম, কিন্তু পুনরায় মুন্সী তঞ্চকতা ব্যবহার করাতে সাহেব তাহাকে আবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুন্সীকে এইরূপ উপর্য্যুপরি দুইবার তঞ্চকতা ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্ত করিল যে "আমি জানিতাম, যে পুলিশ-আমলারা আসামিকে একরার করাইবার নিমিত্ত থানায় যন্ত্রণা দিয়া থাকে, কিন্তু একরার করুক কিম্বা না করুক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে হাজতে প্রেরণ করেন এবং হাজতে গেলে আসামির কারারুদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট কিম্বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। আরও আমি জানিতাম যে শুদ্ধ একরার করাইবার এবং চোরা মাল পাওয়ার নিমিত্ত পুলিশ আমলারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, আসামী একরার করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া দিলে, তাহাকে থানায় কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আমি থানায় আসিবা মাত্রই একরার করিয়াছিলাম এবং আপনিও তজ্জন্য প্রথমে আমাকে কোন কষ্ট না দিয়া কাছারিতে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে জানিতাম, সেইখানে যাইয়া অস্বীকার করিলে আমার থানার একরার বৃথা হইয়া যাইবে এবং আমি হাজতে প্রেরিত হইব; কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, সাহেব দুইবার আমাকে থানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রকমের আইন হইয়াছে না কি? নচেৎ কেন এইরূপ হইল! যাহা হউক, সাহেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনার যাহা করিতে হয় করিয়া দেখুন"। আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে এক দিন এক রাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এক্ষণে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা পরমেশ্বর! সেই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি! "বরমেব ভিক্ষা তরু তলে বাস" তথাপি যেন ভদ্রসন্তানেরা পুলিশের চাকরি না করেন!!!

এইরূপ দুই তিন দিবস ধরিয়া ব্যবহার করিলাম, কিন্তু

মুন্সী সেখ অটল হইয়া রহিল। খাইতে না পাইলে, খাইতে চাহে না এবং প্রহার করিলে নিষেধ করে না। অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া এক নির্জ্জন সময়ে মুন্সীকে হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার বুঝাইলাম এবং বলিলাম যে "দেখ্ মুন্সী, আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার করিতেছি, কি করিব, যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছাড়েন না, তখন তোর একরার করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই"। তাহাতে মুন্সী সেখ যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন এবং সে কত বড় দরের চোর তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এত দীর্ঘকাল পরে, আমার তাহার বাক্যগুলি ঠিক স্মরণ নাই, মর্ম্ম প্রকটন করিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি নূতন কিম্বা কাঁচা চোর নহি, আমার এক্ষণে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স হইল কিন্তু ইহার-মধ্যে আমি চুরি ডাকাইতি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করি নাই, অতএব ভালরূপে আমি জানি, যে আমি নিজে অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া না দিলে, আমার সহস্র সঙ্গী তাহাদের স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিলে, জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কিছু করিতে পারিবেন না, আমি সেই জন্য কখনও একরার করি নাই এবং তন্নিমিত্ত কখনও দণ্ডনীয় হই নাই। আমি অনেক জেলায় বড় বড় গুরুতর মোকদ্দমায় ধৃত হইয়া অনেক দারোগার হস্তে মার খাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দারোগা আমাকে একরার করাইতে পারেন নাই"। এই স্থানে সে তাহার জানুর কাপড় উঠাইয়া কএকটা কাল দাগ দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন যশোর জেলার এক ব্যাটা পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমার জানুর মাংস চড়্‌চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওয়াসফদ্দীন দারোগা এক্ষণে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন; তিনি আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; আর অন্যান্য কত দারোগার কাছে কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা আমি কত বলিব! কিন্তু কেহ আমাকে দিয়া একরার করিয়া লইতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনার হস্তে পড়িয়াছি, দেখি আপনিই বা কি করিতে পারেন? আপনারও বড় নাম শুনিয়াছি, দেখিব যে চোর বড়, কি দারোগা বড়? কিন্তু আপনি ধ্রুব জানিবেন যে মারপিট করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না, প্রহার আমার শরীরে বিলক্ষণ সহ্য হয়, তবে অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা যদি আপনি চোর অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, তাহা অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন"। এই কথোপকথনের পরে মুন্সীকে যন্ত্রণা দেওয়া অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি বরকন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্র আমার মনে ঐ চিন্তা জাগরুক রহিল। ভাবিলাম যে এই দস্যু ব্যাটা যদি আমাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় লজ্জা ও বিপদের বিষয়। লজ্জা আমার, বিপদ সমাজের।

পর দিবস বুধবার থানায় গ্রাম্য চৌকিদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছিল; তাহার মধ্যে মুন্সীর নিজ গ্রামের চৌকিদারকে দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি এক ভাব উদয় হওয়াতে, আমি তাহাকে মুন্সীর পরিবারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে সে কহিল যে মুন্সীর বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কাল হইল স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং মুন্সী তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী স্ত্রী লোককে নিকা করিয়া চিত্রশালী গ্রামের প্রান্তে এক ঘর উঠাইয়া তাহাকে লইয়া বাস করে। মুন্সীর বাড়ীতে কেবল তাহার মাতা থাকে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই চৌকীদারের সঙ্গে একজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া মুন্সীর নিকার স্ত্রীকে থানায় আনিতে আদেশ করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই স্ত্রী লোকটি থানায় উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম, যে সে ভদ্র লোকের মেয়ের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সও কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে; ক্রোড়ে একটি ছয় মাসের শিশু কন্যা। মুন্সীর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া আমার পায়ের উপরে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, মুন্সী বদমায়েস,

নিকার আগে জানিতে পারিলে আমি কখন তাহাকে বিবাহ করিতাম না, মুন্সীর মাতাই সকল অনর্থের মূল এবং সেই জন্য আমার শাশুড়ির সহিত আমার বনিবনাও না হওয়াতে মুন্সী আমাকে গ্রামের বাহিরে স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিয়াছে; আমি মুন্সীকে চুরী ডাকাইতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকি বলিয়া সে আমার নিকট সকল কথা গোপন করে। আমার কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি যে আমি কিছুই জানি না, আমার শাশুড়ীকে আপনি ধরিয়া আনিয়া খুব শাস্তি দিলেই সকল কথা তাহার নিকট জানিতে পারিবেন"। এই স্ত্রী লোকের কথার উপরে আস্থা করিয়া তাহাকে ভাল স্থানে রাখাইয়া মুন্সীর মাতাকে আনিতে পাঠাইলাম। পর দিবস সকাল বেলায় মুন্সীর মাতা আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিলাম, যে তাহার ক্লিষ্টা শরীর, চক্ষু কোটরস্থ; সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহার নিকট মুন্সীর স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে উভয়ে ভারি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে বৌ চোরণী এবং বৌকে শাশুড়ি বেশ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশেষে মুন্সীর স্ত্রীকে স্থানান্তর করিয়া তাহার শাশুড়িকে ধমকাইতে লাগিলাম এবং থানায় তুড়ুমের নিকট টানিয়া লইলাম। তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম্ শব্দ ফরাসিস ভাষা, ইংরাজিতে ইহাকে stocks বলে। দুইখানা লম্বা ভারি কাষ্ঠ এক দিগে শক্ত লোহার কব্জা দ্বারা আবদ্ধ, অন্য দিক খোলা; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিগের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় এমন ভাবে ছিদ্র করা আছে যে একখানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয় খানা পাতিলে, দুই ছিদ্রে একটা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা একখানি কাষ্ঠের দুই ছিদ্রের ভিতরে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানস থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দুই ছিদ্রে পা না দিয়া এক ছিদ্র মধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকাইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। রাত্রিকালে দুরন্ত আসামিদিগকে নিশ্চিন্তরূপে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সকল থানাতেই ইহার এক একটা তুড়ুম্ ছিল। মুন্সীর মাতাকে এই তুড়ুমের নিকট আনিয়া তাহার উপরিভাগের কাষ্ঠটা টানিয়া উঠাইয়া নিম্ন কাষ্ঠের উপরে ছাড়িয়া দিলাম; তাহাতে ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে মুন্সীর মাতা কাঁপিয়া উঠিল এবং আমিও তাহাকে রাগান্ধভাবে বলিলাম যে "দেখ বেটী, তুই যদি এই যুগীর দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া না দিস্ তাহা হইলে, এই তুড়ুমের মধ্যে এক ফুকর অন্তরে তোর পা আটকাইয়া ফেলিয়া রাখিব এবং সমস্ত দিন তোকে প্রহার করিব"! মুন্সীর মাতা আমার রাগান্ধ ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল যে "বাবা, তাহা হইলেত আমার মুন্সী মারা যাইবে।" সন্তানের প্রতি মাতার যে কি গাঢ় স্নেহ, তাহার ইহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মুখে যন্ত্রণার এক ভয়ানক যন্ত্র, পশ্চাতে যমদূতের ন্যায় দারোগা এবং বরকন্দাজেরা তাহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে এবং যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি মুন্সীর মাতার মনে মুন্সীর যাহাতে অমঙ্গল না হয়, তাহাই প্রবল চিন্তা। মুন্সীর মাতার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিলাম। স্ত্রী লোকের এবং সাধারণ লোকের মনে ধারণা আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিকারককে শাস্তি দিতে না চাহে, তবে আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। আমি ইহা জানিয়া মুন্সীর মাতাকে বলিলাম যে "যুগী আমাকে বলিয়াছে যে সে তাহার সমুদয় দ্রব্যগুলি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে কোন আসামিকে সে শাস্তি দেওয়াইতে চাহে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমি যুগীকে ডাকাইয়া আনিয়া মোকাবেলা করিয়া দিব"। ভাগ্যক্রমে যুগীও সেই সময়ে থানায় উপস্থিত ছিল। সে আমার ইঙ্গিত মতে মুন্সীর মাতাকে ঐরূপ আশ্বাস দিল; কিন্তু চোরের মা শুদ্ধ বাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া বলিল যে "তবে যুগী সেতাম্বর কাগজে একখানা দরখাস্ত দাখিল করুক।" অনভিজ্ঞ লোকে ষ্ট্যাম্প কাগজকে

সেতাম্বর কাগজ বলে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাক্স হইতে এক তক্তা ফুলিস্কেপ্ কাগজ বাহির করিয়া মুন্সীর মাতাকে তাহার মধ্যে জলের মার্কা দেখাইয়া প্রতীত করিলাম, যে যথার্থ উহা ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং তাহা আমার নায়েব দারোগার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার দ্বারা মুন্সীর মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী দরখাস্ত লিখাইয়া, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া, যুগীর দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলাম এবং আমরাও কয়েক জন তাহাতে সাক্ষী স্বরূপে স্বাক্ষর করিলাম। স্ত্রীলোকটির মনে তখন বিশ্বাস হইল, যে অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিলে মুন্সীর কোন ক্ষতি হইবে না। এবং তখন সে মাল দিতে সম্মত হইয়া নায়েব দারোগার সঙ্গে চিত্রশালী যাত্রা করিল।

এই পর্য্যন্ত মুন্সী সেখ এই সকল ঘটনার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই। মুন্সীর মাতা থান হইতে বাহির হওয়ার পরক্ষণেই আমি বরকন্দাজি গারদে যাইয়া মুন্সীকে বলিলাম যে "কেমন মুন্সী, এখন ত মাল পাইলাম, তুই দিলি না কিন্তু তোর মা দিতে চাহিয়াছে, এখন তোরা মায়ে পোয়ে ফাটক খাটিবি"। এই কথা শুনিয়া মুন্সী অবাক হইয়া তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিল; আমি তাহাকে দ্বারে আনিলাম। কোতয়ালীর সম্মুখস্থিত রাজ-বর্ত্মটি অতি সরল, থানার দ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকে অনেক দূর দৃষ্টি হয়। মুন্সীকে যখন দ্বারে আনিলাম, তখন তাহার মাতা প্রায় পাঁচশত হাত (যাহারা সেই স্থান দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে পুরাতন কলেজের হাতার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট) গিয়াছে। মুন্সী তাহার মাতাকে চিনিয়া বলিল যে "এখন কি হইবে মহাশয়! আমার মাতাকে কি প্রকারে বাঁচাইব"! আমি বলিলাম "এক উপায় আছে, তুই যদি এখন নিজে মাল বাহির করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট যাইয়া একরার করিস, তাহা হইলে তোর মা বাঁচিতে পারে, কেমন মুন্সী, তোর মাকে ফিরাইব না কি? মুন্সী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল যে "না ফিরাইবার দরকার নাই। ও ত চোরের মা, সে যে সহজে মাল বাহির করিয়া দিবে, এমন কথা আমার মনে লয় না, যাহা হউক আর কিছুকাল বিলম্বেই টের পাইব। এখন গাঙের মাঝে ঢেউ দেখিয়া কিনারায় নৌকা ডুবাইলে, কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আপনি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব, চলুন এখন থানায় ফিরিয়া যাই।" মুন্সী এমনই শক্ত চোর, যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার মাতা এমন কাঁচা কর্ম্ম করিবে। বেলা চারটার সময় নায়েব দারোগা মুন্সীর মাতাকে ও একটা বড় পুরাতন কালা হাঁড়ীর মধ্যে অপহৃত যাবতীয় সোণা রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকা গুলি সম্মুখে আনিয়া,ব্যক্ত করিল, যে, যে কৌশলে সকল দ্রব্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহাতে উহারা দুই জন ভিন্ন আর কাহারও তাহা আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের বাহিরে একটা মাঠের মধ্যে এক শিমুল ও খর্জ্জুর গাছের তলে, মাটির একটা অদৃশ্য গহ্বর আছে তাহার মধ্যে হাঁড়িটা উপুড় করিয়া রাখিয়া সকলের উপরে পাতা ও ঘাসের চাপড়া আচ্ছাদন করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। মুন্সীকে ডাকিয়া দেখাইলাম, সে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমার পা দুইখানা ধরিয়া তাহার মাতাকে রক্ষা করিতে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে "এখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি সমুদায় করিব"। আমি তাহার মাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হইয়া বিস্তারিত রূপে তাহার দ্বারা একরার লিখাইয়া লইলাম এবং মুন্সী দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়ার কথাও তাহাতে স্বীকার করিয়া লইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আণ্ডা ঘরে আণ্ডা খেলিতে ছিলেন; মুন্সী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল এবং তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া মুন্সীর প্রার্থনা মতে সেই রাত্রিটা তাহাকে ফাটকে প্রেরণ না করিয়া, থানায় রাখিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি মুন্সী তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অতিবাহিত করিল এবং পর দিবস প্রাতে কান্দিতে কান্দিতে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া জেলখানায় গেল। যাইবার সময় তাহাতে আমাতে এইরূপ কথোপকথন হয়; —

মুন্সী। দারোগা মহাশয় আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আমার পায়ে কখনও বেড়ী উঠে নাই এইবার

উঠিবে। আমি এখন দেখিতেছি, যে আপনি দারোগাই বড়।

দারোগা। দারোগা বড় নহে, ধর্ম্মই বড় মুন্সী সেথ!

মুন্সী। ঠিক বলিয়াছেন, এবার যদি খোদার মেহের-বাণীতে ফাটক খাটিয়া প্রাণ লইয়া বাড়ী আসিতে পারি, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি করিব না।

দারোগা। সব সে ওহি ভালা।

মুন্সীর সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের সহিত কারাবাসের দণ্ড হয়।*

* 'নবজীবন'' তৃতীয় ভাগ, সপ্তম সংখ্যা, মাঘ, ১২৯৩

নিবেদন—

গল্প-লহরীর শ্রাবণ সংখ্যা সব ফুরাইয়াছে। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাদের বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমরা ওই সংখ্যা চার আনা দিয়া কিনিতে পারি।

সম্পাদক—

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

জন্ বোলস্

[গল্পের মত]

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজ একটা গল্প শুনুন।

১৯১৮ সালের জুলাই মাস। ফ্রান্সের সীমানায় আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের তাঁবু পড়েছে। একদিন সকালবেলা তেতাল্লিশ নম্বর গুপ্তচর 'জন্ বোলস্' পায়চারি করতে করতে তারের বেড়ার ধারে পাহারা দিতে ব্যস্ত।

ঠিক তারের বেড়ার উল্টোদিকে একটা দোতলা বাড়ী—তার বাসিন্দা এক সুন্দরী যুবতী। গুপ্তচরেরা তার নাম দিয়েছে 'ম্যাডাম এক্স।' জন্ বোল্‌সের সঙ্গে মেয়েটীর প্রথম থেকেই ভয়ানক ভাব। যখনই দু'জনের চোখাচোখি হয়—মেয়েটী একটু হাসে। জন্ বেচারিও একটু না হেসে পারে না। কখনও কখনও দু'জনের ভেতর জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভাষায় দু'-একটা যে কথাও হয় না এমন নয়।

কর্ত্তাদের কাছ থেকে বোল্‌সের ওপর হুকুম ছিল মেয়েটীর ওপর লক্ষ্য রাখা। কিন্তু অনেক সময়েই কাজে তা' হ'য়ে উঠতো না। মাঝে মাঝে মেয়েটী তার বাগানের টাটকা ফল ছুঁড়ে দিত—আর বোল্‌সও কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে কামড় দিতে এক মিনিটও দেরী করতো না। মনে মনে তখন সে ভাবতো, মেয়েটী শত্রুর মত ভয়ঙ্কর গুপ্তচরই হোক্ না—বাগানে ফসল ফলাতে তার জোড়া নেই।

যতই কেন না মেয়েটীর সঙ্গে কথা বলুক আর তার ফলে কামড় বসাক—বোল্‌সের চোখ সব সময়েই সজাগ থাকতো। কেউ যেন না তাকে দেখতে পায়।

জন্ বোলস্ নিজেই পরে বলেছে—সত্যিই মেয়েটীকে সন্দেহ করবার কারণ ছিল। সে যেন আমাদের তাঁবুর ভেতরকার খবর জানতে চাইতো। প্রায় সব সময়েই মেয়েটীকে দেখতাম তার বাড়ীর জানালায় কিম্বা বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে—একদৃষ্টে আমাদের তাঁবুর ভেতর চেয়ে। হয়তো বা সে জার্ম্মানদের, আমাদের গুপ্তচরের সংখ্যা বা ওই রকম কিছু জানাতে চাইতো। মেয়েটীর বাড়ীর চারপাশে অধিকাংশ সময়েই আমরা পরিচিত কোন না কোনও জার্ম্মান চরকে দেখ্‌তাম—আমরা তাদের ওপর লক্ষ্যও রাখতাম। এমন কী কখনও কখনও তার বাড়ীর জানালায় নানারঙের সাঙ্কেতিক কাপড়ের পতাকাও উড়তো। আর এসব না থাক্‌লেও আমাদের তাঁবুর ওপর তার বিশেষ মনোযোগই তো সন্দেহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমি আশা করতাম যে, মেয়েটী আমার কাছ থেকে গুপ্তচর বিভাগের সব সংবাদ জানবার চেষ্টা করবে। তাই তখন প্রায় প্রত্যেকদিনই রক্ষী বদল হওয়া সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে থেকে গেলাম। আমার মনে কেন কে জানে মেয়েটীর রহস্য জানবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। মেয়েটীর কাছে কৈফিয়ৎ দিলাম যে, আমার কোনও পূর্ব্বপুরুষ জার্ম্মান থাকার দরুণ—আমাকে সন্দেহ করে' এখানে নজরবন্দী রাখা হয়েছে। ওরা ভেবেছে আমি জার্ম্মানদের ওপর অনুরক্ত।

"কিন্তু ওরা তোমায় এখানে রাখ্‌লে কেন?" মেয়েটী জিগ্‌গেস করলে। "মানে—এটা একটা বাজে কোণঘেঁসা জায়গা—এখানে থাকতে জার্ম্মানদের কোনও সাহায্য বা ফরাসীদের কোনও ক্ষতি করতে পারবো না এই আর কী!"

কিন্তু আমার এইসব কথার সুযোগ নিয়ে মেয়েটী সে-রকম কোনও কথাই তুল্‌লে না। আমাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিগ্‌গেস্‌ও করলে না। কেবলমাত্র আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো—কী মোহময় তার চোখ দু'টি! মেয়েটী চোখ নামাতেই আমি তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার তীক্ষ্ণভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি তখন জানতাম না, দূর থেকে কেউ এই ব্যাপার দূরবীণের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করছে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই তা' জান্‌তে পারলাম। দু'টী ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—সাধারণ পোষাক পরা। তাঁরা যে সৈনিকদলের এতে কোনও সন্দেহ ছিল না—কিন্তু জার্ম্মান কি ইংরেজ তা' বুঝতে পারি নি। তারা আমায় জিগ্‌গেস্ করলেন—ওই মেয়েটীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের মানে কী?

একজন আমায় স্পষ্ট বল্‌লেন—"দেখো, আমাদের সঙ্গে চালাকী করো না—আমরা তোমায় ওই বদমায়েস গুপ্তচর মেয়েটার সঙ্গে কথা কইতে দেখেছি। সে তোমায় কি একটা ছুঁড়ে দিয়েছে পর্য্যন্ত। আমরা গুপ্তচর বিভাগের গোয়েন্দা—আমাদের কাছে কিছু লুকিয়ো না—সব খুলে বলো দেখি।"

কিন্তু আমি তাদের তখুনি সব বুঝিয়ে দিলাম—তারাও তা' বিশ্বাস করলে।

...এইভাবে দিন যায়—এমন সময় মেয়েটীর কাছ থেকে আমার নিমন্ত্রণ এল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েটীর ব্যবহার, আদর-যত্ন দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হলো—সে জার্ম্মানদের গুপ্তচর। তার বাড়ীটা এমন একটু বিশেষভাবে সাজান-গোছান ছিল যে, আমার ধারণা দৃঢ় হ'ল। তার ব্যবহার দেখে মনে হয়—এই মেয়েকে অন্য কিছু হওয়ার চেয়ে গুপ্তচর হওয়াই মানায় ভাল। কিন্তু আমি তাকে তখন সন্দেহ-ই করেছি—তার চরিত্রের অন্যদিক্—ব্যবহারের অন্য বিশিষ্টতার দিকে চোখ দিই নি। আমার সেই মেয়েটীর গুপ্তচর হওয়া সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসই তখন আমার জীবনে একটা ভীষণ ভুলের কারণ হয়েছিল।

একটু চেষ্টাতেই জান্‌লাম মেয়েটীর বাবা ছিলেন জার্ম্মান, স্বামী ছিলেন এক ফরাসী ভদ্রলোক—তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন। আমি একবার দোতলায় যেতে চাইলাম—সব কিছু ভাল করে' দেখ্‌বার জন্যে। আমাদের তাঁবুতেই বা মেয়েটী কি দেখে আর কা'কেই বা সে কাপড় উড়িয়ে সঙ্কেত করে।

খানিক বাদেই দোতালায় গেলাম...কিন্তু ঘরে ঢুকেই যা' ঘটলো—আমি তখন স্বপ্নেও তা' কল্পনা করতে পারতাম না। মেয়েটী অসঙ্কোচে আমায় প্রেম-নিবেদন করলে।

ক্রমশঃ সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল—সব কিছু সন্দেহ আর ফন্দী গেল হাওয়ায় মিলিয়ে। মেয়েটী যুদ্ধে বিধবা হয়েছে—একা থাকে—জীবনে কিছু উত্তেজনা চায়। আমাদের মত যুবকদের সম্বন্ধে হয়তো তার একটু মোহ ছিল—তাই সে জানালা থেকে আমাদের দেখতো—অনুসরণ করতো না—আমাদের হাত নেড়ে ডাকৃতো—আর প্রলুব্ধ করবে বলে' রঙীন কাপড়-জামা টাঙিয়ে দিত—সেগুলো সাঙ্কেতিক নিশান নয়। ঠিক্ এই খবরই পরে গোয়েন্দা অফিস জানতে পারে—তাকে ধরে' আনবার পর। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—তার কাছে যে সব জার্ম্মান গুপ্তচর আসতো, তারা তাকে সন্দেহ করতো আমাদের দলভুক্ত বলে।

এরপর জন বোল্‌সের সঙ্গে আর মেয়েটীর দেখা হয় নি। কিন্তু দুঃখের কথা মেয়েটী জানলে না—বোল্‌সের মনের কথা—কেন সে তার প্রেম-নিবেদনে সাড়া দেয়নি। মেয়েটী আর জন্ বোল্‌স দু'জনে হয়তো এখন রয়েছে পৃথিবীর দু'প্রান্তে। মেয়েটীর কথা আমরা কি-ই আর জানি! কিন্তু জন্ বোলস্ এখন বিশ্ববিখ্যাত তারকা অভিনেতা—তার গান শুনে কে না মুগ্ধ হয়। কে জানে সেই দুর্ভাগ্য মেয়েটী তার ছবি দেখ্‌তে গিয়ে পুরানো দিনের কথা একবারও ভাবে কিনা!

মণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রেড্রিক্ মার্চ্চ

কুমারী অলকা দেবী

চিত্র-জগতের খাতায় এ নামটী খুব বেশী পরিচিত না হলেও, এ-লোকটীর অন্তর্নিহিত তীক্ষ্ণ প্রতিভা সম্বন্ধে কোন চিত্রামোদীরই জান্‌তে বাকী নেই এবং এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, তাঁর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশের জন্য দায়ী একমাত্র তিনি নিজেই। আর সেই জন্যই খুব বেশী পুস্তকে অভিনয় না করেই তিনি আজ এত শীঘ্র 'ষ্টার'-শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে গেচেন। ১৯৩২ অব্দে 'ডক্টর জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড' নামক পুস্তকখানিই তাঁকে সম্মানের এতখানি উচ্চশীর্ষে উন্নীত করেচে।

এঁর সর্ব্বশেষ পুস্তক, অর্থাৎ সব চেয়ে আধুনিক ছবি হচ্চে 'ব্যারেটস্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট্।' ছবিখানি 'গ্লোবে' উপস্থিত দেখান হচ্চে। এই বইখানিতে ইনি নর্ম্মা শিয়ারার সঙ্গে এত সুন্দর অভিনয় করেচেন যে, চোখে না দেখলে তা' সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। এঁর অভিনয়ে এইটুকু বিশেষত্ব যে, ইনি খুব সাংঘাতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষে এমন চমৎকার 'হিউমার' ঢুকিতে দিতে পারেন, যা' সত্যই প্রশংসনীয়। এমনও শোনা যায়, ডিরেক্টার-মহাশয় এঁকে হয় ত' বল্‌লেন: 'কাট্'—অর্থাৎ, থামো, তোমার বক্তব্য শেষ হয়েচে। উনি তখন সময়োপযোগী এমন একটা কথা উচ্চারণ করে' 'সীন' থেকে বেরিয়ে যান, যা' দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আমোদের বিষয় হ'য়ে

FREDRIC MARCH and NORMA SHEARER in "SMILIN' THROUGH"

ফ্রেড্রিক্ মার্চ্চ ও নর্ম্মা শিয়ারার 'স্মাইলিং থ্রু' নামক পুস্তকে

ওঠে—অথচ চিত্রের সৌন্দর্য্যের এতটুকু হানি হয় না। ঠিক এইটুকু বল্‌লেই চিত্র-জগতে মার্চ্চ কতবড় অভিনেতা এবং তাঁর ওজন কতখানি তা' অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

মার্চ্চের আর একটী বিশেষ গুণ যে, ইনি খুব ভাল 'এ্যাক্ট' করতে পারেন। এই 'এ্যাক্টিং'-এর ওপর ঝোঁক তাঁর ছেলেবেলা থেকে। স্কুল এবং কলেজ-জীবনে তিনি কত যে আবৃত্তি করেচেন এবং কত পারিতোষিক পেয়েচেন তা' বলা যায় না, তবে এই থেকেই তাঁর বরাবরের অভিনয়-প্রীতির কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই অভিনয় জিনিষটা ছেলেবেলা থেকে তাঁর হৃদয়ে এমন নিবিড়ভাবে গেঁথে গিয়েচে যে, প্রত্যেক দৃশ্যে ঢোক্‌বার এবং বেরুবার মুহূর্ত্তটিকে পর্য্যন্ত তিনি মূর্ত্ত করে' তুলতে পারেন। এই কথাটা যে মোটে অত্যুক্তি নয়, তা' 'ব্যারেটস্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট' বইখানি-ই ভালরূপ প্রমাণ করে' দেবে।

এবার এর নামের রহস্যের কথা একটু বলবো। এঁর নাম যে কি করে' ফ্রেডিক্ মার্চ্চ হ'ল, তা' একটু ভেবে দেখ্‌বার বিষয়। এঁর নাম ছিল ফ্রেডেরিক বিকেল্ এবং এর মার নাম ছিল মার্চ্চার। ইনি যখন প্রথম ষ্টেজে পা দিলেন, তখন নামের প্রথম দিক্‌টা ছোট করে' কর্‌লেন ফ্রেডিক্ এবং বিকেল্ তুলে মা'র নামের প্রথমাংশ জুড়ে করে' নিলেন মার্চ্চ। সেই থেকে অর্থাৎ মাত্র ১৯৩২ সাল থেকে তিনি হচ্চেন: ফ্রেডিক মার্চ্চ এবং এই ছদ্মনামেই আজ তিনি অপর্য্যাপ্ত যশের অধিকারী।

যতদূর দেখা যায় ফ্রেডিক্ অভিনয় করবার প্রেরণা নিয়েই যেন জন্মেছেন। কেন না মাত্র আট বৎসর বয়স থেকেই তিনি বেশ উচ্চাঙ্গের আবৃত্তি কর্‌তে পার্‌তেন। তাঁর বয়স যখন দশ কি এগারো, তখন একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছেলে নিয়ে তিনি একখানি বই আবৃত্তি করেছিলেন। তা'তে অধিকাংশ প্রধান চরিত্র একা তাঁকেই অভিনয় কর্‌তে হয়েছিল। ষোল বৎসর বয়সে ইনি একজন 'গ্রাজুয়েট' হন্ এবং ব্যাঙ্কিং পড়তে সুরু করেন। এদিক দিয়েও যথেষ্ট প্রতিভা দেখিয়ে তিনি এক ব্যাঙ্কে একটা চাকরী নেন। কিন্তু চাকরী তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তিনি অবসর সময়ে থিয়েটার প্রভৃতিতে অভিনয় করেও কিছু কিছু উপায় কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই দুইদিকে আবদ্ধ থেকেও কিন্তু তিনি লেখাপড়ার নেশা ত্যাগ করতে না পেরে উইন্ কন্‌সিন্-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ বছর বয়সে প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর কাজ হ'ল দিনে প্রফেসারি এবং রাত্রে থিয়েটার করা। তাঁর অভিনয় দেখে 'পেইং দি পাইপার' পুস্তকে বাড়তি হিসেবে অভিনয় করবার জন্যে 'হলিউড' থেকে তাঁকে আহ্বান করা হয়। ক্রমান্বয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে শেষে 'ডক্টর জেকিল' পুস্তকে তিনি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন এবং 'ষ্টার'-শ্রেণীভুক্ত হন্। তাঁর শেষ এবং সম্পূর্ণ নূতনতম 'ব্যারেট্‌স্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট্' পুস্তকে অভিনয় সত্যই অসাধারণ। শুধু অভিনেতা নয়, তিনি একজন খুব ভাল খেলোয়াড়। সব রকম খেলাই তিনি বেশ ভাল খেল্‌তে পারেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ইনি কুমারী এল্‌রিজ্‌কে জীবনের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে লাভ করেন। উপস্থিত তাঁর একটী মেয়ে হয়েচে—বয়স তার মাস ছয়েক এবং নাম হচ্চে পেনীলোপ্।

কুমারী অলকা দেবী
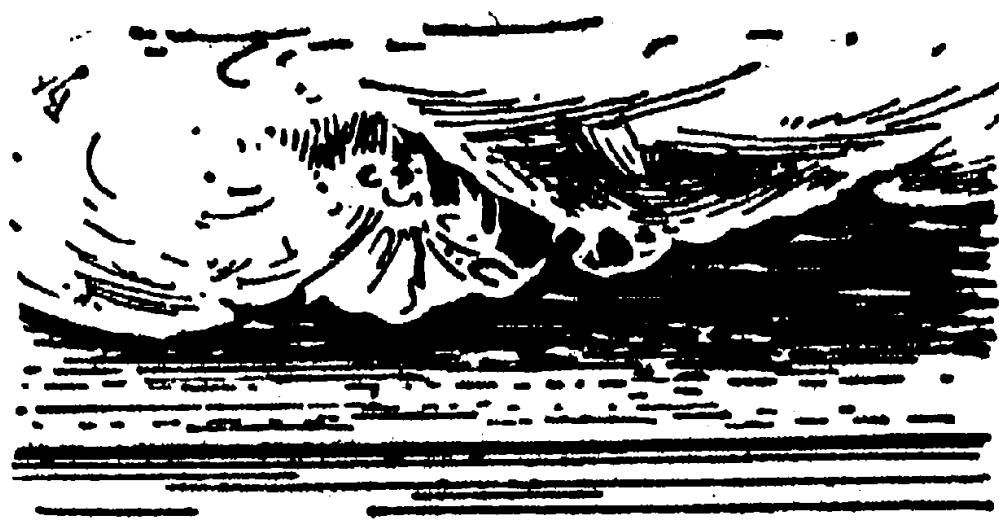
চিত্র-জগতের পঞ্চশস্য

শ্রীপ্রতিভা শীল

আমাদের দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্‌তে আমাদের ইচ্ছে করে, কিন্তু সেগুলি এতই মামুলি-ধরণের এবং সংক্ষিপ্ত যে, তা' দিয়ে সাধারণের মনে কোন বৈশিষ্ট্য আন্‌তে পারে না। কাজেই বিলেতী অভিনেতাদের নিয়েই আলোচনা করতে হয়।

* * *

চেষ্টার মরিস্‌ প্রত্যহ তাঁর বাড়ীর পুকুরে কি শীত, কি গ্রীষ্ম দশবার করে' পারাপার হন।

* * *

লীও ক্যারিলো তাঁর প্রাতরাশ 'সাণ্টামণিকা' পোতাশ্রয়ে তাজা মাছ ধরেই সম্পন্ন করে' নেন।

* * *

ম্যারণা লয় 'ইভলীন প্রেন্‌টিস্‌' নামক পুস্তকে অভিনয় করতে নেবে মন্তব্য করেচেন, চেহারা ফেরাবার একমাত্র প্রকৃত উপায় হচ্চে দু'বেলা খুব জোরে জোরে হাঁটা। এতে নাকি চিত্রে তোলবার উপযোগী চেহারা হয়। আমরা একথা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, তবে অভিনেতাদের দিক্‌ থেকে হয় ত এর কোন উপকারিতা আছে। নৈলে একজন নামকরা অভিনেতা এরকম মন্তব্য করেন কেন?

* * *

ডিরেক্টার উইলিয়ম হাওয়ার্ড কোনরকম ফ্যাসাদে পড়লে বা মনে দুঃখ হ'লে বেশ জোরে জোরে শিস্‌ দেন। তিনি নাকি বলেন: এই শিস্‌ হচ্চে 'কবরের বাঁশি!' (!!)

* * *

সবাক্‌-চিত্রে যোগ দেবার পূর্ব্বে রবার্ট ইয়ংকে পুরো সাড়ে চারবছর থিয়েটারে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েচে।

* * *

রেমন্‌ নোভারো তাঁর এক ভগ্নীর সঙ্গে নাকি আঠারো বছর পরে দেখা করেছেন। তবে দেখাটা সামাজিক ধরণের নয়। তিনি 'দি নাইট ইজ্‌ ইয়ং' পুস্তকে অভিনয় করবার জন্যে মেক্সিকো যান। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে তাঁর ভগ্নীকে দেখ্‌তে পান। নোভারো সাহেবের ভগ্নী-প্রীতি যে প্রশংসনীয় একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য।

* * *

ক্লার্ক গেবল্‌ একদিন তেলের কলে কাজ করেছেন। অথচ আজ তিনি একজন উচ্চদরের অভিনেতা। বায়োস্কোপের যুগ এসে কতজনের ভাগ্যচক্র যে কতদিকে ঘুরিয়ে দিয়েচে, তা' ভেবে দেখ্‌লে মাথা গরম হ'য়ে ওঠে।

* * *

আমাদের দেশের মেয়েরা (অবশ্য অতি আধুনিক নয়) স্বামীকে একখানা চিঠি লিখ্‌তে ঘরের আনাচে-কানাচে, ছাদের আল্‌সে প্রভৃতি নির্জ্জন স্থান খুঁজে বেড়ান এবং যদি-ও দয়া করে' লেখেন তাও ন'মাসে-ছ'মাসে একখানি। কিন্তু এলিজাবেথ এ্যালান্‌ তাঁর লণ্ডনস্থিত স্বামীর জন্য ডায়েরীর আকারে দৈনিক চিঠির একখানি বই করেচেন।

'নিউ থিয়েটারে'র 'ভূমিকম্পের পরে' বইখানি শীঘ্রই পরদার বুকে ফুটে উঠবে। বড়ুয়া-মশায় 'দেবদাস'কে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বিশেষ ব্যস্ত।

* * *

ডিরেক্টার ধীরেন গাঙ্গলী 'বিরোধী' পুস্তক নিয়ে মেতে উঠেচেন। শোনা যাচ্চে, বইখানির উর্দ্দু এবং বাংলা দু'টী সংস্করণই হবে।

* *

'রাজনটী বসন্তসেনা' গত পনেরই ডিসেম্বর 'চিত্রা'র পাদ-প্রদীপের বুকে ফুটে ওঠবার কথা ছিল। কিন্তু তারিখ পাণ্টে বাইশ-এ নাকি তিনি দেখা দেবেন শোনা যাচ্চে। আবার তারিখ পাণ্টাপাণ্টি না হ'লেই ভাল।

* *

'কালী ফিল্মে'র কর্ম্মকর্ত্তারা 'পাতালপুরী' দেখাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত। এই 'পাতালপুরী' গল্পটী নাকি কয়লার খনি নিয়ে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের লেখা!

* *

ডিরেক্টার প্রফুল্ল ঘোষ-মশায় 'পোষ্যপুত্র' বইখানি স্থগিত রেখে 'হরিশ্চন্দ্র' বই তুলচেন। শোনা যাচ্চে বইখানির তামিল এবং বাংলা দু'টী সংস্করণই নাকি হবে।

প্রতিভা শীল

পুস্তক সমালোচনা

১। মধুচ্ছন্দা (কবিতার বই) শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। এইখানি লেখকের প্রথম পুস্তক। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কথা বইখানির কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, বেশ সুন্দর স্বচ্ছগতি। কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছাপ পড়িলেও কবির প্রতিভা অস্বীকার করা চলে না। লেখকের হাত মিষ্ট।

২। স্রোত (উপন্যাস) শ্রীভুবনমোহন মিত্র প্রণীত।

প্রকাশক—'নারায়ণ-সাহিত্য-মন্দির', ৮, রাধামাধব গোস্বামীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

কয়েকটি গল্প লিখিয়াই লেখক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছেন। প্রথম লেখা হিসাবে এখানি মন্দ হয় নাই। প্রথমটা অমনোযোগের সহিতই বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইতেই কিন্তু পাঠের আগ্রহ বেশ বাড়িয়া গেল। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সুন্দর। ভাব ও ভাষা মন্দ নহে। উপন্যাস-প্রিয় পাঠকদের ইহা ভালই লাগিবে। প্লটের দিকে লেখকের আর একটু দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

৩। নারীর রূপ (উপন্যাস) শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত।

প্রকাশক—'বরেন্দ্র লাইব্রেরী', ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসঙ্গত।

বহুদিন হইতে লেখক বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন। এই উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক-রূপে 'পঞ্চপুষ্পে' বাহির হইতেছিল, তখনই আমরা মাসের পর মাস পরম আগ্রহে ইহা পড়িয়া গিয়াছি। লেখকের বলিবার ক্ষমতা অতি চমৎকার। ভাষা সহজ, সরল—কোথাও বড়-একটা অমসৃনতা লক্ষিত হইল না। ইহার সুন্দর গতি সহজেই পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়। সব চেয়ে বড় কথা—ইহার চরিত্রগুলি জলন্ত ও জীবন্ত। তাহারা সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। অতএব তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয়-লাভে এতটুকুও বাধা ঘটে না। এই তারুণ্যের যুগে লেখক যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই—সর্ব্বত্রই সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। বইখানি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে—এক নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিয়াছি।

৪। জামাই-ই-চোর—(শিশু-সাহিত্য) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৮, কাশীপুর রোড, বরাহনগর, দাম ছয় আনা।

ছেলেদের কয়েকটি গল্পের সমষ্টি।

যাহাদের জন্য লেখা, বইখানি তাহাদের বেশ ভালই লাগিবে। ভাষা অতি সহজ। যাহারা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে, তাহারা অনায়াসেই এখানি পড়িয়া যাইতে পারিবে। সবগুলি গল্প পড়িয়া অতিবড় গম্ভীর লোকও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। ছেলেদের তো ভাল লাগিবেই—এমন কি, তাহাদের দাদা-মহাশয়দেরও মন্দ লাগিবে না।

শ্রীবাণার বাহন

ভ্রম-সংশোধন—প্রেসের ভৌতিক স্পর্শে 'স্পর্শমণি' গল্পের লেখক শ্রীজিতেন্দ্রভূষণ বিশ্বাসের স্থলে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নাম বসিয়াছে। আশা করি লেখক-মহাশয় আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

গল্প-লহরী সম্পাদক

'রেড মর্নিং' চিত্রের একটী দৃশ্যে

ষ্টেফি ডুনা।

পঞ্চপুষ্প

একাদশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪২ | নবম সংখ্যা

দর্পের সমাধি

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

আমি বন্ধ্যা! শিশু মুখের মাতৃ-সম্ভাষণ আমার মত অভিশপ্তা ভাগ্যহীনার জন্য নয়!

আমারই তাঁবেদার ঝি-চাকর, আশ্রিত, প্রজা সবাই সভয়ে আপন আপন শিশুকে দূরে টানিয়া লইয়া যায়। আমি বুঝি সব, কিন্তু বলিতে পারি না কিছুই।

তিনটী ছেলে পথের ধারে খেলা করিতেছিল। কি মধুর তাহাদের বাল্য-চপলতা! দূর বাতায়ন পার্শ্বে আমি—হ্যাঁ, দেওয়ালের আবরণীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া। তাহারা নিম্নে, এতটা ব্যবধান, কিন্তু সে ব্যবধান দূরত্বের সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না—যেন হাত বাড়াইলেই আমি কোলে লইতে পারি।

পারি কি? নিজের অন্তরের নিকট এ প্রশ্নে আমি পরাজিত। বুকের ভিতর হইতে নির্ম্মম বাণী তন্মুহূর্ত্তে আমাকে ভালরূপে সজাগ করিয়া দেয়; মনে পড়ে—আমি কি?

একটি খেলনা, তাই লইয়া বিবাদ—"ওরে বাছা, ঝগড়া করিস নি—এই নে টাকা, কিনে আন্।"

চিলের মত তাহাদের মায়েরা আসিয়া 'ছোঁ' মারিয়া আমার সম্মুখ হইতে ছেলেদের দূরে লইয়া পলাইল। আমার দেওয়া দানে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিল না।

ব্যথায় বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি ইহাই যে আমার একান্ত পাওনা বোধে মুখ বুজিয়া বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ করিলাম।

—"ও কি, ও কি, ও কি গো, আহা! দুধের শিশু, কি অপরাধ তার ভগবান! আমি রাক্ষসী, হতভাগিনী! পাইক, পাইক, দরোয়ান!"

কিন্তু আমার হুকুম আর ত কেহই শুনিবে না—তবে কি, তবে কি শিশুটী কেবল স্পর্শ দোষেই মারা যাইবে।

—"রক্ত, রক্ত, ওঃ, কি রক্ত! এত রক্ত ওই শিশু দেহে থাক্‌তে পারে কি? ও গো, রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমার পাপের দণ্ড আমিই ভোগ করব! শিশু ও বমনে ক্লান্ত; আর না, আর না, হে ভগবান!"

চোখের উপর দেখিতে হইল মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে শিশু কোরকটীকে চিরদিনের জন্য লুকাইয়া ফেলিল।

সবার অনুরোধ রাখিতে হত্যা দিয়াছিলাম।

আশ্রিত অনুগতেরা বুঝাইয়া দিল—না, দয়াল বৈদ্যনাথ কোনদিন কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। এতবড় রাজ্যের রাণী আমি, পুত্র অভাবে শেষে কি পরে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিব?

গর্ব্বিতা! অর্থমদ আমায় মনুষ্যত্বের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, এই বুঝি ন্যায্য পথ। হুকুম যাহারা করে তাহারা ভাবে না, ভাবিতে পারে না, সেই হুকুম সে নিজে কতটা প্রতিপালন করিতে সক্ষম—পদমর্য্যাদা বাধা দেয়।

জাক-জমকের সহিত দেবতার পায়ে ভিক্ষার অঞ্জলি দিতে আসিলাম। সঙ্গে কিংখাপ-মকমল, হীরা-মাণিক, লোক-লস্কর যাহা আসিল তাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। কাঙ্গাল ভাব ত দূরের কথা—অবাক হইয়া লোকজন বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

দেবতার পশ্চাতে চরণামৃতের স্থান; হিন্দু মতে অতি পবিত্র। ঘৃণায় আমার কিন্তু বমনোদ্বেগ হইল। শত কলস জলে স্থান মার্জ্জনা করাইয়া মকমলের শয্যায় প্রসাদ কামনায় শয়ন করিলাম। শত দাসদাসী চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া পাহারায় রহিল।

চিরদিন উপবাসে অনভ্যস্ত। ধনলোভী পুরোহিত ধনী যজমানের মন রাখিতে ব্যবস্থা দিলেন—চরণামৃত পান, দেবতার প্রসাদ-ভোজন, ভোজনের মধ্যেই গণনীয় নহে।

প্রথম দিন কাটিয়া গেল দেবতা রাজ-আদেশের বাধ্য নহেন দেখিয়া মনে বিরক্তি ধরিল।

দ্বিতীয় দিন অন্য কোন্ দেশের অধিপতি পূজা দিতে আসিলেন। বিশ লক্ষ বিল্বদল তাঁহার সঙ্কল্প। শুনিয়া মনে হইল, সামান্য বিশ লক্ষে নাম কিনিতে চায়। থাক্, প্রতিশোধ পরে দিব—আশী লক্ষে ওর সঙ্কল্প যদি না ভূমিস্মাৎ করিতে পারি, তবে আমার রাণী পদবীই বৃথা!

দূরে কে যেন কাহাকে বলিল—"এমনি করে কি হত্যে দেয় না কি বোন্—এর নাম কি কায়মনে ডাকা? আড়-চোখে বেলপাতার চুপড়ী গুন্‌ছে শুধু। মাগী উঠে যায় না কেন?"

আমার হুকুমে মেয়েটীর শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

একটী একটী করিয়া বিশলক্ষ গণিয়া শেষ করা অসম্ভব। না, পাণ্ডারা তাহা করেও না; সাজির মাপ আছে, তাহাতেই কম-বেশী হিসাব হয়। সঙ্কল্পচ্যুত হইবার ভয়-ভাবনা মোটেই থাকে না।

অতবড় উঠান কেবল সাজিতেই ভরিয়া গেল। তন্দ্রার ঘোর আসায় বুঝিলাম না, পরে কি হইল। চক্ষু খুলিতেই দেখি সম্মুখে পাতার পাহাড়। ষাঁড়ে খাইতেছে। ছেলেরা চারিদিক বেড়িয়া লুকাচুরী খেলা খেলিতেছে।

হুকুম দিতে যাইতেছি—পাতা তুলিয়া শিবগঙ্গা বুজাইয়া দিক্; আমার বাতাস রোধ করা কেন?

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—একটা তাল পাকান বেলপাতার নুটি আসিয়া সবেগে আমার কোলে পড়িল।

জলিয়া উঠিলাম। আমার আদেশে জমাদার এক অতি সুকুমার শিশুর কান ধরিয়া নিকটে আনিয়া দাঁড় করাইল। হয় ত পাণ্ডাদের পুত্র, নয় ত অন্য কাহারও সন্তান। কিন্তু সে সময় উত্তেজনা অন্ধ করিয়াছিল—নহিলে অমন মনোহর কমনীয় দেহে কি করিয়া বেত্র-প্রহারের আদেশ দিয়াছিলাম।

নিমকের চাকর নিমকহালাল হয়—না, এ ক্ষেত্রেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? কিঙ্কর অক্ষরে অক্ষরে আমার দণ্ডাদেশ প্রতিপালন করিল।

উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ আবার নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল।

স্বপ্নে স্পষ্ট দেখিলাম—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—অত বয়সের লোক জীবনে কোনদিন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। পায় পায় নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যা গা, এখানে যা' চাও না, তার জন্যে লোক দেখান শুয়ে থাকা কেন ?"

মনে হয় স্বপ্নেই বলিলাম—" চাই না মানে ? কে এ কথা বল্‌লে তোমায় ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—"কেন গা, বল্‌তে হবে কেন ? এত পেয়েছ, পেয়ে শান্ত হবে কোথায়, না যে দিলে, তাকে দিলে দণ্ড ! একজন্ম নয় গো, শতজন্ম কাঁদলেও তোমার কোলে ছেলে পাবে না !"

আমি হাসিলাম। বলিলাম—"আমি রাণী, সাধারণে চায় ভিক্ষা, আমরা করি আদেশ। প্রহার যদি পুরস্কার হয়, তারই বদলে প্রথিত বিনিময় কর্‌তেই হবে, নচেৎ শাস্তির হাত হ'তে তোমারও রক্ষা নাই। বলো, দেবে কি না—বলো ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—"দিলাম। তোমার নিজের কোলে ত নয়ই, পরের কোলের ছেলেকে যদি কোলে তুল্‌তে যাও, সে তৎক্ষণাৎ রক্ত-বমনে—"

আর শুনিতে পারিলাম না, চীৎকার করিয়া উঠিলাম—না, না গো, এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না ! আমি সেই ছেলেকে খুঁজে এনে পুতুল খেলনা দিয়ে সন্তুষ্ট করব। ছেলের জাত বই ত নয়, ভুলে যাবে।"

অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল —"পারো, চেষ্টা করে দেখো—ছাড়বে কেন ?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলাম—"সামান্য একটা পাণ্ডাদের ছেলে, যার বাপ-পিতামহ চোদ্দ পুরুষ লোভী, তাকে লওয়াতে পারব না—বলো কি ঠাকুর ?"

পাহারাদার চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া 'মা মা' ডাকে তন্দ্রার কুহক দূর করিয়া চেতনা ফিরাইল।

বহু অন্বেষণেও পাইলাম না, সারা ধাম তন্ন তন্ন করিয়া প্রহরী দল খুঁজিয়া ফিরিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! সে বালককে অত ছেলের মধ্য হইতে কেহই বাছিয়া বাহির করিতে পারিল না।

জনকয়েক বালক দূরে দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসায় বলিল—"সে ত রোজ আসে ; আমাদের সঙ্গে খেলা করে, কত কি এনে খেতে দেয়। জিজ্ঞেস কর্‌লে কিন্তু নাম কি বাড়ী কোথায় বলে না ; হেসে ছুটে পালায়।"

সেই অবধি আর আদেশ কাহাকেও করিতে পারি না। জমাদার দয়াল সিংয়ের খসিয়া পড়া হাত দেখাইয়া স্পষ্টত সকলে বলে—"তোমার আদেশে ওই ত গতি, আর কাজ নেই—থাক্।"

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

স্মৃতি

শ্রীমতী কণিকা বসু

—"রোজই তাকে রাস্তায় ঠিক আমার জান্‌লার সাম্‌নে অপর দিকে ফুটপাতের ওপর বসে থাক্‌তে দেখি। তার দেহটী শীর্ণ, পরণের কাপড়খানি শতছিন্ন তালি দেওয়া, মুখখানি শুকিয়ে গেছে, চোখ দু'টী ছলছল কর্‌ছে, মাথার চুলগুলি রুক্ষ—বোধ হয় অনেক দিন হ'তে তেলের স্বাদ পায় নি। অত দারিদ্র্যের মধ্যেও তার আভিজাত্যের গৌরব পরিস্ফুট রয়েছে। বয়স তার দশ কি এগারো হবে।

—"তার মুখখানি যেন কত চেনা, সে যেন কত আপন, কিন্তু তবুও তাকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কিন্তু আজ প্রতিজ্ঞা করে জান্‌লার ধারে বস্‌লাম—ওকে ডাক্‌বোই ডাক্‌বো। কিন্তু কাজে তা' আর হয়ে উঠ্‌লো না। আজ বিকেল হতেই বৃষ্টি নেমেছে। আমি জান্‌লার ধারে বসে আছি—কিন্তু সে আসে নি।

—"সেও এমনি এক বাদলার দিন। সে আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাক্‌তো। দেখ্‌তাম যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, মনে হ'ত, যেন একযোড়া কালো চোখ আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন বয়স আমার একুশ কি বাইশ হবে, আর তার পনেরো কি ষোল। দেখ্‌তে তাকে মন্দ নয়। লম্বা টানা চোখ, যোড়া ভুরু, ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং ফরসা—মোটের ওপর সে সুন্দরী। তারা আমাদের বাড়ীর পাশে আসবার কিছুদিন বাদেই দেখি যে, আমাদের বাড়ীতে তাদের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। মাঝে মাঝে সে একাই আসতো এবং আমার পড়ার ঘরে আমার বই-খাতা ঘাঁট্‌তো। মাঝে মাঝে আমার বইগুলো নিয়ে পিয়নের কাজ কর্‌তো। তাদের মধ্য থেকে ছোট ছোট চিঠি পেতাম। তা'তে তার নাম জান্‌লাম রাণী। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার পড়ার ঘরে দেখা হয়ে যেত। দুটো কথা বলেই সে বেরিয়ে যেত।

—"এই রকম ভাবেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। আমিও তার সঙ্গে চিঠি বিনিময় কর্‌তাম। এই আলাপ ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হলো। যত দিন যেতে লাগ্‌ল, তত যেন তাকে পাবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে তার যৌবনের উপর কলঙ্কের রেখা টেনে দিলাম। তারপর জানাজানির কিছুদিন বাদে শুন্‌লাম, সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আমিও একদিন বেরিয়ে পড়লাম। সে আজ বছর দশ কি এগার হবে।

—"তারপর একদিক মেঘলা করে আছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। আজ দেখ্‌লাম, সে চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছে। আমি জান্‌লাটি খুল্‌তেই সে আমার সাম্‌নে এসে একটুকরো কাগজ দিলে। কাগজটীর ওপর দেখ্‌লাম আমার নাম। আশ্চর্য্য বোধ হলো! ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমাকে কে দিয়েছে?'

—"সে বল্‌লে—'মা।'

—"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'তোমার মা কোথায় থাকেন?'

—"আমার বাড়ীর সাম্‌নে একটী অন্ধকার ছোট গলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লে—'ওইখানে।'

"—'আমাকে চিন্‌লেন কি করে?'

"—'আমি জানি না, আমাকে শুধু দিতে বল্‌লেন।'

"—'তোমার মায়ের নাম কি?'

"—'বলতে বারণ আছে। একটু তাড়াতাড়ি আসুন, মায়ের বড় অসুখ—বোধ হয় বাঁচবেন না।'

—"আমি তাড়াতাড়ি অফিসের ছাড়া জামাটী পরে চটী যোড়া পায়ে গলিয়ে বল্‌লাম—'চলো।'

—"সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো; আমিও চল্‌লুম।

—"কিছুক্ষণ পরে একটা খোলার ঘরের সাম্‌নে এসে হাজির হলাম। সে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ কর্‌লে। আমাকে ডাক্‌লে। আমি প্রবেশ করে দেখ্‌লাম যে, ঘরের মধ্যে একটী হ্যারিকেন্ জ্বল্‌ছে। অপর দিকে দেখ্‌লাম যে, একটী জীর্ণ বিছানার ওপর একটী রমণী শুয়ে আছে। দেখে মনে হয়, পূর্ব্বে তার সৌন্দর্য্য ছিল, এখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। রমণী ঘুমোচ্ছিল। আমাদের গৃহ-প্রবেশের শব্দে জাগরিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'পতু, বাবা, এলি ?'

"—'হ্যা মা। সেই বাবুটী এসেছেন।'

"—'এসেছেন ? কই বাবা, ডাক্ না তাঁকে।'

—"গলার স্বরটা পরিচিত হলেও কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আস্তে আস্তে তার জীর্ণ বিছানার একপাশে বস্‌লাম। রমণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'তুমি এসেছ ?'

—"তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লে—'আমি জানি তুমি আস্‌বে, তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার অনেক কথা—'

—"আমি বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লাম যে, সেই রমণীই আমার যৌবনের রাণী! সে আমার বিস্মিত চাহনির দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বল্‌লে—'চিন্‌তে পার্‌ছো না ? আমি তোমার রাণী। এবার হয়েছে ?'

—"আমি রাণীকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম—'রাণী, আমার এত কাছে থেকেও তুমি এতদিন আমাকে খবর দাও নি ? আমি যে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি। এখনও আমি তোমার আশায় বসে আছে। আজও আমি অবিবাহিত। বলো রাণী, কেন এ রকম ভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিলে—আমায় কেন খবর দাও নি ? আমি কি আস্—'

—"রাণী বাধা দিয়ে বল্‌লে—'যা' হবার তা' হয়েছে। এখন শোনো—সেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেছে। দু'দিন বাদে আমি তোমার বাড়ীর কাছে গিয়ে শুন্‌লাম যে, তুমিও না কি বেরিয়ে পড়েছ। আমার তখন দুঃখ হলো—কেন তোমাকে খবর দিই নি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হলো যে, হয় ত মিথ্যা কথা। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি কি দুঃখে বেরোতে যাবে—বড়লোকের কুৎসা ত সহজে রটে না। কিছুদিন বাদে হাসপাতালে পতু হলো। সেখানে মাস-খানেক থেকে শরীরে বল পাবার পরই আমি ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। ভদ্রলোকের মেয়ে আমি। কি করি—লজ্জার মাথা খেয়ে একজনের বাড়ী চাকুরী নিলাম। তারপর আজ দীর্ঘ দশ বছর তাদেরই অন্নজলে পতুকে মানুষ করেছি। ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। আর আমি না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছি। এখন তুমি যদি ওকে—'

—"আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম—'তোমার কোন ভাব্‌না নেই। তুমি শুয়ে থাকো।'

—"পতুকে তার মায়ের কাছে বসিয়ে আমি ডাক্তার ডাক্‌তে বেরিয়ে গেলাম।

—"পতু মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'মা, উনি কে ? তুমি ওঁকে ডেকেছিলে কেন ?'

—"মা বল্‌লে—'পতু, উনিই তোমার বাবা। আমি ত মরে যাব, তুমি ওঁর কাছে থাক্‌বে। ওঁকে অমান্য করো না। এতদিন…'

—"আর তাকে কথা শেষ কর্‌তে হলো না।

—"কাশ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো এবং মুখ দিয়ে চাপ চাপ রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে কাশিরও শেষ হলো যখন, তার দেহটাও তখন নিশ্চল পাথরের মত হ'য়ে গেল। পতু আছাড় খেয়ে মায়ের বুকের ওপর পড়্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

—"অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

—"রাণীর শীতল বুক থেকে তখন ধীরে ধীরে তার স্মৃতিটী তুলে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লাম। এই আমার জীবনের সম্বল রাণীর দেওয়া স্মৃতি!…"

শ্রীমতী কণিকা বসু

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]
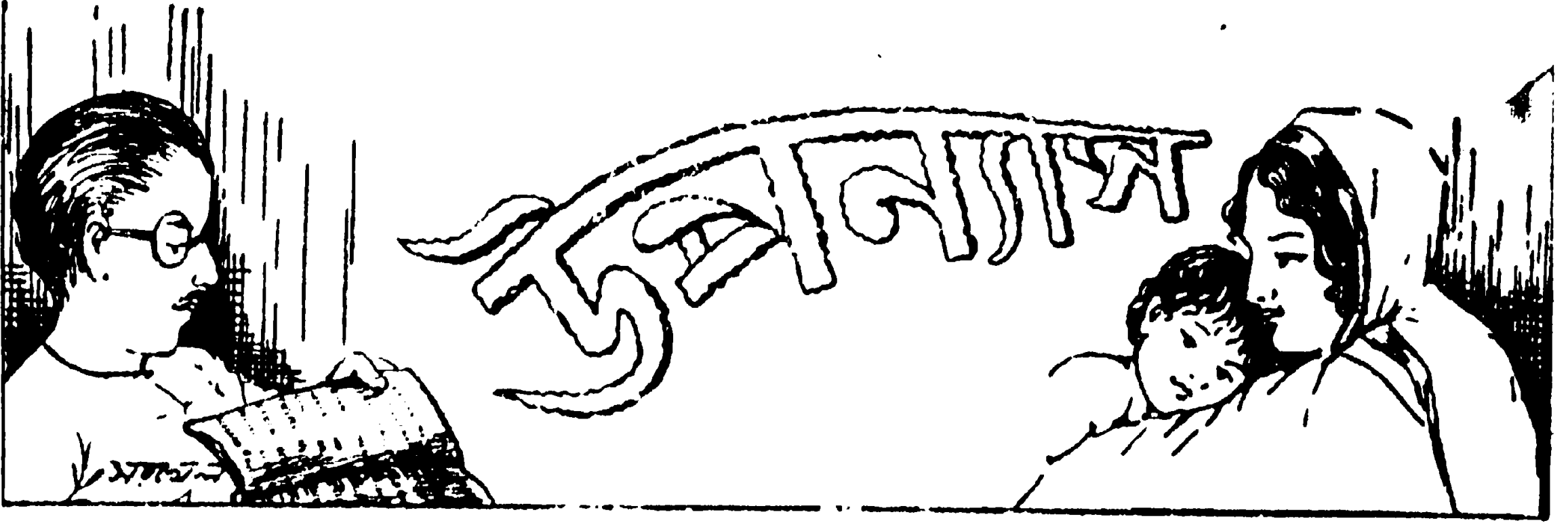
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পনেরো

ভুলিব বলিলেই যদি ভোলা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বোধ করি সংসারে এত বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাই থাকিত না।

যতটা সহজ এবং সরলভাবে অমর বর্ত্তমান জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিল, ঠিক্ ততটা কেন, তাহার কণামাত্রও সে সফল হইল না। সরযূর এই নির্লিপ্ত ব্যবহারটুকই তাহাকে পর্ব্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়া তুলিল। মনের গহন তলে ঘুমান অনেকদিনের অনেক কথাই তাহার স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্রে যে কয়টি কথা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একান্ত অকারণেই উঠিয়াছিল, আজ কারণের দিনে তাহাই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিব্রত, বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

সেদিন অজয়কে লইয়াই ছিল তাহাদের আলোচনার বিষয়। অমর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বন্ধুর প্রশংসাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পত্নীও যাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে ওই আত্ম-ভোলা লোকটীর প্রতি সদয় ব্যবহার করে তাহার জন্য রীতিমত অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছে।

সরযূ লাজুক মেয়ে নয়—বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়া। স্বামীর এই অহেতুক উচ্ছ্বাসের ফল যে ভাল নাও হইতে পারে ইহা ধরিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। সে বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—মানুষের মন বড় চঞ্চল, তাই আজিকার যাহা সত্য, কালিকার পক্ষে প্রয়োজনে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া দাঁড় করাইতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। বিশেষ, মেয়েদের লইয়া যে কত ঘটনা ঘটে, তাহার ত কথাই নাই। বাহিরের বন্ধুত্ব বাহিরে বাহিরেই মানায়, অন্তঃপুরে না ঢুকানই মঙ্গল।

কিন্তু অমর তাহা স্বীকার করে নাই। কিংবা মানুষ সে, ও দুর্ব্বলতাকে না মানাই তাহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, অজয়কে লইয়া কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহা সে কল্পনায়ও আনিতে চাহে না।

তথাপি সরযূ বলিয়াছিল—শতাব্দী গৌরব লইয়া বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নাই। আজও বহু বিগত শতাব্দীকেই মানুষের চরম উন্নতির দিন বলিয়া অনেকে পূজা করিয়া থাকেন। উপমা দিতে হইলে রাম রাজত্বের উল্লেখ হইতে বিলম্ব হয় না। সীতার অগ্নি-পরীক্ষাকেই সমাজ ধর্ম্মের জলন্ত সাক্ষ্য বলিয়া নাক নড়িয়া উঠে। তা' ছাড়া, সত্যকথা বলিতে কি, আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে উন্নতি হইলেও মানুষ যে দুর্ব্বল প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারিয়াছে ইহা সত্য নহে, এবং কোনদিনে

কোন কালেও যে পারিবে না, ইহা স্থির নিশ্চিত। তবু যদি অমর জেদ করে, তাহাতে সে প্রতিবাদ করিতে পারে না—কেন না, মহাভারতে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান যুগে তাহার পরিবর্ত্তনের অঙ্কুরও দেখা যায় নাই। তবে স্বামী-দেবতার কথা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে আজ তাহাকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, অজয়ের সহিত মেলামেশা লইয়া কোনদিন কোন কারণেই সে কোন কৈফিয়ৎ দিবে না। অমর সকৌতুকে বলিয়াছিল—তথাস্তু!

সেদিনকার সেই সরযূ আজও তেমনই আছে—কিন্তু অমরের সে সুখ আজ কোথায়?

শেফালীর নিকটও স্বামীর হৃদয়-বিপ্লবের কথা লুকান ছিল না, তাই সরযূদের প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিলেও অনুতাপের তাহার অন্ত নাই। সেই ত স্বেচ্ছায় এ বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। স্বামীর নিতান্ত অনিচ্ছায় কেনই বা সে জোর করিয়া এতবড় কাণ্ড ঘটাইয়া বসিল। বসিল যদি ত, শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতেই পণ করিল না কেন?

অমরের সেবায় তাহার অন্তর চিরজাগ্রত ত ছিলই, তাহার উপর আরও সহস্রগুণ সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সে হৃদয়ের অপূর্ণ অংশটুকু দু' হাত দিয়া, যেন সে এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু তাহা যে কোন-ক্রমেই তাহার দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় না।

তাই সেদিন যখন পূর্ব্বেরই মত আনন্দপূর্ণ-কণ্ঠে আসিয়া অমর তাহাকে ডাকিল—শেফা! তখন শেফার সারা অন্তর কি এক অপূর্ব্ব রসে বিভোর হইয়া গেল। সে দীপ্ত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে ফেলিয়া বলিল—কি?

—ও কি সত্যি?

—কি সত্যি গা?

—কান্তর মা যা' বল্লে—

আবীর রঙে শেফার গাল দু'টি কে যেন 'খপ্' করিয়া আসিয়া ছোপাইয়া দিয়া গেল। সে কাপড়ের খুঁট্টা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ও মা, এরই মধ্যে বলে দিয়েছে! তোমার ছেঁড়া জামাটা না হয় আশুই হ'ল—গরীব বামুনটাকে দিয়েছিলুম তাই—

অমর শেফাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—সে অত বোকা নয় যে, একটা জামার খবর আমায় দেবে। আমায় খবর দিয়েছে—

সই-এর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নের খবর বুঝি? তা'—

—তা' বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলে, না? না, সে ও কথা বলে নি, সে বলেছে তোমার নিজের ছেলের—

—ওঃ, তাই বুঝি খানিক আগে আমাকে একখানা নোট দেখিয়ে গেল। বলে, বাবু দিয়েছে, আর হাসে…

—তা' দিতে হবে বই কি শেফা। আমাদের বংশধর আস্‌ছে, তার সম্মানের জন্য এটুকু না করলে সে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে?

—তা' বটে বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া শেফা বলিল—কিন্তু যে আন্‌ছে, তাকে কি দেবে ত কই বল্লে না?

—ওঃ, তা' বলা হয় নি বটে এতক্ষণ। তার জন্যে এনেছি যে বলিয়া পকেট হইতে একছড়া নেক্‌লেশ বাহির করিয়া অমর শেফালীর সম্মুখে ধরিল।

মুক্তাগুলা যেন ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শেফা পরম বিস্ময়ে সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—ভারী, ভারী চমৎকার কিন্তু! কত নিলে গা?

—কত আর—পাঁচশো।

—পাঁ—চ—শো! ও মা, এতগুলো টাকা নাহক্ খরচ করে এলে।

—কর্‌লাম বই কি, তবে এ আমার টাকা নয়।

—তোমার নয়?

—হ্যাঁ গো। আজ কান্তর মা যখন বেরুবার মুখে খবর দিলে, তখন পকেটে যা' ছিল তাকে তাই দিয়ে দিলুম বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম—যদি বেশী কিছু পাই, তা' হ'লে তোমার জন্যে যা' হোক্ একটা কিছু আন্‌তেই হবে। যা' পাব আজ—তোমার। দেখি শেফুরাণীর বরাত বলে ত বেরিয়ে পড়্‌লুম। তারপর না দেখা না শোনা হঠাৎ একেবারে পাঁচশো টাকা আগুন্তি দিয়ে এক জমিদার তার

একটা 'কেস্' আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। অনেক টাকার দাবী 'কেস্'টা ও শক্ত, তা' হোক্—এ 'কেস্' আমি জেতাবই! একেবারে বেণীমাধব দত্তর দোকান থেকে এটা নিয়ে এসে বাড়ী উঠেছি। একটু জলখাবার বন্দোবস্ত কর শেফা। জমিদারের ছেলে, তায় মুন্‌সেফ্—'কেস্' সম্বন্ধে আলোচনা করতে এখানে আজ সন্ধ্যার পরই আস্‌ছেন; তাঁকে একটু যত্ন-আত্তি করা ত উচিত।

কাজের কথায় শেফালীর অন্তরটা যেন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল—নিশ্চয়! কিন্তু বাজারের খাবার একটীও আনা হবে না, সব আমি কর্‌ব—কি বলো?

—বেশ ত!

শেফালীর উৎসাহ কিন্তু মুহূর্ত্তেই শিথিল হইয়া গেল। সে বলিল—কিন্তু...

—আবার কিন্তু কি শে—

—আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমার রান্না পছন্দ হবে ত—

—না হ'লে তাঁরই বরাত মন্দ বল্‌তে হবে। আমি ত আগেই বলেছি শেফা, তোমার হাতে খাবার ভাগ্য সকলের থাকে না—দেখ্‌লে না, একদিনও থাক্‌তে পার্‌লে না, সরে পড়তে হ'ল। এ ধর্ম্মের সংসার শেফা, এখানে ভগবানের দয়া না পেলে কেউ সেঁধুতে পারবে না।

কোথা হইতে কোথায় গিয়া কথাটা দাঁড়াইল শেফালীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাও সে প্রথমটা ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাই খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—ও কথা বলো না। আর যাই হোক্, তিনি দিদি, গুরুজন, তাঁর নিন্দে শুন্‌লেও আমার পাপ হয়!

—হওয়াই ত উচিত কিন্তু সত্যি কথা ত নিন্দে নয় শেফা, বরং মিথ্যে কথাকে সত্যি করে ধরে নিলে নিন্দে আছে! ক' দিন আমিও ওসব ছাইপাঁশ ভেবে মাথা গরম করেছিলুম। আজ ঠিক্ করেছি, অন্যায় যা' তা' চিরদিনই অন্যায়—তাকে কোন কিছুর মোহেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যেমন করেই হোক্, তার স্মৃতি পর্য্যন্ত মন থেকে মুছে ফেল্‌তে হবে। যাক্ ও কথা, তোমায় কি কি আনিয়ে দিতে হবে বলো ত?

শেফালী মনে মনে হাসিল কি না কে জানে! কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিল না।

সে প্রসঙ্গ যতটা চাপা পড়ে, ততই ভাল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল।

কিন্তু তাহার চেষ্টাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে বিধাতা পুরুষ কৃপণতা করিলেন না।

ষোল

সন্ধ্যার পর অতিথি সমাগমে সারা বাড়ী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটা অকারণে একবার উপর একবার নীচে করিতে লাগিল।

কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া শেফালীও একবার আড়াল হইতে জমিদারের ছেলেটিকে দেখিয়া গেল।

মোকর্দ্দমার কথাবার্ত্তা শেষ হইল। জলযোগ-পর্ব্বটা না সারিয়া কোনমতেই বিদায় লওয়া সম্ভব নয় বুঝিয়া অতিথি বাধ্য হইয়া অমরের সহিত উপরের ঘরে আসিয়া বলিল।

শেফালীকে সত্যই রন্ধনে দ্রৌপদী বলা চলে। এই সল্প সময়ের মধ্যে সে যে আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে অমর পর্য্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল।

খাইতে বসিয়া অতিথি কণ্ঠও বারবার মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অতিথি বলিল—দেখুন অমরবাবু, এখানে আসা পর্য্যন্ত একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব বলে ভাব্‌ছি, কিন্তু অশোভন হবে ভেবে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করি নি। যদি ভরসা দেন—

অমর সাগ্রহে বলিল—বিলক্ষণ, সচ্ছন্দে বলুন আপনার কি বলবার আছে। কিন্তু হবার কি আছে এতে।

অতিথি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এখানে আসা থেকে আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে

যাচ্ছিল—এখন ওপরে এসে খেতে বসে আরও গুলিয়ে যেতে বসেছে। এমন করে ত রাঁধতে পারতেন বলে একজনকে আমি জানি—তিনি সরযূ দি'। মাপ করবেন, কুসুমপুর গ্রামে গিয়ে আমার তাঁর সঙ্গে দৈবচক্রে আলাপ হয়। আনন্দের বিষয়—এই বাড়ীর ঠিকানাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এখানে এলেই তাঁর দেখা পাব। এরপর কোন চিন্তাই আস্‌ত না, কিন্তু ক'দিন আগে আমার স্ত্রীর একখানা চিঠি এই ঠিকানায় এসেছিল, সেখানা ফেরৎ পাওয়ায় মুস্কিলে পড়েছি। আরও মুস্কিলে পড়েছি এই ভেবে—সরযূ দি' এখানে থাক্‌লে আমার সঙ্গে দেখা করতেন না, এ কথা বিশ্বাস করাই শক্ত। আরও একটা কথা মনে হচ্ছে—অজয় দা'ই বা কোথায়? দিদি ত তাঁকে ছাড়া এক মিনিটও থাক্‌তে পারেন না! আহা, বেচারীর দু' হাতই···

অমরের মুখখানি মড়ার মত শাদা হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—দুটো হাতই...

—তাও বুঝি জানেন না? কলে কাজ করতেন, একদিন অসাবধানে দুটো হাতই ওঁর কলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল—অনেক বলে-কয়ে হাজার তিনেক টাকা কোন রকমে আদায় করা গেছল। যাক্‌, কোথায় গেলেন বলুন ত?

আর্ত্তকণ্ঠে অমর বলিল—জানি না!

—জানেন না? এখানে কি আসেনও নি না কি—আশ্চর্য্য!

বাহিরের দরজাটা নড়িয়া উঠিল। অমর সেদিকে লক্ষ্যও করিল না। দৃঢ় পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল—কিন্তু কুলটাকে রাখা সম্ভব নয় বলেই তারা এখানে থাক্‌তে পারে নি।

—কুলটা! অসীমের হাত হইতে খাবার থালার উপর পড়িয়া গেল। সে ততোধিক দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—অসম্ভব! আপনি কি বল্‌ছেন, সরযূ দি' কুলটা...অযথা একজনের নামে অমন করে বলা উচিত নয়—আপনি আপনার কথা প্রত্যাহার করুন অমরবাবু।

—কিন্তু সে একজন নয়, সে আমার স্ত্রী! মিথ্যা বলা আমার স্বভাব নয়। ওই যে অজয়ের কথা বল্‌লেন, ও ছিল আমার বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওরই সঙ্গে অনেক দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে গেছে। এসব রেঁধেছেন, আমার এ বাড়ীর সত্যকার গৃহিণী যিনি, তিনিই। যদি খেতে অসুবিধা হয়, অনুরোধ করব না—তবে কিছু না ফেলে গেলেই বেশী আনন্দিত হব। কেন না, তিনি আপনার জন্যে অনেক—

—না না, ফেলে যাব কেন, খাচ্ছি আমি বলিয়া অসীম মাথা হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার অন্তরে যে প্রবল ঝড় বহিতে সুরু করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার মত শক্তি তাহার ছিল না—কোন মতে সবগুলা খাইয়া ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোন রকমে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বাহিরে আসিয়া উন্মত্তের মত জনস্রোতের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিয়া তিক্ত চিন্তার হাত এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এমন একটা বিসদৃশ ঘটনা যে ঘটিতে পারে এজন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না—বিশেষ করিয়া শেফালীর সারা শরীর যেন লজ্জায় ভাঙিয়া যাইতে চাহিতেছিল। সে প্রাণপণ প্রযত্নে স্বামীকে প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াও যখন পারিল না, তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া অনেকক্ষণ বারান্দায় নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সন্তর্পণে চোরের মত যখন এক সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও পাষাণ মূর্ত্তির মত অমর খাটের উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—তুমি শুনেছ শেফা, অজয়ের দুটো হাতই কলে কাটা গেছে। এখনো চন্দ্র-সূর্য্যি উঠ্‌ছে, এতবড় অত্যাচার সহ্য হবে কেন?

শেফালী কথা ত কহিতে পারিলই না, কোন্‌দিকে ঘাড় নাড়িবে ঠিক্‌ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যার পরে

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সবাই বলে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না?

না না, কে বলেছে? বেশ ভালো আছো তুমি।

আমি শুনেছি, কাল্‌কে কারা বলাবলি কর্‌ছিল। তোমরা ভেবেছিলে, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তুমি ঘুমোও।

কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেলে কি সব কথা মনে থাক্‌তো? আমি তো কিছুই ভুলি নি। সব বল্‌তে পারি, সব মনে আছে—একটির পর একটি– সব।

তা' তো থাক্‌বেই। তুমি ঘুমোও।

ঘুমোতে চাইতো। ঘুম যে আসে না। চোখ বুজ্‌লেই সব কিছু চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

কথা কোয়ো না। দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে।

তোমরা দেখো, আমি ঠিক্ বেঁচে যাবো।

তা' তো যাবেই। তুমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

তোমরা আমাদের বাঁচাতে এসেছো, না? শুনেছ, বন্যার জলে আমরা মারা যাচ্ছি, তাই ছুটে এসেছো। তোমরা খুব ভালো। খুব দয়া তোমাদের। কিন্তু কেন এলে?

যাদের বাঁচাতে এসেছো তারা তো বাঁচ্‌তে চায় না। কি নিয়ে তারা বাঁচ্‌বে—বানের জলে আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে বেঁচে থাক্‌তে কি ইচ্ছে হয়? আচ্ছা, মরে গেলে কি তাদের দেখা পাওয়া যাবে?—খোকার—মণির—এদের?

* * *

বাইরে বিষ্টি হচ্ছে, না?

হ্যাঁ।

সেদিনও বিকেলে এমনি বিষ্টি হচ্ছিল। নদীর জল ফুলে উঠেছিল। চারদিকে জল ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্প জল, পায়ের পাতাও ডোবে না।

কথা কোয়ো না। এইতো চোখ বুজেছিলে। আবার বোজো তো?

বুজেছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় জল আরো বেড়েছিল। বেশী নয়। আমাদের উঠোনেও ওঠে নি। গাঁ-শুদ্ধ লোকই ভেবেছিল জল আর বাড়বে না। চারদিকে কত দিন ধরে বিষ্টি হয় নি। আর ওইটুকু বিষ্টিতেই নদী ক্ষেপে উঠবে, তা' কেউ আন্দাজ কর্‌তে পারে?

তুমি কথা কইলে আমি চলে যাবো, বুঝ্‌লে?

রাগ করো কেন? কথা বল্‌লে সত্যি আমি মর্‌বো না।

সন্ধ্যের একটু পরেই খেতে বসেছি। আমরা আগ্‌রাত্তিরেই খাই। বেশী রাত কর্‌লে বড্‌ডো তেল পোড়ে। গরীব মানুষ। খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে আঁচাতে এলাম। দেখি, ও মা, জল উঠোনে উঠেছে।

তুমি কি বকবক্ করে বক্‌বেই শুধু?

না। হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন-কোসন সব মণি মাচায় তুলে রাখ্‌লো। তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। আমরা শুয়ে পড়লাম। জল ঘরের ভিত পর্য্যন্ত উঠবে ভাবিও নি। ভেবেছিলাম, নদীতে জোয়ার এসেছে। নেমে যাবে একটু পরেই। বাদ্‌লার দিন। ঘুম এলো চেপে।

বেশ তুমি কথাই কও। আমি চল্‌লাম।

না না, যেয়ো না। বেশ, এই চুপ কর্‌ছি।

* * *

দুপুর রাত্রে হঠাৎ জেগে গেলাম, বুঝ্‌লে। চারদিকে লোকজন চেঁচাচ্ছে। শুনতে পেলাম—বান আস্‌ছে—বান আস্‌ছে। শিউরে উঠলাম।

আগে কি মোটেই বুঝতে পারো নি—বান আস্‌বে বলে।

নাঃ, কক্ষণো তো দেখি নি বান। এ গাঁয়ের কেউও ত দেখে নি। কি করে বুঝ্‌বো? ভেবেছিলাম, জোয়ারের জল। একটু বেশী জোয়ার হয়েছে।

তারপর?

মেঘের ডাকের মত শব্দ শুন্‌তে পেলাম। সে শব্দ আর থামে না। ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে তুলে নিলাম। আচম্‌কা জেগে সে কেঁদে উঠ্‌লো। মণির হাত ধরে এক টান মার্‌লাম। ধড়মড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। তার হাত ধরে টেনে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, পাহাড়ের মত কালো একটা ছায়া ছুটে আস্‌ছে—অনেকখানি জুড়ে। দু'দিকে তার সীমা নেই। কী তার হুঙ্কার! বুদ্ধি ঠাওরাতে পার্‌লাম না। সময় কোথায়?

খোকাকে বুকে চেপে ধর্‌লাম—খুব জোরে। মণির হাত ধরে নিয়ে গেলাম নারকোল গাছটার গোড়ায়। বল্লাম—গাছটা জড়িয়ে ধরে থাকো—শক্ত করে। কিছুতেই ছেড়ো না।

তাই সে কর্‌লো। দেখ্‌তে পেলাম, ভয়ে সে কাঁপছে। খোকাকে বুকে করেই আমিও জড়িয়ে ধর্‌লাম গাছটা। আমার চাপ খেয়ে খোকা চেঁচিয়ে উঠলো।

জল এসে পোড়লো। মণির একটা আর্ত্তনাদ শুন্‌লাম, আর কিছু না। তারপর কি হলো বল্‌বার ক্ষমতা নেই। দম আটকে আস্‌তে লাগ্‌লো। গাছ ছেড়ে দিলাম। খোকাকে ছাড়লাম না। পা বাড়িয়ে নিয়ে হাতড়ে দেখ্‌লাম মণি নাই। সে ভেসে গেছে—জলের সঙ্গে ভেসে গেছে!

সর্ব্বনাশ! আমিও যে গল্পে মেতে উঠেছি। কেঁদো না ভাই, কেঁদো না। লক্ষ্মী ভাইটি, কেঁদো না।

কাঁদ্‌বো না। তুমি বিয়ে করেছো বাবু? কর নি, না? তবে কেমন করে বুঝ্‌বে? বুঝ্‌বে না। মণি যে আমার কি ছিল, তা' বুঝ্‌বে না। তাকে আর দেখ্‌তে পেলাম না। আমার আশপাশ দিয়ে কত স্ত্রীলোক ভেসে গেছে—কিন্তু মণিকে আর দেখ্‌তে পেলাম না!

সে হয় তো বেঁচে আছে। ভাল করে খোঁজ কর্‌লে পাওয়া যাবে। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমায় সঙ্গে করে খোঁজ কর্‌বো। আমরা তো চিনি নে। কথা কোয়ো না। তা' হ'লে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠ্‌বে। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতো।

পাওয়া যাবে? ভালো করে তুমিই খোঁজ কর না বাবু। তার মাথার চুল বেঁকা বেঁকা। সিঁথের মাঝখানে একটা ফোড়া কাটার দাগ আছে। গায়ের রঙ ফর্‌সা। কপালের বাঁদিকে একটা তিল আছে—

না, পাওয়া যাবে না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি—মণিকে আর পাব না। আচ্ছা, কোথাও দেখেছো বুঝি তার মরা দেহটা পড়ে আছে? আর গাঁয়ের লোক বুঝি বল্‌ছিল যে, ও মণি?

আমি কিছু বোল্‌বো না। তুমি চুপ করে ঘুমোও।

আচ্ছা, আমি চুপ কর্‌ছি। তুমি বলো।

না, আমি ঘরে থাক্‌লে তুমি কিছুতেই চুপ কর্‌বে না।

যেয়ো না—যেয়ো না। আচ্ছা যাও। বুঝেছি, তুমি থাক্‌তে পার্‌ছো না এখানে। কিন্তু মণিকে যদি দেখ্‌তে পেয়ে থাকো, একবার বলো। তার দেহটা সৎকার করা হয়েছে শুনলেও যে আমি শান্তি পাব। সে নেই, তাতো আমার মনই বল্‌ছে।

* * *

ও কি?

ওষুধ খাও।

না। জানো বাবু, আমার খোকা মর্‌বার সময় একটু ওষুধ পায় নি।

খাও।

না। ওষুধ খেয়ে আমি কার জন্যে বেঁচে উঠ্‌বো?

ইচ্ছে করে না বাঁচা যে পাপ ভাই।

হোক্ পাপ। আমার বুকে যে আগুন জ্বল্‌ছে, পাপ কি তার চেয়ে বেশী করে পুড়িয়ে দিতে পার্‌বে আমায়।

খাও, লক্ষ্মীটি।

তুমি অমন করে কেন বলো। আমি তোমার কে? কেন আমায় বাঁচাবে? না, খাব না ওষুধ।

তুমি রাগ করছো? আচ্ছা দাও; খাচ্ছি ওষুধ।

এই তো ভাল মানুষ।

খোকাকে বুকে করে আমি ভেসে যাচ্ছিলাম, বুঝ্‌লে? খোকার তখন জ্ঞান নাই। আমি আর পারছিলাম না। ভগবানের দয়া। দয়া! যাক্। দেখ্‌লাম, কাছে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা তক্তপোষ। উঠে বস্‌লাম তার ওপর। খোকাকে কোলের উপর শুইয়ে দিলাম।

কথা কোয়ো না।

কিছুতেই খোকার জ্ঞান হয় না দেখে আমি কেঁদে ফেল্‌লাম।

চুপ করো।

তক্তপোষে উঠেছিলাম সকালবেলা। আমার সারা দিনের কান্না বোধ হয় ঈশ্বর শুন্‌তে পেলেন। বিকেলবেলা খোকার জ্ঞান ফিরে এল।

ঈশ্বর! ঈশ্বর কি সত্যই আছে বাবু?

একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর না।

* * *

রাত তখন শেষ হয়ে এসেছিলো। চারদিকে অথৈ জল। তার মাঝে তক্তপোষের উপর বসে আমি ভাস্‌ছি। আমার কোলে খোকা ছট্‌ফট্ করছে। তার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে তখন। কলেরা। বুঝ্‌তে পার্‌লাম। বন্যার ওই জল সারাদিন সে খেয়েছে। তেষ্টা পেলেই খেয়েছে। তার চেয়ে ভাল জল কোথায় পাবে?

আবার বুঝি কথা কইতে আরম্ভ করলে।

কলেরা হ'ল তার। আমিও তো খেয়েছি সে জল— আমার কেন হলো না?

একটু থামো না। বকে বকে মাথা যে গরম করে তুলেছ। ঘুম আস্‌বে কেমন করে?

আমার কোলে খোকা ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। জল জল ব'লে সে চেঁচাতে লাগ্‌ল। অনবরত চীৎকার। সে জল কি কলেরা রোগীকে দেওয়া যায়? না দিয়েও পার্‌লাম না। না দিলে সে গড়িয়ে তক্তপোষের ধারের দিকে চলে যায়—জলের দিকে। একফোঁটা ওষুধ পাবার তো উপায় নেই।

সেই জলই খেতে দিলে?

তবে আর কি দেবো? জানি সে জলে অপকার করবে। অশিক্ষিত একেবারে নই আমি বাবু। চাষা হলেই কি মূর্খ হয়? কিন্তু বুঝ্‌লাম, বাঁচবে না। ভাবলাম, মরার সময় জল না পেয়ে যাবে কেন? ভগবানের দেওয়া সেই অথৈ জল আঁজলা আঁজলা তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লাম বাবু।

উঃ!

পরদিন দুপুরবেলা সে আর জল খেতে চাইল না। আর চাইবে না কোনদিন। আমার কোলের ওপর সে মরে গেল—আমার চোখের সাম্‌নে!

কেঁদো না ভাই। ও সব মনে করে কি হবে?

আর আমি এখন ওষুধ খাচ্ছি। জল খাচ্ছি। উঃ! খোকা! খোকা! ফিরে আয়! ওরে, ফিরে আয়! ভাল জল তোকে খেতে দেবো। ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তুল্‌ব তোকে। আয় বাপ্, আমার, আমার কোলে আয়! ওরে ফিরে আয়—

ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! শীগ্‌গির আসুন একবার। আবার প্রলাপ বক্‌ছে। কি যে করি! খালি কথা কইবে।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বড় দিন

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

নদীর ধারে কাঠুরেদের পল্লী।

চারধারে ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গল। মাঝখানে ছোট এক এক ফালি উঠান ঘিরে গুটিকতক ঘর। মাটির দাওয়া, খড় দিয়ে ছাওয়া—তাও পর্য্যাপ্ত নয়। চালের ওপর কোথাও বা একটা কুম্ড়া, লাউ বা শশার মাচা। এই ঘরগুলায় বাস করে পাঁচ সাত ঘর কাঠুরে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, বালক-বৃদ্ধ সকলে মিলে। তাদের গৃহস্থালীর আস্বাব দু'-চারটে মাটির হাঁড়ী-কলসী, পিতল-কাঁসার দু'-চারখানা বাসন-কোসন, ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, কাপড়-গামছা, আর গৃহস্থের পোষ্য দু'-একটা গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল নিয়ে।

তেল পুড়িয়ে আলো জ্বালবার সঙ্গতি নেই তাদের কারুরই; তাই ভগবানের দেওয়া আলোর সদ্ব্যবহার করে তারা পুরামাত্রায়। সকলেরই সেরে নিতে হয় সন্ধ্যার আগেই তাদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া। তারপর পুরুষেরা হয় ত দড়ি পাকায়, কিংবা সখ কারো নেহাৎ বেশী হ'লে, সামর্থ্য ও সঙ্গতি থাকলে মাছধরার জাল বোনে, নয় ত দু'-চারজন একত্র বসে একটু-আধটু গাল-গল্প করে। তাও নিজেদের সুখ-দুঃখেরই কথা—স্বল্প আয়ে অভাব মেটে না তারই কথা। তিন-চার মাইল দূরের সহরের বাবুদের কথা—যারা সস্তাই শুধু খোঁজে, গরীবের দুঃখ-বেদনার কথা কিছুতেই বুঝ্তে চায় না একটুও। যে বাবুরা চায় দু' আনার কাঠ ছ' পয়সায় কিন্তে, যারা বোঝে না তার কি করে ছ'পয়সা, দু' আনায় চাল মিল্বে, বোঝে না যে, পরিবারে তার ছ'টি লোক খেতে—বুড়ো মা, তিনটি ছেলে, আর তারা স্বামী স্ত্রী—তাদের মুখে দিতে দু' আনার চাল পর্য্যাপ্ত নয়। যে বোঝা বইতে তার হয় গলদঘর্ম্ম, সেই বোঝাই মনে হয় না বাবুদের কাছে যথেষ্ট বড়। রোজের পর রোজ সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে, আর দা-কাটা তামাক টানে, নয় ত বসে বসে ঝিমোয়।

কেউ যদি দু'-পাঁচসের ধান কেন্বার সংস্থান কর্তে পারে, তবে মেয়েরা পাতার জ্বালে তাই সিদ্ধ করতে বসে; নয় ত চেটাই বিছিয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের খাটুনীর পর চোখ আসে ঘুমে জড়িয়ে। ছেলেমেয়েগুলি সুরু করে বিরক্ত করতে। ভাইবোনের সেই চিরন্তন রেষারেষি, ঝগড়া-নালিশ, মান-অভিমান।

'মা ফের এদিকে বল্‌ছি'—হয় ত বল্লো একটা ছেলে।

তার আবদারে ঘুম-জড়ান চোখেই মা হয় ত নিলে তাকে কোলের কাছে একটু টেনে; অমনি আর একটির হ'ল অভিমান এবং সুরু কান্নার। মা এর ওপর রাখে একটা হাত, তার ওপর আর একটা, তখন হয় ত ঘুমন্ত কোলের ছেলেটা ওঠে কেঁদে, মাই দিতে হয়। এর মাঝেই হয় ত অন্য ছেলে দুটো পড়লো ঘুমিয়ে, কিংবা করলো সুরু নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি, মারামারি। ছোট ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে না পেরে মা হয় ত ওঠে ধমকে, নয় ত উঠে দেয় লাগিয়ে ঘা কতক দুটোরই পিঠে। ওঠে কান্নার কলরোল। কোন মা হয় ত বলে রূপকথা—জ্যোছনা রাতে নদীর বুকে চাঁদের আলো মিলে সৃষ্টি করে তার 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড'—সুন্দর। তারপর একে একে সবাই পড়ে ঘুমিয়ে, চন্দ্রতারা থাকে তাদের দিকে চেয়ে।

আধভাঙ্গা এব্ড়োখেব্ড়ো পাঁকাটির বেড়ায় ফাঁকের অন্ত নাই; ওপরে আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢোকে; তাই ঘরের অধিবাসীদের চোখ কচ্লে বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠতে হয়—গৃহস্থালীর দিনের কাজ আরম্ভ করবার সূত্রপাতে। অবশ্য-কৃত্য নিত্যকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছোটে ঘাটে জলের

কলসী নিয়ে, ছেলেরা নিয়ে চলে তাদের পোষা গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া যা' থাকে দু'-একটা। সকালেই উনুন ধরিয়ে হয় ত চা দিতে হয় চাপিয়ে, দুটো ভাতে ভাত বা আর কিছু; নয় ত পান্তা কি দু'টী মুড়ী খেয়ে পুরুষেরা চলে যায় নিজের কাজে। একেবারে কিছু না খেয়ে কি করে কাটবে ওদের সারাটা দিন—প্রথমে বনে কাঠ কাটতে এবং সেখান থেকে তিন মাইল দূরে সহরে নিয়ে বিক্রী করবার চেষ্টায় ঘুরতে। সহজে যদি বিক্রী হয়, তবে ত কোন কথাই নাই, পয়সায় যেমন কুলায় চাল-ডাল এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক সওদা যথাসম্ভব সেরে ফিরে চলে বাড়ীর দিকে। বিক্রী যার হয় না, সে ঘোরে সহরের পথে পথে যতক্ষণ না তার পা ওঠে অবাধ্য হয়ে, সূর্য্য না পড়ে পশ্চিম গগনে ঢলে। শেষটায় বেচতে তাকে হয়ই—দাম যাই হোক্। নইলে ছেলেপিলে খাবেই বা কি, আর ফিরবেই বা কি করে মাথায় বয়ে অতবড় বোঝার ভার সারাদিনের পর ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত দেহে। ফিরে গিয়ে হয় ত দেখ্‌বে মেয়েরা বসে আছে দিনের কাজ শেষ করে পথের দিকে তাকিয়ে, আর ছেলেগুলির চল্‌ছে তখনও দাপাদাপি।

এই তাদের সংসার, এত সামান্য তাদের অভাব। এমনি ভগবানের বিচিত্র লীলা যে, কেউ কুটোটি পর্য্যন্ত না নেড়ে দিব্যি চর্ব্ব্যচষ্য লেহ্যপেয় দিয়ে উদর পূর্ণ করছে, আর কেউ হয় ত সারাদিন খেটেও পারচে না একমুটো চালের সংস্থান করতে। আর কিছুই চায় না তারা, নদীতে জল আছে, গাছে পাতা আছে, কুমড়া আছে, লাউ আছে, শশা আছে, হয় ত আটদিন আগে যে নুন কেনা হয়েছিল, তারও খানিকটা এখনও আছে—আরও দিন দু'-তিন বোধ হয় তাতেই চলবে, এক ফোঁটা দুধ—তাও ঘরে হয়, সময় থাক্‌লে মাছও দুটো ধরা যায়। কিন্তু তাও জোটে না, এই ত তাদের দুঃখ।

স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া হয়, মান-অভিমান চলে। ক্ষুধার সময় ক্রোধের উদ্রেক হয় সহজেই, তাই কোনদিন দেয় লাগিয়ে ঘা কতক পরিবারের পিঠেই।

এমনি চল্‌তে চল্‌তে এল তাদের সেদিন—যেদিন বছর বছরই আসে বর্ষার প্রারম্ভে। যেদিন পাহাড়ে নদীটাতে ঢল আসে হু হু করে নেমে, ভেসে আসে অজস্র কাঁচা শুক্‌না ছোটবড় গাছ, কাঠ। জল নদীর বুক ছাপিয়ে উপ্‌চে ওঠে, তলিয়ে দেয় আশপাশের ছোট বড় গাঁগুলি দু'-একদিনের মত।

এদিনটা তাদের বড় দিন, বড় সুখের দিন। এদিন জমা কাঠ ধরে যে যত বেশী পুঁজি করে রাখ্‌তে পারবে, তার হবে তত বেশী সুবিধা, ততবেশী অর্থাগম। হয় ত বা তারই থেকে দু' পয়সা বাঁচিয়ে সে দিতে পারবে পরিবারকে একখানা রূপার গয়না বা ছেলেকে একখানা রঙিন দোলাই। এই দিনটার দিকে চেয়ে তারা মাসের পর মাস দেয় কাটিয়ে, আশা নিয়ে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—যা' হয় ত হবে না পূর্ণ কোনদিনই। তবু আশায় থাকে।

ভোর হ'তে-না-হ'তেই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ জম্‌ল এসে নদীর পারে খেয়াঘাটার সাম্‌নে—নিতান্ত অসমর্থ ছাড়া যার কেউ রইল না তাদের ঘরে। সমস্ত পাড়াটা হয়ে গেল স্তব্ধ এবং জনশূন্য।

আগের রাত্রি থেকেই টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সকাল থেকেই সুরু হ'ল ঝড়ের মাতন, বৃষ্টির জোরও বাড়তে লাগ্‌ল ক্রমে। তা'তে নূতনত্ব নেই কিছুই, এমনই হয় বরাবর।

দুর্য্যোগের দিনে মাঝি মাত্র একবারটি পারে যাবে—সরকারী 'ডাক্' পার না করলেই নয়। এপার থেকে ওপার এবং ওপার থেকে এপার—নইলে ঘাট হয়ে যাবে বেহাৎ। সকাল থেকেই পারার্থীরা এসে জমতে থাকে—সেই খেয়ার প্রত্যাশায় থাকে বসে। সন্ধানী মুড়কীওয়ালাটা চিঁড়ে-মুড়কী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়—বিক্রীও হয় মন্দ নয়, দরও পায় বেশ।

নিষ্কর্ম্মা লোকগুলার কাজ থাকে না; কর্ম্মী যারা, তাদের অনেকে সেদিনের মত নিষ্কর্ম্মা। সবাই এসে জড়ো হয় ঘাটের পাশে উঁচু টিলাটার ওপর। কারও মাথায় থাকে ছাতা, কারও বা শুধু গামছাখানা ভাঁজ করা, আর

কেউ বা নিতান্তই নগ্নশির—তার চুল বেয়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টির জল, মুখ বুক সব একাকার করে দিয়ে।

সেখান থেকে ভাটির দিকে দেখা যায় বাঁকের মাথায় অদূরে কাঠুরে-পল্লী, ক্ষেত-খামারে, নদীর চড়ায় জল থইথই, কাঠরেদের উঠানেও জল উঠি উঠি কর্‌ছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় গৃহবদ্ধ পালিত পশুদের দূরাগত অনতিস্পষ্ট করুণ প্রশ্ন—ঘরেই কি থাকৃব আজ আমরা বদ্ধ! কিন্তু আজ সময় নেই তাদের মালিকদের সেদিকে কান দেবার, আজ তাদের বড় দিন।

যেমনই দেখ্‌তে পায় আস্‌ছে ধর্‌বার মত একটা গাছ বা কাঠ ভেসে, অমনি বলিষ্ঠ সবল পুরুষের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর জলে—ধরবার আশায় যেতে থাকে স্রোতের অনুকূলে জোরে সাঁত্‌রে। ছুঁতে পার্‌লেই স্বত্ব জন্মে যায়। যে ছোঁয়, সে তাতে দড়ি বেঁধে ফেরে; অপরে ফেরে আগেই। ঝগড়া-ঝাটী হয় না, মারা-মারি ধরাধরি হয় না, সন্দেহ যদি কখনও হয়, মীমাংসা হয় তার সহজেই, আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় না। পুরুষেরা দড়িটা নিয়ে সাঁত্‌রে ফেরে পারের দিকে; স্রোতে তাদের ঠেলে ভাটির দিকে। পারের লোকগুলি থাকে তার সঙ্গে দৌড়ুতে। দড়িটা পারে পৌছে দিয়েই তারা খালাস। তারা করে বিশ্রাম, অপেক্ষা করে আবার নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার আশায়। ততক্ষণ অন্যেরা সেগুলি পারে টেনে তুলে স্তূপীকৃত করে। ক্ষুধার সময় এক ফাঁকে দু'টি কিছু মুখেও দিয়ে নেয়।

এম্‌নি চলেছে সকাল থেকে—যেমন চলেছে বছরের পর পর বছর খেয়াঘাটের জমায়েৎ পারার্থীদের সাম্‌নে কাঠুরে-পাড়ার অধিবাসীদের জীবন-যুদ্ধের এক পর্ব্ব। ভেসে যায় পোকা-মাকড়, সাপ-খোপ নদীর স্রোতের সঙ্গে তীর বেগে—যেমন ভেসে যায় গাছ ও কাঠ। বোধ হয় ভেসে আস্‌ছে একটা বেড়াল—শোনা যাচ্ছে তার অতি করুণ মিউমিউ শব্দ। ক্রমে অস্পষ্ট স্পষ্টতর। বোধ হয় কেমন করে জলে পড়ে গেছে। অই দেখা যাচ্ছে, একটুকুরো কাঠ আঁকড়ে, পারের থেকে দূরেও নয় বেশী। একদল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে আন্‌ল।

কয়েকজন পারার্থী পারের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ভাঙন ধরেছে!'

সবাই উঠ্‌ল এক সঙ্গে চম্‌কে। ছুট্‌ল প্রাণের ভয়ে—আর ভাঙন-ধরা শিথিল মূল প্রকাণ্ড চাপড়াটা হঠাৎ এতগুলো মানুষের ছুটে চলার নাড়া সাম্‌লাতে অসমর্থ হয়ে লোকগুলো পালাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বসে পড়্‌লো।

'নদী যেন আজ রাক্ষসী হয়েছে। খেয়েছিল এখনই এতগুলি লোককে'—তারা বলাবলি কর্‌ছিল।

দুপুরের কাছাকাছি বৃষ্টি এল ধরে, থাম্‌ল বাতাসও, কিন্তু নদীর জল কমবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 'ডাক্' এসে ততক্ষণ পৌচেছে। লোকগুলি উঠেছে খেয়াতে। গুণদড়ি বেঁধে খেয়া নৌকো টেনে নিয়ে চলেছে উজানের দিকে—অন্ততঃ এক মাইল উজান ঠেলে না গেলে ওপারের ঘাটে যাবে না নৌকো লাগানো। সাঁতারু কাঠুরেরাও চলেছে সে নৌকোয় দেখ্‌তে যদি পায় সংগ্রহ করবার মত কাঠ, তা' হ'লেই তারা লাফিয়ে পড়বে জলে। কাঠুরেদের দৃষ্টি উজানের দিকে নদীর জলে, পারার্থীদেরও অনেকের।

একটা কাঠ আস্‌ছে ভেসে।

বেশ বড়। অই যাচ্ছে দেখা—অই পড়্‌লো বলে এসে নৌকোর সাম্‌নে। শাল কাঠই হবে হয় ত, দামী কাঠ। ডাল নেই, পাতা নেই, তীরের মত সোজা, জলের ওপর ভেসেও নেই বেশী।

চল্‌তে লাগ্‌ল জল্পনা-কল্পনা—হয়ে গেল গাছটার দামও আন্দাজ।

চোখের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তেই গাছটা এসে পড়্‌লো নৌকোর সাম্‌নে। পড়্‌লো সব ক'জন কাঠুরে এক-যোগে লাফিয়ে। পারার্থীদের এবং কাঠুরেদের আত্মীয়-স্বজনের সমবেত দৃষ্টি পার থেকে হয়ে রইল নৌকো এবং ওদের উপর নিবদ্ধ। দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে স্রোতের টানে গাছটা গেল প্রায় পাঁচশ হাত ভাটির দিকে ভেসে। বোধ হয় গাছ এবং কাঠুরেদের মধ্যের ব্যবধান এখন আর দশ হাতও নয়—কিন্তু ভেসে যাচ্ছে তারা তীরের বেগে। তিনজন কাঠুরে গেছে এগিয়ে—তারা কাঠটাকে অই ধর্‌ল বলে।

হঠাৎ গাছটা উঠ্‌ল নড়ে, খাড়া হয়ে উঠ্‌ল পিঠে এক সার বর্ষাফলকের মত কাঁটা, তারপর সেকেণ্ডখানেকের মধ্যে একটা ভীষণ তোলপাড়! পারার্থীরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'কুমীর, কুমীর!'

শোনা গেল দূরাগত বুকফাটা কান্নার অস্পষ্ট একটা সম্মেলিত আর্ত্তধ্বনি—আর দেখা গেল, যে দু'জন কাঠুরে একটু পিছনে ছিল, তাদের তীরে পৌঁছাবার একটা প্রাণপণ আগ্রহ।

কতটুকু সময়ই বা, কিন্তু তারই মাঝে নদীবক্ষ আবার শান্তভাব ধারণ করেছে—যেন কিছুই ঘটে নি।

বিস্মিত স্তব্ধ করুণার্দ্র পারার্থীদের নিয়ে খেয়া নৌকো চল্‌তে লাগ্‌লো পারের দিকে।

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

ছায়া ও কায়ালোক

সঞ্জয়

[চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। গল্প-লহরীর পাঠক-পাঠিকার সুবিধা-কল্পে এই স্তম্ভের সৃষ্টি করা হইল। দেশী ও বিলাতী সমস্ত নূতন ছবির এবং থিয়েটারের নূতন পুস্তকের আলোচনা বিশদভাবে ইহাতে দিবার চেষ্টা করা হইবে। সুপরিচিত 'সঞ্জয়' এই স্তম্ভ নিয়মিত লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গঃ লঃ সঃ]

থিয়েটার বায়স্কোপের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই একটা ভয় হয় যে, অভিভাবকরা মনে করেন, আমাদের এই লেখাই না কি পতঙ্গের মতো ছেলে-পিলেকে আকর্ষণ করে। এই কথার মূলে কতোখানি সত্য, তার বিচার তথাকথিত ছেলে-পিলে ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তার আরো একটা প্রমাণ কোলকাতায় 'মেট্রো-সিনেমা' খোলা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই, কাগজে ছবির কোন অভিমত বেরোবার আগেই যে রকম দর্শক সমাগম হয়েছে এবং হচ্ছে, তখন আর এ বিষয়ে আমাদের কিছু প্রতিবাদ করবার প্রয়োজন থাকে না।

*

'মেট্রো-সিনেমা' খাস য্যামেরিকান্ কোম্পানী। তাঁরা টাকার জোরে কারুরই তোয়াক্কা রাখেন না। শোনা যাচ্ছে ওখানকার প্রতি জিনিষটী বিদেশী; দেশী কোন জিনিষেরই তাঁরা সংস্পর্শ রাখ্‌বেন না। এমন কি, অন্যান্য থিয়েটার বায়োস্কোপের মতো কোন 'ট্রেড্‌-শো'-ও করবেন না। তাঁদের ছবির নাকি ও-সবের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দশ দিন আগে পর্য্যন্ত যখন 'গ্লোবে'র তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন অবধি ও-সবের প্রয়োজন ছিল। দেশটা তবু য্যামেরিকা নয়—কোলকাতা। কিমাশ্চর্য্যম অতঃপরম্!

*

কবির কথাই মনে পড়ে: 'শীতের হাওয়ায় বসন্ত-ফুল ফোটে যদি মনের বনে!'—কোলকাতায় দেখছি বড়-দিনের আমেজ লেগে সমস্ত থিয়েটার বায়স্কোপ মেতে উঠেছে। যেন বড়দিনের পরবটা খ্রীষ্টানদের ছেড়ে হিন্দু-দেরই একচেটে হয়ে উঠ্‌বে! প্রথমতঃ থিয়েটারের কথাই ধরা যাক্—শিশিরবাবুর 'নাট্য-মন্দিরে' তাঁর 'রীতিমত নাটক', 'মিনার্ভায়' 'শিবার্জ্জুন', 'নাট্য-নিকেতনে' 'নরদেবতা', 'রঙ-মহলে' 'চরিত্রহীন' এবং 'রূপ-মহলে' 'আবুলহাসান'—প্রত্যেক জায়গাতেই নতুন নাটক খোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বায়স্কোপ প্রতিষ্ঠানগুলির ত কথাই নেই, তাঁরা নিত্য নতুন ছবি নিয়েই মেতে আছেন—তার সঙ্গে নতুন নতুন বাড়ীর পরিকল্পনা-ও চলেছে। আমরা সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, এই প্রার্থনা করি।

*

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম' কোম্পানীর মিঃ চামেরিয়া এবং মিঃ বি, এল্, খেম্‌কা মিলিতভাবে 'প্যারাডাইস্' সিনেমা প্রতিষ্ঠা করছেন। দু'জনারই লক্ষ্য না কি 'মেট্রো'কে-ও উঁচিয়ে যাবার। তাঁদের চেষ্টাও সফল হোক্।

*

'বিংশ-শতাব্দী' চিত্রের বিখ্যাত পরিচালক ড্যারিল জানুক্ য্যাবিসিনিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'জিব্রাল্টার' নামে একখানি ছবি তুলছেন, খবর পাওয়া গেছে।

শিশু অভিনেত্রী শার্লি টেম্পলকে 'ক্যাপ্টেন জ্যানুয়ারী' নামক ছবিতে শীঘ্রই দেখা যাবে। একজন আলোকস্তম্ভ-রক্ষী একখানি বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে একটি মেয়েকে রক্ষা করার পরের ঘটনা নিয়েই বুঝি এই বইখানির গল্প লেখা হয়েছে।

*

নতুন বইগুলি দেখে, আগছে সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আজ এই পর্য্যন্ত।

সঞ্জয়

ঋণ-শোধ

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম-এ

বড় রাস্তার ধারে সরু গলি, ভিতরে পশ্চিম মুখে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার মোড় হইতে গলির শেষ সীমা দেখা যায় না। দু'ধারে খানকতক পাকাবাড়ী তারপর খানকতক মাঠকোঠা, তারপরে খোলার ঘরের বস্তি। বস্তিতে বাস করে হরেক রকমের মানুষ। মেয়েরা সকালে উঠিয়া সরকারী কলের কাছে জটলা করে, চেঁচামেচি করে, পুরুষেরা উঠিয়া কেহ যায় চটকলে, কেহ যায় পাটের গুদামে, কেহ বড় রাস্তায় পান-বিড়ির দোকানে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া খায়-দায়, নেশা করে, হল্লা করিয়া গান-বাজনা করে, কোনদিন বা মেয়ে-পুরুষে ঝগড়া, গালিগালাজ করে, এ ওকে পিটাইয়া দেয়—আবার দু'দণ্ডেই ভাব হইয়া যায়। এমনই জীবনযাত্রা কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ঠিক নাই।

গলির মোড়ে একটা গ্যাসপোষ্ট, তাহার পরে দু'ধারে যে কয়েকখানি পাকাবাড়ী—তাহার বাসিন্দারা সন্ধ্যাবেলা সাজগোজ করিয়া শীর্ণ মুখে রঙ মাখিয়া নিকেলের গহনাগুলিকে 'ব্রাসো' দিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ঝকঝকে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়ায়, কেহ বা আবার একটা বিড়িও ধরাইয়া লয়। কাহারও বা দু'একঘণ্টার পরই দাঁড়াইবার কাজ মিটিয়া যায়, কাহাকেও বা অনেক রাত্রি অবধি অপেক্ষা করিতে হয়, অনেকে আবার ক্ষুণ্ণমনে বকিতে বকিতে একাই ঘরে ফিরে।

প্রথম শীতটা পড়িয়াছে, সেদিন সকাল হইতে সারাদিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথ কাদায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; অসময়ের বর্ষণে সমস্ত প্রকৃতি যেন একটা দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে একটু ধরণ হইয়াছিল, রাস্তায় পথিকেরা চলিতেছিল সভয়ে, কখন কোন্ মোটরের তীব্রগতি কাদা ছিটাইয়া জামা কাপড় নষ্ট করিয়া দেয়। সন্ধ্যার একটু পরেই মালতী প্রসাধন সারিয়া গলির মোড়ে গ্যাসপোষ্টটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় জনস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—গাড়ী ঘোড়া মোটর বাসের যাতায়াতের বিরাম নাই; ফুটপাতে চলিতে চলিতে কেহ কেহ মালতী ও তাহার সঙ্গিনীদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতেছে। ও ফুটপাতে একটা রেষ্টুরেণ্ট—নানান ধরণের লোক যাইতেছে আসিতেছে, বসিয়া আড্ডা জমাইতেছে।

এমন করিয়া রাত্রি বাড়িতে লাগিল—মালতী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল—না, আজ আর তাহার ভাগ্যে কিছুই রোজগার হইল না। মধ্যে মধ্যে একটা দমকা জলো বাতাস আসিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় বারটা বাজিতে চলিল—দোকান পশারী ঘর বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিল, তাহার সঙ্গিনীরাও যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। মালতী একা দাঁড়াইয়া রহিল। এক একবার তাহার মনে হইল ঘরে ফিরে, কিন্তু তখনই মনে পড়িল হাত একেবারে কপর্দ্দক শূন্য, আজ কিছু না হইলে কাল উপবাস দিতে হইবে। কিন্তু পথের ও চেহারা দেখিয়া আজ যে কিছু হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল না—শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার অত্যন্ত কষ্টও হইতেছিল।

আরও দশ-পনের মিনিট অপেক্ষা করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের উপর কালিকার ভার দিয়া সে গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল দূরে একটী লোক টলিতে টলিতে আসিতেছে;—মালতীর মনে একটু আশা হইল। ভাবিল,—ও যদি সব মদে উড়াইয়া না থাকে, তাহা হইলে কালিকার খরচের একটা উপায় হইবে।

লোকটী একটু অগ্রসর হইতেই মালতী গ্যাসপোষ্টের তলা ছাড়িয়া একটু রাস্তায় নামিয়া আসিল—তাহার পর হাতের চুড়িগুলি একটু নাড়াচাড়া করিয়া, একটু কাশিয়া, পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। লোকটী তাহার প্রায় কাছে আসিয়াই পড়িয়াছে এবং বোধ হয় ছাড়াইয়া যাইতেও পারে, মালতী মরিয়া হইয়া একটু আগাইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"আসুন না।"

লোকটী তাহার কথা শুনিতে পাইল বোধ হয়; কারণ, থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল ও টলিতে টলিতে আসিয়া পড়িল একেবারে মালতীর গায়ের উপর। মালতী একটু সরিয়া আসিয়া গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়াইল—লোকটী পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ তিনদিন কিছু খাই নি, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।"

মালতী অগ্রসর হইয়া লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল একটী সতের-আঠার বৎসরের ছেলে, মুখখানি অতি সুকুমার, দারিদ্র্য ও উপবাসের চিহ্ন তাহাতে যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, গায়ে একটা মোটা কাল ছেঁড়া অলেষ্টার—দূর হইতে তাই তাহাকে অত বড় দেখাইতেছিল। ছেলেটী মালতীর মুখের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া আবার বলিল—"যদি কিছু দেন দয়া করে, আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারছি না।" এই বলিয়া ছেলেটী সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মালতী এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল —তাড়াতাড়ি সে ছেলেটীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিল—"এস আমার সঙ্গে।"

দোতালায় নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সে ছেলেটিকে বসিতে বলিল, তারপর তাহার পাশের ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল, সেখানে তখন নারকীয় কাণ্ডের অভিনয় হইতেছিল, মালতী দরজায় একটু শব্দ করিয়া ডাকিল—"কুসুম।"

দুই একবার ডাকে সাড়া মিলিল না, তখন সে একটু উচ্চ কণ্ঠেই ডাকিল—"কুসুম।"

—"কে?" বলিয়া একটী কিশোরী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"কে মালতী দিদি? কি মনে করে? আজ যে একা—ঘরে কেউ নেই?"

মালতী বলিল—"না।"

কুসুম বলিল—"তা' ডাক্‌ছ কেন? কি দরকার?"

মালতী নিম্নকণ্ঠে বলিল—"একটা টাকা ধার দে না ভাই—বড় দরকার।"

বিস্মিত কুসুম বলিল—"টাকা! এত রাতে কি হবে?"

মালতী বলিল—"অত খোঁজ দিতে পারি না, দিস ত দে—শীঘ্র শোধ করে দেব।"

কুসুম ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা টাকা আনিয়া মালতীর হাতে দিতেই সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, কুসুম অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পর নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

মালতী রাস্তায় নামিয়া সম্মুখের রেষ্টুরেণ্ট হইতে কিছু খাবার ও এক পোয়া গরম দুধ কিনিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ছেলেটী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, চোখের কোণ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই মালতী একবার বলিল—"আহা!"

একটী এনামেলের ডিসে খাবারগুলি সাজাইয়া দিয়া দুধটা একটা কাঁচের গেলাসে ঢালিয়া সে ছেলেটীর মাথায় নাড়া দিয়া ডাকিল—"শুনছ, খেয়ে নাও।"

ছেলেটীর বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল, চম্‌কাইয়া উঠিয়া চাহিতেই দেখিল সম্মুখে সাজান খাদ্য। সে একবার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে মালতীর দিকে তাকাইয়া নিশ্চুপে সব খাবার ও দুধটা খাইয়া ফেলিল। মালতী একদৃষ্টিতে তাহার খাওয়া দেখিতেছিল। ছেলেটী খাওয়া শেষ করিয়া জলপান করিয়া একটী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল—"আঃ!"

মালতীর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাওয়ার পর ছেলেটী সুস্থ হইয়া বলিল—"আপনি আজ

আমাকে বাঁচালেন, তিন দিন পেটে কিছু ছিল না, শুধু কলের জল খেয়েই কাটিয়েছি, আজ ত মনে করেছিলাম রাস্তাতেই মরে পড়ে থাকব—তা' আর হোল না—আপনি আমায় সে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করলেন—"বলিয়া ছেলেটী একটু ম্লান হাসি হাসিল।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মালতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল—সে অন্য দিকে তাকাইয়া চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল—"এখন ত সুস্থ হয়েছ, তা' হ'লে বাড়ী যাও—যেতে পারবে ত ? থাক কোথায় ?"

ছেলেটী হাসিয়া বলিল—"রাস্তায়।"

মালতী সব বুঝিল, বুঝিয়া বলিল—"তা' হ'লে এখন কি করবে ?"

ছেলেটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওই ফুটপাথে কোন জায়গায় শুয়ে থাক্‌বো 'খন।"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া মালতী বলিল—"এত শীতে ফুটপাতে শুয়ে থাক্‌বে ? মারা যাবে যে ?"

ছেলেটী একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"পনের দিন ত এইভাবেই কাটছে, মারা ত এখনও যাই নি—আর তাই যদি হয়, তার আর উপায় কি ? ঘর যার নেই, পথই যে তার সম্বল।" এই বলিয়া ছেলেটি দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

মালতী দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা, দাঁড়াও।"

ছেলেটী ফিরিয়া দাঁড়াইতে মালতী নিজের বিছানার দিকে তাকাইল, তারপর ছেলেটীর কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইয়া দিল—তাহার পর আল্‌না হইতে তাহার একখানা ধোয়া কাপড় আনিয়া দিয়া বলিল—"এইটা পরে শুয়ে পড়।"

ছেলেটী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"সে কি ! আপনি কোথায় শোবেন ?"

—"সে হবে 'খন, তুমি শুয়ে পড় ত দেখি ?"

তিনদিনের পর খাদ্য পেটে পড়ায়—ছেলেটীর চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল, সে আর কথা না বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল—মালতী পরম যত্নে একান্ত মমতার সহিত লেপটী তাহার গায়ে ঢাকিয়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। মালতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া নিদ্রিত ছেলেটীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ; পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল—মালতীর চেতনা ফিরিয়া আসিল শুইতে হইবে, সে তাহার বিছানার দিকে চাহিল, সেখানে যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু লেপ যে একটা ? খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে শয্যার একপাশে শুইয়া পড়িল ও লেপটীর একপ্রান্ত টানিয়া গায়ে দিল।

দুই

পরদিন প্রভাতে ছেলেটীর ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই মালতী উঠিয়া পড়িল ; হাত মুখ ধুইয়া কাপড় কাচিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল ছেলেটী উঠিয়া নিজের কাপড় জামা পরিতেছে ; মালতীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বলিল—"এবার আমি যাই, কাল রাত্রে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

মালতী বিশেষ কিছু বলিল না, ছেলেটী দরজা পার হইয়া যাইতেই মালতী ডাকিয়া বলিল—"তা কোথায় যাচ্ছ এখন ?"

ছেলেটী বলিল—"দেখি, যদি কোথায় কোন কাজের সুবিধা কর্‌তে পারি, ক্ষুধা ত আছে ?"

মালতী হাসিয়া বলিল—"তা' আছে বৈকি ? এত সকালেই সেটা পেয়েছে না কি ?"

ছেলেটীও একটু হাসিয়া বলিল—"না, তা' না পেলেও পাবে ত এক সময়।"

মালতী বলিল—"যখন পাবে, তখন দেখা যাবে 'খন, এখন বসো দিকি একটু—"

ছেলেটী ফিরিয়া আসিয়া মালতীর কাছে দাঁড়াইল—পূর্ণযৌবনা মালতীর পাশে রোগা ছেলেটীকে নিতান্তই ছোট দেখাইতেছিল। তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতী বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসো না। এই

দেখো, কি ভুলো মন, একটা রাত্রি বাস করলে, তবুও নামটী জানা হ'ল না।" তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"তোমার নাম কি ভাই ?"

ছেলেটী অনেকদিন এমন মমতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে নাই, সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার নাম অরুণ।"

—"বা, বেশ নামটী ত! তা' অরুণ, তোমার কি কেউ নেই ?"

—"না।"

—"তুমি এখানে এলে কি করে—এ সহরেই কি তুমি বরাবর আছ ?"

—"না, মাত্র তিনমাস হ'ল এসেছি।"

—"তার আগে কোথায় ছিলে ?"

অরুণ দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আচ্ছা, সব বলছি, শুনুন।"

অরুণ বলিতে লাগিল—

—"বাস আমাদের পাড়াগাঁয়ে। ছোটবেলায় আমার বাপ মা মারা যান, দাদামশাই আমায় মানুষ করেন; বাপ মা মরা ছেলে বলে দাদামশাই একটু বেশীই আদর দিতেন, তারই ফলে ছেলেবেলায় লেখাপড়া ভাল করে শিখি নি। দাদামশাই ছিলেন একজন শিল্পী, তিনি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন, ছোটবেলায় তাঁর সাহায্যে এসে ওদিকে আমারও বেশ একটু ঝোঁক গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন খুব ঠাণ্ডা লাগায় অসুস্থ হ'য়ে দাদামশাই শয্যা নিলেন—শয্যা ছেড়ে তিনি আর উঠলেন না। সে আজ প্রায় বছরখানেকের কথা। মরবার আগের দিন আমায় ডেকে বল্লেন—'অরুণ, তোর জন্যে ত কিছু সম্বল রেখে যেতে পারলাম না দাদা—আমার অবর্ত্তমানে তোর বড় কষ্ট হবে যে রে!'

—"তাঁর দু'চক্ষু দিয়ে হুহু করে জল ঝরতে লাগ্‌ল, আমারও চোখ শুক্‌নো ছিল না। আমার আবাল্যের সহচর একমাত্র আশ্রয়স্থল আজ আমায় ছেড়ে যাচ্ছেন। আমার মনে তখন কি হচ্ছে—তা ত' বুঝতেই পাচ্ছেন। নিজের বেদনা ঢেকে রেখে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম—'তুমি ভেব না দাদু, পুরুষ আমি, আমার উপায় ঠিক করে নেব।'

—"দাদু যেন একটু আশ্বস্ত হলেন, তারপর বল্লেন—'দেখো, সহরে আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি একজন নামজাদা চিত্রকর। আমার বাক্সে তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, আমার মৃত্যুর পর সেখানা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার একটা-না-একটা ব্যবস্থা করে দেবেন—তাই যেয়ো যেন।'

—"পরের দিন ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু হোল। তাঁর যা' কিছু সামান্য পুঁজি ছিল, তাই দিয়ে আমার ছ'মাস কোনরকমে চলে গেল—তারপর হঠাৎ একদিন সেই চিঠিখানার কথা মনে পড়ে গেল। দেশের বাড়ী ঘর দোর বেচে হাতে কিছু টাকা নিয়ে মাস তিনেক হ'ল এই সহরে এলাম—ঠিকানা খুঁজে দাদামশাইয়ের বন্ধুর বাড়ী গেলাম—গিয়ে শুনলাম, মাসখানেক আগে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

—"চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। অপরিচিত স্থান—কোথায় যাই, কি করি ভেবে পেলাম না। হাতে যা' টাকা ছিল, তাই দিয়ে একটী হোটেলে একখানা ঘরভাড়া করে থাক্‌তে লাগলাম আর কোন চাক্‌রীর চেষ্টা করতে লাগলাম। হাতে যা' ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে গেল, হোটেলের ভাড়া বাকী পড়ল, ম্যানেজার আর থাক্‌তে দিলে না, বার করে দিলে। তারপর থেকেই পথে পথে ঘুরছি—কোনদিন খাদ্য জুট্‌ছে, কোনদিন জুট্‌ছে না, কলের জল খেয়েই কাটাচ্ছি—আমার কালকের অবস্থা ত দেখেছেন ?"—বলিয়া অরুণ একটু মৃদু হাসিল।

মালতী এতক্ষণ তার কাহিনী শুনিতেছিল, তাহার চক্ষু দু'টী জলে ভরিয়া আসিয়াছে, অরুণ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। অপরিচিতা নারীর করুণা দেখিয়া তাহারও চোখে জল আসিল। মালতী বলিল—"যতদিন কিছু না কাজের সন্ধান করতে পার এখানেই থাক, বুঝলে ত ?"

মালতী উঠিয়া কক্ষান্তরে গেল। অরুণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সারাদিন অরুণের এক প্রকারে কাটিল--রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল—মালতী বেশভূষা করিয়া কোথায় চলিয়াছে। অরুণকে দেখিয়া বলিল—"এই যে এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে—তোমর কথাই ভাবছিলাম—আমায় এখুনি বেরতে হবে। তুমি ভাই খুব পয়মন্ত, অনেকদিন এতটা রোজগার হয় নি; এই নাও দুটী টাকা, যা' ভাল লাগে কিনে খেও আর এই ঘরে শুয়ে থেকো। আমার আস্‌তে হয় ত অনেক রাত হবে—কোন জিনিষ নিয়ে সরে পড়ো না যেন।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সস্নেহে অরুণের চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া ঘূর্ণি হাওয়ার মত মালতী বাহির হইয়া গেল। অরুণ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাস্তায় মোটরের শব্দ শুনিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, একখানি বৃহৎ মোটরে মালতী ও আরও চার পাঁচ জন লোক হাসিতে হাসিতে কোথায় চলিয়াছে। অরুণ জানালা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু রাত্রি বাড়িলে অরুণ কিছু খাবার আনিয়া খাইয়া লইল, তাহার পর মালতীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানে না। মালতী ও তাহার সঙ্গীরা তখন পুলিশের হাজতে।

পরদিন সকাল বেলা শয্যাত্যাগ করিয়া অরুণ দেখিল, মালতী আসে নাই। সে বিষম ভাবনায় পড়িল। পরের ঘর, অপরিচিত সে—সে কি করিবে? এমন সময় বাড়ীওয়ালী আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিল। সে মালতীর ঘরে তালা চাবি বন্ধ করিয়া অরুণকে চলিয়া যাইতে বলিল। অরুণ ধীরে ধীরে আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল—সম্বল মালতীর দেওয়া টাকা দুইটার কিছু অংশ।

তিন

পনের বৎসরের পরের কথা।

প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট অরুণ গুপ্ত তাহার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসিয়াছিল—বেলা প্রায় সাতটা, চাকর আসিয়া টেবিলের উপর এক পেয়ালা গরম চা ও সেদিনের কাগজখানা রাখিয়া গেল; মিঃ গুপ্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া চক্ষের সম্মুখে কাগজখানি মেলিয়া ধরিল। পাশে ছোট টিপয়টার উপরে একটা পিতলের ফুলদানিতে এক জোড়া তাজা ফুল মালি কখন রাখিয়া গিয়াছে; একটী সুমিষ্ট স্নিগ্ধ গন্ধে ঘরটী ভরিয়া উঠিয়াছে। অদূরে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটী চিনে মাটীর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি; তারই পাশে একটী ধূপদানিতে দু'টী সুগন্ধি ধূপ পুড়িয়া পুড়িয়া গন্ধ বিলাইতেছে। দেওয়ালে অরুণের অঙ্কিত নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ছবি—কোনটী মা ও ছেলের, কোনটী প্রণয়ী প্রণয়িনীর, কোনটী বা একটা ঝড়ের দৃশ্যে ঝড়ের মাঝে পাখা মেলিয়া একটী পাখী উড়িয়া যাইতেছে—নিপুণ শিল্পীর রেখার টানে টানে পাখীটী কি গতিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! দেওয়ালের ধারে বড় বড় দুটী আলমারি; তাহাতে নানাপ্রকার বই। ঘরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড টেবিল; তাহার চারিধারে সাজান কয়েকখানা গদি-আঁটা চেয়ার। তাহারই একটীতে বসিয়া মিঃ গুপ্ত চা পান করিতেছিল এবং সংবাদ-পত্র পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মনযোগের সহিত সে স্থানটী পড়িতে লাগিল—"অভিনেত্রীর শোচনীয় পরিণাম। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, সহরের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মালতী বাঈয়ের সহসা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। গত একমাস হইল মালতীর গৃহে চোর ঢুকিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়, পুলিশে সংবাদ আসে, কিন্তু পুলিশ আজ পর্য্যন্ত চুরির কোন কিনারা করিতে পারে নাই। ডাক্তার অভিমত দিয়াছেন—টাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে না কি তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে—চিকিৎসার্থে তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।"

সংবাদটির নীচে অভিনেত্রীর একটী হাফ্‌টোন ফটো দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ গুপ্ত ভাল করিয়া ফটোটী দেখিতে লাগিল। তাহার পর কাগজটী টেবিলের উপর রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল, তাহার পর সোফারকে মোটর আনিতে হুকুম করিল।

হাসপাতালে গিয়া অরুণ ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার নিকট শুনিল, রোগিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। হঠাৎ মানসিক আঘাতে ঐরূপ হইয়াছিল—সারিতে কিছু দিন লাগিবে; তবে লাগিলেও একেবারে সুস্থ হইবে না, যত্ন করিয়া সেবাশুশ্রূষা করিলে রোগ আর বাড়িতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়।

অরুণ, ডাক্তারের কথা শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আমি যদি এঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাই? তা'তে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপত্তি? না, তেমন কিছু আপত্তি নেই, তবে রোগ যে একেবারে সারবে, তা' বলতে পারি না। তা' ছাড়া, এ রকম রোগীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে নিজেরাই যে বেশী বিব্রত হয়ে পড়বেন।"

অরুণ বলিল—"তা' হোক্, আপনাদের আপত্তি নেই ত?"

ডাক্তার বলিলেন—"না।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, রোগিনী কি আপনার কেউ হন্?"

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে ধীরকণ্ঠে বলিল—"উনি আমার মা।"

মালতীকে লইয়া অরুণ বাড়ী আসিল এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিল। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথা এখনও বেশ সারে নাই; তবে অরুণের বাড়ীতে সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—তাহার মনে লাগিয়া আছে অরুণ তাহার কোন পূর্ব্ব প্রণয়ী। *

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

* মোপাসার ভাবানুসরণে

নানাকথা

সাহিত্য-রসিক

অনেক রকম চুরির খবর পাওয়া যায়—কিন্তু মা সরস্বতীর জন্য চুরি বোধ হয় এই প্রথম শোনা গেল। সম্প্রতি পুলিশের কৃপায় খবর পাওয়া গিয়াছে, চব্বিশ পরগণার বরাহনগরের পালপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে ইংরাজি ও বাংলা মিলাইয়া প্রায় একশত ত্রিশখানি বই চুরি হইয়াছে। ঘরে অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিষ-পত্র থাকা সত্ত্বেও চোর মহাপ্রভু সে দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই।

জাগ্রত দেবতা

সাহীবাগের নিকটস্থ একটি হনুমান মন্দিরে কয়েকটী চোর চুরি করিতে আসিয়াছিল—কিন্তু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করিতে না করিতেই একজন দেবতার কোপে পড়িয়া সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্য চোরেরা শক্ত ঠাঁহ দেখিয়া দে চম্পট। হনুমানজী যে অমর এ কথা আর একবার ভাল করিয়া প্রমাণ হইয়া গেল।

বিজ্ঞান-প্রিয়।

বিজ্ঞানের যুগ পড়িয়াছে। কাজে কাজেই সকল বিষয়েই বিজ্ঞজনের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে বই কি। সম্প্রতি একটী খবর পাওয়া গিয়াছে—বিলাতে অবশ্য কিছুই নয়, কিন্তু এদেশে—অভিনব বলিতে হইবে। গত বিশ-এ নভেম্বর চন্দননগরের একটী বাড়ী হইতে না বলিয়া জিনিষ-পত্র লইতে আসিয়া লৌহগরাদে ও তালা অক্সি-এসিটেলিন গ্যাসের আগুনে গলাইয়া—চোর মহাশয়রা সচ্ছন্দে গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মালপত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

যৌতুক-কৌতুক।

এখানে বিবাহে যৌতুক ফাঁকি দিলে বরকে সম্প্রদান আসন হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়—বিবাহ হইয়া গেলে অনেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বড় জোর তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু নিউগিনি সহরের এক ব্যাচারী 'পাপুয়ান' বর নববধূর জন্য যথারীতি যৌতুক দেয় নাই বলিয়া সেখানকার মিমিকা গ্রামের তিন জন 'পাপুয়ান' (আফ্রিকাবাসী এক আদিম জাতি) তাহাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।

ছায়ার মায়া

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পাঁচ নম্বর ডাউন ট্রেণখানা চলিয়া গেল। মহাদেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

রৌদ্র নাই, বর্ষা বৃষ্টি নাই, গাড়ীর শব্দ শুনিলেই ফ্লাগ্ লইয়া বাহির হইতে হইবে—অম্‌নি করিয়া হাত উঁচু করিয়া নাড়াইতে হইবে—এর আর বিরাম নাই।

এগার বছর ধরিয়া সে এই গেট্‌ম্যানের কাজ করিতেছে। সেই একটানা একঘেয়ে কাজ—খাটের কোণ হইতে সযত্নে গোল করিয়া পাকান ফ্লাগ্‌খানি বাহির করিয়া নাড়ান, গেট্ খোলা, বন্ধ করা, কাজ সারিয়া সামান্য খাওয়া, ছারপোকায় ভর্ত্তি পানের পিচ ও চূণের দাগওয়ালা ছোট্ট একটা ভাঙ্গা খাটিয়ায় আরও ছোট্ট একটা কুঠরীতে রাত কাটান, নিতান্ত বৈচিত্র্যবিহীন—সামান্য কুলির দৈনন্দিন মামুলী জীবনে অস্বাভাবিক নহে।

বুকিং অফিসের সাম্‌নে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বোর্ডে বড় বড় হরপে লেখা—ঝুম্‌ঝুম্‌পুর।

ষ্টেশন হইতে পোয়াটাক রাস্তা দূরে মহাদেবের ছোট কুঠরী। সেই কোন মান্ধাতার আমলে একবার চূণকাম করা হইয়াছিল। বর্ষায়, রৌদ্রে এখন যে তাহার কোন্ রং হইয়াছে তাহার নামোল্লেখ করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ষ্টেশন হইতে দূরে থাকিলেও মহাদেবকে খাতির করিত সকলেই। আপদে বিপদে তাহার সাহায্য পায় নাই এমন লোক ষ্টেশনে খুব কমই আছে। কুলি হইতে বাবুরা পর্য্যন্ত তাহার সেবা পাইয়া থাকে।

মহাদেবের কুঠরীর পাশেই প্রকাণ্ড লোহার গেট্। মাঝ দিয়া গেটের এপাশ হইতে লাইনের ওপাশ দিয়া বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেই দূরের কুসুমপুর পর্য্যন্ত। কুঠরীর পিছনে কতকগুলি পান বিড়ির ও মিঠাইয়ের দোকান।

পাঁচ নম্বর ট্রেণটাকে মহাদেব বড় ভালবাসিত। এইটা চলিয়া গেলে বেশ খানিকটা সময় সে লম্বা ছুটি পায়।

আজ কয়েকদিন হইতে তাহার আবার গান শিখিবার প্রচণ্ড সখ হইয়াছে। পিছনের পানের দোকানের এক ছোক্‌রা একটা অল্পদামী হারমোনিয়াম লইয়া দিনরাত 'হঁা' করিয়া মাথা নাড়াইয়া চেঁচাইতে থাকে—"বিনোদিনী, আজ তুমি যেও না যমুনায়—"

শেষের কথাটার উপর অসম্ভব রকমের টান দিয়া, সুরের নানারকম গিট্‌কিরি কাটিয়া ছোক্‌রা আশে পাশের লোকগুলিকে নানা শ্রেণীর রস পরিবেশন করিয়া থাকে।

অবশেষে সেই হইয়াছে মহাদেবের সঙ্গীত শিক্ষক।

পাঁচ নম্বর ট্রেণটা চলিয়া গেলে ঘরে তালা মারিয়া সে মহানন্দে পানের দোকানে হাজির হইয়া হাসিয়া বলে, "আজ্‌কে দাদা সা—রে—গা—মা—টা শেষ করে দিতেই হবে।"

ছোক্‌রা বিদ্‌ঘুটে লাল্‌চে দাঁত বাহির করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলে, "তোমার মত ছাত্তোর—বুঝ্‌লে মহাদেব দা', আমি আর দেখি নি! কি উদ্যোগ! তুমি শিখ্‌তে পারবে।"

ছোক্‌রা নিজেকে প্রকাণ্ড একটা তানসেন ঠিক করিয়া নিয়াছে। অবশ্য মহাদেবও দুই এক সময় তাহার অদ্ভুত গিট্‌কিরি শুনিয়া তাহাকে একটা বড় রকমের গায়ক ঠিক করিয়া, নিজেকে এমন গুরুর চেলা ভাবিয়া গর্ব্বও অনুভব করিয়া থাকে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মহাদেবের বড় একটা অসুখ

বাধিয়া গেল। রেলের ডাক্তার আসিয়া দুইদিন দেখিয়া গিয়া বাবুদের বলিয়া গেলেন—"অসুখ বড় সুবিধার নয়। আত্মীয় থাকলে এখনি খবর দিন্।"

বাবুরা জমাদারকে এ বিষয় দেখিতে বলিয়া কর্ত্তব্য মুক্ত হইলেন।

পোর্টার, পয়েন্টস্‌ম্যান্, রেলের কুলিরাও মহাদেবকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। উপকার তাহারা ত' কম পায় নাই। দেশে আত্মীয় বলিতে বউ লক্ষ্মী আর পাঁচ বছরের ছেলে ছোট্‌কা ছাড়া মহাদেবের আর কেউ ছিল না। সুতরাং কুলিরা মিটিং করিয়া বউ ছেলেকে দেশ হইতে আনাইবার প্রস্তাব করিল। এই বিষয়ে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষীণ স্বরে মৃদু প্রতিবাদ করিয়া সে বলিয়াছিল, "আমার এমন কীই বা হয়েছে, ও দু'দিনেই সেরে যাবে। মিছিমিছি কত ভাবনা নিয়ে ছুটে আস্‌বে ওরা! হয় ত' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শরীরটাই মাটি করবে। সামান্য অসুখে ওদের বড্ড ভাবনা চিন্তা হয়।"

তথাপি তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া কুলিরা দেশ হইতে বউ ছেলেকে আনাইল।

সহকর্ম্মীদের সাহায্যে, লক্ষ্মীর সেবায় মহাদেব সে যাত্রা কোনক্রমে কাটাইয়া উঠিল।

কয়েকদিন বাদেই মহাদেব সুস্থ হইয়া গেল। লক্ষ্মী তাহার পা জড়াইয়া বলিল, "আর আমাদের দেশে যেতে বলো না! বিদেশে, বিভুঁয়ে একা একা তোমায় আমি থাক্‌তে দিত পার্‌বো না। কত কি বিপদ আসে, তা' কি কেউ বল্‌তে পারে। এত খাটুনী, রাঁধা, বাসন মাজা—না গো না, আমি পার্‌বো না!"

মহাদেব প্রথমে আপত্তি করিল, "অতটুকু ঘরে থাকার ভয়ানক অসুবিধা, তা' ছাড়া, ছেলেটা অসম্ভব রকমের দুরন্ত—কবে যে কি করে বসে! এ লাইনে মানুষ গরু প্রায়ই গাড়ী চাপা পড়্‌ছে, না লক্ষ্মী, তোদের থেকে কাজ নেই।"

লক্ষ্মী কিন্তু সকল অসুবিধা সহ্য করিতে রাজী—ছেলেকে সে বাহির হইতে কখনও দিবে না, কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে সে মহাদেবকে রাজী করাইল।

দিন বেশ যায়। পাঁচ নম্বর ট্রেণ যাইবার পর মহাদেব আড্ডায় আর যায় না। লক্ষ্মীর কাছে বসিয়া গল্প করে, ছেলে লইয়া খেলা করে—বেশ আনন্দেই মহাদেবের সময় কাটিয়া যায়।

পাঁচ নম্বর ট্রেণ সন্ধ্যায় আসে। সেইটা চলিয়া গেলে মহাদেব লাইনের ওপাশের রাস্তার বাঁ' পাশে যে প্রকাণ্ড দীঘিটা আছে, তাহাতে চিরদিনের অভ্যাসমত একটা ডুব মারিয়া সা—রে—গা—মা—র সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসায় ফেরে।

ঘরে আসিয়া দেখে কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে। একখানা ভাঙ্গা কোরোসিন কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া লক্ষ্মী কাজকর্ম্ম সারিয়া বসিয়া আছে। মহাদেব আসিলে তবে গরম ভাত হাঁড়ি হইতে বাড়িয়া দিবে। ঠাণ্ডা ভাত আবার মহাদেব খাইতেই পারে না।

ছোট্‌কা এত বড় বাঁদর, কোথা হইতে মুখে চুণকালি মাখিয়া আসিয়াছে, লক্ষ্মীর সাম্‌নে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলে, "শুন্‌বে মা।"

শুনিয়া মহাদেব ত' হাসিয়াই খুন।

খাইতে বসিয়া কত গল্প, কত হাসি! ছোট্‌কা স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আবার বাবার সহিত খাইতে না বসিলে চলিবে না—একগ্রাস ভাত মুখে লইয়া এখানে ওখানে দৌড়াইয়া যায়। একবার হয় ত' হঠাৎ ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পয়েন্টস্‌ম্যান পঞ্চানন তাহার লাল আলো জ্বালাইয়া লাইনের ওপাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। ছোট্‌কা তাহাকে চেঁচাইয়া বলিল, "এই পঞ্চাদা', মা যা' পুঁটি ঝাল রেঁধেছে! খাবে ত' এসো এখুনি। আর শোন, কাল আমরা সব যাচ্ছি মহেশের মেলায়—মার্‌বেল ত' পাঁচটা কিন্‌বোই—"

পঞ্চাননের অত কথা শুনিবার সময় নাই, হাসিয়া দুই একটা কথার উত্তর দিয়া সে হয় ত' বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছোট্‌কার তখনও কথা শেষ হয় নাই, "কাল

রাতে এসো, বাঁশী বাজিয়ে শোনাব। আমার জন্ম দুটো মাকাল ফল এনো ত পঞ্চা দা'—ভারি সুন্দর দেখতে—"

ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী মহাদেবকে বলে, "দেখছো ছেলেটার কাণ্ড! বড্ড লক্ষ্মীছাড়া—"পরে ছেলের উদ্দেশ্যে কড়াস্বরে বলে, "এই ছোট্‌কা।"

"উঁ।"

"ঘরে আয় শীগ্‌গির হতচ্ছাড়া, এঁটো মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আর ইয়ার্কি মারতে হবে না—আয় বল্‌ছি।"

ছোট্‌কা আসিয়া বাপের সাম্‌নে 'হাঁ' করিয়া দাঁড়াইল। মহাদেব একটু মাছ ভাত মুখে পুরিয়া দিতেই আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রচণ্ড একটা কিল অকস্মাৎ তাহার পিঠে পড়িল।

মহাদেব 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল, "তোর বড্ড বাড়াবাড়ি, ছেলেমানুষ—"

"ছেলেমানুষকে কি করতে হয় না হয় সেটা আমি ভাল বুঝি।" লক্ষ্মী রাগিয়া বলে।

মহাদেব চুপ করিয়া যায়; ভাবে, হয় ত' ইহাতে তর্ক করিবার কিছুই নাই।

ছোট্‌কাকে তখন মহাদেব লাইনের ধার দিয়া ঘুরাইয়া আনে। ছোট্‌কা কান্না থামাইয়াছে; কারণ, বাবা নিজে বলিয়াছে, মেলায় লক্ষ্মীকে নেওয়া হইবে না, একা সে বাপের সহিত যাইবে। কিন্তু বাপের সঙ্গে এমন একটা রফা শেষ পর্য্যন্ত তাহার মনঃপূত হয় নাই। মাকে সঙ্গে না লইলে চলে না। মনটা বড় খুঁতখুঁত করিতে থাকে; সে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "মা-টাকে নেওয়া যাক্ গে—বুঝ্‌লে বাবা, কেবল একটা জিলিপী তুমি আমায় বেশী দিও, তা' হলেই হবে।"

মহাদেব হাসিয়া বলে, "সেই ভাল।"

হইতে গিয়া মরিল—নাঃ, মহাদেব ঝকমারি করিয়াছে উহাদের আনিয়া। ছোট্‌কা মোটে কথা শুনে না, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ঐ লাইনের দিকে যাইবেই, কবে কি করিয়া বসে।

লক্ষ্মীর উপর ছেলের ভার দিয়া মহাদেব নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সকল সময়েই নিজে তাহাকে চোখে চোখে রাখে। ভয়ে সে বেশীক্ষণ বাহিরে আসিতে পারে না; হয় ত হঠাৎ একটা মালগাড়ী আসিয়া পড়িবে—গাড়ীর ত আর অন্ত নাই।

লক্ষ্মী বলে, "তুমি এত ভেব না ত।"

বাধা দিয়া মহাদেব ব্যস্ত হইয়া বলে, "না—না, তুই বুঝিস্ না, আমার বড্ড ভয় করে।" পরে অনুনয়ের সুরে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলে, "তোর এত কাজ করতে হবে না। তুই ওকে খুব চোখে চোখে রাখবি, বলা ত যায় না, এই ত সেদিন..."বিড়বিড় করিয়া আরও কি বলিতে বলিতে আকাশের পানে চাহিয়া সে প্রণাম করিতে থাকে।

গাড়ী আসিবার সময় হইলে সে বারবার লক্ষ্মীকে বলিতে থাকে, "তুই এই দোরগোড়ায় বোস, ও যেন বেরুতে না পারে।" পরে ছেলেকে আদর করিয়া বলে, "পাগলামী করিস্ নি বাবা, গাড়ী আসবার সময় বেরোস্ বুঝি? কথা শুন্‌লে,—দেখ্, এই এত বড় একটা নাটু কিনে দেব।"

গেট বন্ধ করিয়া ফ্ল্যাগ নাড়িতে নাড়িতে সে বারবার দুয়ারের দিকে চাহিতে থাকে—কোন্ ফাঁকে আবার লক্ষ্মীকে ডিঙাইয়া বাহির হইয়া না আসে!

গাড়ী চলিয়া গেলে ঘরে আসিয়া ছোট্‌কাকে দেখিলে তবে সে শান্তি পায়।

পাঁচ নম্বর ট্রেণটা বড্ড বেশী দমে চলে। মানুষ গরু কত যে কাটিয়া চলে, তাহার আর ইয়ত্তা নেই। সেইদিন রায়েদের দু'টা মস্ত বলদ কাটা পড়িল, ঐ ত গত শুক্রবারে জমাদার পরাণকেষ্টর অতবড় জোয়ান ছেলেটা লাইন পার

ভোরের ট্রেণটা চলিয়া গিয়াছে। মহাদেব গিয়াছিল ষ্টেশনে। ফিরিবার পথে ছেলেবেলার বন্ধু বিষ্টুর সাথে হঠাৎ দেখা। সেই অম্বিকা গুরুর পাঠশালায় হাতে মুখে কালী মাখিয়া লুকাইয়া দুইজনে কত কামরাঙা, বেতফল খাইয়াছে ...নষ্টচন্দ্রের রাত্রে নকুড় ঠাকুরের বাগানে বাতাবী লেবু,

শশা চুরি...সেই বাল্যবন্ধু বিষ্টুর সাথে দেখা। বিষ্টু আজকাল ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করে। গল্প করিতে করিতে দেরী হইয়া গেল। বিষ্ট বড় ব্যস্ত, আর একদিন আসিবে বলিয়া সে কাজে চলিয়া গেল। এত বেলা হইয়া গিয়াছে তাহা মহাদেবও টের পায় নাই। একটা অজানা আশঙ্কা লইয়া সে ঘরের পানে ছুটিল।

বাসার ধারে আসিয়া দূর হইতেই সে ডাকিয়া উঠিল, "ছোট্‌কা—এই ছো—"

লক্ষ্মী বাসন মাজিতেছিল, ময়লা হাতে সে বাহির হইয়া বলিল, "খাবারের দোকানীর ছেলে মনুকুর সাথে একটু বাজারে গেছে। বড্ড কান্নাকাটি করছিল—তা' যাক্‌ গে না, ছেলেমানুষ—"

মহাদেব রাগিয়া উঠিল, "দুত্যরি, বারণ করলেও শুনবি নে তোরা—" ঘরে না ঢুকিয়া সে বাজারের দিকে ছুটিল।

মনুকু দোকানে বসিয়া প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ' করিয়া মুড়ির মোয়া চিবাইতেছিল। মহাদেব যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে মনুকু, ছোট্‌কা কোথায় রে?"

মনুকু খানিকটা মোয়া গলাধঃকরণ করিয়া ঢোক গিলিয়া কহিল, "এইখানেই ত আমরা খেলছিলুম, তা' ছোট্‌কা বললে, ভাল খেলার জিনিষ আনবে। ইদিকে সে ছুটে গেছে।" হাত বাড়াইয়া বাজারের দক্ষিণের পচা পুকুরটা সে দেখাইয়া দিল।

মহাদেবের সর্ব্বশরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। এখনও কোন ট্রেণ আসে নাই, তথাপি সে দৌড়াইয়া লাইনটা দেখিয়া তবে পচা পুকুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বাজারের দক্ষিণে যে পুকুরটি পচা পুকুর নামে খ্যাত, তাহা যে কে কখন করিয়াছিল কেহই তাহা বলিতে পারে না। বৃদ্ধেরাও বলিয়া থাকেন যে, ছেলেবেলা হইতে তাহারাও ঐ একই রকম দেখিতেছেন। জলের উপর কলমীলতার ধাপ এত পরিমানে জমিয়াছে যে, জল দেখিবার উপায় নাই। কলমীর ফুল, অন্যান্য বুনো লতার লাল নীল ফুল ধাপের উপর, পাড়ের উপর ফুটিয়া আছে। চারিদিকের পাড়ে দাঁড়াইবার উপায় নাই—বেত কচুর ঝোপে ভরিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র মদনের দোকানের পিছন দিয়া ঐ সুঁড়ি পথটুকু ধরিয়া ঘাটে নামা যায়।

মহাদেব হাঁপাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ভয়ে ভয়ে ব্যগ্রভাবে তাকাইতে লাগিল—নাঃ, কোথাও জনমানব নেই। মহাদেবের চোখ দিয়া জল বাহির হইল। দম বন্ধ করিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল, "ছোট্‌কা!"

কেমন একটা বিশ্রী প্রতিধ্বনি আসিল মাত্র। জ্ঞানশূন্য হইয়া আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট্‌কা—"

ও পাড়ের কলমীর ডগাগুলি নড়িয়া উঠিল, তাহার ঝোপ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "এই—"

মহাদেব বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। ও পাড়ে গিয়া দেখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলমী ডগার ঝোপের একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছোট্‌কা নিশ্চিন্ত মনে কলমীর ফুল ছিঁড়িতেছে—পাশে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে কলমীর ফুল।

গালের উপর 'ঠাস' করিয়া এক চড় মারিয়া মহাদেব তাহাকে বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, এর মধ্যে মরতে এসেছ কেন? সাপখোপ থাকে এর মধ্যে জানিস? ফের যদি আসবি, তবে মেরে খুন করবো।"

রাগের মাথায় আরও কয়েকটা চড় চাপড় মারিতে মারিতে মহাদেব তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে ছোট্‌কার এই অবস্থা দেখিয়া মনুকু হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট্‌কার কী রাগ! বাপের অলক্ষ্যে তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া মনুকুকে প্রতিশোধ নিবার ভয় দেখাইল। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের সহিত চলিল।

বাসায় আসিয়া ছোট্‌কার ক্রন্দন আরও বাড়িল। মহাদেব রাগের মাথায় বলিল, "কিছু খেতে দিস নে আজ, দেখুক না মজাটা!"

লক্ষ্মী সায় দিয়া বলিল, "কক্ষনো না, খেতে দেবো আবার!"

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে মহাদেবকে চুপিচুপি ছোট্-

কাকে একখানা পাউরুটী দিতে দেখিয়া লক্ষ্মী হাসিয়াই বাঁচে না।

কয়েকদিন ধরিয়া ছোট্‌কা ভীষণ বায়না ধরিয়াছে যে, গাড়ীকে নিশান দেখাইবে। মহাদেব বিরক্ত হইয়া সেদিন তাহাকে লইয়া গেল। গাড়ীর শব্দ পাইলে মহাদেব ছোট্‌কাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট্‌কার কী আনন্দ! দূর হইতে গাড়ীটা 'ভস্ ভস্' শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। ছোট্‌কা নিশান ঘুরাইতে লাগিল—আঃ, কী আরাম! গাড়ীর মধ্যে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহাদের দিকে ছোট্‌কা জিব বাহির করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল—করিয়াই কী হাসি!

মহাদেব তাহাকে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "ছিঃ, অমন করতে নেই!"

ছোট্‌কার আজ বুক ফুলিয়া উঠিল—ভারি না কাজ, তার আবার ভয়!

আটটা বাজিয়া গেল। পাঁচ নম্বর গাড়ীটা বড় লেট্ করিতেছে। কুলি-মহলে নানারকম গুজব উঠিল। মাতব্বর পোর্টার আশু আসিয়া বলিল, "নয়ানগঞ্জের ওপাশে ট্রেণখানা আউট লাইন হয়েছে, আজ আর রাতের মধ্যেও আসছে না।"

গুজবটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল।

মহাদেবও খবরটা শুনিয়া আসিল, এখন আর মালট্রেণ আসিবার সম্ভাবনা নাই। বাসায় আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল, "আমরা একটু ময়নামতীর হাটে চল্লাম লক্ষ্মী। দেখি, ছোট্‌কার জন্য যদি একটা জামা কিনতে পারি। এ পর্য্যন্ত ছেলেটা একটা জামাও পরতে পারে নি, আজ দেখি যদি পারি।'

নদী পার হইয়া তবে হাটে যাইতে হয়, তাহারা চলিয়া গেল।

ছোট্‌কার আজ মহা আনন্দ! বাবা নাই বাড়ীতে, মা কাজে ব্যস্ত,—তাকে আজ পায় কে! কতদিন বাবার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই দূরের লাইনের পাশে নীলু চক্রবর্ত্তীর মাঠে ছেলেদের সে খেলা করিতে দেখিয়াছে। বড় ইচ্ছা তাহার হয় উহাদের সহিত একটু ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়—কী যে আনন্দ তাহাতে! কিন্তু বাবার এত ভয় যে, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আজ মহা সুযোগ! লুকাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ ত আর কম নয়। কোনরকমে সে মাঠে আসিয়া পৌছাইল। মহানন্দে মালকোঁচা মারিয়া সে ছেলেদের সহিত 'বুড়ির চি' খেলিতে গেল। ছোট্‌কা যে দৌড়াইতে পারে—বাপরে! সব ছেলেরা ত অবাক! একদিনেই নাম কিনিয়া ছোট্‌কা সর্দ্দার খেলোয়াড় হইয়া গেল। ছোকরার দল তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, "এই ভাই ছোট্‌কা, রোজ আসবি ত?"

ছোটকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"নিশ্চয়ই।"

হঠাৎ দূরে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। ছোট্‌কা খেলা থামাইয়া চাহিয়া দেখে, পাঁচ নম্বর ট্রেণ হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সর্ব্বনাশ! নিশান দেখাইবে কে? বাবা ত সেই দূরের হাটে, মা ত পারিবেই না - তবে হ্যাঁ, সে নিজে পারিবে—ভারী না কাজ!

ছেলেমানুষ হইলেও ছোট্‌কা বাবার বিপদ বুঝিল। হিতাহিত জ্ঞান তাহার নাই, সোজা পথ ভাবিয়া লাইনের মাঝ দিয়াই সে ছুটিয়া চলিল। গাড়ীর পূর্ব্বে সে নিশ্চয়ই পৌছাইতে পারিবে। নিতান্ত ছেলেমানুষ! বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার দুইখানি ছোট পায়ের চাহিতেও ঐ দানব-যন্ত্রের পাগুলি কত শক্তিশালী! ছোট্‌কা পিছন ফিরিয়া গাড়ীর ও তাহার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান মনে মনে মাপিয়া ভাবিল—নিশ্চয়ই আগে পৌছাইবে। ভীষণ বেগে সে দৌড়াইতে লাগিল।

কিন্তু দানব-যন্ত্র যে হঠাৎ একবারে পিছনে আসিয়া

পড়িয়াছে—তাহার উষ্ণ হাঁপ্ ছোট্‌কার পিঠে লাগিতেছে —দম যেন বন্ধ হইয়া যায়। লাইন হইতে সে সরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পা যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছে। নিজের বিপদ সে এইবার বুঝিতে পারিল। হতভাগ্য শিশু বিকট ভয়ে মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিল, "মা—মা!"

মায়ের সাধ্য নাই তাহাকে অঞ্চলতলে লুকাইয়া আজ বাঁচাইয়া রাখে! নিষ্ঠুর যন্ত্রটা একটুও দ্বিধা বোধ করিল না, তাহার কোমল দেহের উপর দিয়া অমন পাষাণের ভার চাপাইয়া দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গেল।

পাশের রাস্তা দিয়া হাট ফেরৎ লোকের দল চলিয়াছে। লাইনের উপর সদ্য কাটা শিশু দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। ক্রমশঃ ভীড় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নানা গবেষণাও চলিতে লাগিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, মহাদেব ছুটিয়া চলিল। আজ তাহার মনে একটা তৃপ্তি আসিয়াছে; কারণ, ছোট্‌কার বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটা রঙিন জামা আজ কিনিতে পারিয়াছে। পথে বিষ্টুর সহিত আবার দেখা, সে কাজে চলিয়াছিল। বলিল, "মহাদেব যে, হাট থেকে ফিরছো দেখ্‌ছি। তোমার নিশেন দেখালে কে তবে?"

মহাদেব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নিশেন—কেন?"

বন্ধু বলিল, "বাঃ, এই ত কিছু আগেই তোমাদের পাঁচ নম্বর ট্রেণ চলে গেল, বড্ড লেট্ করেছে আজ। আরে শুনেছ মহাদেব, ঐদিকের কোন্ লাইনের 'পরে একটা নেহাৎ বাচ্ছা না কি কাটা পড়লো—তোমাদের এদিকে এসব বড্ড বেশী।" বলিতে বলিতে বিষ্টু আগাইয়া চলিল।

মহাদেবের সর্ব্বশরীরে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। তাহার পা আর চলিতে চাহে না—দৌড়াইতে গেলে পড়িয়া যায়। আছাড় খাইতে খাইতে মাতালের মত হইয়া সে ভীড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের একটা লোককে চুপিচুপি অপরাধীর মত শুষ্ককণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

ঠোঁট উল্‌টাইয়া লোকটি বলিল, "চিন্‌তে ত পারছি নে, দেখো না এগিয়ে।"

আগাইয়া দেখিবার সাহস তাহার নাই। দুর্ব্বল পা দুইটা দেহের ভার আর বহিতে পারিল না, 'ধপ্' করিয়া সে ভীড়ের পিছনে বসিয়া পড়িল।

রেলওয়ে কুলীর দল আসিয়া পড়িয়াছে, এইবার আর চিনিতে কাহারাও বাকী রহিল না। জমাদার আগাইয়া মহাদেবকে ধরিল, "কী আর করবি ভাই, সবই অদেষ্ট! আয়, এদিকে আয়।"

মহাদেব টলিতে টলিতে তাহার পিছন পিছন চলিল।

সেই লাল পেড়ে ধুতিখানা মালকোঁচা মারা রহিয়াছে ...গলার কবচটা ও পাশে গিয়া পড়িয়াছে... ...দেহটা থেঁতলাইয়া গিয়াছে—মহাদেব উন্মাদের মত একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

কুলীর দল মৃতদেহটাকে লইয়া চলিয়া গেল। জমাদার মহাদেবের জ্ঞান কোন রকমে ফিরাইয়া তাহাকে বাসার দিকে লইয়া চলিল। পথে কোন কথা মহাদেব কহিল না, মধ্যে মধ্যে উন্মাদের মত চেঁচাইয়া উঠে—মুখ দিয়া অদ্ভুত-ভাবে ফেনা পড়িতেছে—চোখ দুইটা অসম্ভব রকমের লাল! পাগল হইয়া যাইবে না ত!

বেচারী মা! খবরটা সেও পাইয়াছে। এক মাত্র পুত্র, কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাঁপাইয়া গিয়া জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া আছে। মনুকুর মা, দিদি, ওরা সব সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে। জ্ঞান একটু হইলেই তাহাদের ঠেলিয়া লক্ষ্মী দৌড়াইয়া বাহির হইতে যায়। পুত্রশোক! এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু!

রাত্রি অনেক হইয়াছে। মহাদেব মাটীতে পড়িয়া। ওপাশে লক্ষ্মী গোঁয়াইতেছে—তাহার উষ্ণ নিশ্বাস মহাদেবের মুখে আসিয়া লাগে। কিসের একটা ছায়া হাত

রেডিও পিক্‌চার্সের বিখ্যাত অভিনেত্রী—সিড্‌নি ফক্স।

ইসারায় ডাকে যে—হ্যাঁ, ঐ ত মহাদেবকেই ডাকে। খাটের তলা হইতে ছোট্‌কার টিনের ভেঁপু, কাঠের ঘোড়া, রঙিন জামা যেন শূন্যে নাচিতেছে—এই যে তার চোখের সাম্‌নে, একেবারে সাম্‌নে। ঘরের কোণ হইতে কে যেন ডাকিয়া উঠিল—"বাবা—!"

মহাদেব কান পাতিয়া শুনিল।

বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি অজস্র ধারায় পড়িতেছে। ঝড়ের অশ্রান্ত হুঙ্কার যেন সমগ্র ঝুম্‌ঝুম্‌পুরটাকে আজ উল্‌টাইয়া ফেলিবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কড়্‌কড়্ করিয়া মেঘের ভীষণ আর্ত্তনাদ—উপযুক্ত লগ্ন! আবার যেন কোণ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বাবা—!"

মহাদেব লাফাইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী, উঠে আয়।"

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল না, যন্ত্রচালিতের মত সে উঠিয়া স্বামীর সহিত সেই দুর্য্যোগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গেঁয়ো সুঁড়ি পথ দিয়া বনবাদাড় ভাঙিয়া তাহারা দুইজন চলিয়াছে—তাহাদের চলার পথ যেন শেষ হইবার নয়। বিদ্যুতের আলোয় তাহাদের দেখা যায় দূরে—বহুদূরে মাঠের মাঝে। ক্রমশঃ মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিল—আর দেখা গেল না। কোন্ অনিশ্চিত ঐ ছায়ার আহ্বান আজ তাহারা শুনিল—কোন্ ছায়ার মায়ায় আজ তাহারা ঘরের মায়া কাটাইল—কে জানে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অদর্শনে

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি-এস্

কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই নীলাম্বু শুনিলেন, পত্নী নীলিমা, বন্ধু সুকুমারের সহিত মটর চড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

খানিক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভৃত্য পদকে প্রশ্ন করিলেন,—কিছুই বোলে গেল না, কোথায় যাচ্ছে তারা?

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পদ উত্তর করে,—কি কোরে জান্‌ব বাবু, আমায় তো বলে যান নি, মা-ঠান।

—তুই জিজ্ঞেস্ কর্‌লি না কেন?

—আজ্ঞে, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে, এই কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে যাব? সেদিন আপনি অফিসে ছিলেন, ফির্‌তে আপনার রাতও হয়েছিলো। ওই কি বলে, সকুবাবু কোথা থেকে তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই মা-ঠানকে বল্লেন,—ইঙ্গিরিতে কি দু'-একটা কথা—বলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম,—মা-ঠানকে হঠাৎ না-বলা, না-কওয়া সকুবাবুর সঙ্গে চলে যেতে দেখে শুধুলুম,—কোথা যাচ্ছেন বাবু আপনারা, আমাকে বোলে যান,—বাবু শুধুলে বোল্‌তে হবে। অমনই সকুবাবু নাক মুখ পাকিয়ে ধমকে উঠলেন, বল্লেন কি,—তুই চাকর, চাকরের মত থাকবি, তোর অত কথায় দরকার কিরে উল্লুক। গোটা দুই ঘুসি মার্‌তে পেলে ছাড়েন না, এমনই তরা ভাব আর কি! কি বোল্‌ব বাবু, আমার সেদিন যা' দুখ্‌খু হয়েছিলো, ইচ্ছে কর্‌ছিলো,—

বলিয়াই পদ নীরব হইল।

নীলাম্বু সাগ্রহে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,—তারপর?

—তারপর তাঁরা দু'জনা বেরিয়ে গেলেন। আপনি বাবু বাড়ী আস্‌বার এক ঘণ্টা আগে তাঁরা ফিরেছিলেন, মা-ঠান বল্লেন,—বাবু ফের্‌বার আগেই যখন ফিরে এইছি, তখন আর তোর জেনে দরকার কি,—কোথায় গেছিলুম। যা' বোল্‌তে হয় বাবুকে আমরাই বোলব অখন্। তুই চুপ থাক্। তা' বাবু, ওই কি একদিন, অমনই ধারা কদ্দিনই না হয়েছে।

—অ্যাঁ! বলিস্ কি? কই এদ্দিন তো আমায় কিছু বলিস্ নি?

বলিতে বলিতে নীলাম্বুর মুখ সহসা বিবর্ণরূপ ধারণ করিল।

—আপনার কাছে কি নিরালা যেতে ফুর্‌সুৎ পেয়েছি বাবু। আপনি ঘরে থাক্‌লে, মা-ঠানের ফরমাস্ সার্‌তেই আমার সময় ফুরিয়ে যায়।

'ওঃ' বলিয়াই নীলাম্বু ইজিচেয়ারে সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিলেন। মুখের ঘর্ম্মটুকু পর্য্যন্ত মুছিতে তাঁহার হস্ত দুইটা উঠিতেই চাহিতেছিল না যেন।

নীলাম্বুর অসহায়ভাব দেখিয়া ব্যথিত পদ ত্বরিৎ-গতি ফ্যান্‌টা খুলিয়া দিল। ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দে ফ্যান্‌টা মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া অবিরত ঘুরিতে লাগিল।

অফিসের স্বেদ-সিক্ত পোষাক ছাড়া হইল না। নীলাম্বু যেন গভীরাতঙ্কে ডুবিয়া গেলেন।

অতি মৃদুভাবে পদ প্রশ্ন করিল,—চায়ের জল চড়াই গে বাবু?

নীলাম্বু ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, যা'। তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

পদ কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল,—বলা যায় না।

নীলাম্বু ভাবিতেছিলেন, তিনি কী 'গুখুরী' কাজই না করিয়াছেন স্ত্রী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য হইয়া ও'পবিবাহ করিয়া। আবার শুধু তাই? সভ্যগণের অনুরোধে অমন

সুশীলা পত্নী নীলিমাকেও তৎসঙ্ঘের সভ্যাশ্রেণীভুক্ত করিয়া? ছিঃ!

বেশী দিন নয়, একটী বৎসর পূর্ব্বে যে নীলিমা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিল, সে-ই আজ পুরুষ বন্ধুদিগের সহগতি-বিধি সযত্নে গোপন রাখে এবং রাখিতে চেষ্টাও করে। কেন? বংশদণ্ডের কোন্‌স্থলে যে ঘূণ ধরিয়াছে, তাহা নীলাম্বু ভাবিয়াই পাইলেন না।

পদ চায়ের সরঞ্জাম সমূহ আনিয়া টেবিলে রাখিল। নীলিমার পরিবর্ত্তে আজ পদ চায়ের জল ঢালিয়া চা প্রস্তুত করণে রত হইল। বিপরীতমুখী চেয়ারখানা শূন্য দেখিয়া নীলাম্বুর বুকখানার ভিতর যেন 'হা হা' করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তাঁহার হাহা-কারের বিনিময়ে বন্ধু সুকুমার নীলিমাকে লইয়া কী আনন্দেই না মুহূর্ত্তগুলি কাটাইতেছে?...

চায়ের কাপে দুই এক চুমুক দিবার পর মস্তিষ্কটা সতেজ হইলে তাঁহার মনে পড়িল,—স্ত্রী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের তিনিও একজন সভ্য। তাঁহার পক্ষে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধ এরূপ চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই?...... পদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—তোর মা-ঠান এলে বলিস্‌ নি যে, আমি তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলুম,—তিনি গেছেন কোথায়।

ভৃত্য 'ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌' করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

নীলাম্বু একটু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন,—বুঝেছিস্‌ তো? না, শুধু শুধু বোকার মত 'হাঁ' কোরে তাকিয়ে থাক্‌বি।

কলের পুত্তলিকার ন্যায় সে অস্ফুটভাবে উত্তর করিল—হাঁ।

দুই

অতঃপর চা পানের পর একাকী ওই নির্জ্জন বাটীতে কি করা যায়?—নীলাম্বু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখন জাগিতেছিল,—স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি এমনইতর অশান্তিকর, না তাহার সঙ্কীর্ণ চিত্তের জন্যই তিনি শুধু অশান্তি উপভোগ করিতেছেন? সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—স্ত্রী-স্বাধীন আমেরিকা ও ইউরোপের কথা। সেখানকার পুরুষরাও তো বিবাহের নামে শত হস্ত পিছাইয়া পড়ে বটে; কিন্তু তাহার কারণ কি, ওই জন্যই, না অন্য কিছুর জন্য?

একযোড়া চড়ুই পক্ষী কিচিরমিচির করিয়া কলহ করিতে করিতে সহসা তাঁহার শয্যার উপর গিয়া পড়িল। তাহাদিগের কলরবে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিতেই নজরে পড়িল,—শয্যায় পড়িয়া থাকা একখানা রঙিন হাণ্ডবিলে। দূর হইতে বড় বড় অক্ষরের লেখা দেখা যাইতেছিল,—'স্বপ্নরূপ টকি।'

ত্বরিৎ-গতি উঠিয়া-পড়িয়া হাণ্ডবিলখানা হস্তগত করিয়া তিনি পাঠ করিলেন,—'স্বপ্নরূপ টকি'তে গ্রেটা-গার্ব্বোর 'ফ্রেণ্ডস্‌ কিস্‌' নামক উচ্চ-প্রশংসিত অপূর্ব্ব রোমাণ্টিক ছবি অদ্য হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।

'ফ্রেণ্ডস্‌ কিস্‌' নামক উপন্যাসখানা তাঁহার পড়া আছে। সিনেমা বক্সের উপর অন্ধকারে বসিয়া বন্ধুর সহিত বন্ধু-পত্নীর প্রণয়োপাখ্যান হইতে গল্পটী আরম্ভ। কে যেন তাঁহাকে বলিয়া উঠিল,—ছিঃ!

পদকে হাঁক দিয়া ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে, এ কাগজখানা এখানে কে আনল রে?

—আজ্ঞে, বাবু, আমি তো আনি নি। মনে পড়ে সকুবাবুর হাতে অমনিতর রঙিন কাগজ একখানা ছিল।

নীলাম্বুর মনের ফাঁকে সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন,—ওঃ!

তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিল,—ঠিকই হইয়াছে, উহারা দুইজনে ওই ছবিখানা দেখিতে তিনটার 'শো'য় নিশ্চয়ই গিয়াছে।

রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—সন্ধ্যা প্রায় পৌনে ছ'টা বাজে, এতক্ষণে তো 'শো' শেষ হইবারই কথা। তবে?...

'শো' দেখিবার পরই হয়ত তাহারা আর কোথাও বেড়াইতে গিয়া বসিবে। আর তিনি একটী সুন্দর সন্ধ্যা

একাকী বৃথাই নষ্ট করিবেন। তাঁহার বুকখানা যেন সহসা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।…

কিন্তু কোথায় গেলে তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে? তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, এই মুহূর্ত্তেই নীলিমাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁহার সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া 'টকি' দেখার আনন্দটুকু কী সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারে, না সত্যই করিয়াছে সে?

ক্ষিপ্রহস্তে ধুতি পিরহান্ পরিয়া ছড়ি হস্তে ট্যাক্সি ডাকিয়া নীলাম্বু 'স্বপ্নরূপ টকি'র উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

তিন

ট্যাক্সিখানা 'টকি'র দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার যেন মনে হইল—সুকুমার নীলিমার কোমল বাহু ধারণ করিয়া ফুটপাথের অপর পার্শ্বস্থ একটা মটরে গিয়া উঠিয়া বসিল। 'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' 'শো' দেখিবার পরই ঐরূপ বাহুদেশ ধারণ! দেহের সমস্ত রক্ত যেন তাঁহার মাথার উপর চন্‌চন্ করিয়া চড়িয়া বসিল।

সুকুমারদিগের গাড়ী হইতে নীলাম্বুর গাড়ীর মধ্যে বিস্তর মটর, রিক্সাদির ব্যবধান। তদুপরি ট্রাম, বাস পার্শ্বদেশ হইতে ঘনঘন যাতায়াত করিতেছে। ফুটপাতের উপর দিয়া পদব্রজে যাইতে গেলেও বিস্তর পথচারীদের জনতা সহ্য করিতে হয়।

'শো'টা যে মাত্র কয়েক মিনিট আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তবু ভাল যে—দেখা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে যে!

জনতার মধ্যে চীৎকার তুলিয়া ডাকা বড়ই অভদ্রতা-জনক,—নীলাম্বু মস্তকের উপর সিল্ক রুমালখানা উড়াইয়া নীলিমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা! বোধ হইল নীলিমার একবার দৃষ্টি পড়িল বা, কিন্তু সে গ্রাহ্যও করিল না।

'হুড'-ফেলা অন্ধকারময় মটরের গদীর উপর উভয়ে বসিয়াই সহসা যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ কী স্বেচ্ছাকৃত বিদ্রূপ,—না তাঁহার অস্তিত্বের অসম্ভাবনায় উভয়ের মধ্যস্থ প্রাণখোলা আনন্দ-বিকাশ? কে জানে!

নীলাম্বু স্বচক্ষে দেখিলেন,—নীলিমা যেন হাসিতে উছল হইয়া সুকুমারের গায়ের উপর প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। কী বিড়ম্বনা! এটুকু পর্য্যন্তও তাঁহাকে দেখিতে হইল!

ভদ্রতার মাথা খাইয়া নীলাম্বুর মুখ হইতে সহসা বাহির হইয়া গেল,—সুকুমার! সুকুমার!

জনতার দৃষ্টি সহসা তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় মস্তক অবনত করিয়া জনতা ঠেলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইতেছিল,—তিনি জনতার চাপে ওই দণ্ডেই নিষ্পেষিত হইয়া যাইবেন।

হ্যাঁ, এতক্ষণে তাঁহার অস্তিত্বটুকু উহাদিগের মনে জাগিয়াছে নিশ্চয়ই। ওঃ 'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' কী জঘন্য ছবিই না হইবে উহা!

নীলিমাদের গাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই, 'ঘস্ ঘস্ গোঁ—ও' শব্দে গাড়ীখানা সহসা দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে ফুটপাথের জনতা কিঞ্চিৎ পাতলা হইয়া আসিয়াছিল। সজোরে সম্মুখস্থ দুই একজনকে ঠেলিয়া আসিয়াই তিনি একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িলেন। ট্যাক্সি-চালক সরোষ আদেশ শুনিল,—চালাও, ঐ নীল মটর ধরা চাই।

মোড় ঘুরিবার পূর্ব্বেই নীলিমাদের গাড়ী দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। ট্যাক্সি-চালক প্রশ্ন করিল,—উ গাড়ী তো ভাগা, আব্বি কাঁহা যায় গা?

নীলাম্বু উত্তর করিলেন,—পোলক্ ষ্ট্রীট্—নং …

চার

যথাসময়ে সুকুমারের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া গাড়ী থামিল। তিনি ক্ষিপ্রপদে মটর হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সুকুমার অবিবাহিত;—একাকী একটী ভৃত্যসহ নীচের দুই কামরা ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন। উপরের কোঠাগুলিতে বাড়ীওয়ালা জগদীশবাবু সস্ত্রীক বাস

করেন। জগদীশবাবুর ঘরগুলি বিজলীবাতির আলোয় আলোকময়; কিন্তু সুকুমারের ঘরগুলি শুধু অন্ধকারময় নহে,—তাঁহার সদর দ্বার পর্য্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ।

এইবারে উহারা যাইবে কোথায়? নিশ্চয়ই সন্ধ্যার অন্ধকারে উহারা এইখানেই লুকাইয়া আছে। আবার শুধু তাই? হয়ত নিষিদ্ধ প্রেমালাপও চলিতেছে বা! কী উৎসন্নকর ও 'টকি'গুলা! আজই কি না তাহাদিগকে ওই ছবিখানা দেখাইয়াছে তাহারা? কী ভয়ানক!

কম্পিতকণ্ঠে নীলাম্বু হাঁকিলেন,—সুকুমার! সুকুমার! সুকুমার! 'কাকস্য পরিবেদনা',—কেই বা সাড়া দেয়?

বটে! তাহারা অন্ধকারে লুকাইয়া প্রেমালাপ করিবে, আর তিনি কি না বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু মুহূর্ত্ত গণিবেন?

সরোষে ভীম-শব্দে তিনি পুরাতন কবাট জোড়াটার উপর হস্তপদ চালাইতে লাগিলেন। বেচারী কবাট!

লাথি-কিল চড়-ঘুসির চটাপট্ শব্দে জগদীশবাবু দোতলার জানালা হইতে হাঁকিলেন,—কে? কে? কে মশাই আমার দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেল্‌লেন?

সহসা সচকিত হইয়া নীলাম্বু স্থির হইয়া উত্তর করিলেন,—এই দেখুন না মশাই, সুকুমারবাবু ঘরে লুকিয়ে বসে আছেন,—এত ডাক্‌ছি তবু উত্তর দিচ্ছেন না।

সরোষে জগদীশবাবু উত্তর করিলেন,—জবাব দিচ্ছেন না বোলে মশাই, আপনি আমার কবাট জোড়াটা ভেঙ্গে ফেল্‌বেন না কি?

উভয়ের কথা কাটাকাটিতে ইতিমধ্যে পথে দু'-একটা লোক জমিতে সুরু করিল। রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ ফুট-পাথের উপর বসিয়া সুকুমারের ভৃত্য মিঠু কোন্ দেশ-ওয়ালার সহিত আলাপ করিতেছিল। জনতা জমিতে দেখিয়া সেও আসিয়া পড়িল। নীলাম্বুকে মিঠু চিনিত; সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মিঠুর অভিবাদনও বুঝি বা সুকুমারের শিখান অভিনয় মাত্র।

সরোষে কম্পিত-কণ্ঠে নীলাম্বু বলিলেন,—দরজা খোল্, তোর বাবুকে এখনই চাই।

মিঠু ত্বরিৎ-গতি অন্যলোকের বাটীর ভিতর দিয়া গিয়া সদরের দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া দিতে দিতে বলিল,—বাবু তো সেই দুটোয় বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি হুজুর। বোস্‌বেন কি?

মিঠুর অপেক্ষা না করিয়াই নীলাম্বু 'সুইচ্' টিপিয়া আলো জ্বালিলেন। যেন বড় পরিশ্রম হইয়াছে, এই অছিলায় সুকুমারের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আবার একটা 'সুইচ্' জ্বালিলেন। শয্যার দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন,—উহা রচিত হইবার পর এ যাবৎ পর্য্যন্তই অ-কলুষিত রহিয়াছে। তবে?

ইতিমধ্যে জগদীশবাবু উপর হইতে হাঁকিলেন,—মিঠু! অ মিঠু! বাবুটীকে বসিয়ে রাখ্, আমি যাচ্ছি, গিয়ে দেখতে চাই উনি কত বড় লোক—আমার দরজা জোড়্‌টা ভাঙ্গলেন কেন, আর কতখানি?

সুকুমারের কক্ষ দুইটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল,—নীলিমারা এখানে নাই। অতএব আর বৃথা অপেক্ষা করিয়া লাভ কী? ইতিমধ্যে জগদীশ-বাবুর হাঁক-ডাক শুনিয়া তাঁহার ভয় হইল,—কি জানি, ভদ্রলোক আসিয়া এখনই যদি কোনও হাঙ্গামা সত্যই বাধাইয়া বসেন।

নীলাম্বু ত্বরিৎ-পদে সুকুমারের গৃহ হইতে রোয়াকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সদর-পথে অবতরণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক্ এমন সময়ে জগদীশ নীচে নামিয়া আসিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিরাট বপু আন্দোলিত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিলেন,—ধর্, ধর্, লোকটা পালায়। পুলিশ! পুলিশ!

নীলাম্বু আর যায় কোথায়? তিনিও ছুটিতে আরম্ভ করিলেন।

জগদীশবাবু ছুটিতে গিয়া রোয়াকের উপরিস্থ পিচ্ছিল রসাল আম্রবীজের উপর পা দিয়াই ভীষণ শব্দে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহে বিষম চোট্ লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কিন্তু বলিতেছিলেন,—পুলিশ! পুলিশ! শা' পালায়...

এতক্ষণে নীলাম্বু গাড়ীতে উঠিয়াই চম্পট্ দিয়াছেন।

খানিকদূর ট্যাক্সিখানা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবার পর চালক জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁহা যায় গা বাবু?

স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য হইলেও নীলিমার কাণ্ড-কারখানা তাঁহার চিত্তে একটা অকরুণ বিশ্রীভাব জাগাইতেছিল এবং তদুপরি সহসা একটা বিসদৃশ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যেন 'বিসুভিয়াসে'র লীলা চলিতেছিল। কী ভীষণ দাহকর স্রাব সে!

বাটী ফিরিয়া গেলে জগদীশ যদি পুলিশ-সহ আসিয়া তাঁহাকে ধরে,—তাহা হইলে? ভাবিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—কোথায়ই বা যাওয়া যায়। আবার মটর-চালক প্রশ্ন করিল,—কাঁহা যায় গা?

ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে উত্তপ্ত মস্তিস্কপ্রসূত বাণী বাহির হইয়া গেল—চুলোয়!

মোটর-চালক পাঞ্জাবী,—মাত্র কয়েক মাস হইল দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। চুলো কথাটা কয়েকবার শুনিয়াছেও সে। চুলোকে সে চুল্লীর সামিলই করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকটা বাঙ্গালী ড্রাইভারকেও সে নিমতলা ঘাটের চুলোয় যা' বলিতে শুনিয়াছে। অতএব সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া নীলাম্বুর আদিষ্ট চুলোর দিকে গাড়ী চালনা করিয়া দিল।

যথাসময়ে নিমতলা ঘাটের সম্মুখে আসিয়াই সে গাড়ী চালনা বন্ধ করিয়া দিয়াই বলিল,—বাবু, চুলামে আয়া।

রাত্রির অন্ধকারে মুখ বাড়াইয়া নীলাম্বু ঠাহর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থানটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই অন্যমনস্কভাবে বলিয়া উঠিলেন,—এ আবার কোন্ চুলোয় রে?

—কহে বাবু, নিমতলা ঘাট্‌কা চুল্লী?

এত অশান্তির মধ্যেও নীলাম্বুর ওষ্ঠদ্বয় হাস্যে বিস্ফারিত হইয়া গেল। চালক ভাবিল,—এমন সমঝদার না হইলে কী ট্যাক্সি চালান যায়?

সময় কাটাইবার জন্য নামিয়া পড়িয়াই সর্ব্ব দুঃখ-প্রশমক, মহাসাম্যকর ভাগিরথী-বিধৌত পূত স্থান দেখিতে নীলাম্বু চলিলেন।

চালক গাড়ীর 'ষ্টার্ট' বন্ধ করিয়া ছায়ার মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,—কি জানি, সম্ভ্রান্ত হইলেও আরোহী যদি কদলী প্রদর্শন করে।

চিন্তামগ্ন নীলাম্বুকে নিশ্চল থাকিতে দেখিয়া, চালক পার্শ্বে আসিয়া তাগিদ করিল। নীলাম্বু আবার ফিরিলেন। মটর আবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিল।

পথে চালক আবার প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায় গা, বাবু?

এবার আর নীলাম্বুর চুলোয় যাইতে বলিতে সাহস হইল না। পথের আলোয় রিষ্টওয়াচ নির্দ্দেশ করিল রাত্রি দশটা।

নীলাম্বু ভাবিলেন, তখনও বাটী প্রত্যাগমন করা নিরাপদ নহে, পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় করিলে জাগ্রত প্রতিবাসীদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। নীলাম্বু বলিলেন,—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে চলো, সুনীলবরণ উকীলবাবুর বাড়ী।

পাঁচ

......উকীলবাবু যখন বৈঠকখানার লোকদিগকে বিদায় দিয়া বিশ্রামের জন্য অন্দর প্রবেশের চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময়ে 'গুড্ ইভিনিং' বলিয়া নীলাম্বু প্রবেশ করিলেন।

কলেজের সহপাঠী বন্ধুর সহিত শিষ্টাচারে খানিকটা সময় ব্যয়িত হইবার পর, নীলাম্বু বলিলেন,—দেখো ভাই, আজ এক বন্ধুর বাড়ীতে গে তার সদর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে, অনেক ডাকবার পরও সাড়া না পেয়ে দরজায় খুব ধাক্কাধাক্কি করি, ফলে পুরাণো কবাট জোড়াটা ভেঙ্গে যাওয়ার মতন হোয়ে ওঠে, এই না শুনে দোতালা থেকে বাড়ীওয়ালা ছুটে আসে পুলিশ, পুলিশ করে—আমি পালাই। ছোটবার সময় বাড়ীওয়ালা ভাই পা পিছলে পড়ে গে বিস্তর চোট খেয়েছে, দূর থেকে দেখি রক্তও বেরুচ্ছে। চেনা বন্ধুর চাকরটা আমার বাড়ী চেনে। কাজে ভয় হচ্ছে,—পুলিশ না এসে আমার বাড়ী ঘেরাও কোরে বসে থাকে। ভয়েতে ভাই আমি বাড়ীর ধারে মোটে যেতেই পাচ্ছি না। পথে পথে মোটরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—শুধু এখন উপায় কী কি করা যায়, বল?

—ওঃ, এই ? এ আবার একটা 'কেস্'—এর জন্যে আর ভাবনা কি বন্ধু ? তোমার সে বন্ধুটী যদি থানায় গে নালিশ করেন, তবেই 'কেস' হলে হতে পারে। নয়ত এমনে তো পুলিশ আসবেই না, কারণ তুমি তো বাড়ী-ওয়ালাকে ফেলে দাও নি যে, তার নালিশে পুলিশ তোমায় ধর্ত্তে আসবে ?

—তা' বন্ধুটী এখন কি করেন তা'তো বুঝতে পারছি না। তা' ভাই, তুমি এক কাজ কর, আমার সঙ্গে একবারটী আমার বাড়ী চল—মোটর তো সঙ্গেই আছে আমার। যদি কোন পুলিশ হাঙ্গামা হয়, তুমি থাকবে দেখবে অখন। তুমি ব্যবসাদার মানুষ, তোমার 'ফি'টা আমি দিয়ে দিবো নিশ্চয়ই,—সে বিষয়ে কিন্তু করবার কিছু নেই মনে রেখো।

—ওঃ নীলু! তোমার কাছ থেকে যদি ফি না নিলে আমার ব্যবসা অচল হয়, তা' হলে বরং ব্যবসাটা তুলে দিলেই ভাল হয় না ? তবে সময়টা বড় অসময়, এখন আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলুম এই যা'—খাওয়া হয় নি এখনো।

—তা' বুঝেছি তোমার কষ্ট হবে এ সময়ে। তা' বন্ধুর জন্যে আধঘণ্টাটাক সময় নষ্টই কর এই আমার অনুরোধ, কি আর বলব বল ? তুমি বন্ধু বলেই তোমার কাছে এলুম, নয়ত ফি দিলেও এত রাত্রে হয়ত কেউ যেতে চাইবে না ভাবলুম। তুমি আমার অনুরোধটুকু রাখবে, এটুকু আশা করতে পারি।

—তবে আর কি কোরব বল। বন্ধুর অসময়ে দেখার নামই হচ্ছে যখন বন্ধুত্ব, তখন চলই দেখা যাক্।

উভয়ে মটরে গিয়া উঠিলেন।

ছয়

বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইলে নীলাম্বু অগ্রে নামিতে সাহস করিলেন না, সুনীলবরণকে এক রকম জোর করিয়া নামাইয়া দিয়াই, গাড়ীর অন্ধকারে চুপিচুপি বলিলেন,—তুমি বরং চারিধারটা ঘুরে দেখে এস, কেউ কোথাও আছে কি না।

বন্ধুর খাতিরে উকীলবাবুটাকে গোয়েন্দাগিরিও করিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে সুনীলবরণের আহ্বানে নীলাম্বু গৃহ-প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ হইতে মটর-চালক হাকিল, —বাবু, ভাড়া ?

ফিরিয়া দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া নীলাম্বু দেখিলেন— সতের টাকা চোদ্দ আনা।

ওঃ, এতগুলি টাকা ভাড়া উঠিয়াছে! সঙ্গে তো তাঁহার এত টাকা নাই। একমাত্র নীলিমার কাছেই মাহিনার টাকা সমস্ত জমা পড়ে। সে যদি এতক্ষণে নাই-ই আসিয়া থাকে ?—

মোটর-চালককে আশ্বাস দিয়া বন্ধুকে বৈঠকখানা-ঘরে বসাইয়াই নীলাম্বু চলিলেন নীলিমার অন্বেষণে। পথে পদর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। নীলাম্বু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর মা-ঠান ফিরেছেন ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কখন্ ?

—আপনি চলে যাবার আধঘণ্টা বাদেই।

ওঃ, তবে 'শো' দেখার পরই ফিরিয়াছে সে। তবে তিনি বৃথাই সুকুমারের বাটী গিয়া অনর্থক একটা ফ্যাসাদ জুটাইয়া বসিয়াছেন, ফলে কপালে ঘটিয়াছে পুলিশের জন্য উৎকণ্ঠা এবং অর্থদণ্ডও ? হায়!

ইজিচেয়ারে শায়িতা, উপন্যাস-পাঠে-রতা নীলিমাকে দেখিয়া নীলাম্বু প্রশ্ন করিলেন,—এই যে! তুমি এখনও ঘুমোয় নি যে ?

নীলিমা নিরুত্তর। তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল,—তিনিও যেন অন্তর্তাপে ফুলিতেছেন। ইতিমধ্যে মটর-চালক হাঁকিল,—বাবু, ভাড়া ?

মটর-চালকের তাড়নায়, অন্য প্রসঙ্গ নীলাম্বুর মনের মধ্যেই রহিয়া গেল। নীলাম্বু বলিয়া ফেলিলেন,— শীগ্‌গির গোটা পঁচিশ টাকা দাও তো মটর ভাড়া দেবো, কাল তোমায় দেবো অখন্।

নীলিমার স্ফীত অধর দেশ সহসা বিস্ফারিত হইল। নীলাম্বু সরোষ গর্জ্জন শুনিলেন,—এখানে কি টাকার গাছ পোঁতা আছে যে, রাত বারোটা পর্য্যন্ত ইয়ার্কি মেরে, অধীরাকে নে 'জয়-রাইড্' কোরে আস্‌বেন বাবু, আর আমি

গুণব তার খরচ? লজ্জা করে না? চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে।

—হা ভগবান্! এই বদ্‌নাম ছিলো আমার কপালে? কোথায় আমি তোমার আর সুকুমারের খোঁজে সারা কোল্‌কেতায়য় ঘুরে বেড়িয়েছি, আর কোথায় কি না, বদনাম দিচ্ছ অধীরার সঙ্গে 'জয়-রাইডে' রাত কাটিয়েছি বোলে?

অধীরা হইতেছে,—নারী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের অপর একজন পুরাতন কুমারী-সভ্য। এই অধীরার সহিতই নীলাম্বুর বিবাহের পূর্ব্বে রীতিমত কোর্টসিপ্ চলিতেছিল বলিয়া বাজারে গুজব। পরে নীলাম্বুর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পিতার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার পরিণয় সঙ্ঘঠন হয় নীলিমার সহিত। নীলিমা ছিলেন,—নিতান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থের সুরূপা কন্যা। বিবাহের পর, সংঙ্ঘর সভ্যা হইয়া তাহার ওই রূপই পরিণতি ঘটিয়াছিল!

নীলিমা বলিলেন,—তুমি শপথ কোরে বল্‌ছ যে, অধীরার সঙ্গে জয়-রাইডে কাটাও নি এতক্ষণ?

না, না, না। এই দিব্বি গাল্‌ছি,—না। বিশ্বাস করো। ভাল বিপদ্! আবার কি না উলটা চার্জ্জও!

নীলিমা নীলাম্বুর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন,—তোমার দিব্বি আমি বিশ্বাসই করি না। একগলা গঙ্গাজলে বসে বল্লেও,—না।

মটর-চালক পুনঃপুনঃ 'হর্ণ' দিয়াও ফল না পাইয়া পুনরায় চীৎকার করিল,—বাবু! বাবু! বাবু!

বাক্যব্যয়ে কাল কাটাইবার অবসর না পাইয়া নীলাম্বু ঝটিতি চেক বইখানা বাহির করিয়াই বৈঠকখানা ঘরে ছুটিলেন। কি জানি চেক বহিখানা শুদ্ধ যদি নীলিমা কাড়িয়া লয়েন রাগের মাথায়!

পঁচিশ টাকার একখানা চেক সুনীলবরণের নাম বরাবর লিখিয়া দিয়া নীলাম্বু বলিলেন,—ভাই, বাড়ীতে এসেও সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছি। আমার স্ত্রী বলেন, আমি না কি কোন্ এক কুমারীকে নিয়ে 'জয়-রাইডে' বেড়িয়ে বেড়িয়েছি। সেইজন্যে মটর ভাড়াটুকুও দেবেন না। কাজেই এ বিপদের সময় তোমার বন্ধুতার দোহাই দিয়ে তোমার ওপর নির্ভর করছি। শুধু তুমি আজকের ওই ড্রাইভার বেটাকে কোনও গতিকে,—নিজের কাছ থেকে টাকা দিয়ে বিদেয় কোরে দাও। কাল সকালে চেকখানা ভাঙ্গিয়ে নিও এখন।

বৈঠকখানার পার্শ্বে আসিয়া নীলিমা আড়ি পাতিয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছিলেন। সহসা উভয়ের সম্মুখে আসিয়া নীলিমা বলিলেন,—আপনি যেই হোন্ না কেন মশাই, আপনাকে ওঁর বন্ধু বোলেই মনে কোরে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি,—আচ্ছা, বলুন দেখি এত রাত্তির পর্য্যন্ত কোনও ভদ্দর লোক পথে পথে শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে অত টাকা মটর ভাড়া দেয়, যদি না সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোক থাকে?

সুনীলবরণ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন, তৎপরে বলিলেন,—মিসেস্ চন্দর, আমি আপনার স্বামীর বাল্যবন্ধু, আমি জানি, উনি সেরকম প্রকৃতির লোকই নন্।

নীলিমা,—তবে কি বোল্‌তে চান,—আমারই যত দোষ?

সুনীলবরণ,—না, তা বল্‌ব কেন?—শুনেছি না কি আপনারা উভয়েই নারী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য।

নিলিমা—হ্যাঁ, তা'তে আর হয়েছে কী?

সুনীল,—তাই যদি হয়, তবে অপর নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাধা দেওয়াও যে আপনাদের উভয়ের পক্ষে অন্যায়, সঙ্ঘ নিয়ম বিরুদ্ধ, এটা ঠিক নয় কি?

নীলিমা—তাই বোলে কি বোলতে চান,—আমার বর্ত্তমানে, আমায় অপমান কোরে উনি অন্য নারীতে অনুরক্ত হবেন, আর আমি চুপ থাক্‌ব?

সুনীল—আমি জানি, আজকের রাত্রে উনি ওরকম কোনও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। তবু যদি উনি সত্যিই ও রকম কিছু করেন, তা হলেও সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ কোরে আপনার ওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা উচিতই হয় না—বুঝেই দেখুন না? আমি অবিশ্যি আপনাদের সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন সব জানলেও, ওর সভ্য নই,—এই-ই যা আমার দুর্ভাগ্য।

—বাধা দিয়া নীলাম্বু বলিলেন,—(বন্ধুর দিকে

তাকাইয়া) দেখলে তো ভাই আমি কি তোমার সম্মুখে, ওঁর অবাধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনও দোষারোপ করেছি ?

সুনীল,—ওঃ, তবে তুমিও ওই রকম একটা দোষারোপ মিসেস্ চন্দরের ওপর দিতে চাও; অন্ততঃ, মনে মনেও এখন বুঝেছি ট্যাক্সি ভাড়ার কারণটা কী ?

নীলাম্বু মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—মনে মনে চাইলেও আমি পুরুষ বন্ধুর সম্মুখেও অন্ততঃ আমার স্ত্রীর নামে কোনও দোষারোপ কর্‌তে চাই নে,—দোষারোপ করাটাকে আমি আত্ম-অপমানকর বোলেই মনে করি।

ইতিমধ্যে মটর-চালক আবার হাঁকিল। সুনীলবরণ উঠিয়া পড়িয়াই যাইতে যাইতে বলিলেন,—দেখুন, আপনারা উভয়েই ওই সজ্যটা ত্যাগ করুন, তবে যদি পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাসটুকু ফিরে পান। সজ্যটা যুবক-যুবতীদের ছেলেখেলা বই আর কিছু আমার মনেই হয় না। বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রেমের পক্ষে ওটা শুধু অপমানজনক নহে,—ওটার হন্তারকও।

নীলাম্বু সাগ্রহে বলিলেন,—তুমি যা' বলেছ ভাই। ওই অতগুলো টাকার বিনিময়ে আমিও আজ এই সত্য-টুকুর অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ!

সজ্য-ত্যাগে নীলাম্বু যদি অধীরার সঙ্গ বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে নীলিমার পক্ষে মন্দই বা কি? সেও তো একটা বিরাট অশান্তি হৃদয়ে পোষণ করে।

নীলিমাও সানন্দে বলিলেন,—বেশ ত, আমিও সজ্য ত্যাগ কোরতে খুব রাজী আছি—যদি উনি শপথ করে বলেন যে, ভবিষ্যতে অধীরার সঙ্গে আর তেমন করে অন্তরঙ্গতা রাখবেনই না উনি ?

তাই হবে নীলু তাই-ই হবে। এসো, বড্ড রাত হয়েছে, বলিয়া নীলাম্বু নীলিমার হস্তধারণ করিয়া সুনীলবরণকে বিদায়-জ্ঞাপন করতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নীলিমার অদর্শনে যে মেঘ নীলাম্বুর চিত্তে জমাট হইয়াছিল, তাহা বুঝি এতক্ষণে উড়িয়াই গেল...

পথে যাইতে যাইতে সুনীলবরণের মনে প্রশ্ন জাগিতে-ছিল—সভ্যতার পূর্ণ আলোক পাইয়া এবং স্বাধীন প্রেমের সুযোগ লাভ করিয়াও এই সব দম্পতী সাংসারিক শান্তি-লাভ করিতে পারেন না কেন, ইহাই আশ্চর্য্য লাগে!

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বাতাস দিল দোল

শ্রীশচীন্দ্র বসু

এমন অনেক ঘটনা জগতে ঘটে থাকে দৃশ্যতঃ যার কোনো কারণ নেই,—জল পড়া, পাতা নড়ার মত যা সহজ নয়। নভেলের অনেক ব্যাপার আমরা অসম্ভব বলে বিশ্বাস কোরতে চাই না, কিন্তু অনেক সময় চোখের সামনে এমন কিছু ঘটতে দেখা যায়, যা তার চেয়ে অবিশ্বাস্য, তার চেয়েও অহেতুক। যে জিনিষকে আমরা স্বর্গীয় বলে অভিহিত করে থাকি, হৃদয়ের কোমলতম অংশে যার স্থান, তার ফল যে কি রহস্যময় ও অচিন্ত্যনীয় হতে পারে একটি ঘটনায় আমি তাই বোলব। এখন স্পষ্ট অনুভব কোরতে পারি জীবনের স্বল্প শান্ত প্রবাহের নীচে এমন অনেক আবর্ত্ত আছে, যার খোঁজ আমরা নিজেরা জানি না, অথচ যা আমাদের ভাগ্য পরিচালনা করে।

তের চৌদ্দ বছর যখন বয়স,—সেই যখন কণিকা চ্যাপ্টা লম্বা বেণীটা কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ফেলে ভুরুর এক সুন্দর ভঙ্গীসহকারে নেচে বেড়াতো,—তখন থেকে মর্ম্মরের সঙ্গে তার আলাপ। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তার বাল্যের সে উচ্ছলতা কমে এসেছে। হয়তো বা কতকটা মর্ম্মরের স্পর্শের প্রভাবে সে উৎসব এবং উদ্বেলতা ততটা পছন্দ করে না। কোথাও বড় বেশী সে যায় না এক কলেজে ছাড়া। যখন বাড়ীতে বসে কাপড়ে ফুলতোলা বা 'সঞ্চয়িতা' থেকে টুকরো টুকরো কবিতা পড়া আর ভালো লাগে না, তখন সে চলে আসে মর্ম্মরের কাছে। মর্ম্মর থাকে সহরের এক অনাখ্যাত প্রান্তে একটা কাঠের বাড়ির দোতালার একটা একটা ঘরে। ঘরের একদিকে তার সামান্যতম আসবাব-পত্র নিতান্ত অগোছালভাবে ছড়ানো আর একদিকে দু'-তিনটি ছোট টুল, একটা ইজেল, তুলি, রং আর ক্যান-ভ্যাস। ঘরের সামনে ছোট্ট একটি বারান্দা। যেখান থেকে দেখা যায় ধুলোভরা রাস্তাটা আর দূরের ধূম উদ্গীরণী কারখানার চিমনী। কণিকা যখনই আসে, দেখে ও বসে বসে তুলি চালাচ্ছে অথবা হয়তো জানালা দিয়ে চেয়ে আছে; তখন তার চোখ দু'টি দেখলে মনে হয় যেন ওর সমস্ত আত্মা ও ছড়িয়ে দিচ্ছে জগতে ওই চোখের মধ্য দিয়ে। তার চেহারা পার্থিব অর্থে দেখতে গেলে সুন্দর নয়, মাঝারি রকম তার দৈর্ঘ্য, সাদা ফ্যাকাশে রং, তেলহীন চুলগুলি নিজেদের খুসীমত অবিন্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু তার চোখ! আঃ, সে যখন চোখ তুলে তাকায়, তখন অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে ভুলে যেতে হয়,—তা'তে আকাশের সুনীল কারুণ্য আর সমুদ্রের অতল রহস্য। তার এত সব যাবার জায়গা থাকতে কণিকা এখানেই আসতে ভালো-বাসে, অনেক সময় মর্ম্মর টের পায় না তার আগমন, টের পেলে একটু হেসে বলে, বোসো—তারপর আবার নিজের কাজে মন দেয়।

কণিকা ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, হয়তো বিছানাটা ঝেড়ে আবার পেতে দেয়, কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখে, ওর আঁকা ছবিগুলি খুঁজে খুঁজে বের করে দেখে, অথবা হয়তো বসে থাকে শুধু চুপ করে। বেশী কথা কেউ বলে না, বেশী শব্দ কেউ করে না। এখানে এলে তার মনে হয়,—সে যেন বিশাল এক মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে সূর্য্যাস্ত দেখছে, আর কোথা থেকে যেন আসছে মৃদু ধূপের গন্ধ,—অজানিত অবাস্তব কোনো উৎস থেকে।

প্রভাংশুর সঙ্গে মর্ম্মরের চেনা ছাত্রজীবনের আরম্ভে; মাঝের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে যৌবনের আরম্ভে পড়াশুনার ক্ষেত্রেই আবার তারা একত্রিত হয় এবং নিজেদের সম্পূর্ণ অলক্ষিতে ওরা পরস্পরকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেয়। কোনোদিন ওরা নিজেদের সে

মনোভাব অপরের কাছে উচ্চারণ করে নি, কিন্তু রক্তের উষ্ণ স্রোতে এক অদ্ভুত আকর্ষণ তারা অনুভব কোরতো। বাল্য-বন্ধুত্বের ভঙ্গুরতা ছাড়িয়ে এসে তারা বয়স্কতার প্রগাঢ় আত্মীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হোলো।

তারপর মর্ম্মর চলে এলো তার কাঠের ঘরে, তার ক্যানভ্যাস আর তুলির কাছে। প্রভাংশু এসে বোললো, চল্লুম বিদেশে বছর তিনের জন্য, চিঠি লিখো।

মর্ম্মর বোললো, তার চেয়ে চিঠি না-লেখাটাই আমাদের মনে রাখার সূত্র হোক্।

—ঠিক বলেছো, প্রভাংশু বোললো, চিঠি না-লিখলে যদি ভুলে যাই তো সে-ভোলায় দোষ নেই।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্ক মর্ম্মর বোললো, ভোলা কি এত সহজ।

তার তিন বছর পর প্রভাংশু ফিরলো, সরকারী চাকরী পেল, কোলকাতায় বাসা কোরলো। কাঠের ঘরে মর্ম্মরের সঙ্গে সে দেখা কোরতে এল, তারপর প্রায় প্রতিদিনই সে আসতে লাগলো। সাধারণ বলা-কওয়া যখন শেষ হোলো, এল নিস্তব্ধতার পালা; দু'জনে বসে থাকতো চুপচাপ, আর তখন প্রভাংশু অনুভব কোরতো সেই পুরোণো আকর্ষণ, সেই রক্তের উষ্ণ তীব্র স্রোত যা তাকে ভাসিয়ে নিতো। এক-এক সময় সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো মর্ম্মরের দিকে; ভাবতো, ও কি বুঝতে পারে, ও কি টের পায় এই রক্তের সূক্ষ্ম টান! কিন্তু মর্ম্মর চিরদিনের মতই নীরব, রহস্যময়।

এমনি এক সময় সে দেখলো কণিকাকে,—ধূপের গন্ধের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে যে ম্লান সূর্য্যাস্ত দেখছে।...কণিকা চমকে উঠলো, পশ্চিমের লাল আকাশটা রংএর ভারে যেন ফেটে পড়তে চায়; উঃ কি উজ্জল, কি তীব্র সে রং! শারীরিক কোনো যন্ত্রণার মত সেই রং তার চোখকে আঘাত কোরলো, তার শান্তি প্রাত্যহিক ধ্যান থেকে সে জেগে উঠলো। তার প্রতি দিনের গোধূলির সূর্য্যাস্ত দেখার ভেতর এ অভিজ্ঞতা তার হয় নি,—এত রং, এত তীব্রতা, এই আঘাত, এই জেগে ওঠা, এ তার কাছে নতুন। তার ধ্যান থেকে সে জেগে উঠে দেখলো এই তীব্রতা, এই বিরাট উত্তেজনা সে এর আগে অনুভব করে নি।

আর প্রভাংশু যেন চলতে চলতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালো। কোলাহলমুখর রাজপথ দিয়ে যেতে সে হঠাৎ এসে পড়লো কোন্ অজানা রহস্যময় রাস্তায়, যেখানে কোনো উৎসব নেই, চাঞ্চল্য নেই, জনতা নেই,—যেখানে চোখের সামনে প্রান্তরের শেষে ম্লান সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। সে মুগ্ধ হোলো, কিন্তু এক অদ্ভুত আশঙ্কায় বিমর্ষ হয়ে উঠলো। এ কি মৃত্যুর জগতে সে এলো! কিন্তু না, সে বাঁচাবে, এই ম্রিয়মান অস্ত-জগতকে সে তার প্রাচুর্য্য দিয়ে বাঁচাবে, তার বাঁচার স্পর্শ দিয়ে সে এখানে উৎসব গড়ে তুলবে।

মর্ম্মর তখন কণিকার ছবি আঁকছে, তার প্রাণের সবটুকু রং দিয়ে। সামনের টুলটায় কণিকা বসেছিলো, তার হঠাৎ নড়ে ওঠা দেখে সে ফিরে তাকিয়ে দেখলো দরজায় প্রভাংশু দাঁড়িয়ে। সাধারণভাবে সে ওদের দু'জনের পরিচয় করে দিলো।...

...মর্ম্মরের ছবি আর অগ্রসর হচ্ছে না, কণিকা আজ কাল আর তত আসে না। কেন আসে না, ভাববার সময় তার নেই,—হয়তো পড়া শুনো, হয়তো সময়াভাব। সে সব চিন্তা মর্ম্মরের মনকে কোনদিন পীড়িত করে নি, কণিকাকে সে সূক্ষ্ম নৈর্ব্যক্তিকভাবে মেনে নিয়েছে।

দিন কতক পর একদিন সন্ধ্যায় এল কণিকা, ওর চোখ দুটো যেন একটু অস্বাভাবিক ম্লান। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বোললো, তুমি কি রাগ করেছো?

—কেন?

—এ ক'দিন আসি নি বলে?

—না-না, মর্ম্মর হেসে বোললো, তারপর ছবির ঢাকনাটা তুলে বোললো, এসো।

—না, আজ থাক্, আজ থাক্, তুমি এখানে এসে বোসো।

মর্ম্মর ফিরে এলো, কণিকা দু'হাতের ভেতর মুখ ঢেকে বসে রইলো। অনেকক্ষণ পর এক অদ্ভুত সস্নেহে মর্ম্মর ডাকলো, কণিকা।

কণিকা মুখ তুললো; তার শুভ্র মুখের ওপর চোখের জলের ধারা বয়ে গেছে, ঝড়ে আহত পদ্মের মত। রুদ্ধ স্বরে সে বোললো, মর্ম্মর, আমি তোমায় ভালোবাসি।

মর্ম্মর বিস্ময়হীন ভাবহীন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বোললো না, তার দেহ যেমন ছিল, তেমনি নিশ্চল রইলো।

—মর্ম্মর, বিশ্বাস করো আমি তোমায় ভালোবাসি, অনেক দিন থেকে। তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, তা' হলে আমি মরে যাবো, তুমি আমায় ধরে রাখো। ও রকম করে চেয়ে আছো কেন, আমার ভয় করে। কথা বোলছো না কেন? বলো, কিছু বলো। আমি তোমায় ভালোবাসি মর্ম্মর, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না? আঃ, তুমি কি সুন্দর করে আমার ছবি একেছো! ও ছবিটা আমায় দেবেতো, বলে কণিকা ছবিটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

ঘরে অন্ধকার জমছে, আলো জ্বালা হয় নি। এতক্ষণ মর্ম্মর পাথরের মত স্তব্ধ হয়েছিল, এবার সে ওর দু'হাত ধরে ওকে আবার বসালো। কতক্ষণ সে আবার বসে রইলো চুপ করে; তার চোখ বুজে এলো অপরিসীম বেদনায়, দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁট চেপে ধরলো। কিন্তু তারপর সে ফিরে এলো নিজের মধ্যে, ওকে কাছে টেনে আনলো, ওর কাপড়ের আঁচল দিয়ে সাবধানে ওর মুখ মুছে দিতে লাগলো। এবার আর কণিকা চেপে রাখতে পারলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর কোলে উচ্ছ্বসিত কান্নায়। বোলতে লাগলো, আমায় ক্ষমা করো মর্ম্মর, ক্ষমা করো।...

আর ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে খুব আস্তে মর্ম্মর বোললো, কেন কাঁদো কণিকা, কোনো ভয় নেই। ও আমার অনেকদিনের বন্ধু, ওকে আমি বড় ভালোবাসি। কোনো ভয় নেই তোমার, কোনো ভয় নেই।

আর কান্নার অর্গলহীন স্রোতের ভেতর থেকে কণিকা শুধু বোলতে থাকলো বারবার, আঃ, তুমি কি ভালো মর্ম্মর, তুমি কি ভালো।...

প্রভাংশুকে মর্ম্মর সেদিনের পর আর ভালো করে দেখে নি। এর ভেতর সে এসেছেও কম, আর যখন এসেছে তখন বেশীক্ষণ থাকে নি। যেটুকু থেকেছে বিশেষ কোনো কথাই সে বলে নি, এসেই যাবার জন্য ছটফট করেছে। মর্ম্মর লক্ষ্য না করে পারে নি ওর অন্যমনস্ক-ভাব, ওর কপালে কুঞ্চন-রেখা, ওর অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধতা। ধৈর্য্যসহকারে সে অপেক্ষা করেছে হয়তো প্রভাংশু কিছু বোলবে, হয়তো ওর ভেতরকার চাপা কষ্টটা প্রকাশ করে নিজেকে হাল্কা কোরবে, কিন্তু প্রভাংশু শুধু কতক্ষণ অস্বাভাবিকভাবে ইতস্তত করে ফিরে গেছে।

প্রভাংশুর জীবনে তখন এসেছে সবচেয়ে বড় সন্ধিক্ষণ। এ পর্য্যন্ত তাকে কোনোদিন বিশেষ চিন্তার মধ্যে আসতে হয় নি। কৃতকার্য্যতাকে আদর্শ করে সে এ পর্য্যন্ত মসৃণ-ভাবে চলে এসেছে; কিন্তু এখন, যেখান থেকে সে সবচেয়ে কম আশা করেছিল সেখান থেকে এলো বাধা, এলো দ্বিধা। মর্ম্মরের কাছে সব খুলে বলাই এক-একবার সে সঙ্কল্প করেছে, কিন্তু সন্দেহ তাকে সেদিকে অগ্রসর হতে দেয় নি। যে উষ্ণ সূক্ষ্ম আকর্ষণ সে রক্তের মধ্যে অনুভব কোরতো, শুধু তার ওপরই নির্ভর কোরতে সে ভরসা পায় না। মর্ম্মর কি এতদিন পরেও এমন কঠিন সন্ধিক্ষণেও তাকে ভালোবাসতে পারবে? সে বিশ্বাস কোরতে পারে নি। আর যদিও মর্ম্মর এখনও ঠিক আগের মতই থেকে থাকে, পরস্পরের সেই অদৃশ্য আকর্ষণ যদিই বা এখনও সে অনুভব করে, তবু এ রকম অভাবিত সমস্যায় কি সে নির্ব্বিকার থাকতে পারে? আর যাই হোক, মানুষের মনোবৃত্তি প্রতি মানুষের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক। এবং এই কঠিন 'প্যাশন'কে মানুষের পক্ষে জয় করা সহজ নয়। কাজেই প্রভাংশু বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন সে দ্বিধাদ্বন্দ্বের এমন চরমে এসে পৌছেছে যে, একটা কিছু তাকে কোরতেই হবে। তার হৃদয়ের উদ্বেল স্রোতকে সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, তার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন তাকে আত্মসমর্পণ কোরতেই হবে। মানুষ জীবনে অন্তত একবার এমন প্রতিজ্ঞা করে

যা সে না রেখে পারে না, এখন এসেছে সেই সময়। এখন সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করে যে, জগতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে ভালোবাসাকে আটকে রাখা যায়, এমন কিছু নেই যার জন্য সে ভালোবাসা ত্যাগ কোরতে পারে। না, না—তাকে পেতেই হবে। হয়তো এ নিতান্ত স্বার্থপরতা, কিন্তু এতে অগৌরব নেই,—কারণ সে মানুষ, দেবতা নয়। এ পাওয়া সব স্বার্থের অতীত,—এ না হ'লে তার বাঁচা অর্থহীন। আর নয়, এবার তাকে নির্দ্দয় হতে হবে, তাকে দাবী কোরতে হবে, এখন মর্ম্মরকে তার দরকার।

সেই যে সেদিন কণিকা এসেছিল সন্ধ্যায়, তার দিন-কয়েক পর মর্ম্মর বিকেলে রাস্তায় বেরুলো এমন সময় প্রভাংশুর সঙ্গে সে মুখোমুখি এসে পড়লো; থমকে যেয়ে প্রভাংশু শুধু বোললো, এই যে!

তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মর্ম্মর হঠাৎ বোললো, ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়াবে প্রভাংশু?

প্রভাংশু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বোললো, চলো।

একটা ভালো হোটেলে ওরা যখন এসে বোসলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর মর্ম্মর বোললো, আমি আজ তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম।

প্রভাংশু বোললো, আমিও যাচ্ছিলাম তোমার কাছে,—তোমাকে একটা কথা বোলতে হবে।

মর্ম্মর বোললো, তার আগে আমার কথাটা শেষ কোরতে দাও। তারপর একটু নীরব থেকে টেবিলের দিকে চোখ রেখে বোললো, প্রভাংশু, তোমার কাছে এ পর্য্যন্ত কোনোদিন কোন অনুরোধ করি নি, কিন্তু আজ একটা কোরবো। আমার খুব ইচ্ছা তুমি এ কথাটা রাখো।

প্রভাংশু এতক্ষণ ঠিক এই ভয়টাই কোরছিল, বোললো, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে কোরবো, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে যা নিজের জন্যও মানুষ কোরতে পারে না; আশা করি তেমন অনুরোধ তুমি আমায় কোরবে না।

মর্ম্মর এ কথার সোজা জবাব কিছু দিল না, অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইলো মাটির দিকে, তারপর হঠাৎ তার চোখ তুলে তাকালো প্রভাংশুর দিকে, মৃদুস্বরে বোললো, প্রভাংশু, তুমি কণিকাকে বিয়ে করো।

প্রভাংশু চমকে তাকালো ওর দিকে, কিন্তু মর্ম্মরের চোখ যেন ওর এ দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো,—সে-চোখের দিকে চেয়ে প্রভাংশু তার চোখ নামিয়ে নিল।

শান্ত অকৃত্রিম স্বরে মর্ম্মর বোলতে লাগলো, ওকে আমি ছোটকাল থেকে জানি, আমি বুঝতে পেরেছি ও তোমায় ভালোবাসবে। আর তোমাকেও একথা বোলতে পারি যে, ওর মত মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া তোমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়,—তুমি সে গৌরব হারিও না। ওকে তুমি বিয়ে করো, যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে তুমি বিয়ে করো, এতে তোমরা সুখী হবে। আর জেনো, এ বিয়েতে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না। বলো, প্রভাংশু, বলো, আমার কথা রাখবে,—বলে সে তার হাতটা এগিয়ে দিল।

অনেক, অনেকক্ষণ পর এক অদ্ভুত স্বরে প্রভাংশু বোললো, আমায় একটু সময় দাও।

পরদিন বিকেলের ডাকে মর্ম্মর তার প্রশ্নের জবাব পেল:

—মাপ কোরো মর্ম্মর, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না,—আর মাপ কোরো এই তোমায় না বলে চলে যাওয়া। কিন্তু এর জন্য বোধ হয় আমি দায়ী নই। মর্ম্মর, তুমি যদি দেবতা না হয়ে মানুষ হতে, তুমি যদি তোমার বন্ধুত্বের বাইরে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোনোদিন টের পেতে, তুমি যদি পৃথিবীটাকে ঠিক পৃথিবী বলেই দেখতে পারতে,—তা' হ'লে হয়তো আমি বাঁচতে পারতাম, তোমার কণিকাকে বিয়ে কোরতে পারতাম। কিন্তু তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অমানুষিকভাবে অমানুষ। মর্ম্মর কেন তুমি এত উদার হতে গেলে? তুমি কি ভাবো আমি জানি না তুমি কি নিদারুণ কষ্টে সেদিন ও কথাগুলো বলেছিলে? কিন্তু কথা দিয়েই কি সব ঢাকা যায়! কোনো একটা ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে প্রকাশ না করে

পারে না। তাই তুমি যখন ওর ছবির ওপর তুলি বোলাতে, তখন তুমি আমার কাছে ধরা দিয়েছো।

—দুঃখ কোরো না মর্ম্মর, আমাদের তিনজনের একসঙ্গে বাঁচা সম্ভব নয়। চলে যেয়ে আমি যদি তোমার ত্যাগের সামান্যতম প্রতিদান দিতে পেরে থাকি, তবে সেটুকুই আমার সার্থকতা। তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ,—কিন্তু তুমি যদি পৃথিবীর মানুষ হতে, তুমি যদি মানুষের মত ভালোবাসতে, তা' হ'লে হয়তো তোমায় আরো ধন্যবাদ জানাতে পারতুম। ইতি।

···তারপর সন্ধ্যা এলো, এলো রাত। ভাষাহীন, নীরব অন্ধকারে ছায়াময় একটা প্রেতের মত সে বসে রইলো,—মাঝরাতে ক্ষীণ একটু চাঁদের হল্‌দে আলো, জানলা দিয়ে তার পায়ের কাছে পড়লো,—তারপর আস্তে আস্তে তাও সরে গেল। তারপর আকাশের তারারা ম্লান হোলো, রাত্রি হোলো শেষ। তখন সে উঠলো।

বিকেলের আলো যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন কণিকা এলো। আজ অনেকদিন পর তার বড় ইচ্ছে হয়েছিল, অজানা উৎসহতে আসা ধূপের গন্ধের ভেতর দাঁড়িয়ে প্রান্তরের শেষে ম্লান সূর্য্যাস্ত দেখার। কিন্তু ঘরে এসে সে দেখলো তার চেহারা বদলে গেছে; ওর বাক্স আর বিছানা বাঁধা রয়েছে, সেই বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো,—দু'জনেই বুঝলো কিছু বলার আর কোন প্রয়োজন নেই। তারপর মর্ম্মর চিঠিটা দিল ওর হাতে। কিছুক্ষণ পর কণিকা বোললো, আচ্ছা, আমায় ফেলে কোথায় চলেছো ?

অনেকক্ষণ পর মর্ম্মর কথা বললো,—যেন বহু যুগ সে কথা বলে নি, তার স্বর যেন তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে এলো কোন্ সম্মোহিত অবচেতনা থেকে,—কোথায় যাবো সেকথা জিজ্ঞাসা কোরো না। এতদিন করেছি শুধু শিল্পের সাধনা, এবার কোরবো মানুষ হওয়ার তপস্যা।···হয়তো ও ঠিকই বলেছে, হয়তো আমি ওকে বড় বেশী ভালোবেসেছিলাম, হয়তো সেজন্যই ওকে হারাতে হোলো। কিন্তু সত্যিই কি তা'তে আমি সুখী হতাম না ? তোমাকে দোষ দিই নে কণিকা, তুমি আমায় এত ভালোবেসেছো যে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমার শিল্পকে, আমার সাধনাকে তুমি ভালোবেসেছিলে। কিন্তু পুরুষ যেমন শুধু একটা সাধনাকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে, স্ত্রীলোকে তা পারে না। তাই তুমি যখন ওকে ভালোবাসলে, তখন আমার সব ব্যথার মধ্যেও আমি বিস্মিত হই নি। ওর ছিল স্বাস্থ্য, ছিল রূপ, ছিল বাঁচার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পদ; তোমার কাছে তার প্রয়োজনও কম নয়। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমাদের সুখী কোরতে আমার সবটুকু দিয়ে। কিন্তু ও তা নিল না, ফিরিয়ে দিল,—কারণ পৃথিবীতে জন্মে মানুষ হয়েই সে থাকতে চেয়েছিল।... হয়তো আমারি ভুল, হয়তো আমি ওকে বড় বেশী ভালোবেসেছিলাম।

—যা হবার তা' তো হোলো, কিন্তু তুমি কেন চলে যাচ্ছো ?

-কেন যাচ্ছি তা নিজেও জানি না ভালো করে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমাকে যেতেই হবে।

কণিকা একটু চুপ থেকে আবার বোললো জানলার বাইরের দিকে চেয়ে,—এই একদিনের ভেতর আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম ঠিক, সে ভালোবাসায় ফাঁকি ছিল না; কিন্তু একদিন আমাকে আবার তোমার জন্য অনুতাপ কোরতে হোতো; কারণ, আমি ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, তোমার সাধনাকে, তোমার এই ঘরকে,—যেখানে তোমার আত্মাকে আমি স্পর্শ কোরতে পারি। সে ভালোবাসাকে আমি আজ আরো বেশী করে অনুভব কোরছি,—আজ যদি তোমাকে হারাই, তবে কি নিয়ে বাঁচবো ? মর্ম্মর, তুমি যদি চলে যাও তা'তে কার কি লাভ হবে ? তুমি কি মনে করো সে তা'তে তৃপ্তি পাবে ? আমাদের জীবনে দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আর মিছিমিছি বাড়িয়ে লাভ কি ? যা চলে গেছে, যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তার জন্য চিরদিন বসে থাকলেও কোন লাভ নেই।···মর্ম্মর, এমন কি কিছু নেই, যা দিয়ে আমি তোমায় তৃপ্ত কোরতে পারি, একটু শান্তি দিতে পারি ?

কণিকা মর্ম্মরের একটা হাত টেনে নিয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। মর্ম্মর দেখলো ওর চোখে এবং গালে জলের ফোঁটা চক্‌চক্ কোরছে। অনেকক্ষণ পর সে বোললো, সত্যিই কি তুমি আমায় চাও ?

কণিকা কোনো কথা না বলে ওর হাতটায় তার ঠাণ্ডা ভিজে গালটা রাখলো।

—বেশ তাই হবে, মর্ম্মর বোললো, শুধু আমার সন্দেহ ছিলো তুমি এখনও আমাকে চাইবে কি না। আজ আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমাকে আরো বেশী ভালোবাসতে পারবো। হয়তো ওর চলে যাওয়াটা ভালই হোলো, হয়তো তা আমাদের ভালোবাসার আশীর্ব্বাদ। আমার মনে যে বনানী স্তব্ধ হয়েছিল, হয়তো এ না হ'লে তা জাগরণে মর্ম্মরিত হয়ে উঠতো না।

শ্রীশচীন্দ্র বসু

ডিটেকটিভ গল্প
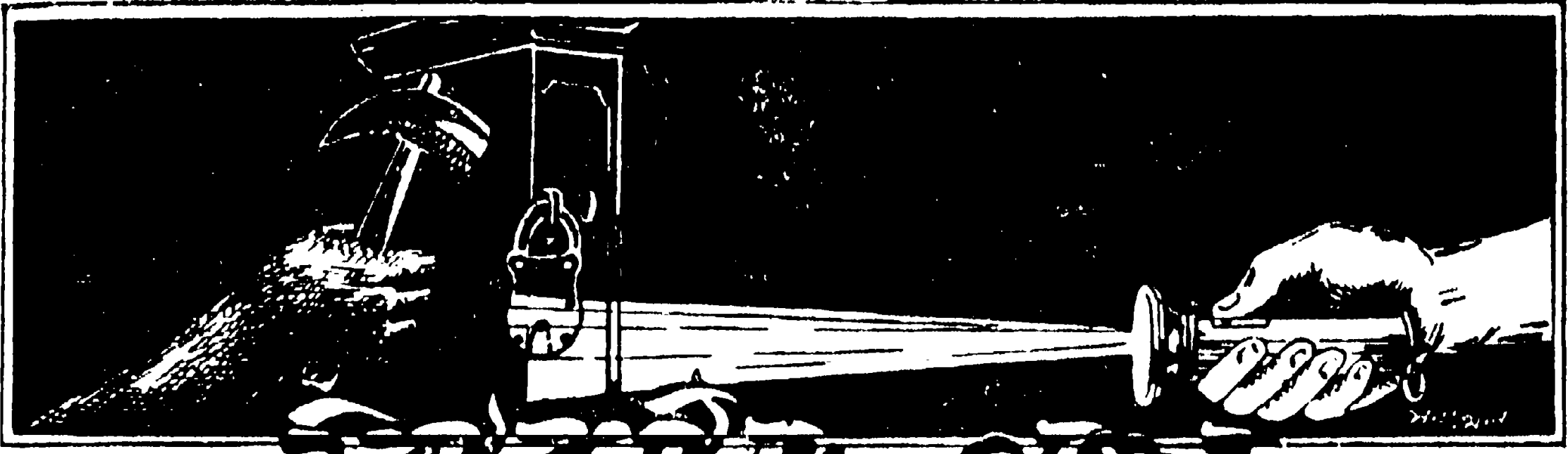
মেকী টাকা

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিশের বিখ্যাত গোয়েন্দা তরুণকুমার ও তাহার পালিতা ভগ্নীর সংসারটা একরকম মন্দ চলিতেছিল না। কয়েকদিন হাতে বিশেষ কাজ না থাকায় তরুণ বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। বোন্‌টিও যেন বাঁচিয়াছে। সারাদিন ধরিয়া নানারকম খাবার তৈরী করিয়া তরুণকে খাওয়াইবার তাহার যে হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ত ব্যাচারী তরুণ অস্থির পঞ্চম।

তরুণ মৃদুকণ্ঠে দু'-একবার প্রতিবাদ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; বরং বেশ প্রসন্ন-মুখেই অমলা বলিয়াছে, "কোন ভয় নেই দাদা, যখন লোহার গুলিগুলো এমন করে হজম করতে পেরেছ, তখন বোনের দেওয়া ক্ষীরের গোলাগুলো খুব হজম হবে।"

কিন্তু বসিয়া বসিয়া ক্ষীরের গোলা হজম তরুণের ভাগ্যে ছিল না। সেদিন সকালে উঠিতেই পিওন আসিয়া একখানি তার দিয়া গেল।

সেখানি পড়িয়া তরুণ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

অমলা নিকটেই ছিল। বলিল, "খবর অতিমাত্রায় শুভ—দাদা, নয় কি? এবার কি খুন, না ডাকাতি?"

তরুণ সহজ সরল দৃষ্টিতে অমলার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া দিয়া বলিল, "একসঙ্গে ও দুটোই হওয়া সম্ভব দিদি, এবং আরও কিছু।"

আরও কিছু?

"জালিয়াতি। এই ছোট সহরটাই শুধু নয়, ভারত জুড়েই আবার এমন ঝড় উঠবে, যাতে লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না—ভয়ে ভয়ে ভাববে সেটা আসল না মেকি—রাজার আপনার ঘরের, না শয়তানের কারখানার?"

অমলা চঞ্চল দৃষ্টিতে তরুণের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে সভয়ে বলিল, "এমন ভয়ানক লোককেও তোমরা জেলের বাইরে ছেড়ে রেখে দিয়েছ দাদা!"

তরুণ হাসিল। হাসিয়া বলিল, "আইন পাপের সাজা দেয় দিদি, তার পাপ প্রবৃত্তিকে ধুয়ে-মুছে দিতে পারে না। সাজায় সাধু খুব কমই তৈরী হয়—নরপিশাচ উগ্রমূর্ত্তি ধরে বেরিয়ে আসে শত শত। তা' ছাড়া, আইন চিরদিন কাউকে আটকে রাখতে পারে না।"

"লোকটা কতদিন ছাড়ান পেয়েছিল দাদা?"

বার বৎসর। মরণ রোধ করে রাখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। সেই মরণের কবলে শুয়ে লোকটা জেলের বাইরে এসে কবর নেয়। এ তারটা জানাচ্ছে, আবার সে দানো পেয়ে কবরের বাইরে এসেছে। বাঙলার ঘরে ঘরে জাল নোট পোরা, এমন কি ব্যাঙ্কের গভর্ণারের পকেটেও বাদ পড়ে নি। এই গতবারের কীর্ত্তি—জানি না, এবার কতদূর কি করবে!

"জানলেই যখন, আটক করাও না—"

"আইন তা' বলে না দিদি। দোষের সাজা, অপরাধের দণ্ড বিদ্রোহের শাসন আইন করবে—কিন্তু বিনা কারণে না কারুর একগাছি চুল পর্য্যন্ত সে নষ্ট হতে দেবে না।"

নির্ব্বাক দৃষ্টিতে হতাশভাবে চাহিয়া অমলা তরুণের কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ বলিল, "কিন্তু দাদা, শ্যামাপোকা পুড়ে মরতেই জন্মায়, সেই রকম এও ত?"

তরুণ স্মিতহাস্যে বলিল, "এক কাপ চা নিয়ে আয় দিদি। পাপী জাহান্নামে যাক্, আমার ঘরে শান্তি আনন্দ বিরাজ করুক।"

"এটা কিন্তু তোমার মুখস্ত কথা দাদা, বুকের প্রার্থনা নয়। চা আনছি, খেয়ে ফাঁদ পাততে ছোট, যা' তোমার চিরদিনের কাজ। বেড়াল ইঁদুর ধরব না বলে হবিষ্যির হাঁড়ী চড়ালে কেউ বিশ্বাস করে?"

অমলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট কয়েক বাদেই তৈরী চায়ের পেয়ালা হাতে পুনরায় ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সবেমাত্র অরুণ ট্রে হইতে চায়ের কাপটী মুখে তুলিয়াছে, গম্ভীর পদবিক্ষেপে একটী লোক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক ধীরকণ্ঠে বলিল, "এ ভাবে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করলে আপনার গৌরব খুব বেশী যে বাড়বে না, এ আমি জ্যোতিষের অঙ্ক না পেতেও বলে দিতে পারি অমলা দিদি। সুতরাং এক পেয়ালা চা খেতে খেতে খোস মেজাজ তরুণ ভায়ার সঙ্গে দুটো বিষয়-কর্ম্মের কথা কয়ে নেওয়া যাক্।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "কবে ফিরলে সোলেমান? খবর কি?"

লোকটী তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে বলিল, "আজই। খবর খাসা-আবার ব্যবসা করছি। ওই যে নেমন্তন্ন-পত্র এসে গেছে দেখ্‌ছি—বলিয়া তারখানি হাতে তুলিয়া লইয়া সোলেমান একবার হোহো করিয়া হাসিল।

তরুণ দারুণ বিস্ময়ে সোলেমনের মুখের দিকে চাহিল। দুষ্কৃতকারী এমন করিয়া কথা বলিতে পারে না কি? ধীর-কণ্ঠে বলিল, "কাজ ধরলে কোথায়?"

সোলেমান হাসিয়া বলিল, "সে খোঁজের ভারটুকু তোমারি ওপর ছেড়ে দিলুম বন্ধু। কাজটা এমন কিছু শক্ত হবে না; বিশেষ, তোমার পক্ষে। কিন্তু খবরটা পাওয়াই হ'লে শক্ত; তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম জানাতে। হাজার হোক্ বন্ধুলোক, কি বলো, হেঁ-হেঁ-হেঁ!"

তারপর চঞ্চল চক্ষে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "সিরাপ খাবে তরুণবাবু? বেশ ভাল তাজা জিনিষ। আজ পর্য্যন্ত যে ক'টা বেরিয়েছে, সবার সেরা। খাবে না, কেন? এক চুমুক, তাও নয়। বেশ, তবে এর গুণাগুণটা বলে যাই শোন। পানে দেহ ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ ত হবেই, আর একটু গোলাপী নেশা। এইটুকুই আমার আবিষ্কার—বুঝলে, হুদ্দোর দারগা, বড় দারগা, এমন কি পুলিস-সাহেবকে পর্য্যন্ত চাকিয়ে সার্টিফিকেট্ নেবার ব্যবস্থা করেছি। রইল বোতলটা, কি বলো? না না, লজ্জা কি? আমি ভাল জানি, পাপ কাজ তোমরা যতটা বুক ঠুকে, বগল বাজিয়ে কর, আমরা পেশাদারী হয়েও তার সিকির সিকিকে আমল দিতে পারি না। আচ্ছা, আসি তা' হ'লে। ধন্যবাদ বন্ধু, ধন্যবাদ!"

সোলেমান চলিয়া গেল। দ্বারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অমলা বলিল, "এ কে দাদা, বুকে একটুও ভয়ডর নেই—পাপীর মন সব সময় ভয়-কাতর, তারা লুকিয়ে ফেরে, এ যে একেবারে উল্টো।"

তরুণ মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিল; বাহ্যিক আকৃতিতে কিন্তু অন্তরের সঠিক ভাব ধরা পড়িল না।

দ্বারে বেল বাজিয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কষ্টটা পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া তরুণ হাঁকিল, "আসুন।"

একজন পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লোক ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "দেখুন, একবার তরুণ গোয়েন্দাকে ডেকে দিতে পারেন—আমার বড় বিপদ মশায়, বড় বিপদ!"

অমলা বলিল, "কেন, কি কথা বলুনই না, ওই ত উনি আপনার সামনেই বসে রয়েছেন।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "উনি জানেন। আমার আমার সঙ্গে ওঁর বহুদিনের জানাশোনা, আজ নতুন নয়।"

মুহূর্ত্তের জন্য লোকটী যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আরম্ভ করিল, "এই যে, ভাল ত, নমস্কার। হ্যাঁ তা' জানি বই কি মশায়, স্বনাম-ধন্য পুরুষ, তাই জন্যেই ত ছুটে আসা। হ্যাঁ যা' বল্‌ছিলুম, আপনি না হ'লে ভাইপোটার কোন গতিই ত হয় না দেখ্‌ছি। পরের মোটর নিয়ে বেরিয়েছে, এখনো ফিরল না।"

তরুণ মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না।

অমলার জিজ্ঞাসায় প্রৌঢ় বলিতে লাগিল, "কি আর বলি মা, সবই করে কাল গুণে। ভাইপোটা কোলকাতায় ছিল, দু'-দশপয়সা আন্‌ছিলও, কোথাকার শনি আহুতি বলে মেয়েটার চিঠি পেয়ে ছুটে এল। আমায় বল্‌লে, এক-বার রায়েদের মোটরটা দিতে হবে কাকা। অতশত কি জানি, দেখ্‌ছেনই ত বামুন-পণ্ডিত, হ্যাকাবোকা মানুষ। দাদার ওই এক ছেলে, বংশের দুলাল নীলমণি, কাজেই আবদার রাখ্‌তে হ'ল। তা' বাবুদের জানাইও নি। গাড়োয়ান হীরাসিং মানে-গণে, ভক্তি করে, তাকেই মাথায় হাত দে পাঠিয়েছিলুম। এত বেলা হ'ল, না এল ছেলে, না এল গাড়োয়ান—এল এই চিঠিখানা, কি করি বলুন ত?"

হাত বাড়াইয়া তরুণ পত্রখানি লইয়া পড়িল—

"কাকা,

"জীবনের মত আহুতি পরের হইয়া যাইবে, আমি তা' সহ্য করিতে পারিব না। বড়লোকের মেয়ে হইলে কি হয়, আমার মতেই তার মত। আমি—আমরা উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করিয়াছি। তবে কাজটা আপাততঃ গোপনেই নিষ্পন্ন করিতে চাই। তুমি এস—আজ সন্ধ্যায় পত্রবাহক তোমায় সঙ্গে লইয়া আসিবে। খবরদার লোক জানাজানি যেন না হয়—হইলে আমি মহাবিপদে পড়িব। সঙ্গে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলিও না। তোমার অসিত"

তরুণের মুখে এখন সেই স্থির গম্ভীর হাসি। বলিল, "আপনি আমায় সঙ্গে নিতে চান্—কেমন?"

ভদ্রলোক কথাটা যেন লুফিয়া লইয়া কহিল, "ঠিক্ ধরেছ বাবা, ঠিক ধরেছ, হাজার হোক্ রাজবুদ্ধি! রাজ-কর্ম্মচারী হলেই যে রাজবুদ্ধি ধরে, তরুণবাবু তোমাতেই তার প্রমাণ! এই নাও বাবা, পায়ের ধুলো দিচ্ছি, মাথা পেতে নাও। তা' হ'লে ঠিক্ গোধূলির সময়ই আসব, কি বল বাবা?"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু চিঠি যে এনেছে, আমাকে ত সে চায় না, সঙ্গে থাক্‌লে যদি না নিয়ে যেতে চায়?"

হতাশা-জড়িত-কণ্ঠে প্রৌঢ় লোকটা বলিল, "তাও ত বটে, কথাটা ত ভেবে দেখা হয় নি। কি হবে তবে?"

তরুণ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, আপনি যান্, আমি দু'ঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে দেখা করব। একটা উপায় ভাবা চাইত, যাতে আমি সঙ্গে গেলেও কারুর সন্দেহ না হয়।"

প্রৌঢ় বলিল, "হয়েছে বাবা, হয়েছে। শুভ-বিবাহের কাজে নাপিত চাই ত। তুমি সেই নাপিত হয়েই আমার পিছু নিলে—বলো না, মন্দ যুক্তি কি?"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে তরুণ হাই তুলিয়া বলিল, "এ কে জানো অমু, সোলেমানের চর।"

অমলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তবু তুমি ওর সঙ্গে যেতে স্বীকার করলে?"

তরুণ উদাস-কণ্ঠে কহিল, "কি করি দিদি, এ গোয়েন্দা-গিরির ধারাই যে এই।"

দুই

নিঃশব্দে পত্রবাহকের সঙ্গে দুইজনে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটা এত নির্জ্জন যে, নিজেদের পদশব্দে মানুষ চমকিয়া উঠে। নদীগর্ভে বড় বড় কাঠ, ভেলা, সংখ্যা কত গণিয়া শেষ করা যায় না। কোন স্থানে প্রকাণ্ড স্তূপ, একটা আঁধার আবর্জ্জনার মত দণ্ডায়মান, আবার কোন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

পল্লীগ্রামের প্রৌঢ় লোকটা বলিল, "দেখ্‌ছ নাপিত ভায়া, এর পেছনে যদি গাদাখানেক লোক লুকিয়ে থাকে, নেহাৎ আশ্চর্য্যও নয়। আর তারা যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে

মুখ চেপে ধরে, 'হুঁ' করে থাকা ছাড়া উপায়ই থাকবে না। দেখো ভায়া, পা ফেলে ফলে এসো। আরে বাবা, একটা হাত-লণ্ঠনও সঙ্গে নিতে দিলি না, নিলিও না, এখন বলো ত এমন বিপদে কি মানুষে পড়ে?"

পথপ্রদর্শক অস্ফুট-স্বরে কতকগুলো কি কথা বলিল, বুঝা গেল না।

কাকা লোকটী বলিল, "শোন কথা, ভাইপোর বিয়ে বলে কি চোখ জালাতে হবে না কি? কিন্তু বিয়ের পর যখন গিন্নীর নামে 'হেঁাৎকা' এসে পড়বে, তখন? ও কি, ও কি!"

মুখের কথা শেষ হইল না। জনকয়েক গুপ্ত আক্রমণকারীর অতর্কিত আক্রমণে অতি সহজেই কাকা-মশায় মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। সঙ্গের নাপিত কিন্তু অত সহজে ধরা দিল না; বোধ হয়, সে পূর্ব্ব হইতেই আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এবার হাতের মোটা-সোটা গোছের লাঠিগাছটা হঠাৎ 'গুপ্তি'তে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

কিন্তু পিছনের একটী লোক যে এমনভাবে আসিয়া তাহাকে কায়দায় ফেলিতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধির না হোক্, কল্পনার অতীত ছিল—কাজেই হুমড়ি খাইয়া সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আত্ম-সমর্পনে বাধ্য হইল।

কাকাবাবু তখনও অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িতেছিল। সেই অবস্থায় আততায়ীর দল হাতে পায়ে বাঁধিয়া তাঁহাদের লইয়া একখানি ডিঙ্গিতে চড়িয়া বসিল। নাপিতের ক্ষৌর-কার্য্যের পুঁটলি হইতে একযোড়া পিস্তল বাহির হইয়া পড়িল। দেখিয়া লোকগুলা হাসিয়া প্রায় বেদম হইয়া পড়িল। বলিল, "কি তরুণবাবু, পিস্তল দিয়ে দাড়ি কামাও না কি?"

তরুণের মুখে কিন্তু একটিও ভাষা ফুটিল না। সে যেন মূক; লোকগুলার কায়দায় পড়িয়া সে যেন ভয়ে বোবা হইয়া গিয়াছে। শত হাস্য-পরিহাসের বৃশ্চিক দংশন অম্লান-বদনে সহ্য করিতে দেখিয়া একজন বলিল, "হ্যাঁ, তা' সংযমী বটে! আধখানা কথা পাছে বাজে খরচ হয়ে যায়, ভায়ার সেদিকেও নজর আছে।

তীরে অন্ধকারে কে একজন লুকাইয়া গেল। দস্যু-দলের সতর্ক চক্ষুকে কিন্তু প্রতারিত করিতে সে পারিল না। উপর্য্যুপরি কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার পর চঞ্চল হইয়া তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্নে বন্দীদ্বয়কে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাকাবাবু তখন প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিল, "শেষে আমার ওপরেও তোরা বিশ্বাস হারালি?"

দলের একজন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "কর্ত্তার হুকুম কি মনে নেই হামিদ? তিনি বারবার বলে দিয়েছেন, 'ডান হাতের কথা, বাঁ হাত যেন না জানতে পারে'—মনে নেই?"

* * *

সোলেমন অভ্যর্থনার সুরে বলিল, "আসুন বাবু, আসুন! এত শীগ্‌গির যে আপনাকে অতিথি পাব, সে আশা কোনদিনই করি নি।"

তিন-চারজন অনুচর ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কাকাবাবুকে ধমক দিয়া সোলেমন বলিল, "অতিথির হাতের দড়ি দাও খুলে দাও! অতিথি বন্ধু, এ কি কথা!"

সেলাম বাজাইয়া হামিদ তরুণের হাতের বন্ধন কাটিয়া দিল বটে, কিন্তু একটা দারুণ উৎকণ্ঠা-জড়িত ভয় তাহাকে যে ভীষণ পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অন্য সকলের এবং সোলেমানের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে হাসিয়া বলিল, "তরুণ আমাদের সে লোকই নয়; বিশেষ, হিন্দু-শাস্ত্রের মত অতিথি নারায়ণ। ওর সেবাই আমরা করে যাব, ভয় করব না। চা নিয়ে আয়রে; কিছু মিষ্টি, কলাও যেন সঙ্গে থাকে। ভাল বামুনের তৈরী লুচি-তরকারী কিছু আনাব কি? জাত মারব না ভয় নেই। হাঁ, একটা করারে এখানে থাকতে হবে, খাবে-দাবে, স্ফূর্ত্তির জন্য যা' কিছু চাও পাবে—কিন্তু নজরবন্দীতে। তেতালার অংশ সব তোমায় ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে। সেখানে থেকে পালাবার চেষ্টা মানে—মৃত্যু, বুঝলে?

বন্দীর দৃষ্টি গৃহখানির সুদূর এক অংশে পড়িল। একটি

ফুলের মত মেয়ে শয্যা-শায়িতা। অন্য একখানিতে একজন সুশ্রী যুবক হতচেতন। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সোলেমান হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বুঝলে না, ওরাই বিয়ের বর কনে—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিছু দূরে আমাদের একটা ঘাটি আছে, সেইখানটায় মোটর উল্টে যাওয়ায় মেয়েটা জ্ঞান হারায়। বর কনেকে ঘাড়ে নিয়ে আমাদের ঘাটিতে রেখে গিয়েছে। কি ফুলজান, চা? আচ্ছা আচ্ছা, তুলে নাও তরুণ ভায়া, মেয়েলোকের অপমান করো না। বা:, ইয়া, এই ত চাই! যাও ফুলজান, কিছু খাবার, বড় পরিশ্রম হয়েছে—"

অপাঙ্গে হাসিয়া ফুলজান বাহির হইয়া গেল। তার মদালস দেহের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া সোলেমান বলিল, "এটি আমারি ভাই-সাহেব, আপকা মেহেরবানসে। যদি চাও এক-আধ রাত সেবা করতে পারে—না না, আমার আপত্তি মোটেই হবে না। আচ্ছা, দাও না, আমিই নামিয়ে রাখ্‌ছি।"

তরুণ শয্যা-শায়িতার দিকে চাহিয়া বলিল, "তারপর?"

সোলেমান বলিল, "হ্যাঁ, বলি। বর চললেন ডাক্তার ডাকতে, আমার ঘাটিদার পড়লেন বিপদে; কি যে করবে ঠিকই করে উঠতে পারলে না—ভেবে চিন্তে মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে এখানে এসে হাজির। হাজার হোক্ মানুষের প্রাণ ত, অস্বীকার করি কি করে বলুন? আল্লার জীব, কাজেই আশ্রয় দিতেই হ'ল। এদিকে বর ডাক্তার ত পেলেই না, কনেও না—ফিরে এসে খালি বাড়ীখানার ওপরেই মহা তম্বী। শেষে নিজের ক্রোধ চাপতে নিজে জ্ঞানহারা। কি আর করি, মেয়েটার খাতিরে ওকেও রাখতে হয়েছে। তোমায় বলি সাহেব এই ছাতির কথা, ও আসমানের বিবিকে আমি সাদী পর্য্যন্ত করতে রাজী! হ্যাঁ বটে বটে, তোমার বড় মেহনৎ হয়েছে, একটু বিশ্রাম দরকার। যাও, এই বাবুকে তেতালা দেখাও।"

ঘরখানি ঘুরিয়া তরুণ সব কিছু পাইল। নানা শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস, কালী-কাগজ-কলম, দুগ্ধফেননিভ শয্যা—পাইল না শুধু মুক্তির কোন আশা। সম্মুখে ত নয়ই, পশ্চাতে ঠিক বাড়ীর গা ঘেঁষিয়া নদী; সুতরাং, সে পথেও পলায়ন অসম্ভব।

খানিক আনমনে বসিয়া বসিয়া সে চঞ্চলহস্তে কয়েকখানা কাগজে কি লিখিল, তারপর বাতায়ন-পথে একে একে সেগুলি নীচে ফেলিয়া দিল। কেহ দেখিল কি?

একটা সঙ্কটজনক ধূমে শ্বাসরোধ অবস্থায় কিছুকালের মধ্যেই সে বিছানায় এলাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক হাসিতে দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তিন

কে বা কাহারা দ্বারের নিকট হতচেতন এক সুশ্রী যুবককে শোয়াইয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। প্রাতে চাকরের মুখে খবরটা শুনিয়া অমলা নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাসী ভারতী ত ভয়েই অস্থির। কান্নাভরা সুরে বলিল, "তোমরা দরজা দাও গো। ভাল বুঝছি না, কাদের মড়া তার ঠিক্ নেই, কাজ কি বাপু ছুঁয়ে-লেপে।"

অমলা ধমক দিয়া বলিল, "তোর কাজে তুই যা' ত, একটা লোকের প্রাণের চেয়ে কি আমাদের ছোঁয়া-লেপাটা এতই বড়।"

দাসী কাচুমাচু মুখে বলিল, "না তা' বলছি না, তবে কাজ কি বাবু পরের খুন ঘাড়ে নিয়ে। দাদাবাবু থাকতেন, আলাদা কথা। খুনেগুলো এবার যদি আসে, আমাদেরই হয় ত খুন করে রেখে যাবে। তার চেয়ে হাসপাতালে খবর দাও, টেনে নিয়ে যাক্—বাঁচে বাঁচল, মরে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।"

কথাটা অমলার মনে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ কলেজে ফোন্ করিল। তারপর প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য বড় এক গামলা জল লইয়া বসিল। চেষ্টা করিয়াও নাড়ী পাওয়া গেল না; বক্ষের স্পন্দনও নয়। কিন্তু কি জানি কেন অমলা তথাপি আশা ছাড়িতে পারিল না।

পাড়ার বুড়া ডাক্তার ধরণীবাবু কি কাজে তখন বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, অমলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "একে একবার দেখুন ত, আমার বোধ হচ্ছে মরে নি।"

ধরণীবাবু অতি অমায়িক লোক। হাসিতে হাসিতে

নিকটে আসিয়া বয়সোচিত কয়েকটা রসিকতার পর তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। কিছু পরেই কিন্তু মুখ কাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না দিদি, এতে আর কিছু নেই।"

দাসী ভারতী হাউমাউ করিয়া উঠিল। অমলা কিন্তু এক দাবড়িতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, দেহটায় হাত দিয়ে দেখুন, এত গরম।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তা' হয় দিদি, ইঞ্জেকসনে অনেক সময় দেহের তাপকে অন্ততঃ ঘণ্টা কতকের জন্যেও ধরে রাখতে পারে। তবে একটা কেস্ জানি—খানিকটা সুতো নিয়ে আয় ত ভারতী। এই যে কাপড় থেকেই নড়ছে যেন— ঠিক্ ঠিক্ নড়ছেই ত। আচ্ছা, দেখি ঘাড়। ঠিক দিদি, এমনি কেস্ আমি আরও দেখেছি। শপথ করে বলতে পারি, এ মরে নি—"

ঠিক এই সময়ে 'এম্বুলেন্স কার' আসিয়া পড়ায় ডাক্তারের অভিজ্ঞতার কথাটা আপাততঃ চাপা পড়িয়া গেল। পরম উৎসাহে ধরণীবাবু যুবকের দেহ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "তরুণ যখন নেই, আমি নিজেই যাচ্ছি দিদি। কিছু বলতে হবে না। সে থাকলেও যেতুম; কারণ, এ 'কেসে'র অভিজ্ঞতা আর কারুর থাক্ না থাক্ আমার আছে যে—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাণপণ চেষ্টা করা হবে বই কি—তবে দিদি, প্রমাই ভগবানের হাত।"

গাড়ী চলিয়া গেলে সকলে ভিতরে আসিয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেল। এত বড় কাঠের সিন্দুকটা এমনভাবে ফেলিয়া গেল কে? একজনের কাজ ত এ নয়ই, অথচ সবার চোখে ধূলা দিয়া নিঃশব্দে এটা ফেলিয়া কি ভাবে যে পলাইল, আশ্চর্য্য!

সিন্দুকটার উপরে একখানা কাল পরদার আবরণী, তার পরেই মোটার কাচের ডালা। পরদা সরাইয়া সকলে এক-যোগে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ যে দাদাবাবু!"

অমলা অস্থির চরণে ফোনের নিকট ছুটিয়া গেল। সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারের ঠিকানা-পরিচয়-পুস্তিকায় একবার মাত্র খুঁজিয়া লইয়া ডাকিল। ঠিক্ সেই সময় কে একজন তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "থামো, কা'কে চাও?"

অমলা সর্পিনীর মত গর্জ্জিয়া দাঁড়াইয়াই চমকিয়া উঠিল—এই ত তরুণ দা' তবে? উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার ছুটিয়া সিন্দুকটার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—এ কি, এক মানুষ কি করিয়া একযোগে দুইস্থানে থাকিতে পারে! জিজ্ঞাসু-নয়ন তুলিয়া সে নবাগত তরুণের মুখের দিকে চাহিল।

কিন্তু তরুণ নিজেই তার এ রহস্য ভেদ করিয়া দিল। বলিল, "ও, বিনোদকে বুঝি তারা এই অবস্থায় পাঠিয়েছে। আগেই আমি সেটা বুঝেছিলুম, তাই নিজে যাই নি। ক'দিন ধরে আমার অধীনে শিক্ষানবীশি করতে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার লোভ সামলাতে পারি নি, কাজেই ওকে আমি সাজিয়ে পাঠিয়ে-ছিলুম—কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি, নিজে গেছলুম তাদের ঘাটি আগ্লাতে।"

অমলা একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া বলিল, "কিন্তু তাদের ঘাটির খোঁজ—"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, আমার কথায়ও তোমার সন্দেহ যায় নি অমলা। ঠিক ত, এত সহজে মনেই যদি নেবে, তবে আমার দিদির পদে আমিই বা তোমায় মেনে নেব কি করে। এই দেখো, মাথার ডান-দিকের এ জড়ুল তোমার পরিচিত, কিন্তু ওর নেই। আর এই বুকের ডানদিকের কাটা দাগ, ওর দেখো নিশ্চিহ্ন। কেমন, এবার বিশ্বাস হ'ল বোধ হয়? এবার আমার খবর দিই, শোন।"

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বিনোদের অসাড় দেহটা দেখাইয়া দিয়া অমলা বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, শোনার আগে এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ঠিক অমনি অবস্থায় আর একটি ছোকরাকে ওরা পাঠিয়েছিল; ডাক্তার-দাদুর মারফতে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "এর ব্যবস্থাও তাই করা দরকার। ফোনটা তুমিই করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কাজ—পুলিসের বড় সাহেবকে জানাও, দু'জন

বিশ্বাসী শক্তিমান ইন্সেপেক্টারের অধীনে ষাটজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী এখনই চাই।"

অমলা বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথা অমান্য করিল না। পুলিশের কর্ত্তার নিকট হইতে উত্তর আসিল, "এতলোক আপনি নিয়ে কি কর্‌বেন ?"

তরুণ বলিয়া দিল, বলো, "এলে বল্‌ব।"

জবাব আসিল, "কিন্তু মাপ কর্‌বেন, একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের অধীনে এতটা 'ফোর্স' কিছু না জেনে ছেড়ে দিতে আমি ভরসা করি না।"

তরুণ শুনিয়া বলিল, বলো, "আমি তরুণ গোয়েন্দার ভগ্নী ; এ ছাড়া, অন্য কিছু বল্‌তে পারি না। যদি আমার প্রার্থনা-মত কাজ না করেন, খুব কম দশ ক্রোর টাকার জন্যে আপনি গবর্ণমেন্টের নিকট দায়ী হবেন।"

উত্তর আসিল, "তিনি কোথায়—তরুণবাবু ?"

তরুণ শিখাইয়া দিল, বলো, "শত্রুরা তাঁকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বাড়ীতে পাঠিয়েছিল, এইমাত্র হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অপর পার্শ্ব হইতে দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসিল, "আপনি কি মনে করেন, এমন বিপদের মুখে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াটাই আমার বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?"

"বেশ দেবেন না, ফল আপনিই ভুগুন।"

"আমি নিজে আপনার সঙ্গে যেতে চাই, কোন আপত্তি আছে ?"

"কিছু মাত্র না। আপনি বারাকপুরে নদীর ধারে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করবেন। একখানা সাধারণ বজরার জন ত্রিশেক লস্করের ওপর শুধু কড়া নজর রাখ্‌বেন। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত খবরদার কোন কথা বল্‌বেন না।"

চার

সৈনিকের পরিচ্ছদে সত্য-সত্যই সেদিন অমলাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। ধীরপদে সে যখন মোটর হইতে নামিয়া পিস্তল হাতে দু'-একপদ অগ্রসর হইয়া চলিল, তখন কালো আঁধারের মধ্য হইতে কে একজন অস্ফুট-কণ্ঠে কি বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমলা ভয় ত পাইলই না, বরং বেশ একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এমনি করেই কি আপনারা খবরদারী করবেন ?"

লোকটী চঞ্চল হস্তে মাথার টুপি নামাইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বলিল, "কি করি, আমরা যে আঁধারে ?"

অমলা বেশ একটু ঝাঁজাল-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ওদিকে যে লরী বোঝাই শেষ হ'য়ে এল। জানেন, এই মেকী টাকা একবার যদি তারা বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারে, আপনার সুনাম থাকা কতটা দায় হ'য়ে পড়বে ?"

"কিন্তু আপনি ত অঙ্কুশে তা' আমায় জান্‌তে দেন নি—এখন উপায় ?"

তাহার বিব্রতভাব দেখিয়া অমলার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে সে ভাব দমন করিয়া সে বলিল, "লোক এনেছেন ? কই, কোথায় তারা ?"

"ওই দিকে কতক ওই ঝোপটার আড়ালে, কতক ওই পল্টুনের নীচে আঁধারে।"

চঞ্চল চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিয়া অমলা মাল বোঝাই লরীখানি হইতে লুক্কাইত পুলিশ-প্রহরীদের দূরত্ব পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর যেন একটু নিরাশ হইয়াই ফিরিয়া কহিল, "দেখুন, কেবল আপনাতে আমাতে এই সাম্‌নের লোক ক'টাকে আটকাতে হবে, পারবেন ?"

"আমার দিক্ থেকে আমি অস্বীকারের কোন কারণ দেখছি না—কিন্তু আপনি মহিলা, এতবড় বিপদের মুখে—"

প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া অমলা অগ্রসর হইয়া গেল। অতি সহজেই ভারবাহীগণকে অপূর্ব্ব কৌশলে করায়ত্ত করিয়া তাহারা বোঝাই লরীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ীতে তখন দুইজনের অধিক তত্ত্বাবধারণকারী না থাকায় অতি সহজেই তাহারা তাহাদেরও আয়ত্বে আনিয়া ফেলিল। তারপর অস্ফুট-স্বরে অমলা বলিল, "এখন ষোল আনা বিপদ মাথার ওপর ঝুল্‌ছে, নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ জেনেই ওরা এতটা অসতর্ক হ'তে পেরেছে। কিন্তু—ও কি !"

ধৃত লোকগুলোর মধ্য হইতে সহসা একজন চিলের মত আওয়াজ করিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদূর মসী-আঁধার ভেদিয়া বহুসংখ্যক নিশাচর পক্ষীর সক্রোধ ধ্বনি শোনা গেল।

সতর্ক অমলা কিন্তু মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিল না, বোঝাই লরীর চাকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ডাকিল, "ও কি এখনো দাঁড়িয়ে, পালিয়ে আসুন শীগ্‌গির এই দিক্‌টায়।"

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আততায়ীর গুলিতে হুমড়ি খাইয়া সম্বোধিত লোকটী পড়িয়া গেল। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া অমলা বাহির হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ 'দাদা' ডাকে চকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল—দেখিল, আসল অমলা তাহারি অনতিদূরে।

যুদ্ধের একটা অভিনয় মাত্র হইল। সতর্ক প্রহরীর দল এমনভাবে দস্যুদলকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, ভয়ে বিস্ময়ে যুগপৎ তাহারা উপস্থিত কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল। তারপর সমান তালে তাল রাখিয়া ক্রমাগত পিছু হটিয়া যাইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে একজন উচ্চতন কর্ম্মচারী একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় তাদের পশ্চদ্ধাবন গতিও রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন চক্রাকারে বসিয়া যুদ্ধ করা অথবা আত্মসমর্পণ ছাড়া আর গতি রহিল না।

সোলেমানকে হ্যাণ্ডক্যাপ পরাইয়া পুলিশ-সাহেবের আনন্দ দেখে কে!

তিনি অমলার সহিত 'হ্যাণ্ডসেক্' করিতে হাত বাড়াইলেন।

অমলাও অসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু হাতে হাত পড়িতেই সাহেব চমকিয়া উঠিলেন—"ও ইউ—"

"ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার" বলিয়া মাথা হইতে পরচুলার বোঝা খুলিয়া ফেলিতেই তরুণকে চিনিতে পারিয়া সাহেব হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

সোলেমান একবার শিহরিয়া উঠিল।

তরুণের দৃষ্টিতে তাহাও এড়াইল না। সে ধীরভাবে কহিল, "চমকাবার কারণ নেই বন্ধু, তোমার নিমন্ত্রণ আমি বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। তুমি আশা করেছিলে, আমাকে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কারবার চালাবে—তা' আর এ যাত্রা হ'ল না। এরপর যদি বেঁচে থাকো, আর শ্রীঘর থেকে ফিরে আস্‌তে পারো, আবার দেখা হবে বই কি? দুঃখ কি! কিন্তু ওসব কথা কইবার সময় পরে অনেক পাবো। এখন বরটীকে ত আমার বাড়ী চালান করে দিলে, কনে কোথায়?"

সোলেমান উত্তর দিল না; উত্তর দিল ফুলজান। বোধ হয় মেয়েটীর প্রতি সোলেমানের অনুরাগ তাহার প্রাণে পর্য্যন্ত টান দিয়াছিল। সে বলিল, "ওই নৌকোর মধ্যেই চোর-কুঠুরিতে আছে।"

সোলেমান আগুনবর্ষী দৃষ্টিতে ফুলজানের দিকে চাহিল। কিন্তু ফুলজান তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিল না। সে বলিল, "চলুন তরুণবাবু, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তরুণ হাসিয়া তাহার অনুসরণ করিল। অমলা পাশেই ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তরুণী বলিল, "চল্ দিদি, এতটা ছুটে যখন এসেছিস্, তখন মেয়েদের সত্যিকার যা' কাজ, তাই তোকে দিয়ে করিয়ে নি।"

ফুলজানের নির্দ্দেশমত নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই একটা কাঠের ঘরের মধ্যে একটী মেয়েকে দেখা গেল। সে যেন পাষাণ প্রতিমা!

তাহাকে অমলা সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

পুলিশ-সাহেব একটা বর্ম্মামুখে দিয়া আনমনে টানিতেছিলেন। মেয়েটীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"হাউ ইজ্ দিজ্?"

তরুণ সংক্ষেপে বলিল, "মানুষ চুরী স্যার!"

* * * *

পাঠক হয় ত ভুলিয়া যান্ নাই। অমলার যত্নে এবং পল্লী-ডাক্তারের চেষ্টায় নকল তরুণ ও আসল বর হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শুধু ফিরিয়া আসা নয়, মেয়েটীর সঙ্গে অমলার উদ্যোগে তরুণের বাড়ীতেই বিবাহ-পর্ব্বটা সমাধা হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রবিবার। অমলা ও সুধা বসিয়া বসিয়া গল্প

করিতেছিল। তরুণ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সোলেমানের দশ বৎসর জেল হয়ে গেল অমু।"

দশ বৎসর!

"হ্যাঁ। কেন, কম হলেই ভাল হ'ত বুঝি? তোর দেখ্‌ছি ওটার ওপর ভারী দরদ—ব্যাপার কি বল্‌ ত?"

"দরদীই ত, ও ছিল বলেই ত তোমাদের পেলুম। সে যাক্‌। কই দাদা, বল্‌লে না যে বড়, এবার কি করে এত সহজে ওকে ধরলে—"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "তাও তোর জানা চাই, না অমলা। একটু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে পেরেছিলুম বলেই কাজটা অতি সোজা হয়ে গিয়েছিল।

"বুড়ো বামুন সেজে যখন লোকটা এল, তখনই বুঝেছিলুম, ওরা একটা ফন্দী এঁটেছে। ওর সঙ্গে যাওয়া সমূহ বিপদ; কিন্তু না গেলে ত সব জানা যাবে না—তাই বিনোদকে তরুণ গোয়েন্দা সাজিয়ে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজে খুব গোপনে ছায়ার মত তাদের অনুসরণ করলুম। তরুণ ধরা পড়ল—আমিও আর একটু হ'লে পড়েছিলুম আর কি! কাণের পাশ দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে ক'টা গুলি বেরিয়ে গেল। যাক্‌, তারা বেশীদূর এগুলো না, তাই রক্ষে!

"বিনোদকে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের আড্ডায় তুল্‌লে। বন্দী করে তেতলার ঘরে রেখেছে বিনোদ তা' লিখে জান্‌লা দিয়ে ফেলে দিতেই আমি তা' জেনে সরে পড়লুম। ইচ্ছে ছিল, তখনই পুলিশে গিয়ে খবর দি', কিন্তু বাড়ী ফিরতে-না-ফিরতেই দেখি তাকে একেবারে মারবার সামিল করে পাঠিয়েছে। ওকে ত হাসপাতালে পাঠান হ'ল, তারপর ত সবই জানিস। শত্রুপক্ষ যখন চিরশত্রু বধ করে পরম নিশ্চিন্ত, তখন তোর পোষাক পরে আমি ছুটেছি তাদের ধরতে।

"খোঁজ নিয়েছিলুম, তাদের গুপ্তচর পুলিসের লোক সেজে আমাদের সব খবরাখবর সোলেমানকে জানাচ্ছে—তাই পুলিশের কাছেও আমার বেঁচে থাকার কথা গোপন করেছিলুম। ওখানে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমই সেই লোকটাকে নিজের কাছে টেনে নিলুম। সে এতটা হতভম্ব হয়েছিল যে, তারই সাহায্যে একরকম বিনা রক্ত-পাতেই নৌকো পর্য্যন্ত অধিকার হ'য়ে গেল।

"রক্ষীরা জান্‌ত, সে তাদেরই লোক এবং তার শিক্ষামতই তারা এটাকে একটা খেলা মনে করে নিয়েছিল বলে বিশেষ কোন বাধা দেয় নি। যখন বুঝ্‌লে, তখন নিরুপায়। পুলিশ-সাহেবের সঙ্গে তুই পর্য্যন্ত যুদ্ধে নেমে গেছিস্‌! দাদাকে বাঁচাতে হবে ত?"

অমলা ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৌতিকগল্প
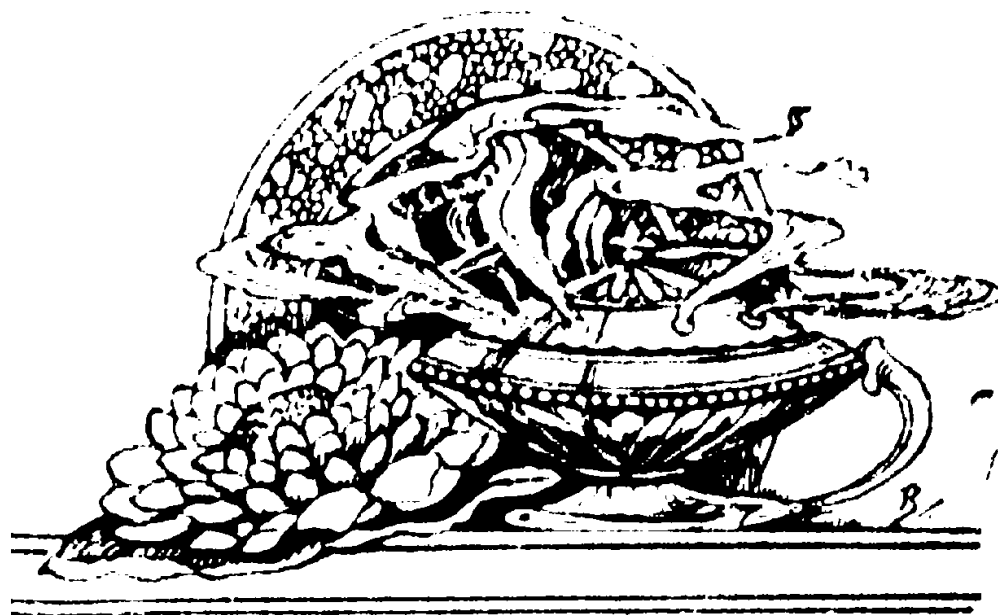
রেশম-কুঠি

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

ভূতের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার জন্য যাঁহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাশি রাশি প্রমাণ-প্রয়োগ ও অজস্র যুক্তি-তর্ক অবতারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চিরকাল ধরিয়া তাহাদের মতবাদ লইয়া থাকুন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বা তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনধিকার চর্চ্চাও করিতে চাহি না। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতে দোষ কি? যদি দোষই না থাকে, তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমি ভীরু নই। বয়স আমার সবে মাত্র বত্রিশ—যদিও বাঙ্গালীর আয়ুর দিক্ দিয়া ইহা প্রৌঢ়ত্বেরই সীমা নির্দ্দেশ করে, তথাপি নিজের সম্বন্ধে উহা আমি মোটেই স্বীকার করি না। দেহ ব্যাপিয়া আজিও যৌবনের জোয়ারই চলিতেছে—ভাটা ধরে নাই এখনও। ইহার উপর আমি পাড়াগেঁয়ে—বন-জঙ্গল আমার বিশেষ পরিচিত। আষাঢ়ের নবঘন কাজল মেঘে নিঃসীম অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিও দেখিয়াছি—সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টি-অচল পল্লীবুকে আমি নির্ভয়ে একাকী বেড়াইতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। ভূত শব্দের অর্থ কি তাহাও বুঝিতাম না, এবং উহা আছে কি নাই অত তর্ক-প্রমাণ না করিয়া 'নাইকেই' 'কায়েমমোকাম' করিয়া লইয়াছিলাম। আপনারা যেমন ভূত শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চন করেন, ঠোঁটের কোল বাহিয়া কি রকম একটা হাসি বাহির হইয়া আসে—চোখ দুইটী বহিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উছলিয়া প... আমারও তাই পড়িত। রাত্রির গম্ভীর অন্ধকারে অতি... পথ লক্ষ্য করিয়া শ্মশানের বুকের উপর দিয়া কর্তা... ও পাড়ার থিয়েটারে যোগ দিতে গিয়াছি এবং নিশুতি... রাত্রিতে একাই বাড়ী ফিরিয়াছি—একটুও মনে ক... সঙ্কোচ আসে নাই। কিন্তু...

যাক্··আসল কথাটাই বলি—

গ্রীষ্মের ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। অকস্মা... বন্ধু তারানাথ আসিল। বিস্মিত কম হইলাম না। ... সে যে আসিতে পারে, তাহা ধারণা করা ত দূরের কথ... কল্পনা করাও যায় না। ধনীর ছেলে—সহরের ত্রিসীমা... বাহিরে পা দেয় না। পাড়াগাঁর নাম শুনিলেই তা... চোখে-মুখে কেমন একটা আতঙ্ক ফুটিয়া উ... ম্যালেরিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে... কখন যদি আমাদের এখানে আসিবার জন্য প্রস্তাব করি... সে এমনভাবে সরিয়া পড়ে যে, কথাটার মাঝখানে... আমাদিগকে দাঁড়ি টানিয়া দিতে হয়। ... তারানাথ... ...

আনন্দাতিশয্যে বন্ধুকে দুইহাত দিয়া বুকের ...ধ্যে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিলাম। কহিলাম, হঠাৎ তো...গে দুর্ব্বুদ্ধি দিলে কে?...

দুর্ব্বুদ্ধি! বন্ধু স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, কল্পনায় ত ...

করিতেছি .এইবার পল্লী-মায়ের সত্যিকার রূপ দেখে দশ বৎসর ...

দশ ...ানাথ কবি।

তারপর কয়েকটা দিন তারানাথ আমাদের লইয়া দে...ড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দিল।

দিগন্তে বিলীয়মান মাঠভরা সবুজ ধান দেখিয়া বন্ধু ...উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মেঘ-কালো ইক্ষুক্ষেতগুলির সাগর-...দোলান ঢেউ দেখিয়া তারানাথ আনন্দে গলিয়া গেল, ...বাবলা গাছের শ্যামল ছায়ায়, আকাশচুম্বী তালগাছের ...পাতায় পাতায় বন্ধু পল্লী-মায়ের কত কি রহস্য আবিষ্কার ...রিয়া ফেলিল, পাখীদের কলতানে বন্ধু কত কি সুরের ...র্ছনা অনুভব করিল—এমন কি, শিবাকুলের তারস্বরে ...কারে সন্ধ্যার সরব অভ্যর্থনা কল্পনা করিয়া তারানাথ ...বড় এক কবিতা লিখিয়া ফেলিল।

কবি তারানাথ মুগ্ধ হইয়া গেল।

আকাশ-পট বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। দিবাশেষের বিদায় মুহূর্ত্তেই গাঢ় ...বেদনায় পল্লী স্তব্ধ। পল্লী-বধূরা অনেকক্ষণ জল লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে নদীজল সীমাহীন ব্যথায় আত্মহারা। নদীর ধারের পথটি ক্রমশঃ যেন জনবিরল হইয়া উঠিয়াছে। ...ারানাথকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া নদীর ধারে বসিলাম। ...ন্ধ্যা নামিয়া আসিল। ও পারের পরিত্যক্ত রেশম-কুঠির ...গনস্পর্শী চিমনীটার পাশে ম্লান ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। ...জোনাকীরা ঝাঁকে ঝাঁকে পল্লী-মায়ের অঙ্গান্তরণে হীরার ...টি পরাইয়া দিয়া গেল। দূরে নিকটে পল্লী-মন্দির হইতে ...ন্ধ্যারতির কি মধুর নিনাদ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

তারানাথ মন প্রাণ দিয়া সন্ধ্যার এই নগ্ন সৌন্দর্য্য ...ভব করিল। তারপর ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন ...রিয়া কহিল, বড় দুঃখ হচ্ছে শিবু, যে, এই সব ছেড়ে ...ত হবে—পল্লীর রূপ এতদিন কল্পনাই করেছি, চোখে ...নি যে, কত সুন্দর! বিলাসিনী নগরী এর কাছে ...তুই নয় শিবু...প্রাণহীন, প্রকৃতির স্নেহস্পর্শ সেখানে নাই, মানুষের হাতেগড়া সহস্র কৃত্রিমতা সেখানে নিয়তই বিমুগ্ধ করে তোলে—এমন করে সুখ-সৌন্দর্য্যে মন প্রাণ ভরে দেয় না...

কহিলাম, থাকো না আরও দু'দিন। কলেজ খোলবার ত দেরী এখনও অনেক...

অকস্মাৎ ওপারের রেশম-কুঠিটি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারানাথ লাফাইয়া উঠিল। তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিলাম, বসো, ও আগুন নয়।

সেই অগ্নির লেলিহান শিখা বাড়িয়া বাড়িয়া তখন আকাশ ছুঁইয়া ফেলিয়াছে। উজ্জ্বল আলোক প্রভাবে ওপারের এপারের সমস্ত স্থান দিনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

আগুন নয়! তারানাথের দুই চোখ দিয়া সীমাহীন বিস্ময় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, না...ও ভূতের কাণ্ড!

ভূতের কাণ্ড! জীবনে তারানাথ যেন এতবড় আশ্চর্য্য কথা শুনে নাই। কহিল, ভূত!...ভূত আবার আছে না কি?

কহিলাম, আছে কি নাই তা' জানি নে, কিন্তু ওই আগুন জ্বলছে এখানে প্রায় আশীবছর ধরে। এই সময়টায় বেশী জ্বলে। লোকে বলে ওটা ভূতের কাণ্ড...

তারানাথের চোখ মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাচ্ছিল্যভরে কহিল, পড়েশুনে তুইও একটা আস্ত ভূত হয়ে গেছিস্ শিবু...ওটা যে একটা বাষ্প...ভুলে গিয়ে বুঝি ভূতের ভয়ে তুইও ভূত হ'য়ে গেছিস।...

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ফিরাইয়া দিলাম, আরে ছোঃ, আমি না কি তাই মনে করি—তুই ক্ষেপেছিস্ তারা! কিন্তু পাড়ার কেউ মানে না ওসব—তা'রা বলে, ওখানে ভূত থাকে এবং তারা বিশ্বাস করেও খুব। জায়গাটায় বড়-একটা কেউ যায় না এবং ঐ পরিত্যক্ত কুঠির ভেতরে অনেকে যে অনেক শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, ইচ্ছে করলে তুইও অনেক শুনতে পাবি। তুই হয় ত হেসে উড়িয়ে দিবি, কিন্তু শুনতে শুনতে তোর গা শিউরে উঠবে নিশ্চয়।...

কথাটাকে তেমন আমল না দিয়া তারানাথ কহিল, লোকের শোনা কথায় কাজ কি...চল্ না, একবার ঘুরে আসি···বলিয়া তারানাথ সোৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

বুকের রক্তটা একবার 'ছলাৎ' করিয়া উঠিল। মনে হইল, কাজ কি বিপদ টানিয়া—ভূত আছে কি নাই তাহা লইয়া আমার কি? প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া যদি···পরক্ষণেই যৌবনের রক্ত এক ধাক্কা দিয়া সকল দৌর্ব্বল্য সরাইয়া দিল। কহিলাম, স্বচ্ছন্দে।

মুহূর্ত্তমধ্যে দুই বন্ধুর মধ্যে এই অভিযানের পরামর্শ ঠিক্ হইয়া গেল।

ও পাড়ায় থিয়েটার হইতেছিল। থিয়েটারের নাম করিয়া মা'র নিকট বিদায় লইলাম।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ-পটে থাকিয়া থাকিয়া মেঘ জমিয়া নিঃসীম নিঃছিদ্র অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—পথের রেখাটী পর্য্যন্ত অবলুপ্ত। সমস্ত পল্লী অচেতন—কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দনটুকুও অনুভব করা যায় না। শুধু নির্জ্জন পথ বহিয়া নিরালা বাতাস বোধ করি সঙ্গীহারা হইয়াই হাহা করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দুই বন্ধু পাশাপাশি চলিয়াছিলাম—মুখে কাহারও কথা ছিল না। আসন্ন অভিযানের ভবিষ্য অভিজ্ঞতার সহস্র বিচিত্র কল্পনা উভয়ের মনে প্রাণে যেন গাঢ় স্তব্ধতা সঞ্চার করিয়াছিল। পথের রেখা কোথাও সরু, কোথাও অনতিবিস্তৃত—দুই ধার হইতে সহস্র লতাগুল্ম দুই বাহু বিস্তার করিয়া পথটীকে যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চলিতে চলিতে কখন কখন ইহাই আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল এবং বাধা পাইয়া সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। ঘুমন্ত দু'-একটী পাখী হয় ত বা দু'-একটী শৃগাল সাড়া পাইয়া তারস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া তীরবেগে ছুটিয়া পলাইতেছিল। তারানাথ চমকিয়া উঠিয়া হাতের বন্দুকটী দৃঢ়মুষ্টিতে চাপি[illegible] ছিলে, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। [illegible]াবে—

হাসিয়া তাহাকে কহিলাম, এমন করে ভূত [illegible] না কি রে তারা—তার চেয়ে বাড়ী ফিরে চল্ ভাই, [illegible] মায়ের ছেলে, শেষটায় বিঘোরে···

ও—বলিয়া নিজের খেয়ালেই তারানাথ আবার [illegible] বহিয়া চলিল।

পারঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল—পার হইতে অসুবিধা হইল না। ধীরে ধীরে আসিয়া কুঠির নীচে দাঁড়াইলাম। গাঢ় অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঢাকা অতীতের পরিত্যক্ত সেই কুঠি যেন এক বিরাটাকার দৈত্যের মত বলিয়া মনে হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—দূরে, নিকটে অচ্ছেদ্য অন্ধকার-সমুদ্রের কৃষ্ণ-তরঙ্গগুলি দুলিয়া দুলিয়া আসিয়া সেই পরিত্যক্ত কুঠির গায়ে পুঞ্জীভূত হইয়া সম[illegible] স্থানটীকে বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে।

তারানাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া কহিল, ভূত থাক্‌বার জায়গা বটে!

অনেক কষ্টে ভিতরে যাইবার একটী পথ বাহির করিলাম। সরু পথ, মানুষ চলাচল না থাকায় নিজের চিহ্নটী পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে; ফণিমনসা ও কাঁটা গাছগুলিকে বাঁচাইয়া সেই প[illegible] দিয়া চলাচল করা আরও কঠিন। তবুও চলিলাম[illegible] বোধ করি একটা সাপ নিশ্চিন্ত আরামে পড়িয়াছি[illegible] অকস্মাৎ সাড়া পাইয়া 'সড়াৎ' করিয়া প[illegible] লুকাইয়া গেল। শিহরিয়া উঠিয়া লাফাই[illegible] পিছাইয়া গিয়া কহিলাম, ভূতে না হোক্, স[illegible] ফেলে দেখ্‌ছি···কি যে তোর খেয়াল তারা...

বন্ধু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বাড়ী যা' শিবু—মা'র ছেলে ...ভয় করিস্ ত এই লাইট্‌টাও নিয়ে যা'। আমি আর না দেখে ফিরছি নে...

ওরে বাবারে, এ যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! লজ্জিত হইয়া কহিলাম, আমাকে এতই ভীরু ভেবেছিস্ না কি?

ততক্ষণ আমরা কুঠির অঙ্গনের ভিতরের ছোট হল[illegible]

করিতেছি। বারান্দার উপর আসিয়াছি। ঘরটী ছোট। দশ বৎসর। চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিলেও অত্যাশ্চর্য্যভাবে ঘরটী দিকে বাঁচাইয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। আশীবছর ইল কুঠিটি পরিত্যক্ত বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু দেখিয়া তা' নে হয় না। অযত্নে হয় ত ধুলা, শুষ্ক পাতা ইত্যাদি কোথাও কোথাও জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাসের অযোগ্য এখনও হয় নাই। পলেস্তরার রং ধূম-মলিন হইলেও এখনও ঘরটী নগ্নগাত্র হইয়া দাঁত বাহির করে নাই।

তারানাথ নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, ঘুমোনো যাবে যা' হোক্।

তারানাথ ও আমি হলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কয়েকটা চামচিকা উড়িয়া গেল। তারানাথ হাসিয়া হিল, ওদের আজ বনবাস.........

আমি হাসিয়া বলিলাম, ওদের, না আমাদের......

তারানাথ প্রত্যুত্তরে হাসিল মাত্র।

বগলের সতরঞ্চটা পাতিয়া লইয়া তারানাথ আরাম করিয়া বসিয়া পড়িল এবং দাবার ছক্‌টা পাড়িয়া লইয়া কহিল, দু'পাটী খেলা যাক্ শিবু—ভূত দেখ্‌তেই যখন আসা, তখন জেগেই থাক্‌তে হবে—ঘুমুলে হয় ত আর দেখা বে না।

বাহিরে তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং ছিটে-টা বৃষ্টির ছাট আসিয়া ভিতরের অনেকটা ভিজাইয়া। দরজা ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া তারানাথের বায় মনোসংযোগ করিলাম।

র মধ্যেই আমাদের খেলা বেশ জমিয়া উঠিল। তখন যে ঝড় আর বৃষ্টিতে ভয়ানক পাল্লা য়াছে, আমরা যে বাড়ী নাই—জনমানবহীন নদীতীরের তদিনের পরিত্যক্ত এই কুঠিতে ভূত নামক অজানা কোন য়ানক অশরীরী আত্মার খোঁজে আসিয়াছি—এসব কিছুই নে হইল না। আমরা যেন শুধু খেলার নেশাতেই জিয়া গিয়াছিলাম।

কতক্ষণ এইরূপভাবে কাটিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ ধ হইল, কে যেন দ্রুত বারান্দা অতিক্রম করিয়া এই-কে আসিতেছে। দুইজনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। বলিতে লজ্জা নাই, বীর বলিয়া যত বড়াই করিয়াই থাকি, অকস্মা কি জানি কি এক অস্বস্তিতে মন ভরিয়া উঠিল।

চলিবার শব্দ বেশ বোঝা যাইতেছিল এবং উহা মানুষের, তাহাতেও আমাদের কোন সংশয় রহিল না শব্দটী ঠিক্ একইভাবে কয়েকবার সমস্ত বারান্দাটা আড় আড়িভাবে চলাফেরা করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করিতেছে।

তারানাথ মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া উঠিল। বন্দুকটা তুলি লইয়া সে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বাধা দি কহিলাম, তাড়াতাড়ি কি......দেখা যাক্......

তারানাথ বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

শব্দটী আসিয়া আমাদের দরজার নিকট থমকি দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন ঘরে প্রবেশ করিবে কি ন তাহাই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

বোধ হয় এক সেকেণ্ডরও কম—দরজাটী ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এবং সেই খোলা-পথের দিকে চাহিয়া উভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

খোলা দরজার উপর ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এব তরুণী,—তন্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বয়স তাহার চব্বিশ কি পঁচিশ—কিন্তু সমস্ত অঙ্গ বহিয়া যৌবনের যে শ্রী লীলায়িত হইতেছে, তাহার নিকট বয়সের কথা মনেই পড়ে না।

মনে হইল, সে যেন এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিল—আমাদের প্রতি লক্ষ্যই পড়ে নাই। অকস্মাৎ এই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আতঙ্কে সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তে বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারানাথ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিশীথ অভি-সারিকা......এই তোদের ভূত, ছোঃ......

অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আবার দাবা লইয়া বসিলাম। কয়েক মিনিটের বাধা পড়ায় খেলা আর তেমন জমিয়া উঠিল না।

চতুর্দ্দিক আলোকিত ও কম্পিত করিয়া অদূরে একটা বাজ পড়িল। এবং তাহারই আলোকে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দ্বারপথে চাহিতেই এবার বিস্ময়ে নহে, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম।

কয়েক মিনিট আগে যেখানটায় তরুণী দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্ সেইখানটায় দাঁড়াইয়া এক হ্যাটকোট পরিহিত সাহেব—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে... বিকৃত মুখের উপর কোটরাগত চক্ষু দুইটী শুধু ভয়ানক নহে, বীভৎস!

যৌবনের মিথ্যা গর্ব্ব লইয়া যে সাহসটুকু এতক্ষণ আমাদিগকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, এইবার বুঝিতে পারিলাম তাহা একবারেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মুখ তুলিয়া যে ভাল করিয়া চাহিব, সে ক্ষমতাটুকুও আর নাই।

সাহেব সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, কে টোমরা?

সেই গুরুগম্ভীর স্বরের আওয়াজে উভয়েই শিহরিয়া উঠিলাম। মানুষ যে এত গম্ভীরস্বরে কথা বলিতে পারে এবং তাহার শব্দ এমন হিমস্পর্শে বুকের চাঞ্চল্যকেও স্তব্ধ করিয়া আনে, তাহা কখন অনুভব করি নাই।......

সাহেব আবার বলিল, কে টোমরা?

তারানাথ বোধ করি এইবার উত্তর করিতে চাহিল, বেশ লক্ষ্য করিলাম তাহার অসাড় ঠোঁট দুইখানি এইবার নড়িয়া উঠিয়া ঈষৎ বিভক্ত হইল, কিন্তু ঐ মাত্র, গলা দিয়া একটা 'রা'ও বাহির হইল না।

সাহেবের চোখে মুখে যেন অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল, ভয় নেই, বলো...

জোর করিয়া কহিলাম, ভয় আমরা করি না...

সাহেব হাসিয়া বলিল, তা' জানি, কিন্তু এখানে?

মরিয়া হইয়া চোখ মুখ বুজিয়া বলিয়া ফেলিলাম, ভূত দেখ্‌তে...

ভূত দেখতে! সাহেব হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামিতে চাহে না। তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, যা' নেই, তা' নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?

তারানাথ বোধ করি এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল। এইবার বলিল, তুমিই বা কি কে... এছিলে, আস্‌লে সাহেব? ...লাবে—

সাহেব যেন আশ্চর্য্য হইল। কহিল, আ... আর এইখানেই থাকি...তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া কহি... বই যা' ঠাণ্ডা পড়েছে...এক কাপ্ চা পেলে তোমরা নিশ্চয় ...ক খুসী হ'বে... ...র

চা! এই পরিত্যক্ত কুঠিতে চা! কিন্তু কথাটা মনেও আসিল না। তারানাথ অত্যন্ত খুসী হইয়া কহিল, তার চেয়ে আনন্দের কিছু হ'বে না...দিতে পার সাহেব...

খুউব! এস না ওধারের ঘরে—সব ঠিক্ আছে।

সাহেব ফিরিয়া চলিল। এবং তাহার সাথে তারানা... ও আমি উঠিয়া চলিলাম। খেলার সরঞ্জাম সেইখানে... পড়িয়া রহিল, টর্চ্চের কথা মনে হইল না; এমন ... সে যাহার বল করিয়া আজ আসিয়াছিলাম, সেই বন্দুকটা... কথাও মনে পড়িল না। হায়রে বন্দুক!...কাজের সম... এমনি করিয়া মানুষ নিজের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটা... ভুল করিয়া ফেলিয়া যায়।

সাহেবের অনুসরণ করিয়া হলঘরের পূর্ব্ব সীমাকে... ছোট কুটুরীতে আসিয়া উভয়ে সীমাহীন বিস্ময়ে দিশাহা... হইয়া পড়িলাম। আরব্য উপন্যাসে আলাদীনের ক... পড়িয়াছি—কিন্তু মনে হইল, ইহার কাছে সে যেন বি... নহে। ছোট ঘরটি বিশেষ করিয়া সুসজ্জিত। রাশি রা... চেয়ার-টেবিলে ঘরখানি পরিপূর্ণ। একটু দৃষ্টি করি... বেশ বোঝা যায়—ঘরখানি মজ্‌লিসের জন্যই ব্যবহৃ... হয়।

সাহেবের ইঙ্গিতে শুভ্র আস্তরণে ঢাকা একটি টেবিলে... নিকট চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—ইতঃপূর্ব্বে কে টেবিলে... উপর চা ও চায়ের সরঞ্জামাদি রাখিয়া গিয়াছে। কি... তাহা আমাদের চোখেই পড়িল না। শুধু ঘরখা... এবং অপূর্ব্ব সজ্জা—অদূরে টেবিলের উপরকার সদ্যফো... স-ফুলের গন্ধ, সাহেবের স্নিগ্ধ মধুর হাসি সবগুলি মি... শুধু যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সাহেব বিনীত মধুর কণ্ঠে কহিল, অসময়ের অতিথি হয় ত তোমাদের কষ্ট হবে...

করিতেছি[illegible] মুখ দিয়া অসংলগ্ন উক্তির ন্যায় বাহির হইল, দশ বৎসর[illegible]

দশ[illegible]হেব বলিল, শুধু এক কাপ চা ভিন্ন ত আর কিছু [illegible] পারি নি...তারপর যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া [illegible]ল, আচ্ছা, তোমরা বসো—আমি আস্‌ছি···বলিয়া [illegible]হেব দ্রুত অদৃশ্য হইল।

সাহেব চলিয়া গেল। আমরা সেইখানে দুইজন স্তব্ধ [illegible]ইয়া বসিয়া রহিলাম। টেবিলের উপর চা-ভেজা জলের [illegible]রভি ধূম কুণ্ডলী করিয়া করিয়া উপরে উঠিয়া [illegible]লাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু উহা টানিয়া লইয়া পান [illegible]রিবার আগ্রহ আমরা অনুভব করিলাম না। কতকটা [illegible]হাচ্ছন্নের ন্যায় নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া সাহেবের চলা-[illegible]র দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

আর একবার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। বিকট [illegible]র্ত্তনাদ করিয়া আকাশ ফাটিয়া পড়িল।

ঠিক্ সেই সময় পাশের ঘর হইতে এক মর্ম্মন্তুদ [illegible]র্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিয়া কানে বাজিল।

দুইজনে চমকিয়া উঠিলাম।

আবার সেই করুণ, যন্ত্রনা-কাতর আর্ত্তনাদ—আবার—[illegible]বার! এবার আরও সুস্পষ্ট, আরও সকরুণ!

[illegible] উভয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। উভয়েই লাফাইয়া [illegible]য়া বাহিরে আসিলাম এবং পাশের ঘরের দিকে সবেগে [illegible]ড়াইলাম।

ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম, ঘরটীর দরজা ভিতর হইতে [illegible]। কিন্তু বদ্ধদ্বার গৃহের ভিতর হইতে একটা [illegible]শ্রান্ত মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে বিচলিত [illegible]য়া তুলিল। তারানাথ ছুটিয়া গিয়া দরজার কড়া [illegible]য়া প্রাণপণে কয়েকবার টানিয়া খুলিতে পারিল না। [illegible]পর কয়েক মিনিট ধরিয়া সবেগে কড়া ধরিয়া নাড়িতে [illegible]গিল—কোনই ফল হইল না। অবশেষে চীৎকার করিয়া [illegible]কিতে লাগিল—সে শব্দ শুধু বাহিরের বিকট বিপর্য্যয়ের [illegible]নতা আরও একটু বাড়াইয়া তুলিল মাত্র।

আমি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। ছুটিয়া গিয়া [illegible]রে দরজার উপর সবুট পদাঘাত করিলাম। দরজায় কাণ রাখিয়া উৎকর্ণ হইলাম—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গৃহাভ্যন্তরের সেই অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ তখনও তেমনি কানে বাজিতেছিল।

এইবার দুইজনে একসঙ্গে দরজার উপর সবেগে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। জীর্ণ দরজা কয়েক মুহূর্ত্ত সে আঘাত সহ্য করিয়া এক সময় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই ভাঙ্গা পথে ঘরের ভিতর চাহিয়া আমরা উভয়ে একসঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, সেই ক্ষণ-দেখা মেয়েটী একপাশে অসাড় অনড় পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের রক্ত যেন কে নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে, চোখ দুইটী নিষ্প্রভ-দৃষ্টি, হিম-শীতল, অচঞ্চল। শুধু সেই অসাড় মুখের প্রতিটী রেখায় আতঙ্ক যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদূরে সাহেবের সেই বীভৎস দেহ হিংস্র শিকারী পশুর ন্যায় হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুইটী চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণিত তীব্র লালসা যেন আগুনের মতো ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার বামহস্ত ঈষৎ নমিত, কিন্তু উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে দৃঢ়াবদ্ধ পিস্তলটী বোধ করি মেয়েটীর ক্ষীণ একটু অবাধ্যতাকেও ক্ষমা করিবে না··· ··

উভয়ে শিহরিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিলাম।

কিন্তু সাহেব পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবং উদ্যত পিস্তলটী আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক নিষ্কম্প কণ্ঠে কহিল, যাও......

সেই শব্দের ধ্বনি শিরায় শিরায় ভূমিকম্পের ধ্বনির মত অনুভূত হইল এবং মুহূর্ত্তে বক্ষের সশব্দ স্পন্দনকেও নিস্তব্ধ করিয়া দিল। ব্যাপারটা চোখের পলকে অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হইল না। পলকে তীব্র অনুশোচনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজেরাই ক্ষেপিয়া উঠিলাম......হায়, বন্দুকটীও যদি কাছে রাখিতাম!...... তারানাথ গোঁয়ার এবং প্রাণের মমতা কিছু ওর আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই সাবধান করিয়া দিবার জন্য অলক্ষ্যে তাহার পিছনে একটু ঠেলা দিলাম। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে যেন

ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। তাহার মুখের ভাব পলকে পলকে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল এবং ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমি অন্তরে কি যন্ত্রনাই যে অনুভব করিতেছিলাম......

সাহেব আবার হিম-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, যাও......

কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। তারানাথ আমাকে পর্য্যন্ত বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়া বাঘের মত সাহেবের ওপর লাফাইয়া পড়িল—সাহেব পলকে সরিয়া দাঁড়াইল। তারানাথ নিজেকে সঙ্গে সাম্‌লাইতে না পারিয়া সবগে গিয়া দেওয়ালের উপর আছড়াইয়া পড়িল—তাহার মাথাটা সজোরে প্রাচীর গাত্রে ঠকিয়া গেল।

সে হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল মাত্র, তারপর ঘাড় গুঁজিয়া সেইখানে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল।

সাহেব হিঃহিঃহিঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেই তীব্র হাসির রূঢ় শব্দে আমার অন্তরের ভিতরটা তুহিনের মত জমিয়া উঠিল—মুখ ফুটিয়া যে একটা আর্ত্তনাদ করিব, সে ক্ষমতাও রহিল না।

সাহেব আসিয়া আমার অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইল। একবার মাত্র আমার দিকে তাহার অচঞ্চল হিম-শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর সে সজোরে আমার কব্জি চাপিয়া ধরিল। আমি শিহরিয়া উঠিয়া চোখ বুজিলাম। ওঃ, সে কি স্পর্শ!—একটুও যেন সে হাতে রক্ত নাই, জীবনের স্পন্দন যেন সেখানে অনুভব করা যায় না। কাঠির মত কঠিন হাড়ের বরফ-স্পর্শ আমার চামড়ার উপর যেন কাটিয়া বসিল।

আমার বুকের স্পন্দনও যেন থামিয়া আসিল, পা দুইটী অবশ হইয়া ক্রমে ক্রমে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া মেঝের সঙ্গে জমিয়া গেল—ক্ষুদ্র প্রাণটুকুও বুঝি এইবার......

যখন জ্ঞান ফিরিল, দেখিলাম, তারানাথ তখনও ঘরের কোণে তেমনি ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। সাহেব ও সেই মেয়েটী অদৃশ্য—ঘরের দরজা বন্ধ।

উঠিতে গেলাম, পারিলাম না। কে যেন সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ভারী পাথর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেই খানে পড়িয়া থাকিয়া বিকল ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্বাধীনে আনিয়া সমস্ত ঘটনাটি আর একবার পর্য্যালোচনা করি গিয়াও কম আশ্চর্য্য হইলাম না। জগতে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অভাব নাই এবং বহু মানুষের জীবনেই অকস্মাৎ বিচি ভাবে সেগুলি উপস্থিত হয়; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার রু যবনিকার অন্তরালে আমাদের অদম্য কৌতূহল যাহ আবিষ্কার করিল, বোধ করি জগতে তাহার আর তুল নাই।

বাহিরে তখন অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল-ঝড়েরও বিশ্রাম ছিল না! সঘন পত্রবিশিষ্ট দার্ঘক ঝাউগাছগুলির অসহায় করুণ হা-হুতাশ বিশ্রী বিভীষিক চতুর্দ্দিক ভারী করিয়া তুলিতেছিল—অদূরের বঁ ঝাড়ের কর্কশ আর্ত্তনাদ একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত স ইন্দ্রিয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। দরজা-জান লার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ বিকাশ পৃথিবীর রাত্রির বীভৎস রূপ উলঙ্গ করিয়া দেখাইতেছিল, পরক্ষণেই বোধ ক লজ্জায় শিহরিয়া উঠিয়া আবার অতল অন্ধকারে মু ঢাকিতেছিল। ঘরে একটীও আলো নাই—অথচ কোথা হইতে কোন অদৃশ্য আলোকধারা সমস্ত কক্ষতল দিনে ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

অকস্মাৎ সহস্র সহস্র কণ্ঠ সেই বাড়ীটার চতুর্দ্দি কলরব করিয়া উঠিল—কাহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তু আক্রোশে সমস্ত স্থানটী যেন চসিয়া ফেলিতে লাগি ইহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য ভিতরে কোন আ জন চলিতেছিল কি না জানি না, তবুও রাত্রির অন্ধকা কাঁপাইয়া বাহিরের বিচিত্র কলরবের ভয়াবহ শব্দকে পর্য অতল করিয়া দিয়া কোথা হইতে অবিশ্রান্ত উদ্দ হাসি তীব্রবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল—হাঃহাঃহ হিঃহিঃহিঃ......

শিহরিয়া উঠিলাম। চোখের সামনে যেন মর ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মৃত্যুর দূতগুলা বোধ করি রা এই ভীষণতার সুযোগে আমাদিগকে কুক্ষিগত করি জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—এ তাহারই কলরব। ভয়ে চে

…ুজিয়া আসিল—আতঙ্কে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া …ঠিলাম। ব্যাকুল চক্ষু দুইটী অকস্মাৎ জলভারী হইয়া …ঠিল। বুকের ভিতর আর্দ্র বেদনা সহসা কাঁদিয়া উঠিল …কেন আসিয়াছিলাম……যাকে ফাঁকী দিয়াছিলাম…… …থ্যা বলিয়াছিলাম ……

বসিয়া বসিয়া কম্পিত চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে- …ছিলাম। বাহিরের অস্পষ্ট কলরব, মৃদু গর্জ্জন যেন ক্রমশঃ …স্পষ্ট ও অসহ্য হইয়া উঠিল—হাসির ধ্বনিরও বিশ্রাম …াই…মেয়েটীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর অসহায়ের মত কাঁদিয়া …দিয়া ফিরিতে লাগিল…

সহসা মনে হইল, এই বিপর্য্যয় বোধ করি সেই মেয়ে- …কে লইয়াই—বোধ করি সেই মেয়েটীকে ছিনাইয়া …বার জন্যই বাহিরে সহস্র সহস্র কণ্ঠ উন্মাদ হইয়া উঠি- …ছে। এই মেয়েটী পাশের গ্রামেরই হয় ত আর পাঁচজনের …ত সুখে আনন্দে সংসার করিতেছিল—কল্পনায়, কত কি …খের আনন্দে নিজের ক্ষুদ্র গৃহখানির বুকের উপর সে স্বর্গ- …রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল—অদূর ভবিষ্যতের অনাগত দেব- …শুগুলির কলতানে বোধ করি তাহার বুক ভরিয়া গিয়া- …ল…একদিন হয় ত সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি সেই সংসারের …পর গিয়া পড়িল। শত সহস্র প্রলোভন হয় ত মেয়েটিকে …চলিত করিতে পারে নাই…কিন্তু সাহেবের উদ্দাম …সা প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই…তারপর একদিন …ত…

অকস্মাৎ বাহিরের সহস্র সহস্র কণ্ঠ বিকট রবে গর্জ্জন …িয়া উঠিল—বাড়ীখানা যেন সেই শব্দে থরথর করিয়া …পিয়া উঠিল—ওধারের ঘর হইতে হয় ত সাহেব মরিয়া …য়া উঠিল। সহসা সহস্র পিস্তল বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষে …ম বাহিরের বিকট গর্জ্জন মুহূর্ত্তের জন্য অতল হইয়া …ল।

তারপর সমানে চলিল সেই গর্জ্জন আর সাহেবের …কট অট্টহাস্যের সহিত অবিশ্রান্ত বন্দুকের গম্ভীর ধ্বনি… …হিরে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ যেন সকরুণ হইয়া উঠিল।

…সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে গিয়া …নালার পাশে দাঁড়াইলাম। জানালার একটি পাকি ভাঙ্গা ছিল—সেই ছিদ্র-পথে বাহিরের তরল অন্ধকার আমার দৃষ্টি মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিল।

কিছুই চোখে পড়িল না…শুধু মৃত্যুর আর্ত্তধ্বনির সীমাহীন ভয়—আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া জানালার পাশে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলাম। তারানাথের অচেতন দেহের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দুইটি চোখ জলে ভরিয়া গেল। তীব্র বেদনায় অন্তর কাঁদিয়া উঠিল—কেন তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করি নাই…কেন আসিতে দিয়াছিলাম…সাহস দিয়াছিলাম… সঙ্গে আসিয়াছিলাম…যদি উহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে না পারি…কি বলিয়া একা ফিরিব…কি বলিয়া…

সত্য-সত্যই এইবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। একবার মনে হইল, উঠিয়া গিয়া দরজাটা ভাঙ্গিয়া দিই—দিয়া তারানাথকে লইয়া ঐ সহস্র বিপর্য্যয়ভরা আতঙ্কিত অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া যাই…

সহসা বিপুল বিজয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, মরেছে—মরেছে—সরলা মরেছে…বেশ হয়েছে…দে—দে—ঐ সঙ্গে সাহেবকেও জীবন্তে চিতায় তুলে…একা যাবে কেন ও…

সেই বিকট চীৎকারে বোধ করি সাহেবও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল…

তারপর গভীর নিস্তব্ধতা…

বাহিরের ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির আর শব্দ শোনা যায় না, ঝাউগাছগুলি বোধ হয় নিরুদ্ধ বেদনায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে—ক্লান্ত পৃথিবী গাঢ় ক্লান্তিতে সবেমাত্র চোখ বুজিয়াছে…

কিন্তু এই গাঢ় নিস্তব্ধতা যেন দ্বিগুণ ভয়ে আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল—মনে হইল, এ বুঝি আর একটী ঝড়ের লক্ষণ! বাহিরের সহস্র নিস্তব্ধ কণ্ঠ বোধ করি আর একটী কল্পনাতীত ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়া নিজেরা নিজেরাই শিহরিয়া উঠিতেছে……

অকস্মাৎ দাউ দাউ করিয়া ওধারের ঘর জ্বলিয়া উঠিল—তারপর বারান্দা—আগুনের লেলিহান শিখা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমশঃ আসিয়া বোধ করি আমাদের জানালার

উপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। বাহিরের হাজার হাজার কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বোধ করি ওধারের ঘরে আবদ্ধ সাহেব একাই প্রাণভয়ে সহস্রকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া দাপাদাপি করিতেছিল।

আগুনের উত্তাপ তীব্র অনুভব করিতে লাগিলাম। ওধারের জানালা আগুনে পুড়িয়া খসিয়া পড়িল—সেই দ্বারপথ দিয়া আগুনের দীর্ঘ প্রলম্বিত তপ্ত জিহ্বাগুলি শুধু আমাদের জন্যই বুঝি উন্মাদ হইয়া উঠিল। আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলাম। কি করিয়া এই আগুন হইতে উদ্ধার পাইব—তারানাথকে উদ্ধার করিব ভাবিয়া পাইলাম না—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য—দালানের বরগাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। কোন্ সময় বোধ করি পুড়িয়া খসিয়া পড়িয়া জীবন্তে সমাধি দিবে। ভয়ে, আতঙ্কে, ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। কোনো দিক্ দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। ওধারের জানালা-পথ দিয়া তীব্র আগুনের শিখা ঘরে আসিতেছে—এধারের দরজাও জ্বলিয়া উঠিল। অবর্ণনীয় উত্তাপে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল—আর পারি না—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল—পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিল—চোখ দুইটা ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল...অকস্মাৎ বুকে বল আসিল—এমনভাবে কাপুরুষের মৃত্যু·· সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিল···বিপদের কথা ভুলিয়া গেলাম। দুই হাত দিয়া তারানাথের অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া সদর দরজাভিমুখে ছুটিলাম......

সেই মুহূর্ত্তে দরজা পুড়িয়া খসিয়া পড়িল—একটা বিরাট আগুনের শিখা আসিয়া যেন আমাদিগকে ডুবাইয়া দিল। প্রাণভয়ে পিছনে হটিয়া গেলাম—কয়েক মুহূর্ত্ত সম্মুখের দিকে চাহিবার মত শক্তিই রহিল না।

এইবার ভাল করিয়া চাহিতেই ভয়ে আর্ত্তনাদ ক[রিয়া] উঠিলাম—সেই দ্বারপথে অজস্র আগুনের শিখার [মধ্যে] সাহেব দাঁড়াইয়া—তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে—অ[সংখ্য] ফোস্কা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ভয়াবহ বীভৎসতায় ফু[টিয়া] উঠিয়াছে—চোখ দুইটা কোটর ছাড়িয়া যেন গালের উ[পর] ফুটিয়া উঠিয়াছে—নাকের চিহ্নমাত্র নাই—চোয়াল দু[ইটা] কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—শুধু দুই পাটী দাঁত...... তাকান যায় না......

সাহেব বিকট রবে হাসিয়া উঠিল, হিঃহিঃহিঃহিঃ

সেই বিকট হাসি যেন আর থামিতে চাহে না আগুনের ন্যায় স্বেচ্ছায় প্রলম্বিত হইয়া সরীসৃপের গতি[তে] আমার শিরা উপশিরা বহিয়া সেই হাসির সকম্প ভী[তি] হিমস্পর্শে বুকের উপর বরফের মত জমিয়া উঠি[ল—] আমার কণ্ঠ হইতে একটী ক্ষীণ আর্ত্তনাদ মাত্র ফা[টিয়া] পড়িল, মা—মাগো......

তারপর...... ...

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ও বেদনা লইয়া চোখ মেলিলা[ম।] দেখিলাম, তারানাথ ইতঃপূর্ব্বেই উঠিয়া আমার দি[কে] সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। [ধীরে] ধীরে উঠিয়া পড়িলাম—সভয়ে একবার চতুর্দ্দিক চাহিল[াম] কিন্তু নিজের চোখ দুইটীকেও বিশ্বাস করিতে পারি[লাম] না।......রাত্রির সেই বিশাল ভয়াবহ অগ্নি ত দূরের [কথা—] এক ফোঁটা ছাইও দেখিলাম না। আমরা যে ঘরে [সর্ব্ব-] প্রথম বসিয়াছিলাম, সেই ঘরে, সেই বিছানার উ[পর] বসিয়া আছি। দাবার ছকটী এখনও তেমনি সাজ[ান] আছে; এমন কি, বন্দুকটী পর্য্যন্ত কেহ নাড়ে নাই—[যেন] সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া............

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র স[াহা]

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

শূন্য মন্দির মোর !

দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, বি-এস্-সি

নাম তার মেরী। মা বিলিতী, বাপ দেশী। দুই জাতির মিশ্রণে তার জন্ম,—দুই জাতির সৌন্দর্য্য দিয়েই গড়া। দুধে আল্‌তা দেওয়া তার গায়ের রঙ, পাত্‌লা ঠোঁট, টানা চোখ, নীল আকাশের মত উজ্জ্বল গভীর তার চোখের তারা। তার অজানুলম্বিত বেণী নাই, কিন্তু চুলের ভেতর যেন নদীর বুকের দোলায়মান ঢেউ খেলে চলেছে।

তার হাসি অপরূপ, চাহনি অপরাজেয়।

এমন যে সে!—একদিন যেন আকাশের বুক চিরে দীপ্তির রথে বের হলো।

তখন বায়স্কোপের ভয়ানক চল্‌তি। মেয়ার কোম্পানীতে তাড়জোড় লেগে গেছে ফিল্‌ম তুলতে। নতুন, নতুন ফিল্‌মে নতুন নতুন অভিনেত্রীর দরকার। কত কত সুন্দরী এসেছে রূপ-যৌবনের ঢেউ তুলে। মেরীও একদিন এলো।

ফিল্‌মে মেরীর খুব নাম হয়েছে। এমন একটিং, রূপের সৃষ্টি কেউ আর করতে পারে নি। এমন উন্মাদনা, মাদকতা, মোহের আবেশ কেহ কখনও আর আনে নি।

সকলে জানেন, এ রূপের স্রষ্টা তরুণ অভিনেত্রীর নাম মেরী। উর্ব্বশীর পরশ বুকে লাগিয়ে দিয়ে যেন জানিয়ে দিল সে মেরী।

ফুল যখন পাপড়ীর পর পাপড়ী মেলে ফুটে ওঠে, তখন ভ্রমরের দল ছুটে যায় মধু লুটতে। বসন্তের সুষমা যখন বুকে লাগে, কোকিল ডাকে, হাওয়ায় দোল খায়, তখন নাগর চলে অভিসারে।

মেরীর চলচল ভরা যৌবনের আহ্বানে তেমনি দেশ বিদেশের কত ভ্রমর ছুটে এলো, কেউ দূর হ'তে অর্ঘ দিল,—তুমি সুন্দর, তুমি অপরূপ, তুমি মধুময়!

যারা তা'তে তুষ্ট নয়, তারা এলো মেরীর পরশ পেতে তাকে বুকে নিতে। মেরী হাস্‌ল।

মেরীর এই ভক্তের দলে এমন কেউ ছিল না—যার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যাদের প্রাণে সত্য আছে, কিন্তু ভাগ্যের দোষে শুষ্ক জীবন, রুক্ষ দেহ, তারা হয় ত দূরে অতি দূরে স্বপ্নের মাঝে স্বপ্নময়ীকে নিয়ে মত্ত ছিল।

বাস্তব জগতে তাদের এগিয়ে আসা সম্ভব নয়,—আস্‌তেও পারে না।

যারা এলো, সবাই ধনীর দুলাল, লক্ষ্মীর বরপুত্র—প্রাসাদের ক্ষীর সর নবনীতে গড়া, অনুপম রূপ লাবণ্যময়

মেরীকে ঘিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্রীর, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বের হাট বস্‌ল।

ভক্তের দলে রূপের ঢেউ তুলে মেরী যখন নাচত, তখন তারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

কাছে এসে হাত ধরে কথা কইলে আপনা ভুলত।

রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানির উষ্ণ পরশ লাগিয়ে দিলে মাতাল হয়ে উঠ্‌ত, বুকের মাঝে অসীম তৃষ্ণা জাগ্‌ত।

আর, আর সে?...বিজলীর মত চমক্ দিয়ে চলে যেত।

চাহিদা যখন বেশী হয়, দামও চড়ে তেম্‌নি। উঁচুহারে 'বিট্' তুলে মেরীও তেমনি অঙ্গের পর অঙ্গ ঘুরতে

লাগ্‌ল। কিন্তু কোন অঙ্গে সে ধরা দিলে না—দামিনীর মত শুধু ক্ষণিকের চমক লাগিয়ে ছুটে চল্‌ল।

ইন্দ্রের চেয়ে বড়, কুবেরের চেয়ে ধনী, কন্দর্পের চেয়ে অনুপম তরুণ নাগর ওয়াট্ আস্‌ল। মেরী ছুটে এসে তার হাত ধর্‌ল—এস প্রিয়তম!

পাওয়ার মাত্রা যে আমার কানায় কানায় উপ্‌চে পড়ছে।

*　*　*

এমনি করে দিন চল্‌তে লাগ্‌ল।

পরে এমন একদিন আস্‌ল, যখন মেরীর অফুরন্ত পাওয়া থাম্‌ল, থাম্‌ল তার সচ্ছন্দ সাবলীল গতি!

পাওয়া যখন থামে, তখন পুঁজিতে হাত পড়ে। গতি যখন থামে, কল-কব্জায় তখন মর্‌চে ধরে।

মেরীরও তাই হলো। যে যৌবন একদিন উদ্দাম হয়ে ছুটেছিল দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'তে ভাটার টান পড়ল। যে রূপ একদিন চোখ ধাঁধিয়ে দিত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা' ফেকাসে হয়ে এলো।

মেরী পমেটম মাখত, ঠোঁটে রং লাগাত, পাউডারের গেলিসে হাত-মুখ ভরিয়ে দিত...

কিন্তু সেরূপ আর ফোটে কই? রূপের আলোতে চৌদিক ঝল্‌সে কই?

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কত ঢঙের মহলা দিত সে—যদি আবার ফিরে আসে সেদিন, ফিরে আসে রূপ-যৌবন!

সব বুঝি বৃথায় যায়! ব্যর্থ হয়ে যায় তার সাধনা! যা' যায় আর বুঝি তা' ফেরে না!

এখন কেউ যে আর আসে না! যে দোরে একদিন প্রেমিকের ভীড় ছিল, আজ সে দোরে কেউই নেই। যাকে দেখ্‌তে শত চক্ষু উন্মুখ হ'ত, কেউই আর তার দিকে তাকিয়ে দেখে না। যার পরশ পেতে কত শতজন ছুটে আস্‌ত, আজ কেউই তার কাছে ঘেঁসে না—দূরে সরে যায়।

ক্রমে মেরীর যৌবনে পুরো ভাটা পড়ল—পুঁজি যা' ছিল কিছুই আর তার রইল না।

কিন্তু দিনের পর দিন যেতে যেতে এমন একদিন আস্‌ল, যখন প্রেমিক তার সর্ব্বস্ব দিয়েও তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লে না।

কেউ যদি বল্‌ত,—মেরী এ তোমার বেশ বেসাতি, বেশ! মেরী হেসে তার জবাব দিত,—মন্দ কি? গতিহীন স্থবির হ'তে যাব কেন, ছন্দবিহীন হয়ে কেন তলিয়ে যাব?...

...আমার এ ঠোঁটের পরশ ত একার নয়। এ দেহের ছোঁয়া ত একার চাওয়া নয়। এ আলিঙ্গনে একজনকে কেন বাঁধব?

...এ রূপের দোলায় দোল খাবে কত নাগর। কত ভ্রমর করবে এ মুখের মধুপান।

...এ জীবনের এই ত উপভোগ, এই ত চাওয়া।

লচর্ম্ম, শিথিল দন্ত, পক্ককেশা মেরী! নুইয়ে পড়ল জু দেহ, চোখ বসে গেল, স্বর হ'ল রুক্ষ।

রী তা'তেও দম্‌ল না—উঠে পড়ে লাগ্‌ল লোকের াব কর্‌তে।

প্রেমের অতিথিকে একদিন তীব্র পরিহাস করে- জ কোমর বেঁধে বার হলো তাকে খুঁজে আন্‌তে। পুজোর ফুল একদিন পায়ের তলায় মাড়িয়ে ছিল, র উপর তাথৈতাথৈ নেচেছিল, মনপ্রাণে লেগে ফুল কুড়ুতে, সে বেদীতে আলপনা দিতে—কিন্তু আর হয়ে ওঠে না।

ায় একজন বালকের কাছে এগুতে সে ডাইনি বুড়ী কিয়ে উঠ্‌ল, এক যুবক তীব্র হাসি হাস্‌ল, এক ানুভূতি প্রকাশ কর্‌ল।

একবারে ভেঙে পড়ল—না, কিছুই নেই আর আজ সে নিঃশেষে দেউলিয়ে!

র যখন এম্‌নি, তখন ভেতরের দিকে দৃষ্টি পড়ল কছু গড়েছে কি না!

রর রিক্ততায় যখন পাষাণ চাপিয়ে দিল, তখন ীর মধ্যে তাকাল, কোথায় কোনো আশ্রয় আছে বাহিরের নগ্নতায় আঁতকে উঠে নিজের মধ্যে গল কোথায় কোন সজীবতা মেলে কি না।

কিন্তু কোথাও কিছুই তার নেই, কাকেও সে কোন-দিন ভালবাসে নাই, ভালবাসার গৃহ বাঁধে নাই, যে এসেছে, তাকে ফতুর করে তাড়িয়েছে।

এখন সে একক, একক—কেউই তার নেই।

…সব হারিয়ে সে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছে, যদি তার স্বামী থাক্‌ত, ছেলেমেয়ে হ'ত—বুক ফুলিয়ে বল্‌তে পার্‌ত এরাই এখন তার সব।

এ ভরা দুর্দ্দিনে, এ রক্ত-দহন অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে আবার হয় ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্‌ত।

নিজের বুকে ভাটার টান পড়েছে, ক্ষতি কি? একটা সুন্দর সুঠাম সাবলীল ভঙ্গিমা ত পেছনে পড়ে রইল।

নিজেকে হারিয়েছে, দুঃখ কিসের? নিজের পুঁজিতে এ ত গড়ে উঠেছে—নয়নাভিরাম নন্দন কানন। নিজেকে নিঃশেষে এঁকে দিয়েছে ভবিষ্যতের পট পরতে পরতে।

মেরী আজ বুঝতে পেরেছে তার ভুল—কি ভুলই না সে করেছে! অতীতের পুঁজি তার অতীতেই ফুরিয়েছে,

ভবিষ্যতের সম্বল শুধু ভিক্ষার ঝুলি—যাতে কোনদিন কাণাকড়িও পড়বে না।

আজ সে বুঝ্‌তে পারছে কেমন করে সম্বল কুড়ুতে হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বড় হ'তে হয়—যাতে করে সংসারের, সমাজের, বিশ্বের আনন্দ উপ্‌চে পড়ে।

সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্‌ছে সে তার বাড়ীর আশেপাশে যোশেফাইন, ইরা, মীরা, আলেকজেন্দ্রিয়া—কত কত জন কেমন আনন্দের সহিত ঘর-করণা করছে।

তারা সংসারী। ছেলেমেয়ে আছে ; ছেলে মেয়ের ছেলে মেয়েতে ঘর ভরেছে।

ওরা ত শুধু ছোট্ট ছেলেমেয়ে নয়—যেন হীরের টুকরো। ওরা ত শুধু কলরব করে না—আনন্দের কল্লোল তোলে। বুড়ো ঠাকুরমাকে ঘিরে যেন আনন্দের মেলা বসিয়েছে।

ওদের ছেলেমেয়েরা যখন 'মা মা' করে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কি আনন্দের বন্যাই না বয়ে যায়! কি অমৃতই না বর্ষিত হয়!

তারও বড় ইচ্ছা হয় 'মা' ডাক্ শুন্‌তে। ওই, ওই অমন করে ছেলেমেয়েকে কোলে-পিঠে, বুকে নিতে।

কিন্তু কা'কে নেবে সে—কেই বা তার আছে। ওরা যে পর, পর, তাকে দেখে দূরে সরে যায়, ডাইনি বুড়ী বলে হাততালি দেয়।

আপন পরে এম্‌নি তফাৎ। ওঃ! ওঃ!

ও পাড়ায় ইলা থাকৃত। মৃত্যুশয্যায় তার ছেলে-মেয়েরা কি সেবাই করেছে! বিদায়-বেলায় তাদের কি মর্ম্মভেদী কান্না!

মরবার সময় বুড়ীর জ্ঞান ছিল। সন্তানের বিয়োগ-বিধুর মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওদের উষ্ণ চুম্বন সাথে নিয়ে সে চোখ বুজেছে।

তারপর কত বৎসরই না কেটে গেল। তার ওই দিনে ছেলেমেয়েরা সমাধি-স্থানে ভীড় করে—প[illegible] সাজায়, নীরবে অশ্রুর অর্ঘ্য দেয়।

সুন্দর তাদের স্মৃতির পূজা! কি সুন্দর ইলা মাতৃত্বের দ্বারে সন্তানের এই শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন!

কিন্তু মেরীর? যাবার বেলায় কে কাঁদবে 'মা ম[illegible] কে দেবে তাকে বিদায় চুম্বন? বছরের পর বছর ক[illegible] তার স্মৃতির তর্পণ?

ভাব্‌তে ভাবৃতে নীরব অশ্রুতে তার বুক[illegible] যায়।

* * *

দিন যায়, রাত আসে। জগতের এই চির অ[illegible] একদিন সবাইকেই যেতে হবে। মেরীরও যাবা[illegible] এলো।

তার পয়সা ছিল, ডাক্তার, নার্স, বয়, মেথর মিল্‌ল। মিল্‌ল না কেবল এতটুকু স্নেহাতুর বুক, এক[illegible] বিয়োগ-কাতর [illegible]।

বুকচেরা নিঃশ্বাস ফেলে সে শেষ চোখ বুজ্‌ল।

* * *

সমাধি-স্থানের এক কোণায় তারও স্থান হয়েছে যেন দয়া করে লিখে দিয়েছে—'শূন্য মন্দির মোর!'

বছরের পর কত বছর গেল। উদাস হা[illegible] কালো পাথরের গা ঘেঁষে বুঝি বা করুণ সুরে ওই আজও মাকে খুঁজে বেড়ায়।

দক্ষিণারঞ্জ[illegible]